পরিচয়।

77

গতিময় অভিযান

পরিচয়

বর্ষ ৪৫ / সংখ্যা ১-৩

শারদীয় ১৩৮২ / ১৯৭৫

ফ্যাসিবাদ সম্পর্কিত

রাজনীতিক প্রবন্ধ

সঙ্গীত ও চিত্রকলা

সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ক প্রবন্ধ

গল্প

কবিতা

বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হরপ্রসাদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন বসু, রণজিৎকুমার সেন, চিত্ত ঘোষ, বনস্পতি গুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, কৃষ্ণ ধর, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সিদ্ধেশ্বর সেন, সতীন্দ্রনাথ মৈত্র, ধনঞ্জয় দাশ, তরুণ সান্যাল, মানস রায়চৌধুরী, শিবশম্ভু পাল, বীরেন্দ্র রক্ষিত, আবুল কাসেম রহিমুদ্দিন, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, গণেশ বসু, আশিস সান্যাল, বিনয় মজুমদার ১২২—১২৮ ও ২৭০—২৮৮

প্রচ্ছদ : বিশ্বরঞ্জন দে

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য । হিরণকুমার সান্যাল । সুশোভন সরকার
অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র । গোপাল হালদার । বিষ্ণু দে । চিন্মোহন সেহানবীশ
সুভাষ মুখোপাধ্যায় । গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তরুণ সান্যাল

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

ক্রোড়পত্র

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে

ফ্যাসিবাদের ঐতিহাসিক ও সামাজিক উৎস

রণজিৎ দাশগুপ্ত

আমাদের দেশে ফ্যাসিবাদ নিয়ে চর্চা কিছুকাল আগেও নেহাৎ অ্যাকাডেমিক কৌতূহলের বিষয় বলে বিবেচিত হত। কিন্তু এখন যখন ফ্যাসিবাদ বা নয়া-ফ্যাসিবাদ প্রসঙ্গে সারা দেশ জুড়ে তর্ক-বিতর্ক-আলোড়নের ঝড় চলেছে তখন এই আলোচনার সমসাময়িক গুরুত্বও সুস্পষ্ট। এই কথা মনে রেখেই বর্তমান নিবন্ধ রচনা।

॥ এক ॥

বুর্জোয়া একনায়কত্ব ও ফ্যাসিবাদ

ফ্যাসিবাদ[১] কাকে বলে? এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার গোড়াতেই কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন।

এক, যে কোনো বুর্জোয়া শাসনেরই অর্থ বুর্জোয়া একনায়কত্ব।

দুই, বুর্জোয়া শাসন বা একনায়কত্বের দুটি প্রধান রূপ: (ক) বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ও (খ) বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল।

তিন, গণতান্ত্রিক বা প্রতিক্রিয়াশীল, যে রকম চেহারাই হোক না কেন, বুর্জোয়া সরকার মাত্রেরই মৌলিক লক্ষ্য অন্তর্বিরোধে পূর্ণ ধনতান্ত্রিক বন্দোবস্তকে বজায় রাখা ও রক্ষা করা এবং শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনসাধারণের বিপ্লবী আন্দোলনকে খর্ব করা।

চার, দেশ-কাল ভেদে দক্ষিণপন্থী বা **প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শাসন বা একনায়কত্বের নানা রকমফের হতে পারে,** যেমন, রক্ষণশীল, প্রভুত্বপরায়ণ (authoritarian), আধা-সংসদীয় প্রভুত্বপরায়ণ, সামরিক একনায়কত্বমূলক কিংবা ফ্যাসিবাদী সরকার। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, **বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়া মাত্রই ফ্যাসিবাদ নয়।** ফ্যাসিবাদ হল সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক

১. অথবা তার জার্মান সংস্করণ নাৎসিবাদ।

বিকাশধারার থেকে উদ্ভূত **বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়ার একটি বিশিষ্ট রূপ**।[২] বস্তুতপক্ষে প্রতিক্রিয়া কি বিশেষ চেহারা বা রূপ নেবে তা নির্ভর করে একটি দেশে বুর্জোয়া শাসকদের কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর মোকাবিলা করতে হবে তার উপর।

অবশ্য ফ্যাসিবাদী আন্দোলন এবং ক্ষমতাসীন ফ্যাসিবাদ—এই দুই অর্থেই ফ্যাসিবাদও এক-একটি দেশের নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতি এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও আন্তর্জাতিক অবস্থান অনুসারে বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে। তবে ইয়োরোপের 'ক্লাসিক' ফ্যাসিবাদী দেশদুটির ক্ষেত্রে (ইতালি ও জার্মানি) মোটের উপরে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে আরও বেশ কিছু ইয়োরোপীয় দেশে চরম প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ও এশিয়ায় জাপানী ফ্যাসিবাদের ক্ষেত্রেও এই সব বৈশিষ্ট্যের অনেকগুলিই বর্তমান ছিল।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিশ্লেষণ[৩] অনুযায়ী ফ্যাসিবাদের অর্থনৈতিক অন্তর্বস্তু ও রাজনৈতিক রূপের **মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ** নিম্নরূপ :

(১) শাসন-ক্ষমতা দখলের লক্ষ্য নিয়ে ফ্যাসিবাদীরা এমন একটি প্রতিক্রিয়াশীল গণআন্দোলন গড়ে তুলেছিল যেটি শুধুমাত্র সামরিক অফিসার ও উচ্চপদস্থ সরকারী আমলা কিংবা বৃহৎ শিল্পপতি, ব্যাঙ্কার ও গ্রামাঞ্চলে ভূস্বামীদের সমর্থন পেয়েছিল তা নয়; ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকটের ফলে এবং অন্যান্য objective ও subjective কারণে এই আন্দোলন পেয়ে গিয়েছিল শহর ও গ্রামাঞ্চলের পেটি-বুর্জোয়াসি, যুব-সমাজের এক বৃহৎ অংশ এবং এমন কি সর্বহারার কোনো কোনো অংশের (যেমন, বেকার ও পশ্চাৎপদ শ্রমিকদের) সমর্থন।

---

২. Rajani Palme Dutt, *Fascism and Social Revolution*, (1935), Indian Edition, 1946, পৃঃ ১০০-০১।

৩. কমিনটার্নের বিশ্লেষণের জন্য এখানে নির্ভর করা হয়েছে নিম্নোক্ত দুটি দলিলের উপর: *Programme of the Communist International*, Adopted at the Sixth Congress (1928), PPH, 1948, পৃঃ ১৪-৫০ ; G. Dimitrov, 'The Seventh World Congress of the Communist International', *Selected Speeches and Articles*, London, 1951, পৃঃ ৮০-৮১ ; ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে কমিনটার্নের অবস্থান ও নীতির বিষয়ে সমালোচনামূলক কিন্তু খুবই মূল্যবান আলোচনার জন্য N. Poulantzas, *Fascism and Dictatorship*, NLB, 1974 দ্রষ্টব্য।

(২) ফ্যাসিবাদীরা জন-সমর্থন পাওয়ার মতলব নিয়ে পুঁজিবাদবিরোধী গালভরা বুলি আওড়াত, কিন্তু আসলে ফ্যাসিবাদ ছিল বৃহৎ পুঁজির হাতিয়ার। বস্তুতপক্ষে জার্মানি, ইতালি বা জাপানে ক্ষমতাসীন ফ্যাসিবাদ ছিল লগ্নী পুঁজির (finance capital) সব থেকে প্রতিক্রিয়াশীল, সব থেকে উগ্র জাত্যভিমানী ও সব থেকে সাম্রাজ্যবাদী অংশের নগ্ন সন্ত্রাসমূলক একনায়কত্ব। এই সঙ্গে এও লক্ষণীয় যে, ফ্যাসিবাদ সর্বদাই সচেষ্ট ছিল ধনতান্ত্রিক সমাজের সংকটগ্রস্ত শাসক-শ্রেণীগুলির (বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র পুঁজিপতি, ব্যাঙ্কার এবং গ্রামাঞ্চলের স্থিত-স্বার্থগুলি) রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ঐক্যসাধনে এবং একটি কার্যকর অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপনে।

(৩) বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিরোধিতা এবং মেহনতী মানুষের লড়াইকে ধ্বংস করার জন্য আইন-বহির্ভূত বেসরকারী সশস্ত্র ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীকে ব্যবহার করা ছিল ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর ফ্যাসিবাদী শাসন ছিল এমন একটি সর্বাত্মক সন্ত্রাসের রাজত্ব যেখানে বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রকে—যে গণতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের চেয়ে অনেক নিম্নস্তরের—সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল, জনগণের বহুদিনব্যাপী বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ফলে অর্জিত রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারগুলিকে যথাসম্ভব বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছিল, ফ্যাসিবাদী দল ভিন্ন অন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলকে, এমন কি ফ্যাসিবাদের প্রতি অনুগত উপদলগুলিকেও পাশবিক নির্যাতন ও হত্যার মধ্যে দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই ডিমিট্রভ বলেছিলেন: "The accession to power of fascism is not an *ordinary succession* of one bourgeois government by another, but a *substitution* of one state form of class domination of the bourgeoisie—bourgeois democracy—by another form—open terrorist dictatorship."[৪]

(৪) ফ্যাসিবাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে ছিল শিল্প-শ্রমিক, গরীব কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকদের আন্দোলন ও সংগঠন এবং মার্কসবাদের উৎকট বিরোধিতা।

(৫) একদিকে বিজয়ী সমাজতন্ত্রের দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জেহাদ, আর অন্যদিকে সমরবাদ (militarism) ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ছিল ফ্যাসিবাদী বৈদেশিক নীতির মূল উপাদান।

৪. Dimitrov, পৃঃ ৪২। এই প্রসঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য Poulantzas, পৃঃ ৬৫।

'ক্লাসিকাল' ফ্যাসিবাদের উপরোক্ত লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি ফ্যাসিবাদ ও নয়া-ফ্যাসিবাদকে চিনতে সাহায্য করে। তবে ফ্যাসিবাদকে ভালো করে জানার ও বোঝার আর একটি পন্থা হল জার্মানি, ইতালি ও জাপানে ফ্যাসিবাদের **আদি ঐতিহাসিক উৎস** এবং এই দেশগুলিতে বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়ার এই বিশিষ্ট রূপটির **উদ্ভব** ও **উত্থানের** ধারাটির বিবেচনা। কারণ ফ্যাসিবাদ শুধুমাত্র কতকগুলি বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত একটি আন্দোলন ও বুর্জোয়া শাসন নয়। ফ্যাসিবাদের জন্ম ও অভ্যুদয় এই দেশগুলিতে সমাজ বিবর্তনের একটি সুনির্দিষ্ট ধারার ফল। এবং উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলিকে এই ইতিহাসের থেকে আলাদা করে দেখা যায় না।

॥ দুই ॥

ধনতন্ত্র ও রাজনৈতিক গণতন্ত্র

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, বুর্জোয়া শাসনের একটি প্রধান রূপ উদারনৈতিক গণতন্ত্র। ফ্যাসিবাদের উৎপত্তি ও বিকাশকে উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করার জন্য প্রথমে সংক্ষেপে দেখে নেওয়া দরকার যে, ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্সের মতো দেশে কোন বিশেষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া রাজনৈতিক গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে। সূত্রাকারে বলা যেতে পারে, **রাজনৈতিক গণতন্ত্রসহ ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে মার্কস-কথিত প্রথম পথে ধনতান্ত্রিক বিকাশ**[৫] ও উদীয়মান বুর্জোয়াসির সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি সংক্রান্ত ভূমিকার (hegemonic role[৬]) ঘনিষ্ঠ ঐতিহাসিক যোগাযোগ লক্ষণীয়।

---

৫. ধনতান্ত্রিক বিকাশের প্রথম পথ ও দ্বিতীয় পথ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য Marx, *Capital,* vol. III, Moscow, পৃ: ৩২৯-৩০ ; ও Paul Sweezy, Maurice Dobb, H. Takahashi and others, *The Transition from Feudalism to Capitalism,* People's Book House, Patna.

৬. কোনো শ্রেণীর social hegemony বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি প্রসঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলসের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি লক্ষণীয় :

"...each new class which puts itself in the place of one ruling before it, is compelled, merely in order to carry through its aim, to represent its interest as the common interest of the members of society, that is, expressed in ideal form.. Every

বিশদ আলোচনার মধ্যে প্রবেশ না করেও বলা যায়, এই প্রথম পথে ধনতান্ত্রিক বিকাশের অর্থ হল (১) সামন্ততান্ত্রিক শোষণব্যবস্থার মূল উৎপাটন, (২) বণিকী পুঁজির মালিক ও বৃহৎ ভূস্বামীদের মজুরী-শ্রম নিয়োগকারী পুঁজিপতিতে রূপান্তরিত হওয়ার পাশাপাশি নিচের থেকে প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের মধ্যে থেকে, উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি-যুক্ত স্তরগুলির ভিতর থেকে ধনতান্ত্রিক উৎপাদক বা

---

new class, therefore, achieves its hegemony only on a broader basis than that of the class ruling previously, whereas the opposition of the non-ruling class against the new ruling class later develops all the more sharply and profoundly." Marx and Engels, *The German Ideology*, Moscow, পৃঃ ৬১-২।

এই প্রসঙ্গে গ্রামশ্চির রচনা থেকে নিচের উদ্ধৃতিটিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

"What we can do, for the moment, is to fix two major superstructural 'levels': the one that can be called 'civil society', that is the ensemble of organisms commonly called 'private', and that of 'political society' or 'the State.' These two levels correspond on the one hand to the function of 'hegemony' which the dominant group exercises throughout society and on the other to that of 'direct domination' or command exercised through the State and 'juridical' government...These [functions] comprise :

"1. The 'spontaneous' consent given by the great masses of the population to the general direction imposed on social life by the dominant fundamental group; this consent is 'historically' caused by the prestige (and consequent confidence) which the dominant group enjoys because of its position and function in the world of production.

"2. The apparatus of state coercive power which 'legally' enforces discipline on those groups which do not 'consent' either actively or passively. This apparatus is, however, constituted for the whole of society in anticipation of moments of crisis of command and direction when spontaneous consent has failed." Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (ed.), *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*, New York, 1971, পৃঃ ১২ ; আরও দ্রষ্টব্য পৃঃ ৫৭-৮।

পুঁজিপতিদের আবির্ভাব,[৭] (৩) ব্যক্তিগত মুনাফামুখিনতা ও ব্যক্তি-মালিকানাধীন মূলধনের সঙ্গে উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নতি ও রূপান্তরের ধারার সংযোগ সাধন, (৪) উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির ফল হিসেবে শিল্পের নানা শাখাকে ব্যাপ্ত করে বলিষ্ঠ ও বেগবান শিল্পবিপ্লব, (৫) শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র আয়তন, উৎপাদনের ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক ছোট-মাঝারি পুঁজিপতিদের ব্যক্তিস্বত্ব-মূলক উদ্যম ও প্রতিযোগিতামূলক ধনতন্ত্র এবং (৬) রাষ্ট্রের নানা ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সত্ত্বেও অর্থনীতিতে মোটের উপরে সীমাবদ্ধ হস্তক্ষেপ।

ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে এই প্রথম পথে ধনতান্ত্রিক বিকাশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বুর্জোয়াশ্রেণীর এক প্রগতিশীল, বিপ্লবী ভূমিকা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের ইংল্যাণ্ডে ও তারও পরে ফ্রান্সে এক বিরাট অর্থনৈতিক রূপান্তর-প্রক্রিয়া শুরুর অনেক আগেই পুরনো সামন্ততান্ত্রিক সমাজের গর্ভে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের উদ্ভবের সময় থেকেই উদীয়মান বুর্জোয়াসি তার নানা সীমাবদ্ধতা ও নির্মমতা সত্ত্বেও পালন করেছিল সামাজিক উৎপাদনের অগ্রগণ্য তাৎপর্যের ভিত্তিতে রাজনীতি এবং সমাজ, সংস্কৃতি ও নৈতিকতা, চিন্তা ও জ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে অগ্রণী ও সৃজনশীল ভূমিকা। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে থেকেই এই নতুন শ্রেণী তার বহুবিধ কার্যকলাপে শুধু তার একান্ত নিজস্ব শ্রেণীগত বাসনা ও স্বার্থসমূহকে প্রতিফলিত করেছিল এমন নয়; এই শ্রেণী সেই যুগের ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে উৎপাদিকা শক্তি-সমূহের বিকাশ এবং রাজনীতি ও সমাজের প্রগতিশীল রূপান্তরের যে সম্ভাবনা নিহিত ছিল তাকেও বাস্তবায়িত করে তোলার জন্য আগ্রহ ও সামর্থ্যের জোরে পুরনো শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সমগ্র সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনসমূহের প্রতিনিধিত্ব করেছিল, পুরনো সামন্ততান্ত্রিক সমাজের চরম অবক্ষয়ের পটভূমিতে এক নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্তের আদর্শকে তুলে ধরেছিল[৮]।

---

৭. Maurice Dobb, *Studies in the Development of Capitalism*, London, 1951, পৃঃ ১২৩-৭।

৮. এই প্রসঙ্গে মার্কস লিখেছিলেন, "The Revolution of 1648 and 1789 were not *English* and *French* revolutions; they were revolutions of a *European* pattern... The bourgeoisie was victorious in these revolutions, but the victory of the bourgeoisie was at that time the *victory of a new order of society*...'The Bourgeoisie and the Counter Revolution', *Selected Works*, Vol. 1, Moscow, পৃঃ ১৩৯।

পুরনো সামাজিক শক্তিগুলির প্রতিরোধের মুখে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন আনয়নের প্রয়াসে বুর্জোয়াসিকে নির্ভর করতে হয়েছিল সমাজের বিপুলসংখ্যক মানুষের সমর্থন ও সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর, তুলে ধরতে হয়েছিল কারিগর, কৃষক ও অন্যান্য নানাস্তরের স্বার্থানুগ নীতিসমূহকে। বুর্জোয়াসির এই ভূমিকার পরিচয় মেলে ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধ ও ফ্রান্সের বিপ্লব-প্রতিবিপ্লবে। এই ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে সক্ষমতার জোরেই ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্সের বুর্জোয়াসি সমর্থ হয়েছে সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি স্থাপনে, সমাজের অন্যান্য শ্রেণী-উপশ্রেণীগুলির উপর তার মতাদর্শগত ও নৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায়। আর বুর্জোয়াসির এই hegemonic role-এর সঙ্গেই ঐতিহাসিকভাবে যুক্ত বুর্জোয়া উদারনীতিবাদ ও রাজনৈতিক গণতন্ত্র।

তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত: এক, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ-বিকাশের ধারায় প্রতিক্রিয়াশীল নানা উপাদান আগাগোড়াই বর্তমান থেকেছে ও মাঝে মাঝে বেশ প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়েছে; এবং দুই, এই সব দেশেও পুঁজিবাদী গণতন্ত্র তার পরিপূর্ণতা পেয়েছে বুর্জোয়াশ্রেণী কর্তৃক সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অর্জনের পর, শিল্পবিপ্লবের পর, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনেকখানি বিকাশের পর।

এখানে আর-একটি বিষয় উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে 'ক্লাসিকাল' বুর্জোয়া গণতন্ত্রের দেশগুলিতেও ফ্যাসিবাদী ভাবধারা ও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। তবু যে এসব দেশে ফ্যাসিস্টরা শেষপর্যন্ত সরকারী ক্ষমতা দখল করতে সমর্থ হয় নি তার সম্ভবত চারটি কারণ রয়েছে। (১) এই দেশগুলির বিশাল সাম্রাজ্যের বিপুল সম্পদ ও বাজার অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবিলা করতে ব্রিটিশ, ফরাসী, ডাচ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াসিকে সাহায্য করেছে। (২) এই সব দেশের উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ঐতিহ্য তার নানা দুর্বলতা সত্ত্বেও ফ্যাসিবাদের প্রসারের পথে বাধা হিসেবে কাজ করেছে। (৩) ফ্রান্সে একটা সময়ে শ্রমিকশ্রেণী ও গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন অন্যান্য সমস্ত শক্তির সম্মিলনের বা 'পপুলার ফ্রন্ট'-এর রাজনীতি ফ্যাসিবাদের অগ্রগতি রোধ করতে সক্ষম হয়েছিল। (৪) ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা হল্যাণ্ডের বুর্জোয়াসির কাছে সমাজ-বিপ্লবের ভয় কোনো সময়েই প্রবল হয়ে ওঠে নি।

॥ তিন ॥

রাজনৈতিক গণতন্ত্রবর্জিত ধনতন্ত্র : ফ্যাসিবাদের আদি উৎস

উপরে যে সব দৃষ্টান্তের কথা বলা হল তার পাশে ইয়োরোপের অন্য বহু দেশে ও এশিয়ায় জাপানে বিকাশ ঘটল গণতন্ত্রবর্জিত ধনতন্ত্রের এবং তাও অনেক দেরিতে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (কোথাও কোথাও সত্তরের, এমন কি নব্বুই-এর দশকে)। এরই মধ্যে ধনতান্ত্রিক রূপান্তর ও অর্থনৈতিক উন্নতির মাত্রার বিচারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে সব থেকে বেশি এগিয়ে গিয়েছিল জার্মানি, জাপান তার থেকে কিছু কম, ইতালি ও জারতন্ত্রী রুশিয়া ছিল বেশ পিছনে, আর সব থেকে পিছনে পড়ে ছিল স্পেন কিংবা পর্তুগালের মতো দেশ। এসব দেশেরই ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য ছিল **মার্কস-নির্দিষ্ট দ্বিতীয় পথে ধনতন্ত্রের বিকাশ** এবং **সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তিহীন বুর্জোয়াশ্রেণীর আধিপত্য**।[৯]

এসব দেশেই পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার নানা অবশেষ—কোথাও কম, কোথাও বেশি—ধনতন্ত্রের গতিপথকে ব্যাহত করেছে। উপর থেকে বণিকী (mercentile) পুঁজি ও আর্থিক লগ্নীকারকদের এবং বৃহৎ ভূম্যধিকারীদের তরফ থেকে চাপিয়ে দেওয়া **ধনতন্ত্রের বিলম্বিত সূত্রপাত ও** বিকাশ ছিল এই দেশগুলির অভিজ্ঞতা।

এসব দেশে ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব ছিল রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় ভূমিকার বিস্তার। আর ধনতান্ত্রিক বিকাশের স্বল্পকালের মধ্যেই আবির্ভূত হল একচেটিয়া পুঁজি এবং এক-একটি দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে ধনতন্ত্রের প্রসারের সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতার ফলে দেখা দিল পররাজ্যগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতা।

ইতিহাসের মঞ্চে অনেক বিলম্বে আবির্ভূত বুর্জোয়াসির ভূমিকা ছিল দুর্বল, আড়ষ্ট, আত্মপ্রত্যয়হীন; সমাজব্যবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তর-সাধন-প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দানে, জনসাধারণের বিস্তীর্ণ অংশের সমর্থন অর্জনে বুর্জোয়াসি হল ব্যর্থ। এরকম পরিস্থিতিতে এসব দেশে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ধারা চিরকালই রয়ে গেল বিশীর্ণ; তার কোনোদিনই সবল, প্রাণবন্ত, ব্যাপকভিত্তিক বিকাশ ঘটল না। জার্মানি ও জাপানের মতো দেশে রাষ্ট্রশক্তি তো প্রথম থেকেই নিল স্বৈরতান্ত্রিক

৯. পাদটীকা ১৭ ও ২৬ দ্রষ্টব্য।

জবরদস্তিমূলক চরিত্র। এটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে এ-রকমের পটভূমিসম্বলিত কিছু দেশেই ফ্যাসিবাদ ক্ষমতাসীন হয়েছিল।

আমাদের উদ্দেশ্যের কথা মনে রেখে এখানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী জার্মানি ও ইতালিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের একটি রূপরেখা দেওয়া যেতে পারে।

(ক) **জার্মানি**[১০]

[১] ধনতান্ত্রিক রূপান্তর

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে প্রথমে ইংল্যাণ্ডে ও পরে ফ্রান্সে বিরাট পরিবর্তনগুলির পাশে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও জার্মানি ছিল রীতিমতো পশ্চাৎপদ, সেখানে রূপান্তরের পথে বাধা ছিল দুস্তর। ১৮৭১-এর আগে পর্যন্ত অনেকগুলি রাজ্যে বিভক্ত জার্মানিতে রাজনৈতিক ঐক্যের অভাব, এই রাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থার স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্র, সর্বত্র সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার শক্তিশালী পিছুটান, জার্মান ইতিহাসে বিশেষ স্থানের অধিকারী প্রাশিয়ায় বৃহৎ ভূম্যধিকারী য়ুঙ্কারদের (Junker) প্রবল প্রতাপ এবং শিল্প-বাণিজ্য-নির্ভর শ্রেণীর দেরিতে আবির্ভাব ও দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপ জার্মানির ধনতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পরিবর্তনকে সমানে ব্যাহত করছিল।

ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক বিকাশের পরিপন্থী এক শক্তিশালী উপাদান হিসেবে প্রাশিয়ায় সতেরো ও আঠারো শতকে গড়ে উঠেছিল সামন্ততান্ত্রিক ভূম্যধিকারী অভিজাততন্ত্র[১১] ও রাজতন্ত্রী আমলাতন্ত্রের এক সমন্বয়[১২]। উনিশ শতকে প্রাশিয়ার এই ভূস্বামী বা য়ুঙ্কারদের উদ্যোগেই ঘটল লেনিন-কথিত প্রুশীয় পন্থায় কৃষির ধনতান্ত্রিক রূপান্তর[১৩]।

---

১০. এই অংশটি লেখার ব্যাপারে প্রধানত নির্ভর করা হয়েছে Roy Pascal-এর *The Growth of Modern Germany* (London, 1946) বইটির উপর।

১১. প্রাশিয়ায় সামন্ততন্ত্র ও ভূম্যধিকারী অভিজাততন্ত্রের বিবর্তন প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ১৮৮২-তে মার্কসের কাছে এঙ্গেলসের লেখা দুটি চিঠিতে *"second serfdom"* সংক্রান্ত মন্তব্য—*Selected Correspondence*, Moscow, পৃঃ ৪২৮-৩০ এবং Barrington Moore Jr., *Social Origins of Dictatorship and Democracy*, Penguin Books, পৃঃ ৪৩৫-৬, ৪৬০-৩।

১২. ঐ, ৪৩৫-৬।

১৩. Lenin, 'The Agrarian Programme of Social Democracy in the Russian Revolution', *Collected Works*, Vol.13, পৃঃ ২৩৮-৪২।

এরই পাশে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত উনিশ শতকের তিরিশ ও চল্লিশের দশকে, পরবর্তী কয়েক দশকে এই প্রক্রিয়া লাভ করে দ্রুতগতি। কিন্তু এই 'শিল্পবিপ্লব'ও ঘটে প্রধানত ও মূলত উপর থেকে।

শুরুর থেকেই রেলপথ ও বাষ্পীয় জলযান ব্যবস্থার প্রসার কিংবা রূঢ়ে কয়লা ও সংশ্লিষ্ট শিল্পের বিকাশে অন্যতম প্রধান উদ্যোগ ছিল বড় বড় ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্ক-মালিকদের। বস্তুতপক্ষে জার্মানির শিল্পোন্নয়নের ইতিহাসে ব্যাঙ্কের আধিপত্য ছিল আগাগোড়া[১৪]। গত শতাব্দীর শেষ দিকে জার্মান ব্যাঙ্কগুলির দ্রুত একত্রীকরণ এবং ব্যাঙ্ক-পুঁজির সঙ্গে শিল্প-পুঁজির সংযুক্তির ভিত্তিতে finance capital-এর উদ্ভব এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়।

জার্মান অর্থনীতির ধনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধনে রাষ্ট্রের ভূমিকা কিন্তু ছিল নিয়ামকের। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক সংহতি সাধনের 'ক্লাসিক' নিদর্শন ১৮৩৪-এ প্রুশিয়ার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত Zollverein বা Customs Union[১৫]। এই সঙ্গে সাইলেসিয়ায় কয়লাখনি ও লোহা কারখানায় প্রুশীয় সরকারের বিনিয়োগ, কৃৎকৌশলগত জ্ঞানের প্রসারে বিভিন্ন জার্মান রাষ্ট্রের উদ্যোগ, রেলপথ নির্মাণ ও পরিচালনায় সরকারী অংশগ্রহণ, শুল্কের দেওয়াল তুলে জার্মান শিল্প ও কৃষির সংরক্ষণ কিংবা বৈদেশিক নীতির অঙ্গ হিসেবে জার্মানির বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষা ইত্যাদি[১৬ক] সবই ছিল অর্থনীতিতে এমন ধরনের হস্তক্ষেপ যার সঙ্গে তুলনীয় নমুনা ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্সের ইতিহাসে মেলে না। প্রসঙ্গত বলে রাখা উচিত, জার্মান রাষ্ট্রশক্তি এসব কাজই করছিল যুঙ্কার ও শিল্পপতিদের মিলিত স্বার্থে।

এই ভাবে যুঙ্কারদের উদ্যোগে, ব্যাঙ্ক-পুঁজির সহযোগে ও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে জার্মান অর্থনীতির দ্রুত ধনতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটল। শিল্পসংস্থাগুলি প্রথম থেকেই হল বৃহদায়তনের, অল্পকালের মধ্যেই উদ্ভব হল একচেটিয়া পুঁজির (এবং জার্মান শিল্প-কাঠামোর বিশিষ্টরূপ ট্রাস্ট ও কার্টেলের) এবং ঐ পুঁজির স্বার্থে গত শতাব্দীর আশির দশকেই দেখা দিল সাম্রাজ্যবাদ[১৬খ]।

[২] 'উপর থেকে বিপ্লব'।

১৪. Pascal, পৃঃ ২৯ ; এবং Alexander Gerschenkron, *Economic Backwardness in Historical Perspective*, Praeger, London, 1965, পৃঃ ১৪-৫।

১৫. C. M. Cipolla (ed.), *The Fontana Economic History of Europe : The Industrial Revolution*, London, 1973, পৃঃ ৩৩৫-৬।

১৬ক. ঐ, পৃঃ ৩২৪-৬, ৩২৯-৩০।

১৬খ. Pascal, পৃঃ ৫৯,৬৫-৭।

অর্থনীতিতে যখন এই সব পরিবর্তন ঘটে চলছিল তখন রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে কি ঘটছিল ? গত শতাব্দীর প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগেই জার্মানিতে যে বুর্জোয়াসি ও সর্বহারার বিশেষ বিকাশ ঘটেছিল তার দিকে মার্কস 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত জার্মানিতে রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচারের কাঠামো ও সামন্ততান্ত্রিক অবক্ষয়ের মধ্যে জার্মান বুর্জোয়াসির ভূমিকা ছিল দুর্বল, দ্বিধাগ্রস্ত, আড়ষ্ট। ১৮৪৮-এর জার্মানিতে ব্যর্থ বিপ্লবের ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে জার্মানির বুর্জোয়াশ্রেণীর গুরুতর পার্থক্য নির্দেশ করে মার্কস লিখলেন, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের বিপ্লবে বুর্জোয়াসির বিজয় ছিল একটি নতুন সমাজব্যবস্থার বিজয়, ঐ দুই দেশে বুর্জোয়াসি প্রতিনিধিত্ব করছিল সমগ্র সমাজের। কিন্তু জার্মান বুর্জোয়াসি ও মধ্যশ্রেণী দেখল একদিকে রয়েছে অবক্ষয়গ্রস্ত সামন্ততন্ত্রের প্রতাপ ও রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচার, আর অন্যদিকে উদীয়মান সর্বহারাশ্রেণীর চ্যালেঞ্জ। এই অবস্থায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাওয়ার সাহস তারা পেল না, জনসাধারণের বিস্তীর্ণ অংশের উপর নির্ভর করে একটি নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা তারা দেখাতে পারল না।[১৭]

---

১৭. জার্মান বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকার বিষয়ে মার্কসের মন্তব্য : "The German bourgeoisie had developed so slothfully, cravenly and slowly that at the moment when it menacingly faced feudalism and absolutism it saw itself menacingly faced by the proletariat and all factions of the burghers whose interests and ideas were akin to those of the proletariat. And it saw inimically arrayed not only a class *behind* it but all of Europe *before* it. The Prussian bourgeoisie was not, as the French of 1789 had been, the class which represented the *whole* of modern society *vis-a-vis* the representatives of the old society, the monarchy and the nobility. It had sunk to the level of a sort of *social* estate, as distinctly opposed to the crown as to the people, eager to be in the opposition to both, irresolute against each of its opponents .. ; inclined from the very beginning to betray the people and compromise with the crowned representative of the old society because it itself already belonged to the old society ; representing not the interests of a new society against an old but renewed interests within a superannuated society...". সূত্র ৮, পৃঃ ১৪০।

সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তিহীন জার্মান বুর্জোয়াসি মিতালি করল রাজতন্ত্রী আমলাতন্ত্র ও প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী য়ুঙ্কারদের সঙ্গে, শাসন ক্ষমতায় শেষোক্তদের শরিকানা স্বীকৃতির বিনিময়ে বুর্জোয়াশ্রেণী পেল মুনাফা লোটার অধিকার। বস্তুতপক্ষে উৎপাদন ও অর্থনীতিতে তাদের গুরুত্বের তুলনায় য়ুঙ্কাররা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ক্ষেত্রে পেয়ে গেল অনেক বেশি ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রশক্তির অন্যতম প্রধান অঙ্গ সমরযন্ত্রের উপর স্থাপন করল তাদের প্রায় সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ১৮। এই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে সমর-বিভাগের ছিল বেসামরিক কর্তৃপক্ষের (civil authority) নিয়ন্ত্রণ-নিরপেক্ষ ও শাসনব্যবস্থার উপর খুবই শক্তিশালী প্রভাবসম্পন্ন বিশেষ স্থান।

রাষ্ট্রক্ষমতায় আমলাতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র ও বৃহৎ ভূস্বামীদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান হয়ে দাঁড়াল গণতান্ত্রিক বিকাশের গুরুতর প্রতিবন্ধক। এদিকে বিলম্বিত রাজনৈতিক সংহতিসাধন জন্ম দিল সেই উগ্র জার্মান জাত্যভিমানের যা পরবর্তীকালে এক উৎকট মানবতা-বিদ্বেষের রূপ পরিগ্রহ করল। উপরন্তু, অনেক জার্মান দার্শনিক ও লেখকদের (যেমন, নীটশে ও ত্রাইৎস্কে) প্রচারিত তত্ত্বে এমন বহু উপাদান ছিল যা জার্মান সংস্কৃতি বা kultur-এর শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাকে পুষ্ট করেছে এবং এক বিকৃত জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে১৯।

সংক্ষেপে, দীর্ঘদিন ধরে—উনিশ শতকের গোড়ায় স্টাইন-হার্ডেনবার্গের সংস্কার-প্রয়াসের সময় থেকে শুরু করে বিসমার্কের 'রক্ত ও অস্ত্র'-র শাসনকাল ধরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত—জার্মানিতে চলেছিল একটি রক্ষণশীল ও প্রভুত্বপরায়ণ (authoritarian) শাসন।

এই প্রভুত্বপরায়ণ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কোনো গণতান্ত্রিক দিক ছিল না এমন নয়। ১৮৭১ সালে একটি ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্র, দ্বিতীয় রাইখ বা জার্মান সাম্রাজ্য, স্থাপনের সময়ে প্রবর্তিত সংবিধানে ব্যবস্থা রাখা হল ২৫ বছর বয়সের বেশি সকল পুরুষের দ্বারা নির্বাচিত সংসদের দ্বিতীয় কক্ষ বা রাইখস্টাগের। বস্তুতপক্ষে ঐ সময়ে ইয়োরোপের অন্য কোনো দেশেই এত ব্যাপকভিত্তিক ভোটাধিকার ছিল না।

কিন্তু জার্মানির দুর্ভাগ্য বলতে হবে যে তার রাষ্ট্রীয় সংহতি, জার্মান রাষ্ট্র

১৮. Barrington Moore Jr., পৃঃ ৪৩৭ ; এবং Hoare and Smith (ed.), পৃঃ ৮৩।

১৯. Pascal, পৃঃ ৪৯-৭০, ৭২-৩।

এবং সংসদীয় গণতন্ত্র সৃষ্ট হল বা সীমাবদ্ধ অর্থে হলেও এই "রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হল উপর থেকে," একজন প্রুশীয় য়ুঙ্কার বিসমার্কের উদ্যোগে।

এই সব নয়। যে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু করা হল (এবং যা বহাল ছিল বিশ্বযুদ্ধের শেষে হ্বাইমার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত) তার ক্ষমতা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। জার্মান সম্রাট বা কাইজারের মনোনীত চ্যান্সেলর ও আবার চ্যান্সেলারের দ্বারা নিযুক্ত মন্ত্রীদের অর্থাৎ শাসনবিভাগের উপর সংসদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সুতরাং যে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হল তাকে বড় জোর বলা যায় এক আধা-সংসদীয় গণতন্ত্র[২০]। আর এই শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্রবিরোধী জুলুমের দিকের কোনো অভাব ছিল না।

য়ুঙ্কার, শিল্পপতি ও ব্যাঙ্কের মালিকদের যুক্ত-স্বার্থে বিসমার্ক কর্তৃক অনুসৃত নীতির আর-একটি দিকের উল্লেখ করা দরকার। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রগতিতে ভীত হয়ে ১৮৭৮-এ জারি করা সমাজতন্ত্রবিরোধী কানুনের জোরে সমাজতন্ত্রী পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা হয়, সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সভা-সমাবেশ বে-আইনী ঘোষিত হয় ও এই পার্টির শত শত সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। আবার একই সময়ে প্রবর্তন করা হয় শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য নানা ব্যবস্থা, বিশেষত প্রায় একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক বীমা-ব্যবস্থার। বস্তুতপক্ষে যুগপৎ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও সংস্থাগুলির দমন-পীড়নে এবং গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের বিবেককে শান্ত রাখা ও শ্রমিক-বিক্ষোভ অন্তত কতকটা প্রশমনের উদ্দেশ্যে কিছু কিছু শ্রমিক-কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে অসাধারণ পারদর্শিতা দেখান বিসমার্ক।[২১]

যাই হোক, ১৮৭১-এর পর থেকে এক আধা-গণতান্ত্রিক, মূলত প্রভুত্বপরায়ণ রাষ্ট্রের[২২] কাঠামোতে জার্মান ধনতন্ত্রের গতি হয়ে ওঠে বিশেষভাবে ত্বরান্বিত

---

২০. এর সঙ্গে বর্তমানে লাতিন আমেরিকার কোনো কোনো দেশের সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

২১. অনুরূপ নীতির অনুসরণ এখনও কি কোনো কোনো দেশে নজরে পড়ে না?

২২. মার্কসের ভাষায় বিসমার্ক-সৃষ্ট রাইখ ছিল—"a military despotism, bedecked with parliamentary trimmings, with an admixture of feudalism, influenced by the bourgeoisie, bureaucratically constructed and protected by the police". Golo Mann-এর *The History of Germany since 1789*, Penguin Books (1974), পৃঃ ৩৪৩ ৪-এ উদ্ধৃত।

এবং শতাব্দী পার হওয়ার আগেই জার্মান সাম্রাজ্যবাদ আত্মপ্রকাশ করে পুরনো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির (ব্রিটেন, ফ্রান্স বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের) প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে এই ক্রমবর্ধমান প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণামে যে বিশ্বযুদ্ধের বিস্ফোরণ ঘটল তার শেষে জার্মানির রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটল তার পরিচয় আমরা কিছু পরে নেবো।

(খ) **ইতালি**

জার্মানিতে ধনতান্ত্রিক পরিবর্তনের সঙ্গে ইতালিতে এই পরিবর্তনের মিল অনেক, আবার অমিলও নেহাৎ কম নয়। ইতালির শিল্পায়নের সূত্রপাত জার্মানির থেকেও অনেক দেরিতে—ইতালির স্বাধীনতা, ঐক্য ও জাতীয় পুনরুজ্জীবনের জন্য বহু বছরব্যাপী আন্দোলন বা Risorgimento-র ফল হিসেবে গত শতাব্দীর ষাটের দশকে রাষ্ট্রীয় সংহতি অর্জনের বেশ কিছু পরে ১৮৮০ সাল নাগাদ।

অর্থনৈতিক রূপান্তর আনয়নে রাষ্ট্রের স্থান ছিল গোড়ার থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। ইতালিতে রাষ্ট্র অবশ্য কোনো সময়েই জার্মানির মতো শক্তিশালী ও জবরদস্ত হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু বিলম্বে আবির্ভাবের পর দ্রুত বেড়ে ওঠা জার্মান বুর্জোয়াসিকে উপর থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতায় বসানোর কাজটি করেছিলেন বিসমার্ক; আর কাভুর ও ক্রিসপি অনুসরণ করেছিলেন, গ্রামশির ভাষায়, "the policy of manufacturing manufacturer", তাঁদের আমলে ইতালির সরকার সৃষ্টি করেছিল ধনতান্ত্রিক বিকাশের উপযোগী নানা ব্যবস্থা ও পরিবেশ[২৩]।

আশির দশকে শিল্পোন্নয়নের সূচনাকাল থেকেই এর বৈশিষ্ট্য ছিল ব্যাঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, বিদেশী মূলধনের সহযোগ ও প্রতিপত্তি, নানাবিধ প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের উপর নির্ভরশীলতা,[২৪] এবং অতি সত্বর, বলা যেতে পারে এঁচড়ে পাকা বা precocious প্রকৃতির, পুঁজির একত্রীকরণ ও মনোপলির উদ্ভব।

উপরন্তু, এই শিল্পোন্নয়ন সীমাবদ্ধ ছিল কেবলমাত্র উত্তরে। মধ্য ও দক্ষিণ ইতালি ও দ্বীপগুলির অর্থনীতি ছিল খুবই অনুন্নত, একান্তই কৃষিনির্ভর; আর

---

২৩. Hoare and Smith (ed.). পৃঃ ৬৭।

২৪. S. B. Clough, *The Economic History of Modern Italy*, London. 1974, পৃঃ ৯-১০, ১২৪, ১৩১; এবং Cipolla, পৃঃ ৩৪১-৩।

এই কৃষি-অর্থনীতিতে প্রকৃত ভূমিসংস্কারের অভাবে সামন্ততন্ত্রের অবশেষ, বৃহৎ ভূস্বামীদের প্রবল প্রতিপত্তি, গরীব কৃষক, ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরদের তীব্র শোষণ এবং ব্যাপক বেকারি খুবই প্রকট। গ্রামশ্চি যে সমস্যাটিকে 'The Southern Question' বলে অভিহিত করেছেন সেটি এই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বলিত অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফল। এই অসম (uneven) অর্থনৈতিক বিকাশ, শিল্পের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা, তুলনামূলক অর্থে অগ্রসর শিল্প ও পশ্চাৎপদ কৃষির মধ্যে বিভেদ; উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের বিচ্ছেদ—এসব কিছুই ইতালির রাজনীতি ও সমাজের গতিপ্রকৃতিকে, তার ভবিষ্যৎকে, গুরুতর-ভাবে প্রভাবিত করেছে।

গ্রামশ্চি জোর দিয়েই বলেছেন, ইতালির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের পিছনে (আশির দশকেই ইরিত্রিয়া ও সোমালিয়া অধিকার দিয়ে এর শুরু) অপরিণত ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক প্রয়োজন কিংবা মূলধন রপ্তানির প্রয়োজন কাজ করছিল না। এ ব্যাপারে আসল তাগিদ ছিল অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমস্যাবলীর থেকে উদ্ভূত; দক্ষিণের গরীব কৃষকদের আফ্রিকায় জমি দিয়ে বসানো ছিল ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য[২৫]।

ইতালির ধনতান্ত্রিক বিকাশের এই সব দুর্বলতা ও সমস্যার মূল অবশ্য নিহিত ছিল তার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও Risorgimento-র মধ্যে। ইতালির বুর্জোয়াসি ছিল খুবই দুর্বল, জার্মান বুর্জোয়াসির থেকেও দুর্বল। ইতালিতে জাতীয় ঐক্য অর্জনের প্রয়াস ও বুর্জোয়া-বিপ্লব প্রসঙ্গে এঙ্গেলস ১৮৯৪-তে লিখেছিলেন, বুর্জোয়াসির তার বিজয়কে সম্পূর্ণতা দেওয়ার সামর্থ্য বা ইচ্ছা কোনোটাই ছিল না[২৬]। গ্রামশ্চির ভাষায় এটি ছিল 'passive

২৫. Hoare and Smith (ed.), পৃঃ ৬৮।

২৬. ১৮৯৪-এর ২৬ জানুয়ারি তুরাতিকে এক চিঠিতে এঙ্গেলস লিখেছিলেন, "Come to power during and after the national emancipation, the bourgeoisie has neither been able nor willing to complete its victory. It has not destroyed the remnants of feudalism nor has it reorganized national production on the modern bourgeois pattern. Incapable of providing the country a share in the relative and temporary advantages of the capitalist regime it has cast upon it all the burdens, all the inconveniences of that system ..

"...It is a case where one may well say with Marx :

revolution'২৭ অর্থাৎ এমন এক 'বিপ্লব' যেখানে সমাজের বিস্তীর্ণ অংশের, বিশেষত শোষণ ও পীড়নে জর্জরিত কৃষক সাধারণের, সক্রিয় অংশগ্রহণ ঘটে ওঠে নি। এর পরিবর্তে গড়ে ওঠে উত্তরের নবজাত উগ্রমহীন বুর্জোয়াসি ও দক্ষিণের অনেকাংশে সামন্ততান্ত্রিক বৃহৎ ভূস্বামীদের জোট। এই জোটের মধ্যে বুর্জোয়াশ্রেণী তার প্রাধান্য স্থাপনের দাম হিসেবে বৃহৎ ভূস্বামীদের দিয়েছিল ভূমিসংস্কার থেকে বিরত থাকার ও গণতৎপরতাকে দমন করার প্রতিশ্রুতি। ভঙ্গুর জাতীয় ঐক্য রক্ষার উপায় হিসেবে রাষ্ট্র একটি কেন্দ্রীভূত ও আমলাতান্ত্রিক চেহারা পেল। সংসদীয় গণতন্ত্র চালু করা হল, কিন্তু তা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ প্রকৃতির। তবে নানা কারণেই রাষ্ট্র এখানে জার্মানির মতো প্রভুত্বপরায়ণ, জবরদস্ত চরিত্র পেল না। কিন্তু সব মিলিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী ইতালিতে নানা বিরোধ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল।

(গ) জারতন্ত্রী রাশিয়া

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনধারার ক্ষেত্রে জারতন্ত্রী রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানি বা ইতালির বেশ কিছু গুরুতর পার্থক্যের পাশাপাশি মূলগত সাদৃশ্যও ছিল অনেক বিষয়ে। ১৮৬১-র তথাকথিত কৃষক-মুক্তির পরেও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যাপক ও শক্তিশালী অবশেষের অস্তিত্ব, গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বাণিজ্যিক পুঁজির উদ্যোগে উপর থেকে ধনতন্ত্রের সূচনা এবং শতাব্দীর শেষ দিকে রাষ্ট্রকে ক্রাচ হিসেবে ব্যবহার করে এই ধনতন্ত্রের দ্রুত বিকাশ২৮, শিল্পের কতকগুলি

'We, like all the rest of Continental Western Europe, suffer not only from the development of capitalist production, but also from the incompleteness of that development. Alongside of modern evils, a whole series of inherited evils oppress us, arising from the passive survival of antiquated modes of production, with their inevitable train of social and political anachronisms. We suffer not only from the living, but from the dead." Marx and Engels, *Selected Correspondence*, Moscow, পৃঃ ৫৫১-২।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলতে লোভ হয়, এই চিঠিতে এঙ্গেলস যা লিখেছিলেন তা আজকের ভারতের ক্ষেত্রে প্রায় হুবহু প্রযোজ্য।

২৭. Hoare and Smith (ed.), পৃঃ ১০৫-২০।

২৮. Gerschenkron, পৃঃ ১৬-৭।

শাখায় বিদেশী পুঁজির আধিপত্য, অতি অল্পকালের মধ্যেই একচেটিয়া পুঁজির উদ্ভব এবং ধনতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণ—এসব কিছুই ছিল 'দ্বিতীয় পথ'-এ ধনতান্ত্রিক পরিবর্তনের পরিচায়ক। রুশ বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকা ছিল দুর্বল, দ্বিধাগ্রস্ত; সামন্ততন্ত্র ও জারতন্ত্রী স্বৈরাচারের সঙ্গে আপোষ করেই তারা চলার চেষ্টা করেছে; গণতন্ত্র প্রবর্তনের জন্য প্রয়াসী হওয়ার মতো আত্মপ্রত্যয় তাদের ছিল না। বরং বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় যখন দেখা গেল ধনতন্ত্রের গতিবেগ মন্থর হয়ে এসেছে তখন প্রথম রুশ বিপ্লবের পর স্টলিপিনের আমলে চেষ্টা করা হল রাষ্ট্রীয় জবরদস্তিকে ব্যবহার করে ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে সব বাধা অপসারণের। অতি সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রায় সব ক্ষমতাবর্জিত 'ডুমা' নির্বাচনের ব্যবস্থা করে জার-শাসনকে একটা গণতান্ত্রিক চেহারা দেওয়ার ভড়ং অবশ্য করা হল, কিন্তু এতে জারতন্ত্রের অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী চরিত্রের কোনো পরিবর্তন ঘটল না। বস্তুতপক্ষে উনিশ শতকে শিল্প ও ধনতন্ত্রের যে বিকাশ হয়েছিল তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে দেখা দিল ক্রমবর্ধমান সামাজিক উত্তেজনা ও শ্রমিক বিক্ষোভ এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রসার। আর এসবের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার থেকেই স্বৈরতন্ত্রের পক্ষ থেকে নির্মম জুলুম চালানো, ধর্মঘট ভাঙা ও গুপ্ত রাজনৈতিক খুনের জন্য ভাড়াটে প্ররোচক বা agent provocatuers এবং ইহুদি ও সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে হত্যালীলা (pogrom) সংঘটিত করার জন্য 'ব্ল্যাক-হাণ্ড্রেড'-দের নিয়োগ করা স্বাভাবিক রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল[২৯]।

ইয়োরোপে অন্য অনেক দেশের, যেমন স্পেন বা পর্তুগালের, ইতিহাসেও উপরে উল্লিখিত মূল বৈশিষ্ট্যগুলির কয়েকটি দেখতে পাওয়া যাবে। তবে নানা কারণেই অর্থনীতি ও সমাজের রূপান্তর বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি।

ইয়োরোপের বাইরে তাকালে দেখা যায় একটি মাত্র দেশেই, এশিয়ায় জাপানে, ধনতন্ত্রের লক্ষণীয় বিকাশ ঘটেছিল। এখানেও এই পরিবর্তন ঘটেছে পুরাতন ব্যবস্থার সঙ্গে আপোষ করে, গ্রামীণ কায়েমী স্বার্থ ও শহরভিত্তিক বণিক ও শিল্পপতিদের মিতালির কাঠামোতে এবং রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায়। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও ছিল মূলত অগণতান্ত্রিক। তবে এই নিয়ে আর আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

---

২৯. Christopher Hill, *Lenin and the Russian Revolution*, Penguin Books, 1971, পৃঃ ২৩—৫, ৩১।

কয়েকটি সিদ্ধান্ত :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত কয়েকটি প্রধান ধনতান্ত্রিক দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের যে পরিচয়, নিঃসন্দেহেই অনেকাংশে ছক-বাঁধা ও অতি-সরলীকৃত পরিচয়, এখানে পাওয়া গেল তাতে জোর দিয়ে দুটি কথা বলা যায়।

(ক) ইংলাণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো কয়েকটি দেশ ভিন্ন অন্য যে সব দেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে সে সব দেশে ইতিহাসের ধারায় ধনতন্ত্রের সঙ্গে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের যোগাযোগ ঘটে ওঠে নি।

(খ) ফ্যাসিস্ট আন্দোলন দানা বেঁধেছে ও শক্তিলাভ করেছে এবং শেষ-পর্যন্ত ফ্যাসিস্টরা ক্ষমতায় আসতে পেরেছে উপরে উল্লিখিত পটভূমিসম্বলিত দেশগুলির কয়েকটিতে।

উপরে যা বলা হল তার মানে অবশ্য এই নয়, যে সব দেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে উপর থেকে মার্কস কথিত দ্বিতীয় পথে এবং অগণতান্ত্রিক ও প্রভুত্বপরায়ণ রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায়—সে সব দেশেই ফ্যাসিবাদের জয় ছিল অবশ্যম্ভাবী, অলঙ্ঘনীয় নিয়তি। তা যে ছিল না তার সব থেকে বড় প্রমাণ রাশিয়ার ইতিহাস। বিশ্বযুদ্ধ ক্ষয়িষ্ণু ও পচনশীল সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রের পর্বে জারতন্ত্রী রুশসমাজের সব কটি অন্তর্বিরোধকে—অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত বিরোধগুলিকে—তীব্রতর ও গভীরতর করে তুলল। সংকটের ব্যাপ্তি ও সমাজের স্তরে স্তরে শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রখরতা বৃদ্ধি রাশিয়াকে পরিণত করল সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার দুর্বলতম গ্রন্থিতে। শ্রেণী-সংগ্রামের এই নতুন পর্যায়ে, বিপ্লবী পর্যায়ে, লেনিনের প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী পরিচালনায় গড়ে ওঠা বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে রুশ শ্রমিকশ্রেণী তার বিপ্লবী আত্মসচেতনতার জোরে সমাজের বিস্তীর্ণ অংশ, বিশেষত কৃষক কারিগর ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ও ঐক্যের জোরে, পুরনো পচা সমাজকে ভেঙে নতুন সমাজ গড়ার আন্তরিক প্রেরণার জোরে তার ইতিহাস কর্তৃক ন্যস্ত ভূমিকা পালন করে দুনিয়াটাকে কাঁপিয়ে দিল। দ্বিতীয় পথে ধনতান্ত্রিক বিকাশ, উদারনৈতিক-গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের অভাব, রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচার, এমন কি ফ্যাসিবাদের আদি আভাস সম্বলিত 'ব্ল্যাক-হাণ্ড্রেড' আন্দোলনও রাশিয়ার বৈপ্লবিক রূপান্তরের পথে চূড়ান্ত বাধা হয়ে উঠতে পারে নি। বিপ্লবী শ্রেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ শ্রমিকশ্রেণী তার আপন পরাক্রম ও জনসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংলগ্নতার জোরে উন্মোচিত করল ইতিহাসের এক নতুন দিগন্ত।

॥ চার ॥

ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ও অভ্যুদয়

বিশ্বযুদ্ধের শেষে ইয়োরোপের অনেক দেশেই দেখা গেল এক চরম দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন ও এর এক বিশিষ্ট রূপ ফ্যাসিবাদের সূত্রপাত। ঘটনা পরম্পরায় কতকগুলি দেশে ফ্যাসিবাদ ক্ষমতাসীন হল। কেমন করে এবং কেন ফ্যাসিবাদ জয়লাভ করল তা বোঝার জন্য প্রধানত দুটি দেশের, ইতালি ও জার্মানির, ইতিহাসের কিছু পাতা উলটানো দরকার। (এই প্রবন্ধের সীমাবদ্ধ পরিসরে জাপানী ফ্যাসিবাদ নিয়ে কোনো আলোচনা এখানে করা হচ্ছে না।)

(ক) ইতালি

বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব ইতালিতে অর্থনৈতিক বিবর্তনের বিশিষ্ট প্রকৃতির—বিলম্বিত ধনতান্ত্রিক বিকাশের এঁচড়ে-পাকা জাতীয় (precocious) সাম্রাজ্যবাদী গতিবিধি—ফলে বহু জটিল সমস্যা যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল তা কিছু আগেই বলা হয়েছে। সামরিক চাহিদা সৃষ্টি ও সাম্রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে এসব সমস্যার কিছু সুরাহা করা যাবে, এমন একটা হিসেব কষে ইতালির বুর্জোয়া-শ্রেণী যুদ্ধে ভিড়ে পড়েছিল।

[১] যুদ্ধোত্তর সংকট ও বিপ্লবী আলোড়ন :

কিন্তু যুদ্ধে ইতালির অর্থনীতি ও সমাজ যতটা বিধ্বস্ত হয়েছিল বিজয়ীপক্ষের আর কোনো দেশেই তা হয় নি। হতাহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২২ লক্ষেরও বেশি। কর্মচ্যুত (demobilised) সৈনিকদের বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি ও লিরার মূল্য হ্রাস, বাজেটের বিপুল ঘাটতি, পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর উপর করের ভারী বোঝা, লেনদেনের ব্যালান্সে ঘাটতি, অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের (ইঞ্জিনিয়ারিং, রাসায়নিক, খনি ইত্যাদি) এবং গমের উৎপাদন হ্রাস—সব মিলিয়ে যুদ্ধের অব্যবহিত পরের বছরগুলিতে ইতালির অর্থনৈতিক সংকট চরম রূপ নিয়েছিল[৩০]।

---

৩০. ইতালির যুদ্ধোত্তর সংকটের জন্য দ্রষ্টব্য A. Rossi, *The Rise of Italian Fascism 1918-1922*, London, 1938, পৃঃ ৯-১০, ৫৮; ও Hoare and Smith (ed.), পৃঃ XXXV—XXXVI.

এই পটভূমিতে রুশ বিপ্লবে অনুপ্রাণিত হয়ে জনসাধারণের বিপুল অংশ রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

যুদ্ধের অবসান ঘটেছিল ১৯১৮-র নভেম্বরে—পরবর্তী দু-বছরে ইতালির শাসকশ্রেণী এবং শ্রমিকশ্রেণী ও সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন সকলের মনেই এই ধারণা সৃষ্ট হয়েছিল যে বিপ্লব আসন্ন। বস্তুতপক্ষে ইতালিতে সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে—শিল্প-শ্রমিক, কারিগর, গরীব কৃষক, কৃষি-শ্রমিক ও বেকার সৈনিকদের মধ্যে—বিপ্লবী আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল। মধ্যবিত্তদেরও স্পর্শ করল এই নতুন মেজাজ। উত্তর-ইতালিতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ধর্মঘট, কোথাও কোথাও সোভিয়েত ধরনের সংস্থার প্রতিষ্ঠা, শ্রমিকদের পক্ষ থেকে কারখানা দখল করে উৎপাদন চালু রাখা, দক্ষিণে গরীব কৃষক ও ক্ষেত-মজুর কর্তৃক ভূস্বামীদের জমি দখল ইত্যাদি সব মিলিয়ে শ্রেণীদ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ এক নতুন পর্যায় সূচিত হচ্ছিল। সরকার, শিল্পপতি ও বৃহৎ ভূস্বামীদের প্রায় শক্তিহীন বলে মনে হচ্ছিল, সৈন্যবাহিনীকেও নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা চলছিল না। একথা বলা বোধহয় ভুল হবে না, সামাজিক বিপ্লবের প্রায় সবগুলি 'ক্লাসিক' শর্তই বিদ্যমান ছিল।[৩১]

কিন্তু বিপ্লব ঘটল না। কেন? শাসকশ্রেণীগুলি পুরনো রীতিতে আর শাসন করতে পারছিল না, জনসাধারণও এই শাসন মেনে নিতে রাজী ছিল না। কিন্তু বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালিত করতে সমর্থ শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির তখনও জন্ম হয় নি। গ্রামশি ও তাঁর সহযোদ্ধা তোগলিয়াত্তির কর্মতৎপরতা সে সময়ে সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানত তুরিনের শ্রমিকদের মধ্যে। ইতালির সোস্যালিস্ট পার্টি তখন যদিও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের শাখা হিসেবে কাজ করছিল, তার না ছিল উপযুক্ত বিপ্লবী কর্মসূচী না ছিল দূরদর্শী নেতৃত্ব। পার্টির নেতৃত্বে ছিল সেররাতির (Serrati) মতো মধ্যপন্থীরা, প্রধান ট্রেড-ইউনিয়নগুলির কর্তৃত্বে ছিল সংস্কারপন্থীরা, আর জনমানসে অ্যানার্কিস্ট, সিণ্ডিক্যালিস্ট ইত্যাদি রকমারী পেটি-বুর্জোয়া প্রবণতার ছিল ব্যাপক প্রভাব।

[২] শ্রমিকশ্রেণীর পশ্চাদপসারণ ও সমাজজীবনে শূন্যতা

১৯১৯-এর অক্টোবরের শেষ দিকে সেররাতির কাছে লেখা এক চিঠিতে লেনিন এই আশা প্রকাশ করেছিলেন, "...they [the Socialist Party]

৩১. ঐ, XXXV ; R. P. Dutt, পৃঃ ১২৭-৩০।

will be...successful in winning the entire industrial and the *entire rural* proletariat plus the small peasants. "[৩২] কিন্তু লেনিনের এই প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি। সোশ্যালিস্ট পার্টির মধ্যপন্থী নেতৃত্ব কর্তৃক সমগ্র শ্রমিক-শ্রেণীকে তার ঐতিহাসিক কর্তব্য সাধনের জন্য প্রস্তুত করা এবং শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের শোষিত মানুষের বিপ্লবী মৈত্রী গড়ে তোলার জন্য কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। এই নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে মধ্য ও দক্ষিণ ইতালির ক্ষুদ্র কৃষকদের সংগঠিত করল ক্যাথলিকপন্থী পপুলার পার্টি। আর শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্তদের তীব্র অসন্তোষকে সঠিক পথে চালিত করতে না পারার ফলে তারা হয়ে উঠল শ্রমিকদের সংগ্রামের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন। 'প্রচণ্ড সংঘর্ষ', 'বিরাট প্রস্তুতি' ইত্যাদির কথা অবশ্য সোশ্যালিস্ট নেতৃত্বের পক্ষ থেকে অহরহই বলা হত—কিন্তু এগুলি ছিল শুধু ফাঁকা কথা। সোশ্যালিস্ট পার্টির বিচারে রাষ্ট্র ছিল 'বুর্জোয়াসির কার্যনির্বাহক কমিটি', অথচ পার্লামেন্টের সোশ্যালিস্ট ডেপুটিদের একটা প্রধান কাজ ছিল সামান্য কিছু সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রিদপ্তরে দরবার করা। বাস্তবিকপক্ষে সোশ্যালিস্ট পার্টি হয়ে পড়েছিল সংসদীয় রাজনীতি-সর্বস্ব, তার সমস্ত কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চৌহদ্দির মধ্যে। যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে বিপ্লবের যে সম্ভাবনা নিহিত ছিল তা যে বাস্তবায়িত হয়ে উঠল না তার পিছনে রয়েছে এই সব কিছু—এতে ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের কোনো ভূমিকা ছিল না[৩৩]।

১৯২১-এর জানুয়ারিতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা হল; কিন্তু তখন, একপক্ষে, বিপ্লবী আলোড়নে ভাটা দেখা দিয়েছে, আর অন্যপক্ষে, ফ্যাসিস্টদের শক্তি উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। তদুপরি কমিউনিস্ট পার্টির তদানীন্তন নেতা বোর্ডিগা কর্তৃক অনুসৃত নীতি—সোশ্যালিস্টদের সঙ্গে যুক্ত কর্মতৎপরতা ও সংগ্রামের জন্য লেনিন[৩৪] ও কমিনটার্নের পরামর্শ এবং সংকীর্ণতাবাদী ও অতি-বামপন্থী প্রবণতা—সদ্যপ্রতিষ্ঠিত পার্টির কার্যকলাপকে নানাভাবে ব্যাহত করছিল।

---

৩২. *Collceted Works*, Vol. 30, পৃঃ ৯১।

৩৩. এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য Hoare and Smith, পৃঃ XXXVI-XXXVII; A. Rossi, পৃঃ ১৫-৭, ১০০; ও R. P. Dutt, পৃঃ ১২৩-২৭।

৩৪. ১৯২২-এর গোড়ায় লেনিন লিখেছিলেন, "The purpose and sense of the tactics of the united front consist in drawing more

এখানে একথাও স্মরণে রাখা দরকার, ইতালির তৎকালীন সর্বাত্মক সংকট সমাধানের কোনো পন্থা নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া পার্টিগুলি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। বিভিন্ন সংসদীয় দল-উপদল-চক্রের নানা অদল-বদল করে কাজ-চালানো গোছের কোয়ালিশন সরকার গঠিত হল একের পর এক। এই সব বুর্জোয়া সরকার বিপ্লবী গণআন্দোলনের দমন-পীড়নে যে পিছপা ছিল এমন নয়। কিন্তু ইতালিতে বুর্জোয়া শাসনের গোড়ার থেকেই যে কতকগুলি গুরুতর দুর্বলতা ছিল তা আগেই বলা হয়েছে। আর অভূতপূর্ব সংকটের মুখে এদের অযোগ্যতা সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল।

এই ভাবে সমগ্র রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে দেখা দিয়েছিল সেই শূন্যতা যাকে গ্রামশি বলেছেন কর্তৃত্বের সংকট বা "crisis of authority"[৩৫]।

এই অবস্থায় বুর্জোয়াসি ও গ্রামাঞ্চলের কায়েমী স্বার্থগুলি চাইছিল, একদিকে, অর্থনৈতিক সংকট, আর অন্যদিকে, শ্রমিক-কৃষদের জঙ্গী আন্দোলনকে শক্তহাতে মোকাবিলা করতে সক্ষম শক্তিশালী হাতিয়ার। নানা সমস্যায় জর্জরিত, হতাশাগ্রস্ত, তিক্ত অথচ সুনির্দিষ্ট লক্ষহীন শহুরে মধ্যবিত্ত অর্থাৎ অফিস কর্মচারী, দোকানদার, কর্মচ্যুত বেকার সৈনিক ও অফিসার, ছাত্র-তরুণেরাও চাইছিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা নিয়ে আসতে সমর্থ শক্তির আবির্ভাব।

---

and more masses of the workers into the stuggle against capital, even if it means making repeated offers to the leaders of the II and II½ Internationals to wage this struggle together." Collected Works, Vol. 42, পৃঃ ৪১১। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২১-এর জুনে লেনিনের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত কমিনটার্নের তৃতীয় কংগ্রেসে ঘোষিত হয় যুক্তফ্রণ্টের নীতি।

৩৫. If the ruling class has lost its consensus, i.e. is no longer "leading" but only "dominant", exercising coercive force alone, this means precisely that the great masses have become detached from their traditional ideologies, and no longer believe what they used to believe previously, etc. The crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the new cannot be born; in this interregnum a great variety of morbid symptoms appear." Hoare and Smith (ed.), পৃঃ ২৭৫-৬; আরও দ্রষ্টব্য পৃঃ ২১০ ৮।

[৩] ফ্যাসিবাদের উত্থান

উপরোক্ত শূন্যতা পূরণ করল ফ্যাসিবাদ[৩৬]। ফ্যাসিবাদের আদি উৎস যে ইতালীয় ধনতন্ত্রের গতি-প্রকৃতিতেই নিহিত ছিল তা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের **আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত** ১৯১৯-এর মার্চে যখন প্রাক্তন সমাজতন্ত্রী—ভোল পাল্টিয়ে যুদ্ধবিরোধী থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের উগ্র সমর্থক—মুসোলিনি চরম জাতীয়তাবাদী, প্রজাতন্ত্রী ও বিপ্লবী বুলিভরা একটা পাঁচমিশেলী কর্মসূচীর ভিত্তিতে স্থাপন করল 'ফ্যাসি ডি কম্ব্যাটিমেণ্ট' (Fascio di Combattimento)। নানাস্থানে স্থাপন করা হতে থাকল ফ্যাসিস্ট পার্টির শাখা, বেকার সৈনিকদের নিয়ে সশস্ত্র দলীয় বাহিনী গড়ে তোলার কাজও শুরু করে দেওয়া হল। আর তখনকার বিপ্লবী মেজাজের সঙ্গে তাল রেখে আওড়ানো হতে থাকল ধনিক-বিরোধী গরম গরম বুলি[৩৭]। কিন্তু মোটের উপরে ১৯১৯ থেকে ১৯২০-র শরৎকাল পর্যন্ত, বিপ্লবী আন্দোলনের জোয়ারের সময়ে, ফ্যাসিবাদী আন্দোলন তেমন কোনো শক্তিবৃদ্ধি করতে পারে নি; বিশেষ গণসমর্থনও লাভ করে নি[৩৮]। ১৯১৯-এর নভেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ফ্যাসিস্ট পার্টি একটি আসনও পেল না; মিলানে ১,৮০,০০০ সমাজতন্ত্রী-ভোটের বিরুদ্ধে মুসোলিনি পেল মাত্র ৪,৭৯৫ ভোট।

কিন্তু অসাধারণ ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির পরিচয় দিয়ে গ্রামশ্চি ১৯২০-র মে মাসে মন্তব্য করেছিলেন, "The present phase of the class struggle in Italy is the one which precedes *either* the conquest of power by the revolutionary proletariat *or* a terrible reaction on the part of the property-owning class and the governing caste."[৩৯] গ্রামশ্চি-উল্লিখিত দ্বিতীয় বিকল্পটিই, অর্থাৎ প্রতিক্রিয়ার চরম সন্ত্রাসমূলক শাসন, শ্রেণী-সংগ্রামের ধারায় ইতালির উপর চেপে বসল। উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে শ্রমিক-শ্রেণী ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করার পর, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নৈরাশ্য ও ঔদাসীন্য দেখা দিতে শুরু করার পর থেকে ঘটতে থাকল ফ্যাসিস্টদের শক্তিবৃদ্ধি।

---

৩৬ সরাসরি ইতালীয় পরিস্থিতি সংক্রান্ত না হলেও এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য Hoare and Smith (ed.), পৃঃ ২১০-১৫।

৩৭. Rossi, পৃঃ ১৯, ২২-৪২।

৩৮. R. P. Dutt, পৃঃ ১৩২।

৩৯. G. Fiori কর্তৃক লিখিত *Antonio Gramsci; Life of a Revolutionary* (London, 1970) বইটির পৃঃ ১২৮-এ উদ্ধৃত।

১৯২০-র সেপ্টেম্বরে কারখানা দখলের লড়াইয়ে পরাজয়ের সময় থেকে শ্রমিকশ্রেণীর পশ্চাদ্‌প্সরণের শুরু ; আর ঐ বছরেরই নভেম্বরে বোলোগনা শহরে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হল প্রথম ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ, সোশ্যালিস্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতাসম্পন্ন নির্বাচিত পৌরসংস্থাকে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে ভেঙে দেওয়া হল।

অনেক সময় ভাবা হয় ফ্যাসিবাদ হল শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষের বিপ্লবী অভিযান বা আক্রমণের ফলে বিপন্ন বুর্জোয়াসি ও গ্রামীণ কায়েমী স্বার্থের আত্মরক্ষামূলক হাতিয়ার। কিন্তু **উপরোক্ত ঘটনা-পারম্পর্য**—ফ্যাসিস্ট পার্টির **জন্ম** আর **শক্তিবৃদ্ধির সূত্রপাত** –থেকে একথা সুস্পষ্ট যে ফ্যাসিবাদ **পশ্চাদ্‌পসরণরত বিপ্লবী-শক্তিগুলির বিরুদ্ধে, পরাজয়ের পর তাদের সকল ক্ষমতা চূর্ণ করে দেওয়ার জন্য,** বুর্জোয়াসি ও অন্যান্য বিত্তশালী শ্রেণী-উপশ্রেণীর হিংস্র প্রতিশোধাত্মক আক্রমণ[৪০]।

১৯২০-র নভেম্বর থেকে ১৯২১-এর অক্টোবর—এই দুই বছর ছিল ফাসিস্ট পার্টির উত্তরোত্তর শক্তিবৃদ্ধির পর্যায়। পার্টির প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই ফ্যাসিস্টরা বিত্তবানদের কিছু না কিছু সমর্থন পাচ্ছিল। তবে এই নতুন পার্টির কার্যকর ক্ষমতা কতখানি সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে না পারায় বুর্জোয়াসি ও গ্রামীণ কায়েমী স্বার্থ অন্যান্য বুর্জোয়া দল-উপদল ও রাজনীতিবিদদেরও সাহায্য করছিল। তাছাড়া শাসক শ্রেণী-উপশ্রেণীগুলির (বিশেষত একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে মাঝারি পুঁজি ও একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে ভূস্বামীদের) মধ্যেও তীব্র দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু ১৯২১-এর শেষাশেষি থেকেই একচেটিয়া পুঁজিপতিরা তাদের পুরো সমর্থন জানাতে থাকল ফ্যাসিবাদীদের প্রতি, মুসোলিনি পেতে থাকল এদের অকৃপণ আর্থিক সাহায্য[৪১]।

মুসোলিনি কিন্তু চটপট বুঝে নিয়েছিল যে, শুধু সম্পত্তির মালিকদের সমর্থন যথেষ্ট নয়, সাফল্য অর্জনের জন্য চাই ব্যাপক গণসমর্থন। তাই তার ছিল **দ্বৈত-নীতি**—গরীবদের প্রতি সহানুভূতি অথচ সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের বিরোধিতা, ধনিকতন্ত্রবিরোধী জনপ্রিয় বুলি কিন্তু উৎকট সমাজতন্ত্রবিরোধিতা, বিপ্লবী বাগাড়ম্বর অথচ স্থিতিশীলতার ওকালতি। এইভাবে ছলনামূলক বিচিত্র সব মতামত প্রচার করে ফ্যাসিবাদ নানা স্তরের মানুষকে আকৃষ্ট করল। অসন্তুষ্ট

৪০. R. P. Dutt, পৃঃ ১৩১ ; এবং Hoare and Smith(ed.), পৃঃ XXXVI।
৪১. Poulantzas, পৃঃ ১৩১-২।

শহুরে পেটি-বুর্জোয়াসি, বিশেষত তাদের বেকার, গরীব অংশ ও ছাত্র-তরুণেরা হয়ে দাঁড়াল ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের মেরুদণ্ড। অসংগঠিত, পশ্চাৎপদ শ্রমিক, লুম্পেন প্রলেতারিয়েত, গ্রামীণ জনসাধারণের একটা বড় অংশ—সবাই ভিড়ে পড়ল এই আন্দোলনে। প্রত্যেককেই মুসোলিনি বুঝিয়ে দিল তার ভালোর জন্যই ফ্যাসিবাদ[৪২]। এইভাবে ফ্যাসিস্ট পার্টি পেল একটি গণভিত্তি। পার্টির সদস্য সংখ্যা যেখানে ১৯২০-তে ছিল মাত্র কুড়ি হাজার, ১৯২১-এ তা লাফ দিয়ে বেড়ে হল প্রায় আড়াই লাখ। **এই ব্যাপক গণচরিত্র ছিল ফ্যাসিস্ট পার্টির এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা অন্য কোনো বুর্জোয়া পার্টির ছিল না।**

কিন্তু মুখে যাই বলা হোক না কেন ফ্যাসিবাদ ছিল মূলত সম্পত্তির মালিকদের, পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের হাতিয়ার। তারাই ফ্যাসিস্টদের টাকা যোগা চ্ছিল, তাদেরই স্বার্থে ফ্যাসিস্টরা শ্রমিকশ্রেণী, গরীব কৃষক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করল **সংগঠিত অত্যাচার ও সন্ত্রাস চালানোর বিশেষ পদ্ধতি**। কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্ট পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন, গরীব কৃষকদের গণসংগঠন, সমবায় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির দপ্তরে অগ্নিসংযোগ; শ্রমিকদের সংবাদপত্র ও ছাপাখানার ধ্বংসসাধন; সোশ্যালিস্টরা সংখ্যাগুরু এমন এমন স্বায়ত্তশাসিত পৌরসংস্থাগুলি জবরদস্তি করে ভেঙে দেওয়া কিংবা এই ধরনের সংস্থার সোশ্যালিস্ট সদস্যদের কাছ থেকে পদত্যাগপত্র আদায়; পরিচিত সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট নেতাদের বাসস্থানের উপর সশস্ত্র হামলা; জঙ্গী কৃষক ও শ্রমিকদের হত্যা—এসব নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। এই হামলা চালানোর জন্য সাধারণত রাষ্ট্রের নিয়মিত বা আইনসম্মত পীড়নমূলক বাহিনী-গুলিকে (যেমন, সৈন্য বা পুলিশ) সরাসরি ব্যবহার করা হত না; দিশেহারা অথচ অসন্তুষ্ট তরুণ, কর্মহারা সৈনিক কিংবা শ্রেণীচ্যুত (declassed) ব্যক্তিদের নিয়ে গড়ে তোলা বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত **বেসরকারী সশস্ত্র ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীকে এসব কাজে লাগানোটা ছিল ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসমূলক অভিযানের বৈশিষ্ট্য**। ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া সরকার, আইন-শৃংখলার তথাকথিত রক্ষকেরা, এ-ব্যাপারে বাধা তো দিলই না, বরং সচরাচর প্রশ্রয় দিতে থাকল[৪৩]।

৪২. Rossi, পৃঃ ৩২-৪।

৪৩. ফ্যাসিস্টদের সন্ত্রাসমূলক পদ্ধতির বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য Rossi, পৃঃ ১০৩-২৭।

কোথাও কোথাও সংঘবদ্ধ শ্রমিকেরা ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। কিন্তু এ রকম ক্ষেত্রে সরকারী নিরাপত্তাবাহিনী আক্রান্ত শ্রমিকদের বিরুদ্ধেই সক্রিয় হয়ে উঠত। উপরন্তু, ফ্যাসিস্টদের সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত হামলার মুখে শ্রমিকশ্রেণী রইল দ্বিধাবিভক্ত, সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকেরা রয়ে গেল সোশ্যালিস্ট পার্টির মধ্যপন্থী নেতৃত্বের প্রতি অনুগত, কমিউনিস্ট নেতৃত্বও সংকীর্ণতামুক্ত ছিল না। আর সোশ্যালিস্ট নেতাদের পরামর্শ ছিল সক্রিয় প্রতিরোধের পরিবর্তে আইনী পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়াটাই বিজ্ঞজনোচিত কাজ।

ফ্যাসিস্টদের শক্তি কিন্তু দিনে দিনে বেড়েই চলল। আর ১৯২২-এর অক্টোবরে তথাকথিত রোম অভিযানের পর রাজার আমন্ত্রণে পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও মুসোলিনি হয়ে বসল প্রধানমন্ত্রী—ফ্যাসিবাদ হল ক্ষমতাসীন।

ক্ষমতায় বসার পর কিছুকাল পর্যন্ত একটা গণতান্ত্রিক ঠাট বজায় রাখা হল, কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট ও অন্যান্য দলের আইনী অস্তিত্বও রাখা হল। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও পাশবিক উৎপীড়ন বেড়েই চলল এবং শুধু কমিউনিস্ট বা সোশ্যালিস্টরা নয়, এমন কি নরমপন্থী ও উদারনীতিবাদীরাও এর থেকে রেহাই পেল না। মুসোলিনির গরীবের প্রতি দরদভরা কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে যারা ফ্যাসিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিল তারা যখন ধনতন্ত্র-বিরোধী 'দ্বিতীয় বিপ্লব'-এর জন্য চাঞ্চল্য প্রকাশ করতে শুরু করল তখন তাদের দল থেকে বিতাড়িত করা হল। আর এই মেকি গণতন্ত্রও বেশিদিন বহাল রাখা হল না। ১৯২৬-এর মধ্যেই ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব তার পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে ইতালির বুকে চেপে বসল।

(খ) জার্মানি :

[১] বিপ্লব ও বিপ্লবের পরাভব৪৪

বিশ্বযুদ্ধের শেষে জার্মানিতেও শুরু হল এক বিপ্লবী পর্ব। কিন্তু এখানে ইতালির মতো শুধুমাত্র যে বিপ্লবী সংগ্রামের জোয়ার দেখা দিল তাই নয়, এখানে বিপ্লবও ঘটল। ১৯১৮-র নভেম্বরে শ্রমিক ও সৈনিকেরা পুরনো রাষ্ট্রব্যবস্থাকে,

---

৪৪. জার্মানির ইতিহাসে এই পর্যায়ের জন্য দ্রষ্টব্য Pascal, পৃঃ ৮৪-৯৫ ; A J. Nicholls, *Weimer and the Rise of Hitler*, London, 1968, পৃঃ ১০-২৬ ; এবং R. P. Dutt, পৃঃ ১৪৩-৮।

দ্বিতীয় রাইখকে, উল্টে দিয়ে ক্ষমতা দখল করল, নানাস্থানে সোভিয়েতের অনুরূপ শ্রমিক ও সৈনিকদের কাউন্সিল তৈরি করল।

কিন্তু এই জার্মান বিপ্লবের মারাত্মক দুর্বলতা ছিল (১) শ্রমিকশ্রেণীকে তার চৈতন্যে ও কর্মে উপযুক্ত নেতৃত্ব দিতে সমর্থ বিপ্লবী পার্টির অভাব (জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি বা KPD গঠিত হয় ১৯১৮-র ডিসেম্বরে) এবং (২) শ্রমিক ও সৈনিকদের সংখ্যাগুরু অংশের বিপ্লববিরোধী জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রতি আনুগত্য। গৌরবময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী এই পার্টির সে সময়ের নেতৃত্ব ছিল সর্বহারা কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে, জার্মানির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের বিরুদ্ধে।

এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা ঘোষণা করল একটি বুর্জোয়া সংসদীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। তারাই সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতি ও বৃহৎ ভূস্বামীদের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত কাটা হল না; রাজতন্ত্রী ও প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন সৈন্যবাহিনী, সিভিল সার্ভিস বা প্রশাসনিক আমলাতন্ত্র ও বিচারবিভাগের ক্ষমতা ও অবস্থানে সামান্যতম পরিবর্তনও করা হল না[৪৫]। (পরবর্তীকালে এসবই হয়ে দাঁড়াল প্রতিবিপ্লবের পক্ষে দৃঢ় প্রাচীর।) বরং উল্টে শ্রমিকদের কাউন্সিলগুলিকে ভেঙে দেওয়া হল, বিপ্লবী শ্রমিক ও সৈনিকদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হল, সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নোস্‌কের (Noske) গড়ে তোলা প্রতিবিপ্লবী স্বেচ্ছাসৈনিকবাহিনী ফ্রী-কোর (Freikorps) ১৯১৯-এর জানুয়ারিতে নৃশংসভাবে খুন করল রোজা লাক্সেমবার্গ ও কার্ল লিয়েব্‌নেখ্‌টকে।

বিপ্লব পরাভূত হল। কিন্তু এই পরাজয়ের কারণ ও সংঘর্ষের প্রকৃতি এমন ছিল যে বিপ্লবীশক্তি উৎসাদিত হয় নি, শ্রমিকশ্রেণী বিধ্বস্ত হয় নি, মেহনতী মানুষের আত্মরক্ষার পর্যায় তখনও শুরু হয় নি। পরবর্তীকালের কয়েক বছরের ঘটনাবলী লক্ষ্য করলেই একথা সুস্পষ্ট বোঝা যায়।

[২] হ্বাইমার প্রজাতন্ত্র: অনিশ্চয়তা ও সংকট ১৯১৯-১৯২৩

তবে যুদ্ধোত্তর জার্মানির এই সামাজিক আলোড়নের মধ্যে থেকে ১৯১৯-এর গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত হল হ্বাইমার (Weimer) প্রজাতন্ত্র, ধনতান্ত্রিক

৪৫. Nicholls, পৃঃ ৪২-৮; এই 'সব থেকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে' বিচারবিভাগের প্রজাতন্ত্রবিরোধী ভূমিকার জন্য দ্রষ্টব্য পৃঃ ৪৬-৮।

দেশগুলির মধ্যে 'সব থেকে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র'। নতুন সংবিধান বলে শ্রমিক-শ্রেণী ও জার্মান জনসাধারণ অর্জন করল তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার[৪৬]। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের প্রথম চার-পাঁচ বছরের (১৯১৯-১৯২৩) নিদারুণ অর্থনৈতিক সংকট (যুদ্ধের সময়ে অনুসৃত আর্থিক নীতির ফলস্বরূপ বিপুল সরকারী ঋণ, ঘাটতি বাজেট, যুদ্ধ-ক্ষতিপূরণের ভারী বোঝা, বল্গাহীন মুদ্রাস্ফীতি, মার্কের ক্রমাগত মূল্য হ্রাস, মুদ্রাব্যবস্থার সম্পূর্ণ ভাঙন, মধ্যবিত্তের চরম দুর্গতি, কর্মচ্যুত হাজার হাজার সৈনিকের বেকারি ইত্যাদি) এবং এই সংকট-সমাধানের পন্থা নির্দেশে হ্বাইমার কোয়ালিশনের (অর্থাৎ সরকারী ক্ষমতাসীন ও প্রজাতন্ত্রের সমর্থক সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক, ক্যাথলিক সেণ্টার ও ডেমোক্রাটিক পার্টি তিনটির জোট) চরম ব্যর্থতা সমাজজীবনকে বিপন্ন করে তুলল। এই সঙ্গে ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলীতে জার্মান জনসাধারণের আহত জাতীয় অভিমান এবং এই ব্যাপারটিকে পুঁজি করে প্রজাতন্ত্রবিরোধী উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির প্রচার সমস্যাকে গভীরতর করে তুলল।

শ্রমিকশ্রেণী ও বিপ্লবী শক্তিগুলির সঙ্গে প্রতিবিপ্লবীদের ক্রমাগত সংঘর্ষ এই সময়ের জার্মান ইতিহাসের অন্যতম মুখ্য বৈশিষ্ট্য। ১৯২০-র গোড়াতেই জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি গণপার্টিতে পরিণত হল, সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল সাড়ে তিন লাখ। সাধারণ ধর্মঘট, বিক্ষোভ প্রদর্শন, সভাসমাবেশ, প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে সশস্ত্র লড়াই হামেশাই ঘটতে থাকল; কে. পি. ডি-র নেতৃত্বে বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থানের চেষ্টাও বার কয়েক করা হয়; ১৯২০-র মার্চে কাপ-পন্থী প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহের (Kapp Putsch) সামনে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক রাষ্ট্রপতি এবার্ট রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে গেলে ও সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ দমন করতে অস্বীকৃতি জানালে শ্রমিকশ্রেণীর দৃঢ় সংগঠিত হস্তক্ষেপ ও ধর্মঘটের ফলে বিদ্রোহ পর্যুদস্ত হয়; আর ১৯২২-এর নভেম্বরে ব্যর্থ হয় মিউনিকে হিটলার কর্তৃক আয়োজিত putsch। মজার ব্যাপার হল যে, এই 'সব থেকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র'র সরকার ও সে সরকারের শরিক সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক এবং মধ্যপন্থী বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দ প্রজাতন্ত্র-বিরোধী প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহীদের প্রতি দেখাল অসাধারণ ভদ্রতা, অথচ এদের পক্ষ থেকে কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী শ্রমজীবী মানুষের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর দমন-পীড়নের অভাব ছিল না। ১৯২৩এর শেষাশেষি নাগাদ অবস্থাটা ছিল নিম্নরূপ: শ্রমিকশ্রেণীর জঙ্গী মেজাজ ও শক্তিশালী আন্দোলন সত্ত্বেও অনৈক্য, সংখ্যাগুরু অংশের সোশ্যাল

৪৬. Pascal, পৃঃ ২৬-৭।

ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রতি আস্থা ও সর্বোপরি ঐ পার্টির নেতৃত্বের শ্রেণী-সহযোগিতার নীতির ফলে ১৯১৯-১৯২৩-এর পরিস্থিতিতে নিহিত বিপ্লবী অগ্রগতির সম্ভাবনা বাস্তব হয়ে উঠতে পারল না; কিন্তু সময়টা ফ্যাসিবাদের জার্মান সংস্করণ নাৎসিবাদের অনুকূলও ছিল না।

[৩] হ্বাইমার প্রজাতন্ত্র : আপাত-স্থিতিশীলতা ১৯২৪-১৯২৮

বিশদ আলোচনার মধ্যে না গিয়ে বলা যায়, ১৯২৪ থেকে ১৯২৮—এই বছরগুলিতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে একটা আপেক্ষিক স্থিতিশীলতা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এই স্থিতিশীলতার আভাসের আড়ালে জমে উঠছিল অনেক অশুভ লক্ষণ৪৭। আপাতদৃষ্টিতে যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দেখা যাচ্ছিল তার ভিত ছিল খুবই নড়বড়ে। ডজ (Dawes) পরিকল্পনা অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থেকে ধার-করা টাকায় যুদ্ধ-ক্ষতিপূরণ শোধের ব্যবস্থা, বিদেশী পুঁজির উপর নির্ভর করে শিল্পের পুনরুন্নয়ন, বিদেশের কাছে ঋণের বিপুল বৃদ্ধি, বৃহৎ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে গিলে একচেটিয়া কারবার স্থাপন, অল্পসংখ্যক ব্যাঙ্ক ও ট্রাস্ট কর্তৃক তাদের সম্পত্তি ও ক্ষমতার দ্রুত বৃদ্ধি এবং অর্থনীতির প্রধান শাখাসমূহের উপর কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ, একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে মাঝারি পুঁজির কিংবা একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে বৃহৎ ভূস্বামীদের স্বার্থের সংঘাত—এসব কোনো কিছুই অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ ছিল না।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রধান প্রধান অঙ্গ—সৈন্যবাহিনী, আমলাতন্ত্র ও বিচারবিভাগের প্রজাতন্ত্রবিরোধী, প্রভুত্বমুখীন দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো মূলগত পরিবর্তন ঘটে নি, ইম্পিরিয়াল জার্মানির সঙ্গে এদের একাত্মবোধ ছিল অক্ষুণ্ণ। অথচ 'সব থেকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' নির্ভরশীল হয়ে রইল এই সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উপর। বাস্তবিকপক্ষে বিসমার্কের উদ্যোগে 'উপর থেকে বিপ্লব'-এর পরিণাম হিসেবে দ্বিতীয় রাইখের সংসদীয় দলগুলি কোনোদিনই সরকারী দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত হয়ে বিকাশ লাভ করতে পারে নি, আর এর জের প্রজাতান্ত্রিক বুর্জোয়া পার্টিগুলির অকর্মণ্যতাতে সুস্পষ্ট ছিল। এদিকে এই আপাত স্থিতিশীলতার পর্যায়ে শ্রমিকশ্রেণীর অন্যতম পার্টি সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের নেতৃবৃন্দ বুর্জোয়া দলগুলির সঙ্গে সহযোগিতার দিকে আরও ঝুঁকে পড়ল, আর শ্রমিকশ্রেণীরও একটা বড় অংশের মধ্যে অর্থনীতিবাদ, শুধুমাত্র মজুরী ও

---

৪৭. Nicholls, পৃঃ ১২৯-৩২।

আর্থিক দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনের প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠল[৪৮]। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি তার বিপ্লবী অবস্থানে অটল থাকলেও কেবলমাত্র তার নিজস্ব অনুগামীদের জোরে নতুন পরিবর্তন নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। পার্টির মধ্যে ভ্রান্ত রাজনৈতিক প্রবণতাও ছিল।

তবে জনসাধারণের মধ্যে সাধারণভাবে যে একটা নিশ্চিন্তির মনোভাব দেখা দিয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া গেল ১৯২৮-এর নির্বাচনে। সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের ভোট ও আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল খুবই লক্ষণীয়ভাবে, কমিউনিস্টদের শক্তিও আগের তুলনায় কিছু বাড়ল। দুটি প্রধান প্রজাতন্ত্রবিরোধী উগ্রদক্ষিণপন্থী পার্টির (ন্যাশনালিস্ট পার্টি ও হিটলারের ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট পার্টি) ভোট কমে গেল দারুণভাবে। আর প্রজাতন্ত্রের সমর্থক মধ্যপন্থী বুর্জোয়া পার্টি—ক্যাথলিক সেণ্টার ও ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রতি নির্বাচকদের সমর্থন মোটের উপর অক্ষুণ্ণ রইল। শেষোক্ত পার্টিগুলির সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে সোশ্যাল ডেমোক্রাট মুলারকে চ্যান্সেলর করে গঠিত হল কোয়ালিশন সরকার।

কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই, ১৯২৯-এর শেষে, জার্মানির রাজনৈতিক স্থায়িত্বের ভাঙন সূচিত হল। আর ১৯৩৩-এর জানুয়ারিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল নাৎসিরা।

[৫] নাৎসিবাদের সূত্রপাত ও প্রসার

১৯১৮-১৯-এর বিপ্লবের সময়ে ও তার অব্যবহিত পরে প্রতিবিপ্লবী প্রয়াসগুলির (যেমন, কাপ-পুটশ,) মধ্যে ছিল নাৎসিবাদের **পূর্বাভাস**। হিটলারের রাজনীতিতে হাতেখড়ি ১৯১৯-এর মিউনিকে ব্যাভেরিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল আর্মি হেড-কোয়ার্টারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং এখানেই ১৯১৯ থেকে ১৯২৪-এর মধ্যে সেই সংগঠনের **সূত্রপাত** ও **প্রসার** যাকে ভিত্তি করে নাৎসিবাদের অভ্যুদয়। ১৯১৯-এর শেষ দিকে মিউনিকের এক ছোট পার্টি, জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টিতে (পরবর্তীকালের ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি) যোগ দেওয়ার পর হিটলার শস্তা জনপ্রিয় বুলি কপচিয়ে আকৃষ্ট করে নানা কারণে বিক্ষুব্ধ শহুরে মধ্যবিত্ত ও এমন সব লোকদের সমাজে যাদের বিশেষ সুনাম ছিল না। ১৯২০ শেষ না হতেই হিটলার গড়ে তোলে এক আধা-

৪৮. Poulantzas, পৃঃ ১৭২-৩।

সামরিক বাহিনী, কুখ্যাত ঝটিকাবাহিনী বা Storm Troopers (SA)[৪৯]। আর এই গোড়ার পর্যায়েও হিটলার ও তার পার্টিকে টাকা যোগান দিত ব্যাভেরিয়ার বিত্তশালীরা, বড় বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা[৫০]।

তবে এই সময়ে নাৎসি পার্টির পরিচিতি ও প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানত ব্যাভেরিয়াতে। কিন্তু শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর অফিসার, যুঙ্কার ও আমলাতন্ত্রকে অবলম্বন করে কাপ-পুটশ্ এবং ১৯২৩-এর নভেম্বরে মিউনিকে হিটলার ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের সংকীর্ণ ভিত্তির উপর নির্ভর করে বিদ্রোহের ব্যর্থতা থেকে হিটলার সিদ্ধান্ত করল: সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিবর্তে ভিতর থেকে, হ্বাইমার সংবিধান এবং সংবিধান-প্রদত্ত সুযোগ ও অধিকারগুলিকে ব্যবহার করে, ক্ষমতা দখল করতে হবে। আর এর জন্য চাই একই সঙ্গে সামরিক কায়দায় পরিচালিত সন্ত্রাসমূলক সংগঠন এবং ব্যাপক গণ-সমর্থন ও গণ-উন্মাদনা[৫১]।

১৯২৪-১৯২৯-এর বছরগুলি যে নাৎসিবাদের বিকাশের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল না তা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু নাৎসিবাদের সুযোগ মিলতেও দেরি হল না।

যে সংকট যুদ্ধ-পরবর্তী দশ বছর ধরে জার্মান অর্থনীতিকে কুরে কুরে খাচ্ছিল তা ১৯২৯-১৯৩৩-এ এমনই তীব্রতা ও ব্যাপকতা নিয়ে দেখা দিল যে গোটা অর্থনীতি ধ্বসে পড়ার উপক্রম হল। ১৯২৮-এর শেষ দিক থেকেই জার্মানিতে বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছিল। ঐ সময়ে যখন আমেরিকা ও অন্যান্য প্রধান ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদেরা এক নতুন ধনতান্ত্রিক সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখছিলেন তখন ঐ বছরেরই গ্রীষ্মকালে অনুষ্ঠিত কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেস থেকে বলা হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট আসন্ন। ঐ বিশ্লেষণের যথার্থতা প্রমাণ করে ১৯২৯-এর অক্টোবরে নিউ ইয়র্কের শেয়ারবাজারে 'ক্র্যাশ' (crash) ধনতন্ত্রের যে বিশ্বসংকট সূচিত করল তা সমস্যাজর্জরিত জার্মান অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে হল মারাত্মক।

ব্যাপক বাণিজ্যিক মন্দা, শেয়ারবাজারে হু হু করে দাম হ্রাস, একটার পর

---

৪৯. Alan Bullock, *Hitler : a study in tyranny*, Penguin Books, 1962, পৃঃ ৬৩-৮৩।

৫০. ঐ, পৃঃ ৮৪; এবং Nicholls, পৃঃ ৯৯-১০৫।

৫১. ঐ, পৃঃ ১২২; Pascal, পৃঃ ১১০; এবং Bullock, পৃঃ ১১৮-৯।

একটা ব্যাঙ্ক ফেল, লক্ষ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক, কর্মক্ষম মানুষের বেকারি ও শ্রমিক-কর্মচারীর কর্মচ্যুতি[৫২] অসংখ্য ছোটো ব্যবসায়ী ও কৃষকের সর্বস্বান্ত অবস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করে বেরুনো ছাত্র-তরুণদের অন্ধকার ভবিষ্যৎ, রুটি ও খাদ্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি—সব মিলিয়ে দেখা দিল এক সর্বনাশা সংকট। এই সংকট মোকাবিলার জন্য রক্ষণশীল চ্যান্সেলর ব্রুনিঙ-এর দক্ষিণপন্থী সরকারের দাওয়াই ছিল, একদিকে, মোটা মোটা সরকারী অর্ডার দিয়ে একচেটিয়া পুঁজির মালিকানাধীন সমরশিল্পকে চাঙ্গা রাখা ও ভূস্বামীদের স্বার্থে শস্তায় খাদ্য আমদানী নিষিদ্ধ করে গম ও অন্যান্য কৃষিপণ্যের দাম বাড়ানো আর অন্যদিকে, শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী ও বেতন হ্রাস ও বেকারদের ভাতা কাটা। কিন্তু সংকটের সুরাহা তো দূরস্থান, তা আরও বৃদ্ধি পেল।

এরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিন্তু স্বতন্ত্র সমস্যা হিসেবে দেখা দিল হ্বাইমার শাসন-ব্যবস্থার গুরুতর সংকট[৫৩]। রাইখস্টাগের ঘন ঘন নির্বাচন, ১৯৩০-৩৩-এর বছরগুলিতে গঠিত সরকারগুলির রাইখস্টাগে নিশ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রপতি জেনারেল হিণ্ডেনবুর্গের মর্জির উপর চ্যান্সেলারদের নির্ভরশীলতা, রাইখস্টাগের বিরল অধিবেশন ও একে পাশ কাটিয়ে সংবিধানের বিশেষ ধারার জোরে রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলার কর্তৃক ডিক্রির (decree) শাসন, সমরবাদের পুনরুত্থান, Reichswer বা সমরবিভাগের সঙ্গে নাৎসি ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র এবং শাসনের ব্যাপারে বেশি বেশি হস্তক্ষেপ,[৫৪] নাৎসিদের হুমকির মুখে সরকারের পক্ষ থেকে ক্রমাগত 'কনসেশন' দান, প্রজাতন্ত্রের সমর্থক বুর্জোয়াদলগুলির নীতিহীন কোঁদল ও চক্রান্ত, ক্রমবর্ধমান হিংসা, রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা-হাঙ্গামা সব কিছুই হ্বাইমার ব্যবস্থার ভাঙন সূচিত করছিল। এসবের সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছিল শহুরে পেটি-বুর্জোয়াসির মধ্যে ব্যাপক

---

৫২. সরকারী হিসাব অনুসারে বেকারের সংখ্যা ছিল ১৯২৯-এর সেপ্টেম্বরে ১৩ লাখ, এক বছর পরে ৩০ লাখ, ১৯৩১-এর সেপ্টেম্বরে সাড়ে ৪৩ লাখ ও ১৯৩২-এর শীতকালে ৬০ লাখেরও বেশি।

৫৩. Pascal, পৃঃ ১১৮-৯।

৫৪. বস্তুতপক্ষে কি বিসমার্ক-সৃষ্ট দ্বিতীয়-রাইখে আর কি হ্বাইমার প্রজাতন্ত্র army-র এমন একটি বিশিষ্ট স্থান ও ভূমিকা ছিল যাকে উপেক্ষা করে কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্ভবপর ছিল না। হ্বাইমার ব্যবস্থায় Reichswer-এর ভূমিকার জন্য দ্রষ্টব্য E. A. Mowrer, *Germany puts the Clock Back*, London, 1933, পৃঃ ৬৯-৮৫।

হতাশা, কৃষকদের অসন্তোষ, যুবসমাজের চূড়ান্ত নৈতিক সংকট (চটুল ও আদি-রসাত্মক রচনার ছড়াছড়ি ছিল এর একটা লক্ষণ[৫৬]) এবং সাধারণভাবে বুর্জোয়া মতাদর্শের গভীর সংকট।

এসবের পাশাপাশি ছিল শ্রমিকশ্রেণীর বিক্ষুব্ধ মেজাজ ও আলোড়ন এবং জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবের দ্রুত ও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি[৫৭]। এই সঙ্গে ধনতন্ত্রের জগৎজোড়া সংকটের পাশে সংকটমুক্ত নতুন সভ্যতার দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃষ্টান্তও মেহনতী মানুষের চেতনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছিল। ব্যাপক বেকারির পটভূমিতে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াইয়ের চিরাচরিত হাতিয়ার (অর্থাৎ ধর্মঘট) ব্যবহারে অসুবিধা ছিল। কিন্তু জার্মানির সংঘবদ্ধ, শক্তিশালী, অগ্রসর শ্রমিকশ্রেণী তাদের স্বার্থ ও অধিকারসমূহকে রক্ষা করার জন্য ক্রমাগত লড়ছিল ; নাৎসি ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল আক্রমণের বিরুদ্ধে বারে বারেই পাল্টা-আক্রমণ চালাচ্ছিল। আর এসব কিছুই জার্মান বুর্জোয়াসির মনে সঞ্চারিত করছিল সমাজ-বিপ্লবের প্রচণ্ড আতঙ্ক।

বস্তুতপক্ষে সমস্যার পাকে পাকে পরিস্থিতিটা এমনই দাঁড়িয়েছিল যে শাসক-শ্রেণীর পক্ষে বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখে চলা আর সম্ভবপর ছিল না। একথা ক্রমশই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, জার্মানিতে ধনতন্ত্রকে বজায় রাখার—বিশেষত একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ রক্ষার—জন্য জরুরী দরকার হল নয়াপদ্ধতি, অর্থনীতি ও সমাজে রাষ্ট্রের বেশি বেশি হস্তক্ষেপ, অর্থনীতির দ্রুত সামরিকী-করণ (militarisation), মেহনতী মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারগুলির সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্নকরণ, শ্রমিকশ্রেণীর সংহতিনাশ ও তার শক্তির ধ্বংসসাধন এবং কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রগতিকে রোধ ও পরাস্ত করার জন্য বুর্জোয়া-একনায়কত্বের আরও সন্ত্রাসমূলক রূপের প্রতিষ্ঠা[৫৮]।

অবশ্য এই মাত্র যা বলা হল তার এমন ব্যাখ্যা করা একেবারেই অনুচিত হবে যে সন্ত্রাসমূলক বুর্জোয়া-একনায়কত্বই ছিল ১৯৩০-১৯৩৩-এর জার্মানিতে একমাত্র বিকল্প। না, জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের জয় মোটেই অবশ্যম্ভাবী ছিল না।

৫৬ ঐ, পৃঃ ১৯২-৯৩।

৫৭. ১৯২৮ থেকে ১৯৩২-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত চারটি নির্বাচনের প্রতিটিতেই কে. পি. ডি.-র প্রাপ্তভোট ও আসনের সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। অবশ্য নির্বাচনী সমর্থন সব সময়ে সংগঠিতশক্তি ও কার্যকর প্রভাবের বা লড়িয়ে ক্ষমতার পরিচায়ক নয়।

৫৮. R. P Dutt, পৃঃ ১৫৬।

কৃষক ও শহরের পেটি-বুর্জোয়াসির সঙ্গে বিপ্লবী মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ সম্মিলিত শ্রমিকশ্রেণীর ইতিহাস-সচেতন সুনির্দিষ্ট হস্তক্ষেপ এবং সমস্ত বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তির ঐক্যের কর্মনীতি জার্মানির ও ইয়োরোপের ইতিহাসের মোড় ঘোরাতে পারত[৫৯]। কিন্তু তা হল না। শ্রমিকশ্রেণীর অন্যতম প্রধান পার্টি সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা এ সময়ে সরকারী কোয়ালিশনে ছিল না—কিন্তু নাৎসি বিপদ ও কমিউনিস্ট পার্টির ক্রমবর্ধমান প্রভাবের সামনে 'মন্দের ভালো' হিসেবে তারা অনুসরণ করল দক্ষিণপন্থা-অভিমুখী বুর্জোয়া-সরকারকে সমর্থনের নীতি, প্রত্যাখ্যান করল কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে বারে বারে দেওয়া ফ্যাসিবাদবিরোধী যুক্তসংগ্রামের জন্য প্রস্তাব। নেতৃত্বের একটি ছোটো অংশ ও সভ্য-সমর্থকদের অনেকে কমিউনিস্টদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ কর্মতৎপরতায় আগ্রহ দেখানো সত্বেও পার্টিনেতৃত্বের প্রধান অংশটি উপরোক্ত অবস্থানে অটল রইল।

সোশ্যাল ডেমোক্রাট এবং/অথবা মধ্যপন্থী ও উদারনৈতিক বুর্জোয়া দলগুলি কর্তৃক গঠিত হ্বাইমার সরকারের পক্ষ থেকে শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের বিপ্লবী আন্দোলন দমন-পীড়নে কোনো শৈথিল্য ছিল না। কিন্তু নাৎসিদের বিরুদ্ধে শক্ত হাতে ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে এই সরকার অনুসরণ করল কনসেশনদান ও আপোসের নীতি। অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টির নাৎসিবাদ-বিরোধিতায় দৃঢ়তা ও আন্তরিকতার অভাব না থাকলেও পার্টি এমন কতকগুলি গুরুতর ভুল করেছিল যেগুলি নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে ব্যাহত করে[৬০]। এই সব ভুলের মধ্যে ছিল জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের বিপদকে কমিয়ে দেখার প্রবণতা[৬১]

---

৫৯. Dimitrov, পৃঃ ৪৯।

৬০. ঐ, পৃঃ ৫২।

৬১. কমিনটার্নের সপ্তম কংগ্রেসে ডিমিট্রভ তাঁর রিপোর্টে বলেন: "In our ranks there was an imperssible underestimation of the fascist danger...Of this nature was the opinion formerly to be met within our Parties that 'Germany is not Italy', meaning that fascism may have succeeded in Italy, but that its success in Germany was out of the question, because the latter is an industrially and culturally highly developed country, with forty years of traditions of the working-class movement, in which fascism was impossible." ঐ, পৃঃ ৫২।

এবং আত্মসন্তুষ্ট সংকীর্ণতা[৬২]। 'সোশ্যাল ডেমোক্রাসি'-কে 'সোশ্যাল ফ্যাসিজম' এবং কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসে সোশ্যাল ডেমোক্রাসির বামপন্থী অংশকে "সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলির সব থেকে বিপজ্জনক অংশ" হিসেবে চিহ্নিতকরণ একটি কার্যকর বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক সম্মিলন রচনার কাজকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে[৬৩]। জরুরী সমস্যাগুলি সমাধানের উদ্দেশ্যে, সুনির্দিষ্ট হস্তক্ষেপের পরিবর্তে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ অনেক সময়ে সীমাবদ্ধ থেকে যায় শুধু সাধারণ তত্ত্বগত প্রচারে[৬৪]।

[৫] নাৎসিদের জয়লাভ

সব মিলিয়ে সময়টা ছিল জার্মানির রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক **চরম অনিশ্চয়তা ও শূন্যতার**। ব্যাপক বেকারি, গভীর অনৈক্য, লোক-সমাজের অন্যান্য অংশের থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে ক্রমাগত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শ্রমিকশ্রেণীর বেশ একটা বড় অংশের মধ্যে নিয়ে এল নৈরাশ্য ও অবসাদ। অন্যান্য নানাস্তরের মানুষ, বিশেষত অসন্তুষ্ট কিন্তু উদ্দেশ্যভ্রষ্ট পেটি-বুর্জোয়াসি হয়ে উঠল গণতন্ত্রবিমুখ, জবরদস্ত শাসনের পক্ষপাতী[৬৫]। এই পরিস্থিতির পুরো সুযোগ নিল হিটলার ও নাৎসিরা।

ধাপ্পাবাজি ও প্রতারণা, হ্বাইমার পার্টিগুলির অপদার্থতা ও দুর্নীতির

---

৬২. ঐ, পৃঃ ১০৫।

৬৩. এটা লক্ষণীয় যে লেনিনের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত কমিনটার্নের তৃতীয় (১৯২১) ও চতুর্থ কংগ্রেস (১৯২২) থেকে ফ্যাসিবাদী বিপদের বিষয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ প্রসঙ্গে পাদটীকা ৩৪ এবং *Outline History of the Communist International*, Progress Publishers, Moscow, 1971 দ্রষ্টব্য। অথচ পরবর্তী বছরগুলিতে যখন ফ্যাসিবাদের বিপদ অনেক বেশি প্রবল হয়ে ওঠে তখন কমিনটার্ন ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের নীতি থেকে ক্রমশ সরে আসে। ১৯২৪-এই স্তালিন বলেন, "Objectively, Social Democracy is the moderate wing of fascism···They are not antepodes but twins···" কমিনটার্নের পঞ্চম (১৯২৪) ও ষষ্ঠ (১৯২৮) কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহে এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে, *Outline History of the Communist International*, পৃঃ ২২১, ২৯১।

ইতিপূর্বে অনুসৃত ভ্রান্ত নীতিগুলির সংশোধন করা হয় সপ্তম কংগ্রেসে।

৬৪. Dimitrov, পৃঃ ১৩৩-৩৪।

৬৫. Pascal, পৃঃ ১১৮।

প্রতিটি তুচ্ছ ঘটনাকেও অতিরঞ্জিত করে গণতন্ত্রকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং ধনতন্ত্রবিরোধী নাৎসিমার্কা 'সমাজতন্ত্র'এর অর্থাৎ প্রত্যেককে কাজ দেওয়ার রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা, অনুপার্জিত আয়ের বিলোপসাধন, ট্রাস্টগুলির জাতীয়করণ ইত্যাদি হরেকরকম শস্তা জনপ্রিয় বুলি আওড়ানো ছিল নাৎসি প্রচার-অভিযানের বিশেষত্ব। একই সঙ্গে তারা আবার ধনিকদের দিচ্ছিল তাদের সম্পত্তির পবিত্র অধিকার রক্ষার গ্যারান্টি আর সৈন্যবাহিনীর কর্তাদের দিচ্ছিল জার্মান সমরশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি। তারা উস্কিয়ে তুলল জার্মানদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানকে, সারা দেশকে তাতিয়ে তুলল ভার্সাই চুক্তির অবমাননাকর শর্তগুলির বিরুদ্ধে—"জার্মান জনগণের দাসত্বের বিরুদ্ধে", আর উন্মত্ত জিগির তুলল 'সভ্যতার শত্রু' বলশেভিক রাশিয়া এবং 'বিশুদ্ধ' জার্মান 'আর্য-সভ্যতা'র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ও 'বিশ্বাসঘাতক' 'মানবেতর' (sub-human) ইহুদি আর কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে। জনসাধারণ সম্পর্কে নাৎসিদের ছিল অপরিসীম অবজ্ঞা ; তাদের তোয়াজ করা ও ভয় দেখানোর কাজ চালানো হতে থাকল একই সঙ্গে। আবার প্রুশীয় আজ্ঞানুবর্তিতা ও শৃংখলাবোধকে পুঁজি করে একটিমাত্র পার্টির একমাত্র নেতার (the Leader) সর্বময় কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্যের দাবি জানানো হল[৬৬]।

এইভাবে অতি ধূর্ততার সঙ্গে পরস্পরবিরোধী কিন্তু চিত্তাকর্ষক নানা কথা বলে জনসাধারণের নিঃসহায় দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে নাৎসিরা বিভিন্ন ধরনের মানুষকে—দোকানদার, সরকারী অফিসার, অফিস-কর্মচারী, নৈরাশ্যপীড়িত মধ্যবিত্ত, সংকটগ্রস্ত কৃষক, বিভ্রান্ত যুবশক্তি, পশ্চাৎপদ ও অদক্ষ শ্রমিককে—ভেড়াল তাদের আন্দোলনে। এইসঙ্গে ইহুদিদের বিরুদ্ধে, সংগঠিত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে, বিরোধী মতাবলম্বী সমস্ত সংস্থা ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে নাৎসিরা অনুসরণ করল নির্যাতন সন্ত্রাস ও বর্বর হিংসার নীতি, কুখ্যাত ঝটিকাবাহিনী পেল পুলিশ ও বিচারবিভাগের প্রশ্রয়।

এদিকে একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বৃহৎ ভূস্বামীরা এতদিন পর্যন্ত নাৎসি পার্টি সমেত সব বুর্জোয়া পার্টিকেই—হয়তো কাউকে কম, কাউকে বেশি—সমর্থন জানিয়ে আসছিল। কিন্তু তারা যেই নিশ্চিত হল যে, অন্য কোনো বুর্জোয়া পার্টি নয়, একমাত্র নাৎসিরাই পারে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের ত্রাণকর্তার ভূমিকা পালন করতে এবং সমাজ-বিপ্লবের আতঙ্ককে মুছে ফেলতে—অমনি

৬৬. ঐ, পৃঃ ১১০-১৫।

তারা নাৎসিদের জানাল তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন, দরাজ হাতে ভরে দিতে লাগল নাৎসি-তহবিল[৬৭]।

১৯৩২ পার হওয়ার আগেই বোঝা যাচ্ছিল যে, নাৎসিদের পথরোধ করা বোধহয় আর সম্ভবপর নয়। আর ১৯৩৩-এর ৩০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গের আমন্ত্রণে হিটলার হয়ে বসল চ্যান্সেলর। নাৎসিরা রাইখস্টাগে তখনও সংখ্যালঘু, কিন্তু এইভাবেই তারা প্রথম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল।

এর পরের ঘটনাবলী এই নিবন্ধের আলোচ্য নয়। তবু অতি সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলা যেতে পারে। সংবিধানকে রক্ষা করার এবং 'আইন ও শৃংখলা' ফিরিয়ে আনার শপথ নিয়ে হিটলার চ্যান্সেলর হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলিতে জার্মানির বুকে নেমে এল বিরোধীদের বিরুদ্ধে নৃশংস অনুষ্ঠান ও বিভীষিকার তাণ্ডব। এর প্রথম কোপ পড়েছিল ইহুদি, কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর উপর। কিন্তু শেষপর্যন্ত সোশ্যাল ডেমোক্রাট থেকে শুরু করে বুর্জোয়া উদারনীতিবাদীরা কেউই রেহাই পেল না। এমন কি যে ঝটিকাবাহিনী (বা S. A.)-কে ভর করে হিটলার ক্ষমতায় এল—তারা 'প্রথম বিপ্লব'-এর পর যখন পুঁজিবাদবিরোধী 'দ্বিতীয় বিপ্লব'-এর কথা তুলল, তখন ১৯৩৪-এর জুনে ঝটিকাবাহিনী ভেঙে দেওয়া হল ও তার নেতাদের হত্যা করা হল[৬৮]। এরপর থেকে শুরু হল সম্প্রসারণবাদী জার্মান সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে নিরঙ্কুশ নাৎসি-সন্ত্রাসের রাজত্ব। ইতিপূর্বে ১৯৩৪-এর ৩১ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তৃতীয় রাইখ।

পাঁচ

উপসংহার

এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি শেষ করার আগে পুনরুক্তির ঝুঁকি নিয়েও কয়েকটি কথা স্মরণ করা দরকার।

এক, ফ্যাসিবাদের সাধারণ ঐতিহাসিক পটভূমি হল সামাজিক পরিবর্তনে

---

৬৭. Bullock, পৃঃ ১৭২-৭৩, ১৯৯। নাৎসি পার্টি ও নাৎসিবাদের সঙ্গে শাসকশ্রেণীগুলির, বিশেষত একচেটিয়া পুঁজি-সম্পর্কের, বিস্তৃত বিবরণের জন্য আরও দ্রষ্টব্য Poulantzas, পৃঃ ১০৮-১২।

৬৮. এই ঘটনার বিশদ বৃত্তান্ত ও তাৎপর্যের জন্য দ্রষ্টব্য ঐ, পৃঃ ২৮৪-৩০৯।

বুর্জোয়াসির গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের অভাব এবং উপর থেকে মার্কস-নির্দিষ্ট দ্বিতীয় পথে ধনতান্ত্রিক রূপান্তর ও অতি-সীমাবদ্ধ ও ভঙ্গুর গণতন্ত্রের কৃত্রিম প্রবর্তন।

দুই, ফ্যাসিবাদ তার 'ক্লাসিক' অর্থে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর phenomenon. ধনতন্ত্রের বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব পর্বে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন (যেমন, 'ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড') ও শাসনের (বিসমার্কের জার্মানি বা জারতন্ত্রী রাশিয়া) নানা রকমফেরের মধ্যে ফ্যাসিবাদের পূর্বাভাস থাকলেও তা ফ্যাসিবাদ নয়।

তিন, ফ্যাসিবাদের উদ্ভব, শক্তিবৃদ্ধি ও ক্ষমতালাভ সবই ধনতন্ত্রের যুদ্ধোত্তর সংকটের থেকে। সংকট না থাকলে ফ্যাসিবাদ নেই বা থাকলেও একান্তই শক্তিহীন।

চার, এই সংকটের প্রকাশ মুখ্যত তিন রূপে। (ক) সমৃদ্ধি ও মন্দার মধ্যে চক্রাবর্তনের পরিবর্তে সমগ্র অর্থনীতিকে ব্যাপ্ত করে এমন এক প্রচণ্ড বিপর্যয় বা সাধারণ সংকট যার থেকে স্বাভাবিক বুর্জোয়ারীতিতে অর্থনৈতিক পুনরুন্নয়ন ছিল অসম্ভব। কিন্তু ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয়ের জন্য অর্থনৈতিক দুর্বিপাক যথেষ্ট ছিল না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল (খ) রাজনৈতিক-সামাজিক সংকট ও (গ) বুর্জোয়া মতাদর্শের সংকট। বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে (ঘ) শ্রেণীসংগ্রামের ব্যাপকতা ও তীব্রতা বৃদ্ধি এবং যুদ্ধোত্তর ইতালি, জার্মানি বা এদের সঙ্গে তুলনীয় দেশগুলির সমাজজীবনের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চরিত্র। বস্তুতপক্ষে অর্থনীতি ও সমাজের স্তরে স্তরে এমন গভীর সংকট দেখা দিয়েছিল যার ফ্যাসিবাদী প্রতিক্রিয়াশীল সমাধান ভিন্ন অন্য কোনো বুর্জোয়া সমাধান সম্ভব ছিল না।

পাঁচ, ফ্যাসিবাদী মতাদর্শ ও প্রচারের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছলনা ও প্রবঞ্চনা। মূলত একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থরক্ষা অথচ জনপ্রিয় বুলি কপচানোর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য প্রকট।

ছয়, সূত্রপাতের সময় থেকেই ফ্যাসিবাদ সমাজের যে সব স্তরের থেকে প্রধানত সমর্থন পেয়েছে তাদের মধ্যে ছিল এমন এক দুর্দশাগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত শহুরে মধ্যবিত্ত ও গ্রামাঞ্চল থেকে আসা তরুণ—যাদের পক্ষে বুর্জোয়াশ্রেণীতে উন্নীত হওয়া তো দূরস্থান, বেকারের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলার কালে শিল্পশ্রমিক বা সর্বহারাশ্রেণীতে যোগ দেওয়ার পথও ছিল রুদ্ধ।

সাত, শ্রমজীবী মানুষের সচেতন ও সংগঠিত কর্মতৎপরতা এবং লড়াইয়ের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র রাষ্ট্রের আইনসম্মত ও নিয়মিত পীড়নমূলক অঙ্গগুলির উপর

নির্ভর না করে গণ-উন্মত্ততা-ভিত্তিক বেসরকারী দলীয় ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর পরিকল্পিত নিয়োগ ছিল ফ্যাসিবাদের আর-একটি মৌলিক বিশেষত্ব।

আট, ফ্যাসিবাদ অবশ্য প্রথম থেকেই ছিল বুর্জোয়াসি, বিশেষত একচেটিয়া পুঁজির হাতিয়ার। তবে গোড়ার দিকে পুঁজিপতিরা সমর্থন ও টাকা যুগিয়েছে একাধিক বুর্জোয়া পার্টিকে। কিন্তু বুর্জোয়াব্যবস্থার সংকট-মোচনে একমাত্র ফ্যাসিবাদই সমর্থ এ বিষয়টি নিঃসন্দিগ্ধভাবে বুঝতে পারার পর থেকে একচেটিয়া পুঁজিপতি ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাদের পুরো মদত দিয়েছে ফ্যাসিস্টদের।

নয়, ফ্যাসিস্টরা ক্ষমতায় আরোহণের পূর্বে বুর্জোয়াসির মধ্যপন্থী ও উদারনৈতিক অংশগুলি কর্তৃক পরিচালিত বুর্জোয়া সরকারগুলির ফ্যাসিস্টদের সম্পর্কে আপোস ও তোয়াজের প্রবণতা ফ্যাসিবাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সংহত করতে সাহায্য করেছে। পরিণামে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বদলে সর্বাত্মক সন্ত্রাসমূলক ফ্যাসিবাদী বুর্জোয়া একনায়কত্বের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

দশ, সর্বহারার বৈপ্লবিক অগ্রগতির পর্যায়ে ফ্যাসিবাদ কোথাও সুবিধা করতে পারে নি। ফ্যাসিবাদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে ঠিক তখনই যখন শ্রমিকশ্রেণী ছিল আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে ব্যাপৃত।

এগারো, বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রামের একটা পর্বে কতকগুলি খণ্ড-লড়াইয়ে পশ্চাদ্‌পসরণ কিংবা পরাজয়ের অর্থ এই ছিল না যে শ্রমিকশ্রেণী হয়ে পড়েছিল একেবারেই শক্তিহীন। বস্তুতপক্ষে এই পর্যায়ে ফ্যাসিবাদের হিংস্র মরিয়া আক্রমণের পিছনে কাজ করছিল (১) একচেটিয়া পুঁজিপতি ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে শক্তির পুনর্বিন্যাস ও অবস্থানকে সংহত করে নতুন করে পাল্টা-অভিযান চালানো ও সমাজ-বিপ্লব সংঘটনের আতঙ্ক (২) শ্রমিকশ্রেণীর শক্ত ঘাঁটি অর্থাৎ তাদের সমস্ত সংস্থা ও সংগঠনকে সম্পূর্ণ চূর্ণ করার লক্ষ্য এবং (৩) বহু সংগ্রামের ফলে অর্জিত সকল অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার ধ্বংস করার উদ্দেশ্য। (৪) জনমানসে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রচণ্ড প্রভাবও চরম প্রতিক্রিয়াশীলদের মনে প্রচণ্ড ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। অতএব ফ্যাসিবাদ কর্তৃক ক্ষমতাদখলের অর্থ হল **নিরোধমূলক প্রতিবিপ্লব** বা preventive counterrevolution.[৬৯]

* * * *

৬৯. R. P. Dutt, পৃঃ ১২৩।

এই প্রবন্ধ ইতিমধ্যেই রীতিমতো দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। তবে শেষ করার আগে এই আলোচনার সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে একথা বলা দরকার যে, ফ্যাসিবাদের ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমির সঙ্গে ভারতের কতকগুলি লক্ষণীয় সাদৃশ্য ও বৈপরীত্য বর্তমান। ঔপনিবেশিক কাঠামোয় উদ্ভূত ভারতীয় বুর্জোয়াসির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমাজের গণতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনের কাজে শোচনীয় ব্যর্থতা খুবই প্রকট। মার্কসবাদে বিশ্বাসী বামপন্থী রাজনীতি অনেকাংশে বিপথগামী। দেশের মানুষের একটা বেশ বড় অংশই নৈরাশ্যপীড়িত, অবসাদগ্রস্ত। এই পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আশীর্বাদপুষ্ট প্রতিক্রিয়ার চূড়ান্ত প্রতিপত্তি লাভের বিপদ।

আবার একথাও উপেক্ষা করার নয় যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি (অর্থাৎ এমন এক পরিস্থিতি যেখানে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা নিয়ামক উপাদান হিসেবে কাজ করছে এবং বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের উত্তরোত্তর সাফল্য সূচিত হচ্ছে) দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের থেকে গুণগত অর্থেই সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এই সঙ্গে এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, ভারতীয় বুর্জোয়াসির দেশপ্রেমিক অংশের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও স্থিতাবস্থাপন্থী স্বার্থগুলির বিরোধ দুঃসমাধেয়। উপরন্তু, জাতীয় সার্বভৌমত্বের জন্য সংগ্রামের সময় থেকেই—জনসাধারণের, বিশেষত কৃষকসমাজের বিস্তীর্ণ অংশের উপর নির্ভরতার ফলে—গণতন্ত্রের একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে এবং নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গণতন্ত্রের—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে জনসাধারণের অংশগ্রহণের অর্থে গণতন্ত্রের—সুযোগ এখনও বর্তমান। এরই একটা তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল, ভারতে এখনো পর্যন্ত সৈন্যবাহিনীর সংসদ ও বেসামরিক শাসন-কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের উর্ধ্বে স্বতন্ত্র কোনো স্থান বা ভূমিকা নেই।

স্পষ্টতই ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে অনেক জটিলতা ও পরস্পর-বিরোধী দিক রয়েছে। এখন যখন গণতন্ত্র প্রতিক্রিয়া ও ফ্যাসিবাদ নিয়ে অনেক কথাই আলোচিত হচ্ছে তখন ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে অতীতের অভিজ্ঞতা এই জটিল ও সমস্যাসংকুল পরিস্থিতির যথাযথ বিচারে ও সমাজের প্রগতি-অভিমুখী পরিবর্তনের কর্মনীতি রচনায় সহায়ক হতে পারে।

[আজকের দিনে পৃথিবীর নানা দেশে, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ার অনেক

দেশে, যে সব চরম প্রতিবিপ্লবী আন্দোলন ও শাসন দেখা যায় তার সঙ্গে সাবেক ফ্যাসিবাদের মিল ও অমিল বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। আবার, বর্তমানের পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে তৃতীয় দুনিয়ার বুর্জোয়া এবং/ অথবা পেটি-বুর্জোয়া প্রভুত্বপরায়ণ শাসনও অনেক সময়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং দেশের ভিতরে সামাজিক অর্থনৈতিক রূপান্তর সাধনে সীমাবদ্ধ অর্থে হলেও একটি সুনির্দিষ্ট প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করতে পারে। আশা করি 'পরিচয়'-এর সম্পাদকমণ্ডলী ভবিষ্যতে এই সব সমস্যা নিয়ে আলোচনার উদ্যোগ নেবেন।]*

---

* এই প্রবন্ধটি রচনায় রুদ্রাংশু মুখার্জি, সুনীল মুন্সী, অশোক সেন ও গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা থেকে আমি বিশেষ লাভবান হয়েছি। তবে এই প্রবন্ধের সব ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার দায়িত্ব আমার।—লেখক

যন্ত্রণার অস্ত্র

পল এলুয়ার

[১৯৪৬ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রতিরোধ-কালের কবিতার সংকলন *AU RENDEZ-VOUS ALLEMAND*-এর পরিশিষ্টে পল এলুয়ার এই কবিতা রচনার উপলক্ষ ও কারণ সম্বন্ধে যা লেখেন এখানে তা উদ্ধৃত করছি ভূমিকা হিসেবে :

"কোনো না কোনো ভাবে কবিতা বরাবর সত্যের উপর নির্ভর করে এসেছে। কি নাটকীয় ঘটনাবলী আমাকে এই কবিতা লিখতে অনুপ্রাণিত করে তা আমি বিবৃত করতে চাই—

"১৯৪২ সালে 'লিসে ব্যুফঁ'-তে ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের জের হিসেবে আলসাস স্কুলের ছাত্র সতেরো বছর বয়সের ল্যুসিয়ঁ্যা ল্যগ্রোকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ বছরই জুন মাসে ফরাসী রাষ্ট্রের আদালতে তার বিচার হয় এবং তাকে যাবজ্জীবন কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, পরে তাকে গেস্টাপোর হাতে সমর্পণ করা হয়। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা পর্যন্ত যতদিন তাকে আটক রাখা হয় সেই সময়ের মধ্যে জার্মানরা তার বুদ্ধিমত্তা, তার সংস্কৃতি এবং তার সংশয়াতীত শিল্প ও সঙ্গীত প্রতিভা স্বীকার না করে পারে নি। ইতিমধ্যে তার বাবা ও বড় ভাই গ্রেপ্তার হয়েছিল এবং ঐ দিনই তাদের আরো একশোজন জামিন-দারের সঙ্গে গুলি করে মারবার জন্যে সরাসরি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রোমঁ্যাভিল দুর্গে। সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত বাবার এক বন্ধুর হস্তক্ষেপের ফলে তারা আশ্চর্যভাবে রক্ষা পেয়ে যায়।

"কিন্তু আমার সেই তরুণ বন্ধুর বেলায় অন্য রকম ঘটে। সে যখন বুঝতে পারে তার রক্ষা পাবার উপায় নেই তখন সে জার্মান আদালতের সামনে তার বিশ্বাস ও মতামত, ফ্রান্সের প্রতি তার ভালোবাসা, জোর গলায় ঘোষণা করে এবং আমাদের শত্রুদের যা যা ক্ষতি সে করতে পেরেছিল তা পরিষ্কার বলে। জার্মানি যেন খুব উদার এমন ভাব দেখিয়ে গোয়েরিং তাকে ক্ষমা করে দেয়। এবং

জার্মানি যেহেতু নির্মম সেহেতু কয়েকদিন বাদে ঐ একই গোয়েরিং-এর নির্দেশে তাকে জামিনদার হিসেবে গুলি করে মারা হয়। তার কাছ থেকে তার সঙ্গী-সাথীর নাম পাওয়ার জন্যে তাকে পর পর আশা এবং নিরাশার ভয়ঙ্কর বিকল্প-চক্রের মধ্যে দিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। তার শরীর ও মন ওরা নির্যাতনে জর্জর করেছিল। তার চারজন সাথীর সঙ্গে তাকে ইভ্রিতে কবর দেওয়া হয়। সে চারজন সাথী হল: ঝাঁ আরত্যুস, পিয়ের ব্যনোয়া, পিয়ের গ্র্যলো, ঝাক বোদ্রি। তারা সবাই তার সমবয়সী ছিল।" —অনুবাদক]

বাবার প্রতি:

চুরমার ঘরের বাপ
ফুটো টুপিওয়ালা মানুষ
ওপড়ানো চোখের মানুষ
কালো আগুনের মানুষ
বুড়ো হয়ে মরবার ভূশণ্ডি
তুমি তো সুখী হবার স্বপ্ন দেখেছিলে

চুরমার ঘরের বাপ
তোমার ছেলে মরেছে
খুন হয়ে

বাপ ঘৃণা
ও নিষ্ঠুর শিকার
আমার দুই যুদ্ধের সাথী
আমাদের জীবন কচুকাটা
রক্তঝরা কুচ্ছিৎ
কিন্তু আমরা শপথ নিচ্ছি
শিগগির ছুরি ধরব

বাপ আশা
অন্যদের আশা
তুমি সব জায়গায়।

মা বলছে :

আমাদের প্রতিজ্ঞার ভিতরে আমি তিনটে কেল্লা গড়েছিলাম
একটা জীবনের জন্যে একটা মৃত্যুর জন্যে একটা ভালোবাসার জন্যে
আমার সুখী আর সরস জীবনের
ছোট ছোট কষ্টগুলো
আমি মণিমুক্তোর মতো লুকিয়ে রাখতাম

আমি খুশির ভিতরে তিনটে জামা বুনেছিলাম
একটা আমাদের দুজনের জন্যে আর দুটো আমাদের ছেলের জন্যে
আমাদের একই হাত ছিল
আমরা একে অন্যের জন্যে ভাবতাম
আমরা পৃথিবীকে সাজিয়ে ধরতাম

আমি রাতের ভিতরে তিনটে আলো গুণেছিলাম
ঘুমের সময় সব একাকার হয়ে যেত
ছেলে আশা আর ফুল আয়না চোখ আর চাঁদ
সাদামাটা পুরুষ কিন্তু পরিষ্কার কথাবার্তা
নিষ্প্রভ স্ত্রীলোক কিন্তু আঙুলগুলো তরল স্রোত

হঠাৎ এক মরুভূমি
আমি অন্ধকারে হারিয়ে যাই
শত্রু দেখা দিয়েছে
আমার রক্তমাংসে আমি একা
ভালোবাসতে আমি একা।

*

তার ছেলে, সেই শিশু

সেই শিশু মিথ্যে বলতে পারত
মিথ্যে ব'লে নিজেকে বাঁচাতে

কোমল দুস্তর সমতল
সেই শিশু মিথ্যে বলতে ভালোবাসত না
সে তার অপরাধ চীৎকার ক'রে বলল
সে তার সত্যকে তুলে ধরল
সত্যকে
তরোয়ালের মতো জল্লাদদের বিরুদ্ধে
তরোয়ালের মতো তার চরম বিধানকে

এবং তার জল্লাদরা প্রতিশোধ নিল
ওরা মৃত্যুকে সামনে দিয়ে নিয়ে গেল
আশা মৃত্যু আশা মৃত্যু
ওরা তাকে রেহাই দিল তারপর খুন করল

ওরা তাকে ভীষণ নির্যাতন করেছিল
তার পা তার হাত ভেঙে দিয়েছিল
কবরখানার পাহারাদার বলল।

*

একমাত্র চিন্তা একমাত্র আবেগ
এবং যন্ত্রণার অস্ত্র।

*

যারা পৃথিবীতে শান্তি আনবে
সেই সংগ্রামীদের রক্ত ঝরে আগুন
শ্রমিকরা কৃষকরা
জনতার সঙ্গে মিশে-যাওয়া যোদ্ধারা
এবং আরো জোর আঘাত হানবার জন্যে
কি অমোঘ যুক্তি
জলধারার মতো যোদ্ধারা
সর্বত্র খরা মাঠের উপর
কিম্বা ঘোলাটে আকাশে
দুরন্ত পাখা ঝাপটায়

যাতে অত্যাচারীর
অন্ত পৃথিবীর নীতি নিশ্চিহ্ন হয়

এবং প্রেম অনুযায়ী ঘৃণা

আশা অনুযায়ী
জীবনের অর্থ অনুযায়ী যোদ্ধারা
এবং পরাজিত করবার
আমাদের ক্ষতিপূরণ করবার
আবেগ অনুযায়ী
সকলের কথা

আমার হৃদয় অনুযায়ী যোদ্ধারা
মৃত্যুর কথা কেউ ভাবে
কেউ ভাবে না
একজন ঘুমোয় আরেকজন ঘুমোয় না
কিন্তু সবাই একই স্বপ্ন দেখে
মুক্ত হবে
প্রত্যেকেই সকলের ছায়া।

*

অনেকেই গম্ভীর অনেকেই নিরাবরণ
তারা তাদের মঙ্গল গায় তাদের অমঙ্গলকে দাঁতে চেপে রাখে
তাদের শরীরের ভার দাঁতে চেপে রাখে
কিম্বা গান গায় যেন উড়ছে

হাজার মানবিক স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে
নিসর্গের হাজার পথ দিয়ে
তাদের স্বদেশ থেকে তারা বেরোয়
এবং তাদের স্বদেশ প্রবেশ করে তাদের ভিতরে
তাদের রক্তে হাওয়া লাগে
তাদের স্বদেশ হয়ে উঠতে পারে

সত্যিকার আশ্চর্যের দেশ
অপাপবিদ্ধতার দেশ।

*

মানুষ অনুযায়ী বিদ্রোহীরা
সমস্ত মানুষের আকাশের নিচে
পরিপূর্ণ সমভূমি পৃথিবীর উপর

এই পাকা ফলের ভিতরে
রোদ অকলুষ হৃদয়ের মতো
সমস্ত রোদ মানুষের জন্যে

সমস্ত মানুষ মানুষের জন্যে
সমগ্র পৃথিবী এবং সময়
সুখ এক অদ্বিতীয় শরীরে।

*

আমি তাই বলছি যা আমি দেখছি
যা আমি জানি
যা সত্য।

অনুবাদ ঃ অরুণ মিত্র

* মূল ফরাসী থেকে অনুবাদিত

ফাঁসির মঞ্চে যে বীর গেয়েছে গান

লুই আরাগঁ

"...এ যন্ত্রণা সইতে যদি হয়
এ পথে তবু আবার যাব ফিরে"
উঠল গেয়ে শৃঙ্খলিত স্বর
ভাবীকালের গানের মীড়ে মীড়ে।

সান্ত্রী দুটো কক্ষে এলো চুপে
রাত্রি হল কালির মতো কালো
বলল তাকে, "বিকিয়ে দাও কথা
জীবন আলো লাগে না আর ভালো?"

"গোলাম হয়ে বাঁচার অধিকার
এবার দেবো তোমার হাতে তুলে
একটা কথা বিকিয়ে যদি দাও,
জেলখানার ফটক যাবে খুলে।"

"এ যন্ত্রণা সইতে যদি হয়
এ পথে তবু আবার যাব ফিরে,"
শৃঙ্খলিত ভাবীকালের স্বর
উঠল জেগে রাতের হাওয়া চিরে।

"এক কথায় দুঃখ অবসান
বিকিয়ে কথা মুক্তি নাও কিনে
তপ্ত লোহা দেবে না আর ছ্যাঁকা
ব্যথার রাত মিলিয়ে যাবে দিনে।

একটা কথা, একটা মিছে কথা
জগদ্দল পাথর তুলে নেবে
বদলে ফ্যালো নিয়তি নির্মম
ঝামরে-পড়া রোদের কথা ভেবে।"

"এ যন্ত্রণা সইতে যদি হয়
আবার তবু যাব এপথ বেয়ে"
সওয়াল করে শৃঙ্খলিত গান
ভাবীকালের শিশুর মুখ চেয়ে।

"মরণাহত পশুরাজের চেয়ে
জ্যান্ত গাধা অনেক বেশি দামী
ছোটোবেলায় শুনেছি তবু আজ
সত্যি ব'লে মানবো না তা আমি।"

জীবন যে কী মূর্খ তা কি বোঝে
মাথায় একী খুন চেপেছে তার
বেঁচে থাকার সুযোগ দিলো ছুঁড়ে
মূর্খ সে তো মৃতের মতো ছার।

এ যন্ত্রণা সইতে যদি হয়
এ পথে বোকা আবার যাবে ফিরে!
"আগামী কালও একাজ করে যাব"
শৃঙ্খলিত জবাব এলো ফিরে।

"ফ্রান্স আমার জীবনব্যাপী প্রেম
মৃত্যুহীন ফ্রান্সকে রেখে যাই
মরণ এলো মরছি কেন আজ
জবাবটুকু কালকে জেনো ভাই"

ছাইয়ের রঙে ধূসর ভোর এলো
কারার প্রভু প্রশ্নে ছোঁড়ে বাণ
বাণের মুখে বিদেশী ভাষা বিষ
“বন্দী তুমি দেবে কি সন্ধান ?”

জবাব এলো “যেতেই যদি হয়
এ পথে আমি আবার যাব ফিরে
আগামী কাল সীসার কালো ঝড়
হারিয়ে যাবে গানের মীড়ে মীড়ে।”

বধ্যভূমি অবাক—শোনে গান
“রক্তে রাঙা পতাকা ওড়ে মেঘে”
গানের কলি থামিয়ে দিতে ফের
সীসার ঝোড়ো ঝাপটা এলো বেগে।

কাঁপন-লাগা লা মার্সাই সুরে
মরণ-জয়ী ফরাসী সন্তান
মাটি-মায়ের শিশুর উদ্দেশে
সেদিন ভোরে গাইল সে কী গান !

অনুবাদ ঃ দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী

* ‘লুই আরাগঁর কবিতা’ থেকে। বানান ও যতিচিহ্নে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। কবিতাটি গেব্রিয়েল পেরির শহীদত্ব বরণের পরে লেখা। —সম্পাদক

তিনটি কবিতা

ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকা

বিস্ময়

পথে প’ড়ে রয়েছে সে মৃত
বুকের ভিতরে একটা ছোরা,
কারো চেনা-শোনা নয় সে।
পথের বাতিটা কী কাঁপছে
মাগো !
ছোট্ট বাতিটা কী কাঁপছে
ঐ যে পথে !

সরে ভোর তখন। কেউ
তাকাতে পারল না তার চোখে
কঠিন হিম হাওয়ায় খোলা।
পথে সে প’ড়ে রইল
বুকের ভিতরে একটা ধারালো ছোরা,
কারো চেনাশোনা নয় সে।

চীৎকার

একটি চীৎকারের উপবৃত্ত
পাহাড় থেকে পৌছায়
পাহাড়ে।
জলপায়ের কুঞ্জ থেকে
সেটি হয়ে উঠবে কালো একটি ইন্দ্রধনু
রাত্রির নীলের উপরে।
—আ!
ভিয়োলার ছড়ের মতন
চীৎকারটি বাজিয়ে তুলল
বাতাসের দীর্ঘ স্বরগ্রাম।
—আ!
অন্ধকার সব গুহা থেকে লোকজন
তাদের সব বাতি বাইরে আনল
—আ!

ছোরা

ছোরাটি হৃদয়ে ঢোকে
যেন এক লাঙল
পোড়ো আবাদায়
—না।
কোরো না আমায় ভেদ।
—না।
ছোরাটি
সূর্যের রশ্মির মতো
আগুন ধরাল ভয়ঙ্কর
গভীর খদে খদে।
না।
কোরো না আমায় ভেদ।
—না।

অনুবাদ : বিষ্ণু দে

উপহার

বের্টোল্ড্ ব্রেখট

সৈনিকবধূ অবাক, খুলল মোড়া
নজর পাঠায় প্রাচীন শহর প্রাগ!
উঁচু খুরওলা জুতো এ যে এক জোড়া—
অবাক করলে পুরানো শহর প্রাগ!

সৈনিকবধূ মোড়া খোলে চুপি চুপি
সাগরপারের অস্‌লো পাঠাল কিবা?

পাঠিয়েছে স্বামী সরেশ লোমের টুপি—
ফূর্তিতে হাসে আর্য শিবের শিবা।

সৈনিকবধূ অবাক নয়নে ছাখে,
এমস্টারডাম পয়সার দেশ বটে,
হীরার আংটি পাঠাল সেখান থেকে—
সাদা চামড়ায় মানাবে তা বেশ বটে।

সৈনিকবধূ অবাক হয়েই থাকে,
ব্রাসেলস শহর বড়োই সে সৌখীন!
দামী দামী লেস ব্রাসেলস পাঠায় ডাকে—
কিবা সাজগোজ চলবে সারাটা দিন!

সৈনিকবধূ বিস্মিত, ভাবে বামা
প্যারিসের আলো চক্ষু জ্বালায় তার
ফ্যাশন-স্বর্গ পাঠাল রেশমী জামা—
চরম এ সখ জেগেছে কত না বার!

সৈনিকবধূ সুখে ভাবে চোখ বুজে
বুখারেস্ট থেকে ব্লাউস যে উপহার,
পাঠায় আবার স্বামী তার খুঁজে খুঁজে
নকশার কাজ, রঙের কি যে বাহার!

নাৎসির বৌ আবার অবাক চেয়ে—
তুষার কঠিন রাশিয়ার উপহার!
বিধবার কালো ঘোমটা পাঠাল কে এ
তুষার কঠিন রাশিয়ার উপহার!

অনুবাদ : বিষ্ণু দে

প্রতীক্ষায় থেকো

কনস্টান্টিন সিমোনভ

প্রতীক্ষায় থেকো, আমি আসবো আবার ফিরে ঘরে
তুমি শুধু থেকো প্রতীক্ষায়…
প্রতীক্ষায় থেকো ম্লান বৃষ্টিধারা পড়ুক ঝর্ঝরে
একঘেয়ে শ্রান্ত হতাশায়,
প্রতীক্ষায় থেকো ঝঞ্ঝাতুষারের প্রবল বাতাসে
থেকো গ্রীষ্মে উত্তপ্ত হাওয়ায়,
প্রতীক্ষায় থেকো যবে অতীতের প্রতি অবিশ্বাসে
অন্যেরা রবে না প্রতীক্ষায়,
প্রতীক্ষায় থেকো তুমি যবে বহুদূর দেশ থেকে
চিঠিপত্র আর না পৌঁছায়,
প্রতীক্ষায় থেকো যবে বাড়ির লোকেরা দেখে দেখে
ক্লান্ত হয়ে ওঠে অসহায়।

প্রতীক্ষায় থেকো আমি আবার আসবো ঘরে ফিরে,
তুমি মোটে দিও নাকো কান
যদি কেউ বলে তবে বলুক না বৃথা রাখা ঘিরে
পরাজিত গত বর্তমান।
যদিবা আমার ছেলে কিংবা মা-ই হন ধৈর্যহীন
আমি আর ফিরব না ভয়ে,
যদিবা বন্ধুরা দীর্ঘ প্রতীক্ষায় অবসন্ন ক্ষীণ
আগুনরাখার পাশে ব'সে রয়,
যদি তারা পান করে ভরাট পেয়ালা বেদনার
আমারিই স্মৃতির উদ্দেশে,
প্রতীক্ষা একটু রেখো, মিশিয়ো না তুমিও তোমার
পেয়ালা তর্পণে কালো বেশে।

প্রতীক্ষায় থেকো আমি ধ্বংসের বিধান তুচ্ছ ক'রে
আসবো আবার ঘরমুখ,
প্রতীক্ষা করে না যারা, তারা যদি কপালের জোরে
ফিরি আমি ভাবে তো ভাবুক,
প্রতীক্ষায় থাকেনিকো যারা তারা বুঝবে কেমনে,
কেমনে জানবে সেই প্রাতে
তোমারই প্রতীক্ষাখানি আমার ভাগ্যকে প্রাণপণে
বাঁচাল যুদ্ধের লাল রাতে ?

অনুবাদ : বিষ্ণু দে

টিমোশেঙ্কো

সিডনি কীজ

দশটায় উঠলেন তিনি, দশপ্রহরণ হাতে, প্রতিটি আঙুল
ভারাক্রান্ত ফলা ; এবং কোমরবন্ধ আঁটসাঁট বেঁধে
পান্টা আক্রমণের শৌর্যে, খুলে দিলেন জানলা,
তাকালেন নিজের নির্দিষ্ট রাত্রির উদ্দেশে।

যেখানে রয়েছে, হাওয়া আর কিচিমিচি অগ্নিকাণ্ডের নিচে
দম্পতির মতো কেউ অঙ্গাঙ্গী কিংবা কেউ একা
ঘুমে মাতালের মতো দুঃশীল ভঙ্গিতে যত
দুমড়ানো শরীর আর বিরক্ত মুখ এক সৈন্যের বাহিনী
হাওয়া আর ছায়ার ভিড়ের মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

আহা শোনো ঐ হাওয়া, যে হাওয়ায় ঊষা থরোথরো।
আর ঐখানে রাত্রির আগে, তাঁর মর্মে মর্মে পশে
কত না সংসারের ছারখার ক্ষেত ও খামার, আর ধ্বংসে ধ্বংসে কালো

সর্বদাসহায় এই বসুন্ধরা, ট্যাঙ্কের চাকায় চাকায় চিহ্নিত।
তাঁর ক্ষুরধার হাত করুণায় আনত, যেন ভাঙা লাঙলের
শোকে রুদ্ধমান ভাঙাচোরা এক হাতের নকলে ;
আর দিব্যবাক্ তাঁর অষ্টধাতু ওষ্ঠাধর ক্রোধে হয়ে ওঠে
সমকোণ ধর্ষিত মেয়ের আর্তনাদে মুখর মুখের আকারে।
তাঁর কানে পশে ঐ হাওয়া, করে প্রকৃতির যন্ত্রণার ভাষ্য
আর গুনগুন ক'রে বাজে মৃতদের চুলের তন্ত্রীর মধ্য দিয়ে।

ফিরে দাঁড়ালেন তিনি, তাঁর বিশাল ছায়া দেয়ালের গায়ে
দুলে ওঠে গাছের মতন। তাঁর চোখ সীসার মতো হিম হয়ে আসে।
তারপরে, প্রেম আর শোক আর করুণার প্রচণ্ড আবেগে
পেন্সিলচিহ্নিত ম্যাপে প্রাণের সঞ্চার ক'রে দিলেন লড়ায়ে লড়ায়ে।

অনুবাদ : বিষ্ণু দে

* বিষ্ণু দে-অনুবাদিত বিদেশী কবিতার সংকলন 'হে বিদেশী ফুল' ১৯৫৬ সালে (আশ্বিন ১৩৬৩) প্রকাশিত হয়। ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকা, বের্টোল্ড ব্রেখট, কনস্টান্টিন সিমোনভ ও সিডনি কীজ-এর কবিতাগুচ্ছ ঐ বই থেকে আহৃত হল। বানান ও যতিচিহ্নের ক্ষেত্রে 'পরিচয়'-এর নিয়ম অনুসৃত হয়েছে।

—সম্পাদক

স্পেনের রণক্ষেত্রে লেখা দুটি কবিতা

জন কর্নফোর্ড

[জন্ম কেমব্রিজের এক অধ্যাপক-পরিবারে, ১৯১৫ সালে। ষোল বছর বয়সেই মার্কসের 'ক্যাপিটাল' ও লেনিনের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচয় ; সতেরোয় গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান ; উনিশে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ। কমিণ্টার্নের সপ্তম কংগ্রেসের (১৯৩৫) ডাকে ঐক্যবদ্ধ ফ্যাসিবিরোধী গণতান্ত্রিক সমাবেশের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৩৬-এ স্পেনের গৃহযুদ্ধে আন্তর্জাতিক

ব্রিগেডে যোগদান। ঐ বছরেই ডিসেম্বরে একুশ বছর বয়সে কর্ডোভার কাছে রণক্ষেত্রে মৃত্যু।

টীকা:

উয়েস্কা ছিল আরার্গ-ফ্রন্টে ফ্রাঙ্কোর বাহিনীর একটি শক্ত ঘাঁটি। তিয়েৰ্জে সেখান থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরবর্তী একটি গ্রাম। আস্তুরিয়া প্রদেশের সদরকেন্দ্র অভিদ ফ্রাঙ্কো-বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী হাতাহাতি লড়াইয়ের জন্য বিখ্যাত হয়েছিল। ফ্যাসিস্ট জার্মানিতে অভিযুক্তের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে, রাইখস্টাকের সাজানো মামলা ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতা ডিমিট্রফ মুক্তিলাভ করেছিলেন। থোরে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির ও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অন্যতম তদানীন্তন নেতা।—অনুবাদক]

তিয়েৰ্জে পূর্ণিমা
(উয়েস্কা দখলের পূর্বাহ্ণে)

অতীত তো হিমবাহ। আঁকড়ে ছিল পর্বত-প্রাকার,
এবং কালের গতি ইঞ্চি-মাপা। বেবাক আঁধার!
অবশেষে এইখানে এ গণ্ডীর প্রত্যন্তে কখন
দ্বান্দ্বিক নিয়ম-নিষ্ঠ পরিবর্তনের ক্ষণ
রবিকরে বিচ্ছুরিত, বিচূর্ণিত, ভাঙে শতধার।

বর্তমান, সে জলপ্রপাত। উৎস থেকেই শক্তি তার
থরোথরো যাত্রাপথে ভাঙছে দু-পাড়।
আমাদের হাতে হাতে সোচ্চার প্রত্যয় মোটে নমনীয় নয়।
তবু সে প্রত্যয়ে-গড়া ইতিহাসও গুঁড়ো গুঁড়ো হয়।
শেষ যাত্রার দোলে আমরাই এসো ওকে দোলাই এবার।

যেন পরস্পরছেদী রেখা গোটাকয়—অনিশ্চিত অভিমুখ যার,
সেই তো ভবিষ্যকাল। দেশোত্তীর্ণ, শুদ্ধ নিরাকার।
গন্তব্য যে-পথ আমাদের—সর্পিল যেন তারই মতো ;
আর ঋজু, যেমন বুলেট ছোটে আমাদের সামনে সতত।
আমরাই ভবিষ্যৎ। শেষ যুদ্ধের মুখোমুখি এসো বাঁধি সার।

২

দিনের আলোর মতো ফুটফুটে ছায়া ফেলে ধীরে
উয়েস্কার মাঠে ভরাচাঁদ। এখুনি অচিরে
এই শান্ত প্রান্তরের নিষ্পাপ সারল্য, হায়,
মুছে যাবে স্বেদাক্ত রক্তাক্ত বেদনায়,
আমাদের এ মোক্ষম ঘাঁটিটির হারজিত ঘিরে।

আরাগঁর ঊষর পাহাড় জুড়ে ওই যায় শোনা
আমাদের পরীক্ষার প্রারম্ভ-ঘোষণা।
সত্য হোক, মিথ্যা হোক, জীয়ন্ত কি মৃত,
সপ্তম কংগ্রেসে হল যে-বাণী রণিত
সেই কণ্ঠস্বর আজ অভিদ-র পথে পথে অসির ঝনঝনা

তিন বছর আগে ডিমিট্রফ একচোট লড়লেন একাই।
আমাদের মাথা উঁচু ক'রে গেল জয়ী সে-লড়াই।
কিন্তু আজ লাইপজীগের ড্রাগন-দশন
অঙ্কুরেই দৃঢ় আর মৃত্যুর বিরুদ্ধে স্বশোভন।
সেদিন একজন ছিল। লড়ছে আজ গোটা ফৌজটাই।

যুদ্ধারম্ভের পাঠ আমরা নিয়েছি যত্ন ক'রে,
কমরেড মরিস থোরে দেখালেন পথ আলো ধ'রে।
তবু আজ আরাগঁর পাহাড়তলীতে
আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি নিঃসঙ্গ আঁধারে আচম্বিতে।
পৃথিবীর নবতম গ্রহ যেন রথে চেপে সারারাত ঘোরে!

৩

কমিউনিজম ছিল আমার প্রাত্যহিক ঘুম-ভাঙানি ভোর—
আলোয় আলোয় ভ'রে ওঠার আগেই ঘরদোর,
পূর্ণতায় ধরা দেবার আগেই দৃশ্যপট।
সহায়কারী তবু ছিল কাছেপিঠেই, হঠাৎ খেলে হোঁচট।
আর আজ ? আমার পার্টির সাথে আমি রই নিঃসঙ্গে জাগর

অতএব, আমার স্নায়ুর সাথে আমার এ একান্ত লড়াই,
বেদনার ভয়, যার বেদনার উপশম নাই,
যে-প্রেম আমার সারা সত্তার শিকড় ধ'রে টানে,
আমার যে-নিঃসঙ্গতা অন্ত্রগুলো ছিঁড়ে খুঁড়ে আনে—
সমস্ত সামিল হোক আমাদের সংগ্রাম-লালিত এই সংযুক্ত ময়দানে।

হে বীর ! অজেয় হও পরাক্রান্ত সূর্যের প্রতীক,
আমার এ বন্দুকের মতো হও ইস্পাত নির্ভীক,
আমার এ পদক্ষেপ যেখানেই ফসকে নিষ্ফল,
ট্রেনের ঝটিকাবেগ সেখানেই আপন প্রবল
ছন্দের দোলায় তবে অক্টোবর-দিন এনে দিক।

৪

এখন জার্মানি জুড়ে ঘনায় তো একই রাত, এই একটাই !
আকাশ সেখানে বুঝি অনুভূতিহীন। আর অবিরত,
নিরপেক্ষ নক্ষত্রের রূপের রোশনাই
নরম আলোয় ভরে বন্দীশিবির আর আজাদীর কুটিল ক্ষতের দাগ যত।
আমরা পারছি না দিতে এ ব্যথার উপশমে কোনো অবদান,
তবু, এ যন্ত্রণা ব্যর্থ যে হয় নি তার রেখে যাই তপ্ত প্রমাণ।

একই চাঁদের নিচে ইংল্যাণ্ড—সে-ও আজ নিশ্চুপ, নিশ্চল !
এতটুকু সাড়া কই ওয়েলসের খনিখাদে, ক্লাইডের বাঁকে ?

স্বাধীনতা—ওই ছাখো নিক্তিতে—আমার দেশেও টলোমল,
ভালোমানুষির মুখোশ একথা আড়ালে লুকিয়ে রাখে।
বড় বেশি দেরি হওয়ার আগেই বুঝে নাও সোজা কথা ঃ
বিনা রণে কোনোদিন অচলা ছিল না স্বাধীনতা।

'স্বাধীনতা' এই শব্দ উচ্চারণে খই ফোটে মুখে।
বাস্তব কঠিন কিন্তু। এখানে স্পেনের বুকে
জিতছি না এ লড়াই
যতক্ষণ ছুনিয়ার সমস্ত শ্রমিক ভাই
উয়েস্কার মাঠে এসে সঙ্গে না দাঁড়ায়,
যতক্ষণ শহীদের রক্তের তর্পণে, সাম্য আর স্বাধীনতা চেয়ে,
উর্ধ্বে জয়দৃপ্ত লাল ঝাণ্ডা না ওড়ায়॥

মার্গট হেইনমানকে

রিক্ত-হৃদয় পৃথিবীর হৃদয়,
হৃদয় আমার !
তোমার ভাবনাই পাশতলায় ব্যথা হয়,
দৃষ্টিতে শীতার্তি ছায়ার।

বিকেলে শনশনিয়ে বাতাস বয়,
মনে পড়িয়ে দেয়—শরৎ কাছেই।
তোমাকে হারাই; সতত ভয়।
শঙ্কা আমার এই শঙ্কাকেই !

উয়েস্কা অভিমুখে এই যে শেষ মাইল,
শেষ যে ফাঁকটুকু আমাদের গরবে,
দরদী ধ্যানে তার-ই, প্রেয়সি, ভরো দিল
যেন গো পাশে পাই তোমাকে অনুভবে।

আর ভাগ্যের দোষে নেহাতই যদি
আধ-খোঁড়া কবরেই শুতে হয় আমাকে,
পারো তো ভালোই শুধু মনে রেখো নিরবধি,
ভুলো না আমার ভালোবাসাকে ॥

অনুবাদ : অমলেন্দু গুহ

ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের বীরদের প্রতি

মিগুয়েল হার্নান্দেজ

[ডলোরেস ইবারুরি তাঁর স্মৃতিকথায় মিগুয়েল হার্নান্দেজ সম্পর্কে লিখেছেন : "হার্নান্দেজ হলেন চারণ কবি, সৈনিক আর কমিউনিস্ট। ফ্যাসিস্টরা তাঁকে বন্দী করে এবং বন্দীশালাতেই হত্যা করে। ফিফথ রেজিমেণ্টের হয়ে যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। স্প্যানিশ রিপাবলিকের উদ্দেশে তিনি এই সময় রচনা করেন প্রায় এক হাজার কবিতা। ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের বীর যোদ্ধা, যাঁরা স্পেনের মুক্তির জন্যে যুদ্ধ করেছেন এবং প্রাণও দিয়েছেন—তাঁদের উদ্দেশে এই কবিতাটি রচিত এবং এই কবিতায় তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর আবেগ ও অনুভব।" কবিতাটি ইবারুরির স্মৃতিকথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।—সম্পাদক]

যদি এমন কোনো আত্মা থাকে যা পার হয়ে যায় সীমান্ত
যার বিস্তীর্ণ ভ্রূযুগলে ছায়া রাখে দুনিয়ার ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের টান
যার প্রসারিত দৃষ্টিতে ধরা দেয় দিগন্ত, জাহাজ আর গিরিমালা
আর বালি ও তুষার—তবে তোমরা, তোমরাই সেই মানুষ।

তোমাদের জন্মভূমি তোমাদের ডাক দিয়েছিল পতাকা তুলে
তোমাদের প্রাণবায়ু স্মৃতিস্তম্ভ দিয়ে পৃথিবীকে আশীর্বাদ ক'রে যাবে
ময়ালের রক্ততৃষ্ণা চিরকালের মতো ঘুচিয়ে দিতে এসেছিলে তোমরা
তাই সমস্ত সূর্য আর সহস্র সমুদ্রের অমিত বিক্রম নিয়ে
ঝাঁপ দিলে তার করাল চক্রের ওপর।

স্পেন তোমাদের বুকে ক'রে রাখে, কারণ তোমরাই দেখালে
মহাদেশকে পরিমাপ করতে পারে বৃক্ষের মতো শৌর্য
তোমাদের অস্থির ভিতর দিয়ে মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠবে অলিভ গাছ
আর মাটির ভিতর ক্রমাগত সঞ্চারিত করতে থাকবে দৃঢ়তম মূলগুলি
কারণ তোমরাই হলে মানুষের প্রতি অনুগত সার্বিক মানুষ।

অনুবাদঃ রাম বসু

কয়েকটা জিনিস বুঝিয়ে দিচ্ছি

পাবলো নেরুদা

তোমরা জানতে চাইবেঃ তো কোথায় সেই নীলগাছের ফুল?
আর আফিম ফুলে আবৃত নিগূঢ় তত্ত্ব?
আর অনেক সময় কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করা সেই বৃষ্টি
যে তার কথাগুলো কোটরে কোটরে আর পাখিতে পাখিতে
ভরিয়ে রাখত?

আমার যে কি হয়, দাঁড়াও, আমি তোমাদের বলছি।

আমি থাকতাম
মাদ্রিদের এক উপকণ্ঠে, যেখানে ঘণ্টা ছিল,
ঘড়ি ছিল, গাছ ছিল।

সেখান থেকে দেখা যেত
কাস্তিলার শুকনো মুখ
চামড়ার সমুদ্রের মতো।

আমার বাড়িটাকে বলা হত
ফুলবাড়ি, সব জায়গায় বকফুল
ফুটে থাকত ব'লেঃ বাড়িটা
বড় সুন্দর,
বাড়িময় কুকুর আর বাচ্চাকাচ্চা।

রাউল, তোর মনে পড়ে ?
তোর মনে পড়ে, রাফায়েল ?
ফেদেরিকো, তোর মনে পড়ে
মাটির তলা থেকে,
মনে পড়ে আমার বাড়িময় সেইসব অলিন্দ
যেখানে জুন মাসের আলোয় তোর হামুখের ফুলগুলো ডুবে যেত ?

ভাই, ও ভাই !

সব
দরাজ গলা, বেচাকেনার রসকষ,
বুকের মধ্যে হঁাচড়-পাঁচড়-করা রুটির তালগোল,
আমার আরওয়েলের সেই শহরতলির হাটে
মাছপট্টির মাঝখানে দোয়াতের মতো পাথরের মূর্তি
তেল পৌঁছুত গলায়,
হাত আর পায়ের
বিস্তর হট্টগোলে ভ'রে উঠত রাস্তা,
এইটুকু মাপে, এইটুকু ওজনে অসম্ভব তাৎপর্য পেত
জীবন,
গাদা করা মাছ,
নিস্তাপ সূর্য নিয়ে, ছাদগুলোর যে বুনট, তার মধ্যে
বাণমুখ ক্লান্তি ধরায়।
আলুর আত্মহারা চিকন গজদন্ত আভা,
আসমুদ্র টমেটোর পুনরাবৃত্তি।

একদিন সকালে কী হল, হঠাৎ সব কিছু লী লী ক'রে জ্ব'লে উঠল :
একদিন সকালে
টপাটপ জীবন গিলতে গিলতে
মাটি থেকে বেরিয়ে এল দাবানল,
আর তখন থেকে আগুন,
গুলিবারুদ সেই তখন থেকে,
আর তখন থেকে রক্ত।

উড়োজাহাজ আর মূরদের নিয়ে ডাকাতের দল
আংটি আর বেগমসাহেবাদের নিয়ে ডাকাতের দল,
আশীর্বাদকের ভূমিকায় কালো কাপড়ের সন্নাসীদের সঙ্গে নিয়ে ডাকাতের দল
আকাশ থেকে পড়ল শিশুদের খুন করার জন্যে
আর রাস্তায় রাস্তায় শিশুদের রক্ত
ব'য়ে গেল সরলভাবে, অবিকল শিশুদের রক্তের মতো।

শেয়ালগুলো, যাদের দেখে একটা শেয়ালও ঘৃণায় মুখ সরিয়ে নেবে,
নিরেটগুলো, যাদের শুঁটকো কন্টিকারিও মুখ থেকে থু ক'রে ফেলে দেবে,
কেউটেগুলো, যাদের দেখে কেউটেরাও নাক সিঁটকোবে!

তোমাদের সামনাসামনি আমি উঠে আসতে দেখেছি
স্পেনের রক্ত
গর্বের আর ছুরির একটি একক ঢেউয়ে
তোমাদের তলিয়ে দিতে।
জেনারেলের দল
বেইমানের দল ঃ
গ্যাখো আমার মৃত বাড়ি,
গ্যাখো স্পেন ভেঙে মিস্‌মার ঃ
তবু প্রত্যেকটা মৃত বাড়ি থেকে ধেয়ে আসছে জ্বলন্ত ধাতু
ফুলের বদলে,

স্পেনের প্রত্যেকটি ফোকর থেকে
ঝাঁপিয়ে পড়ছে স্পেন,
প্রত্যেকটি নিহত শিশুর কাছ থেকে এসে যাচ্ছে চোখ ফাটানো
একটি ক'রে বন্দুক।
প্রত্যেকটি পাপ থেকে জন্মাচ্ছে বুলেট
যা একদিন ঠাঁই খুঁজে নেবে
হৃৎপিণ্ডে।

তুমি কি জানতে কেন তার কোনো কবিতায়
ঘুণাক্ষরেও থাকে না
যেখানে সে দেখেছে সেই দেশের মৃত্তিকা আর পাতার কথা,
বিরাট বিরাট আগ্নেয়গিরির কথা ?

এসো খ্যাখো রক্ত রাস্তাময়,
এসো খ্যাখো
রক্ত রাস্তাময়।
এসো খ্যাখো রক্ত
রাস্তাময়॥

অনুবাদ ঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

* 'পাবলো নেরুদা-র কবিতাগুচ্ছ' থেকে। বানান ও যতিচিহ্নের ক্ষেত্রে 'পরিচয়'-এর নিয়ম অনুসৃত হয়েছে। কবিতাটি স্পেনের গৃহযুদ্ধকালে রচিত।
—সম্পাদক

আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের মাদ্রিদ-প্রবেশ উপলক্ষে

পাবলো নেরুদা

শীতের মাসের এক সকালবেলা,
কর্দমাক্ত, ধোঁয়ায় ধূসর এক যন্ত্রণাদায়ক মাস,
হাঁটুভাঙা একটা মাস, অবরোধ আর দুর্ভাগ্যে বিষণ্ণ মাসের এক সকালবেলা
যখন আমার বাড়ির আর্দ্র শার্সির ওধার থেকে
কানে আসছিল আফ্রিকার শিয়ালের হুক্কাহুয়া
শোনা যাচ্ছিল রাইফেল আর রক্তমাখা দন্তর তর্জন,
ঠিক তখনই—
যখন আশা বলতে ছিল আমাদের বারুদের স্বপ্নমাত্র, যখন ভাবছিলুম
দুনিয়াটা পূর্ণ কেবল নরখাদক রাক্ষস আর প্রতিহিংসার ডাকিনীতে,

ঠিক তখন মাদ্রিদের শীত-মাসের তুষার-অবরোধ ভেঙে, প্রত্যুষার কুয়াশায়
আমার এই দুটো চোখ দিয়েই দেখলুম, দেখলুম এই চক্ষুষ্মান হৃদয় মেলে,
আমি দেখলুম একনিষ্ঠরা এলো, এলো কৃশ আর কঠিন,
পরিণত আর প্রদীপ্ত পাথর-বাহিনীর দুর্ধর্ষ সৈন্য সব।

এ ছিল সেই দুঃসহ সময় যখন মেয়েরা
ভয়ঙ্কর জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো বুকে বইত বিরহ,
আর ইতিপূর্বে-গমের-ঐশ্বর্যে-সম্মানিত মাঠে মাঠে
মেদুর হয়ে থাকত স্পেনদেশী মৃত্যু,
অপর সকল মৃত্যুর চেয়ে সে ছিল বেশি কটু, বেশি তীব্র।
রাস্তায় রাস্তায় বাঁধভাঙা রক্ত মানুষের
মিশে থাকত বাড়িগুলোর বিচূর্ণ হৃদ্‌পিণ্ড থেকে উচ্ছ্বসিত জলস্রোতে ;
ছিন্নভিন্ন শিশুর দেহাস্থি, মায়েদের
শোকের বুকফাটা নৈঃশব্দ্য, নিরুপায়ের
চিরতরে মুদ্রিত চোখ,
ছিল বিষাদ আর বিয়োগের প্রতিমূর্তি,
নিষ্ঠীবন ত্যাগ-করা উদ্যান যেন,
চিরতরে খুন-হয়ে-যাওয়া আস্থা আর কুসুম যেন।

কমরেডসব,
ঠিক তখনই
দেখলুম তোমাদের,
আর সেই দৃশ্যে আমার চোখ আজও গর্বে-গৌরবে উজ্জীবিত
কারণ আমি দেখলুম কুয়াশা-ভোর মাড়িয়ে আসছ তোমরা
কাস্তিলের বিশুদ্ধ ললাটের দিকে
নিঃশব্দে, দৃঢ়পদে,
ভোরের আগমনী ঘণ্টাধ্বনির মতো,
দূর-দূরান্ত থেকে গাম্ভীর্যে পূর্ণ স্বপ্ননীল চোখ নিয়ে,
আসছ তোমাদের গৃহকোণ থেকে, দূরে-দূরে হারানো দেশ ছেড়ে,

ঘনীভূত মাধুর্য ও বন্দুকে আকীর্ণ স্বপ্ন থেকে
আসছ সেই স্পেনদেশী শহরে, কোণঠাসা স্বাধীনতা যেখানে
জন্তুর দাঁতে-নখে ভূপাতিত নিহত হবার মুখে।

ভাইসব, এখন থেকে
তোমাদের শুদ্ধতা, তোমাদের শক্তি, তোমাদের জমকালো ইতিহাস
জানা থাক শিশু আর যুবকের, বণিতা আর বৃদ্ধের,
বীতআশ যারা কানে পৌঁছুক তাদের, নেমে যাক
গন্ধক-বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন খনিতে,
আরোহণ করুক ক্রীতদাসের অমানুষিক সোপান বেয়ে,
যেন সকল নক্ষত্র, কাস্তিলের, পৃথিবীর সকল শস্যশিষ
লিখে রাখে তোমাদের নাম, তোমাদের প্রাণান্ত সংগ্রাম
ও প্রবল ও পার্থিব রক্তিম দেবদারুর মতো তোমাদের
জয়োপাখ্যান।
কারণ, তোমাদের আত্মত্যাগে পুনর্জন্ম ঘটিয়েছ তোমরা
বিনষ্ট বিশ্বাসের, অনুপস্থিত আত্মার, পৃথিবীতে আস্থার,
এবং তোমাদের প্রাণপ্রাচুর্যের, তোমাদের মহত্বের, তোমাদের শহীদদের
ওপর দিয়ে, যেন জমাট পাথুরে রক্তের উপত্যকা ছাপিয়ে
প্রবাহিত ইস্পাত ও আশার পারাবত-সংকুল এক মহতী নদী।

অনুবাদ ঃ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

* 'পাবলো নেরুদার কবিতা' থেকে। বানান ও যতিচিহ্নে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। —সম্পাদক

আমেরিকার জন্য গান

পল রোবসন

এই আমাদের দেশের প্রবল, এই আমাদের দেশের নবীন
এই আমাদের দেশের মহান গান এখনো হয় নি গাওয়া···
প্রতারণার ভিতর থেকে, কোলাহলের ভিতর থেকে
হত্যা এবং অত্যাচারের ভিতর থেকে
ফাঁপা কথার ভিতর থেকে, দেশোদ্গারের ভিতর থেকে
অনিশ্চয় আর দোলাচলের ভিতর থেকে···
জাগবে আবার গান।
জাগবে আবার সেই আমাদের অভিযানের গান,
প্রিয় স্বরের মতো সহজ, উপত্যকার মতো গভীর
পাহাড়চূড়ার মতো উঁচু এবং তাদের মতোই প্রবল
বানায় যারা সেই আমাদের গান!

অনুবাদ: শঙ্খ ঘোষ

* স্পেনের গৃহযুদ্ধকালে রচিত। রোবসন ফ্রণ্টে এই গান গেয়েছিলেন।
—সম্পাদক

অসউৎস

সালভাতোর কোয়াসিমোদো

ভিসতুলা থেকে দূর উত্তর সমতটে
মৃত্যুপুরী অসউৎস, ভালোবাসা, মরচে পড়া
খুঁটি আর কাঁটাতারের বেড়াজালে বর্ষার
জল, শবযাত্রার হিম।
না বৃক্ষ না পাখিরা ধূসর বাতাসে কিংবা

আমাদের কল্পনা ছাপিয়ে শুধু অবসন্ন
যন্ত্রণা স্মৃতি রেখেছে গচ্ছিত
নৈঃশব্দ্যে পরিহাস অথবা ক্রোধের স্বাক্ষরবিহীন।

গাথা বা এলেজি নয় কেবল খুঁজেছ
তোমরা জীবনের মর্ম, মনের সংঘর্ষে
পীড়িত, অনিশ্চিত
জীবনের স্বচ্ছ রূপায়ণে, কেননা
এখানে রয়েছে জীবন।
প্রত্যেক না যেন অবশ্যম্ভাবী ধারণ করছে জীবন।
এখানে আমরা শুনব দেবদূতের কান্না, দানব,
আগামীর বুকে স্পন্দমান
আমাদের ভবিষ্যৎ সময় রয়েছে এখানে
অনন্তে অসীমে, স্বপ্নের
প্রতীকে নয় অথবা উদ্বেল করুণায়।
আর এই তো আমাদের উপাখ্যান, আমাদের রূপান্তর।
কোনো প্রতীক অথবা ঈশ্বরের নামাঙ্কিত নয়;
এই হচ্ছে ইতিহাস, জগতের ভূখণ্ড
এই অসউৎস, ভালোবাসা।　কেমন দ্রুত
আলফিউস ও আরথুসার সুপ্রিয় শরীর
হয়ে ওঠে ছায়াচ্ছন্ন ধোঁয়া।

'শ্রমের মাধ্যমে মুক্তি' শুভ্র বাণী খচিত
নরক থেকে উঠছে
শত-সহস্র নারীর অন্তহীন ধোঁয়া প্রত্যুষে
কুঠুরি থেকে তাড়িত দণ্ডায়মান
মৃত্যু-দেয়ালে বন্দুকের নিশানা অথবা
গ্যাসে শ্বাসরুদ্ধ
অস্থিসার মুখে জলের জন্য করুণ চীৎকার।
সৈনিক, এখানে তুমি খুঁজে পাবে সব কিছু

তোমার ইতিহাসের মাঝে নদী ও পশুর গড়নে
অথবা তুমিও কি আজ
অসউৎসের ছাই, নৈঃশব্দ্যের পাকে?
কাঁচের পাত্রে এখনও রয়েছে দীঘল বিনুনি
মাধুর্যময় এবং
বালকের ভৌতিক জুতো ও ইহুদির
অগুনতি চাদর।
সেই প্রাজ্ঞ কালের স্বাক্ষর
মানুষের জ্ঞান যেখানে অস্ত্রের রূপ পেয়েছে।
আর এই তো আমাদের উপাখ্যান, আমাদের রূপান্তর।
সমতট জুড়ে যেখানে ভালোবাসা দুঃখ
করুণার বিনাশ সেখানে বৃষ্টিধারায়
আমাদের মাঝে স্পন্দিত এক না
অসউৎসে নিহত মৃত্যুর প্রতি না
এই ছাই-গহ্বর থেকে যেন কখনো নয়
মৃত্যুর পুনরুত্থান।

অনুবাদ: মফিদুল হক

* বাঙলাদেশ, ঢাকার 'গণসাহিত্য' পত্রিকা (মে ১৯৭৫ সংখ্যা) থেকে পুনর্মুদ্রিত। বানান ও যতিচিহ্নে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

নভেম্বরের এগারো

হো চি মিন

॥ ১ ॥

সেদিন দেখেছি নভেম্বরের এগারোয়
সারা ইয়োরোপে অস্ত্র-মোচন উৎসব-সমাবেশ,
আজ দেখি, নাঙা ফ্যাসিস্ত স্বৈরাচারে
শোণিতরঙ্গে ভাসে প্রতি মহাদেশ।

॥ ২ ॥

আধযুগ গেল, দাঁতে দাঁত চীন লড়ছে
সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে তার ত্যাগদের গল্প ;
সে জানে—যদিও বেশি দূর নয় জয়,
তবু চাই আরও মেহন্নত ও রক্ত।

॥ ৩ ॥

খুদে মাঝারি বিশাল
এশিয়াময় উড়ছে হরেক জাপ-বিরোধী ঝাণ্ডা।
ঢাউস মাপের নিশান সে তো শক্তই,
ছোট্টগুলোও অবশ্য চাই—
সেগুলো নয় কম-জোরি, কম-পোক্ত।

অনুবাদ ঃ অমিতাভ দাশগুপ্ত

দিন আসবে

নিকোলা ভাপ্‌ৎসারভ

[বুলগেরিয়ার আজীবন সংগ্রামী কবি ও কমিউনিস্ট নিকোলা ভাপ্‌ৎসারভ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাঁর দেশের ভাগ্যবিপর্যয়ের পর প্রতিরোধ-আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসেবে গ্রেপ্তার হন। বুলগেরিয়ার তৎকালীন ফ্যাসিস্ট সরকার তাঁর ওপর অমানুষিক নির্যাতন করে। ১৯৪২ সালের ২৩ জুলাই মাত্র তেত্রিশ বছর বয়েসে স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের আদর্শে অবিচল ভাপ্‌ৎসারভ ফাঁসির মঞ্চে আক্ষরিক অর্থেই হাসিমুখে আত্মাহুতি দেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনুবাদিত তাঁর জগদ্বিখ্যাত দীর্ঘ কবিতা 'দিন আসবে'র একটি ছোট্ট অংশ এখানে পুনর্মুদ্রিত করা হল। বানান ও যতিচিহ্নের ক্ষেত্রে 'পরিচয়'-এর নিয়ম অনুসৃত হয়েছে।—সম্পাদক]

এই আমি—
এই নিই হাওয়ায় নিশ্বাস,

কাজ করি,
প্রাণের প্রাচুর্যে থাকি বেঁচে,
(নিজেকে নিঃশেষে ঢেলে)
আমার কবিতা যাই লিখে।
চোখ রাখে কটাক্ষ আমার।
আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে
জীবনের সঙ্গে আমি যুঝি।
জীবনের সঙ্গে থাক যতই বিবাদ—
ভুলেও ভেব না
আমি করি জীবনকে ঘৃণা।
বরং উলটোটা সত্য—
ম'রে যাই সেও ভালো
তবু চাইব
জীবনের বাঘনখ
আমাকে জড়াক বাহুডোরে!
যদি কোনোদিন
আমাকে ফাঁসির মঞ্চে তুলে
গলায় দড়ির ফাঁস পরাতে পরাতে
জল্লাদেরা বলেঃ
"প্রাণে যদি শখ থাকে আরও এক ঘণ্টা বাঁচতে পারো।"
তক্ষুনি চীৎকার ক'রে ব'লে উঠব ঃ
'খুলে দাও,
খুলে দাও শয়তান কাঁহাকা!
ছুটে এসো—
খুলে দাও দড়ি।'
জীবনের জন্যে যদি হয়—
আমাকে যে-কাজ দেবে
নেবো মাথা পেতে
আকাশে পরীক্ষা নেবো প্রাণ হাতে ক'রে বিমান যন্ত্রের।

অনুবাদ ঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ফ্যাসিবিরোধী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে-অভিজ্ঞতা ভুলবার নয়

বিদ্যা মুন্সী

মিউনিক চুক্তির বড়জোর এক মাস আগে, ১৯৩৮-এর আগস্ট মাসে, ছাত্র হিসেবে আমি ইংলণ্ডে পৌঁছলাম। সাধারণ ইংরেজ নাগরিকেরা তখন পরস্পরকে এই বলে আশ্বাস দিচ্ছেন যে "এদেশে ঐসব কিছুই ঘটতে পারে না।" 'ঐসব' মানে ফ্যাসিবাদ—যা তখন ইতালি, জার্মানি ও জাপানে পোক্ত ভাবে গেড়ে বসেছে এবং ইয়োরোপের সমস্ত দেশের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে তুলেছে। জাপান ইতিমধ্যেই মাঞ্চুরিয়া দখল করেছে, ইতালির দস্যু-অভিযান গ্রাস করেছে আবিসিনিয়াকে, হিটলারের বাহিনী জবরদখল করেছে প্রথমে রাইনল্যাণ্ডের নিরস্ত্রীকৃত অঞ্চল ও পরে অষ্ট্রিয়া। আর, এসবই সম্ভব হয়েছে ইংলণ্ড ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকচক্রের গোপন এবং কখনও কখনও প্রকাশ্য সমর্থনের ফলেই। এই শাসকচক্রদের মনে আশা: হিটলার তার বড় বড় কামানগুলি পশ্চিমী রাষ্ট্রদের বিরুদ্ধে নয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধেই শেষ পর্যন্ত ঘুরিয়ে ধরবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মঞ্চে একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ও যৌথনিরাপত্তার সপক্ষে দৃঢ়ভাবে বক্তব্য রাখছিল।

হিটলার ও মুসোলিনি ইতিমধ্যেই স্পেনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া শুরু করে দিয়েছিল। পৃথিবীর প্রগতিশীল যুবসমাজের সেরা অংশ স্পেনীয় প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করার সংগ্রামে অকাতরে রক্ত ঢালছিল। স্পেনের গৃহযুদ্ধে অবশ্য ততদিনে প্রজাতন্ত্রের পরাজয় সুনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল। পীরিনিজ পর্বতমালা ডিঙিয়ে হাজার হাজার শরণার্থী স্পেন থেকে ফ্রান্সে পালিয়ে আসছিল, সেখান থেকে ইংলণ্ডে বা লাতিন আমেরিকাতে। আমার মনে পড়ছে যে আমি লণ্ডনে পৌঁছনোর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই স্পেনের শরণার্থীদের জন্য সাহায্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক আসরে পল রোবসন গাইলেন কৃষ্ণকায় মানুষদের ও স্পেনের প্রতিরোধ সংগ্রামের অনেকগুলি গান।

চারদিকে তখন যে মন্তব্য শোনা যেত তা এই: "দেখবেন, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হবে না। কোনোও না কোনো উপায়ে ওরা যুদ্ধ এড়াবেই।" বড় বড়

ধনকুবেরগোষ্ঠীর বহুল প্রচারিত খবরের কাগজগুলি সযত্নে এই আত্মসন্তুষ্টির মনোভাবকে গড়ে তুলছিল। দৈনিক পত্রিকাসমূহের মধ্যে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'ডেইলি ওয়ার্কার'ই বোমারু বিমানের সম্ভাব্য আক্রমণ ও যথোপযুক্ত আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অধ্যাপক জে. বি. এস. হলডেনের প্রবন্ধ ছেপে যাচ্ছিল। রক্ষণশীল সংবাদপত্রগুলি তখন সোল্লাসে খবর দিচ্ছিল যে অভিজাত ক্লাইভডেন পরিবার হিটলারের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা জার্মানির 'নতুন সমাজ'-এর প্রশংসায় কেমন ভোজসভার ব্যবস্থা করছেন।

হঠাৎ, ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগ থেকে চেকোস্লোভাক সীমান্তের স্বদেতেন অঞ্চলে জার্মান সংখ্যালঘু জনতার উপর চেকদের অত্যাচারের কল্পিত বর্ণনা দিয়ে হিটলার চেকোস্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে উন্মত্ত বিষোদ্গার শুরু করে দিল। সরকারের প্রচারদপ্তর ও সংবাদপত্রগুলি আসন্ন আক্রমণ সম্বন্ধে আতঙ্ক ছড়াতে লাগল। ইংরেজ জনসাধারণকে গ্যাস-মুখোশের জন্য লাইন করার নির্দেশ দেওয়া হল। স্ত্রী-পুরুষ স্বেচ্ছাসেবকদের কোদাল দেওয়া হল লণ্ডনের পার্কগুলিতে পরিখা খনন করার জন্য। এই সমস্ত ডামাডোলের মধ্যে ২৯ সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন বিমানযোগে মিউনিকে গেলেন, ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ের এবং হিটলার ও মুসোলিনির সঙ্গে শলাপরামর্শের পর বেইমানের চুক্তি স্বাক্ষর করে। চেকোস্লোভাকিয়াকে তিনি দাসত্বের কবলে বিক্রি করে দিলেন। পাশের ঘরে নতমস্তকে অপেক্ষমান রইলেন চেকোস্লোভাক সরকারের নেতারা—তাঁদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হল না। দু-তিন দিন পর চেম্বারলেন লণ্ডনে ফিরে এলেন। বিমানবন্দরে নামলেন, এক টুকরো কাগজ নাড়তে নাড়তে ঘোষণা করলেন : "এ যুগের জন্য শান্তি রক্ষা করেছি।" সবাই স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এইভাবে অস্বাভাবিক আতঙ্ক সৃষ্টি না করলে, এত বড় বিশ্বাসঘাতকতাকে জনসাধারণকে দিয়ে বেমালুম হজম করানো সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।

কিন্তু "আমাদের যুগের জন্য শান্তি" রক্ষা পেল না। পুরো এক বছর কাটবার আগেই, ১৯৩৯-এর ১ সেপ্টেম্বর, হিটলারের সৈন্যবাহিনী আবার অভিযান শুরু করল—এবার পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। পশ্চিমী শক্তিবর্গের সমস্ত ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করল না। পশ্চিমী ষড়যন্ত্র টের পেয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সই করে নিজের সীমান্তকে রক্ষা করল। শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

যুদ্ধের প্রথম কয়েকমাসকে ইংলণ্ডের জনতা বলত "ভূতুড়ে যুদ্ধ"। ম্যাজিনো লাইনের দুধারে ফরাসী ও জার্মান সেনাবাহিনী মুখোমুখি বসে থাকত, গোলা-গুলি খুব কমই ছোঁড়া হত। ইংলণ্ডের রক্ষণশীল কাগজগুলি কুৎসা রটনা করত যে সোভিয়েত ইউনিয়নের যেসব ট্যাঙ্ক ফিনল্যাণ্ডে লড়াই করছে, সেগুলি পিচ-বোর্ডে তৈরি। ইংলণ্ডের ফ্যাসিস্ট দলের নেতা ওসওয়াল্ড মস্‌লী তার কালো-কুর্তা সমর্থকদের নিয়ে প্রকাশ্যে লণ্ডনে সভা করত, নাৎসি দলের স্বস্তিকা-চিহ্নিত পতাকা উড়োত, আর বিশ্বের সমস্ত গণ্ডগোলের জন্য ইহুদিদের গালমন্দ করত। পরবর্তীকালে প্রকাশিত দলিলপত্র থেকে জানা গেছে যে কিভাবে এই যুগে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকেরা তখনও চেষ্টা করছিল যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হিটলারের সঙ্গে চুক্তি করা যায়। কিন্তু জনসাধারণের মেজাজ ক্রমেই গরম হয়ে উঠছিল। কয়েকমাস পরই নাৎসি ফৌজ সদম্ভে ঢুকে পড়ল প্রথমে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়মে, পরে ফ্রান্সে। চেম্বারলেনকে সরে পড়তে হল, তাঁর জায়গায় এলেন উইনস্টন চার্চিল। ১৯৪০-এর জুনে ফরাসী সরকার পারী শহরে আত্মসমর্পণ করল, আর মার্শাল পেতাঁার নেতৃত্বে ভিশি শহরে এক তাঁবেদার সরকার তৈরি হল তথাকথিত অনধিকৃত ফ্রান্সে। পশ্চিম ইয়োরোপে এই বিপর্যয়ের পর ইংরেজ সেনাদলের যা অবশিষ্ট রইল, তাদের ডানকার্ক থেকে অপসারণ করা হল—ইতিহাসের সে এক মর্মান্তিক কিন্তু বীরত্বপূর্ণ অধ্যায়। "ভূতুড়ে যুদ্ধ" ভয়ঙ্কর ভাবে জীবন্ত ও বাস্তব হয়ে উঠল।

কমিউনিস্টরাই ছিল প্রতিরোধ সংগ্রামের সবার সামনের সারিতে। অনেকে বলবার চেষ্টা করেছেন যে ফ্রান্সে এবং ইয়োরোপের অন্য বহু দেশে কমিউনিস্টরা নাৎসিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ততদিন কোনোও উৎসাহ দেখান নি, যতদিন না হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করেছে। বাস্তব ঘটনাবলী কিন্তু অন্য কথা বলে। জার্মান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অতীতে যেমন ১৭৯২-এ জ্যাকোবিনরা এবং ১৮৭১-এ কম্যুনপন্থীরা পারী নগরীকে শত্রু ও দেশদ্রোহী শাসকদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রুখে দাঁড়িয়েছিল, এবারও পারী নগরী ও শহরতলীর শ্রমজীবী জনতাই প্রথম দিন থেকে দখলকারী নাৎসি ফৌজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করেছিল। দু-মাসের মধ্যেই, ১৯৪০-এর আগস্টে, 'লুমানিতে'র বে-আইনী সংখ্যাগুলি নিয়মিত ছেপে বেরতে শুরু করল আর ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রসিদ্ধ

'ফ্রান্সের জনগণের প্রতি আহ্বান' গোপনে ছাপা হয়ে সারা ফ্রান্সে অগণিত গোপন প্রতিরোধ-গোষ্ঠীর হাতে হাতে ঘুরতে লাগল।

১৯৪০-এর ৫ অক্টোবর গেস্টাপোর নির্দেশে পার্লামেন্টের দুজন সদস্য গেব্রিয়েল পেরি ও খনিশ্রমিক নেতা টিম্বো সহ ৩০০ জন কমিউনিস্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল এবং একবছর পরে এঁদের মধ্যে অনেককেই শাতুরব্রিয়াঁতে গুলি করে হত্যা করা হল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধবিরতির দিন, ১১ নভেম্বর, পারীর ছাত্ররা বিজয়স্তম্ভের কাছে অজানা সৈনিকের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে মিছিল বের করল। নাৎসিরা সেদিন বহু ছাত্রকে গুলি করে হত্যা করল, আহত হল শতাধিক, গ্রেফতার হল আরও অনেকে। বিশ্ববিদ্যালয় এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল। শহরতলীর শ্রমিকদের সঙ্গে এইভাবে রক্তের রাখীবন্ধনে বাঁধা পড়ল ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীরাও।

পারীর শ্রমিকদের প্রদর্শিত পথে শীঘ্রই পা বাড়াল অন্যান্য অঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণী। ১৯৪১-এর মে মাসে ক্যালে বন্দরের শ্রমিকরা অধিক খাদ্য-রেশনের দাবিতে দীর্ঘদিন ধর্মঘট করল। নাৎসিরা নিদারুণ দমননীতি শুরু করল। সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের গ্রেফতার করা হল, হত্যা করা হল কমিউনিস্ট পৌরপিতাদের। যারা পালাতে পারল—তারাই অস্ত্র ধরল, গড়ে তুলল গেরিলা বাহিনী।

একই অবস্থা দাঁড়াল চেকোস্লোভাকিয়াতেও। সেখানে ১৯৩৬-এ নির্বাচিত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ৫০ জনের মধ্যে ১৮ জনকে নাৎসিরা গুলি করে হত্যা করল। আর ১৬ জন মারা গেল নাৎসি বন্দীশিবিরে। মাত্র ৪ জন দেশের বাইরে চলে যেতে সক্ষম হয়েছিল। পার্টির ২৫০০০ সদস্য নাৎসি জহ্লাদদের হাতে প্রাণ হারিয়েছিল, বন্দীশিবিরে আটকে ছিল আরও ৫০ হাজার। অন্যান্য নাৎসি-অধিকৃত দেশেও একই অবস্থা ছিল।

আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ঐক্য

কিন্তু প্রতিরোধ সংগ্রামে কমিউনিস্টরা বা শ্রমিকরা একা ছিল না। নাৎসিরা বেপরোয়াভাবে বিভিন্ন দেশ ও জনসাধারণের সমস্ত অংশের উপরই হামলা চালিয়েছিল। তারা যে নারকীয় বর্বরতা সংঘটিত করেছিল, যুদ্ধের ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। সৈন্যই হোক আর বে-সামরিক অধিবাসীই হোক, নরনারীশিশুবৃদ্ধ যাই হোক শ্রমিক হোক, বা বুদ্ধিজীবী হোক, কমিউনিস্ট

বা নাস্তিক হোক অথবা ক্যাথলিক পাদ্রীই হোক—সর্বশক্তিমান গেস্টাপোর হাত থেকে কারুরই নিস্তার ছিল না। সবারই ভাগ্যে জুটেছিল বন্দীশিবির বা বীভৎস অত্যাচার।

যুদ্ধাবসানের আগে পর্যন্ত অধিকৃত দেশসমূহে নাৎসি অত্যাচারের ভয়াবহতার পরিপূর্ণ চিত্র সর্বসমক্ষে যথাযথভাবে উদ্ঘাটিত হয় নি। প্রথম বিশ্ব-যুব-উৎসবের প্রস্তুতি কমিটির সদস্য রূপে ১৯৪৭-এ আমি কয়েকমাস প্রাগ শহরে ছিলাম। তখনই আমার লিদিৎসে গ্রামটি দেখার সৌভাগ্য (বা দুর্ভাগ্য) হয়েছিল—খনি-শ্রমিকদের যে ছোট্ট গ্রামটিকে হিটলার মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিল। ঐ গ্রামের সমস্ত পুরুষ অধিবাসীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। মেয়েদের সবাইকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল বন্দীশিবিরে, আর বাচ্চাদের চাকরের কাজ দিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল জার্মানির কোণে কোণে—যাতে ঐ সব শিশু ভুলে যায় তাদের মাতৃভাষা, ভুলে যায় যে তাদের বাপ-মা কারা ছিল। প্রথম যুব-উৎসবে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা সবাই হাত লাগিয়েছিলেন লিদিৎসের পুনর্গঠনে। কিন্তু শুধু লিদিৎসেই ইয়োরোপের একমাত্র শহীদ-পল্লী নয়। ফ্রান্সে এই ধরনের গ্রাম ছিল ওরাদোর, ইয়োরোপের অন্যান্য দেশেও ছিল এমনি ধরনের বহু গ্রাম। আর সোভিয়েতভূমিতে যে সমস্ত গ্রাম ও শহরকে নাৎসিরা ধ্বংস করেছিল, তার তালিকা এত দীর্ঘ হবে যে পাতায় কুলনো যাবে না।

যুদ্ধাবসানের বহু পরে ১৯৫৫তে আমি আউশউইৎস দেখতে যাই—পোল্যাণ্ডের মাটিতে গড়া সেই কুখ্যাত বন্দীশিবির যেখানে লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে—কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রী, উদারপন্থী, ইহুদি, প্রোটেস্টাণ্ট ও ক্যাথলিক—গ্যাসচুল্লিতে পুড়িয়ে মারা হয় বা নাৎসি নরপিশাচ চিকিৎসকরা তাদের বীজানু-যুদ্ধের অস্ত্র তৈরির জীবন্ত গিনিপিগ হিসেবে তিলে তিলে হত্যা করে। আউশউইৎসের প্রদর্শনী-ঘরে রাখা আছে নারকীয় হত্যার ফটোগ্রাফ, চিঠিপত্র, কাপড়চোপড়, জুতো, বহু বস্তা ভর্তি মাথার চুল (যা দিয়ে কম্বল তৈরি করা হত), মানুষের চামড়া দিয়ে তৈরি বাতি-ঢাকা ইত্যাদি।

ইংলণ্ডে থাকার সময় আমরা বেতার-প্রচার ও খবরের কাগজ মারফৎ এই সব নারকীয় অত্যাচারের কিছু বিবরণী জানতে পেরেছিলাম। তবে পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারি নি। কিন্তু নাৎসি-অধিকৃত ইয়োরোপের লক্ষ লক্ষ নরনারীর কাছে এগুলি ছিল মর্মন্তুদ বাস্তব, যা প্রতিদিন ঘটেছিল।

এই ভয়াবহ বর্বরতার সামনে দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকার জন্যই তাদের লড়তে হয়েছিল, আর সফলভাবে লড়বার জন্যই সমস্ত সংগ্রামী মানুষকে একজোটও হতে হয়েছিল। নাৎসি আক্রমণের সর্বব্যাপী ভয়াবহতাই প্রতিরোধ সংগ্রামে সর্বাত্মক ঐক্যের জন্ম দিয়েছিল।'

ইংলণ্ড রক্ষার লড়াই

ডানকার্ক থেকে পশ্চাদপসরণ ইংলণ্ডে জার্মান আক্রমণের সম্ভাবনাকে বাস্তব করে তুলেছিল। ঝাঁকে ঝাঁকে নাৎসি বোমারু বিমান প্রতি রাতে প্রায় অরক্ষিত লণ্ডন শহরে হাজার হাজার বোমা ফেলে বাড়িঘর, কারখানা, হাসপাতাল, গির্জা প্রভৃতি চূর্ণবিচূর্ণ করতে লাগল। ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের দূরে সরিয়ে নেওয়া হল। বড়লোক নাগরিকরা গ্রামাঞ্চলে নিজেদের বাগানবাড়িতে চলে গেলেন, এমন কি কেউ কেউ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও আশ্রয় নিলেন। কিন্তু বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ দাঁতে দাঁত চেপে, মাটি কামড়ে পড়ে রইল নিজ নিজ কর্মস্থলেই। মাসের পর মাস প্রতি রাতে ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক রাত নটায় বোমাবর্ষণ শুরু হত, আর ভোর পর্যন্ত চলত। লক্ষ লক্ষ লণ্ডনবাসী অভ্যস্ত হয়ে গেল এক বিচিত্র জীবনযাত্রায়—সারাদিন তারা যথারীতি কাজ করত, তাড়াতাড়ি সান্ধ্য-আহার সেরে নিত এবং তারপর সপরিবারে বিছানাপত্রসহ আশ্রয় নিত নিকটবর্তী মাটির নিচের রেলস্টেশনে। সেগুলিই ছিল বোমারু বিমান আক্রমণ থেকে রেহাই পাবার সেরা আশ্রয়। দিন যত কাটতে লাগল আর বিমান আক্রমণ যত অব্যাহত থাকল, তত এই সব আশ্রয়কেন্দ্রে জীবনযাত্রাও সংগঠিত রূপ নিতে লাগল। ক্যান্টিন গড়ে উঠল, প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপিত হল, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীরা গান-বাজনার ব্যবস্থাও চালু করল। বুড়োবুড়ি এবং অসুস্থ লোকদের জন্য খাটিয়ার ব্যবস্থাও হল। প্রতিদিন ভোরে বোমারু বিমান ফিরে গেলে যখন বিপদ-মুক্তির সাইরেন-ধ্বনি বাজত, তখন আশ্রয় থেকে উপরে উঠে একদল মানুষ দেখতে পেতেন যে তাঁদের বাড়িটা আর নেই। অনেক পরে ইংলণ্ড তার বিমানের ঘাটতি পুরোতে পারল এবং নাৎসি জার্মানির উপর প্রতিশোধাত্মক বোমাবর্ষণ শুরু করতে সক্ষম হল।

ইংলণ্ডে শুধুমাত্র লণ্ডনই বোমায় বিধ্বস্ত হয়েছিল, তা নয়। তার চেয়ে ছোটো বহু শিল্পকেন্দ্রও—যেমন ম্যাঞ্চেস্টার, কভেন্ট্রি ইত্যাদিও—ক্রমাগত বোমাবর্ষণে

একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। সেখানেও হতাহত হয়েছিল হাজার হাজার বেসামরিক অধিবাসী। কিন্তু এইসব শহরে বোমারু বিমানের আক্রমণ মাত্র কয়েকদিন ধরে হয়েছিল। লণ্ডনের মতো মাসের পর মাস বোমারু বিমান-আক্রমণ তাদের সহ্য করতে হয় নি।

আমি তখন ছিলাম নিউকাসল-অন-টাইন শহরে, ডাক্তারি পড়ছিলাম। আশ্চর্যর কথা এই যে, ঐ শহরটিতে বোমা আদৌ পড়ে নি, যদিও ভিকার্স-আর্মস্ট্রংদের বিশাল অস্ত্র তৈরির কারখানা টাইন নদীর উপর প্রায় এক মাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত ছিল। বোমাবর্ষণের পক্ষে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। বাজারে জোর গুজব ছিল যে এর উপর বোমা বর্ষিত হয় নি, কারণ নাৎসি নায়ক গোয়েরিং এই কারখানার আংশিক মালিক ছিল। পরে আমি জানতে পারি যে নাৎসি জার্মানিতেও এই ধরনের কয়েকটি বড় বড় অস্ত্র তৈরির কারখানা ছিল, যেগুলিকে মার্কিন ও ব্রিটিশ বোমারু বিমানবহর রেহাই দিয়েছিল। একেই বলে মাল্টি-ন্যাশনাল কর্পোরেশনের হাতযশ!

যুদ্ধের সময় শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছিল

আধুনিক ধনবাদী সভ্যতার অন্তর্দ্বন্দ্বের একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা গেল যুদ্ধকালীন ইংলণ্ডে। যুদ্ধের কষ্ট ও জিনিসপত্রের অভাব সত্ত্বেও ইংলণ্ডের শ্রমিকশ্রেণী বহু বছরের তুলনায় অনেক উন্নত জীবনযাপন করছিল।

যখন ১৯৪০-এ আমি নিউকাসলে প্রথম গেলাম, তখনও সেখানে ত্রিশের দশকের অর্থনৈতিক সংকটের গভীর ছাপ স্পষ্ট দেখা যেত। নিউকাসল ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলি একান্তভাবেই নির্ভর করত কয়লাশিল্পের উপর, আর ১৯২৯-এর বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটে সবচেয়ে বেশি মার খেয়েছিল কয়লাখনি ও কয়লাশিল্প। ফলে লক্ষ লক্ষ লোক বছরের পর বছর বেকার ছিল। তার ছাপ দেখেছি ঘিঞ্জি নোংরা বস্তিগুলিতে, বয়স্ক নরনারীর অনশনক্লিষ্ট চোখেমুখে, পুষ্টিকর খাদ্য না পেয়ে কম বয়সে বুড়িয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের ভগ্নস্বাস্থ্য চেহারায়। যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে সবার জীবনে এল আবার চাকরি। পুরুষেরা গেল সৈনিক হয়ে রণক্ষেত্রে, আর ৪৫ বছর বয়স অবধি মেয়েদের বাধ্যতামূলকভাবে শ্রমিকের কাজ দেওয়া হল। মায়েরা যাতে চাকরি করতে পারে, সেই কারণে বাচ্চাদের জন্য শিশুসদন ও স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করা হল। সারা শহর ও কারখানাগুলি ছেয়ে গেল

ক্যান্টিন ও খাবারের দোকানে, যেখানে সরকারী ভরতুকির সাহায্যে শস্তা দামে পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা হল। মাংস, ডিম, মাখন, চিনি প্রভৃতি কঠোর-ভাবে রেশন করে দেওয়া হল। এমন কি আমেরিকানদের কাছ থেকে পাওয়া টিনের খাবার, গুঁড়ো ডিম, জ্যাম বা চকোলেট পর্যন্ত কিনতে গেলে কুপন দেখাতে হত। পুষ্টিকর খাদ্যবিশারদ স্যার জন বয়েড অর—যুদ্ধের পর যিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষিসংস্থার প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হয়েছিলেন—যুদ্ধের সময় নিউকাসলে ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের উপর এক তদন্ত পরিচালনা করেন। তাতে দেখা যায় যে ঐ অঞ্চলের শ্রমজীবী ছেলেমেয়েদের দৈর্ঘ্য ও ওজন যুদ্ধের আগের যুগের তুলনায় যথেষ্ট বেড়েছে।

সোভিয়েত প্রতিরোধের বিস্ময়কর কাহিনী

কিন্তু তা অনেক পরের কথা। ইতিমধ্যে ১৯৪১-এর ২২-এ জুন হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করল। আমার স্পষ্ট মনে আছে সেইদিনই বিকেলে নিউকাসলের বড়রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ পথসভায় বক্তৃতা করেন ইংলণ্ডের কমিউনিস্ট নেতা জন গোলান—তখন তিনি ঐ জেলার পার্টি সম্পাদক। তিনি বলেন আজ নাৎসি জার্মানি নিজের উপর মৃত্যু-পরোয়ানা জারী করল।

প্রথমে উক্রেইন ও পরে রাশিয়ার প্রান্তর দিয়ে যখন জার্মান সেনাদল এগোতে লাগল, তখন ধনবাদী দৈনিক পত্রিকার নৈরাশ্যবাদী ভাষ্যকাররা চীৎকার আরম্ভ করল যে এই হামলার বিরুদ্ধে লালফৌজ কয়েক মাসের বেশি টিকবে না, শীতের মধ্যেই সব খতম হয়ে যাবে। শীত এল, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিরোধে অটল রইল। হিটলারের যন্ত্রদানব ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়িগুলি মস্কোর সন্নিকটে, লেনিনগ্রাদের উপকণ্ঠে—সর্বত্রই—প্রতিহত হল। তারপর তারা পিছু হটতে শুরু করল। ১৯৪৩-এর শুরুতে এল স্তালিনগ্রাদের শৌর্যমণ্ডিত বিজয়বার্তা—বদলে দিল সমগ্র বিশ্বযুদ্ধের গতি ও প্রকৃতিকেই।

সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে ইয়োরোপের কোণে কোণে লক্ষ লক্ষ নরনারী রুদ্ধনিশ্বাসে সোভিয়েতভূমিতে যুদ্ধের জোয়ারভাঁটাকে দেখছিল, যেন তাদের সবাইকার জীবনমরণ ঐ যুদ্ধের উপরই নির্ভর করছে। ঘটনাও সত্যই ছিল সেইরকমই। নিউকাসলের ওয়াই. ডাব্লু. সি. এ. ছাত্রাবাসে ৫০ জন ইংরেজ মেয়ের মধ্যে আমি ছিলাম একমাত্র বিদেশিনী। আমার সঙ্গিনীদের প্রত্যেকেরই

কোনো না কোনো প্রিয়জন ছিল সেনাদলে—কারুর স্বামী লড়ছিল এল আলামাইনে, কারুর ভাই ছিল বর্মা কি মালয়ে, কারুর প্রিয়তম বোমারু বিমান নিয়ে রোজ যাচ্ছিল জার্মানি অভিমুখে। সে যুগে ট্রান্সিস্টর ছিল না এবং হোস্টেলে কাউকে ব্যক্তিগতভাবে রেডিও রাখতে দেওয়া হত না। ফলে বসবার ঘরে—যেখানে হোস্টেলের রেডিওটা থাকত—সব সময়ই ভীড় থাকত, আর সোভিয়েত রণাঙ্গনের খবর কেউ কোনও দিন শুনতে ভুল করত না। অধিকৃত ইয়োরোপে অগণিত নরনারী জীবন বিপন্ন করেও এই সব খবর প্রচার শুনত।

স্তালিনগ্রাদের বিজয়ের পর ইংলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জ স্তালিনগ্রাদের রক্ষাকর্তা বীরদের ইংলণ্ডের জনগণের তরফ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে চমৎকার কারিগরি কাজ করা একটা বিরাট তলোয়ার উপহার পাঠালেন। পাঠানোর আগে লোককে দেখানোর জন্য তলোয়ারটি ইংলণ্ডের বড় বড় শহরে প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শিত হল। লক্ষ লক্ষ লোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন দিয়ে তলোয়ারটি দেখেছিল ও এইভাবে সোভিয়েত জনগণের প্রতি ইংরেজ জনগণের গভীর শ্রদ্ধা ও বন্ধুতা প্রকাশ করেছিল। সমগ্র গ্রেট ব্রিটেন জুড়ে জন্মগ্রহণ করল অগণিত ব্রিটেন-সোভিয়েত মৈত্রীসঙ্ঘ। স্তালিনগ্রাদের বিজয়ের পর পশ্চিম রণাঙ্গনে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার দাবি ইংলণ্ডে দুর্বার হয়ে উঠল।

শুধু কমিউনিস্টরা বা শ্রমিক নেতারাই নন, ডি. এন. প্রিট বা স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের মতো জননায়ক থেকে শুরু করে অভিনয়-জগতের সেরা লরেন্স অলিভিয়ার, সীবিল থর্নডাইক বা মাইকেল রেডগ্রেভের মতো লোকেরাও এই আন্দোলনে সামিল হয়ে বিশাল বিশাল জনসভায় বক্তৃতা করলেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত সব কিছুই তখন বিপুল সাড়া জাগাত। আমার মনে পড়ছে যে 'চের্নিশেভস্কি' (উনিশ শতকের রুশদেশের প্রসিদ্ধ প্রগতিশীল লেখক) নামে একটি সোভিয়েত বাণিজ্যতরী এসেছিল। নিউকাসল বন্দরে এটিই প্রথম সোভিয়েত জাহাজ। স্থানীয় দৈনিকে জাহাজটির প্রথম অফিসারের ছবি ছাপা হল—অফিসারটি একজন মেয়ে। ইংলণ্ডে এটা অভূতপূর্ব ঘটনা। আমার যতদূর মনে পড়ছে, ১৯৪৩-এই সর্বপ্রথম এক যুব-প্রতিনিধিদল ইংলণ্ডে এল ও প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রগুলিতে গেল। তারপর তারা চলে যায় কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমন্ত্রিত হয়ে। সেই প্রতিনিধিদলের তিনজন সদস্যের মধ্যে একজন ছিল মেয়ে গেরিলা,

দক্ষ বন্দুকধারী। সে ইতিমধ্যেই ছয়শতাধিক নাৎসিকে খতম করেছিল। এই প্রথম আমি, পরাধীন ভারতবর্ষের এক ছাত্রী, একজন সোভিয়েত মেয়েকে সামনাসামনি দেখলাম—আমারই বয়সী একটি ছেলেমানুষ মেয়ে! আমার মনে তা এত গভীর ছাপ ফেলেছিল যে আজও আমি তাকে—লুডমিলা পাভলিচেঙ্কোকে—একটুও ভুলি নি।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্র

এই ভ্রমণকালেই সোভিয়েত যুব-প্রতিনিধিরা ব্রিটেনের যুব ও ছাত্র নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, আলোচনা করেন ইংলণ্ডে অবস্থিত বিভিন্ন ইয়োরোপীয় দেশের ফ্যাসিবিরোধী শরণার্থী ছাত্র ও যুব নেতাদের সঙ্গে। কথা ওঠে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপকতর যুব-মৈত্রী গড়ার। এর থেকেই জন্ম নেয় আন্তর্জাতিক যুবপরিষদ, যাকে ভিত্তি করেই যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আহূত হয় প্রথম বিশ্ব-যুবসম্মেলন। ইংলণ্ডস্থ ভারতীয় ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ সংস্থা 'ফেডিও' গোড়া থেকেই আন্তর্জাতিক যুবপরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আমেরিকা ঘোরার সময়ও সোভিয়েত যুব-প্রতিনিধিদের সঙ্গে অনেকের দেখাসাক্ষাৎ হয়, যাদের যৌথ উদ্যোগে মেক্সিকোতে আহূত হয় মহাদেশীয় যুবসম্মেলন। সেখান থেকেই বহু প্রতিনিধি আসেন ১৯৪৫-এর প্রথম বিশ্ব যুব সম্মেলনে।

ফ্যাসিবাদ বিপন্ন করেছিল সারা বিশ্বকে। ফলে, এটা খুবই স্বাভাবিক যে যারা আত্মরক্ষা করছিল তারাও নানান ধরনের আন্তর্জাতিক মৈত্রী গড়ে তুলবে। এই মৈত্রী সরকারী ও বে-সরকারী দুই স্তরেই সুপরিস্ফুট ছিল। ঋণ-সহায়তা চুক্তি অনুযায়ী মার্কিন ও ব্রিটিশ জাহাজী বহর যুদ্ধাস্ত্র ও রসদ নিয়ে রুশ বন্দরগুলিতে যেত। ব্রিটিশ সেনাদলের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়াই করত জেনারেল চার্লস দ্য গলের স্বাধীন ফরাসী বাহিনী, পোল্যাণ্ড চেকোস্লোভাকিয়া ও অন্যান্য দেশের সৈন্যরা। রুশদেশের মাটিতেও লড়েছে চেক ও পোল সেনাদল, লালফৌজের পাশে দাঁড়িয়ে, নিজেদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য। নর্মাণ্ডি বিমান বহরটি ছিল সম্পূর্ণই ফরাসী বৈমানিক দিয়ে গঠিত। তারা সোভিয়েতভূমি থেকে লড়ত এবং বারংবার জার্মানিতে বোমাবর্ষণ করে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। যদিও তার মূল্য দিয়েছিল তারা অনেকেই যুদ্ধে আত্মাহুতি দিয়ে। যে সব মিত্রপক্ষীয় বৈমানিক বিমান ভেঙে পড়ায় ফ্রান্সের গ্রামে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল, তাদের রক্ষা করতে জীবন বিপন্ন করেছিল বহু সাধারণ

ফরাসী কিষাণ রমণী। যাঁরা সৌভাগ্যক্রমে বন্দীশিবিরের নরককুণ্ড থেকে বেঁচে ফিরে এসেছিলেন, তাঁরা সেই অভিশপ্ত জায়গাতেও বিপ্লবী বন্ধুতার রক্তে দোলা লাগা বহু কাহিনী পরবর্তী জীবনে নিজেদের স্মৃতিপটে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

যুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রের একটা সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হল সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক লক্ষ লক্ষ তরুণ জার্মান যুদ্ধবন্দীকে নতুন করে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা সংগঠিত করা। নিজেদের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা থেকে শিখে এই সব তরুণ বন্দীদের অনেকেই বয়োজ্যেষ্ঠ ফ্যাসিবিরোধীদের সুযোগ্য সহকারীতে পরিণত হয়েছিলেন। এঁরা সবাই মিলে পরে ফ্যাসিবাদের মহামারী থেকে জার্মানিকে মুক্ত করে সেখানে নতুন গণতান্ত্রিক জীবন নির্মাণের কাজ শুরু করতে কোমর বেঁধে লেগেছিলেন।

ইংলণ্ডে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের জন্য বিশাল আন্দোলন ছাড়াও আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রের ক্রমবর্ধমান চেতনা থেকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ অনেক বেড়ে গেল। ইংলণ্ডের সাধারণ মানুষকে তো চিরকাল বোঝানো হয়েছে যে ইংলণ্ড পরাধীন দেশের মানুষদের "সুসভ্য" করার মহান ব্রত নিয়েই ভারতে গেছে। কিন্তু এখন তারা বুঝতে পারছিল যে ভারতের বেশির ভাগ লোক যদি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তবে ভারতকে ঘাঁটি করে জাপানের বিরুদ্ধে সফল লড়াই চালানো খুবই কঠিন। যাদের বাড়ির পুরুষেরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে লড়ছিল, তারা সবাই ভারতবর্ষে কি হচ্ছে না হচ্ছে জানতে খুবই ব্যগ্র ছিল। ইণ্ডিয়া লীগ সংগঠনটি এত বক্তার ব্যবস্থাই করে উঠতে পারত না। নিউকাসল ও ডারহামের আশেপাশের খনিমজুর অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ, মহিলা সমবায় সংঘ ও অন্যান্যরা যে সব সভার বন্দোবস্ত করত তার অনেকগুলিতে আমিও বক্তৃতা করেছি। পরে, যখন ক্রীপস ভারতে গেলেন, তখন এই আগ্রহ আরও বাড়ল। ১৯৪৪-এ, আমি তখন শেফিল্ডে থাকি, বাঙলার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে আমরা ভারতীয় ছাত্ররা একটা খালি দোকান ঘরে যে-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করি, তা দেখতে বহু সহস্র লোক আসে।

যুদ্ধ শেষ—ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু

১৯৪৪-এর জুন মাসে নির্দেশ এল যে শেফিল্ড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সমস্ত 'বেড' খালি করে দিতে হবে। আমি তখন সেখানে অগ্রজ মেডিকেল ছাত্রী। রোজ রাত্রে মাথার উপর দিয়ে বিরাট বোমারু বিমানবাহিনী উড়ে

যেত ইয়োরোপে, নাৎসি জার্মানির বিভিন্ন কেন্দ্রকে বোমায় বোমায় বিধ্বস্ত করতে। তারপর হঠাৎ একরাত্রে খালি 'বেড'গুলি আহত সৈন্যে ভরে যেতে লাগল। বহু প্রতীক্ষিত দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হয়েছে।

পূর্বে তখন চলছে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ। আর পশ্চিমে খোলা হল দ্বিতীয় রণাঙ্গন। জয় অনিবার্য হয়ে উঠল। তবুও আরও প্রায় এক বছর কেটে গেল—তারপর বার্লিনে জয়ের লাল পতাকা উড়ল। সেই বছরই পারীতে গণঅভ্যুত্থান হল, গড়ে উঠল ব্যারিকেড। স্লোভাক জনতা পা বাড়াল সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে। বুলগারিয়া ও যুগোস্লাভিয়া মুক্ত হল। মুক্ত হল পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরি ও রুমানিয়া। প্রতিদিন আসত নতুন নতুন জয়ের খবর। ১৯৪৫-এর ৫ মে সোভিয়েত ট্যাঙ্ক প্রবেশ করল প্রাগ শহরে। ৯ মে মুক্ত হল বার্লিন। মানবসভ্যতার ইতিহাসের সবচেয়ে বিধ্বংসী যুদ্ধের প্রকৃতপক্ষে অবসান হল।

কিন্তু ঠিক যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অধিকৃত ইয়োরোপের জনগণ মুক্তির জন্য লড়ছিল, তখনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী শাসকচক্র এক নতুন ধরনের যুদ্ধের ফন্দী আঁটছিল। ঘটনাবলীর চাপে ৬ বছর ধরে তারা বাধ্য হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে হাত মেলাতে। কিন্তু ৬ বছর ধরেই তারা নানাভাবে চেষ্টা করছিল কি করে তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে হাসিল করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার আগেই ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

ইংলণ্ডের বেতার-প্রচারে যখনই ফ্রান্সের প্রতিরোধ-সংগ্রামের কথা বলা হত, তখনই ফলাও করে জানানো হত দ্যগল সমর্থকদের কীর্তিকাহিনী, ছোটো করে দেখানো হত কমিউনিস্ট নেতৃত্বে পরিচালিত প্রতিরোধ-বাহিনীর অবিস্মরণীয় সংগ্রামকে। ইতিমধ্যে লণ্ডনের নিরাপদ আশ্রয়ে বসে দ্যগল ও বেনেস তাঁদের সমর্থকদের পরামর্শ দিতেন যেন তারা বেশি জঙ্গী না হয়ে ওঠে। কেননা তাহলে তাদের উপর নেমে আসবে নাৎসিবাদের নির্মম দমননীতি। অধিকৃত ইয়োরোপের সংগ্রামশীল বিভিন্ন প্রতিরোধগোষ্ঠীকে বিমান থেকে অস্ত্র ও রসদ যোগানোর ব্যাপারেও বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হত। এমনকি যুগোস্লাভিয়াতেও—যেখানে টিটোর নেতৃত্বে পরিচালিত ব্যাপক সমর্থন পুষ্ট প্রতিরোধ-আন্দোলনের উপর নির্ভর করা ছাড়া পশ্চিমী শক্তিদেরও কোনো উপায় ছিল না—তারা ক্রোট বা মন্টেনেগ্রিন জাতীয়তাবাদীদের ছোটো ছোটো দলকে বেশি সাহায্য করত।

স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধের সময় থেকেই স্তালিন বারবার পশ্চিম ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার কথা বলেছেন, যাতে লালফৌজের উপর থেকে অন্তত খানিকটা চাপ কমে যায় এবং যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ করা সম্ভব হয়। কিন্তু ১৯৪৪-এর মধ্যভাগ অবধি দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলতে দেরি করা হল এই আশায় যে হিটলার-জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পরস্পরকে রক্তাক্ত ও বিধ্বস্ত করে ফেলবে, আর সেই সুযোগে ভবিষ্যত পৃথিবীর উপর মাতব্বরি করবে পশ্চিমী শক্তিবর্গ। যখন সোভিয়েতে জয় অবধারিত, এবং যখন দেরি করলে বিজয়ী লালফৌজ প্রায় ইংলিশ চ্যানেল পর্যন্ত চলে আসতে পারত, একমাত্র তখনই দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হল।

ঠিক একই ধাঁচের ঘটনা ঘটল সোভিয়েত সেনাদল কর্তৃক অধিকৃত ইয়োরোপের পরিপূর্ণ মুক্তিলাভের অব্যবহিতকাল পূর্বে, ইয়োরোপের শহরগুলির উপর মিত্রপক্ষীয় বিমানবহর থেকে বেপরোয়া বোমাবর্ষণের মধ্য দিয়ে। ১৯৪৭-এ চেকোস্লোভাকিয়ার তরুণ শ্রমিকরা প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধভাবে আমাকে দেখাল যে কেমনভাবে প্রাগ শহর মুক্তির মাত্র এক সপ্তাহ আগে মার্কিন বিমানবহর সেখানে বোমা ফেলে সুন্দর শহরটির অকারণ ক্ষতি করে গেছে। সারা ইয়োরোপের স্থপতিবিদ্যার সেরা নিদর্শন এই শহরটিতে এর আগে কেউই বিমান থেকে বোমা ফেলে নি। চেকোস্লোভাকিয়ার যে সব বড় বড় যুদ্ধাস্ত্রের কারখানা ৬ বছর ধরে নাৎসিদের অস্ত্র যুগিয়ে এল, মার্কিন বোমারু বিমান তাদের উপর বোমা ফেলল মুক্তির কয়েকদিন মাত্র আগে। পূর্ব-ইয়োরোপের আরও বহু নগরীর ভাগ্যেও ঠিক এই ধরনের ব্যাপারই ঘটেছিল।

অবশ্য সবচেয়ে বীভৎস ব্যাপার ঘটে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে, আণবিক বোমাবর্ষণের মাধ্যমে। ইয়োরোপে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার তিন মাস পরে এশিয়াতেও যখন মিত্রপক্ষের জয় সুনিশ্চিত, তখন এই কাণ্ডটি ঘটানো হল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার এই ঘটনার মারফৎ পৃথিবীর উল্লাসমুখর মুক্ত বিজয়ী জনগণকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাইল: "খবরদার! বাড়াবাড়ি করলে একেবারে চুরমার করে দেবো।"

শান্তিরক্ষায় জনগণ একজোট হল

জনগণও এই হুঁশিয়ারির মানে বুঝতে দেরি করল না। ১৯৪৫-এর নভেম্বরে লণ্ডনে ৬০টি দেশের যুবপ্রতিনিধিরা একজোট হল বিশ্বযুবসম্মেলনে, গঠন করল

বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুবসঙ্ঘ। কয়েক সপ্তাহ পরে, ১৯৪৫-এর ডিসেম্বরে, পারীতে (সেখানে তখন খাবার নেই, কয়লা নেই) অনুষ্ঠিত হল বিশ্বনারী সম্মেলন—সেখান থেকে জন্ম নিল বিশ্ব গণতান্ত্রিক মহিলা সঙ্ঘ। আমি এই দুই মহাসম্মেলনেই উপস্থিত ছিলাম—নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিনিধি হিসেবে। এর পরে গঠিত হয় বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন সঙ্ঘ ও ১৯৪৬-এ আন্তর্জাতিক ছাত্র সঙ্ঘ। দু-এক বছর পরে জন্মলাভ করে বিশ্ব শান্তি সংসদ। এই সবকটি মহাসম্মেলনের মূল সিদ্ধান্ত একই। ছেলেমানুষ আর বুড়ো, পুরুষ আর মেয়ে, শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবী—বোমাবিধ্বস্ত শহর আর যুদ্ধবিধ্বস্ত বহু দেশ থেকে তারা এসেছিল। অনেকে এসেছিল বন্দীশিবিরের নরককুণ্ড থেকে সদ্যমুক্ত হয়েই। একবাক্যে তারা ঘোষণা করেছিল: "আর যুদ্ধ নয়। আর ফ্যাসিবাদ নয়। রক্তস্রোতের মধ্যে যে বন্ধুতা আমরা অর্জন করেছি, তা আমরা রক্ষা করব ও দৃঢ়তর করব। আমাদের সন্তানসন্ততির জন্য সুনিশ্চিত ও নিরাপদ করবই ভবিষ্যতকে!"

গত ৩০ বছরে যদি বারবার সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের ষড়যন্ত্রকে বানচাল করা সম্ভব হয়ে থাকে, যদি ইয়োরোপ তার সাম্প্রতিক ইতিহাসের দীর্ঘতম নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ভোগ করে থাকে, যদি এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অগণিত দেশ স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়ে থাকে, তার অনেকটা কৃতিত্বই পাওয়া উচিত এই আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্র আন্দোলনের—যা জন্মেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতার আগুনে।

July 8, 1936

STEPPING STONES TO GLORY.

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্‌কালে লণ্ডনের 'ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড' দৈনিকে প্রকাশিত লো-র কার্টুন পৃথিবীতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। হিটলার-মুসোলিনি ও তোজো ছিল লো-র প্রধান লক্ষ্য। অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্তমোর্চাগঠনে পশ্চিমী গণতন্ত্রের দ্বিধাকেও লো তাঁর কার্টুনের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীসুনীল মুন্সীর সৌজন্যে, 'লো এগেইন' নামে ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত যে-অ্যালব্যাম থেকে মেরুদণ্ডহীন পশ্চিমী গণতন্ত্রের দুর্বলতার সুযোগে হিটলারের জয়যাত্রার এই কার্টুনটি আমরা পেয়েছি, তার ভূমিকাতে লো লিখছেন,

"কার্টুন-আঁকিয়ের পক্ষে দুনিয়াটা আর তেমন জুতসই নেই। কারণ এই নয় যে বিষয়ের কিছু ঘাটতি পড়েছে—তেমন কোনো ঘাটতি নেই—আসলে, কার্টুনটাই এখন স্বাভাবিক অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"…"প্রায়ই মনে হয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার চাইতে কমিউনিস্টদের ডোবানোই যেন অনেক দরকারী কাজ।"

এক

দুই

[চিত্র পরিচিতি

তিন
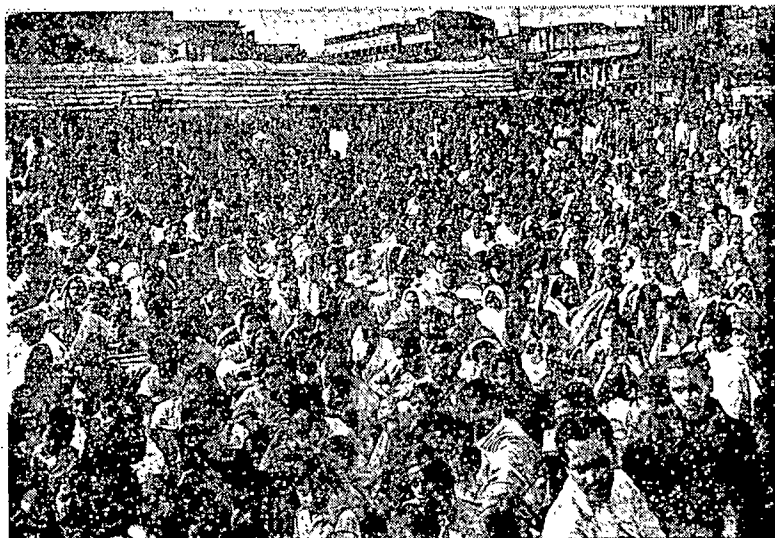
চার

পরবর্তী প্রবন্ধে]

পাঁচ

ছয়

ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক আন্দোলন : কয়েকটি পুরানো ছবি

চিন্মোহন সেহানবীশ

চল্লিশের দশক জুড়ে যুক্ত বাঙলায় লেখক ও শিল্পীদের এক প্রবল আন্দোলন চলেছিল ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে। তার কথা ইতিমধ্যে কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে নানা পত্রপত্রিকায়—বিশেষ করে 'পরিচয়'-এর ফ্যাসিস্টবিরোধী সংখ্যায়।

এখানে ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ পরিচালিত আন্দোলনের কয়েকটা পুরানো ছবি ছাপা গেল। তার মধ্যে একটিতে (এক নম্বর ছবি) দেখা যাচ্ছে লেখকসংঘের (সম্ভবত তার কার্যনির্বাহক সমিতির) সভা বসেছে। সংঘের সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডান দিক থেকে পরপর আছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দেবকুমার গুপ্ত, অনিল সিংহ, অরুণ মিত্র, চিন্মোহন সেহানবীশ, রবীন্দ্র মজুমদার, শম্ভু মিত্র, বিনয় রায়, রঞ্জিত দাশগুপ্ত, অমল ভট্টাচার্য ও বিজন ভট্টাচার্য। কাল জানা নেই, তবে শাল কোট পুলওভারের বহর দেখে বোঝা যাচ্ছে শীতকাল। স্থান অবশ্য সুপরিচিত ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটের (এখন লেনিন সরণী) চারতলার ছাত। সংঘের দপ্তর ছিল ঐ বাড়িতে।

একটি ছবিতে (দুই নম্বর) দেখা যাচ্ছে গানের তালিম চলেছে। হার্মোনিয়ামে সুজাতা (তখনো মুখোপাধ্যায়—পরে ডেভিস। সুপরিচিত লেখক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের তিন কন্যা—সুজাতা, সুপ্রিয়া ও সুচিত্রা ; এই তিনজনার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল লেখক সংঘ এবং তার সহযোগী প্রতিষ্ঠান —সোভিয়েত সুহৃদ সংঘের) ; তাঁর বাঁ দিকে যথাক্রমে কল্যাণী (তখনো মুখোপাধ্যায়, পরে কুমারমঙ্গলম), বিনয় রায়, দিলীপ রায় ও অনিল সিংহ।

দুটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসে ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন উপলক্ষে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে চলেছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং দর্শকশ্রোতারা তা উপভোগ করছেন। একটিতে (তিন নম্বর) মঞ্চের উপর দেখা যাচ্ছে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় ঘোষণা করছেন পরবর্তী

অনুষ্ঠানের ; আর এধারে-ওধারে চোখে পড়ছে সাধনা রায়চৌধুরী, স্থরপতি নন্দী, বিনয় রায়, সম্ভবত কিষাণ দাশগুপ্ত, চিন্মোহন সেহানবীশ ও অজয় সিংহকে।

দর্শকবৃন্দের এই ছবিটি (চার নম্বর) প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল সেবার আমরা কি জানি একটি নাটক অভিনয় করেছিলাম যার এক দৃশ্যে শ্রীজলি কাউল মুখ দিয়ে এমন অবিকল সাইরেনের আওয়াজ করেছিলেন যে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের ঐ ঠাসা জনতা নিমেষের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কারণ তখন যুদ্ধের কাল—মানুষ স্বভাবতই ভেবেছে জাপানী বোমারু জাহাজ বুঝি এসে গেল। আমরা তখন মাইক্রোফোনে প্রাণপণে ঘোষণা করছি—"ভয় নেই, ওটা অভিনয়।" তাতে ধীরে ধীরে ত্রস্ত দর্শকেরা যদি বা ফিরে এলেন, তারই সঙ্গে এল পুলিশ। বললে, "যুদ্ধের সময়ে সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রকাশ্যে অমন আওয়াজ করা বে-আইনী। থানায় যেতে হবে।" অনেক কষ্টে তাদের ক্ষান্ত করা গেল শেষ অবধি।

আর-একটি ছবিতে (পাঁচ নম্বর) দেখা যাচ্ছে মোহম্মদ আলি পার্কে ১৯৪৫ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সম্মেলনে শ্রোতারা সাগ্রহে শুনছেন কবির লড়াই : একদিকে চট্টগ্রামের বিখ্যাত কবিয়াল রমেশ শীল, অন্যদিকে তাঁর প্রতিপক্ষ মুর্শিদাবাদ-বীরভূমের প্রসিদ্ধ কবিয়াল শেখ গোমহানি।

শেষ ছবি ১৯৪৭ সালের ১ অক্টোবর প্রগতি লেখক সংঘ ও কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের যুগ্ম উদ্যোগে আয়োজিত দাঙ্গাবিরোধী শোভাযাত্রার। ছবিতে (ছয় নম্বর) দেখা যাচ্ছে তারাশঙ্করবাবু মাইকে বক্তৃতা করছেন। সবিতাব্রত দত্ত, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধী প্রধান, করিম সাহেব, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকেও দেখা যাচ্ছে এধারে ওধারে। ছবিটি তোলা শ্রীশ্যামাদাস বসুর। অন্য ছবিগুলি কার জানা নেই। সব ছবিগুলিই পাওয়া গেছে দিল্লীর 'অজয় ভবন'-এর সৌজন্যে।

কর্তব্য সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[১৯৪৫ সালের ৩-৮ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে 'ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' পুনরায় 'প্রগতি লেখক সংঘ' হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য সংঘের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এপ্রিল ১৯৪৯ সালে সংঘের পরবর্তী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব সম্মেলনে নির্বাচিত অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে এই সম্মেলনে সম্পাদকের বিবরণী তিনিই পেশ করেন। রিপোর্টটি 'প্রগতি সাহিত্য' শিরোনামে প্রথমে 'পরিচয়'-এ (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৫৬) ও পরবর্তীকালে তাঁর একমাত্র প্রবন্ধ সংকলন 'লেখকের কথা'য় (ভাদ্র ১৩৬৪, সেপ্টেম্বর ১৯৫৭) প্রকাশিত হয়।
এখানে 'লেখকের কথা' থেকে 'প্রগতি সাহিত্য'র প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হল। রচনাটির বর্তমান শিরোনামা আমাদেরই দেওয়া। বানান ও যতিচিহ্নে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক]

যুদ্ধের সময় সংঘের ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনের প্রসার লাভ ও শক্তিশালী বৃহৎ সংগঠন গড়ে ওঠা বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে সংঘটিত হয়। এই সাফল্যের একটি বিশেষ তাৎপর্য আজ আমাদের লক্ষ্য করা প্রয়োজন। ১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে সংঘের কেন্দ্রীয় শাখার সভ্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৭৫ জন—এক বছরের মধ্যে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৪২ জন; সংঘের শাখা ছিল মাত্র ২টি, বাঙলার বিভিন্ন জেলায় সক্রিয় ১৪টি শাখা গড়ে ওঠে।

কেন্দ্র ও শাখাগুলির মোট সভ্যসংখ্যা হাজারের উপরে উঠে যায়। কলিকাতা ও মফঃস্বলে বহু সাংস্কৃতিক সভা, শিল্প-সাহিত্য ও সমাজ-জীবনের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা, পুস্তক প্রকাশ, লাইব্রেরি পরিচালনা প্রভৃতি নানা কাজের মধ্যে আন্দোলন অসাধারণ শক্তি সঞ্চয় করে।

কেবল বাঙলায় নয়, সারা ভারতে ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে সংঘের সর্বভারতীয় বিরাট সংগঠন গড়ে ওঠে।

এই অসাধারণ সাফল্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই, আদর্শ

ও আন্দোলন সম্পর্কিত একটি সহজ সত্যই আরেকবার প্রমাণিত হয়েছিল এই সাফল্যের মধ্যে, যে, আদর্শ ও সংগঠন পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। আদর্শে খুঁত থাকবে অথচ সংগঠন নিখুঁত হবে, বা সংগঠনে খুঁত রেখেও নিখুঁত আদর্শ সার্থক হবে—এটা অসম্ভব। আদর্শ ও সংগঠন আন্দোলন পরস্পরের পরিপোষক ও পরিপূরক, অবিচ্ছিন্ন, অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সমাজ-জীবন ও শিল্প-সাহিত্যের সম্পর্কে মার্কসিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি কি তখন আমাদের নিখুঁত ছিল? আজকের চেয়ে পরিষ্কার ধারণা ছিল শিল্পী ও সাহিত্যিকের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে? তা নয়, দৃষ্টি তখন আমাদের অনেকখানি ঝাপসাই ছিল, আদর্শগত সমগ্রতার দিক থেকে।

কিন্তু তখনকার পরিস্থিতিতে, পৃথিবীব্যাপী সংকটের সীমাবদ্ধ বাস্তবতায় আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মূল আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল নির্ভুল। সোভিয়েতের নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী সংগ্রাম চলার সময় প্রগতিবাদী শিল্পী ও সাহিত্যিকের একমাত্র কর্তব্য সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল—তার সবটুকু সৃজনীশক্তি দ্বিধাহীন চিত্তে ফ্যাসিবাদের উচ্ছেদ সাধনে প্রয়োগ করা।...

২২. ৪. ৪৯

'জনযুদ্ধ' ও 'অরণি' থেকে

জাপ-বিরোধী নাটিকা চাই / পুরস্কার ১০৲ টাকা

বাংলার জাপ অভিযান আসন্ন। বাংলার সহরে গ্রামে সর্ব্বত্র সমগ্র জনসাধারণকে আজ বিপুলভাবে জাগাইয়া তুলিতে হইবে জাপানী ফাসিষ্টদের রুখিবার জন্য। জননাটিকা[১] এই কাজে বিরাট সহায়।

বাংলার দেশপ্রেমিক লেখকদের এবং বিভিন্ন গণ-আন্দোলনের কর্ম্মীদের আমরা আহ্বান করিতেছি এইরূপ একখানি ছোট জনসাধারণের উপযোগী নাটিকা লিখিতে। নাটিকাখানি এইরূপ হওয়া চাই।

(১) যেন উন্মুক্ত স্থানে অভিনীত হইতে পারে—দৃশ্যপটাদি বা খুব বেশী—পোষাকের প্রয়োজন না হয়। কতকটা যাত্রা ধরণের হইবে। (২) ভাষা খুব সহজ হওয়া চাই যাহাতে অশিক্ষিত জনসাধারণও সহজেই বুঝিতে পারে। (৩) বিষয়বস্তু এমন হওয়া চাই যাহাতে তীব্র জাপ-বিরোধী মনোভাব জাগিয়া উঠে ও জনসাধারণের মধ্যে জাপানকে রুখিবার দৃঢ়তা জন্মায়। (৪) নাটিকাটি ছোট হওয়া চাই—যেন এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টার ভিতরই অভিনয় শেষ হয়।

কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া আগামী ৩১শে মের ভিতর "জনযুদ্ধ" অফিসে নাটিকাটি পাঠাইতে হইবে। যাঁহার লেখা মনোনীত হইবে তাঁহার উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য দশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। নাটিকাটি বিচার করিবেন :—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রোঃ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও গোপাল হালদার।

'জনযুদ্ধ' ১৬ মে ১৯৪২

জাপ-বিরোধী জন-নাট্য চাই / পুরস্কার ত্রিশ টাকা

আমরা ইতিপূর্ব্বে জাপ-বিরোধী জন-নাট্যের জন্য ১০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলাম—কিন্তু এ যাবৎ যে সকল নাটিকা আমাদের হাতে

১. এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন 'শ্রীরঙ্গম'-এ 'নবান্ন'-র প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১৯৪৪ সালের ২৪ অকটোবর। 'জবানবন্দী' প্রথম অভিনীত হয় ১৯৪৩ সালে। দেখা যাচ্ছে তার অনেক আগে 'জনযুদ্ধ' কর্তৃপক্ষ 'ম্যাস থিয়েটার' বা 'গণনাট্য'র কথা ভেবেছিলেন। এমনকি, তার প্রোডাকশন সম্পর্কেও।—সম্পাদক

পৌঁছিয়াছে—তাহা আশানুরূপ নয়। তাই আমরা ৩১শে মে'র পরিবর্তে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত লেখা পাঠাইবার সময় বাড়াইয়া সকল দেশ প্রেমিক লেখকদের আবার আহ্বান করিতেছি। আমাদের দুই জন বন্ধু এই কার্য্যের জন্য আরো কুড়ি টাকা দেওয়াতে পুরস্কারের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হইল।

সঃ জ

'জনযুদ্ধ' ১৭ জুন ১৯৪২

[সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, হীরেন মুখার্জি ও গোপাল হালদার—এই তিন বিচারকের মতে বনস্পতি গুপ্ত[1] লিখিত জননাট্য 'দেশরক্ষার ডাক' "জননাট্যের পুরস্কার" অর্জন করেছে।

সম্পাদক

১। ৯। ৪২]

ফাসিস্ত বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলন

ফাসিস্তবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের উদ্যোগে আগামী ডিসেম্বর মাসের ১৯শে ও ২০শে তারিখে কলিকাতায় নিখিল-বঙ্গ ফাসিস্তবিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। বাংলার ও বাংলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশের বহু খ্যাতনামা লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে যোগদান করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে। সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যদের জন্য এক টাকা এবং সম্মেলনের প্রতিনিধিদের জন্য চারি আনা চাঁদা ধার্য্য করা হইয়াছে। সম্মেলনে ফাসিস্তবিরোধী নাটক অভিনয়, সঙ্গীত, কবিতা আবৃত্তি ও চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইতেছে। সম্মেলন উপলক্ষে ফাসিস্তবিরোধী, প্রগতিশীল কবিতার[2] ও ছোটগল্পের[3] দুইখানি সঙ্কলন পুস্তিকা প্রকাশের আয়োজন চলিতেছে।

---

১. বনস্পতি গুপ্ত কে? 'দেশরক্ষার ডাক' কি কোনোদিন অভিনয় হয়েছিল, বা, মুদ্রিত? সম্প্রতি একজন প্রখ্যাত ও বর্ষীয়ান কমিউনিস্ট নেতা বনস্পতি গুপ্ত ছদ্মনামে দুটি-একটি কবিতা লিখেছেন, অবশ্য তাঁর কন্যার দেয়ালপত্রিকায়। 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বনস্পতি গুপ্ত সম্পর্কে কি তিনি কিছু আলোকপাত করবেন?—সম্পাদক

২. 'একসূত্রে' নামে প্রকাশিত হয়।—সম্পাদক

৩. সম্ভবত এই সংকলনটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি।—সম্পাদক

ফাসিস্ত বিরোধী, প্রগতিশীল ছোটগল্প কোন্ কোন্ লেখকের কোথায় কখন প্রকাশিত হইয়াছে বাংলার সাহিত্যিক ও পাঠকরা সেই সম্পর্কে আমাদিগকে জানাইলে আমরা বাধিত হইব। সম্মেলনে যোগদান এবং উক্ত পুস্তিকা প্রকাশ সম্পর্কে পরামর্শ করিবার জন্য বাংলার বিভিন্ন জেলার লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ ও সাহিত্যিককে ফাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের যুগ্ম সম্পাদকের সহিত চিঠিপত্র লিখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে—বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়—যুগ্ম-সম্পাদক, ফাসিস্তবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ, ৪৬নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

'জনযুদ্ধ'। প্রথম বর্ষ একত্রিংশ সংখ্যা। বুধবার, ৯ ডিসেম্বর ১৯৪২, ২৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৯

রণেশের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে

নিখিল বঙ্গ ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী শিল্পী ও লেখক সংঘের সভাপতি শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিল ভারত জননাট্য[১] সংঘের বঙ্গীয় শাখার সভাপতি শ্রীযুত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রীযুত সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বিষ্ণু দে নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন।

গত ২৪শে জুলাই ঢাকা প্রগতি লেখক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও 'প্রতিরোধ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রণেশ দাশগুপ্ত কোন গুপ্তঘাতকের হাতে গুরুতরভাবে আহত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রণেশ দাশগুপ্ত অক্লান্ত চেষ্টায় ঢাকার সাহিত্যিকদের মধ্যে ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। যাঁহারা ফ্যাসিষ্ট শক্তির সহায়তায় দেশের মুক্তির কল্পনা করেন এবং সেই কারণে হিংসাত্মক গুপ্ত আন্দোলনে লিপ্ত, শ্রীযুক্ত রণেশ দাশগুপ্তের কার্য্যকলাপ যাঁহাদের কর্ম্মপন্থার অন্তরায়—এই হিংসাত্মক আক্রমণ তাঁহাদের বলিয়া মনে করিবার বিশেষ কারণ আছে। প্রায় দেড় বৎসর আগে সোমেন চন্দকে এমনি ভাবেই হত্যা করা হইয়াছিল।

ফ্যাসিষ্ট শক্তির সহায়তায় কোনও জাতির মুক্তিতে আমরা বিশ্বাস করি না, মহাত্মা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল রাজনৈতিক নেতা এই কল্পনা ভ্রান্ত বলিয়া

১. 'জননাট্য' কবে 'গণনাট্য' হল তা গবেষকদের অনুসন্ধানের বিষয় হওয়া উচিত।—সম্পাদক

দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর ভ্রান্ত মুক্তিপন্থা অনুসরণের মর্ম্মন্তুদ স্মৃতি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অক্ষয় হইয়া আছে, আজও তাহার মাশুল আমাদের দিতে হইতেছে। এই পন্থা অনুসরণে গভীরতর দুর্দ্দশা আমাদের জীবনে নামিয়া আসিবে। শিল্প সাহিত্য জীবনাদর্শ বিপন্ন হইবে—ধ্বংস হইবে।

সোমেন চন্দের মৃত্যুর পর বাংলার প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক ও শিল্পীরা একত্রিতভাবে প্রতিবাদ জানাইয়া ছিলেন এবং সেই প্রেরণা হইতেই সকলে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ গঠন করিয়াছেন।

আমরা সবিনয়ে জানাইতেছি যাঁহারা এই হিংস্র অসহিষ্ণুতা এবং আত্মঘাতী নীতি পোষণ করেন তাহারা উহা বর্জন করুন। যে আচরণ সংঘটিত হইয়াছে আমরা দৃঢ়ভাবে মুক্তকণ্ঠে তাহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। এই সর্ব্বনাশা নীতির নিন্দা করিতেছি।

'জনযুদ্ধ'। দ্বিতীয় বর্ষ ষোড়শ সংখ্যা, বুধবার, ১১ আগষ্ট ১৯৪৩,
২৫ শ্রাবণ ১৩৫০

দুর্জয় দানবকে ব্যর্থ ও নিশ্চিহ্ন করিতে হইবে

হিটলারের প্রারম্ভিক বিরাট সাফল্যগুলি এবং যখন তার প্রচণ্ড আঘাতে ফ্রান্সের ভাগ্যরবি অস্তমিত হইয়াছে, সেই সময় হইতে আমি সভয়ে ভাবিতে-ছিলাম বুঝিবা হিটলার দুনিয়া জয় করিতে চলিয়াছে—এবং তারপর প্রতি-দিনকার অভাবনীয়, আতঙ্কজনক এবং অশ্রুতপূর্ব ঘটনাপ্রবাহ আমার সেই আশঙ্কাকে আরও দৃঢ়তর করিতেছিল। পরিশেষে হিটলার যখন সহসা বিনা প্ররোচনায় বিশ্বাসঘাতকের মত সোভিয়েট দেশকে আক্রমণ করিল, তখন আমার আশঙ্কা বাস্তবেই পরিণত হইতে চলিল, আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম্ যে, স্বাধীনতার জন্য আমাদের যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, তা আগামী কিছুকালের জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে, প্রথম ও প্রধান কর্তব্য দাঁড়াইতেছে, হিটলারী দস্যুদল এবং তাদের সহযোগীদের বিজয় অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দুনিয়াজোড়া অসংখ্য বন্দীশিবির প্রতিষ্ঠার যে-প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহাকে প্রাণপণে বিপর্যস্ত করা। আমি তখনও যেমন পরিষ্কার ধারণা করিয়াছিলাম, আজও তেমনি নিঃসন্দেহ যে হিটলার এক দুর্জয় যুদ্ধযন্ত্রের দানব সৃষ্টি করিয়াছেন; সমগ্র দুনিয়ার জনগণের মিলিত শক্তিতে আমাদের শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা ও শৌর্য সহকারে এই দুর্জয় দানবকে ব্যর্থ ও নিশ্চিহ্ন করিতে

হইবে। কারণ যে দেশ তার স্বাধীনতার জন্য যত বেশি ত্যাগ করিয়াছে, সরব হইয়াছে এবং এখনও স্বাধীনতার জন্য তা করিতেছে, সে দেশকেই এই নাৎসী গুণ্ডাদল ও তাদের সহযোগীদের অপমানকর অনাচার, ক্রূর অত্যাচার, নিষ্ঠুর আঘাত ইত্যাদির সম্মুখীন হইয়া পরীক্ষাদানের জন্য তত বেশি প্রস্তুত হইতে হইবে। এখানেই তো তাদের অবিচ্ছেদ্য কমরেডশিপ।...

স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী

হাজারীবাগ সেণ্ট্রাল জেল হইতে কমরেড ইন্দুলাল যাজ্ঞিকের নিকট লিখিত চিঠি, ৫. ১. ৪২। 'অরণি', ২০ মার্চ ১৯৪২

বাংলার স্বরাষ্ট্র সচিবের নিকট চট্টগ্রাম বন্দীদের আবেদন

ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে আটক চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার আসামীগণ বাংলার স্বরাষ্ট্র সচিব ও প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হকের নিকট এক পত্র লিখিয়াছেন।

...আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, ফ্যাসিস্ত আক্রমণকারীর জয়লাভে মানব সভ্যতার সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটিবে। ফ্যাসিবাদের জয়ে মানব সমাজের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা সৃষ্টি হইবে। অন্যান্য জাতির ন্যায় ভারতের ভাগ্যে একই দুর্দশা ঘটিবে।

...ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্য আমাদের সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে এবং এই প্রচেষ্টাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হইবে। মানব ইতিহাসের এই নিদারুণ সংকটকালে করজোড়ে দর্শক হিসাবে বসিয়া থাকা অসঙ্গত। বিশ্ব-ইতিহাসের এই নাটকে আমাদের উপযুক্ত অংশগ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই আমাদের সর্বপ্রধান রাজনৈতিক কর্তব্য।...

(স্বাঃ) গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, প্রভাত চক্রবর্তী, শচীন করগুপ্ত, হরিপদ দে, আনন্দ গুপ্ত, প্রিয়দা চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু গুহ, সুখেন্দু দস্তিদার, সুবোধ চৌধুরী, হরিপদ ভট্টাচার্য, কামাখ্যা ঘোষ, নরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিরাজমোহন দেব, জগদানন্দ মুখার্জি, সুহায়রাম দাস, সুকুমার সেনগুপ্ত, বিনয়ভূষণ রায়, মোক্ষদা

চক্রবর্তী, নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, কালীপদ চক্রবর্তী, মধুসূদন ব্যানার্জি, হৃষিকেশ ব্যানার্জি, অমূল্য রায়।

তারিখ—ঢাকা সেণ্ট্রাল জেল, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২

'অরণি', ২৭ মার্চ ১৯৪২

['অরণি'র এই দুটি রচনার বানান ও যতিচিহ্নে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক]

মুক্ত কমরেডদের বিবৃতি

কমরেড আবদুল হালিম, ধরণী গোস্বামী, রণেন সেন, মহম্মদ ইসমাইল, গোপেন চক্রবর্ত্তী, নিরঞ্জন সেন, গোপাল আচার্য্য, প্রমোদ দাসগুপ্ত, আবদুল মোমিন, স্মৃতিশ ব্যানার্জি, শৈলেন মুখার্জি ও অপূর্ব্ব মুখার্জি এই ১২জন কমিউনিস্ট রাজবন্দী সম্প্রতি মুক্তি পাইয়া নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :—

আমরা কয়েকজন কমিউনিষ্ট রাজবন্দী মুক্তি পাওয়ার পর হইতে অনেকে বর্ত্তমান যুদ্ধ ও রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তাই আমরা সংক্ষেপে তাহার জবাব দিতেছি। আমরা এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধ মনে করি। আমরা বিশ্বাস করি যে সম্মিলিত জাতিগুলির যুদ্ধ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের যুদ্ধ। ভারতের জনগণ আপন শক্তিতে এই যুদ্ধে যোগ দিয়া ও ইহাতে জয়লাভ করিয়াই নিজেদের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমরা এ বিষয়ে একমত যে, প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট নহিলে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সফল জাতীয় প্রতিরোধ গড়িয়া তোলা যায় না। কিন্তু এই গবর্ণমেণ্ট বিদেশী বলিয়া ও জাতীয় গবর্ণমেণ্ট নয় বলিয়া ইহার বর্ত্তমান যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করা উচিত নয়—কংগ্রেস নেতৃত্বের এই কথা আমরা স্বীকার করি না।···

আজ আমাদের দেশের সামনে নূতন দাসত্বের চরম বিপদ উপস্থিত। এ অবস্থায় আমরা মনে করি যে দেশের রাজনীতিক অবস্থা যাহাই হোক না কেন, এমন কি বর্ত্তমান সরকারের অধিকারের মধ্যেই বর্ত্তমান যুদ্ধ-ব্যবস্থায় যতদূর সম্ভব সাহায্য ও সহযোগিতা করিয়া জাপানী দস্যুদের রুখিবার চেষ্টা করা প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের মহান্ কর্ত্তব্য।···

'জনযুদ্ধ'। ১৭ জুন ১৯৪২

সদ্যমুক্ত কমরেড আনন্দ গুপ্তের বাণী / কমিউনিষ্ট পার্টি'র একথার[১] পথই একমাত্র পথ / মৃত্যুশয্যায়ও আনন্দের উপর দমননীতির চোট

দীর্ঘ ১২ বছর পরে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বন্দী কমরেড আনন্দ গুপ্ত গত ১২ই জানুয়ারী মুক্তি পাইয়াছেন। এই মুক্তিও আমলাতন্ত্র উদারতার বশবর্ত্তী হইয়া দেয় নাই, বহুদিন হইতে কমরেড আনন্দ কঠিন হাঁপানী রোগে ভুগিতে ছিলেন। আজ তিনি মৃত্যুশয্যায়। তাঁহার মৃত্যুর দায়িত্ব এড়াইতেই হয়ত শেষ পর্যন্ত সরকার এখন শেষ মুহূর্তে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

কিন্তু মুক্তির সাথে সাথেই তাঁহার উপর হুকুম হইয়াছে তিনি বাংলা দেশে থাকিতে পারিবেন না। নিরুপায় হইয়া তিনি কটকে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু সেখানেও আমলাতন্ত্র এই মুমূর্ষু রোগীকে রেহাই দেয় নাই। কটকের পুলিশ সাহেব তাহার উপর এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে তাঁহাকে তাঁহার বাড়ির সীমানার ভিতরই আটক থাকিতে হইবে।

মৃত্যুশয্যায় ও তাহার রেহাই নাই।

১৬ বছরের কিশোর বালক আনন্দ একদিন দেশপ্রেমের জ্বলন্ত আগুন বুকে নিয়া সন্ত্রাসবাদের পথে পা দিয়াছিলেন। তারপর জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন গুলি কাটিল জেল খানার কঠোরতার মাঝে। তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। আজ তিনি মৃত্যুমুখে।

জেলে বসিয়া তিনি সন্ত্রাসবাদী পথ ত্যাগ করিয়া কমিউনিষ্ট মত গ্রহণ করেন। যে সব বীর বন্দীরা ঢাকা ও দমদম জেলের ভিতর হইতে দেশবাসীকে আহ্বান জানাইয়া বলিয়াছিলেন যে এ যুদ্ধ জনগনের যুদ্ধ, ইহার অধিকার আমাদের হাতে আনিতে হইবে, ইহার জয়ের ভিতর দিয়াই আমাদের স্বাধীনতা আসিবে—কমরেড আনন্দ ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম।

বাংলা দেশ ত্যাগ করার সময়ে তিনি তাঁহার সহকর্ম্মী ও দেশবাসীর কাছে এই আবেদন জানাইয়া দিয়াছেন :

"জাপানী দস্যু আজ আমাদের দেশের মা, বোন ও নিরীহ শিশুর উপরে ধ্বংশ ও মৃত্যুর বিভীষিকা ঢালিয়া দিতেছে। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি আজ বিপন্ন। এই সময়ে মুক্ত হইয়া ভাবিয়াছিলাম যে দেশের স্বাধীনতার জন্য ঘৃণ্য

---

১. নিশ্চিতই মুদ্রণ প্রমাদ, হবে 'একতা'। —সম্পাদক

ফাসিষ্টবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আপনাদের পাশে মৃত্যু বরণ করিয়া লইব। কিন্তু আমলা তন্ত্র আমাকে এবং এখনও যাহারা জেলে আবদ্ধ আমার সেই প্রিয় সহকর্মীদের সে সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিতেছে। আজ দেশের কাছে একটিই মাত্র পথ—তাহা কমিউনিষ্ট পার্টি নির্দ্দেশিত পথ, সে পথ একতার পথ। কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট কায়েম করিয়া সাম্রাজ্যবাদ ও ফাসিষ্টবাদকে প্রতিরোধ করার পথ। ঐক্যের পথেই সাম্রাজ্যবাদের চাল ব্যর্থ হইবে, ফাসিষ্টবাদ পরাজিত হইবে।"

'জনযুদ্ধ'। প্রথম বর্ষ সপ্তত্রিংশ সংখ্যা। বুধবার ২০ জানুয়ারি ১৯৪৩, ৬ মাঘ ১৩৪৯

ফাসিজমকে রুখিতে / হাতুড়ী, কাস্তে, হাতিয়ারের পাশে / তুলি-লেখনীর স্থান / ফাসিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী-সম্মেলনের দাবী

…মহাপণ্ডিত শ্রীরাহুল সাংকৃত্যায়ন, শিল্পী শ্রীযামিনী রায়, কমরেড সাজ্জাদ জাহীর, বিখ্যাত 'এশিয়া' পত্রিকার ভারতীয় সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা গারট্রুড এমারসন সেন, খ্যাতনামা তেলেগু কবি ও নাট্যকার শ্রীআব্বুরি রামাকৃষ্ণ রাও, যুক্ত প্রদেশের প্রগতিশীল লেখক আন্দোলনের অন্যতম নেতা অধ্যাপক প্রকাশচন্দ্র গুপ্ত ও বেনারসের 'দুনিয়া' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীনন্দলাল রায় সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া বাণী প্রেরণ করেন। ঢাকা নদীয়া ময়মনসিংহ, বহরমপুর, বাঁকুড়া, খুলনা প্রভৃতি জেলা হইতে এমনকি বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব হইতেও প্রতিনিধিবৃন্দ সম্মেলনে যোগদান করেন।

ফাসিষ্ট-বিরোধী মুসলিম লেখক সংঘ[১] ও অন্যান্য লেখক-শিল্পী সংঘ, কৃষক, মজুর ও ছাত্রদের তরফ হইতে সম্মেলনে অভিনন্দন জানান হয়। এই উপলক্ষে সম্মেলনের উদ্যোক্তারা পঞ্চান্ন জন কবির কবিতা লইয়া "একসূত্রে" নামক একটি সঙ্কলন প্রকাশ করিয়াছেন। ফাসিজমকে রুখিবার সঙ্কল্পই এই কবিতা সঙ্কলনের অন্যতম প্রধান সুর।

'জনযুদ্ধ'। প্রথম বর্ষ ত্রয়োত্রিংশ সংখ্যা। বুধবার, ২৩ ডিসেম্বর ১৯৪২, ৭ পৌষ ১৩৪৯

১. এ যুগের পাঠকদের কাছে এই নামটি একেবারেই নতুন। এই সংগঠনের বিবরণাদি অবিলম্বে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন।—সম্পাদক

সার

গুণময় মান্না

এক বুড়ো অধর চাষীর কথা আমি জানতাম, সম্প্রতি তার মৃত্যু হয়েছে তারই কথা কয়েক দিন ধরে লিখছিলাম, গল্পের মতো করে, আজ সকালেই সেটা শেষ করেছি। কাগজ ক-খানা ড্রয়ারের মধ্যে পুরে ভাবছিলাম সেই কথাই। আমি যে ভাবে দেখিয়েছি, মানে, দেখাবার চেষ্টা করেছি, সামান্য একটু আলোকপাতের তফাৎ হলেই মানুষটা অন্যরকম দেখাতে পারত। যেমন—হঠাৎ পিছন থেকে চোখ টিপে ধরল।

'গোপালদা…আসুন…'

হো হো করে হেসে উঠলেন গোপালদা, 'ধরেছ তো ঠিক, সিকসথ সেন্স না কি…' চোখ ছেড়ে দিয়ে টেবিলের ডান দিকের চেয়ারটায় গিয়ে বসলেন, 'কি করে ধরলে বলো তো ?'

'হাতে স্রেফ গোল্ডফ্লেকের গন্ধ, আবার কি।'

গম্ভীর হলেন গোপালদা, 'তোমরা আজকাল গুরুজন মানো না, দেখছি।'

'মানে ?'

'আমরা হলে টের পেয়েও চেপে যেতুম। গোল্ডফ্লেকের গন্ধ বললে বোঝায় যে তোমারও ও-বস্তুটির স্বাদ গ্রহণ করা আছে…'

এরপর হো হো করে আমারই হেসে ওঠার পালা।

গোপালদা বললেন, 'তারপর, এই কদিন ডুব মেরেছিলে কোথায় ?'

'গোপালদা ভুলে যাচ্ছেন যে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি একজন জার্নালিস্ট।'

'তাহলে বলছি, মেদিনীপুরে কৃষক সম্মেলন…তোমার কাগজে রিপোর্ট দেখছিলাম বটে। এটা যেন সরকার পক্ষের পার্টির…তাই না ? বাই-দি-বাই, তোমাদের এই সব সম্মেলন…উগ্রবাম, মধ্যবাম, চরম-দক্ষিণ, মধ্য-দক্ষিণ—মানে, সরকারী বাম-দক্ষিণ—এদের পার্থক্য কোথায় বলতে পারো ? তুমি জার্নালিস্ট, এই সব সম্মেলনের সঙ্গে তোমার প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে, তুমি হয়ত আলোকপাত করতে পারবে। বাইরের থেকে আমাদের তো মনে হয়…'

'বাইরের থেকে, ভেতরের থেকে একই ব্যাপার. কোনো পার্থক্য নেই।'

'মানে…একটু বুঝিয়ে বলো।'

'সব একই…ইয়ে, দিনগত পাপক্ষয়। কলকাতায় প্রত্যেক দলের নেতারা আছেন, তাঁরা সেখানে গিয়ে বক্তৃতা করেন, গ্রাম থেকে চ্যাংড়া আর প্রবীণ মাতব্বরেরা এসে তা শোনে, শোভাযাত্রা করে, প্রস্তাব পাশ করে, তারপর ফিরে যায় নিজের নিজের স্থানে…'

'এবং বর্তমান শোষণ ব্যবস্থা, ক্ষেতমজুর সমস্যা, ভাগচাষী উচ্ছেদ,…সবাই একই কথা বলে এবং একই প্রতিকার দাবি করে। কার কাছে করে এবং কে করবে সেটা অবশ্য আলাদা কথা…তুমি ঠিকই বলেছ হে…' বলে গোপালদা ঘাড় নাড়লেন। 'বাই-দি-বাই, তোমাদের কৃষক সম্মেলনগুলো সব জেলা শহরেই হয় দেখছি, গ্রামে হলেই তো মানাত!'

'উঁহুঁ, লোক হবে না, শো থাকবে না। নেতাদের, প্রেসের লোকদের গ্রামে নিয়ে যাওয়া অসুবিধে, আর গ্রামের যে প্রতিনিধিরা আসে, দু-চারদিন শহুরে হল্লায় মুখ ফিরিয়ে যাবে বলে, তারাও উৎসাহিত হবে না…'

'বেড়ে, বেড়ে বলেছ…' গোপালদা টেবিলের ওপর একটা থাপ্পড় মারলেন, পরক্ষণেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি নতুন কিছু দ্যাখো নি, সব গতানুগতিক?'

মুহূর্তের জন্য আমিও থমকে গেলাম, মনে করবার চেষ্টা করে বললাম, 'আছে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যেমন এই সম্মেলনে দেখাল ছৌ নৃত্য, পাল্টা দলের লোকেরা হয়ত দেখাবে সাঁওতালী নাচ…'

'উহুঁ, আর কিছু দ্যাখ নি তুমি, যা নিয়ে তোমার কাগজের রিপোর্ট নয়, অন্য কিছু লেখা যায়?…'

একটা আইডিয়া হঠাৎ চমক দিল, আধখানা-টানা ড্রয়ারের হাতলে হাত দিলাম এবং চমকে উঠে দেখলাম যে আমার সদ্যসমাপ্ত লেখার কাগজ ক-খানা সেখানে নেই।

'হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, গোপালদাকে ফাঁকি, নিশ্চয়ই নতুন কিছু পেয়েছ তুমি।' গোপালদা নিজের পাঞ্জাবির পাশ পকেটে হাত ভরলেন, 'গোপালদার অনেক কিছুই জানো, কিন্তু হাত সাফাইয়ের খবর রাখো কি? যখন চোখ টিপে ধরেছিলাম তখনই দেখলাম…'গোপালদা পাণ্ডুলিপিটা বের করলেন।

'দোহাই গোপালদা, লেখাটা ঠিক হয় নি, ওটা কিছু না…মেদিনীপুর থেকে সোজা কলকাতায় ফিরি নি, ক্ষীরপাই গ্রামে আমার এক আত্মীয়

থাকেন। সেখানে গিয়েছিলাম, আগেও গিয়েছি···’ দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়লাম কাগজ কখানা হস্তগত করবার জন্য।

‘কী হচ্ছে কি, এত ছেলেমানুষি কেন। তার থেকে গোপালদা যা বলছেন সুবোধ ছেলের মতো তা পালন করো। তোমার বাজার করা হয় নি, যাও দিকি। তোমাদের মোড়ের ময়রা দোকানে দেখে এলাম অমৃতি ভাজছে, কিছু সংগ্রহ কোরো ততক্ষণ আমি এটা পড়ে শেষ করব। আর হ্যাঁ, বৌমাকে বলে যাও, এক কাপ চা পাঠিয়ে দেবেন···’

‘উঃ গোপালদা!’···হতাশ হয়ে কাঁচুমাচু স্বরে বললাম, ‘ওটা ঠিক গল্প নয়, সত্য ঘটনা···ফর্ম নেই···আচ্ছা, পড়ুন, কিন্তু কোনো মন্তব্য করতে পারবেন না···’

‘তথাস্তু!’

ক্ষীরপাই গ্রামের ওপর দিয়ে ঘাটাল-মেদিনীপুর পাকা সড়ক চলে গেছে। এই সড়কের থেকে বেশ খানিকটা দূরে গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে অধর দোলুইয়ের ঘর। জাতে বাগদি, খালবিলে মাছটাছ ধরে না তা নয়, কিন্তু চাষবাসই প্রধান জীবিকা, লোকে তাকে অধর চাষী বলে ডাকে। পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে সে পেয়েছিল মাত্র চার বিঘে জমি, এখন বয়েস সাড়ে তিন কুড়ি পেরিয়ে গেছে, এখন তার জমি বিঘে চৌদ্দ। নিজের হাতেই আর ছেলেদের কিছু কিছু সাহায্য নিয়ে চাষবাস থেকে আরম্ভ করে সব কাজ করে, এখনও বেশ শক্ত-সমর্থ আছে।

তবে তার বাস্তু-বেড়ের কোনো কমতি-বাড়তি ঘটে নি, যেমন ছিল তেমনি আছে। তা পরিমাণে সেটা বিঘে দুই হবে। ঘরের পিছন দিকে একটা ছোট পুকুর, তার এক দিকে জাত গুঁড়ি-ভেলকোর দুটো ঝাড়—বেশ মূল্যবান বাঁশ, আর এক দিকে কিছু আম-কাঁঠালের গাছ। দুই দফার ঘর—পিছনের ঘরটা ‘কাঁথ’-এর, অর্থাৎ কেবল কুটি মেশানো বিশেষ ভাবে তৈরি কাদা দিয়ে বানানো দেয়াল; আর সামনের সারিটা বাঁশের বেড়া, মাটির প্রলেপ—দুটোরই চাল খড়ের।

অধরের এক মেয়ে দুই ছেলে। মেয়েই বড়, তার শ্বশুর বাড়িও বড় ঘরের চাষী, ছেলেপিলে আছে। দুই ছেলেও বিবাহিত, বড় রতনের দুই মেয়ে, আর ছোট পবনের একটি ছেলে হয়েছে—তার কয়েক মাস বয়েস হল।

কিছুদিন থেকে ছেলেদের সঙ্গে অধরের খিটিমিটি লেগেছে। অধর অবশ্য চিরকালই একটু স্বতন্ত্র, ওর স্ত্রী বলে, 'ছিষ্টিছাড়া লোক', পাড়ার লোকেরা বলে, 'মারকুট্টে গাই'—অর্থাৎ দড়িতে বাঁধা গরুটা দিব্বি ঘাস খেয়ে যাচ্ছে মুচুড় মুচুড় শব্দ করতে করতে, তুমি তার চৌহদ্দির বাইরে দিয়ে চলে যাও, কোনো ঝামেলা নেই, কিন্তু তার ভিতরে গেছ কি শিং নেড়ে তেড়ে আসবে। আড়ালে অধরের সম্বন্ধে যাই মন্তব্য করুক না, পাড়ার লোকেরা ওকে সমীহ করে চলে।

সে যাই হোক, এখন বড় ছেলে রতনের একটা বেমক্কা কাজ ওকে খেপিয়ে তুলেছে। ভিন পাড়ার গঙ্গা দুলে এসেছিল ওর কাছে দু-পণ খড় ধার চাইতে, 'হ্যাঁ গ্যাখো অধরদা, তমার কাছে এলম···'

বাইরে গোচালাটার ধারে দাঁড়িয়ে অধর তামাক টানছিল, গঙ্গার দিকে হুঁকাটা এগিয়ে দিয়ে এবং কাজের জন্য উদ্যোগী হয়ে বলতে আরম্ভ করল, 'ইদিকে আমার জ্যৈষ্ঠ পুত্তের বিত্তান্ত শুনেছ? ছেলে এখন ঘোড়া ডিঙি' ঘাস খায়···'

অধরকে খুশী করা দরকার, হুঁকায় এক টান মেরে গঙ্গা বললে, যদিও তার প্রস্তাবটা পেশ করার সময় সে পায় নি—'কি আবার করল তোমার সে রতন···'

'ওই যে গো, তমার, গবর্‌মেণ্ট (অ) থিকে যে ব্যাঙ্ক (অ) আছে নি, সিখেনে ধার দিবে চাষীদিকে···জানিওনি বাবু কোথা তাদের আপিস-টাপিস আছে··· ইদিকে এক পহর লাঙল মেললে ছঁড়ার কমর ব্যথা করে, আর ছঁড়া সেই খুঁজে খুঁজে সেথা ঠিক গেছে, হঁ···' একটা চরম বিরক্তির ভঙ্গি করে খড় গাদাটার দিকে এগিয়ে গেল অধর, টেনে টেনে পাঁচ গণ্ডা খড়ের আঁটি বের করল, তারপর একটা বড় চাঙারি আর 'ছানি'-কাটা বঁটি নিয়ে খড়গুলো কাটতে বসল গরুর জন্যে।

'কেনে, আজকাল ত সব চাষীই ছুটছে গো ব্যাঙ্কর ধার লিতে, যার কিনা দু-এক বিঘা জমি আছে···'

'তুমি থামো দিকি, তুমি বলবে বৈ কি, তুমি মাথা বিকি দিছ···' গঙ্গাপদকে ঝটকা মেরে থামিয়ে দিল অধর, বঁটির ওপর পা চেপে দু হাতে আঁটিগুলো ধরে ধরে ঘসঘস্ করে খড় কাটতে লাগল। গুম খেয়ে রইল, অনেকক্ষণ কিছু বলল না। গঙ্গাও হুঁকো টানতে টানতে সংশয়ী দৃষ্টিতে ফাঁকে ফাঁকে ওর দিকে তাকাচ্ছিল, সে-ও কিছু বলছিল না।

অধরের দেহের গড়নে বেশ শক্ত সমর্থ ভাব রয়েছে, যেন শুকনো পাকা

বাঁশ। বুড়ো হবার জন্যে এখানে ওখানে চামড়া ঢিলে হয়ে কুঁকড়ে গেছে, কিন্তু কোথাও মেদ নেই। কালো, লম্বা দেহটা, লম্বা হাত-পা। সমস্ত দেহটাই একরকম উলঙ্গ, একটা ছোট পুরনো গামছা সেঁটে পরেছে লজ্জাস্থানে, প্রকৃতপক্ষে তাতে উলঙ্গতা ঢাকে নি। এদের মেয়েপুরুষে সে চেতনা, সে সমস্যা নেই। বিশেষ করে অধর গামছা আর খাটো ধুতি ছাড়া জীবনে কোনো দিন কিছু পরে নি, শীতে একখানা মোটা চেক দেওয়া সুতির চাদর, আর ভিন গাঁয়ে যেতে হলে ফতুয়া।

সে যাই হোক, যেন নিজের মনেই ব্যাপারটা মিলিয়ে দেখছে, এমনি ভাবে বললে, 'বুঝলে গঙ্গা, ছেলেকে আমি বললাম, ধার যে আমি লুব, কেনে, আমার কি দরকার? না, রাসানি (রাসায়নিক) সার কিনবে জমিতে দিবার জন্যে··· কেনে দুব রে বাবু, জমিতে সার?···না চাষের ধরণ বদলি' দিতে হবে, হৈমন্তী ধান রুয়া চলবে নি, ওই যে গো বাবুরা যে আইরেট ধান চল করছে, সেই ধান করতে হবে, তা সে গোবর সারে হবে নি···'

'অধরদা তুমি যাই বলো কেনে, বিঘায় শুনি তিরিশ-চল্লিশ মণ ফলে। আমি দু-বিঘা করেছিলাম, তা পঁচিশ করে ফলেছিল···'

'বটে···' দ্রুত কাজের হাত থেমে গিয়ে কটমট করে তাকাল অধর, 'তুমি আইরেট চালের ভাত খেইচ! উ আবার ভাত না কি, মুখে দিলে ভাতের স্বয়াদ আছে? কেনে জানো, তমার গে ওই রাসানি সার। কী হয় উসব সার ব্যভার করে···দু বছর পরে ত জমির দফা-রফা। দাঁড়াও, তমাকে দেখাই···' হাতের কাজ ফেলে উঠে গেল অধর। স্পষ্টতই উত্তেজিত হয়েছিল, নইলে এমন মাঝখানে কাজ ফেলে যাওয়া তার রীতি নয়। একটু পরে পিছনের ঘর থেকে দুহাতে কয়েকটা করে আলু নিয়ে এসে রাখল গঙ্গার সামনে, আলাদা আলাদা করে। বললে, 'লিয়ে যাও তুমি, ইবেলা উবেলা ভাত দিয়ে খেয়ে দেখবে···'

'উ দেখার কি আছে, উত জানি···' তবু আলুগুলো নিল গঙ্গা। বলছিল, 'রাসানি সারের আলু দেখলেই চিনা যায়। ফলবে খুব কিন্তু শক্ত পাথর। আর তমার সেই আগেকার সরষে আর খইলের সার দাও, তার আলু হবে—তমার গে ভাতে দাও, দানা-দানা মাখন···তমার নিজের জমির আলু আমি খেয়েছি আগে।'

'তবে! তবে তমরা রাসানি সারের পিছে ছুটো কেনে, বলো দিকি?···'

বেশ একটু আত্মসুখী, গর্বিত ভাব নিয়ে অধর আবার তার কাজে বসল।

'তা আর বুঝলে নি? টাকা···দুগুণা ফসল হলে চাষীর হাতে কতগুলা টাকা এসবে বলো দেখি, হাঃ হাঃ···' বোধ হল গঙ্গার বুড়ো চোখও লোভে ঝিকিয়ে উঠল। তারপর হুঁকাটা নামিয়ে রেখে বললে, 'কিন্তু ধরগে; তুমি ত বুড়া হলে, তমার বেটারা যদি তমার কথা না শুনে···'

'শুনবে নি কেনে, তার বাপ শুনবে। আমার জমি, আমি যেমন চাষ করে এস্‌ছি চিরটা কাল, সেই রকম করব, বেশি জারিজুরি করলে শালার বেটাদের ঘাড় ধরে দূর করে দুব, হঁহঁ···তারপর গলার স্বর নিচু করে বললে, 'সে হবে নি, গঙ্গাপদ, সে অরা পারবে নি। শালার ব্যাটা ত গেছল, ত বলেছে বাড়ির কর্তা যদি জমি বন্ধক রাখে তবে টাকা দিবে। বুঝলে, চাবি-কাটি আমার হাতে, বুঝলে হে···আর জমি বাঁধা দুব আমি! শালা, বউকে বাঁধা দিতে যাব নাকি, হাঃ হাঃ···'

গঙ্গাও হাসতে লাগল। 'তুমি কারও কথা শুনবে নি, অধরদা, সে কি আমি জানি নি? চিরকালটাই তুমি নিজের ঝুঁকে চললে, তমার মত চাষী ই তল্লাটে কটা আছে বলো দিকি···'

হঠাৎ গুড়গুড় করে উঠল, আষাঢ় অপরাহ্নের কালো মেঘ আকাশের একটা দিক ছেয়ে ফেলেছে। ব্যস্ত হয়ে উঠল অধর, আকাশের দিকে চোখ তুলে খানিকক্ষণ ঠাওর করে বললে, মেঘের ধরণ দেখে 'ই শালা অঝোরে ঢালবে দেখছি আজ। ইবারে বর্ষাটা একটু নাম্‌লা জল, কি বলো···শালা, গরুগুলা সব মাঠে পড়ে রইছে এখনো···' বলে ও উঠে দাঁড়াল।

আর দেরি করা উচিত নয় দেখে গঙ্গা অধরের কাছে তার প্রস্তাবটা উত্থাপন করল। শুনে ব্যস্ততার মুখে প্রবল ঘাড় নাড়ল অধর, 'না-না তা কি হয়। তা তমার ত ইবারে দুগাদা খড় পেইছিলে—নিজের আর ভাগে মিলিয়ে —কী হল বলো দিকি···'

যেন ধরা পড়ে গেছে এমনভাবে মাথা চুলকে গঙ্গা বললে, 'সে আর বোলো নি অধরদা, চোত মাসে কাহন চারেক বিক্রি করে দিলম নি, দামটা উঠল, তাই···'

'ওই···ওই, তোমাদের সব্বনেশে লোভ, গঙ্গাপদ, বুঝলে! দাম উঠল আর বিক্রি করে দিলে! বলি সে টাকা তমার কাজে লাগল কিছু, আর তোমরা সব প্যাগল, টাকা কখনো থাকে?···বলি ও পুঁটি, পুঁটি···'

ব্যাপারটা যেন ঠেলে সরিয়ে দিতে চায়, এমনি ভাবে অধর মাঠের দিকে খানিকটা এগিয়ে গেল। ওর ডাকে সাড়া দিয়ে বছর চারেকের একটা ইজার পরা মেয়ে বেরিয়ে এল। অধর হেঁকে বললে, 'ওই খড় কেটে দিলম, তরা গইলে কুঁড়া মাখি জাবনা করে রাখ দিকি, আমি গরুগুলা ছেড়ে দিচ্ছি', অধরের এই নির্দেশ ছিল পুঁটির মারফৎ পুঁটির মা অর্থাৎ তার বড় বৌমার প্রতি—এবং সেটা সে পালন করবেই। গঙ্গাকে বললে, 'পারব নি ভাই, আমার খড় তেমন মজুত নাই…'

গঙ্গা বুঝলো যে এটা অধরের ছুত্‌নো, আসলে দিতে চায় না। যারা এইরকম চাষের ফসল লোভে পড়ে বিক্রি করে দেয়, 'দ্রব্যি' গুলো বুকে জাপটে আগলে থাকতে পারে না, তাদের দেখতে পারে না সে। যে নিজেকে সাহায্য করে না অধরও তাকে সাহায্য করে না। গঙ্গা অধরের পিছু পিছু দু-এক পা এগিয়েও গেল, আর একবার বলার জন্য মুখটা নড়ল, ডান হাতটাও তুললে, কিন্তু তখন অধর অনেকটা এগিয়ে গেছে।

একটু পরেই গাছপালার মাথা দুলে উঠে ঝমঝম করে বৃষ্টি এসে গেল। একটু পরেই দেখা গেল বৃষ্টির মধ্যে আলপথ ধরে বা মাঠ ঝাঁপিয়ে গরুগুলো লেজ উঁচিয়ে মাথা নিচু করে ছুটে আসছে, আর পিছন পিছন অধরও বৃষ্টির মধ্যে মাথাটা নুইয়ে মুখে বিচিত্র শব্দ করে ওদের তাড়ছে। গরুগুলো রাস্তা চিনে ঠিক পৌঁছে গেল।

বড় বৌ আর পুঁটি গোয়াল ঘরেই ছিল। পুঁটি গরুগুলোর শিং আর ফোঁস ফোঁস নাকের শব্দে ভয়ে মায়ের পিছনে গিয়ে লেপটে গেল। বউ মাথার কাপড় তুলে দিলে। যার যা নির্দিষ্ট খুঁটি, জাবনার ডাবা আছে, বউ আর শ্বশুর মিলে, গরুগুলোকে সেই রকম বাঁধলে। এক কোণে ছাড়ের মধ্যে ছোটো বাছুরগুলো ছিল—তাদের মাঠে নিয়ে যাওয়া হয় নি—মা-দের দেখে তারা বাঁ-বাঁ করতে লাগল। ওদের খাওয়ার তদারক করে অধর উঠোন পেরিয়ে ঘরের বারান্দায় উঠে দাঁড়াল, কতকটা শ্রান্ত ভঙ্গিতে চালের বাতা ধরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখতে লাগল।

বউ তার আগেই ঘরে ঢুকেছিল, এখন একটা ছোটো জামবাটি আর টিনের কৌটো বের করে ওর সামনে এনে রাখল, সরষের তেল আর কেরাসিন আনতে হবে।

'এখন অবেলায় আবার বাজারে ছুটতে হবে, বাবু…' অধর বললে কিন্তু তার

গলায় অনুযোগ বা রাগের চিহ্ন ছিল না। ঘর-গেরস্থালির যা দরকার, তা মিটিয়ে দিতে কোনো দিন সে বিরক্ত বোধ করে না। ভিজে মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে কতকটা জল ঝেড়ে ফেললে অধর। পাত্র দুটো তুলে নিয়ে সেই একবিঘত ভিজে গামছা পরেই আবার বেরিয়ে পড়ল। গাছের মতো খরার রোদ, বৃষ্টির জল আর শীতের কাঁপুনি ওরা সহজেই গায়ে নেয়, কিছু হয় না। একটু দূরে গিয়ে বললে, 'বড় বৌমা, ছাঁদন দড়ি আর বালতিটা বার করে রাখো, আমি চট করে ফিরে এসে গাই দুয়ে দুব...'

একটা কথা মনে হল অধরের। গঙ্গাপদকে-খড় দিলে হত ; বড় মুখ করে চাইলে। হুঁ—মাথা নাড়ল অধর। আচ্ছা, যাচ্ছে তো সে বাজারে, কারও মারফৎ খবরটা পাঠিয়ে দেবে, চাই কি গঙ্গাপদ নিজেও বাজারে থাকতে পারে। কাল সকালে কিছু খড় যেন সে নিয়ে যায়।

অধর চাষীর দুই প্রস্থ ঘরের মধ্যে পিছনেরটায় সে রাত্রি কাটায়। তাতে একটাই বড় শোবার ঘর। পাশের ছোটটায় রান্নাবান্না হয়। বড় ঘরটার মাঝখানে আবার 'চাঁচ'-এর বেড়া দেওয়া, তাতে দুটো ছোট কুঠরির মতো হয়েছে। তার একটাতে ছোট ছেলে পবন তার বউকে নিয়ে থাকত, এখন সে ক্ষীরপাই যেখানে শহর বাজার বসে, সেখানে উঠে গেছে বউকে নিয়ে। এই নিয়ে তার মা এক তুলকালাম বাধিয়ে ছিল অধরের সঙ্গে, 'হ্যাঁ গা, ই কি কাণ্ড! ছেলে গেরত্যাগী (গৃহত্যাগী) হচ্ছে আর তুমি কিছু বলছি নি, কেমন ধারা বাপ তুমি গো! বেটাকে কি এই জন্যে নেকাপড়া শিখিছিলম, এঁ্যা...'

'এখন আঁকপাঁক করছু কেনে, ছোটকি...তখন যে লাফিছিলি বেটা লেখাপড়া শিখবে, বেটা লেখাপড়া শিখবে, তার কি...'

'তাই বলে চলে যাবে, এঁ্যা...'

'কেনে, ডানা গজালে সে উড়বেনি, তোকে আঁকড়ি থাকবে নাকি...'

মাঝে মাঝে অধর অদ্ভুত মনোভাবের পরিচয় দেয়, যা ওর সংসারের লোকজন এবং পাড়া-পড়শীরা বুঝতে পারে না। এ ব্যাপারেও তাই। পবন যখন চলে গেল, সে হ্যাঁ-না বলে নি, ঝগড়া-ঝাঁটিও করে নি। এমনকি স্বল্প আয়ে সংসার চলে না বলে ছেলে বা ছেলের বউ এসে আজ চালটা ডালটা কাল ক্ষেতের আলু-কুমড়ো-পেঁয়াজটা নিয়ে যেত, তখনও কিছু বলে নি। বাপের আছে বেটা নেবে তার আবার কি।

সে যাক। সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর কেরাসিনের কুপি হাতে করে অধর তার কুঠরিটায় বিছানায় এসে বসল, একটু দূরে আলোটা রেখে। একটু আগে মাটির মেঝের ওপর মাদুর-কাঁথা পেতে বালিশ দিয়ে বিছানাটা পেতে রেখে গেছে তার স্ত্রী, ননী। এখন সে অপেক্ষা করবে, ননী ওর হুঁকো দিয়ে যাবে।

বিছানায় বসে একটা আরামের উদ্গার তুলল অধর, অভ্যাস মতো। কিন্তু আজ দেহটা কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছে, বুকের ভেতরটায় ভারী চেপে রয়েছে যেন। আবছা আলোয় ঘরের চারদিকটা তাকিয়ে দেখল ও। সামনের দেয়ালে ঠাকুর-দেবতার পট, পাশের দেয়ালে আলনায় কাপড়-চোপড় টাঙানো, কোণে কোণে হাঁড়ি-কুড়ি, তোরঙ্গ-প্যাঁটরা। চাঁচের বেড়ার ওদিকের কুঠরিটায় কিচকিচ করে ছুটে গেল, ছুঁচো নিশ্চয়ই। কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হল অধর, একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। পবন ছেলেটা ঘর ছেড়ে চলে গেছে—রাগ করে কি? ওদিকটা ফাঁকা।

একটা কথা মনে পড়ল অধরের। তখন পবন বিয়ে করে বউ এনেছে। ওদিকটায় শুতে দিয়েছে ওদের। পরের দিন দুপুরে একান্তে ননী অধরকে বলেছিল, 'হ্যাঁ গা, তুমি কি মানুষ! বউ-বেটার জন্যে আলাদা একটা ঘর তয়ের কর দিকিনি…'

'কেনে, চাঁচের বেড়া ত লাগি দিলম, উ আর একটা ঘর হয়ে গেছে…'

'হ্যাঁ, ভারি ত চাঁচের বেড়া, নিঃশ্বাস ফেললে শুনা যায়। উধারে বউ বেটা, আর ইধারে তমার সঙ্গে আমি থাকতে পারব নি…'

'থাকবি নি ত কার ঘরে কার সঙ্গে থাকবি?'

'আ মরণ! আমি লয় শাশুড়ী, আমার নোজ্জা করবে নি? আর তুমি ই কেমন ধারা শ্বশুর, এ্যাঁ…'

খ্যাক খ্যাক করে হাসছিল অধর, 'তোর নোজ্জা করবে কেনে! জুয়ান-জুয়ানী এক জায়গায় থাকলে যা করার তাই করবে, তুই কি রাত্রে জেগে জেগে কান পেতে পড়ে থাকু নাকি! শুবি আর ঘুমাবি…'

'তুমি বললে বটে…' জেগে পড়ে থাকা—কথাটায় বুড়িও লজ্জা পেয়ে গেল।

'নোজ্জা! কেনে তোর লালি গাই যখন 'পাল' তুলে, আর আমি ষাঁড় এনে 'পিটাই', তখন তোর নোজ্জা করে, এ্যাঁ…?'

'আমি বলেছি ঝকমারি হয়েছে…' রেগে উঠে গিয়েছিল বুড়ি, 'তুমি যেমন

বেহায়া বাপ-শ্বশুর !'

একটু পরেই ননী এক হাতে হুঁকো অন্য হাতে কলকের মাথায় কয়লার আগুন দিয়ে ফুঁকতে ফুঁকতে এসে হাজির হল, 'লাও দিকি, তুমি ফুঁক দিয়ে লাও…' বলে কলকেটা এগিয়ে দিলে।

ননীর রোগা পাতলা শরীর, বেশ চুল পেকেছে, পরণে ময়লা খাটো শাড়ি, কলকেটা এগিয়ে দিয়ে হাতটা শাড়িতে মুছল।

অধর তাকিয়েছিল ওর দিকে, সেইভাবে কিছুক্ষণ থেকে একরকম করে হাসল, 'কেনে, আমি নিজে ফুঁক দুব কেনে। তুই রোজ দেও, আজও দিবি…'

'হাসছ কেন, আমার হাতে এমন অনেক কাজ, ধরো দিকি…'

'কাজ ত দু-দশ বছর আগেও তোর ছিল, ছোট কি…' স্থির দৃষ্টিতে বুড়ির মুখের দিকে তাকাল অধর, গলার স্বর বিষণ্ণ কিন্তু একটা পরিহাসের ভাবও ছিল, 'ত্যাখন ত উসব বলে উঠে যেতিস নি, এখন বুড়া ভাতার বলে খাতির কমে গেছে লয় ?'

'ঢঙ ! যত বুড়া হচ্ছে তত রস বাড়ছে, লাও, ধরবে ত ধর, লয় নামি রেখে চলে যাচ্ছি আমি…'

'ধরব কি, ধরার বয়স কি আছে, হ্যাঃ-হ্যাঃ…'

এবার সত্যি সত্যিই মাটির ওপর কলকেটা রেখে বুড়ি ঠরঠর করে চলে গেল। তাকিয়েছিল অধর সেই দিকে। এই রকম গা দুলিয়ে মুখ মুড়ে ননী কতবার চলে গিয়েছে—কিন্তু এখন বুড়িটা কিরকম হয়ে গেছে, হাত-পা কাহিল হয়ে গেছে। চৌকাঠে বুড়ি হোঁচট খেল, আর একটু হলে পড়ে যেত।

আস্তে আস্তে ফাঁক দিয়ে হুঁকো টানছে অধর। মাথার মধ্যে ঝিম ধরে আসছে ; রাত হয়েছে বোধ হয়। পিছনের এটা-ওটা মনের ওপর দিয়ে ভেসে যায়। ওই ননী তখন এক ছেলের মা, ভর যোবতী, সোন্দরী ছিল। বামুন-পুকুর থেকে স্নান করে ভিজে কাপড়ে কাঁখে কলসি নিয়ে আসছিল, পথে জামতলায় ও পাড়ার লবা আর বটেকেস্ট—ওরই বয়েসী হবে ছোঁড়া দুটো—জামগাছে উঠে পাকা জাম খাচ্ছিল আর মনের সুখে দুদিন আগে হয়ে-যাওয়া কেষ্টযাত্রার গান হাঁকছিল। হঠাৎ—বউটাকে দেখেই বানরের মতো এ-ডাল ও ডালে ঝুলোঝুলি আরম্ভ করে দিলে। তাই দেখে বউটা খিলখিল করে হাসছিল। মাথার কাপড় গিয়েছিল খুলে। স্বচক্ষে দেখেছিল অধর—মাঠ

থেকে হেলে গরু ছেড়ে দিয়ে বাঁকের মাথায় হিজলতলায় আসছিল সে। ভয়ে কাঠ হয়ে ননী দ্রুত পায়ে ঘরে এসে ঢুকেছিল। পিছন-পিছন লাঙল-ছড়িটা নিয়ে ঢুকেছিল অধর। সপাং সপাং করে পিঠে আর পাছায় কষে দিয়েছিল, 'ঢলে পড়, শালী, কত ঢলে পড়বি পড়···'। আর কোনো দিন ননীর আর কিছু দেখে নি সে।

কথাটা হঠাৎ মনে হল অধরের। সে কতদিন আগেকার কথা—ঝাপসা! কিন্তু বুকের ভেতরটায় কীরকম কষ্টের মতো লাগল ওর। রাগ মানুষের চণ্ডাল। হুঁকোটা দেয়ালে একটা পেরেকে টাঙিয়ে রাখল সে। তারপর শুয়ে পড়ল। বিছানার চাদরটা কেমন ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে লাগছে।

আজই বিকেলে গঙ্গা সাঁত বলছিল, ওর ছেলেদের কথা। ব্যাঙ্কে ধার নেবার বিষয়ে। 'অরা যদি তোমার কথা না শুনে···?' সত্যিই তো। যদি না শুনে, সে আটকাবে কেমন করে? গলা টিপে মারবে অমন জোয়ান ছেলেকে? হাত-পা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে অধরের। আর ননী, সেই তখন যদি মার খেয়ে তার কথা না শুনত, যদি ঘর থেকে পালিয়ে যেত?

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল অধর। ওর নিঃশ্বাস দ্রুত, হাত-পা শক্ত হয়ে উঠছে, 'হঃ! শালার বেটা ব্যাঙ্কর ধার লেউ দিকি, দেখি কেমন পারে··· জমি আমার, শালার বেটার বাপের লয়। পেঁদিয়ে ফাটি দুব নি, ইঃ···' গলার মধ্যে অজান্তেই ঘড়ঘড় করতে লাগল ওর, কাল্পনিক লাঙল-ছড়িটা ঘোরাতে লাগল ও।

সকালবেলা বুড়ির হাত ঠেকল ওর গায়ে। তারপর সে কপালের ওপর হাত রেখে বলে উঠল, 'হ্যাঁগা, তমার গা গরম কেনে, জ্বর হইছে নাকি···' বলতে গিয়ে বুড়ি নিজেই নিজের কথায় সংশয়ী হয়ে উঠল, অধরের জ্বর জ্বালা হয় না, কোনো দিন 'চোঙা-বদ্যি'-র কাছে যায় নি ও (স্টেথসকোপের জন্যে ডাক্তারদের ও চোঙা-বদ্যি বলে ঠাট্টা করে)।

ঘুম ভাঙা চোখে বউয়ের দিকে মিটমিট করে তাকাচ্ছিল অধর, 'জ্বর হয় নি গো, হইচে রাধার কামজ্বর, কেস্ট-বদ্যি চাই···'

রাগ করল না ননী, বললে, 'না গো, তুমি বুড়া হলে, ত্যাখন নায় রক্তের জোরে কেটেছে, এখন একবার যাও না বাবু বদ্যির কাছে, কাল অবেলায় মাথায় ভিজলে···'

'দুস শালী' উঠে বসল অধর, তুই যা না বত্তির কাছে। তোদের মাগী-ছুঁড়ি দেখলে বত্তিগুলা···আগে বত্তিরা মাগীদের হাত টিপত। আর এখন চোঙা দেয় মাগীদের বুকে, হ্যাঁ হ্যাঁ···'

'তমার সঙ্গে কথায় কে পারবে বাপু, বুড়া হলে রঙ মস্করা গেল নি···আর শুনবে ত নি কারও কথা তুমি, তমার চিরকেলে গোঁ'···গজর গজর করতে করতে চলে গেল বুড়ি।

আজ অম্বুবাচী, হলকর্ষণ নিষিদ্ধ, এমনকি মাটির অঙ্গে একটা আচড় পর্যন্ত কাটা চলবে না। সকাল বেলাটা উঠেই কি রকম নিষ্কর্মা ফাঁকা ফাঁকা লাগে—কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্য। তারপরই ভুলে গেল সেটা অধর। কাজের কোনো সময়ই অভাব হয় না ওর।

কাল বড় বৌমা বলেছিল (এখন তারই হাতে রান্নাবান্নার ভার) 'জ্বালুন'-এর অভাব। মুস্কিল। আজ কুড়ুল ধরে কাঠ ফালা করা চলবে না—কেননা, মাটিতে গর্ত হয়ে যাবে। অধর বাড়ির পিছনের দিকে বাগানে চলে গেল। গেল চৈত্র মাসে হিজল-করঞ্জার ডাল কেটে 'জাঁক' দিয়ে রাখা হয়েছিল, প্রখর রোদে শুকনো খটখটে হয়েছিল প্রথমে, এখন বর্ষায় ভিজে গেছে। সেই ডালগুলো 'জাঁক' থেকে তুলে ভাঙতে লাগল অধর। একটা ডাল তোলে, আর তার গা থেকে শুকনো, পচা পাতাগুলো ঝরে ঝরে পড়তে থাকে। একদিকে 'জ্বালুন'-এর বোঝা যত বড় হতে লাগল, অন্যদিকে পাতার গাদাও। বোঝাটা বড় হতে দুই হাতের কোলে বুকে চেপে বয়ে আনল অধর, রান্নাঘরের পাশে দাওয়ায় জড় করে রাখল।

বড় বৌমা গোয়াল ঘরে ঢুকেছিল। অধর গিয়ে তাকে সাহায্য করতে আরম্ভ করল, এরকম সে করেই থাকে, তাতে কেউ ব্যস্ত হয় না। বললে, 'বৌমা, তুমি গইলের চনাগুলা জড় কর দিকি, গোবর লি যেয়ে গাদায় দাও। আমি গরুগুলা বার করছি···'

কাজ চলছিল, কিন্তু বড় কালো এঁড়েটাকে বের করতে গিয়ে একটা কাণ্ড ঘটে গেল। দড়ি ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ কি হল, এঁড়েটা টান ধরল, হড় হড় করে টেনে নিয়ে গেল অধরকে। যা কখনো হয় নি, দড়িটা ছেড়ে গেল অধরের হাত থেকে, আর ধপ করে পড়ে গেল সে।

'ওমা, কি হল গো···' বউমা ছুটে এসে দাঁড়াল অধরের সামনে, শ্বশুরের

গায়ে হাত দিয়ে ধরে তুলবে কিনা (যা কখনো হওয়া সম্ভব ছিল না) ইতস্তত করতে লাগল। বাড়ির আর সব যে যার কাজে চলে গেছে, এমনকি পুঁটিটাও শুশনি শাক তুলতে গেছে।

অধরের মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে, ডান হাতটা ঠেকনো দিয়েছে মাটিতে। আস্তে আস্তে মাথাটা তুলবার চেষ্টা করল ও, চোখের দৃষ্টি শূন্য। অধর অনড়, আর বউয়ের সমস্ত আগ্রহ সত্ত্বেও নিষ্ক্রিয়—ঘড়ির কাঁটা থেমে যাওয়ার মতো কয়েকটা মুহূর্ত।

একটু পরেই অধর উঠে দাঁড়াল, যেন সব ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। নিঃশ্বাস ফেলে বললে, কণ্ঠস্বর একটু দুর্বল আর মনে হয় কাঁপা কাঁপা, 'পা পিছলে পড়ে গেলম, বাবু' তারপরই আবার আদেশের স্বরে বললে, 'ওই—দাঁড়ি আছে ছাখ (অ), এড়ে বাছুরটা চলে গেল যে, যেয়ে ধরো···ছুটো একটু ···

মেয়েমানুষের জড়ানো জড়ানো পায়ে ছুটে গিয়ে বউ এঁড়েটা ধরল।

তখন বেলা প্রহরটাক গড়িয়ে গেছে। অধর বেরিয়েছে ক্ষীরপাই বাজারের দিকে, সকালবেলার ঘটনার কোনো চিহ্ন নেই তার শরীরে মনে। সুতো আর তকলি হাতে। উঁচু করে ধরা বাঁ হাতে সুতোর গোলা, ডান হাতে তকলিতে জড়ানো তার প্রান্ত। হাঁটতে হাঁটতে মাঝে মাঝেই ডান পা তুলে তকলিটা ঘসে ঘুরিয়ে দিচ্ছে, সুতো পাক দেবার জন্য। এই সুতো কাজে লাগবে জাল তৈরির জন্য। চাটুনি বা কলি জাল।

বাজারে ঢুকছে, একটা সারের দোকানের সামনে থমকে দাঁড়াল অধর। ভিতরে চাষা লোক দুটো ছোকরা, এক ছেলে দু-ছেলের বাপ হবে। রাসায়নিক সার কিনতে এসেছে। দু-জনে দু-বস্তা। 'ছাই হবে, চাষ হবে···দুদিনেই জমির দফারফা নিজের মনেই গজরাতে গজরাতে এগোল অধর; 'আরে বাপু, সার ত চাষার নিজের হাতে, মা বসুমাতা ত মাটি দিছে, গোবর দিছে··· তোর গতরে হিংমত দিচ্ছে, জোরে চেপে ধর ল্যাঙলের ফাল, মাটিকে দে উল্টে, ঘাসের ঝাড়েবংশে 'শুকি' 'শুকি' পচে পচে এমন সার হবে নি? তা লয়'···

ওর চিন্তাধারায় বাধা পড়ল। লক্ষ্য করল, পথ দিয়ে দলে দলে লোক যাচ্ছে কোথাও হুড়মুড় করে। মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো সবাই। ওকে পেরিয়ে গেল অনেকেই। একজনকে ডেকে বললে, 'হ্যাঁ গো বাবু, তমরা সব যাচ্ছ কোথা···'

'তা জাননি ? বুড়া শিবের আটচালায় গরমেণ্ট থিকে চাল-ডাল-কাপড় বিলি করছে। যে যাচ্ছে তাকেই দিচ্ছে। তুমি যাবে নি ? গেলেই পাবে··· চলো···'

'আমি যাব ?···' হা হা করে হেসে উঠল অধর, 'যাব নি কেনে, চলো চলো···'

খবর দেনেবালা লোকটা থতমত খেয়ে গেল, সংশয়ী দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল ওর দিকে ; কিন্তু আর কিছু না বলে এগোতে লাগল, এবারে ওর গতি খানিকটা মন্থর, অধরের পিছু পিছু।

দাতব্যের জায়গাটাতে হাজির হল কিন্তু অধর। 'আরে বাপ। এক কড়ায় কিনেছি খাসি, লোক জুটেছে বারশ আশি···' আপনা-আপনিই কথাগুলো বেরিয়ে এল ওর। সমস্ত আট চালাটা লোকে গিসগিস করছে, আরো এসে জুটছে সব। ভিড় ঠেলে, পাশ কাটিয়ে জায়গাটায় গিয়ে হাজির হল অধর, যেখানে বস্তাবন্দী কাপড় আর চাল ডাল জড়ো করা আছে, তিন জন বাবু দিচ্ছেন নাম লিখে লিখে, পাশে স্থানীয় এম-এল-এ স্থহাস বাবু দাঁড়িয়ে তদারকি করছেন।

'আরে, অধরদা যে, কাপড় একখানা নেবে নাকি, লাইন দিতে হবে কিন্তু··· বেশ আত্মতৃপ্ত হাসি হেসে স্থহাসবাবু বললেন।

'আমি কাপড় লুব ?···' তকলি ঘুরানো বন্ধ করে অধর বলে উঠল, 'দেশটাকে ভিকারী করে দিলে গো তোমরা, সব বাঁধা পড়ে যাচ্ছে গো···'

'ভিখারী !' স্থহাসবাবুর গলার স্বর বদলে গেল, রিলিফ ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীরাও থমকে গেলেন। ওই যে আপনার লাইন লাগাইছেন, তার সবার ঘরে কাপড়ের পয়সা নাই ? বলু দিকি বুকে হাত দিয়ে···' অপেক্ষা করল না অধর, অতগুলো অবাক লোকের মাঝখান থেকে হনহন করে চলে গেল। 'গরমেণ্ট নাম কিনছে গো, বাবুরা সব দাতা কন্ন হইছে···'

সেদিন সন্ধ্যে হয় হয় এমনি সময় মাঠের দিকে গেল অধর, কিছু কাজ না থাকলেও মাঝে মাঝে এমনি ঘুরে আসে। জমিগুলো দেখে তার নিজের আর অপরেরও। কিন্তু সে অবাক হয়ে গেল এই দেখে যে তার বড় ছেলে রতনও জমিতে এসেছে। ওদিকে মুখ করে তাদেরই আড়াই বিঘেটার দিকে তাকিয়ে কোমরে দু-হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'হাঁ, এই ত চাষী…' মনে মনে হাসল অধর, খুশি হয়ে। জমির দিকে এমনি করেই তো চাষী তাকিয়ে দেখবে, নতুন বউয়ের দিকে যেমন ভাব-লাগা চোখে তাকায়।

'কি রে রতনা, কখন এসছু ?'

'এঁ্যা হ্যাঁ…' চমকে থতমত খেয়ে ফিরে তাকাল রতন, 'এই এলম…', যেন কিছু একটা লুকিয়ে করছিল, হঠাৎ ধরা পড়ে গেছে।

অধর তাতেও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আছে দেখে বললে, 'বিকালা কাজ ছিল নি, তাই ভাবলুম একবার ঘুরে যাই জমিগুলো। ভাবছি, কাল-পরশুই চাষ দুব একটা, তুমি কি বলো…'

'হ্যাঁ ঠিক বলেছ…' এবার অধর নিজেই পরীক্ষার দৃষ্টিতে তাকাল জমি-গুলোর দিকে, 'ইবারে চাষটা কিন্তুক উপর উপর দিতে হবে, সার ছড়িয়ে… হব কি জানু, ঘাসের গোড়া লাড়া খেয়ে জেগে উঠবে, তারপর ঢল বর্ষা নামলে ডুবি চাষ দিবি, দেখবি যে ঘাস-সার পচে ক্ষীর হয়ে গেছে, তায় যখন রুইবি, তখন কী হবে বল ত…'

'আচ্ছা, বাবা, তমার কি মনে লেয় নি…যদি আমরা জমিএ রাসানিক সার দি ! থালে তুমি যা বলছ তার থিকে চারগুণ ভাল হবে…'

'এ্যাই এ্যাই এতক্ষণ ত বেশ ছিলি, চাষীর মতন, দেখে পরাণটা জুড়াল …ত এমন আচাষীর মতো বলছু কেনে, মাটি তয়ারি হয় গতরে, চাষীর গতরে, গতরে বুঝলি…' করুণ, আদর-মাখা স্বরে বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল অধর।

ফিরবার সময়—তখন আঁধার হতে শুরু করেছে অথচ কাছাকাছি সব দেখা যায়—মাঠের একটা জমির ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল অধর; সঙ্গে সঙ্গে রতনও জমিটার আলের একদিকে তিনটে হিজল-জাম-খেজুর গাছ জড়াজড়ি করে রয়েছে, অত বড় মাঠটায় আর এমন গাছ নেই। জমিটার দৌড় বেশ, এক প্লটে সাড়ে পাঁচ বিঘে। ওটার ডাক ছিল তেগাছা জমি, এখন হয়েছে গলা-দৌড়ের জমি। এর আগেকার মালিক হরু ঘোষ ঐ হিজল গাছটায় গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল বলে।

'কি…থেমে গেলে কেনে…' কীরকম ভয় পাওয়া স্বরে বললে রতন।

'জানু ত সব বেত্তান্ত…'

হরু ঘোষ রায়েদের কাছে জমিটা বাঁধা রেখেছিল পাঁচশ টাকার জন্যে, সাফ

বিক্রি কোবালা করে। কিন্তু টাকা যে দিতে পারে নি, পাঁচশ টাকায় যেটুকু জমি হয় ছেড়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু রায়েরা ছাড়ে নি। অসহায় ক্রোধে হরু ঘোষ বলেছিলে, 'আমি গলায় দড়ি দুব, ভূত হয়ে থাকব, দেখি কেমন তারা জমি ভোগ করে!'

রতন বাপকে বললে, 'জানি ত বেত্তান্ত, কিন্তু কেনে…'

'থালেই দেখ। খতিয়ে দেখ। হরু ঘোষ লোভে পড়ল, টাকা ধার করে দুদিন বাবুয়ানা করল…মরণফাঁস পরল জমিটা বাঁধা রেখে। আর এই যে অপঘাতে মরল গলায় দড়ি দিয়ে—হল রায়বাবুদের কিছু? তাদের 'অমুক' গিঁড়ে পড়ল…'

'হুঁ…চল কেনে…'

বাপের কথা রতন কতটুকু বুঝল কে জানে, কিন্তু ভর সন্ধ্যায় জায়গাটায় থাকতে ভয় করছিল ওর। আর এক রকম করে অধরের মনেও ঘটনাটা চেপে বসেছিল। বাকি পথটা কেউ আর কোনো কথা বলল না।

এরপর দিন দশেক কেটে গেছে। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, রতন বাপের কথা মেনে নিয়েছে, জমি বন্ধক দিয়ে সার বা চাষের অন্য কোনো সরঞ্জাম কেনার কথা ওঠে নি। রোজকার কাজকর্ম যথারীতি চলছে।

সেদিন মাঠে বাপ-বেটায় লাঙল চষতে গিয়েছিল। বেশ মনের সুখে চাষ দিয়েছে দুজনে। ফিরতে দেরি হয়ে গেছে বলে ওদের মনে কোনো অসন্তোষ সৃষ্টি হয় নি। অধর বরঞ্চ বেশ খুশী। বাপবেটায় এক সঙ্গে বসে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেল ওরা। বুড়ি খাওয়াচ্ছিল ওদের। ঢেঁকিছাঁটা চালের ভাত, বিরির ডাল, বড়ি পোস্ত, আর কুচো-চিংড়ির ঝাল চচ্চড়ি।

কিন্তু খাওয়াটা বোধহয় বেশি হয়ে গিয়েছিল, একে অবেলা, তায় ক্ষিদে ছিল অত্যধিক। বাইরের ঘরে দাওয়ায় একটা খেজুর পাতার চাটাই পেতে হুঁকো টানতে টানতে বুঝতে পারল অধর। পুঁটিকে দিয়ে একটা বালিশ আনিয়ে একটু গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু পেটের ওপর দিকটা বেশ চেপে রয়েছে, আর খুব গরম লাগছে।

বেলা গড়িয়ে গেছে। ঠিক ঘুমোয় নি, ঘুম হল না। আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়ল অধর। বউমাকে ডেকে বললে, 'রতনা কোথা গেল, জানো…'

'বাজারের দিকে গেছে তমার ছেলে…'

'কেনে আবার! তুমি আজ মাঠ থিকে গরুগুলা লি এস দিকি…আমি

গাড়ি-এ সার তুলব। পুঁটিকে লিয়ে যাও—তমার শাউড়ী কোথা, ধান ভানতে গেছে?…'

কিছুক্ষণ পরে গরুর গাড়িটা টেনে গোবর সারের বড় গাদাটার কাছে টেনে নিয়ে এল অধর। সারা বছর ধরে গোবর খড়কুটা গোয়াল-ঝাঁট সব জড়ো করে করে উঁচু সারে টিপিটা হয়েছে। বড় কোদালটা হাতে কাজ আরম্ভ করার আগে কিছুক্ষণ টিপিটার দিকে তাকিয়ে রইল অধর, তারপর লেগে গেল।

আস্তে আস্তে আলোর তেজ কমে এল, মেঘও দেখা দিয়েছে, কিন্তু বৃষ্টি নেই। বেশ গুমোট, অধর ঘামে নেয়ে গিয়েছিল। টিপিটার প্রায় আদ্ধেক মতো কেটে শেষ করে ফেলেছে ও। কিন্তু কোদালটা যেন বেশ ভারী লাগছে, সারও ঝুড়ি ভরে গাড়িতে তুলতে অসুবিধে হচ্ছে।

তা হোক, গাড়িটা ভর্তি করে রাখলে তবে বলদ দুটো কাল সকালে মাঠে টেনে নিয়ে যাবে।

আরো কিছুক্ষণ কাজ করেছে অধর। ভর্তি ঝুড়িটা আর তুলতে পারল না এবার। বরঞ্চ ওর পেটে-পিঠে ধাক্কা মারল যেন কেউ। মাথাটা ঘুরে উঠল, অন্ধকারের মতো।

'রাম, রাম…' বলতে বলতে ঝুড়িটা পাক দিয়ে ঘুরে গেল যেন, অধর মাটি ধরে বসে পড়ল।

সন্ধ্যার পর আলো নিয়ে ওর বাড়ির লোকেরা ওকে খুঁজতে এসে দেখলে, সারের টিপির আদ্ধেকটার বেশি কেটেছিল অধর, একটা গুহার মতো হয়ে গিয়েছিল। তাতে হেলান দেওয়া ওর দেহ, চোখ দুটো আধ-বোজা, দাঁত একটু ফাঁক—যেন হাসছে।

ঐ হাসিটুকু বাদে সারের গাদা থেকে মানুষটাকে আর আলাদা করা যাচ্ছে না।

লখিয়ার বাপ

অসীম রায়

নদীর দিকে মুখ ফেরাতেই সে আগুনের কুণ্ডে প্রবেশ করে। নদী মানে সামনে মাইলখানেক চওড়া জলন্ত বালি। একটা জায়গা ছাড়া কোথাও চোখ আটকায় না, সেখানে এই জলন্ত গেরুয়ার মাঝখানে একটা সবুজ লরী আটকে আছে। চালক নেই সঙ্গী নেই, রোদ্দুরে ঝলকাচ্ছে নিশ্চল যন্ত্র। রাতে বালি চালান যাবে।

সামনে বড় মাদি শুয়োরের পা-টা জড়িয়ে যায় দড়িতে। ছানাগুলো দাঁড়িয়ে পড়ে। লখিয়ার বাপ নিচু হয়ে বসে দড়ি ছাড়াতে ছাড়াতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং তার অসহায়তা আন্দাজ করেই নাকের ভেতর থেকে আওয়াজ বার করে জন্তুটা। প্রায় তিন মাইল খুঁজেও সামান্য জল কিংবা পাঁকের সন্ধান পায় নি তারা।

পাশে পীচের রাস্তা থেকে ভাপ ওঠে। খানিকটা দূর চকচকে কালো রাস্তার ওপর চোখ-ঝলসানো ধোঁয়া। তিরিশ হাত দূরে যে পাকা একতলা ঘরখানা দু-বছর আগে গ্রামসেবক সেণ্টার ছিল এবং যার দেয়ালে আলকাতরায় লেখা—"খাটমল্ সে সাবধান"—তাও সেই রুপোলী ধোঁয়ায় অদৃশ্য। ফল্গুর ধারার মতো প্রবাহিত বলে কথিত সেই কিংবদন্তীর নদীতে এক ফোঁটা জল নেই। এই তিন মাইলের পর আরও তিন মাইল উজিয়ে যেখানে নদী বাঁক নিয়েছে, সেখান থেকে জল ছেঁচে ছোট এক কুঁজো জল আনে লখিয়ার দিদি একদিন অন্তর। ভাত ফোটানোর পর অবশিষ্ট দু-তিন গেলাস জলে প্রায় দুদিন। লখিয়ার বাপ ঠিকমতো হিসেব করে দিয়েছে—সে আর তার দুই মেয়ে, প্রত্যেকের ভাগে এক গেলাস জল। কিন্তু মেয়েরা, বিশেষ করে লখিয়া, তার এ হিসেব মানছে না। সে বলে দরকার হলে আবার যাবে জল আনতে। যেখানেই পাবে জল সেখান থেকেই সে জল নিয়ে আসবে এই রকম দুর্বিনীত কথা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার বাপের প্রচণ্ড থাপ্পড়ও খেয়েছে। কিন্তু লখিয়া মেনে নেয় নি, তাকে নিয়েই তার বাপের ভাবনা।

পাক খেতে খেতে হাওয়া আসে আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে। সেই আগুনে হল্কায় শুয়োরের পাল দাঁড়িয়ে পড়ে। তাদের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। পেছনের দুটো বাচ্চা মায়ের পেটের তলায় ছায়া সন্ধান করে। মাথায় ভালো করে শুকনো খড়খড়ে গামছাটা জড়ায় লখিয়ার বাপ। "খাটমল্ সে সাবধান" লেখা দেয়ালের গায়ে এক চিলতে পাকা ড্রেনে ছিল পেঁকো কাদা থাকার সম্ভাবনায় সেদিকে এগিয়েই থমকে যায়। আগুনে হাওয়া তার অজস্র জিভ দিয়ে চেটে-পুটে রেখেছে গোটা ড্রেন। আবার দাঁড়িয়ে পড়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেয় শুয়োরগুলো। 'হেই হেই!' গলার আওয়াজের সঙ্গে দু-তিনটে পাথর এসে পড়ে। লখিয়ার বাপ হাতের কঞ্চিটা নাড়ে। আবার তারা পাকা রাস্তার সমান্তরালে চলতে থাকে।

লখিয়া ক্রমশই ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মোতিয়াও ভাবনার কারণ ছিল, কিন্তু ভগ্‌ওয়ান বাঁচিয়ে দিয়েছেন। প্রবল বসন্ত রোগে সারা মুখে এমন দাগড়া দাগড়া ক্ষত, নাকের ওপর গালের ওপর এমন বড় বড় গর্ত যে তাকে লুট করবার ইচ্ছে এখন কম হতেই পারে। কিন্তু দিনকে দিন সৌন্দর্যের অভিশাপে ঝলমল করছে তার সতেরো বছরের ছোট মেয়ে লখিয়া। আবার যদি তাদের ঝুপড়িগুলোয় বসন্ত রোগের প্রকোপ দেখা দেয় তাহলে সে বাঁচে। কারণ বাহিরে সমস্ত কাজে একমাত্র বড় মেয়েই হাত নাড়ু। বিয়ে-সাদির পরবে এখান থেকে সবচেয়ে কাছে আট মাইল দূরের রেল স্টেশন, শকট—যেখানে বেত শনের রঙীন ঝুড়ি ডালা বিক্রি, তিন চার মাইল উজিয়ে ফল্গুর বুক থেকে জল ছেঁচে আনা এ সমস্ত কাজে বড় মেয়েই ভরসা। এ অঞ্চলে ধান লুটের সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে লুট ভীষণ বেড়ে গেছে। এবং হরিজন মেয়ে লুট হয়ে গেলে পুলিশ আউট-পোস্টের দারোগাবাবু কেস লেখে না। ওসব ঝামেলায় গিয়ে কি লাভ। বাড়িতে যাদের ধান আছে, হাতে সময় আছে—তারা এরকম করেই থাকে। সাবধানের মার নেই। এবং সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে তার দুর্বিনয়ও তার বাপের ভাবনার কারণ। জামাই, মোতিয়ার বর, যে শকট স্টেশনের গায়ে লাগা মহকুমা শহরের নালা সাফ করে—সেও তার এই দুর্বিনয়ে ইন্ধন জুগিয়ে আসছে বলে তার বিশ্বাস। অবশ্য নতুন খড়ে তাদের ঝুপড়ি ছাইয়েছে জামাই। শহরে মাগ্‌গি ভাতার যে আন্দোলন চলেছে তাতে জয়ী হয়েই সে তাদের ঝুপড়ির পাকা দেয়াল তুলবে। এই সব প্ল্যানিং লখিয়ার সঙ্গেই বেশি জমে। শালীর জন্যে একটা শাড়িও এনেছে শহর থেকে।

এখন তার দু-মেয়ের দুটো আস্ত শাড়ি। অবশ্য একটা শাড়িতে খুব অসুবিধে হচ্ছিল না, কারণ লখিয়া বাড়িতেই থাকে এবং শহর থেকে আনা একটা আজানুলম্বিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ক্যালেণ্ডার কোমরে জড়িয়ে সে কাজ করত। এই দীপ্ত দহনে যখন চারদিক পুড়ে খাক তখন জলের চেহারা ছবিতে দেখলেও চোখ জুড়োয়। লখিয়ার কোমর থেকে পাক খেয়ে খেয়ে পাঞ্চেত ড্যামের জল নামছে, আর একটু নিচে মানে লখিয়ার থোড়ায় শিশুরা খেলা করে।

জামাইয়ের কথাবার্তাও তার খুব পছন্দ নয়। হরিজন হওয়া মানে এক ভিন্ন গ্রহের অধিবাসী হওয়া এই সাধারণ কথাটা যা গান্ধী মহারাজ প্রমাণ করে দিয়েছেন তাদের গায়ে হরিজন ছাপ দিয়ে সেই ছাপটা তার জামাই রগড়ে তুলে ফেলতে চায়। 'অ্যায়সা দিল্লাগি নেহি চলে গা', কথায় কথায় বলে। তাদের মহকুমা শহরে এই সব দিল্লাগি উঠে গেছে। যেমন সে স্থানীয় মুখিয়ার ভাগ্নের মনিহারী দোকানে গিয়ে সাবান কিনবে এবং দোকানী সাবান দিতে অস্বীকার করায় ঝগড়া বাধাবে। তার ডোরাকাটা প্যাণ্ট আর চকরাবকরা জামাও যেন স্থিতাবস্থার প্রতিবাদ। লখিয়ার বাপের ভয় পাশের জেলায় গণ্ডগোল লেগে গেছে, তাদের সম্প্রদায়ের লোকজনের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের কথাও সে লোকমুখে শুনেছে। তার জামাইকে যদি পুলিশে টেনে নিয়ে যায় তাহলেই সর্বনাশ। তাহলে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে।

হঠাৎ আগুনের গোলায় সে আর তার শুয়োরের পাল ছাড়াও আরও এক সচল পদার্থের আবির্ভাব হয়। সামনে রূপোলী ধোঁয়ার মধ্য থেকে তার গর্জন ক্রমশ এগিয়ে আসে। আলো- ঠিকরানো পিচের রাস্তায় একটা বাস আসছে। দূর থেকে দেখা যায় বড় বড় দেবনাগরী হরফে লেখা বিহারশরিফ। যদিও তারা রাস্তা থেকে নিচে তবু তার অস্তিত্ব জানান দেবার জন্যে দু-তিনবার হর্ণ বাজায় ড্রাইভার যেন শুয়োরপালকের সঙ্গে সে এক আত্মীয়তা স্থাপন করতে চায়। এবার সে প্রাইমারি স্কুলের আটচালার পাশে যে কুয়ো সে দিকে এগিয়েই থমকে যায়। এ কুয়োটা দিন পনেরো আগে শুকিয়ে গিয়েই যত সমস্যা। এই সর্বজনীন কুয়োতলার ছায়ায় দাঁড়িয়ে জিরোতে থাকে লখিয়ার বাপ। মহকুমা শহরের আবহাওয়া অফিসে সেদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল একশো বাইশ ডিগ্রি, কিন্তু তাপমাত্রার হিসেবনিকেশ শহরের অধিবাসীদের জন্যে। নইলে গরমের সময় গরম, শীতের সময় শীত এই অনন্তকালের যে ব্যবস্থা

হয়ে আছে সে ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে কি লাভ?

এই ঋতুপরিক্রমার অনিবার্যতার মতো আরও একটা অনিবার্য ঘটনা তাদের হরিজন অস্তিত্ব। এর বিরুদ্ধে তার জামাইয়ের মতো প্রতিবাদ করে কি লাভ? এই হরিজন অস্তিত্ব কি দিল্লাগি? বরং এ প্রসঙ্গে গাঁয়ের মুখিয়া রামপ্রসাদ তেওয়ারীজীর ছড়াটা তার ভালো লাগে। গত শীতে রবিচাষের সময় আলুর ক্ষেতে কাজ চাওয়াতে তেওয়ারীজী ছড়া কেটে শুনিয়েছিলেন লখিয়ার বাপকে: "য্যায়সা সুরজ য্যায়সা চাঁদ ত্যায়সা হিন্দু ত্যায়সা হরিজন।" ক্ষেতে কাজ না পাওয়ায় প্রথমে খিজড়ে গিয়েছিল তার মন, কিন্তু পরে সে ভেবে দেখেছে—তাদের হরিজন অস্তিত্ব ঠিক চাঁদ সূর্যের অবস্থানের মতো অনতিক্রম্য। একে ওল্টানো-পাল্টানো যাবে না, ওল্টাতে গেলেই গণ্ডগোল, পুলিশ মুখিয়া মহাজন। শহরের কথা শহরে, গাঁয়ের কথা গাঁয়ে—এ কথাটা তার জামাইকে বোঝাতে গিয়ে সে ব্যর্থ হয়েছে। শহর-গ্রাম-ব্যাপ্ত কোনো সর্বজনীন সত্য নেই।

স্কুলের আটচালা শূন্য, পাশে উঁচু অশ্বত্থ গাছের নিচও ফাঁকা। একটা কুকুরও নেই। পাকা ঘরখানার দেয়ালে পরিবার-পরিকল্পনার ত্রিভুজ, রোদ-বৃষ্টিতে ধোয়া নীল কালিতে আঁকা গাই বাছুর। তেওয়ারীজীর সার বিক্রয় কেন্দ্র এখন কুলুপ-আঁটা, বাইরে ধান মাপবার কাঁটা রোদ্দুরে ঝলকাচ্ছে। এর গায়েই তেওয়ারীজীর ক্ষেত। এবং চুম্বকের আকর্ষণে লখিয়ার বাপের চোখ ওপরে উঠে যায় পাকা ঘরখানার মাথায় আমগাছগুলো ছাড়িয়ে আকাশের দিকে এক নিশ্চল তর্জনীর মতো তেওয়ারীজীর কুয়োর টেণ্ডা। এবং চাঁদ-সূর্যের সুদূর অবস্থানের অনিবার্যতা প্রসঙ্গে ছড়াটা সে একদম ভুলে যায়। আস্তে আস্তে সে নেড়া ক্ষেতের দিকে অগ্রসর হয় আম বাগানের নিচ দিয়ে। সামনে ক্ষেতের আগে এক চিলতে জমি যেন দুই বিবদমান শিবিরের মাঝখানে নো ম্যানস ল্যাণ্ড। এবারে সমস্ত কুয়োটা দেখা যায়। এবং লখিবার বাপের সঙ্গে সঙ্গে মাদি শুয়োরটাও তাকিয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে। পাকা কুয়োর নিচটা কালো এবং এই রোদজ্বলা ধুলোর মাঝখানে কালোর বাহারে জন্তু ও মানুষ একই সঙ্গে চিত্রার্পিত। এই অঞ্চলে এই একটাই পাথরের কুয়ো যার জল কোনোকালে শুকোয় না। চোখের মণির মতো আগলে আছে তেওয়ারীজী এ কুয়োর জল। এই কুয়োর জল তার জ্ঞাতিগুষ্টি নিয়ে চারপাশের গায়ে গায়ে লাগা বারোটি বাড়ির জন্যে। সারা রাত এখানে পাহারার ব্যবস্থা। শুয়োর-

গুলোও পর্যন্ত জানে এই এক চিলতে জমি পেরিয়ে ক্ষেতে নামলেই বিপদ। তারাও শুধু সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

ঘণ্টাখানেক হল লু চলতে শুরু করেছে, কিন্তু ফেরার মুখে তার প্রকোপ আরও বাড়ে। দমকে দমকে একশো বাইশ ডিগ্রির আগুনে হল্কা এসে ঝাপ্টায় মুখে চোখে, যেন অদৃশ্য জ্বলন্ত আগুনের পিচকিরিতে আগুন ছলকে ছলকে উঠে জীবজন্তু গাছপালা পাথর বালির অগ্নিস্নান করায়। মাথায় ফেট্টি জড়িয়ে এগোতে এগোতে লখিয়ার বাপ ভাবে, এতখানি এগিয়ে আসা ঠিক হয় নি, বিশেষ করে জন্তুগুলোর পক্ষে। তা ছাড়া তেওয়ারীজীর কুয়ো সম্পর্কে শিশুর কৌতূহল তার এই বাষট্টি বছরে শোভা পায় না। বরঞ্চ এখন সেই পাথরের কুয়োয় টলটলে জলের কল্পনায় গলা আরও কাঠ হয়ে আসে তেষ্টায়। মাদি শুয়োরটা আবার থমকে দাঁড়ায় আগুনে হল্কায়, নাক দিয়ে আওয়াজ করে। ত্বরিত পায়ে এগিয়ে চলে লখিয়ার বাপ। এখন ফল্গু নদী আরও প্রচণ্ড, দমকে দমকে গরম বালির ঝড়ে মানুষ ও জন্তু আচ্ছন্ন বোধ করে। ফল্গুর গায়ে একটা খাড়া নিষ্পত্র শিমূল গাছের ডালে একজোড়া পাঁশুটে শকুন তাদের ভারী দেহের ভারসাম্য মুহূর্তের জন্যে হারিয়ে আবার নিশ্চল হয়ে বসে। শিমূল গাছের নিচেই একটা ভাঙা শিবমন্দির। তারপর ভাগাড়। বহু বছর আগে গয়া শহরের এক জমিদারবাবু ফোর্ড গাড়িতে এসেছিলেন নদীর ধারে পিকনিক করতে, তারপর গাড়ি বিকল হওয়ায় ফেলে রেখে গেছেন নদীর পাড়ে। সমস্ত যন্ত্রপাতি চাকা খুবলে তুলে নেওয়া হয়েছে। এখন জং-ধরা সেই তামাটে যন্ত্রের কঁাকলাস ভাগাড়ের একমাত্র অধিবাসী। এরপর জমির ঢাল দিয়ে লখিয়ার বাপ অগ্রসর হয়। সামনে নদীর প্রায় গায়েই হুমড়ি খেয়ে আছে দশ-বারোটা ঝুপড়ি—হরিজন কলোনি।

আগুনের ঝলমলে কুণ্ড থেকে ঝুপড়িতে ঢুকে মুহূর্তের জন্যে অন্ধ হয়ে যায় লখিয়ার বাপ। তারপর অন্ধকারে ছ হাত লম্বা আর ছ হাত চওড়া জায়গাটা আস্তে আস্তে ভেসে ওঠে এবং সর্বাগ্রে কলাইয়ের থালার ওপর জল দেওয়া ভাত। জামাই কুমড়ো আর শসা এনেছে শহর থেকে। উঠোনে এক মুঠো ভাতের সঙ্গে কুমড়োর বুকো ছিটিয়ে দিয়ে সে খেতে বসে। চোখ বন্ধ করে সশব্দে গরাস তোলে। তারপর খেয়ে দেয়ে হাঁপাতে থাকে এক গেলাস জলের জন্যে। উপুড় করে রাখা কলসিটার দিকে তার শূন্য দৃষ্টি পড়ে, তারপর দরজার কোণায় লখিয়ার দিকে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ লখিয়া শণ বেতের ঝুড়ি বুনে

চলেছে চোখ না তুলে। কোঁদা পেটা কালো শরীরখানা মাঝে মাঝে টান করে আবার ঝুঁকে আঙুল চালায়। পাশে জামাইয়ের আনা গোলাপী জ্যালজেলে শাড়িখানা যেরকম কাগজে মোড়া ছিল তেমনিই আছে। পাশে একটা তেলচিটে ন্যাতা জড়ানো মোতিয়া অঘোর ঘুমন্ত। এক চিলতে আলোয় তার মুখে বসন্তের দাগড়া দাগগুলো আলোকিত। সেদিক থেকে চোখ উঠে আসে লখিয়ার দিকে, তার যৌবনের ভাস্কর্যের অপরিসীম সুন্দর স্তম্ভিত মূর্তির দিকে। 'কাপড়া পিন্' বেয়াড়া গলায় হাঁক দেয় লখিয়ার বাপ। মেয়ে সেদিকে তাকায় না, যন্ত্রের মতো তার আঙুল চলে।

বাহিরে চরাচর জ্বলে পোড়ে আগুনে হাওয়ায়। তেষ্টায় গলা আরও কাঠ হয়ে আসে লখিয়ার বাপের। উপুড় করা কলসিটার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল আসে কিন্তু শ্রান্তিতে আরও অবসন্ন লাগে লখিয়ার বাপের। তার ঝিম আসে। আর মাসখানেক পরেই এ অবস্থা কেটে যাবে, আর মাত্র তিরিশটা দিন। তারপর বালিতে জল নামবে। ভাগাড় কচি সবুজ ঘাসে ছেয়ে যাবে। গেরুয়া নদীর জলের আওয়াজ শোনা যাবে ঝুপড়ি থেকে। এবং প্রবল তেষ্টায় যে প্রবল অবসন্নতা নামে তাতে কান ভোঁ ভোঁ করে এবং সত্যিই লখিয়ার বাপ জলের শব্দ শোনে। জলের শব্দ শুনতে শুনতে সে ঘুমায়।

যখন ঘুম ভাঙে তখন চারদিক অন্ধকার। খালি ঝুপড়ির ফাঁকে শিমূল গাছটা নজরে আসে যার নিষ্পত্র ডালে দু-খাবলা অন্ধকার পাশাপাশি একজোড়া শকুনের অস্তিত্ব জানান দেয়। একটা তারাও চোখে পড়ে। এতক্ষণ সে তো কখনও ঘুমোয় না। একবার মাথা তুলবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। তার মানে তার এখন খুব জ্বর, দুপুরের লু লেগে জ্বর বছর দশ আগে একবার হয়েছিল, একেবারে মরতে বসেছিল। দাওয়া থেকে চাটুতে রুটি সেঁকার শব্দ আসে।

'লখিয়া।' হাঁক দেবার চেষ্টা করে।

'লখিয়া বাহার', রুটি সেঁকতে সেঁকতে জবাব দেয় মোতিয়া।

'কিধার গিয়া ?'

'কেয়া জানে !'

চাটুতে খুন্তির আওয়াজ শুনতে শুনতে আবার ঝিম আসে। তার মানে জামাইয়ের সঙ্গে বেরিয়েছে। কোথায় যাবে ? কোথায় যেতে পারে ? মেয়েটাকে বোধহয় আর আগলে রাখা গেল না। ভগ্‌ওয়ান যদি আবার দয়া

করতেন, যদি তাঁর কৃপা বর্ষণ করতেন তার ছোট মেয়ের মুখে গায়ে। ঘরের মধ্যে আবছা অন্ধকারে তার দৃষ্টি ঘোরে এবং যেখানটায় উপুড় করা কলসিটা ছিল সেই শূন্য জায়গায় তার দৃষ্টি আটকে যায়।

আবার বেয়াড়া আওয়াজ ওঠে, 'কিধার গিয়া লখিয়া?'

'কে জানে।' আবার নিস্পৃহ গলায় উত্তর এবং চাটুতে খুনতি ঘষার আওয়াজ।

জ্বরের ঘোরে লখিয়ার বাপ আবার জলের শব্দ শোনে। তাদের ঝুপড়ির নিচেই ঘোলা জল পাক খেতে খেতে চলেছে তার ছলছল আওয়াজ। এবং যখন সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল ঠিক সেই সময় তেওয়ারীজীর আমবাগান পেরিয়ে যে নো ম্যানস ল্যাণ্ড তা নিঃশব্দে অতিক্রম করে দুটো মূর্তি। অনেকটা ন্যাড়া খেতের মাঝখানে কুয়ো। লখিয়া ভাবে যদি চারপাশে কটা গাছ থাকত তাহলে বেশ হত। চারদিকে গুমোট গরমে থম থম করছে রাত। যখন নেড়া ক্ষেতের মাঝামাঝি তারা চলে এসেছে, যখন আর ফেরার উপায় নেই বিশেষ করে দড়ি কলসি সমেত—তখন তার মনের বল ফিরে আসে, তার চলনে ক্ষিপ্রতা আসে। দিগ্‌বিদিগ বিচার না করে আনকোরা নতুন গোলাপী শাড়ি পরা লখিয়া ত্বরিত পায়ে কুয়োর পাড়ে এসেই এক ঝটকায় কলসি নামায়। ঝপাং করে জলের আওয়াজ যেন এক অনির্বচনীয় সঙ্গীত।

লাটা টেণ্ডার সাহায্য ছাড়াই সাঁ সাঁ করে কলসি তুলে নেয় লখিয়া। জল ছলকে পড়ে তাদের দুজনের মুখে চোখে। তারা মুখে চোখে জলের ঝাপ্টা দেয়, আঁজলা ভরে জল পান করে। এবং বেঁচে থাকার এত গভীর আরামে তাদের দুজনের চোখ মুহূর্তের জন্যে বুজে এসেছিল যে বহুদূর থেকে টর্চের আলো তাদের মুখে আলতো ভাবে এসে লাগে মাত্র, আলোয় যে বিপদ আছে সে বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। এবার আলোর সঙ্গে সঙ্গে চাপা কোলাহল এগিয়ে আসতে থাকে। এবং মুহূর্তের সেই প্রবল আনন্দের জগত থেকে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে লখিয়া দাঁড়িয়ে ওঠে। তারপর দুটো মূর্তি ক্ষিপ্র পায়ে আমবাগানের দিকে মিলিয়ে যায়। 'অব্ কেয়া করে, অব্ কেয়া করে!' বিলাপের মতো মুখিয়ার কণ্ঠ বাজতে থাকে সেই গুমোট সন্ধ্যায়। দুটি নরনারীই পরিষ্কার আলোর বৃত্তে ধরা পড়েছে। এরা কারা এ বিষয় সামান্য সংশয় নেই মুখিয়ার কিংবা তার জ্ঞাতিজাদের যারা দলবদ্ধভাবে সে দৃশ্যের সাক্ষী ছিল। এবং মুখিয়া যত বিলাপ করে তাদের মুখের পেশী তত শক্ত হয়। তাদের

মনে দৃঢ়তা আরও ভিত গাড়ে। প্রথমে যেসব দ্বিধা ছিল যা শহর থেকে আমদানী-করা পলিটিক্স দ্বারা সঞ্জীবিত অথবা পুলিশ সম্পর্কে অকারণ ভয় তা রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেটে যেতে থাকে। কারণ পলিটিক্স পুলিশ এই সমস্ত কিছুর ওপরে দাঁড়িয়ে আছে ভারতীয় ধর্মবোধ। থানার পুলিশ অফিসার কিংবা দু-এক পাতা বই মুখস্থ করা কিছু ছোকরা রাজনৈতিক কর্মী কি এই ধর্মবোধের আওতায় পড়ে না? মুখিয়া কাব্যরসিক। তিনি তুলসীদাস কোট করে বলেন যে এই ভবসংসার রামচন্দ্রজীর মায়া, কোথাও ধূপ আছে কোথাও ছায়া। কিন্তু ধূপ আর ছায়া মিলে মিশে কখনও এক হয় না। তারা সব সময় তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পাশাপাশি বহন করে নিয়ে চলে। লখিয়ারা আজ যা করলে তা বাড়া ভাতে মলত্যাগের চেয়েও গর্হিত। এবং জেনেশুনেই তারা এটা করেছে যাতে এই জল নষ্ট হয়, অথবা জাত মারবার এই পরিকল্পনা লখিয়াদের শহুরে জামাই দিয়েছে, সে না থাকলে লখিয়ার সাহস হত না। হয়ত পাশের জেলায় যা ঘটছে সেই সব ঘটনার সঙ্গে এই বেপরোয়া হরিজন তরুণটিও যুক্ত। এবং উগ্রপন্থীদের হত্যা করা ছাড়া যখন দ্বিতীয় পথ নেই তখন তারা নিঃসংশয়েই এগিয়ে যেতে পারে কারণ তাদের এই কাজের পেছনে মৌন সম্মতি আছে সমাজের সমস্ত গণ্যমান্য লোকজনের। একটু হয়তো আলোড়ন সৃষ্টি হবে। একটা-দুটো স্থানীয় কাগজে একটা-দুটো ছিঁচকে রিপোর্ট বেরোবে, এস ডি ও সাহেব হয়তো তদন্ত করতেও আসবেন, কিন্তু যদি গ্রামের লোক চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখায় তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কারণ আত্মা বলহীনের লভ্য নয়। একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিলেন মুখিয়া, কখনও তুলসী-দাস কখনও গীতা কোট করে। অবশ্য বক্তৃতার খুব দরকার ছিল না। উপস্থিত সমস্ত তরুণ ইতিমধ্যেই লাঠি সড়কি নিয়ে অন্ধকারে জমা হতে থাকে। দুটো শট গানও জোগাড় হয়।

রাত দেড়টা-দুটোয় গুমোট কাটে। ফল্গুর বালিতে এক দীর্ঘশ্বাসের মতো হাওয়া ওঠে। শিমূলের ডালে আবার ভারসাম্যচ্যুত শকুনদ্বয় ডানা ঝাপটিয়ে স্বস্থানে চেপে বসে। প্রথমে একটা দুটো ঝুপড়ি জ্বলে, তারপর হাওয়ায় সমস্ত সারিটা একসঙ্গে জ্বলে ওঠে।

প্রবল উত্তাপে ঘুম ভাঙে লখিয়ার বাপের। এবং হাতের কাছেই অবিশ্বাস্য ভাবে ঢাকা জলের গেলাস। হাত বাড়িয়ে জলের গেলাস নেবার সময় চালের ওপর জমে ওঠা ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলী তার প্রথম নজরে পড়ে। এবং জলের গেলাস মুখে তুলবার সময়েই ঘটনাটা ঘটে। বিশেষ আওয়াজ না করেই জ্বলন্ত চালা লখিয়ার বাপকে চাপা দেয়। আধ-খাওয়া জলের গেলাসটা তার হাত থেকে গড়িয়ে পড়ে।

ছন্দে পঁচাত্তর

বিষ্ণু দে

দ্বান্দ্বিকের জয় পরাজয়
বৃদ্ধ হাড়ে উত্তরণহীন ?

আশা কোথা লুকোয় প্রত্যহ ?
মুক্তিযুদ্ধ কেন হয় ব্যর্থ ?
নানা স্থানে গুপ্তি অহরহ—
সত্য কেন থেকে থেকে দ্ব্যর্থ !

ভলগায় যে কয় কোটি প্রাণ
আত্মদানে জ্বালাল আহুতি,
সেই অগ্নি দধীচির দান,
মানুষেই স্বয়ং সম্ভূতি !

এই স্তরে সয় না যে আর !
দ্বন্দ্ব হোক ছন্দে পঁচাত্তর ।
ধুয়ে দাও ব্যর্থতা এবার—
প্রশ্ন হোক বর্তমানোত্তর ॥

সামনের আলো

বিমলচন্দ্র ঘোষ

পিছন দিকে জ্বলন্ত মশাল থাকলে
সামনের দিকের ছায়া
সহজ ভাবে পা বাড়াতে দেয় না ।
ছায়ার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ভয় ।
জড়িয়ে থাকে দ্বিধা ।

যতই মশাল জ্বলুক
পিছনের অন্ধকারে
হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া
ঐতিহাসিক কর্মফল
সমাজজীবনকে আলো দেখায় না।
পরিষ্কার করে না
সামনের পথ।

কর্মফল নয় ঐতিহ্য,
তার মধ্যে রয়েছে
ইতিহাসের ধিক্কার বিভীষণের
রক্তবীজ।
তার আশ্রয়
নিরন্ধ্র তাস্কর্যের অন্ধকার
কর্মফল আলো দেয় না।

আলো দেয়
মানবজাতির মুক্তিকামী
শত শত শহীদের আত্মা
চলার পথে যারা
অনির্বাণ মশালের মতো
সামনের দিকে
আলোকসম্পাত করে।

জীবনই তো ব্যাপক হরিণ

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

কখনও হাওয়ায় তীব্র গতির ঘোষণা।
কখনও বা পিছুলাগা আততায়ী আনে,
অনেক অরণ্য ভেঙে জোড়ালাগা শহরের
উপকণ্ঠে যতি। তাই, জ্যামুক্ত বেগের সমে
চিড়িয়া বাগানে নম্র খুর পেতে
আকাশে অরণ্যচিত্ত খোঁজে।
অথচ সহজ স্বাস্থ্যে জীবিকার শস্প খুঁটে খুঁটে,
হঠাৎ আচমকা কোনও পাহাড়ী লাফের
আর ঘাসফুল বনের আড়ালে
নিজের শরীর মেলে অনায়াস গতির গভীরে।
তারপর শব হয়ে যায়, স্থির চিত্রল বাহারে,
মৃগয়ার শিকারে মারীচ।
প্রাণঘ্ন শার্দুল তার মনুষ্যস্বাদের জন্য
গোটা জনপদই চায়।
চামড়া-চাপা কঙ্কালের কিছু কিছু ভুষুণ্ডীর খেল্
নাঁদু চাঁদু হাঁদু মল্লিকেরা তাই
ওরই মধ্যে কিছুটা বা মোটা, কিছু চর্ব্য চোষ্য
চোরাই বণিক।
প্রাণঘ্ন শার্দুল তাই মনুষ্যস্বাদের জন্য
গোটা জনপদই পায়—রক্তের মুনাফায়—
চিলিতে, ঢাকায়, পর্তুগালের ফাঁকায়, কিম্বা,
কৃষ্ণশক্তি আফ্রিকায়,
হানয় সাইগন চীন ক্যাম্বোডিয়ায়।
সবেতেই অরণ্য আছে, বিস্ফোরণ দাবদাহ
সভ্যতার অবার তরাই।

হিংসায় ক্লান্তি আনে। আনে প্রত্যহের ভোজ্যে
অগ্নিমান্দ্য। তাই
দেশে দেশে খাণ্ডবের পশু পক্ষী সরীসৃপ
তক্ষকের বিপন্ন প্রয়াণ।
সাগ্নিক এ বিপ্লবে প্রাণপ্ন শার্দুলও দগ্ধ।
গাণ্ডীব প্রশ্রিত শুধু
বেঁচে যায় জীবনের চৈতন্য বিহার,
প্রাণাবেগ আরণ্যক শ্যামলে বিলীন,
প্রচণ্ড বিদ্যুৎবহ বেগের চূড়ায় কৃষ্ণসার।
কারণ এ জীবনই তো ব্যাপক হরিণ ॥

নিবেদন

হরপ্রসাদ মিত্র

সবাই ভারি দুঃখে আছি
লেখাতে তাই মনে হয়,
অথচ কী চাই যে,—সেটা
স্পষ্ট কি কেউ ভেবেছি ?
মজ্জার নেই তেমন তাকৎ
থাকলেই বা হোত কী ?
দুঃখ-কে কে তাড়ায় বলো—
দুঃখেই প্রাণধারণ তো।

জানলা দিয়ে যা দেখা যায়—
নিরাভরণ সে দৃশ্যে
সবুজ সবুজ ঘাসের মধ্যে নধর কালো ছাগলটা
সত্যি বড়োই সুখী—এবং
তার পাশে কী উদাসীন
তিনটে বাড়ি চিলতে-দুয়েক আকাশ দিয়ে
বিভক্ত।

ব্যক্তিগত বিষাদ বড়োই ব্যক্তিগত,

বন্ধুগণ—

উপনিষদ, গান্ধী, লেনিন, মহাভারত, রামায়ণ

সব ঢেউয়েরই মধ্যে দেখুন—

মানুষ নামক রহস্য !

কবিরা হোন ভূয়োদর্শী,

—পাঠক প্রিয় বয়স্য।

মিথ্যে কথা

দক্ষিণারঞ্জন বসু

মুজিব নেই, মুজিব নেই !
নিজেরাই করলে খতম
শেষে জাতির জনককেই !
মুজিব নেই, মুজিব নেই !

লাশ দেখে সে কী উল্লাস,
দেশ জুড়ে কী বিষম ত্রাস !
ভয় যে কাঁপায় সকলকেই,
মুজিব নেই, মুজিব নেই !

বলছে ওরা মুজিব নাই,
করছে নিকেশ নিজেরাই
শেষে জাতির জনককেই,
মুজিব নেই, মুজিব নেই !

মুজিব নেই, মুজিব নেই!
মানতে হবে মিথ্যেকেই?
বাঙলাদেশের কী আর মানে,
আমরা বুঝি মুজিবকেই!

শেষ যুদ্ধ / অনাগতের প্রতিভাষ

রণজিৎকুমার সেন

এখন যুদ্ধ শেষ।
অতঃপর এই সব অগ্নিদগ্ধ ট্যাঙ্ক, লরি, করোটি-কঙ্কাল,
　　বোমারু বিমান আর ভস্মাবৃত যা কিছু জঞ্জাল—
　　ভাগাড়ের স্তূপে স্তূপে ঝেঁটিয়ে ঝেঁটিয়ে সব মুছে দিতে হবে।

কেউটের ঝাঁপির মতো বারুদের ঢাকা খুলে এতদিন
　　রাজতন্ত্রী কুবেরেরা বন্দুকে কামানে যত তুলেছে আওয়াজ,
　　এবারে তা প্রতিহত, স্তব্ধ, নীরব।

অজস্র প্রাণের মূল্যে
　　এখন সমাজতন্ত্র আপন শক্তিতে তার দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত।

কতবার—
নারীর দেহলী নদী ভেঙে ভেঙে বয়ে গেছে দুরন্ত প্লাবনে,
শিশুরক্ত বন্যাস্রোতে ভাসিয়েছে কূল,
ধানের উপল ক্ষেত বোমার বারুদে পুড়ে হয়ে গেছে ক্লিন্ন মরুভূমি;
নিরস্ত্র জনতা তবু ধ্রুবসত্য বুকে নিয়ে ছুটে গেছে দুর্গমের দুস্তর তীরে,
　　অবশেষে জয়ের পদক নিয়ে মুক্তশিরে ফিরেছে সবাই;
　　আজ তাই যুদ্ধশেষে বিজয়ের হোলি শুরু খামারে খামারে।
ধূলির মানবরাজ্যে এখন সমাজতন্ত্র আপন শক্তিতে তার দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত।

এবারে আর-এক যুদ্ধ ঃ
সবকিছু দেখে শুনে ভালো ক'রে গ'ড়ে নিতে হবে—
জীবিকা, জীবন, শিক্ষা, গৃহ, স্বাস্থ্য, প্রতিরক্ষা, চরিত্র, মনন ঃ
উজ্জ্বলন্ত সূর্যপ্রাতে সর্বহারা সর্বজন ফিরে তবে পাবে তার ঐশ্বর্য প্রাণের।
এই হোক শেষ যুদ্ধ এই পৃথিবীতে ॥

কোন দিকে জলের ধারা

চিত্ত ঘোষ

কোন দিকে জলের ধারা বয়ে যায়, ঝড়ের ঝাঁকুনি
কাঁপায় বনের মাথা, তোলপাড় আকাশ-পাতাল।
শুধুই মথিত হয়ে থাকা যায় না।
গা ভাসিয়ে যাওয়া যায় না সেই উপকূলে।
তাই বুকের স্পন্দনে চাই
আরো এক প্রাণবন্ত উত্তাল রক্তের দাপাদাপি
আরো এক আবেগের অস্থির প্রবল জলোচ্ছ্বাস
দুর্বার তরঙ্গ শব্দ, মুক্ত ধারা, নীল জলরেখা
প্রবাহিত, প্লাবিত মনের মাটি
ধৌত, শুদ্ধ, পলিময়, উর্বর, মসৃণ
যেখানে প্রান্তর জুড়ে সবুজ, হলুদ বর্ণ শস্যের লাবণ্যরূপ
দিগন্ত উজ্জ্বল করে যেন এক রূপসী রমণী।

উপন্যাস পাঠের প্রস্তুতি

গোপাল হালদার

বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ক নিম্নের আলোচনা সংক্ষেপিত আকারে 'সাক্ষরতা প্রকাশনী'র 'বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ'-র ভূমিকা থেকে গৃহীত। প্রয়োজন বুঝলে পাঠকের তা দ্রষ্টব্য ও আলোচ্য।

—লেখক

বাঙলা সাহিত্যে উপন্যাসের উদ্ভব : বঙ্কিমচন্দ্র

গল্পের নেশা চিরদিনের, কিন্তু উপন্যাস একালের। গল্পের নেশাই নানাভাবে সভ্যতার নানাপর্বের মধ্য দিয়ে এসে উপন্যাসে জন্ম নিয়েছে। প্রথম সে জন্ম পশ্চাত্য দেশে—আমাদের দেশে তা আসে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার পিছনে—অথচ গল্পের নেশা এদেশে কতকাল ধরে তার ঠিকানা নেই।

বেদ-উপনিষদেও নানাস্থলে গল্পের এক-আধটুকু ছায়া আবিষ্কার করা যায়। আমরা দেখেছি বৌদ্ধ জাতক, পঞ্চতন্ত্র এবং রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণে তো নানারকমের গল্পের সমারোহ,—আখ্যান-উপাখ্যানের আর শেষ নেই। গদ্যে তা একটা বিশেষ সাহিত্যিক রূপ লাভ করে :—'বৃহৎ কথা'-য় (তা পাওয়া যায় নি) 'কথাসরিৎসাগর', 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'দশকুমারচরিত', 'কাদম্বরী' প্রভৃতির সাধারণ গল্পের বই-এর নাম 'কথাকাব্য'। আরও নতুন রূপ—আমাদের বাঙলা মঙ্গলকাব্য, দেশজ কথাকাহিনী, যা 'ময়মনসিংহ-গীতিকা'য়, 'পূর্ববঙ্গগীতিকা'য় পাওয়া যায়, যা পূর্ব যুগে অজ্ঞাতে রামায়ণ-মহাভারতেও মিলছে, গল্প নতুন করে জুটেছে বৈষ্ণবসাহিত্যের চরিত-কথায়। তা ছাড়া, আরবী-ফারসী 'রম্যন্যাস' সেই ভারতীয় গল্পের ধারায় জুগিয়েছে দৈত্যদানব, বাদশাহ-শাহজাদী-

সওদাগরদের রম্যন্যাস্। ইংরেজ আগমনের পূর্বে এই ছিল ভারতীয় আখ্যান-সাহিত্যের পশ্চাৎপট।

শিষ্টসাহিত্যের বাইরে লোকসাহিত্যেরও একটা প্রধান ধারা গল্পের ধারা। নানা রূপকথা, উপকথা, রাজপুত্র-রাজকন্যা, রাক্ষস-খোক্কস, চোর-দস্যু থেকে বাঘ-শেয়াল-টুনটুনি—কত কিছু নিয়েই না সেসব গল্প। একালে হলে তা রোমান্স নাম হত। বাঙলায় যত লোককথা (ফোকলোর) আছে এত অজস্র লোককথা ভারতবর্ষের অন্য কোথাও নেই—সম্ভবত পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষায়ও নেই।

ক্রমেই রোমান্স বা অদ্ভুতকথা অপেক্ষা, পরিচিত বাস্তব জীবনই এই কাহিনীকারদের বর্ণনীয় হয়ে ওঠে। রস-কল্পনা বাস্তবজীবনকে করতে চায় সত্য। শেষ পর্যন্ত কাহিনীর (ফিকশন) এই বাস্তবমুখী ধারাই যে 'নভেল' নামে চিহ্নিত হয়ে পড়ে, পূর্বে এসব উল্লেখিত হয়েছে। আমরা 'নভেল' যখন পেয়েছি উনবিংশ শতকে, তখন ইংলণ্ডে এ নাম স্থির হয়ে গিয়েছে। ফ্রান্সেও তার প্রকৃতি তখন জানা। কাজেই আমাদের উপন্যাসের ইতিহাসের পিছনে আছে—ভারতের আবহমান গল্পের বা আখ্যানের ধারা নয়—পাশ্চাত্য দেশের সেই নভেলের প্রভাব।

রিনাসেন্স (১৫শ শতক) পর্যন্ত গল্প কাহিনীর ধারা ইউরোপেও অনেকটা আমাদের দেশের মতোই ছিল। হয়তো বা কোনো কোনো দিকে ওরাই খাটো ছিল। আধুনিক যুগ আসতেই ওদের শিল্পসাহিত্যেও কার্যকারণের ঘাতপ্রতিঘাতে উদ্ভব হতে লাগল নতুন শিল্পরূপ (আর্ট-ফর্ম)। তার মূল সত্যটা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি,

> "সাংকোপাঞ্জা ডন কুইকজোটের ভৃত্যমাত্র, সংসারে প্রবহমান তথ্য-পুঞ্জের মধ্যে তাকে তর্জমা করে দিলে তাকে চোখেই পড়বে না—তখন হাজার লক্ষ চাকরের সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে তাকে সনাক্ত করবে কে। ডন কুইকজোটের চাকর আজ চিরকালের চেনা হয়ে গেছে, সবাইকে দিচ্ছে তার একান্ত প্রত্যক্ষতার আনন্দ; এ পর্যন্ত ভারতের যতগুলি বড়লাট হয়েছে তাদের সকলের জীবনবৃত্তান্ত মেলালেও এই চাকরটির পাশে তারা নিষ্প্রভ। কারণ, সাংকোপাঞ্জাও শুধু ভৃত্য নেই, ব্যক্তি-মানুষ।"

দেখা দিল 'ব্যক্তিমানুষ', এটিই আসল কথা।

বাস্তব জীবনযাত্রার প্রতি আকর্ষণ, বৈষয়িক উদ্যোগ-আয়োজন, ব্যক্তিগত-

সম্পত্তি-চেতনা; ব্যক্তিস্বাধীনতা, মানবাধিকার (রাইটস অব ম্যান) ও মানবিকতা (হিউম্যানিজম)-বোধ—এই সামাজিক-মানসিক পরিবেশ লাভ করতেই উপন্যাসের লাভ হয় প্লট (প্রধানত বাস্তব-জীবনাশ্রয়ী), চরিত্র (ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধ) ও মানবতার অস্পষ্ট আদর্শ প্রভৃতির উদ্ভবক্ষেত্র।

উপাখ্যান পেরিয়ে উপন্যাস

ভারতবর্ষ ও বাঙলা ছিল মধ্যযুগে বন্দী যখন ইংরেজ-বণিক আধুনিক যুগের অগ্রগামী শক্তিরূপে এসে এদেশে রাজা হয়ে বসল (১৭৬৫)। তার ফলে যা ঘটল তা এখন সর্বস্বীকৃত। খানিকটা আধুনিক আয়োজন-প্রতিষ্ঠান প্রবর্তন ছিল ইংরেজের নিজের পক্ষেও অনিবার্য—যাতে শাসন ও শোষণ থাকে অব্যাহত। তার পণ্য ও বাণিজ্যিক স্বার্থে ইংরেজ এদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে ফেলল; তাঁতী, পল্লী-কারিগর বৃত্তিহারা হল, অথচ নতুন বৃত্তির পথ নেই। কারণ, মূলত দেশটাকে মধ্যযুগের সামন্তব্যবস্থায় আবদ্ধ রাখাই ছিল ইংরেজের স্বার্থ, সে জন্যই জমিদারীপ্রথার পত্তন, যাতে বৈষয়িক আত্মোন্নতির উদ্যোগ—ব্যক্তিস্বাধীনতা, জাতীয়-স্বাধীনতা, আত্মপ্রকাশের সুযোগ, মানব-মর্যাদাবোধ—এসব আধুনিক যুগের আয়োজন ও আদর্শ এই শাসিতসমাজে ব্যাহত থাকতে বাধ্য। কাজেই দেশটা মধ্যযুগ ছাড়িয়ে আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ হতে পারল না। এই অবস্থা মোটেই স্বাভাবিকভাবে নভেলের জন্মের উপযোগী অবস্থা নয়।

কিন্তু ওই শাসনের ও শোষণের নিয়মেই আরেকটা জিনিসও ঘটল :—শহরে কিছু বেনিয়ান্ মুৎসুদ্দি পুষ্ট হল; তাদের আওতায় কিছু ভদ্রলোকও অর্থের সুবিধা দেখল। গ্রামেও জমিতে মধ্যস্বত্ব লাভ করে 'ভদ্রলোকদের' বেশ পুষ্টি হল। শাসনের জন্যও তো কেরানী-কর্মচারা চাই, এই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা তাতে পেল জীবিকা-উন্নতির নতুন সুযোগ। বুঝল ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষা পেলেই আত্মোন্নতির সুযোগ। একটু ব্যক্তিস্বার্থ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধও তাই এল। রামমোহন রায় তা পান মুখ্যত নিজের প্রতিভায় ও প্রচেষ্টায়। শহুরেরা সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থা করল হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা করে (১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারি)। মুদ্রাযন্ত্রের প্রসার হল; সংবাদপত্র বের হল; কলকাতায় শহুরে বেনিয়ান-মুৎসুদ্দি ও মধ্যবিত্ত নানা দালালগোষ্ঠী দেখা দিল। তেমনি

ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষা যারা পেল, তারাও ইংরেজি সাহিত্য, তার রসসম্পদের আস্বাদনে ও তার চিন্তাসম্পদের প্রেরণায় মেতে উঠল। একদিকে পেল শেকসপীয়র-মিলটন থেকে স্কট-বায়রন পর্যন্ত আধুনিক সাহিত্যের স্বাদ ! অন্যদিকে পেল লক-হিউম থেকে টমাস পেন পর্যন্ত আধুনিক যুক্তিবাদী শিক্ষার দান। ১৮১৮ থেকে ১৮৫৮-র পূর্ব পর্যন্ত এই যুক্তিবাদী দানে বাঙালী হিন্দুসমাজে আলোড়ন চলে। রামমোহন রায় তার অগ্রদূত। 'ইয়ং বেঙ্গল' সেই ধ্বজাবাহী ; 'তত্ত্ববোধিনী'র অক্ষয়কুমার দত্ত—বিদ্যাসাগরও তার শিক্ষাগুরু। ততদিন খুব সীমাবদ্ধ হলেও শহুরে 'বাবু'দের সঙ্গে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সংখ্যায় বেড়েছে, সংবাদপত্র, পুঁথি-পুস্তিকা দেখা দিয়েছে। ১৮৫০ সালের পরে ক্রমে এল সাহিত্য-সৃষ্টির উদ্যোগ।

অথচ দেশের অবস্থাটা মূলত তখন কী? কার্যত এবং বাস্তবত (অবজেকটিভলি) বাঙালীসমাজ জমিদারিতন্ত্রে বাঁধা, আর মনের দিকে (সাবজেকটিভলি) বাঙালীসমাজের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত অংশ আধুনিক ভাবাদর্শে ও সাহিত্য-আস্বাদনে উদ্যোগ-উল্লসিত। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় তাদের কর্মশক্তি বাস্তবে ব্যাহত ; শুধু মানসিক ক্ষেত্রে ও ভাব-কল্পনায় আছে তার একপেশে প্রকাশের পথ। ডিফো, সুইফ্‌ট্ প্রভৃতির প্রবর্তিত পাশ্চাত্য নভেলের বাস্তব-পন্থা কী করে বাঙালী লেখক অনুসরণ করবে ? রাষ্ট্রে-সমাজে সবদিকেই যে সে বাঁধা। বিদেশী শাসন ও ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা তো আছেই, আমাদের সামাজিক বাধাই কি কম ? পদে পদে যে আমাদের সমাজে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব খর্বিত। ধর্মের বাধা, জাতিবর্ণের বাধা, বাল্যবিবাহ, পর্দাপ্রথা, ইত্যাদি ইত্যাদি—বলতে গেলে শেষ হয় না। নারী-পুরুষের বাস্তবজীবনে আত্মবিকাশের সুযোগ পাশ্চাত্য সমাজের তুলনায় প্রায় কিছুই নেই। লেখকের পক্ষে তবে প্রেম-ভালোবাসা-দ্বন্দ্ব-ভরা 'প্লট' রচনার অবকাশ কোথায়? সমাজে ব্যক্তি-চরিত্র ফোটাবার বাস্তব সুযোগ কোথায় ? কোথায় দুর্ধর্ষ পুরুষ, বাণিজ্য-কর্মে উদ্যোগী মানুষ ?

তবে গল্পে-আখ্যানে বাস্তব-জীবন দেখাতে হলে, যা এ অবস্থায় করা যায় তা হচ্ছে শহুরে স্বাধীন 'বাবুদের' ব্যঙ্গচিত্র। কিংবা নতুন শিক্ষিতদের জন্য নীতিশিক্ষামূলক চিত্র। তা না হলে তৃতীয় এক পথে আঁকা যায় বাস্তব থেকে পালিয়ে রম্যন্যাসের সূত্র ধরে নতুন রম্যন্যাস বা রোমান্স। সেই রোমান্সের একটা দিক খুলে যেতে পারে ইতিহাস সম্বন্ধে আকর্ষণে ও আবেগে কল্পনায়, যে কথা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় অবাস্তব, ইতিহাসের অস্পষ্ট যুগের মধ্যে

তাকেও বাস্তব-কল্প বলে খাড়া করা যায়। এ ধরনের রোমান্সের উৎকৃষ্ট প্রেরণাও ছিল—শেকসপীয়রের রোমান্টিক নাটকে বাঙালী শিক্ষিতরা চমৎকৃত। নভেলে সেরূপ কাহিনী রচনা করা যায় না? স্কটের ঐতিহাসিক নভেল ঐতিহাসিক রোমান্টিক নভেলের প্রতিষ্ঠা বাঙলাদেশে বাড়িয়ে দেয়। সেদিকে আরও দৃষ্টি পড়ল টড-এর 'অ্যানালস অব রাজস্থান' বেরুবার সঙ্গে। ইতিহাস, হিন্দুগর্ব, বীরগাথা, সবই একসঙ্গে লাভ করা যায় টডের পুরাকাহিনী থেকে। কাজেই, বাস্তবপন্থী নভেলের ধারা অপেক্ষা তথাকথিত ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক ধারার নভেলের দিকে সৃষ্টি-উৎসাহী বাঙালী লেখকদের দৃষ্টি ১৮৫০ সালের পরে পড়লে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

নভেলের জন্য বাঙালী মনে মনে (সাবজেকটিভলি) প্রস্তুত, কিন্তু বাস্তবত (অবজেকটিভলি) তার সামাজিক ক্ষেত্র প্রস্তুত নেই, ক্ষেত্রটা বরং অচল অনড় জাতি-বর্ণ-বাল্যবিবাহবদ্ধ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবিরোধী আধা-সামন্ততান্ত্রিক,—এই নানা চাপ সত্ত্বেও ইংরেজিশিক্ষিত, 'জাগরণে' উদ্দীপ্ত, ভাব-কল্পনা কুশল বাঙালীর হাতে পুরনো 'উপাখ্যান' হয়ে উঠল 'উপন্যাস'। 'সমাচারদর্পণে'-র 'বাবুর উপাখ্যান' (জুন, ১৮২১), 'নববাবুবিলাস' (১৮২৩) বিদ্রূপের নকশা রূপে দেখা দেয়—বাস্তবধারায় তা প্রথম ব্যঙ্গচিত্র মাত্র। প্যারীচাঁদ মিত্রের ('টেকচাঁদ ঠাকুর') 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) শিক্ষাপ্রদ আখ্যান, সমাজ-নকশা। তবু নকশা শুধু নয়, চরিত্র-চিত্রেও 'আলাল' সার্থক। এটি সম্পূর্ণ উপন্যাস না হলেও উপন্যাসকল্প। আনা ক্যাথেরিন মুলেন্স রচিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২) সম্বন্ধেও তা বলা যায়। এদিকে নাটকে কিন্তু 'কুলীনকুলসর্বস্ব'-র মতো বাস্তবসমস্যা নিয়ে নাটক রচিত হচ্ছিল। বঙ্কিমের বন্ধু দীনবন্ধু রচনা করলেন 'নীলদর্পণ' (১৮৬০)। অবশ্য রোমান্সও নাটকে-কাব্যে যথেষ্ট ছিল—'পদ্মিনী-উপাখ্যান' ১৮৫৮ সালের রচনা; মধুসূদন 'শর্মিষ্ঠা' থেকে চলে গেলেন 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'-এ। কথাসাহিত্যে 'রোমান্স অব হিস্টরি' অবলম্বনে রচিত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয়বিনিময়' (১৮৫৭ সালে রচিত) সেই ছদ্ম-ঐতিহাসিক ধারার প্রথম বাঙলা রোমান্স। 'অঙ্গুরীয়বিনিময়' ছোট কাহিনী না হলে রোমান্টিক উপন্যাসের অন্য সকল গুরুত্বই তার আছে। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'দূরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণে'-রও (১৮৫৯-৬০) গুরুত্ব ওরূপ। ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'-র আবির্ভাবের সঙ্গে বাঙলায় এই 'ঐতিহাসিক উপন্যাসের' ধারাতে বাঙলা উপন্যাসেরও যাত্রারম্ভ। 'বিষবৃক্ষ'-এর (১৮৭২)

বঙ্কিমকেই প্রথম যথার্থ ঔপন্যাসিকও বলা উচিত।

'রোমান্স' ও ঐতিহাসিক উপন্যাস

"বঙ্কিম আনলেন সাতসমুদ্রপারের রাজপুত্রকে আমাদের সাহিত্য-রাজকন্যার পালঙ্কের শিয়রে। তিনি যেমনি ঠেকালেন সোনার কাঠি, অমনি সেই বিজয়-বসন্ত, লায়লা-মজনুর হাতির দাঁতে বাঁধানো পালঙ্কের উপর রাজকন্যা নড়ে উঠলেন। চলতিকালের সঙ্গে মালাবদল হয়ে গেল, তারপর থেকে তাঁকে আজ ঠেকিয়ে রাখে কে?"

এই হল রবীন্দ্রনাথের কথায় বঙ্কিমের আবির্ভাবের অর্থ। এ আবির্ভাব 'রাজমোহনস ওয়াইফ' দিয়ে নয়, 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে।

"যে পথ দিয়া উহার অশ্বারোহী পুরুষটি অশ্বচালনা করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃত পক্ষে রোমান্সের রাজপথ; এবং বঙ্গ-উপন্যাসে প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রই এই রাজপথের রেখাপাত করিয়াছিলেন।"

—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কথাটা অনেক প্রতিধ্বনিত, কিন্তু আংশিক সত্য। কারণ, 'দুর্গেশনন্দিনী' রোমান্টিক উপন্যাস ও 'বিষবৃক্ষ'-ই যথার্থ নভেল। বঙ্কিমের রোমান্স কী-জাতীয়, তাও একটু বোঝা দরকার।

'রোমান্টিক', 'ক্লাসিক', রিয়ালিষ্টিক' প্রভৃতি শব্দগুলির যথেচ্ছা প্রয়োগ কে ঠেকাবে? তবে এককথায় বলা যেতে পারে রোমান্টিক রস হচ্ছে 'অদ্ভুত রসের চমৎকৃতি', 'বিস্ময়' তার প্রধান ভাব। তার অবলম্বন রোমান্স। রোমান্সেরও কি রকমভেদ কম?—আজব কথা, 'ঘটন' অপেক্ষা অঘটন, লৌকিক অপেক্ষা অলৌকিক, অতিলৌকিক যার প্রাণ—আবার, শঙ্কা-সূচক গা-ছমছমে কথা (ইংরাজ ওয়ালপোল, মিসেস র‍্যাডক্লিফরা যার পশরা খুলেছিলেন; 'গথিক' রোমান্স ও জার্মান রোমান্সের যা প্রধান গুণ); অজ্ঞাত অপরিচিত (স্ট্রেঞ্জনেস) কথা (হয়তো সুদূর দেশের, হয়তো সুদূর কালের—অর্থাৎ অতীত ইতিহাসের, কিংবা ভাবীকালের কল্পকথা; অথবা সায়েন্স ফিক্‌শ্যান বা বিজ্ঞানের কল্পকাহিনী তাই এ যুগের রোমান্স); অসামান্য বীরত্বকথা, অসমসাহসিক কর্ম (ভালোমন্দ, জীবন-রহস্যের কল্পনাময় কথা, অথবা আবেগরঞ্জিত হৃদয়োচ্ছ্বাস-প্রধান কথা, প্রভৃতি)—রোমান্সের এরূপ কত রকমফের দেখা যায়। কিন্তু মূল মানবজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক হারালে রোমান্সেরও চলে না। রোমান্সও জীবন-সত্য, মানব-সত্যেরই স্বীকৃতি, তবে অসাধারণকে অবলম্বনে, বিস্ময়ভাব আশ্রয়

করে, 'অদ্ভুতরসকে' প্রাধান্য দিয়ে—বাস্তব-কথা যেমন জীবন-সত্যের, মানব-সত্যের স্বীকৃতি সাধারণকে অবলম্বন করে, প্রত্যক্ষতার আনন্দকে আশ্রয় করে, মানব-রসকে প্রাধান্য দিয়ে। রোমান্স বা বাস্তব-কথা দুয়েরই কিন্তু উদ্দেশ্য চমৎকৃতি, রসসৃষ্টি। একটার হয়তো অবলম্বন আকবর বাদশাহ, অন্যটির হরিপদ কেরানী। মাঝখানে বিশিষ্ট মানুষ, অসাধারণ যে সাধারণ হয়েও।

ইংরেজ শাসন আমাদের বাস্তবে চাপা দেওয়ায় কিন্তু আমাদের ভাবনায়-কল্পনায় আগুন দ্বিগুণ তেজে জ্বলল। কর্মজগতে সাফল্য না পেয়ে সেই নবজাগ্রত জীবন-স্বপ্ন; মানুষের মহিমা, অতীতের ভাবময় কল্পনা তার ক্ষতিপূরণ খুঁজছিল মানস-লোকে, বিস্ময়ের উদ্বোধনে, অদ্ভুতরসে, আত্মস্ফূর্তিতে। বাঙালী জাগরণের পিছনে একদিকে ছিল রামমোহন-অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগরের 'বুদ্ধির মুক্তি'র অভিযান, আর দিকে (বিশেষ করে ১৮৫০ সালের সময় থেকে) কল্পনা-আবেগ-আশা-উল্লাস-ভরা আত্মস্ফূর্তি—যা দেখা দেয় ধর্মের উন্মাদনায় ও সাহিত্যের সৃষ্টি-সংকল্পে। ঐতিহাসিক অস্পষ্টতার প্রেক্ষাপটে রোমান্টিক কাহিনী রচনায় বঙ্কিমের তাই হস্তার্পণ। বঙ্কিমের কল্পনা ও মোহাঞ্জন বাঙালী পাঠকের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করলে।

কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভা কি সেই ঐতিহাসিক রোমান্সের পথে তৃপ্ত হবার মতো? সকলেই জানি, বঙ্কিম আমাদের সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্রষ্টা, আর তাঁর প্রতিভা রোমান্টিকতা-প্রবণ। কিন্তু কথাটা সীমাবদ্ধ অর্থে সত্য।

ঐতিহাসিক উপন্যাস কাকে বলে,—আচার্য যদুনাথ সরকার সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 'বঙ্কিমগ্রন্থাবলী'তে তা আলোচনা করেছেন। ঐতিহাসিক গুচ-এর (১৯৪৫) মত উদ্ধৃত করে তাতে তিনি নিজের সম্মতি জানিয়েছেন:

> "ইতিহাস ও উপন্যাস এক বস্তু নহে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্থান সাহিত্যের শ্রেণীতে, ইতিহাসের শ্রেণীতে নয়।"

সামাজিক উপন্যাস সামাজিক তথ্যের রিপোর্ট নয়; ঐতিহাসিক উপন্যাসই বা ইতিহাসের তথ্য-সর্বস্ব হবে কেন? এইটি সর্বস্বীকৃত সত্য—সাহিত্যের সত্য হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'ইতিহাসরস' তা শুধু বস্তুসত্য নয়; তা আরও সত্য, কারণ রসসত্য। তাই যা ইতিহাস-কথিত ঘটনা ইচ্ছামত তাকে ঐতিহাসিক উপন্যাসেও উড়িয়ে দেওয়া চলে না; বিশেষত, প্লট রচনায় তা মানতেই হবে। চরিত্র-চিত্রে ঐতিহাসিক মানুষদের প্রধান বা

অপ্রধান রূপে উপন্যাসে টেনে আনলে তাঁদের যা ঐতিহাসিক রূপ তাকে অবজ্ঞা করা ঠিক নয়। তার সঙ্গে সংগতি রেখে সেরূপ কল্পনায় ছাড়িয়ে যাওয়া বা পূরণ করা যায়। কল্পনারও কিন্তু মাত্রা থাকবে—তাহলেই ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করা হয়। আর ভাবে-ভাষায় বিশেষ সময়কার ধারণার সঙ্গে সংগতি রাখা তো বিশেষ প্রয়োজন। এজন্য ঐতিহাসিক মানুষদের পার্শ্বচরিত্র রেখে অন্যদের প্রধান চরিত্র করলেও সে উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাস হতে পারে। স্কট তো প্রায়ই তা করেছেন। যদুনাথ জানিয়েছেন:

> "লেখক যতই বেশী পরিমাণে নিজ কল্পনায় সৃষ্ট চরিত্র ও ঘটনা রঙ্গমঞ্চে নামাইবেন, ততই তাঁহার একখানা সাহিত্যগ্রন্থ, একটি প্রকৃত কথার বস্তু রচনা করিবার সুযোগ বাড়িবে।"

এই সত্য গ্রহণ করলেও ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকারভেদ হতে পারে। স্কট কি রোমান্স লিখেছেন? স্কট অতীতকে শুধু জীবন্ত করেছেন তা নয়, জীবন্ত মানুষ নিয়েই ইতিহাসকে প্রাণবন্ত করেছেন। অথচ থাকারের 'হেনরি এসমণ্ড'কে বলা যায় বেশি বাস্তববাদী ধারা। আর ডিকেন্সের 'টেল অব টু সিটিস' আবার রোমান্টিক। আরও বোঝা উচিত—ইতিহাস কাকে বলে, তাও এখন প্রশ্ন। ইতিহাসের ধারণা বদলে গিয়েছে। যেমন, আচার্য যদুনাথ গুহ-এর মত জানিয়েছেন—ঐতিহাসিক উপন্যাসও জাতীয়তামূলক। কিন্তু এদিকে ইতিহাসের ধারণাও কেবলই বদলাচ্ছে। ইতিহাস বলতে এখন আর শুধু রাজারাজড়া, যুদ্ধবিগ্রহ বোঝায় না; বোঝায় এক-এক সমাজের মানুষের ইতিহাস; এবং সমাজের সর্বাঙ্গীণ রূপান্তর। ইতিহাস এখন যেন বিজ্ঞান। তার থেকে ইতিহাসের রস নির্যাস করে সাহিত্যে তা ধরার পদ্ধতিও বাড়ছে। যেমন, মনোবিজ্ঞানবিশ্লেষণপূর্ণ (বাস্তববাদী) ঐতিহাসিক চরিত্রব্যাখ্যাও তাতে দেখা যায়। আবার 'ইতিহাসরস' ও 'সাহিত্যরস' দুয়ের সম্মেলিত পরিবেশনও এ যুগে কোনো কোনো ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য। ব্যাপারটা কঠিন, কিন্তু অসাধ্য নয়। এপিক-ধর্মী উপন্যাসও ইতিহাসকে এভাবে আত্মসাৎ করছে। যেমন, সকল যুগের উপন্যাসের মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ এক উপন্যাস, টলস্টয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি'—এক অর্থে এমনি ঐতিহাসিক উপন্যাস, এপিক—মহাকাব্য। আর প্রকৃতপক্ষে তার চেয়েও বড়—তথাকথিত ইতিহাসের নেপোলিয়ন-কুটুজোভদের বীরত্ব-মহিমাকে আচ্ছন্ন করে নাতাশা, আন্দ্রে, পিয়ের, প্লাতো কারাতিয়েফ প্রভৃতি সহস্র মানুষকে নিয়ে মানব-সত্যের, প্রবহমান রূপের কথা।

'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে 'রাজসিংহ' পর্যন্ত বঙ্কিমের আটখানা উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাসের কমবেশি যোগ, আশ্চর্য নয়। ভারতের ইতিহাসে বঙ্কিমের ছিল বিশেষ অনুরাগ। 'দুর্গেশনন্দিনী'কে তিনি প্রথম 'ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস' বলেছেন। 'মৃণালিনী'র প্রেক্ষাপট বক্তিয়ার খিলজির নবদ্বীপ-বিজয়ও শুধু প্রেক্ষাপট নয়। পরের 'সীতারাম' তো ঐতিহাসিক বিষয়ই, তবু সর্বত্র ইতিহাসের গুরুত্ব তত নেই। ১৮৯৩ সালে 'রাজসিংহ'কে তিনি নিজের 'একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু সাধারণভাবে যদি মেনে নিই

"গল্পরস সুনির্দিষ্ট দেশকালের আধারে (আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় স্পেস -টাইম-কনটেকস্টে) পরিবেশিত হলেই উপন্যাসকে বলব ঐতিহাসিক, তা না হলে নয়।" (ডঃ সুকুমার সেন। অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্তের 'ঐতিহাসিক উপন্যাসের পরিচয়' থেকে উদ্ধৃত।) তা হলে বঙ্কিমের আটখানা উপন্যাসকেই ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে পারি। আচার্য যদুনাথের সমর্থনও তাতে আছে। কিন্তু এসব গ্রন্থের অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয়—ইতিহাসকে জীবন্ত করা, বা ইতিহাসরসকে আয়ত্ত করা বঙ্কিমের মুখ্য প্রয়াস নয়। ইতিহাস কখনো বা গৌণ, কদাচিৎ তাঁর বিশিষ্ট অবলম্বন। আসলে বঙ্কিমের উপন্যাসকে ঐতিহাসিক, সামাজিক, পারিবারিক বলে ভাগ করা তাই একটা বাহ্য ব্যাপার।

বঙ্কিমের ঐতিহাসিক রোমান্স বা রোমান্টিক রচনার কথাটাও বুঝবার মতো। 'কপালকুণ্ডলার'র মতো উপন্যাসে ইতিহাসের যোগাযোগটা তুচ্ছ, তাকে ঐতিহাসিক বলা অবান্তর। ঐতিহাসিক রোমান্সও তা নয়; অতীতের কেন, 'কপালকুণ্ডলা' সর্বকালের জগতের রোমান্স। জগৎ ও জীবনের শাশ্বত রহস্যের কবি-কল্পনায় রূপায়িত কথা। অসামান্যকে, অভাবনীয়কে, বৃহৎকে ভাবকল্পনায় অনুধাবন—পরিচিতের মধ্যেও তার স্পর্শ—এই রোমান্টিক-প্রবণতা বঙ্কিমের শিল্পস্বভাবে প্রায় বারবারই স্বীকৃত। তার জন্য ইতিহাস তার প্রয়োজন হত না—'বিষবৃক্ষ' থেকে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' মনে করলেই এই সত্য বুঝতে পারি। বঙ্কিমের মন আজন্ম কবি-কল্পনার ও মহৎ অনুভূতির অধিকারী—তাঁর কর্মগত প্রবণতাও আমরা পূর্বে অনুধাবন করেছি। বঙ্কিমকে প্রথম যৌবনের উপন্যাসে দেখি রসমুগ্ধ, রোমান্টিক সৌন্দর্যসৃষ্টিতে উদ্‌গ্রীব—'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে 'মৃণালিনী' পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টিচেতনা এইভাবে পরিচালিত। রোমান্টিকতার পথে তিনি যে কী অতুলনীয় সার্থকতার অধিকারী, তা দেখি 'কপালকুণ্ডলা'য়। কিন্তু

সেরূপ রসাস্বাদনে বঙ্কিমের জীবন-জিজ্ঞাসার তৃপ্তি কোথায়? 'এ জীবন লইয়া কি করিব?' এই অনির্বাণ জিজ্ঞাসা তাই চাইল জীবনকে আরও ঘনিষ্ঠ করে, আরও প্রত্যক্ষভাবে। তাই 'বিষবৃক্ষে' স্পষ্ট আধা-সামন্ত বাঙালীসমাজ, পরিচিত গৃহজীবন, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জীবন। বঙ্কিম অন্তঃস্পর্শী কল্পনা-ভাবনায় তার সত্যকে সে উপন্যাসে বুঝলেন। তাই অতীত বা ইতিহাস আর তাঁর কাছে কল্পনার অনিবার্য প্রেক্ষাপট রইল না। রোমান্টিকতাও চাইল না তেমন সুদূর আধা-আলো আধা-অন্ধকারের প্রদোষ-পারিপার্শ্বিক। পরিচিতের মধ্যেও জীবনের মহৎ বা নিগূঢ় প্রবৃত্তি কি কম সত্য? না কম বিস্ময়েরই, না কম গুরুতর? জ্ঞানার্জনী বৃত্তি ও চিত্তরঞ্জনী বৃত্তির সামঞ্জস্য তার অবলম্বন। তাঁর রোমান্টিকতার পরিণতিধারা তাই জীবন-নিষ্ঠ। সেখান থেকেও অবশ্য জীবন-জিজ্ঞাসা তাঁকে ঠেলে নিয়ে গেল ধর্মজিজ্ঞাসায়—যার প্রভাবে বঙ্কিম নির্মাণ করলেন তিনটি প্রচারের 'কল'—'আনন্দমঠ,' 'দেবী চৌধুরাণী,' 'সীতারাম'। কিন্তু 'জীবন লইয়া কি করিব?'—এই ভাবনা বঙ্কিমের উপন্যাসেরও অন্তর্গূঢ় জিজ্ঞাসা। তাই শত সত্ত্বেও এই জীবন-জিজ্ঞাসার দিক থেকে বঙ্কিমের উপন্যাসকে দেখাই আসল দেখা।

জীবন-নিষ্ঠাকে স্বীকার করেই বঙ্কিমের রোমান্টিকতা—এই হল বঙ্কিমের রোমান্টিকতার নিজস্ব রূপ। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', 'জাতীয়তামূলক উপন্যাস', 'সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাস', 'প্রচার-মূলক উপন্যাস'—এরূপ নামে বঙ্কিমের সৃষ্টি-সম্পদকে ভাগ করতে চাইলে করা যায়। কিন্তু 'এহ বাহ্য'। তার অপেক্ষা বেশি শিল্প-সংগত—রসমুগ্ধ রোমান্টিক কল্পনা, জীবননিষ্ঠ রোমান্টিক কল্পনা ও মতাদর্শপ্রধান রোমান্টিক কল্পনার সৃষ্টি হিসাবে এই তিন পর্যায়ে বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিকে গণনা করা। আসল লক্ষণীয়—যুগের জীবনদৃষ্টির দিক থেকে বঙ্কিমের সৃষ্টি। স্মরণ রাখা উচিত—সর্বাগ্রে প্রয়োজন বঙ্কিমের প্রধান উপন্যাসগুলি একে একে পাঠ; তাঁর প্রধান উপন্যাসগুলি তার পরে বুঝে নেওয়া, শেষে বোঝা সাহিত্যে তার তাৎপর্য।

বঙ্কিমের সৃষ্টিসম্পদ

১৮৬৫ সালে মার্চ মাসে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয়। 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে 'সীতারাম মোট ১৪ খানি উপন্যাস বঙ্কিমের

সৃষ্টিকর্মের প্রধান নিদর্শন। সমমূল্যের নয়, তবে ৫ খানিকে স্মরণ রাখতেই হয়—কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর ও রাজসিংহ।

'এ জীবন লইয়া কি করিব, কি করিতে হয়,'—এইটিই বঙ্কিমচন্দ্রের মূল জীবন-জিজ্ঞাসা। কিন্তু তারও মূল বঙ্কিমচন্দ্রের সোৎসুক জীবন-চেতনা—কী রহস্য এই জীবন!—বঙ্কিমপ্রতিভা প্রথম সেই রসানুভূতিতে উন্মেষিত হয়; রহস্যানুভূতি ও রহস্যজিজ্ঞাসা প্রায় শেষ অবধি একসঙ্গে চলে। কারয়িত্রী প্রতিভাই বঙ্কিমকে প্রথম সাহিত্যে আত্মপ্রকাশে পরিচালিত করে। তের বৎসর আট মাসের পদ্যলেখক বঙ্কিমকে তথাপি ছেড়ে দেওয়া উচিত। ইংরেজি 'রাজমোহনস ওয়াইফ'-এর (ধারাবাহিক প্রকাশকাল ১৮৬৪) লেখকও বাঙলা পাঠকের নিকট প্রায় অজ্ঞাত ও অগ্রাহ্য। অবশ্য 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনা তখনি (১৮৬৩-৬৪) আরম্ভ হতে চলেছে; এবং সকলের বিচারেই ১৮৬৫ সালে 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশেই বঙ্কিমের সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণ। বঙ্কিম তখন অন্তরে অনুভব করেছেন—সৃষ্টির জগৎই তাঁর নিজের জগৎ—'রাজমোহনস ওয়াইফ' ও 'দুর্গেশনন্দিনী' এই জীবন-সংকল্পের সুস্থির প্রমাণ। সেই ১৮৬৫ সাল থেকে ১৮৯৩ সালের বড় 'ইন্দিরা' ও বড় 'রাজসিংহ' পর্যন্ত বঙ্কিমের কারয়িত্রী প্রতিভা কখনো তাঁকে পরিত্যাগ করে নি। আবার, 'মৃণালিনী'র (১৮৬৯) পর 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭২) থেকে 'সীতারাম' (১৮৮৭) পর্যন্ত,—অর্থাৎ শেষ সৃষ্টি-প্রয়াসেও,—বঙ্কিমের ভাবয়িত্রী প্রতিভা তাঁর কারয়িত্রী প্রতিভাকে নিষ্কৃতি দেয় নি। প্রথমে পদে পদে সহযোগী হয়েছে; ক্রমে তাকে সঞ্চালিত করতে গিয়েছে; এবং শেষে সৃজনশক্তিকে আপনার 'প্রচারের কলে'ও পরিণত করতে পেরেছে। অবশ্য, এই সকলের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি, বঙ্কিমের চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিকে একটা গুরুত্ব ও গরিমা দিয়েছে, তাও নিঃসন্দেহ। কারণ, দুই বৃত্তির যথাযথ অনুশীলনে সমগ্র প্রতিভা চেয়েছে তার সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকাশ, সৃষ্টির মধ্য দিয়ে জীবন-জিজ্ঞাসার সার্থক উত্তর।

স্বভাবতই সাধারণ পাঠকের চিত্ত জয় করে চিত্তরঞ্জনী রচনা। সেই সাহিত্যের মারফতই অধিকাংশ বাঙলা-পাঠক বঙ্কিমের মনন-ধারারও ধারণা সংগ্রহ করে। বঙ্কিমের চিন্তা-সম্পদ বরাবরই তর্কসাপেক্ষ ছিল, কালের জিজ্ঞাসা তাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে, তা আমরা পূর্ব খণ্ডে মনন-সম্পদের আলোচনায় দেখেছি। কিন্তু বঙ্কিমের উপন্যাস? – উপন্যাসশিল্পের ধারা আধুনিক কালে

বঙ্কিমের শিল্পরীতি ও পদ্ধতিকে ছাড়িয়ে গিয়েছে, তাও আমরা জানি, কিন্তু রসবস্তুরূপে বঙ্কিমের সৃষ্টিসম্পদ তথাপি সরস, আর তাই সজীব। সর্বকালের কাছেই এই কারণে বঙ্কিমের স্থির পরিচয়—তাঁর উপন্যাস, তাঁর সৃষ্টি-সম্পদ, বিশেষ তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের সাক্ষ্য।

পরিচয় পরিক্রমা

'এই জীবন লইয়া কি করিব? কি করিতে হয়?', এই প্রশ্ন বঙ্কিমের মনে উদিত হত, আর সারা জীবন তিনি সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। মনন-সাহিত্যের আলোচনা করলে বেন্থাম, মিল, কোঁৎ থেকে গীতা পর্যন্ত বঙ্কিমের এই উত্তরান্বেষণ আমরা দেখতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিস্বরূপ, পরিবার-পরিবেশগত তাঁর উত্তরাধিকার, অপ্রাকৃতে বিশ্বাস, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম ও সমাজের জন্য সুগভীর মমতা এসব মনে রাখা দরকার। সেই সঙ্গে যে বিশেষ পরিস্থিতি বা ঊনবিংশ শতাব্দীর যে বিশেষ ক্ষণটি বঙ্কিমের প্রতিভার প্রকাশকাল এবং তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, অধ্যয়ন, জ্ঞানার্জন, বিচার-চিন্তা প্রভৃতির সাহায্যে তিনি যে জীবন-জিজ্ঞাসা পরিচালনা করেন, তাও দেখতে হয়। শিল্প-সৃজন যত সার্থক হয় ততই তার অভ্যন্তরে ওসব প্রভাব এমন মিলেমিশে যায় যে, তা সহজে আর পরিলক্ষিত হয় না। বঙ্কিম-জীবনের যেসব বিশেষ ঘটনা কোনো উপন্যাসরচনার উপলক্ষ বলে কথিত, উপন্যাস-পরিচয়ে তা জানা থাকা উচিত। সাহিত্যের দিক থেকে সেসব ঘটনা অনেক সময়ে গৌণ ব্যাপার, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব বরং যা অনেক সময়ে অপ্রত্যক্ষ এমন সব জিনিসের—যেমন, বঙ্কিমের জীবন-যাত্রায় বাস্তব ও মানসিক ধারার, মানসিক-প্রবণতার, ধ্যান-ধারণার, নীতিগত আদর্শের, এবং বঙ্কিমের বিষণ্ণ অন্তর্মুখিতার ও গম্ভীর জীবন-জিজ্ঞাসার; —মূলত সেই প্রশ্নের—'এ জীবন লইয়া কি করিব'।

'উপন্যাস-সাহিত্যে' দেখা যাবে 'কি করিব?' এই প্রশ্নও বঙ্কিম-প্রতিভায় কিভাবে উদিত হয়। 'কি করিব?'—এই প্রশ্নটা তো কর্তব্য-জিজ্ঞাসা ও নীতিজিজ্ঞাসা। সর্বাগ্রে তাতে জিজ্ঞাসা—'কী এই জীবন?' অথবা, আরও একটু আগেকার যা ব্যাপার—তখন তা প্রশ্ন নয়, শুধু এক বিস্ময়ের অনুভূতি,—'কী এই জীবন!' এই জীবনবোধের কথাই তাৎপর্যবিচারে মূল কথা—প্রথম, বিস্ময়, বিস্ময়মিশ্রিত জিজ্ঞাসা, বিষণ্ণ গাম্ভীর্য, ক্রমে তার উত্তরান্বেষণের সূত্রে

নীতিজিজ্ঞাসা, নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন, এবং শেষে ধর্মাধর্ম সিদ্ধান্ত ও প্রচার—সৃজনক্ষেত্রে বঙ্কিমের জীবন-জিজ্ঞাসার এই ক্রম। অবশ্য, উপন্যাসের বা সৃষ্টি-সম্পদের তাৎপর্যচিন্তায় শিল্প-তাৎপর্য, ভাবনা-তাৎপর্য, সামাজিক-তাৎপর্য, অধ্যাত্ম-তাৎপর্য প্রভৃতি নানা দিক থেকে সেই তাৎপর্যান্বেষণ করতে হয়। কিন্তু উপন্যাসের আসল তাৎপর্য 'বক্তব্যে' নয়; নীতিস্থাপনায় নয়, জীবন-দর্শনের প্রতিপাদনে নয়—কারণ, উপন্যাস ধর্মসংহিতা নয়, চর্যাচর্যবিনিশ্চয় নয়,—জীবনের সত্যার্থপ্রকাশ। সৃষ্টিসম্পদের মূল তাৎপর্য তাই লেখকের জীবন-বোধের বিশিষ্টতায়।—অন্য সবই সেই বোধ থেকে সমুদ্ভূত বা তার প্রকাশ। জগৎ ও জীবনের হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ অনাবৃত করে জীবন-সত্য ও মানব-সত্যের যে নিগূঢ় রূপ বঙ্কিম বাঙলা সাহিত্যে—ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে—আমাদের নিকট উন্মোচিত করলেন, তাতেই বঙ্কিমের সৃষ্টিসম্পদের মূল তাৎপর্য নিহিত।

তিন পর্ব: বঙ্কিমের সাহিত্যিক জীবনের তিনটি পর্ব দেখতে পাওয়া যায়। মনন-সাহিত্য অপেক্ষাও সৃজন-সাহিত্যে সেই পর্বগুলি আরও স্পষ্ট। পর্বগুলি একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়, তবু শিল্প-চেতনার এই তিন পর্ব পরিষ্কার।

জীবন সম্বন্ধে বঙ্কিমের প্রথম অনুভূতি ছিল বিস্ময়-রোমাঞ্চের, রোমান্টিক মুগ্ধতার ও রসানুভূতির। এ পর্ব তাঁর রস-চেতনার পর্ব। প্রথম তিনখানা উপন্যাস এই রস-চেতনায় প্রণোদিত, তাতে 'জীবন লইয়া কি করিব?' এই প্রশ্ন প্রধান নয়। 'কী এই জীবন!' জীবন-রসিকের এই রোমান্টিক ভাবাবেশ তাতে প্রধান। ঐতিহাসিক রোমান্স রচনা—বঙ্কিমের প্রথম সৃষ্টি-প্রয়াস। 'দুর্গেশনন্দিনী' 'কপালকুণ্ডলা'তে রোমান্টিক কল্পনা আছে, কিন্তু সেরূপ রোমান্স আর নেই। এই কাব্যময় রহস্য-চেতনায় ও অদৃষ্ট-চিন্তায় রসাবেশ সেখানে এক বিষণ্ণ জিজ্ঞাসায় পৌঁছেছে—'কী এই জীবন?' 'কপালকুণ্ডলা'য় বঙ্কিম ভাবস্তব্ধ, সে জিজ্ঞাসা গাম্ভীর্যমিশ্রিত বিষাদেরও। 'মৃণালিনী'তে সেই রস-চেতনা তত প্রবল নয়। একটা স্থিরতর ভূমিতে শিল্পী পদস্থাপনা করতে চান, কিন্তু তার নাগাল পান না। মনোরমা-চরিত্রে রহস্যচেতনার রেশ টেনে নিজেকে বহন করেন। পর্ব শেষ হচ্ছে—বোঝা যায়—শুধু রস-চেতনায় আর লেখকের তৃপ্তি নেই।

পর্বান্তর এল। 'বিষবৃক্ষে' পটভূমি বদলে গেল। সমসাময়িক দেশকালের পরিচিত জীবন-যাত্রার মধ্যে বঙ্কিম পদস্থাপনা করলেন,—সেই পরিচিতের মধ্যে তিনি জীবনের রূপরসের উদ্বোধন করবেন। আসলে পরিপ্রেক্ষিতও বদলে

গেল। তখন থেকে বঙ্কিমের রোমাণ্টিক চেতনা পরিকল্পিত হল জীবন-জিজ্ঞাসার নিয়মে—আরম্ভ হল 'জীবন লইয়া কি করিব?' এই গম্ভীর জিজ্ঞাসা,—প্রবৃত্তির ও সংযমের প্রাণক্ষয়ী দ্বন্দ্ব, আরম্ভ হল নীতিচেতনার পর্ব। 'বিষবৃক্ষ' থেকে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পর্যন্ত উপন্যাসগুলিতে এই জিজ্ঞাসার গভীরতা দেখা যায়। দেখা যায়—জীবন-ধর্মের রক্তাক্ত সংগ্রামের রূপ, রস-চেতনার সঙ্গে নীতি-চেতনার দ্বন্দ্ব-মিলন ও সমন্বয়ের ক্রমাগত প্রয়াস। সংস্কারগত পাপবোধ ও যুক্তিবাদী নীতিবোধ দুইকেই তথাপি এ সময়ে সংযত রেখেছে বঙ্কিমের রঞ্জনীবৃত্তি। বঙ্কিমের সৃষ্টিশক্তির তাই পূর্ণতা ঘটেছে এই পর্বে—নীতিপ্রবণতা যেখানে উৎকট নয়, জীবন-বোধে গভীরতা দিয়েছে, জীবন-সত্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সম্ভব করেছে।

তৃতীয় পর্বে 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী,' 'সীতারাম'—এই উপন্যাস-'ত্রয়ী', বঙ্কিমের ভাষায় তাঁর 'প্রচারের কল',—ধর্মতত্ত্ব প্রতিপাদন, সংহিতাকার বঙ্কিমের নীতি-নির্দেশ। আধুনিক কোঁৎবাদী যুক্তি ও নীতিবুদ্ধির সঙ্গে ফিউডাল সমাজের আচরণ-বিধিকে—গীতার নিষ্কামকর্মের সূত্রে—জোর করে মিলিয়ে সমন্বয়ের চেষ্টা—আসলে সমন্বয়ের নামে পৌরাণিক সমাজবিধিকেই বঙ্কিম এ পর্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এটি বঙ্কিমের ধর্ম-চেতনার কাল,—ধর্মগত মতবাদের মধ্যে আত্মাশ্রয়চেষ্টা। রস-চেতনা ও শিল্প-চেতনা অপেক্ষা 'বক্তব্যে'র ঝোঁকই এ পর্বে প্রকট। চিত্ত-রঞ্জিনী শক্তি কিন্তু এ সময়েও একেবারে স্তিমিত নয়; বরং বড় ইন্দিরায় ও বড় রাজসিংহে তার পরিণত প্রকাশ দেখা যায়—তখন বঙ্কিম নীতির পরোয়া করেন নি, ধর্মের পরোয়ানা সেখানে বিশেষ মানেন নি। দৃঢ়হস্তে সুপরিণত শিল্পের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। 'ইন্দিরা'র ভাগ্যজয়ের কৌশলে তাই দেখি বঙ্কিমের অকুণ্ঠিত সম্মতি তাঁকে হাস্য-সরস করে তুলেছে। 'রাজসিংহে' মুঘলসাম্রাজ্যের ক্ষুদ্রতা ও ন্যায়ধর্মহীনতা রাজপুত হস্তে প্রতিহত হচ্ছে—ইতিহাসের এই ন্যায়নীতিতে বঙ্কিমের জীবন-বোধ তাই আশ্বস্ত। ইতিহাসের দুর্জয় প্রবাহে 'বক্তব্য'ও আপনা থেকেই তাই প্রাণবন্ত।

'ইন্দিরা' ও 'রাজসিংহ' দুই-ই বঙ্কিমের শিল্প-প্রতিভার পরিণত কীর্তি। দুখানাই ঐ তৃতীয় পর্বের অনেকটা ব্যতিক্রম। চিত্তের দ্বন্দ্বহীনতার পরিচায়ক। সামগ্রিক বিবেচনায়—রস-চেতনার পর্বের 'কপালকুণ্ডলা' ও নীতিচেতনার পর্বের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিমের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, সেই মধ্যপর্বের 'বিষবৃক্ষে'র স্থানও সেই সারিতে। তারপরেই বিশিষ্ট সৃষ্টি 'চন্দ্রশেখর' ও 'রাজসিংহ'। তাৎপর্যের

বিচারে এই কয়খানা উপন্যাসই মূলত গ্রাহ্য। 'রজনী,' 'ইন্দিরা' বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় পর্বের উপন্যাসত্রয় অবশ্য বাদ দেওয়া যায় না অন্য কারণে —ধর্মপ্রচার শিল্পধর্মকে ছাড়িয়ে গেলে নিজেও ব্যর্থ হয়।

একশত বৎসরের পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিকভাবে বঙ্কিমের মুখ্য তাৎপর্য কী দাঁড়িয়েছে, এখন তা জিজ্ঞাস্য। যা রসোত্তীর্ণ বলে গ্রাহ্য, তারই তাৎপর্য জিজ্ঞাস্য; শ্রেষ্ঠ কীর্তিরই গুরুত্ব সমধিক।

দেশকালগত তাৎপর্য

বঙ্কিমের একটা তাৎপর্য সর্বস্বীকৃত,—আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিমের স্থান নিয়ে প্রশ্ন নেই: বাঙলা ভাষায় বঙ্কিম প্রথম ঔপন্যাসিক। তার অর্থ—ভারতীয় ভাষাতে, হয়তো বা আধুনিক প্রাচ্যমণ্ডলের ভাষাতেও, বঙ্কিম প্রথম ঔপন্যাসিক। কথাটার যথার্থ তাৎপর্য বোঝা সম্ভব হয় যদি আমরা আলোচনার সূচনায় উপন্যাস কী, উপন্যাসের জন্ম কিরূপে—তা মনে রাখি। অন্য দেশের সঙ্গে তুলনায় প্রতিতুলনায় (প্রতিতুলনায় না হোক, পার্থক্যে) বঙ্কিমের এই দেশকালগত তাৎপর্য আমরা অনুভব না করে পারি না।

১৮৬৫ থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত বঙ্কিমের লেখক জীবন—মোটামুটি ১৮০০ সাল থেকে ১৮৯০ সাল তাঁর কালগত পটভূমি। দেশ বাঙলাদেশ। কিন্তু চিত্তের পটভূমি আরও বিস্তৃত। ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্য-সম্পদের সঙ্গে বঙ্কিমের পরিচয় সুগভীর; ইংরেজিতে সুশিক্ষিত বাঙালীরূপে ইংরেজি ভাষার মারফত ইংরেজি চিন্তাজগৎ ও ইংরেজি সাহিত্যজগৎ বঙ্কিমের সেইরূপ সুপরিচিত। কতকাংশে ইংরেজি ভাষার বলেই পাশ্চাত্য সভ্যতার অতীত সম্পদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ, সমসাময়িক পাশ্চাত্য সাহিত্য-সম্পদের সম্বন্ধে যে তিনি তদপেক্ষা কম আগ্রহী ছিলেন না, তাও অনুমান করতে পারি। তাঁর সাহিত্যাদর্শ সংস্কৃত কাব্যের সাহিত্যাদর্শ নয়;—গোলেবকাওলীও নয়। পাশ্চাত্য জগতের বঙ্কিমের জানার কথা—ইংরেজি ফরাসী প্রভৃতি পাশ্চাত্য সাহিত্যে উপন্যাসের প্রধান ধারা বাস্তবপন্থী, তাই যুগেরও পন্থা। সেই বাস্তবমুখী ধারার পার্শ্বে অবশ্য রোমান্স-পন্থী উপন্যাসের ধারাও আছে, ঐতিহাসিক রোমান্সও আছে। কিন্তু রোমান্টিক উপন্যাস উপন্যাসের শাখাপথ, মূল পথ বাস্তবমুখী। তবু সেই যুগ-জোয়ারে বঙ্কিম তরী ভাসান নি—বাঙলার প্রথম উপন্যাস রোমান্টিক ধারায় যাত্রা শুরু করে, কিন্তু রোমান্টিক উপন্যাসের

যে তা একটি বিশিষ্ট প্রকাশ, প্রথমে তাই লক্ষণীয়—কেন ? কেন রোমান্টিক উপন্যাসের পথ বাঙলায় প্রথম গ্রাহ্য হয় ?

সংক্ষেপে তার উত্তর—দুটি কারণে। এক—বঙ্কিম প্রতিভার নিজস্ব ধর্ম (দৃষ্টিভঙ্গি); দুই—দেশকালের বিশেষ পরিবেশ-পরিস্থিতি। পরাধীন দেশের আমরা মানুষ তখনো আর্থিক-রাষ্ট্রিক নিগড়ে বাঁধা। একই সঙ্গে ফিউডাল ঐতিহ্যবন্ধন ও শাসকশ্রেণীর শাসন-শোষণের নাগপাশ—ডবল ডবল বন্ধন—একদিকে এই হল বাস্তব (অবজেকটিভ) অবস্থা।

আমাদের জীবনযাত্রার পর্দাপ্রথা, বাল্যবিবাহ, ধর্মগত ও বর্ণ ('কাস্ট')-গত ভাগ-বিভাগ, নারীজাতির স্বাতন্ত্র্যহীনতা বহুকালের নিয়ম,—এর মধ্যে পূর্বরাগ অনুরাগের অবকাশ কোথায় ? ব্যক্তিচরিত্রের প্রকাশ কতটুকু সম্ভব ? বঙ্কিমের পূর্বে দীনবন্ধু মিত্র অবশ্য নাটক-প্রহসন রচনা করেছিলেন, এই সমাজের প্রত্যক্ষ বাস্তবকে গ্রহণ করে, সার্থক চরিত্রও সৃষ্টি করেছিলেন কিন্তু সমাজ-বাস্তবকে যথার্থরূপে না বোঝায় বহু ক্ষেত্রেই দীনবন্ধু ব্যর্থ হন। 'লীলাবতী'র সমালোচনায় দীনবন্ধুর এই ব্যর্থতার কারণ বঙ্কিম স্পষ্টভাবেই (১৮৮৫) নির্দেশ করেছিলেন :

"হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, কোর্টশিপের পাত্র হইয়া যিনি কোর্ট করিতেছেন তাঁহাকে মনপ্রাণ সমর্পন করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাঙালী সমাজে ছিল না—কেবল আজকাল নাকি দু-একটা হইতেছে শুনিতেছি।"

বোঝা যায়, বিশ বৎসর পূর্বে—১৮৬৫ সালে 'দুর্গেশনন্দিনী'র রচনাকালে—বঙ্কিমের নিজেরও ছিল এই সমস্যা—'আমাদের সমাজে ধেড়ে মেয়ে নেই'—পূর্বরাগ, অনুরাগের অবকাশ কোথায় ? তাই ইতিহাসের শরণ নিতে হয়। কতকটা এই সামাজিক কারণে এবং কতকটা আপনার নিজস্ব রোমান্টিক কল্পনার জন্য ও যৌবন-সুলভ রোমান্স-প্রীতিতে, বঙ্কিম উপন্যাসসৃষ্টিতে রোমান্টিক উপন্যাসের পথ গ্রহণ করেছিলেন। বুঝেছিলেন রোমান্টিক কল্পনার পক্ষে নাতিপরিচিত ঐতিহাসিক পটভূমিই সৌন্দর্যসৃষ্টির সুস্থ পথ। সৌন্দর্যসৃষ্টিই তখন বঙ্কিমের প্রধান লক্ষ্য (দ্রষ্টব্য : 'উত্তরচরিত' ১।২)—শুধু 'স্বভাবানুকারিতায়' সৌন্দর্যসৃষ্টি হয় না,—এই তাঁর ধারণা। চিত্ত-চমৎকৃতি উৎপাদন বঙ্কিমের যুবক-প্রতিভার প্রথম লক্ষ্য। বাঙলার প্রথম ঔপন্যাসিক তাই উপন্যাসের প্রধান ধারায় বাঙলার উপন্যাসের উদ্বোধন করলেন না। বরং নিজের দেশকালের সেই বিশেষ সামাজিক অবস্থাতে রোমান্টিক উপন্যাসের ধারায় বাঙলা উপন্যাসের

উদ্বোধন করলেন।

পলায়ন-পথ? প্রসঙ্গত কথাটা একবার পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। সাধারণত, ধরা হয় সাহিত্যে বাস্তবমুখী পথ ছেড়ে রোমান্টিক পথ গ্রহণ করার অর্থ হল জীবনের থেকে 'পলায়ন' (এসকেপ), কল্পলোকে আত্মরক্ষার চেষ্টা। বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিমের রোমান্টিকতার অর্থও তাই সেরূপ 'পলায়ন'-চেষ্টা, তা 'প্রতিক্রিয়াশীলতা'। কলোনির 'মধ্যবিত্ত' শিক্ষিতের শ্রেণী-চরিত্র হল-'জীবন-বিমুখিতা', 'পলায়নী-স্বভাব' (এসকেপিজম)। বঙ্কিম সেই ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুখপাত্র হিসাবে সে পথই গ্রহণ করেন।

স্পষ্ট করে বোঝা দরকার, এই শ্রেণীগত সাহিত্য-ব্যাখ্যা অতি-সরলীকরণ (ওভার-সিমপ্লিফিকেশন), রোমান্টিকতার অর্থ সর্বক্ষেত্রে 'পলায়ন-চেষ্টা' নয়। তুচ্ছতা-ক্ষুদ্রতায় বিজড়িত অবসন্ন জাতিকে রোমান্টিক মহৎ আদর্শ প্রবুদ্ধ করতে পারে। কাজেই সব রোমান্টিকতা জীবন-বিরোধী নয়। আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর 'জাগরণের' অভ্যন্তরেই যে নানা বক্রতা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল তা আমরা জানি। কিন্তু সেই সময়কার বাঙলা সাহিত্যের প্রধান স্বরটা কি? মোটামুটি ১৮৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত আমাদের গিয়েছে যুক্তিবাদী চিন্তা ও কর্মের উদ্বোধনে—তা 'প্রস্তুতির পর্ব'। ১৮৬০ থেকে আসে সৃষ্টির পর্ব—আশায়-আনন্দে অভিনব-উল্লাসে। অবশ্য সাবজেকটিভিজমে ব্যর্থতার সকরুণ বিষাদ আছে। কিন্তু বড় কথা—জাতীয় মানসকে মুক্ত করার স্বপ্ন—সাংস্কৃতিক স্ফুরণ। সমাজজীবনে দ্বিমুখিতা (ডাইকোটমি) ছিল, সাহিত্যেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু নবজাগ্রত বাঙলা সাহিত্যের তা সত্ত্বেও মুখ্য উপজীব্য ছিল মনের বৃহৎ স্বপ্ন, মহদুদ্দীপনা—অর্থাৎ গর্কি যাকে পরবর্তীকালে বলেছেন 'রিভল্যুশনারি রোমান্টিসিজম' বা বিপ্লবী রোমান্টিক প্রেরণা। সেই প্রেরণাতেই বাঙলা কবিতায় মাইকেল এই দুর্দান্ত সাহসের পথ গ্রহণ করেছিলেন—অন্যদিকে অবসাদে আত্মবিলাপও করেছেন।

'স্বভাবাতিরিক্ত' চিত্ত-চমৎকৃতির জন্য বৃহৎ করে, মহৎ করে, জীবন-স্বপ্ন রচনা, আশা-উল্লাসে জাতীয় চেতনাকে সঞ্জীবিত করা, প্রবুদ্ধ করা—এই সেই প্রথম ঔপন্যাসিকের দেশকালগত তাৎপর্য। বঙ্কিমের শিল্পস্বরূপের আলোচনা করলে তাঁর জীবননিষ্ঠ রোমান্টিক কল্পনার তাৎপর্য আরও বিশেষ করে উপলব্ধি করতে পারব।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে বাঙলা উপন্যাস প্রথম সেই মুক্তিপথ দেখল—৯৯৭

বঙ্গাব্দে শৈলেশ্বরের মন্দিরে, 'দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে', 'সাগরসঙ্গমে' 'সাড়ে ছয় শত বৎসর পূর্বে' (১২০১ সালে) গৌড়ে। জীবন-জিজ্ঞাসায় তীব্রতা থাকলে এরূপ সুদূর রাজ্যে শিল্পী আবদ্ধ থাকবে না। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি নিজের অভিজ্ঞতার মধ্য হতেই সন্ধান করবে জীবনের সাক্ষ্য। তাতেও দেখবে— মানুষে-মানুষে সম্পর্ক, স্নেহ-প্রেম-ঘৃণা-আকাঙ্ক্ষার অভিযান-অভিসার। এই ঔপনিবেশিক বাঙালী জীবনেও সেই মূল সত্য তো অনুপস্থিত নয়। পরিচিত সমাজরূপের মধ্য থেকে অন্তর্নিহিত জীবন-সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করা, সেই অপরাজেয় মানব-সত্যকে উন্মোচিত করা—এই তো জীবন-রসিক সাহিত্যস্রষ্টার আত্মপ্রকাশের পথ। 'বিষবৃক্ষ' থেকে বাঙলা উপন্যাস সেই পর্বে উত্তীর্ণ হয়। বঙ্কিমের জীবন-নিষ্ঠ কল্পনা 'স্বভাবানুকারিতার' সঙ্গে 'স্বভাবাতিরিক্ততাকে' তখন মিলিয়ে সৃষ্টিতে অগ্রসর হল। তার সাধনা—যে প্রচ্ছন্ন সত্য (রিয়েলিটি) সমাজের তখনো অগোচর, তাকে মায়া-কল্পনার ('ইল্যুশন') মধ্য দিয়ে সঞ্জীবিত করা, সম্ভাবিত করা ; আর রোমান্সের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে ঘুমন্ত রাজকন্যাকে জীইয়ে তোলা— অমনি ঘুমের রাজ্যে সাড়া পড়বে, শোনা যাবে পাখির কলকাকলি, মানুষের কোলাহল, জীবন-চাঞ্চল্য, বাঙালীর গৃহ-কোণেও প্রাণের দাপাদাপি। বাঙলার প্রথম ঔপন্যাসিকের এই ছিল সাধনা—আর সে সাধনা নিরর্থক হয় নি,—কল্পনার স্বপ্ন জীবনে সত্য হয়ে উঠল—শুধু রোমান্টিকতার শূন্যলোকে ভেসে গেল না।

বঙ্কিমের প্রেরণার উৎস : সন্দেহ নেই যে, বঙ্কিমের প্রেরণার উৎসস্থল মুখ্যত ইংরেজি সাহিত্য। কিন্তু শুধু স্কট, বায়রন, মূর নয়, বঙ্কিমের রোমান্টিক চেতনার প্রধান প্রেরণাদাতা প্রথমত শেকসপীয়র—যুদ্ধবিগ্রহ মানবহৃদয়ের দুর্জ্ঞেয়তার এমন উজ্জীবন-উদ্ভাবন আর কার সৃষ্টিতে পাওয়া যায়? বঙ্কিম হয়তো তা কতকাংশে কালিদাস-ভবভূতিতেও পেয়েছিলেন। কিন্তু শেকস-পীয়রের পরে বঙ্কিমের দ্বিতীয় প্রেরণাদাতা ইংরেজী সাহিত্যের নিসর্গানু-ভূতির কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ। এখানেও কতকাংশে হয়তো ভারতীয় নিসর্গ-চেতনার ঐতিহ্য, নিসর্গসৌন্দর্য-মুগ্ধতা ও রসানুভূতি বঙ্কিম-মানসকে প্রস্তুত করেছিল। তবু মূলত প্রেরণার উৎস শেকসপীয়র ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ।

কিন্তু স্কট? স্কট কি বঙ্কিমকে প্রেরণা জোগান নি? সেই প্রসঙ্গটা এইখানে শেষ করা যাক।

'বাঙলার স্কট'? ঐতিহাসিক উপন্যাসের পথ বঙ্কিমের নিকট স্কট দেখিয়ে-

ছেন। কিন্তু বঙ্কিম বাংলার স্কট নন। স্কটও তাঁর কালের জাতীয় উদ্বোধনের এক গুরু, বঙ্কিমও সেইরূপ জাতীয়তার গুরু বলে গ্রাহ্য। কিন্তু স্কট-এর ভাবয়িত্রী প্রতিভা ছিল না। আবার, উপন্যাসের বেলা স্কটের সকল বৈশিষ্ট্য বঙ্কিমের ছিল না। উদ্ধৃতি-চিহ্ন ছাড়া সংক্ষেপে উদ্ধৃত করছি (নিজেরই কথা, অন্যত্র লেখা)—স্কটের গল্প বলার অসামান্য ক্ষমতা ছিল, সে ক্ষমতা বঙ্কিমেরও অসামান্য। অতীতকালীন কাহিনীতে ভাগ্যের অনিশ্চয়তা—অর্থাৎ ঝড়-বৃষ্টি, যুদ্ধবিগ্রহ, দৈব-নির্ভরতা, আকস্মিক ও অলৌকিক বিশ্বাস—এইসব ঔপন্যাসিকের প্রয়োজন হত ;—অবশ্য সেজন্য চাই লেখকের উদ্ভাবনা-শক্তি ও শিল্পকৌশল, আপন মনের মাধুরী মেশানোর ক্ষমতা। স্কটের এ ক্ষমতা অফুরন্ত ; বঙ্কিমেরও তা অফুরন্ত ছিল। স্কটের মোহ রাজা-রাজড়াদের প্রতি ; তথাপি মোহহীন সজল দৃষ্টিতে তিনি দেখেছেন সামান্য অনুচরশ্রেণী-কেও—নিচের তলার মানুষের চিত্রে তিনি সুকুশলী। 'বিষবৃক্ষে'র হীরা ছাড়া বঙ্কিমের নিচের তলার কোন্ মানুষটি স্মরণীয়? অবশ্য বঙ্কিমের পুরুষ-নারী সবাই বাঙালী (?) সুসম্পন্ন ভদ্রলোকের (জমিদার ও মধ্যবিত্তের) আদর্শে ঢালা। স্কটের উপন্যাসে যেমন সাধারণ মানুষের সফল জীবনচিত্র আছে বঙ্কিমের তার বিশেষ অভাব। অথচ মধ্যবিত্ত ধারণানুযায়ী বীর-বীরঙ্গানা এবং জীবন্ত মধ্যবিত্ত মানুষ বঙ্কিমে অনেক। অন্যদিকে মনে পড়ে, স্কটের তো মানুষের সঙ্গে মামুলি পরিচয়মাত্র ছিল। বঙ্কিমের নায়ক-নায়িকার অন্তরে অন্তর্দ্বন্দ্বের জ্বালা স্কট-এ আছে কি? কিন্তু স্কট-প্রসঙ্গ আর বিশদ করে লাভ নেই। কারণ, বঙ্কিমের মোট চোদ্দখানা উপন্যাসের মধ্যে সত্যকার 'ঐতিহাসিক রোমান্স' মাত্র 'দুর্গেশনন্দিনী', ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ'। তাহলে স্কট তাকে প্রভাবিত করেছেন কতটুকু? নিশ্চয়ই ইংরেজি সাহিত্যই বঙ্কিমের সৃষ্টির প্রধান উৎস—বাঙালী জীবনের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয় সে সাহিত্যের অমৃতস্পর্শে। কিন্তু সে স্পর্শ বঙ্কিমের বেলা প্রধানত শেকসপীয়রের এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের (কদাচিৎ শেলির?) আর সে প্রভাব মিশে গিয়েছিল বঙ্কিমের মেদে মজ্জায়, তাঁর শিল্পপ্রকৃতিতে ও জীবনজিজ্ঞাসায়। বঙ্কিমের কীর্তি তাই শুধু রোমান্টিকতার দিকে নয়, বাঙলা উপন্যাসকে জীবনসত্যের দিকেই এগিয়ে দেয়। এই তাঁর দেশকালগত তাৎপর্য।

বঙ্কিমের সমকালীন একজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য—আপন নিজস্বতায় ভিন্নপথের যাত্রী, 'স্বর্ণলতা'র তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। বাঙলায় বাস্তবমুখী

উপন্যাসের প্রথম রচয়িতা। যে প্রাত্যহিক বাস্তব (এভরিডেইজম) বাঙালী জীবনযাত্রায় প্রত্যক্ষ, বঙ্কিম নিজে তাতে বিশেষ আকৃষ্ট বোধ করতেন না। 'স্বর্ণলতা' 'বিষবৃক্ষে'র সমকালীন রচনা (বঙ্গাব্দ ১২৭০)। 'স্বর্ণলতা' 'অ্যাভারেজ মেন ইন অ্যাভারেজ সারকমস্টানসেস'-এর চিত্র; প্রমাণসই অবস্থার প্রমাণসই মানুষের চিত্র। অথচ, জীবন আসলে প্রমাণ-সই ব্যাপার নয়, মানুষও প্রমাণ-সই মানুষ নয়। প্রমাণ-সই তা যা বাহ্য। জীবন-সত্য মানব-সত্য তা ছাপিয়ে যায়, প্রায়ই সে সত্য প্রচ্ছন্ন দুর্নিরীক্ষ্য। বঙ্কিমের রোমান্টিক কল্পনার ঔজ্জ্বল্য সেই বাঙালী জাগরণের যুগে মানুষের বেশি ভালো লাগবার কথা, লেগেও ছিল। তার প্রধান এক কারণ নিশ্চয়ই বঙ্কিমের শিল্প-প্রতিভা। বঙ্কিম-প্রতিভা রোমান্টিক হলেও, রোমান্সের উদ্দাম আতিশয্য অপেক্ষা তাতে 'স্বভাবানুকারিতা' কম নয়,—তাঁর শিল্পস্বরূপ আলোচনাকালে আমরা তা উপলব্ধি করতে পারব। কিন্তু বঙ্কিম-সাহিত্য ভালো লাগার গোড়ার কারণ, বঙ্কিমের জীবন-বোধের গভীরতা ও ভাবুকতা।

তথাপি কথাটা সত্য, বঙ্কিম বাংলা উপন্যাসের যে পথ উন্মোচন করেন তা পাশ্চাত্য উপন্যাসের সেই 'উদ্যোগী জীবনযাত্রার জয়ধ্বনিমুখরিত রাজপথ' নয়। বরং উনবিংশ শতাব্দীর 'বাঙালী জাগরণের' সীমাবদ্ধ চৈতন্যের মুক্তির স্বপ্নপথ। বৈষয়িক উদ্যোগ-সমৃদ্ধির পথ নয়, চৈতন্য-প্রসারের পথ—যাদের জীবন ছিল বাস্তবত পঙ্গু, তবু যাদের অভীপ্সা ছিল অসাধারণ, বঙ্কিমের বিশিষ্ট রোমান্টিক কল্পনা রসাস্বাদনে সেই বাঙালী মধ্যবিত্তদের তৃপ্তি জুগিয়েছে, তেমনি সত্য জীবনের ভাবুকতায় উদ্বুদ্ধও করেছে। বঙ্কিমের শিল্পস্বরূপ এজন্যই বিশেষরূপে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

সোনার চেয়ে দামী

অসিত ঘোষ

সুখদা ঘাটের সিঁড়িতে থমকে দাঁড়াল। বাসনগুলো জলের তলায় দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই গভীর জলে ঠেলে দিয়েছে হাঁসগুলো। শেষ পৌষের সকাল। জলে পা ডোবাতেই মন চায় না, এখন বাসন খোঁজার জন্যে গা ডোবাতে হবে। পুকুরের জলের ওপর নজর তুলে দেখল—কুয়াশা তখনও উড়ছে। হাঁসগুলো মাঝ-পুকুরে ডুবছে, গেঁড়ি-গুগলি খাচ্ছে। একটা এমন গণ্ডে-পিণ্ডে খেয়েছে দেখলেই মনে হয় ডুবে মরবে। ডাঙার তল্লাসে ভেসে আসছে। সুখদা ইচ্ছে করলেই ঢিল ছুঁড়ে মারতে পারে, মারল না। বাসনগুলো ঠুকরে-ঠুকরে গভীর জলে ঠেলে দিয়েছে, ওদের অভ্যাস। দু-চারটা ভাতের দানা পেলেই হলো। সুখদার উচিত ছিল ভারী পাথর চেপে রাখা।

পূবদিকে সূর্যটা লাল হয়ে উঠছে। আর কিছু সময় পার হলেই রোদ চড়া হবে। কিন্তু খোয়ানোর মতো সময় সুখদার হাতে নেই। অনেক কাজ। কোমরে শাড়িটা পেঁচিয়ে জলে নামার জন্যে তৈরি হলো।

'ডুবে মরবে নাকি?'

ঠাট্টার সুরে সুখদা পিছন দিকে তাকিয়েই হেসে ফেলল। দেবর কখন এসে সিঁড়িতে দাঁতন করতে বসেছে। বিয়ে হওয়ার পর সকলেই যখন জানল—সুখদা সাঁতার জানে না, দেবর ও ননদেরা মিলে কোনো-কোনো সময় ডুবিয়ে মারত তাকে। গরম কালে গা ডুবিয়ে বসলে পাড়ার ঝিউড়িয়া এমনকি আট-নয় বছরের পুঁটি পর্যন্ত নাকের ওপর ঢেউ নিয়ে আসত। নাকে মুখে জল ঢুকে যেত তার, চোখ লাল হতো জলের ঝাপটায়। এরকম করে সকলেই খুশি হতো। দেবর জাপটে ধরে ডুব জলে ছেড়ে দিত, সুখদা ভরপেট জল খেয়ে উঠে আসত। কিন্তু সুখদা আজও সাঁতার জানে না।

'রোদটা একটু চড়া হতে দাও, মরে আরাম পাবে—!'

সুখদা গড়গড় করে জলে নেমে গেল। হাতড়ে-হাতড়ে বাসনগুলো তুলে সিঁড়ির ওপর রেখে দু-হাতে জল ছিটিয়ে দেবরকে প্রায় ভিজিয়ে দিল। 'এদ্দিন যখন মরিনি, আর ডুবে মরবনি!' খিলখিল করে হেসে উঠল সে। ঠাণ্ডা জলের

ঝাপটা খেয়ে সুবল বিধ্বস্ত। যে ধুতিটা গায়ে জড়িয়ে দাঁতন করছিল তা ভিজে একসা। ভেজা ধুতিটা খুলে ফেলতেই সুবলের পেশল উলঙ্গ শরীরটা সুখদার চোখে পড়ল। কোমরটা কেমন সরু। কোমরের উপরের অংশটা ক্রমশ চওড়া হয়ে গেছে। ছাতিটা বিরাট। সেই অনুপাতে বাহু দুটিও দেখার মতো। সব ভাইই এমন শরীর পেয়েছে। কোমরের ওপর গামছাটা এঁটে বসাতে আরো সরু মনে হয়। গামছার একটা খুঁট কৌপিনের, মতো ঘুরিয়ে পিছনে গোঁজা। সরু কোমরের পরই নেমেছে পাছা ও হাঁটু। হাঁটুর নিচে পায়ের ডিমটা খুব বড় হাতুড়ির মতো এক জায়গায় জমে গেছে। পায়ের পাতা খুব চওড়া ও আঙুলগুলো ফাঁকা ফাঁকা। মাটি কামড়ে বসেছে যেন আঠার মতো। শাড়ির জল ঝুঁকে নিঙড়াতে-নিঙড়াতে সুখদা বলল, 'তমার দাদাকে কিছু কলাই-ডাল, মুগ-ডাল, মুশুর-ডাল যা পায় তাই লিয়েসতে বল না!'

'কেনে তুমি পারনি?' একটু রাগ প্রকাশ পেল সুবলের কথায়।

'বড়ি দিতম, পরের বড়ি দিয়ে ঘুরব, নিজেরা কিছু···!'

সুখদা আর কিছু বলল না। বাসনগুলো নিয়ে ঘরে চলে এল। বিজয় একটা পেরেক নিয়ে ডিবের ঢাকনা ছেঁদা করছে। হাটে গিয়ে বিজয় ওজনের পাল্লাগুলো খেয়াল করে দেখেছে। খুব সহজেই সে ও রকম পাল্লা তৈরি করতে পারে ভেবেছিল। কিন্তু দুটো ডিমের ঢাকনা যোগাড় করাই ছিল সমস্যা। তাও যোগাড় হয়ে গেল। সুখদার ধনে ও জিরা রাখার ডিবের মুখ দুটো বিজয় চুরি করেছে। শনের দড়িও সংগ্রহ করেছে। মোটা পাটকাঠিও সাইজ মতো কেটেছে।

'উটা কুথা পেলি?'

বিজয় মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে রইল। সুখদার সন্দেহ প্রবল হয়। ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখে ডিবে দুটো একেবারে হা-হা করছে। সঙ্গে সঙ্গে চুলের ঝুঁটি ধরে বেদম মার। বিজয় চোখের জল ফেলতে-ফেলতে চলে গেল। সুখদা ঢাকনা দুটো ডিবের মুখে দিয়ে ভিজে কাপড় ছাড়ল। সুবল মুখ-হাত ধুয়ে এসে বসল উঠোনে। একটা উঁচু মাটির বেদিতে তুলসী গাছ। বেদির ওপর সিঁদুর দিয়ে স্বস্তিকা চিহ্নের অনুকরণে একটি মানুষের ছবি। খুকি মায়ের দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে ছিল।

'মা আমাকে মারবেনি ত?'

সুখদা ডুকরে হেসে ওঠে। খাওয়া নিয়ে ঝগড়ার সময় দুজনেই একসঙ্গে মার খায়। তাতে মেয়ের খেয়াল হয়েছে কি যখনই দাদা মার খাবে তখন সেও তার ভাগ পাবে। সুবলও হাসল।

'আজই বোধহয় একলা বিজয় পিটুনি পেল!'

'হ্যাঁ!'

সুখদা খুকিকে কোলে নিয়ে রোদে পিঠ দিয়ে বসল। সুবল জামবাটিতে বাসি পিঠে নিয়ে বসল খেতে। সামনেই এক টুকরা জমি। তাতে গমের চাষ করেছে দু-ভাইয়ে। কিলো দুই এমোনিয়া দিতে পারলে আরো বাড়ত গাছগুলো। সারের যেমন অভাব সেই সঙ্গে পয়সারও অভাব। সাড়ে তিন টাকা কিলো গমের বীজ। কোথা থেকে টাকা নিয়ে এসেছিল দাদা। গমের বীজ কিনে জমিটাকে চাষ করেছে। গাছ দেখে মনে হয় ফলন ভালো হবে। সুবল সেদিকেই তাকিয়েছিল। মায়ের কোল থেকে উঠে খুকি খুড়ার কাছে গিয়ে বসল। একটা পুরপিঠা হাতে তুলে দিতে খুকি চলে গেল মায়ের কাছে আবার।

'বাঁশবন ত ভরিচ—আরো ভরাবে নাকি?'

'না মা আমি এখন পয্যন্ত হাগিনি। দাদা দু-বার গেছে।'

'দাদার আজ মুখ বন্দ!'

'রান্নাঘর ত বন্দ থাকেনি!' সুবল হাসতে হাসতে বলল। সুখদা রান্নাঘরের দরজার দিকে তাকাল। বাঁশের বেড়ার দরজা। জোতদারেরা এ ধরনের বেড়া দেয় বাগানে।

'তমার দাদা এত সকালে কুথা গেল?'

'আমাকে বলে যায়নি!'

সুবল ছুরির ধার পরখ করে ঝুড়ি নিয়ে কপির ক্ষেতে নামল। কিছু বাঁধাকপি ও ফুলকপি কেটে নিয়ে এলো। আরো বড় হতো। কিন্তু পয়সার দরকার। আজ হাটে যেতে হবে। সবুজ কপির পাতাগুলো সুখদা দামড়া দুটোর মুখের সামনে ধরে দিল। হাঁস-ফাঁস করে খেতে থাকল। ছাগলের মুখেও কয়েকটা পাতা ছুঁড়ে দিল সে। খুকি ছাগল বাচ্চা দুটো কোলে করে আদর করছে।

'ও খুড়ি তুমি এখন বসে আছ?'

'যাচ্ছি দাঁড়া!'

স্থখদা ঝটপট ঘরের দরজায় তালা দিয়ে করুণাদের উঠোনে এলো। ততক্ষণে অনেক মেয়েই জড়ো হয়েছে। করুণারা সবাইকে বলে রেখেছে বড়ি দেওয়ার জন্যে। কেউ ফুলকপির বড়ির প্রস্তুতি চালাচ্ছে, কেউবা কুমড়ার বড়ি। স্থখদা পোস্তর বড়ি দেবে। এক-একটা টিনের পাতে তেল মাখিয়ে মেয়েরা কেউ পা ছড়িয়ে কেউ উবু হয়ে বসে বড়ি দিচ্ছে। করুণা নিজে ফুলবড়ি দিতে থাকল। শ্যামলী ঝালবড়ি।

'লঙ্কার গরম বটে, হাত জ্বলচে!'

'ভাতার ত হয়নি, হাতের গরম বুজতে, হাল ধরা হাত!'

'কি যে তুমি, সবার সামনে…।' করুণা মাথা নিচু করে বড়ি দিচ্ছিল। লজ্জায় মুখটা লাল হয়ে গেছে। স্থখদা তাড়াতাড়ি বড়ি দিয়ে একটা টিনের পাত চালের ওপর রোদ্দুরে রেখে দিল। 'কুটুম্ এসে গেছে!'

সকলেই একসঙ্গে সদর দরজার দিকে তাকাল। কেউ নেই। মাঠ অবধি কাউকে নজরে পড়ছে না। স্থখদা কি রঙ্গ জুড়েছে নাকি। দুঃখের মধ্যেও এই এক মেয়ে স্ফূর্তিতে কথা বলে। চারদিকে কাউকে না দেখতে পেয়ে সকলে যখন তার দিকে তাকাল—স্থখদা হুস করে কাকটা তাড়িয়ে দিল। তৎক্ষণাৎ হাসির রোল। একটা লম্বা বাতা চাঁপারি, সম্পর্কে ননদের হাতে দিয়ে বলল, 'বসে থাকলে চলবেনি, কাগ তাড়াও!' আবার একখানা টিনের পাত তেল মাখিয়ে নিয়ে বসল স্থখদা। কপির বড়ি দেওয়া একটু কষ্ট, কুমড়োরও…। বড়ি দিতে দিতে বেলা অনেকখানি হলো। স্থখদা ঝটপট তার অংশের কাজ শেষ করে সোজা দাঁড়াল। কোমরে ব্যথা ধরেছে। পিছনের দিকে শরীরটা ঝুঁকিয়ে গা ভাঙল। ঘটির জল নিয়ে হাত পরিষ্কার করে শাড়ির আঁচলে মুছল। সকলেরই কাজ শেষ প্রায়। খুড় শাশুড়ি পা ছড়িয়ে এখনো কপির বড়ি ধীরে ধীরে টিনের পাতের ওপর টুকটুক বসিয়ে দিচ্ছে। স্থখদার হাত সরে না ওসবে। কেমন যেন ছিবড়ে-ছিবড়ে লাগে। আশপাশের সব বউ-ঝিরা একত্রে বসেছে। চাঁদের হাট যেন। কেবল এ-বাড়ির ছোটকী অনুপস্থিত। একটা শুকনো লাঠি হাতে সেও এসে গেল। শ্যামলী বলল, 'এৎখনে পুরা হল। দেরী হল কেনে?'

'ছেনাটা দেখেছু?'

'তোর ছেনা কতগুলান যে খুঁজতে বেরিচু?' খুড় শাশুড়ি বলল।

'দেখতে দেখতে পাঁচটা হল, তুমি ত আজকাল ঘরের বার হওনি,

জানবেনি !'

'ভারী ত পাঁচটা ! আমার হিসাব করে দেখেচু… !'

সকলে হেসে উঠল। সুখদা বলল গুণতে-গুণতে 'বেঁচে থাকলে ষোলজন শুনেচি… !'

'তবে, পাঁচটা বিইয়ে লাঠি লিয়ে বেরিচে !' ফোকলা দাঁতে হাসল বুড়ি।

সুখদা আর দেরি করল না। হেলে দুটোর মুখে জাবনা দিতে হবে। কেউ বাড়ি নেই। তাকেই হয়ত এদিক-ওদিক কোথাও ঘাস দেখে খুঁটি গাড়তে হবে। দেবর কোথা থেকে একমণ ধান নিয়ে এসেছে ভিজোতে হবে, কাল সকালে সেদ্ধ করার জন্যে তড়িঘড়ি করতে হবে। সুখদার অনেক কাজ। পাঁচুর মাকে ডাকল। হেলে দুটোর মুখে দু-আঁটি খড় খুলে গোবরের নাদগুলো একদিকে সরিয়ে রাখল।

'কেনে ডাকচ ?'

'পাঁচুর মা কাল ধান সিদ্ধ করব, পাতা কুড়ি এনে দিবে ত ! খড় জ্বাল দিলে বড্ড রাগারাগি হয় দুজনে !'

'আচ্ছা, দুবখন !'

'কিন্তু বাছা একটু দেখেশুনে, গু-সুদ্দা লিয়েসনি… !'

পাঁচুর মা পাড়ার সকলের জন্যেই পাতা কুড়িয়ে দেয়। শীতকালে গাছের পাতা ঝরে পড়ে। পাঁচুর মায়ের পেট ভরে। গেরস্থ ঘরের খড় বাঁচে। পাঁচুর মা চলে গেলে ছেলের কথা মনে পড়ে। সকালবেলাই বাছা মার খেল। একটু জোরেই হাঁক দিল। পুকুরপাড়ে পাড়ার ছেলেরা এদিক-ওদিক থেকে শুকনো ডালপালা নিয়ে আগুন তাপছিল। অনেক বেলা হয়েছে ওদের আগুন সেঁকার খেলা শেষ হয় না। ছেলেবেলায় সুখদাও এমন করেছে। বিজয় ভিড় থেকে দৌড়ে চলে এল মায়ের কাছে।

তমার খুকি জলের ধারে বসে জলে ঢিল ছুঁড়চে, কতবার বারণ করছি শুনছেনি, ডুবে মরবে !'

কথা শুনে সুখদার রাগ হলো। ছেলেমানুষ বোঝে না। খুকিকে ডাক দিয়ে বলল, 'কেনে বোন বলতে পারনি ?' আলতো করে বিজয়ের কান ধরল। 'যাও বোনকে ডেকে লিয়েস !' ঘরের পিছন দিক থেকে শুকনো কাঠ নিয়ে উনুনের ধারে রাখল।

এবার ভাত রান্নার সময়। মানুষটা কোথায় গেছে বলে-কয়ে যায়নি।

হুট করে কখন এসে পড়বে। গতকাল একটা নারকোল কোথা থেকে নিয়ে এসেছিল, তারই পিঠে করেছে অনেক রাত অবধি। গাইটা বেঁচে থাকলে এমন দিনে বাছুর দিত। দুধ থাকলে দুধে-সেদ্ধ করতে পারত সুখদা। কিন্তু বাড়িতে দুধ নেই। খুকির জন্যে দুধ নেওয়া হয় হরি পাত্রদের ওখান থেকে। সুখদা একটা বড় পিতলের গ্লাস নিয়ে দুধ আনতে গেল। 'ইদিক-উদিক কুথাও যাবিনি, বোনকে লিয়ে বসবি!' এ ধরনের কাজ বিজয়ের কাছে বিরক্তিকর। বোনটাও তার কথা শোনে না। কোনো একটা জিনিষ বোনের এক্তিয়ারে এসে গেলে সহজে দিতে চায় না তাকে। তার ওপর তাকে দাদা বলে না, নাম ধরে ডাকে। এসব ভেবে খুব গম্ভীর হয়েই বিজয় বলল, 'শুনলি ত তুই এখন থেকে আমার কথামত চলবি!'

'চলি ত, তুই জলের ধার থিকে ডাকলি, এলমনি?'

'উ ত মা ডেকেচে বলে, অর আগে আমার কথা শুনেছিলি?'

'না রে জলের ভিতরে ঢিল মারতে মজা লাগে তাই!'

'আবার তুই-তুকারি, আমি তোর দাদা না!'

'হুঁ দাদা ত!'

'তবে না-রে কি!'

খুকি এখন পুরোপুরি বিজয়ের তত্ত্বাবধানে, যতক্ষণ না সুখদা আসছে। চড়-চাপড়ের ভয়ে খুকিও জড়সড়। এরকম অস্বস্তিকর অবস্থায় খুকির আদৌ ভালো লাগছিল না। মা কখন আসবে তারই প্রতীক্ষা করছিল। মায়ের আবার বদ অভ্যাস রয়েছে—যেখানে যাবে গল্প জুড়ে বসবে। এতখানি সময় দাদার কাছে কাটানো কম কষ্টের নয়। বাঁশ গাছের ডগায় একটা কি পাখি বসেছে সেদিকে তাকিয়ে রইল খুকি। বিজয় ভাবছিল দাঁড়ি-পাল্লার কথা। কেমন করে পাল্লার উপযোগী দুটো ডিবের ঢাকনা পাবে সে।

'বিজয়⋯!'

'আবার?' বিজয় দাপড়ে উঠল।

'দাদা উটা কি পাখিরে?'

'আবার তুই-তুকারী?'

'উটা কি পাখি?'

'বুলবুলি!'

'খুব দাদাগিরি চলছে দেখছি!' বিমল বাড়ি ফিরল। দূর থেকে ছেলে-

মেয়ের খুনসুটি দেখে খুশি হলো। বাপকে পেয়ে খুকি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বিজয়ের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বাবার কাঁধ ধরে দাঁড়াল। বিমল গামছার খুঁট থেকে কটকটি ভাজা বের করে দিল। খুকির হাতে শালপাতার ঠোঙাটা। পুরোই দেওয়াতে বিজয়ের গোঁসা। শেষ পর্যন্ত দু-ভাগ করে দিল বিমল। পুকুর ঘাট থেকে পা-হাত-মুখ ধুয়ে পিঁড়ি পেতে বসল। 'তোর মা কুথায় রে ?'

'দুধ আনতে গেছে !'

'ডেকে লিয়ে আয় !'

বিজয় মাকে ডাকতে গেল। বিমল গামছার পোটলাটা একদিকে রেখে বসে থাকল। একটু খেয়ে খালি জমিটুকুতে কাজ শুরু করবে। গ্রীষ্মকালীন শাক-সব্জীর চাষ করবে ঐ মাটিতে। সুখদা ভাবেনি এত তাড়াতাড়ি বিমল ফিরবে। দুধের গ্লাসটা ঘরের মধ্যে রেখে জিজ্ঞেস করল, 'কি খাবে তুমি ?'

'দাও না দুটা পিঠা, সুবল হাটে গেছে ?'

'হ্যাঁ !'

'উটা তুলে রাখ !'

সুখদা গামছার পোটলাটা নিয়ে ঘরের ভিতরে গেল। একটা হাঁড়ি টেনে নিয়ে গামছার বাঁধন খুলতেই বিস্মিত হলো। 'ইদিকে এসত !' বিমল কাছে যেতে বলল, 'তুমি কলাই লিয়েসচ, আমি মনে করেছি গরুর তরে খোল লিয়েসচ—যদি হাঁড়িতে ঢেলে দিতম ?'

'গরুর সাধ, তমার সাধ, সবার সাধ ত মিটাতে হয় !'

'আমি আর গরু সমান নাকি ?'

'তা লয়, তমার সাধ মিটলে আমারও সাধ মিটে··· !'

সুখদা বিমলের চোখে চোখ রাখল। এইভাবেই তাদের শুভদৃষ্টির বিনিময় ঘটে থাকে। সর্বাঙ্গময় একটা শিহরণ ওঠে। বিমল পিছন ফিরে বাইরের দিকে পা বাড়াল। 'খোলও শেষ হয়েল লিয়েসবে বুঝলে ?' উঠোনে খুঁকি তখনো কটকটি চিবোচ্ছিল। 'বাবা কটকটি ভাল লয়, জিলাপি আনবে বুঝলে ?' মেয়ের কথাগুলো শুনে সামনেই সবুজ ক্ষেতের দিকে তাকাল। পালং শাকগুলোও তেজি হয়ে উঠছে। সুবল কিছু শাক নিয়ে গেলেই পারত। মূলাও হয়েছে তবে মূলা রোপনে পিছিয়ে যাওয়াতে ফলন ভালো হবে না। বেগুন গাছগুলো শিগগির ফল দেবে। বেগুনি রঙের ফুল ফুটেছে ঢের। এ বছর প্রত্যেক দিন বেগুন তুলতে-তুলতে সুবল তার ওপর রাগ করবে,

কেননা হাতে কাঁটা ফোটে বেগুন তোলার সময়। বর্ষা ভালো পেলে আষাঢ় মাস পর্যন্ত বেগুনের ফলন পাবে। চৈৎ-বৈশাখে কিছুটা সার দিয়ে নিড়ানি দিলে ফলনের কামাই হবে না। লাগাতার হাটে বেগুন নিয়ে যেতে পারলেই হলো।

সুখদা একখানা জামবাটিতে পিঠা নিয়ে এল। একঘটি জল নিয়ে বিমল পা হাত ধুয়ে পিঁড়ি পেতে বসল। হেলে গরু দুটোর দিকে মুখ ফেরালো। এতক্ষণ ডাইনেরটা শুয়েছিল, উঠে দাঁড়িয়ে পিছনের পা দুটো একটু পিছিয়ে পিঠ বাঁকিয়ে গা ভাঙল, বাঁয়ের গরুটাকে একচোট গুঁতিয়ে নাদল ও পেচ্ছাপ করল। দুটোই দেখার মতো গরু। সোলেমান পয়সার অভাবের জন্যে বিক্রি করে। খবরটা শুনেই বিক্রির সময় বিমল সোলেমানের বাড়ি গিয়েছিল। আরো অনেকেই গিয়ে দাম শুনে চলে গেলেও বিমল অনেকক্ষণ গরু দুটোকে দেখল। কাছে গিয়ে দুটোর পিঠে চাপড় দিয়ে খুশিই হলো। গর্দান দেখার মতো। প্রায় ছ'ইঞ্চি চওড়া গর্দান। দুটোই সমান। শিংগুলো মাঝারি সাইজের।

'আমি লুব সোলেমান!'

'তুমি!' সোলেমান অবাকই হলো। বিমল সাধারণত বুড়া বলদ সস্তায় কিনে চাষাবাদ করে, কাদার সময় মই টানার জন্যে অপরের হাল ধার করে। সেই বিমল হাজার টাকা দামের বলদ কিনবে, অবাক হওয়ারই কথা। 'আমি লুব ··কিষিকাজ করব ভাল করে!'

'তালে কত দিবে বল?'

'তুই হাজার বললি, একশ কম করে নয়শ' দুব!'

'একশ' কমাতে পারবনি··· !'

'তালে ন'শ পঁচিশ দুব, আর বাড়বনি আমি!'

সোলেমান রাজি হয়ে গেল। সুখদাকে তার গয়নাগুলো দেওয়ার জন্যে রাজি করাতে সারারাত লেগেছিল সেদিন। ঝগড়াও হয়েছিল বেধড়ক। গয়না বিক্রির টাকা আর বুড়া বলদ দুটো বিক্রি করে টাকা মিলিয়ে নয়শ' পঁচিশ টাকা সুবলকে সকাল বেলাই দিয়ে বিমল তাড়া দিতে থাকে। সেদিন বিমলের কোনো কাজে মন বসেনি। খুরপি নিয়ে সকাল থেকে জমিতে বসেছে বটে, নিড়ান বেশিদূর এগোয়নি। সুবল বৌদির হাতে টাকাগুলো দিয়ে বলেছিল, 'তুমি হাতে করে না দিলে আমি গরু দুটা লিয়েসতে যাবনি।' সুখদা তখনই বুঝেছিল বিমলেরও সায় আছে এতে। দুপুর নাগাদ টাকার গোছা সুবলের

হাতে দিয়ে সুখদা মুখ গোমড়া করে বলেছিল, 'যাও লিয়েস…!' বিমল কাণ্ড দেখে স্রেফ হেসেছিল। 'সুবল সন্ধ্যে করিসনি, তালে গরু দিবেনি আজ!' সুবল গামছাটা কষে বেঁধে সোলেমানের বাড়ি থেকে বলদ দুটোকে একই দড়িতে বেঁধে নিয়ে এল। সোলেমান গরু দুটোর শিঙে তেল মাখিয়ে দিয়েছে। চাষী মানুষ এ-ধরনের বলদ সহজে ছাড়ে! সোলেমানের বিপদটা গুরুতরই ছিল, তাই বিক্রি করে দিল গরু দুটো। সুবল বাড়ি পৌছেই উপেনের গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বলদ দুটাকে পুরো গ্রামটাই ঘুরিয়ে নিয়ে এল চারদিকে ধুলো উড়িয়ে। ছেলে মেয়েরা গাড়িতে চড়ে বসে আনন্দ করল। মনসুর বলল স্রেফ 'আমি জানলে হাজার টাকায়ই লিয়ে লিতম!' সুখদা উঠানে দাঁড়িয়ে সুবলের তামাসা দেখল। এমনি আনন্দ যে বিজয় আর খুকিটাকে গাড়িতে চড়িয়ে নেয়নি, গাড়ির পিছনে-পিছনে দৌড়চ্ছে দুটোই। সুখদা কয়েকবার চেঁচিয়ে তুলে নেওয়ার জন্যে বলল, কে শোনে কার কথা! একটা উঁচু ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে দুজনে দেখল—কাকা কেমন বলদ দুটোকে দৌড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঘণ্টাখানেক গাড়ি ঘুরিয়ে সুবল বলদ দুটোকে পেট ভরে খাওয়ালো, খড়ের লুটি দিয়ে গা দলল। রাতে খাওয়ার সময়ও সুবল খুব সুখ্যাতি করল— 'ভরা জুয়ান বুঝলে-দা!' বিমল একটু হাসল—সে কি না দেখে নিয়েছে।

বিমল পিঠা খেতে-খেতে দামড়া দুটোকে দেখল। চেহারা ঠিকই রয়েছে। খোরাক ঠিকমতো দিলেই চেহারা থাকে। উপেনের গরু দুটোর চেহারা টিকছে না, কারণ খোরাক যত্ন। দুটো পিঠে ছুঁড়ে দিল বিমল। একটু দূরে পিঠে দুটো পড়ে যাওয়াতে হাঁটু মুড়ে দুটোই খাওয়ার জন্যে হাঁসফাঁস করতে থাকল। 'দড়ি ছিঁড়বে নাকি গো!' সুখদা দৌড়ে গিয়ে পিঠে দুটো মুখের কাছে ঠেলে দিল।

'বিজয় আবার কুথা গেছে?'

'জানিনি, আজ সাত-সকালে মার খেয়চে!'

'কেনে?'

'ডিবার খোল দুটাকে ছেঁদা করছিল!'

'তাই বলে মারবে!'

'মারবনি; তমার ঘরে ইঁদুর আদৌ নাই! ঢাকনা দুটো না থাকলে মশলা একদানা রাখবে?'

হাতের তেলোতে একলাদা কাদা নিয়ে বিজয় ঘরে ফিরল। ছেলের

দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। 'কি হবে কাদা?'

নাকের শিকনিটা টেনে বিজয় বলল, 'বাটখারা!'

'বুঝলে তমার ছেনা চাষা হবেনি, বেনিয়া হবে!'

'হলেই বা।'

বিমল আর কোনো কথা বলল না। বিজয় কাদা দিয়ে এক কেজি, আধ-কিলো, দুশো গ্রাম, একশো, পঞ্চাশ গ্রামের বাটখারা তৈরি করতে থাকল। পিঠে খাওয়ার পর বিজয়ের বাটখারাগুলো দেখে বলল, 'পঁচিশ গ্রামটা কুথা?' 'করব' বিজয় উত্তর দিয়েই শিকনিটা আর একবার টানল। 'টেনা লিয়েসে শিকনি ঝেড়ে দাও ত!' সুখদাকে এই কথা বলে, খড়ের লুটি নিয়ে দামড়া দুটোর গা দলতে থাকল। ছেলেটা বড় হলে চরাতে নিয়ে যাবে, সুবল এখন নেই বলে সেই গলা খুলে নিয়ে বেরোলো। গ্রামের অন্যান্যরাও গাই-বাছুরের গলা খুলে চরাতে নিয়ে চলেছে। 'সুবল এলে পাঠি দিও!'

'দেরি হবে বলে গেছে!' সুখদা বিমলের পেছন দিকটা দেখল। বলদ দুটোকে নিয়ে দূর মাঠে চলে গেলে বিজয়কে শাসন করল। 'বাটখারা ত বানাচ্চ, ডিবার খোল লিলে তমার চামড়া খুলে লুব!'

'তোমার জিনিষ চাই নি!' বিজয় পকেট থেকে দুটো ডিবের ঢাকনা নিয়ে দেখাল সুখদাকে। খুকি দাদার পাশে বসে এতক্ষণ বাটখারা তৈরি দেখছিল। বলল, 'দাদা একটু কাদা দিবি, পুতুল করব!'

'কেনে তুমি লিয়েসতে পারনি!'

'বড় হই সাঁতার শিখলে জলের ধার থিকে লিয়েসবখন!'

'আমি ত সাঁতার জানিনি কি করে লিয়েলম?'

'দেনা একটু...!'

বিজয় একদলা কাদা খুকির দিকে ছুঁড়ে দিলে, কাঠপুতুলের অনুরূপ কয়েকটা ছোট পুতুল তৈরি করে খুকি রোদে শুকোতে দিল। বিজয় বাটখারা শুকোতে দিয়ে দাঁড়ি-পাল্লায় মন দিল। সুখদা এবার হেঁসেলে মন দেবে। এতক্ষণ পিঠে ছিল—চলল। এবার ভাত চড়াতেই হবে। পুকুরঘাট থেকে কয়েক বালতি জল ঝটপট তুলে, একঝুড়ি ঘুঁটে উনুনের মুখে ঢেলে, কয়েকটা শুকনো বাঁশ মড়মড় করে ভেঙে উনুনে আগুন ধরাল। পাঁচুর মা শুকতো পাতা ঝাঁট দিয়ে নিয়ে এল কিছুক্ষণ পরেই। 'কুথা ঢালব দেখি দাও!' পাঁচুর মাকে শুকনো পাতা ঢালার জায়গা দেখিয়ে দেওয়ার পর ভাতের হাঁড়ি

উথলে উঠল। সুখদা ক্ষেত থেকে বাঁধাকপি তুলল, আঙুল দিয়ে কিলোখানেক আলু উপড়ালো। আনাজ কুটতে-কুটতেই সুবল এসে গেল।

'এত তাড়াতাড়ি?'

'পাইকার পেয়ে গেলম!'

সুবল গামছার খুঁট থেকে টাকা ও খুচরো পয়সাগুলো বের করে বৌদির হাতে দিল। সুখদা ঠাকুরপোর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'এখন রান্না করচি, পরে দিলেই পারতে!'

'কাল টকি দেখব!'

'আমাকে লিয়ে যাবে?'

'তমার উগুলান···!'

'অর কাছে রেখে যাব!'

'এতখানি রাস্তা হাঁটবে, এসতে রাত হবে!'

'হোক, অনেকদিন টকি দেখিনি—কি টকি হচ্ছে?'

'কোরাস, হিন্দি বুঝলে রোজই যেতম, অনেকদিন পর বাঙলা টকি, হাটে চঁ্যাঢরা দিয়ে গেল, পিঠে কুলা বাঁধার মতন করে ছবিগুলান বয়ে বেড়াল অনেকক্ষণ!'

'তবে ঠাকুরপো, গামছা পরলে তমার সঙ্গে যাবনি!'

'অঃ, ধুতি পরব তালে!'

সুবলের বড় খারাপ অভ্যাস। ধুতি থাকা সত্ত্বেও গামছা পরবে। বললেই উত্তর মুখে-মুখে, 'চাষা মানুষ অত কায়দা ভাল নয়।' ধুতি পরলেও হাঁটুর ওপর থেকে নিচে নামবে না। একখানা ফতুয়া রয়েছে—তাও গায়ে চড়ায় কম। 'ইস ভাত লেগেচে!' সুখদা দৌড়ে হেঁসেলে গেল। সুবল পুকুরঘাট থেকে হাত-পা-মুখ ধুয়ে এসে একটা পিঁড়ির ওপর আরামে বসে 'খুকি তেলের বাটিটা লিয়ে আয় ত।' বলে পায়ের জল মুছল। খুকি এখন আর কাউকে বলে না —খুড়া অমুক চাইছে। বাটিতে নিজেই তেল ঢেলে গুটি-গুটি পা ফেলে সুবলের দিকে আসতে দেখেই টের পায়—বাটি ভর্তি তেল নিয়ে আসছে। পাছে উপচে পড়ে তেল এরকম সতর্ক সে। তা সত্ত্বেও সুবলের সামনে বাটিটা রেখে কোঁৎ দিয়ে সোজা দাঁড়াতে গিয়েই তেল উপচে পড়া মাত্রই খুড়া ধরল কান। 'চাট এখন!' খুকি কান ছাড়াবার চেষ্টা না করে অপরাধীর মতো তাকিয়ে রইল। 'এত ভর্তি করবিনি বুঝলি?' খুকী ঘাড় কাৎ করে সায় দিল। 'যা!'

সুবল ভালোভাবে তেল মালিশ করে স্নানে গেল। সুখদা ছেলেকে বল্‌ল, 'আজ্‌ চান হবেনি নাকি ?'

'না !'

'চান করলে ছাল উঠে যাবে ?'

বিজয় কোন উত্তর না দিয়ে দাঁড়ি-পাল্লাটা তৈরি শেষ করল। 'খুকি, খুড়ার কাছে চান করে আয়, অকে দেখচি আমি !'

'তেল মাখি দিবে কে ?'

'অ, নিজে মাখতে পারচনি ?'

খুকি পায়ের চেহারাখানা দেখল। ধুলোয় ভর্তি। তবু নাকটা একবার টেনে ফ্রকটা টেনে খুলে ফেলল। পেণ্টটা খুলে তেলের বাটিতে হাত ডুবিয়ে তেল মাখল। বেশির ভাগ তেল ভুঁড়ির ওপর ও মাথার চুলে মাখল। পায়ের ধুলোভরা চামড়ার ওপর তেল গড়িয়ে পড়ছে। ধুলো আছে বলে তেল না মাখলেও পেটের ওপর থেকে তেল গড়িয়ে পড়ছে। পিঠের দিকে হাতের আঙুলের দাগ পড়েছে। 'খুড়া চান করি দাও !' সুবল তখন ডুব দিচ্ছিল। ডুব দিয়ে উঠে খুকিকে দেখে হা-হা করে হেসে উঠল। হাত দুটো ধরে জলের দিকে যাওয়ার সময় আঁৎকে-আঁৎকে ওঠে খুকি। জলের ভিতরে ডুবিয়ে দিতে খুকীর আর ভয় করে না। নিজে নিজে ডুব দেয়। 'অত ডুবতে হবেনি, চোখ লাল হবে !' সুবল দুটো হাত ধরে সিঁড়িতে দাঁড় করাল। গামছায় গা মুছে 'যা' বলতেই খুকি মার কাছে চলে গেল। ভাত খেতে বসে সুবল খুকির পাছাটা দেখল, ধুলোর ছাপ লেগেছে। উদোম বসেছে মাটিতে। 'এই চান করি দিলম, চাষার ছেনা বলেচে কেনে ?' সুখদা একচোট খুব হাসল এবং মেয়ের পাছাটা দেখল। খুকি খুড়ার কাঁধ থেকে ভিজে গামছা নিয়ে পাছার ধুলো মুছতে গেলে, 'হোয়চে, খেতে বোস !' সুবল হাসল। 'ঐ মেয়েই বড় হোক না, কত সোনো-পাউডার দাও দেখব !' সুখদা ঠাকুরপোর দিকে কটাক্ষ করল। সুবল কোনো কথা না বলে একগাল ভাত মুখে পুরল।

'তমাকে কেউ বিয়া করবেনি !'

'কেনে ?'

'তুমি ত চাষারও চাষা, ধুতি পরলেনি কুনুদিন !'

'ধুতি-পাঞ্জাবী পরলে নাকি মানায় ভাল আমাকে !'

'কাঁচকলা !'

'কাল টকী যাওয়ার সময় পরব, ঝিউড়িরা দেখে কিনা দেখব!'

'তালে তুমিও ঝিউড়ির দিকে নজর দাও!'

সুবল হা-হা করে হেসে উঠল। বিমল বাইরে দাঁড়িয়েই হাসির কারণ অনুমান করার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। 'তমার বোন ত ফিরতই নি, কুনবার যেন এয়ছিল এখেনে, দাদা ত জোর করে…!'

'হোয়চে, রেখা তমার তরে কখন মরবেনি।'

বিমল বাইরে দাঁড়িয়েই এখন মজা পাচ্ছিল। কেন না বৌদি দেবরের আলাপ খুব জমে উঠেছে। সুবল যে-পিঁড়াখানা বাইরে ফেলেছিল তাতেই পা ছড়িয়ে বসল। 'মরচে বুঝলে, রোজ সন্দেবেলা আয়নার সামনে নিজের মুখ দেখে বিরক্ত হয়। খবর লাও…!'

'আয়নায় তমার মুখ খুঁজে নাকি?'

'হ-অ…!'

'বাপের ঘর গেলে ই-খবর লুবই!'

সুখদা ঠাকুরপোর মনের খবর এতদিন জানত না। রেখাও যে এভাবে এতখানি নিকট হয়ে গেছে টের পায় নি। যাই হোক সুখদার ভালোই লাগছে। দুইবোনে সুখেই কাটাবে। 'তেলের বাটিটা দাও ত!' সুখদা জিভ বের করে তেলের বাটি নিয়ে বিমলের সামনে দিল। 'সব কথা শুনছিলে নাকি?'

'শুনলম কিছু কিছু…!'

'কাল টকি যাব, তুমি যাবে নাকি?'

'তমরা যাও, ঘরে থাকবে কে?'

সুখদা ঘরের ভিতরে গেল। বিজয় বাবাকে দেখে ধীরে ধীরে সুবোধ হয়ে উঠল। পুকুরঘাট থেকে চান করে বাপের সঙ্গে খেতে বসল সুবল। এবার বন্ধুদের কাছে যাবে। তাসের আড্ডা চলবে সন্ধ্যে পর্যন্ত। তাসের বাণ্ডিলটা বের করে দেখল, সেটা ঠিক নেই। ছুঁড়ে ফেলে দিল। খুকি তাসগুলো কুড়োতে-কুড়োতে বলল, 'ই-গুলান লুব?'

'লে!'

সুবল চলে গেল তাসের আড্ডায়। আলস্য এলে ওখানেই ঘুমিয়ে পড়বে কিছুক্ষণ। তারপর সন্ধ্যেবেলা ফিরবে। যেদিন বলদ দুটোর ভার তার ওপর থাকে—একটু আগেই ফেরে সেদিন। আজ সুবল বৈকালিক কাজগুলো করল। রাতে শোবার আগে ভাইয়ের সঙ্গে কৃষি-সম্পর্কে একটু আলোচনা করে শুতে

গেল সুবল। সন্ধ্যে থেকে বিজয় আড়ি ধরেছে। কাকার কাছে শোবে। বিজয়কে ডেকে নিয়ে সুবল তার বিছানায় গেল। 'বাবার নাক ডাকে!' সুবল লেপের তলায় হাসছে। বিমলও হাসছে। সুখদা হাসতে-হাসতে বলল—'ছেলার কথা শুনচ?' 'হুঁ!'

খুকি অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

খুব ভোরে উঠে সুখদা ধান সিদ্ধ করতে আরম্ভ করেছে। ভোর থেকে এ-কাজ না করলে কাজ যেন শেষ হতে চায় না। সুবল কিছুক্ষণ পরে উঠে দাঁতন করতে করতে চলে গেছে। বিজয় আর খুকি উনুনের পাশে আগুন তাপছে। বিমল বিছানা ছেড়ে উঠে সুখদাকে দেখল। ধান সেদ্ধ হাঁড়ির কালি লেগেছে হাতে। সেই হাত দিয়েই হয়তো গাল চুলকেছিল। কালো দাগ পড়েছে গালে। কিছু এলোমেলো চুল সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

'তমার কাজ করার একটা লোক লিয়েসতে হবে।'

'লিয়েলেই হল, ঠাকুরপো ত ঠিক করেছে!'

'শুনলম ত···!'

সুখদার কথায় কোনো খাদ ছিল না, দুঃখ ছিল না। স্রেফ চিন্তা স্পষ্ট। রেখাকে সে চেনে। কিভাবে মানিয়ে চলবে তাই ভাবনা। এত জেদি মেয়ে। দিদি বলে রেখা কোনোদিন গ্রাহ্য করেনি। এখানে এসে যদি সে ধরনের জেদ চালাতে শুরু করে তাহলে হয়তো সুখ হবে না। উনুনের পাশে বসে খুকি তাসগুলো নাড়াচাড়া করে। দাদাকে দেখিয়ে বলে, 'দেখচু কতগুলান টাকা আমার!' বিজয় তাকিয়ে দেখে। চাইলে সহজে দেবে না। কিভাবে ওগুলো করায়ত্ত করা যায় তারই ফন্দি আঁটছিল। সুবল ফিরে এসেছে ততক্ষণে। খুরপি আর কোদাল নিয়ে শস্যক্ষেতে নেমে গেল। সকালবেলার রোদ শস্যের ওপর ঝিকিয়ে উঠছে। বিমল আলের ওপর দাঁড়িয়ে অনেক কথাই ভাবছিল। সুখদার আরো কিছু ডাল চাই নইলে বড়ি দিতে পারবে না। দোকানের দিকে একটু পরে যাবে। পালংশাকগুলো বেড়ে গেছে—খিরপাইয়ের হাট ছাড়লে চলবে না। এই হাটে বেগুন না নিয়ে গেলে পেকে যাবে।

'খিরপাইর হাটে দুজনকে যেতে হবে মনে হচ্ছে।'

'হুঁ, না গেলেই বেগুনগুলা হাটে তোলার মত থাকবেনি!' সুবল দু পা ফাঁক করে কোপাচ্ছিল। কোমর সোজা করে দাঁড়াতেই মিলিটারির কুচকাওয়াজ-কালীন চেহারা মনে পড়ে বিমলের। বিজয় পাড়ার ছেলেদের নিয়ে বাঁশতলায়

পাতা নিয়ে ছোট্ট দোকানঘর তৈরি করছে। খুকি কৌতূহল প্রকাশ করাতে বিজয় বৃত্তান্ত দিল। 'আমি হব দকানি, ইটা একটা মুদি-দকান। চাল-ডাল-তেল-নুন-পোস্ত-লঙ্কা সব থাকবে দকানে! তরা সব কিনবি, আমি দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করে দুব!' খুকি ঘাড় কাৎ করল। সঙ্গীদের ডেকে জড় করল। খুকির খেলনাগুলো, হাঁড়ি-কলসি-থালা-বাসন-কড়াই-উনুন সবই রয়েছে। ছোট-ছোট মেয়েরা যে-যার সংসার উঠিয়ে নিয়ে এল বাঁশতলায়। কারো পয়সা খলামকুচি, কারো বা কড়ি। খুকির হাতে টাকা। এক-একটা আস্ত টাকা। বিজয়ের জিনিসের দামও এক টাকার নিচে হলো না।

'গমটাতে একটু জল পাওয়ালে ভাল হত!'

'হুঁ আজ হবেনি, টকি যাব!'

'গঞ্জে যখন যাস, দশ কেজি অ্যামোনিয়া লিয়েসবি, এখন দিলে গাছগুলান বড় হবে!'

খুকির রান্না-বাড়া শেষ হলো। খাওয়াও শেষ হলো। সংসার উঠিয়ে নিয়ে এল ঘরে। কিন্তু হাত খালি। টাকা একটিও নেই। শুরু হলো ভাই-বোনের ঝগড়া। বিজয়ের হাতে সমস্ত টাকা। দাড়ি-পাল্লা, বাটখারা, দোকানদারি গুছিয়ে রেখে সে এখন টাকার থলি নিয়ে বাজায়, খুকিকে রাগায়।

'দে আমার টাকা!'

'কেনে, তুই মাল কিনুসনু?'

খুকি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে। সুখদা বলে—'হলো কি।' কিছুই হয়নি। 'ধূলার চালের দাম আছে নাকি, আমার সব টাকাগুলান নিয়েচে দাদা!' সবেমাত্র ধান সেদ্ধ শেষ হলো। পাতার ছাই হাওয়ায় উড়ে উঠোনময় ছড়িয়ে পড়েছে। মেয়ের কথা শুনে হেসে লুটোপুটি খায়। বিজয় এতে সাহস ফিরে পায়। মা হয়তো টাকাগুলো দিতে বলবে না। সস্নেহে দুলতে দুলতে বলেই ফেলে, 'তাসের টাকার দাম আছে নাকি!' ছেলে-মেয়ের ঝগড়ায় নাক না গলিয়ে চোখ পাকিয়ে সুখদা বলে, 'দুটোই আজ মার খাবে, দাঁত মেজেছিলি, মুখ ধুয়েছিস?' বিজয় চুপিচুপি উঠে যায়। খুকি বলে, 'ই দাঁতগুলা ত ভেঙে যাবে, নতুন দাঁত হবে যখন···!'

'পাকামো, যা দাঁত মেজে আয়···!'

মেয়ের কথা শুনে ফেলেছে বিমল। আলের ওপর দাঁড়িয়েই হেসে উঠল। সুবল বলল, 'আমার কাছে পাঠি দাও, দাঁতগুলো ভেঙে দি!' খুকি মনে করল,

সবাই তার শত্রু। মুখ গোমড়া করে উনুন থেকে ঘুঁটের ছাই নিয়ে আনাড়ির মতো আঙুল ঘষতে থাকল দাঁতে। 'দেখ বিজয়, বোনকে যেন জলে ঠেলে দিসনু!' ঘাটের সিঁড়িতে দু ভাই-বোন বসে দাঁত মাজতে মাজতে পুরানো ঝগড়ায় মন দিল। বিজয় টাকার থলি হাতছাড়া আদৌ করছে না। 'আমার টাকা দিবি কিনা?'

'না!'

'তুই ঘুমি পড়লে সব লিয়ে লুব!'

'ইস, সন্ধ্যা হলেই ঘুমি পড়ে, রাত জাগে!'

'আজ আমি ঘুমাবনি!'

'দেখবখন!'

সারাক্ষণ ভাই-বোনের খুনসুটি চলল। সুখদা দুপুর পর্যন্ত যাবতীয় কাজ শেষ করে প্রস্তুত। পায়ে আলতা, কপালে ভালো করে সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর, মুখটা আজ বেশ পরিষ্কার করেছে। বিমল সুখদার রকমসকম দেখল। এমন সাজগোজের দিন খুব কমই আসে। কৃষকের ঘরের বউ, পরী সেজে থাকলে তো চলে না। আধমন ধানের হাঁড়ি ঠেলতে না পারলে সে-বউয়ের কোনো দাম নেই। সুখদা সবই পারে। সাজলেও মন্দ দেখায় না। প্লাষ্টিকের চপ্পলটা পরে সুবলের পিছন পিছন চলল!

'ছেলাগুলাকে বেশি মারধোর করবেনি!'

বিমল ঘাড় কাত করল। বিজয় ও খুকি মায়ের সঙ্গে যাবার জন্যে প্রথম দিকে আড়ি ধরলেও বাপের মারের ভয়ে স্রেফ পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে বিমল ক্ষেতের ধারে ধারে ঘুরল, বিকেলের সময় ছেলে দুটোকে খুব যত্ন করল। অনেকদিন পরে নিজেকে একা একা মনে হলো। কোনো কাজ নেই। ঘরটা ফাঁকা। বিজয় আর খুকি একটু চোখের আড়াল হলেই ডাকাডাকি করে কাছে নিয়ে আসে। সন্ধ্যের সময় পালংশাকের গোড়ায় জল দিল। গ্রামের ঘরে ঘরে যখন শঙ্খধ্বনি উঠল, বিমল সন্ধ্যার প্রদীপটা জ্বেলে খুকিকে বলল, 'সন্ধ্যে দে!' খুকি প্রদীপ হাতে আনাড়ির মতো তুলসিতলায় প্রণাম করল, চারদিকে দেবতাদের উদ্দেশে জোড়হাত করল, বিমল শাঁখে ফুঁ দিল। বহুদিন পরে সে নিজে শাঁখ বাজাল। বুড়ি মা মারা যাবার পর যখন তার বিয়ে হয়নি তখন নিজেরাই দু-ভাই মিলে এইভাবে সন্ধ্যা দিত। সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালত।

সুখদা দুবেলার রান্না সেরে গেছে। খুকির ঘুমঘুম ভাব যখন এল, বিমল খাইয়ে দিল। বিজয় খেল না। মায়ের অপেক্ষায় বিজয়ও ঘুম কাটিয়ে উঠতে পারল না। খাওয়া সেরে দুই ভাই-বোন শুয়ে পড়ল। বিমল একা বসে বসে পাটের মুঠাটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দড়ি কাটতে শুরু করল। ওদের ফিরতে দেরি হবে।

এখন অন্ধকার চারদিকে। বাঁশবনে হয়তো একটা শিয়াল অথবা খেঁকি কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুকনো পাতার খড় খড় আওয়াজ আসছে। কে যেন লণ্ঠন নিয়ে এদিকেই আসছে। সুবল ওরা আসছে না—ওদের হাতে টর্চ আছে। আলোটার গতিবিধি লক্ষ্য করল বিমল। না, তার দিকেই এগিয়ে আসছে। গলা পরিষ্কার করার ভঙ্গিতে কাশল।

'কে গো তুমি?'

পরেশ লণ্ঠনটা উঠোনে রেখে বিমলের পাশে বসতে চাইল। বিমল নিজের পাছা থেকে পিঁড়িটা ঠেলে দিল পরেশের দিকে। 'তমার ফসল ই-সাল ভালই হোয়চে!'

'হুঁ!'

'আমার ত বিধবার দশা, চাষ করতে পারিনি ই-সাল! কুনুরকমে হাল খরিদে ধান রুয়েছিলম, ফসল ভাল হয়নি!'

'পরেশ তমার হেলেটার কি অসুখ হোয়ছিল, চাষের মুখেই…!'

'বুঝতে পারলমনি, আমার বুকের আধখানা ধ্বসি দিয়েচে!'

গত বর্ষার প্রাক্কালেই পরেশের বলদ মারা যায়। চাষাবাদ ভাল করতে পারেনি। অন্যের হাল নিয়ে কোনোরকমে চাষ করেছিল বটে, আশানুরূপ ফসল পায়নি। পরেশের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ছে। দু-তিন একর জমির ওপর ভরসা করে এত বড় একটি পরিবার। আর একটা বলদ না কিনতে পারলে দিন দিন ঋণ বাড়বে। সরকারি অফিসেও কয়েকবার যাতায়াত করেছে। ফল ভালো হয়নি। অঞ্চলের প্রধান বিরোধিতা করছে। এদিকে পরেশের একটি মেয়ে বড় হয়েছে। বিয়ে দিতে হবে।

'এক বিঘা জমির খদ্দের দিতে পার তুমি?'

বিমল দড়ি পাকানো থামিয়ে পরেশের মুখের দিকে তাকাল। এক বছরে পরেশের বয়স বেড়ে গেছে মনে হলো। চুলে পাক ধরেছে। একজন সৎ কৃষক জমি বিক্রি করবে, বিমলের অবাক লাগছে।

'খুব অভাবে পড়েচ ?'

'হুঁ ! মেয়েটাকে পার করে দি !'

'একটা ছেলে কিন না !'

'চার মাসের খোরাক টান পড়ছে ; ই-বছর ধান ছাড়া আর কিছু করতে পারলমনি ; আমি আর কমর সজা করতে পারবনি ।'

প্রায় কেঁদে ফেলে পরেশ। সুখদা ওরা সে-সময় এসে পৌছায়। সুবলের মাথায় একটা ভারি বোঝা। সুখদা ধরে নামাল বোঝাটা। কোমরে হাত দিয়ে অভিনয়ের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, 'কত তুব ?'

'আমি কি তমার মুটে ?'

সুবল নিমেষে খাপ্পা হয়ে উঠল। সুখদা দৌড়ে ঘরের মধ্যে চলে গেল। সুবল এভাবে রসিকতা বুঝবে না, টেরই পায়নি সুখদা। নইলে বলত না। প্রকৃতই হালুয়ার মেজাজে দাবড়ে উঠল। সুখদা ঘরের মধ্যে বেদম হাসল।

'তুমি যাও, কথা বলবখন !'

পরেশ লণ্ঠনটা নিয়ে চলে গেল। পিঁড়িটা টেনে নিয়ে সুবল দু পা ছড়িয়ে বসল। 'এমন জানলে যেতমনি আমি !' সুবল বলার সঙ্গে সঙ্গে সুখদা হেসে উঠল আবার।

'ই কি বঝা, পথের ধারে দাড়িছিল উ-বঝা আরো ভারি !'

'মুগ ডাল, মুসুর ডাল, খোল, এ্যামোনিয়া···পুরা বাজার আমার মাথায় ! টকি গেলম কুথা বাবুর মতন ঘুরব, না—বাজার কর ! কুথিকে একটা পচা ইলিশ কিনেচে !'

'বড় মাছ চিনে, খাওয়ার সময় বুঝবে !'

সুখদা বঁটি নিয়ে মাছ কুটতে বসল। শীতের ইলিশ তেমন স্বাদ হবে না, তবে ইলিশ তো বটে ! অন্য মাছের স্বাদের চেয়ে আলাদা। সুখদা খুব কাজের মেয়ে। এতো কম সময়ের মধ্যেই এতবড় একটা মাছ খাবার থালায় উপস্থিত। দু ভায়ে বসে ভাত খাচ্ছে। সুবল একখানা মাছের পেটি চাইলে সুখদা স্রেফ মিটিমিটি হাসল। একটু আগেই বড় চেঁচাচ্ছিল। লোকে পচা মাছ জেনেশুনে কেনে, আর সে দেখেশুনে তাজা মাছ নিয়ে এসেছে। তাতেও সুবলের আপত্তি। ধড়ফড় না করলেই মাছ যেন পচে যায় ! এমন ভাব সুবলের।

'আচ্ছা তুমিই বল, মেছনীরা কি পুখুর কাটি রাখবে জ্যান্ত মাছ বিক্রি করার জন্যে! ঠাকুরপো যে কি করে… !'

বিমল কোনো কথা বলল না। কারণ মধ্যস্থতার সময় হয়নি এখনো। অবশ্য বহুবার সে মধ্যস্থতা করেছে। নানান ছলছুতোয় ঝগড়া বেধে গেলে মহান বিচারক বিমল। সাক্ষী তখন বিজয় আর খুকি। খুকির বক্তব্য বোঝার চেয়ে আন্দাজ করে নিতে হয় বেশি। তবু বিচার বেশ জমে ওঠে। আজ সে ধরনের বিচার করার উপযোগী পরিস্থিতি নয়। কাজেই খাওয়া-দাওয়া আর শুয়ে পড়া।

সকাল বেলা উঠেই হাটে যাওয়ার জন্যে দু-ভাই তৈরি হতে থাকল। বিজয় ও খুকির হাতে একশ টাকার, দশ টাকার, পাঁচ টাকার নোট ঘুরছে। সুবল গতকাল ওদের টাকার খেলা দেখে বাজার থেকে ঐ নোটগুলো কিনে নিয়ে এসেছে। কিছু না, সাদা কাগজের ওপর ছাপানো নোটের ছবি। প্রকৃত টাকার মতো দেখতে নোটগুলো নিয়ে বিজয় পরিকল্পনা করল সমস্ত ছেলে-পুলেদের নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য খেলার। সুবল-বিমল হাটে গেল। খুকিও দারুণ ব্যস্ত পরিকল্পনা নিয়ে। সুখদার কাজ ধানগুলো দ্বিতীয়বার সিদ্ধ করা। এবং তারপরই শুকোতে হবে। ধান শুকনো হলে সুবল যাবে মিল-এ ধান কুটোতে।

যত বেলা বাড়ছে ততই বিজয় ও খুকির পরিকল্পনা জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। হিসেব মিলছে না। সুবল-বিমল হিসেব মিলিয়ে চলে এলো হাট থেকে, কিন্তু বিজয়ের ব্যবসা-বাণিজ্য স্থগিত রইল সন্ধ্যা পর্যন্ত। ফালতু ধুলো-বালির ব্যবসা করতে গেলে সত্যির মতো নোটগুলো হাতছাড়া হয়ে যায়। সেজন্যে চকচকে নোটগুলো হাতে হাতে ঘুরে ফিরছে। সুবল ও বিমল হাট থেকে ফিরে পায়ে তেল মালিশ করছে। এতদূর হাঁটার পর কিংবা জমিতে প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর কৃষকদের অভ্যাসই তাই—পায়ে তেল মালিশ করে নিশ্চিন্ত নিদ্রা। বিমল মস মস করে রোমে ভর্তি পায়ের ডিমটা দলতে দলতে জিজ্ঞেস করল, 'কুনটা ক-টাকার নোট বল তো।' বিজয় তড়তড় করে বলে দিল, খুকি পারল না। 'তোর মাকে আমি শিখিচি বুঝলি, পয়সা গুণতে পারত নি!'

'মা খুব বকা ছিল?'

'হুঁ!'

সুখদা ঘরের ভিতর থেকে থেকে 'হুঁ' এর ওপর জোর দিয়ে দিয়ে ঝামটে

উঠল। মানুষের-দুর্বল জায়গায় লাগলেই এমন করে। কার ওপর রাগ বেশি বিমল বুঝতে পারল না। সম্ভবত তারই ওপর চোট নিল। সুবল হাসতে-হাসতে বিজয়ের কান ধরে বলল, 'তোর মা আজও সাঁতার জানেনি বুঝলি!'

'তমরা সব পয়গম্বর জানি!'

সুবল বিমল হেসে উঠল। সুখদা রেগে গেলে পয়গম্বর কথাটা ব্যবহার করে। সুযোগ পেলেই আক্রমণের ঐ হাতিয়ার প্রয়োগ করতে কখনোই ছাড়ে না। তাতে হাসি ছাড়া কিছুর উদ্রেক হয় না কারো। বড় সাদা-সিধা মানুষ সুখদা। সেজন্যেই তো সুখী সকলেই। কয়েক মিনিটেই সরল বালকের চাপল্যের ফলে পরিবেশ অতর্কিতে বদলে গেল।

'বাবা টাকার চেয়ে সনার দাম বেশি না!'

'হুঁ!' বিমল মূল্যবান ধাতুর উল্লেখে সহজভাবেই সায় দিল।

'তালে আমাদের সব জমি-জায়গা বেচে সনা কিনলে ভাল হয়?'

বিমলের রাগ দপ করে জ্বলে উঠল। সুখদার রাগ উবে গেল। ছেলেটার ওপর এমন মারধোর দেখে কিছু ভেবে পেল না। বিমল তেল মাখানো কড়া হাতের চাপড়ে ছেলেটাকে যেন মেরেই ফেলবে। সুবল ঝট করে টেনে নিল। তা সত্ত্বেও বিমল এমন রুখে দাঁড়াল যেন হত্যা করে ফেলবে। খুকি মায়ের কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে দাঁড়ালো। এবার হয়তো তার পালা। মারের চোটে নোটগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল, মারতে আর না পেরে নোটগুলো ছিঁড়ে কুচিকুচি করল।

রাগ সহজে নিভল না। খেতেও পারল না বিমল। খুকিও আজ তার কাকার সাথে শুতে গেল। সুখদা স্বামীর পাশে জড় পাথরের মতো শুয়ে রয়েছে। মানুষটা কোনো কথা না বলাতে তারও ভয় করছে।

'তুমিও তমার গয়নাগুলা ফিরে চাও, গরু-কেনার সময় যেগুলান বিচেছিলম!'

'গয়না লিয়ে কি করব? এক জড়া হেলে কিন তার চেয়ে, ঠাকুরপোর বিয়া হবে, ক-বিঘা জমি আরো কিন!'

বিমল খুশি হলো। বউ গয়নার কথা ভুলে গেছে। গয়না পরার বয়সও আর নেই। সুখদার কাছাকাছি সরে গেল। সুখদা তার মনের কথা জানে। সুখদার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'তুমি এখন সত্যিই আমার বউ। আমি ত চাষা!'

'চারিদিকে নবীন যদুর বংশ'

অশ্রুকুমার সিকদার

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্র' লেখার সময় মহাভারতের মৌষলপর্বের মৌলিকতা বিষয়ে কিছু দ্বিধান্বিত ছিলেন। যে অর্জুন "পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, এবং ভীষণ কর্ণের নিহন্তা, তিনি লগুড়ধারী চাষাদিগকে পরাভূত করিতে পারিলেন না। গাণ্ডীব তুলিতে পারিলেন না। রুক্মিনী, সত্যভামা, হৈমবতী, জাম্ববতী প্রভৃতি কৃষ্ণের প্রধানা মহিষীগণ ভিন্ন আর সকলকেই দস্যুগণ হরণ করিয়া লইয়া গেল।" বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন তুলেছিলেন, "এই সকল কথা কি মৌলিক?" তিনি শেষপর্যন্ত এই রকম সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে মৌষলপর্ব মহাভারতের "প্রথম স্তরের অন্তর্গত নহে বলিয়া বোধহয়।" অন্যদিকে সম্প্রতি বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছেন মহাভারতের বিপুল কলেবরের মধ্যে মৌষলপর্বের একটা অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ যথাযোগ্যতা আছে। 'মহাভারতের কথা'-র 'বৃদ্ধ কাণ্ডারী' অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন—"মৌষলপর্বটি কুরুপাণ্ডবযুদ্ধের এক সংক্ষেপিত ও ভীষণতর পুনর্লিখন, অথবা এক মর্মভেদী মন্তব্য, সেই দীর্ঘায়িত ঘটনাবলির সারাৎসার—তার ব্যাখ্যা, তার সর্বশেষ পরিণাম। যে যুদ্ধ বিধিবদ্ধভাবে ঘোষিত হয়েছিল, এবং যাকে অনেকবার ধর্মযুদ্ধ বলা হয়েছে—তা প্রকৃতপক্ষে কী এবং কেমনতরো, তা মৌষলপর্বের ক্ষুদ্রাকৃতি পটের উপর পিঙ্গল আলোয় প্রতিফলিত হলো। দুয়ের মধ্যে প্রতিসাম্য অনেক…।" মৌষলপর্ব প্রক্ষিপ্ত কিংবা মহাভারতের বিপুল পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, সেই কথা আমাদের আলোচ্য নয়; সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকের পক্ষেও সে প্রসঙ্গ বিবেচ্য নয়। কারণ সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকেরা তো গ্রন্থকীট গবেষক নন, তাই পুরাণের কোন অংশ মৌলিক আর কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত তা নিয়ে তাঁদের শিরঃপীড়া নেই। পুরাণের কোনো উপাখ্যানের মধ্যে সৃষ্টিবীজ যদি তাঁরা পেয়ে যান, যদি সেই কাহিনীর মধ্যে পেয়ে যান সম্প্রতি-কালের একটা পূর্বাভাস তাহলেই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট। পুরাণের প্রাচীন অনুষঙ্গের মধ্যে লুকিয়ে থাকে গভীর কোনো পুনরাবৃত্ত প্রাসঙ্গিকতা—সেই গূঢ় সারাংশকে নিষ্কাশিত করে নেন আধুনিক কবি এবং ব্যবহার করেন নিজের

সময়ের দর্পণ রচনার কাজে। সেই রচনায় প্রাচীন নবীন বিষয়ে মন্তব্য করে, নবীন প্রাচীনের করে নবতর ব্যাখ্যা।

তাই দেখি মৌষলপর্ব মৌলিক নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত নবীনচন্দ্র সেনকে বিচলিত করে নি। তিনি ত্রয়ী মহাকাব্য নামে পরিচিত রচনার তৃতীয় অংশ 'প্রভাস'-এ মৌষলপর্বের কাহিনীর উপর নির্ভর করেছেন। "কবিরা কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক", একথা নবীনচন্দ্রেরই, তবু এই উনিশ শতকী মহাভারত লেখার সময় নবীনচন্দ্র পুরাণকে নিজের কালের সঙ্গে খুব বেশি সম্পৃক্ত করে নিতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। হরেক রকম কারণে নবীনচন্দ্রকে সার্থক কবি এখন যে বলা হয় না, তার একটা কারণ বোধহয় পুরাণের নবায়নে তাঁর এই অসাফল্য। যদুবংশ ধ্বংসের এই নতুন রূপান্তরে উপস্থাপনাগত যে-সব অভিনবত্ব তিনি করেছেন তার মধ্যে প্রায় কোথায়ও যুগের প্রয়োজন লক্ষ্য করা যায় না। বৃষ্ণিবংশীয় মেয়েরা যে স্বপ্ন দেখেছিল এক শুভ্রদশনা কৃষ্ণাঙ্গী রমণী হেসে হেসে তাদের মঙ্গলসূত্র চুরি করে পালিয়ে যাচ্ছে, নবীনচন্দ্রের কাব্যে সেই দুঃস্বপ্নের রমণী প্রতিহিংসাময়ী জরৎকারু। জরৎকারুর প্রতি আসক্তি নিয়েই নবীনচন্দ্রের কাব্যে বিসংবাদ বেধেছে সাত্যকি এবং কৃতবর্মার—তারই পরিণাম যদুবংশের বিনষ্টি। মহাভারতে যদুবংশের ধ্বংসের কারণ নিহিত ছিল অনেক গভীরে, নৈতিক অবক্ষয়ে। নবীনচন্দ্র তাকে নামিয়ে এনেছেন ব্যক্তিগত স্তরে। জরাব্যাধের শরে বিদ্ধ হয়ে কৃষ্ণের মৃত্যু ঘটেছিল, নবীনচন্দ্রের কাব্যে কিন্তু সেই হত্যার জন্যও দায়ী জরৎকারুর অপ্রত্যার্পিত প্রেমজনিত ক্রোধ। মূলে যে ইঙ্গিত ছিল—কৃষ্ণও কালাধীন—নবীনচন্দ্র সেই ইঙ্গিতও এইভাবে নষ্ট করলেন। কৃষ্ণকে ব্রাহ্মণবিদ্বেষী প্রতিপন্ন করে, বহির্ভারতে ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারের, এমনকি আভীরদস্যুগণ কর্তৃক যদুবংশীয়া রমণীদের অপহরণের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের ইঙ্গিত করে তিনি পুরাণের আখ্যানে উনিশ শতকী ভাবের আবহ সঞ্চার করতে চেয়েছেন বটে, কিন্তু সেই চেষ্টা সার্থক হয় নি নানা কারণেই। মূল কারণ তো কবিত্বশক্তির অভাব, তারই সঙ্গে জড়িয়ে আছে যুগচৈতন্য বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টির অভাব। ফলে নতুন-পুরোনোয় তিনি সেলাইচিহ্নহীন সংযোগ সৃষ্টি করতে পারেন নি।

ইদানীংকালে বাঙলা সাহিত্যে মৌষলপর্বের উপাখ্যানের যে নতুন নতুন ব্যবহার আমরা পাচ্ছি, দেখছি তাকে নতুন বহুস্তরান্বিত দ্যোতনায় মণ্ডিত হতে, তার সঙ্গে নবীনচন্দ্রের অভিপ্রায় ও অর্জনের বেশি কোনো মিল নেই। ভক্ত

নবীনচন্দ্রের লক্ষ্য কৃষ্ণমহিমা ব্যাখ্যান, যদুবংশের ধ্বংসের বিবৃতি তার একটা উপলক্ষ মাত্র—সেই উপাখ্যানের কোনো আধুনিক তাৎপর্য খুঁজে নিতে পারেন নি তিনি। সেদিকে তাঁর চেষ্টাও হয়তো ছিল না। তাছাড়া এই বিনষ্টির বিবরণ যে আমাদের কালেরই আত্মকথা এমন কোনো উপলব্ধি তাঁকে উত্তেজিত করে নি। করার কথাও নয়, ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের জাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার দিনে, সেই শ্রেণীর প্রতিনিধি নবীনচন্দ্র এই আত্মহননের ও অবক্ষয়ের কাহিনীর মধ্যে নিজেদের সময়কে খুঁজে পাবেন কী করে? পরবর্তী পর্বের ধ্বংসের বীজ সেদিনই যে বপন করা হয়েছিল সে তো তাঁদের বুঝতে পারার কথা নয়। নবজাগ্রত মধ্যবিত্তের বক্ররেখা সবে উপরের দিকে উঠছে, সেদিন কী ভাবে জানা যাবে শত বছরের মধ্যেই সেই রেখা হুমড়ি খেয়ে পড়বে?

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মৌষলপর্বের নতুন উপস্থাপনায় এক সুগভীর স্বাতন্ত্র্য আছে। বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করি এই পুরাণকাহিনী কী তীব্র টানে আকৃষ্ট করেছে সম্প্রতিকালের কবি নাট্যকার ঔপন্যাসিককে। এ কোনো খেয়ালি নির্বাচন নয়—এই উপাখ্যানকে এত বারবার বেছে নেওয়া। নির্বাচনের এ হল মৌলিক তাগিদ। তাঁরা অনুভব করেছেন মৌষলপর্বের মতো সভ্যতার এক অন্তপর্বে তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন, সামূহিক অন্ধকারে, অবক্ষয়ের কিনারে, বর্বরতার পুনরুত্থানের মধ্যে। তাঁরা অনুভব করেছেন অদ্ভুত আঁধার এক পৃথিবীতে নেমে এসেছে, কালসন্ধ্যা আসন্ন, চারিদিকে "এমন ঘোর কালবেলা, অসহিষ্ণু অবিশ্বাস ঘৃণা / হৃৎপিণ্ডে অন্ধকার।" নিরপেক্ষ কবিদৃষ্টি দিয়ে জীবনানন্দ লক্ষ্য করেন পরিচিত সভ্যতার পতন ও অবক্ষয়—নৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাঙন।

> চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়—অলীক প্রয়াণ।
> মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর;
> যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল;
> মানুষের লালসার শেষ নেই;
> উত্তেজনা ছাড়া কোনো ঋতুক্ষণ
> অবৈধ সঙ্গম ছাড়া সুখ
> অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ
> নেই। (এই সব দিনরাত্রি)

'নেই' শব্দটিকে একটি স্বতন্ত্র চরণে নিঃসঙ্গভাবে বসিয়ে জীবনানন্দ এই নৈতিমগ্ন

সভ্যতার শূন্যতাকেই বোধহয় সাকার করতে চেয়েছিলেন। এবং প্রায় অনিবার্যভাবে সেই ক্ষয়োন্মুখ সভ্যতার প্রতিমান তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন মহাভারতের মৌষলপর্বে।

> চারিদিকে নবীন যদুর বংশ ধ্বসে
> কেবলই পড়িতে আছে ; সঙ্গীতের নতুনত্ব সংক্রামক ধুয়া
> নষ্ট করে দিয়ে যায় ;—
> স্মৃতির ভিতর থেকে জন্ম নেয় এই সব গভীর অসূয়া।
>
> (আমিষাশী তরবার)

মহাভারতে আছে "দদর্শ বিপরীতানি নিমিত্তানি যুধিষ্ঠির।" বিপরীত—পাখিরা বামাবর্তে মণ্ডলাকারে ঘুরতে লাগল, মহানদীসকল বিপরীতমুখে প্রবাহিত হতে থাকল। গোরুর গর্ভে গর্দভ, অশ্বেতরীর গর্ভে হস্তিশাবক, কুক্কুরীর গর্ভে বিড়াল এবং বেজির গর্ভে ইঁদুরের জন্ম হল। এই উন্মার্গগামিতা, প্রকৃতি ও স্বভাবের বিরুদ্ধতা জীবনানন্দের 'কালবেলা'তেও লক্ষ্য করি—যারা অন্ধ তারাই বেশি চোখে দেখে, প্রেম-প্রীতি-করুণা নেই যাদের হৃদয়ে তাদের সুপরামর্শ ছাড়া আজ পৃথিবী অচল, আর মানুষের প্রতি যাদের গভীর আস্থা "শেয়াল ও শকুনের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।" যদুবংশের আসন্ন বিনাশের ইঙ্গিত দিয়ে চিরাগত সংস্কারের ভিত্তিতে মহাভারতকার নিয়তিকে শরীরী করেছিলেন নানা অশুচি ও অশুভ জীবজন্তুর উল্লেখের মধ্য দিয়ে। বর্তমান কালবেলা, যেখানে "রিরংসা, অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষো, ভয়" চরাচর-ব্যাপী, তাকেই শরীরী ও মূর্ত করার এবং সভ্যতার নিয়তিনির্দেশক দুর্নিমিত্তের ইশারা দেবার জন্যেই কি জীবনানন্দের কবিতায় ইঁদুর-পেঁচা-শেয়াল-শুয়োর-শকুন-আবহমান গাধা—এই সব প্রাণীর উপস্থিতি ?

জীবনানন্দ নির্লিপ্তভাবে তুলে ধরেছেন পরিস্থিতিকে, সভ্যতার রোগজর্জর চেহারাকে। বিষ্ণু দে থেকে আরম্ভ পক্ষপাতী রূপায়ণ—কখনো অকপটভাবে, কখনো ছদ্মবেশে। বিষ্ণু দে-র 'পদধ্বনি'-তে আমরা পেলাম শ্রেণীসংঘাতমুখর ইতিহাসতত্ত্বের রূপায়ণ। ক্ষয়োন্মুখ বুর্জোয়ার প্রতিনিধি অর্জুনের মুখ দিয়ে যদিও এই নাট্যিক স্বগতোক্তিময় কবিতাটি বলানো হয়েছে, তবু কবির সমর্থন এতদিন-কার প্রবঞ্চিত লুটেরা গোপদস্যুদের প্রতি। মহাভারতেও অক্ষম অর্জুন পূর্ব-প্রতাপের কথা স্মরণ করে বিকলচিত্ত হয়েছিল। তার মনে পড়েছে খাণ্ডব-দাহনের কথা, নিবাতকবচদের পরাস্ত করার কথা, উত্তরগোগৃহরণের কথা—

কুরুক্ষেত্রে কৌরবগণের সঙ্গে মহাযুদ্ধে আমার যে তূণ বাণশূন্য হয় নি, আজ সামান্য গোপদের সঙ্গে যুদ্ধে সেই তূণ বাণশূন্য হয়েছে। বিষ্ণু দে-র অর্জুনও আজ ভগ্নসামর্থ্যের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে স্মরণ করেছে সুভদ্রাহরণের "আদিগন্ত মুক্ত মোহানার" দিনগুলিকে—যেদিন "যাদবের পঙ্গপাল" বৃথাই পিছনে তাড়া করেছিল। সেদিন ছিল বুর্জোয়া সভ্যতার অভ্যুত্থানের দিন। কিন্তু আজ সেই সভ্যতার অবক্ষয়ের দিন—

> ঊর্ধ্বশ্বাস উৎসবে কাতর বিলাসী যাদব যুবাদল
> অতীত-অর্জিত সুখে এলোমেলো অলস ভোগের
> স্বার্থপর আবিষ্কারে ক্লান্তিভারে নিদ্রান্ধ বিকল।

ইতিহাস-নায়ক অর্জুনেরও আজ "জরিষ্ণু ধমনী"। আভীরদস্যুদের আক্রমণের মধ্যে বিষ্ণু দে দেখেছেন ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম। দেখেছেন, "কালের ধারায় / নিয়মে হারায় পার্থসারথির পরাক্রম" ; যে কালের নিয়মে কৃষ্ণও বশীভূত সেই কালের নিয়মেই ঘটে শ্রমজীবীর উত্থান ও জাগরণ। "শালপ্রাংশু হাতে সব পাশবিক বল" দস্যুদল ছুটে আসে, সেই দস্যুদের পদধ্বনির মধ্যে কবি শুনতে পেয়েছেন' দুরন্ত মিছিল'-এর পদধ্বনি। 'মিছিল'—এই একটা শব্দের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে কবি যুক্ত করে দিলেন পুরাণকে আর সাম্প্রতিককে। যাদবনারী অপহরণকারীদের মধ্যে তিনি দেখেছেন নিজের অধিকার ছিনিয়ে নিতে উদ্যত শ্রমজীবী মানুষকে।

> চায় তারা রঙ্গিলাকে প্রিয়া ও জননী
> প্রাণৈশ্বর্যে ধনী,
> চায় তারা ফসলের খেত, দিঘি ও খামার,
> চায় সোনাজ্বলা খনি। চায় স্থিতি, অবসর।

যেন মধ্যবিত্তশ্রেণীর একজন হয়ে কবি অনুভব করেছেন এই শ্রেণী আজ, সমর সেনের ভাষায়, "লবেজান"। কিন্তু সেই অনুভব তাঁকে আত্মকরুণায় মগ্ন করে নি, বরং যে শ্রমজীবী সম্প্রদায় রথের রশি ধরলে কালের রথ আবার চলবে সেই শ্রমজীবীর উত্থানকে কবি অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। কারণ সভ্যতার গতি অব্যাহত রাখার জন্যেই অশক্ত নায়কের জায়গায় নতুন সমর্থ নায়কের প্রয়োজন সম্বন্ধে কবি সচেতন।

বিষ্ণু দে যখন 'পদধ্বনি' লিখেছিলেন তখন শ্রমজীবীর অভ্যুত্থান, আমাদের

দেশের পক্ষে, বেশির ভাগই ছিল তাত্ত্বিক সম্ভাবনা। দূর দেশে কোথায়ও কোথায়ও শ্রমিকের সেই জয় ঘটেছিল বটে, কিন্তু সেই বিপ্লবের ওলোটপালট আমাদের স্বার্থকে ব্যবহারিক দিকে কত দূর পর্যন্ত আঘাত করতে পারে, তা আমাদের জানা ছিল না। সেই বিপ্লব আমাদের কাছে ছিল দূর দিগন্তের অস্পষ্ট সম্ভাবনা। সম্ভাবনা সুদূর ছিল বলেই হয়তো জরিষ্ণু মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি অর্জুনের পক্ষে দস্যুশ্রমজীবীদের অভ্যর্থনা করা সহজ হয়েছিল। কারণ তখন বাস্তবিক তারা খেত, দিঘি, খামার বা সোনাজলা খনির স্বত্ব ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হয়নি। গায়ে তখনও আঁচ এসে লাগেনি বলেই সহজ ছিল দূর থেকে "আগুন আমার ভাই" গান গাওয়া। কিন্তু ১৯৬৭ সালের পর দিন ক্রমেই তেতে উঠেছিল, মনে হয়েছিল বিপ্লব আসন্ন, ক্ষমতা চলে যাচ্ছে শ্রমজীবীর হাতে অসংবরণীয়ভাবে। বিষমভাবে বিব্রত হয়েছিল মধ্যবিত্ত ধূর্ত সুখ। শ্রমজীবীর অভ্যুত্থান যখন আর নিরাপদ নিশ্চিন্ত দূরত্বের ব্যাপার থাকল না, তখন হৃতশক্তি মধ্যবিত্ত মানসিকতায় দেখা দিল অস্বস্তি। আভীরদস্যুদের জয়ে এখন অভিনন্দন জানানো হয়ে উঠল কঠিন।

বিমল করের 'যদুবংশ' উপন্যাসে অবশ্য স্বেদজীবী শ্রমিকদের কথা নেই, এখানে সকলেই সমাজের মধ্যশ্রেণীর মানুষের বংশধর। মৌষলপর্বের দুটো উপাখ্যান আছে—এক, যদুবংশের ধ্বংসকাহিনী; দুই, অর্জুনের অক্ষমতা-ব্যর্থতার কাহিনী। সূর্য, বুললি, কৃপাময়, অভয় সব এক ধ্বংসোন্মুখ যদুবংশের সন্ততি। বাড়িতে বাড়িতে অসূয়া-বিদ্বেষ—মায়ের সঙ্গে অভয়ের, দিদির সঙ্গে সূর্যর, বৌদির সঙ্গে বুললির কুৎসিত ঝগড়া। একদিকে প্রেমহীন যৌনসম্ভোগ, বন্ধ্যাত্ব বা বিকৃত যৌনতার ছবি, অন্যদিকে সুরাসক্তি। এদেরই যেন বর্ণনা করেছিলেন সমর সেন প্রায় তিরিশ বছর আগে—

> কালসন্ধ্যার এই কুটিল লগ্নে
> রাস্তায় হাসির গররায় ঘোরে তুখোড় ইয়ারের দল,
> রেস্তহীন গুলিখোর, গেঁজেল মাতাল···। (বকধার্মিক)

চার বন্ধুর মধ্যে চাপা হিংস্রতা যে-কোনো উপলক্ষ নিয়ে হিসিয়ে ওঠে। এই অংশে গণনাথ যেন কৃষ্ণেরই প্রতিভূ—"আমাদের এনি থিং, লীডার গণাদা।" এই গণনাথ মানুষের স্বাধীনতার কথা বলত, বলত, "চাকরি করবো না, ছোট হয়ে যেতে হয়, নোংরামিতে থাকবো না, মন নষ্ট হয়ে যায়।" দ্বিতীয় অংশে এই

গণনাথের উপরে যেন অর্জুনের ছায়াসম্পাত ঘটেছে। তখন সূর্য-বুললি ইত্যাদি গোপদস্যুদের হাত থেকে গণনাথ নয়না-যমুনা-রত্নাকে বাঁচানোর বৃথা চেষ্টা করে হেরে যায়। যখন গণনাথ ওদের দ্বারা আক্রান্ত তখন, "অনেক দিন পরে সেই পুরনো গণনাথের ঝলসে ওঠা চোখ ও গলার স্বর যেন ধরা পড়েছিল। কিন্তু সে সাময়িক। সে গণনাথ আর নেই।" আত্মবিস্মৃত হতবল অর্জুনও দস্যুগণ কর্তৃক নির্জিত হয়ে ভেবেছিল, "আমার সেই মাহাত্ম্য আর নেই।" অর্জুন যে যাদবনারীদের রক্ষায় ব্যস্ত ছিল, তাদের সকলে কিন্তু রক্ষিত হতে ব্যস্ত ছিল না —"অনেক স্ত্রীলোক ইচ্ছানুসারে দস্যুগণের অধীন হলো।" গণনাথের দ্বারাও তিন বোনের সকলে রক্ষিত হতে চায় নি। যমুনা লোভের বশে বেচে দিয়েছে সোনার প্রদীপ, ছেড়ে গিয়েছে গণনাথের আশ্রয়। সূর্যদের পরিবারে বংশানুক্রমিকভাবে এই সোনার 'জন্মসুখী প্রদীপ' ব্যবহৃত হত নবজাত সন্তানের মুখ দেখার সময়। দিদির পঙ্গু দুর্বল ছেলে ছোক্‌কুর জন্মের সময় এই প্রদীপ জ্বলেছিল শেষবার। পঙ্গু ছোক্‌কুর পরেই, ইঙ্গিত আছে, নির্বংশ হবে এই বংশ— 'জন্মসুখী প্রদীপ'-ও তাই চিরকালের জন্যে অপহৃত হয়ে গেল। উনিশ শতকে যে মধ্যবিত্তের আবির্ভাব একশো বছরের মধ্যে সেই মধ্যবিত্ত হয়ে গেল উত্তরাধিকারহীন, দেউলে।

আধুনিক সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নায়কেরা সবাই প্রায় পরাজিত নায়ক। কিন্তু মধুসূদনের রাবণ বা রবীন্দ্রনাথের কর্ণের ক্ষেত্রে পরাজয়ের মধ্যেও প্রকট হয়েছে ব্যক্তিমানুষের মহিমা। কিন্তু কৃষ্ণ-গণনাথ বা গণনাথ-অর্জুনের পরাজয় যেন শুধু সর্বস্বহারার পরাজয় নয়, এই পরাজয় একেবারেই মহিমাহীন। গণনাথ আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করল—হার মেনে নিল "not with a bang, but a whimper"। "বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল?"—তাই কি গণনাথের আত্মহত্যা? বিশ্বাস নষ্ট হয়েছিল সূর্য-বুললিদের সম্বন্ধে, না কি যমুনার সম্বন্ধে, যে যমুনাদের জন্যে সে মারামারি করেছিল? লেখক যেন এই রকম একটা জবাব আশা করেছেন। কিন্তু আসলে, মনে হয়, নিজের উপর বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলেই গণনাথের এই আত্মহত্যা। ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তের সামাজিক ভূমিকার অবসান ঘটে গেছে, তাই গণনাথের কোনো মহিমাময় ভূমিকা নেই। বিমল করের উপন্যাসে গণনাথের মতো আর একজন মানুষ আছে, বয়সে সে সূর্যদের সমবয়সী, তুলসী। এই কল্পনাপ্রবণ, অস্থির, বিস্ময়াপন্ন যুবা যক্ষ্মারোগে ভোগে; ফ্যাকাসে রক্তহীন চেহারা নিয়ে পড়ে পড়ে মার খায়। সূর্যর হাতে ছুরি দেখে

তার ফ্যাকাসে চেহারা আরো ফ্যাকাসে হয়ে যায়। তুলসীও গণনাথের মতো আর একজন হেরে-যাওয়া গুটিয়ে-নেওয়া মানুষ। তারও কোনো সৃষ্টিশীল সামাজিক ভূমিকা নেই।

দুই কৌশলে পুরাণকে করে তোলা যায় আধুনিক। এক পদ্ধতির নিদর্শন 'যদুবংশ'—আধুনিক চরিত্র ও সমস্যাকে পৌরাণিক সমস্যা ও মানুষের অনতিপ্রচ্ছন্ন সমান্তরালতায় যেখানে গড়ে তোলা হয়েছে। দ্বিতীয় পদ্ধতির উদাহরণ প্রমথনাথ বিশীর 'পূর্ণাবতার' উপন্যাস। পুরাণের চরিত্রই এখানে অবলম্বন, পৌরাণিক পরিবেশই এখানে আশ্রয়; কিন্তু ভিতরে ভিতরে বাজিয়ে তোলা হয়েছে সম্প্রতিকালের প্রতিধ্বনি। প্রমথনাথের এই উপন্যাসের রচনাকাল যে ১৯৬৮ থেকে ১৯৭১ তা অন্তর্গত প্রমাণই বলে দেয়। যেমন 'ঘেরাও' শব্দের ব্যবহার। অথবা এই বাক্যটি, "আজ উত্তরপাড়ায় আগুন লেগেছে বলে তাদের নিরীহ মনে করবেন না, ওরাই কালকে দক্ষিণপাড়ায় আগুন লাগিয়েছিল। আজ তার বদলা চলছে।" মৌষলপর্বে জর নামক যে ব্যাধ কৃষ্ণকে শরবিদ্ধ করেছিল সে-ই 'পূর্ণাবতার' উপন্যাসের নায়ক। এই উপাখ্যানে যাত্রারম্ভের চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে মৌষলপর্বের কাহিনী, যদিও শেষপর্যন্ত রচনাটি বাস্তববাদী উপন্যাসের স্তর থেকে পর্যবসিত হয়েছে ইউটোপিয়ায়। অরওয়েলের '1984' বা হাকস্‌লির 'Brave New World'-এর মতো অ্যান্টি-ইউটোপিয়া বা উল্টো-ইউটোপিয়ায় নয়, মোরের 'Utopia'-র মতো অকৃত্রিম ইউটোপিয়ায়। উপাখ্যানের চতুর্থ খণ্ডে সেই আদর্শজগতের কথা—সে দেশ বৃদ্ধের নয়, পাপ-পুণ্য সেখানে অজ্ঞাত, রাজা নেই রাজ্যশাসন নেই, সন্তান বা পত্নী কারো ব্যক্তিগত নয়। একমাত্র শাসন, স্বভাবের। কিন্তু পরিণাম যেখানেই হোক, আরম্ভ মৌষলপর্বে। সেই রাজাদেশে মদ-তৈরি বন্ধ করে দেওয়া হল, যদুবংশীয় পুরুষেরা পরস্পর হানাহানি করে আত্মঘাতী হল, অর্জুনের নেতৃত্বে রমণীদের প্রস্থান মাত্র দ্বারকাপুরীকে গ্রাস করল সমুদ্র, অর্জুনের আশ্রয় থেকে রাজবাড়ির বধূগণ দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে অধিকাংশই আত্মসমর্পণ করল আততায়ীদের কাছে। আততায়ীরা অবশ্য মহাভারতের আভীরেরা নয়—তারা হরণ করল ধনরত্ন মাত্র; প্রমথনাথের রচনায় রমণীরা আত্মসমর্পণ করেছে খট্টাসচালিত লুম্‌পেনদের কাছে। যেসব ক্ষেত্রে লেখক সরে গিয়েছেন মৌষলপর্বের ছক থেকে সেসব বর্তমান আলোচনায় আমাদের বিবেচ্য নয়।

মৌষলপর্বের কাঠামোকে আশ্রয় করে প্রতিষ্ঠিত সমাজের প্রতি বিরূপ মনোভাবকে সাকার করেছেন লেখক কিঞ্জল্ক বা খট্টাসের মাধ্যমে। এই কিঞ্জল্ক একদিন প্রতিষ্ঠিত সমাজেই জন্মেছিল, তাদেরই একজন ছিল। কিন্তু শ্রেণীচ্যুত কিঞ্জল্ক এখন খট্টাস নামেই বেশি পরিচিত—তার নাম-বিবর্তন যেন তার শ্রেণীতে অধঃপতনেরই সূচক। এই খট্টাস কিন্তু তন্তুবায় কৃষক ইত্যাদি শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের নেতা নয়, সে লুমপেন-গোষ্ঠীর নেতা বরং। একটি চরিত্র তাকে 'সমাজবিরোধীগণের নেতা' বলেছে। রাজ্যের যত চোয়াড় বদমাইশদের এই নেতার প্রতি, তার খট্টাস নাম থেকেই বোঝা যায়, লেখক খুব একটা সহানুভূতিশীল নন। কিন্তু তার কার্যকলাপের লজিক তুলে ধরতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি, বলতে দিয়েছেন অকপটে যা বলার আছে। খট্টাসের মুখে প্রমথনাথ বসিয়েছেন প্রতিষ্ঠানবিরোধী বিপ্লবী দর্শনের কথা—"ব্রহ্মাণ্ড অশ্বাণ্ড, চরাচর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর নীতিধর্ম সত্য বিবেক সুচতুর শাস্ত্রব্যবসায়ী আর ধনিকদের উদ্ভাবিত ধাপ্পা।" প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে সে বলে—"দুর্বলকে প্রবল মারছে, গরীবকে ধনী মারছে আর প্রজাকে মারছে রাজা। এই যে শৃঙ্খলাবদ্ধ মার এই তোমার সমাজ। প্রাণভয়ে তারা যদি পালিয়ে একতাবদ্ধ হয়ে যোগ্য নেতার শরণ নেয় তাহলে তোমরা বলে থাকো এ সব সমাজবিরোধী কার্য। আর এ বিরোধের সূত্রপাতটা কোথায় কেউ খোঁজ করে না।" এই শৃঙ্খলাবদ্ধ মার চিরকাল চলতে পারে না; তাই খট্টাসের লক্ষ্য, "বর্তমান অবস্থাকে বানচাল করে দেওয়ার উদ্দেশে সব ভেঙেচুরে সমতল করে দিয়ে ওলটপালট করে দিতে চাই।" খট্টাসের কথা যদিও লেখক নিরপেক্ষভাবে উপস্থিত করেছেন, তবে লেখকের মতাদর্শের প্রতিনিধি যে খট্টাস নয়, প্রভুদয়াল, তা সহজেই বোঝা যায়। প্রভু-দয়ালের মধ্য দিয়ে লেখক তাকিয়ে আছেন এক ইউটোপিয়ার দিকে যেখানে সব বিরোধের নিষ্পত্তি, রক্তপাতে নয়, সৌহার্দ্যে। এই প্রভুদয়াল বাসুদেবের কাছে জেনেছে কালের নিয়মে মাঝে মাঝে সমাজবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। অবতার বা মহানেতা সেই বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন। কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে এই শিক্ষা মেনে নেওয়া এক কথা, আর নিজের ব্যবহারিক জীবনে সেই সত্যকে কার্যকর করা অন্য কথা। বিপ্লবকে যে বিমূর্ত তাত্ত্বিকতায় সমর্থন করে, নিজের কালে সেই বিপ্লব ঘটতে গেলে সেই মধ্যবিত্ত মানসিকতা সায় দিয়ে উঠতে পারে না নিজেরই স্বার্থের প্ররোচনায়।

'উলঙ্গ রাজা' বইয়ের অন্তর্গত বেশি পরিচিত 'অকালসন্ধ্যা' কবিতার আগেও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এই পুরাণকাহিনী নিয়ে আরো একটি কবিতা লিখেছিলেন, 'কলকাতার যীশু' বইয়ের 'মুষলপর্ব'। দুটো কবিতারই বক্তা-নায়ক মনস্তাপে তাপিত অর্জুন। প্রথম কবিতা 'মুষলপর্ব'য় শুধু বলা হয়েছে, মালতী বকুল কামিনী ও মল্লিকা নাম্নী নারীদের, যাদের আজন্ম আমি "সুবাস গ্রহণ করেছি," সেই "তোমাদের রক্ষা করবার মতো উদ্যম আমার ছিল না।" 'মুষলপর্ব'-র সূচনায় চতুর্দিকে দুর্নিমিত্তের ছড়াছড়ি; দুর্বলের অভ্যুত্থানের মধ্যে, অধঃপতিতের জাগরণের মধ্যে "বিড়ালগুলি কুকুরের গলায়, এবং /কুকুরগুলি বাঘের গলায় ডাকছে।" "আমার চোখের সামনে বাগানগুলি/কাঁটালতায় ছেয়ে গেল।"—মধ্যবিত্তের সাজানো বাগান যে শুকিয়ে গেল অন্তঃসারশূন্যতায়, উর্বরতার অভাবেই যে জন্মাল কাঁটালতা, কালের অমোঘ নিয়মে সে খেয়াল নেই নীরেন্দ্রনাথের। এই প্রলয়কালে অর্জুন স্মরণ করেছে অতীতের ব্যর্থতা; সভাপর্বে "কুরুপুত্রেরা যখন / উরু দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায়" তখনও সে পাঞ্চালীর সম্মান রক্ষা করতে পারে নি। আজও সে যাদববংশীয়া পুষ্পতুল্যা রমণীদের দস্যুদের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্যম পেল না।

কেন অর্জুন আজ নিরুদ্যম তার কারণ সন্ধান করেছেন নীরেন্দ্রনাথ 'অকাল-সন্ধ্যা' কবিতায়। মৌষলপর্বের অন্ত্যঘটনায়, দস্যুগণ কর্তৃক নারী-অপহরণের মুহূর্তে "সত্যি সেই সংকটের মুহূর্তে একটিও / দিব্যাস্ত্র আমার/স্মৃতির সড়কে, অন্ধকারে / ভাসিত হয় নি।" কিন্তু তার কারণ, নীরেন্দ্রনাথের অর্জুন বলে, স্মৃতিভ্রংশ নয়—সে পরাজয়, লজ্জা ও নিরুদ্যমের কারণ অন্য।

যাদের সম্মান রক্ষা করবার মানসে আমি গাণ্ডীবে সেদিন
জ্যা-রোপণ করতে গিয়েছিলুম, যখন
তারাই অনেকে—অগ্নিকুণ্ডের উদ্দেশে ধাবমান
মূর্খ পতঙ্গের মতো—
লাস্যভরে
লুঠেরা দলের দিকে চলে গেল,
তখন, স্বীকার করি, ঠিক সেই মুহূর্তে আমার
শরসন্ধানের কোনো ইচ্ছাই ছিল না।...
...তারা অনেকেই
অর্জুনের হাত ধরে

নিরাপদ ভূমিতে উত্তীর্ণ হতে চায় নি, অনেকে
সেই ঘোর সংকটের মুহূর্তে সেদিন
অর্জুনকে নয়—
অরণ্যের একদল আভীর দস্যুকে
প্রাপনীয় প্রেমিক পুরুষ বলে সাগ্রহে বরণ করেছিল।
জেনে রাখো,
কোথায় আমার লজ্জা, কোথায় আমার পরাজয়।

অর্জুনের নিরুদ্যম ও নির্বেদের কারণ দেখাতে গিয়ে নীরেন্দ্রনাথ "অনেক স্ত্রীলোক ইচ্ছানুসারে দস্যুদের অধীন হইল", এই ইঙ্গিতকে সম্প্রসারিত করেছেন ও ব্যবহার করেছেন। লক্ষণীয় যে মহাভারতে গতশ্রী অর্জুন যখন বিদীর্ণ মনে বেদব্যাসের কাছে নিজের লজ্জাকাহিনী বিবৃত করেছিল—তখন কিন্তু সে যাদবরমণীদের দস্যুকর্তৃক অপহরণের কথা বললেও, তাদের অনেকের স্বেচ্ছায় দস্যুবরণের কথা উল্লেখ করে নি। না কি আত্মপক্ষীয়দের এই স্বপক্ষত্যাগ এতই লজ্জার যে অর্জুন সর্বজ্ঞ ব্যাসদেবকেও সেই কথা বলতে চায় নি। যাই হোক, কতিপয় নারীর এই পক্ষপরিবর্তনকে নীরেন্দ্রনাথের অর্জুন চমৎকারভাবে ব্যবহার করেছে নিজের প্রবীণ বয়সজনিত অক্ষমতা গোপন করার কাজে। স্বপক্ষীয়দের শ্রেণীত্যাগে, হৃতবল মধ্যবিত্তমানসের এই প্রতিনিধি দেখে নিজের নির্বেদের অজুহাত। মধ্যবিত্তের মহিমার হানি নয়, নিজের কালকবলিত অশক্ত শরীর নয়, শ্রেণীগত অক্ষমতা নয়, যেন এই পরাজয়ের কারণ স্বপক্ষীয়ের ভ্রষ্টতায় ইচ্ছার অভাব। যেন ইচ্ছা করলেই সে দস্যুদের হারাতে পারত, কিন্তু তার মনে জন্মাল বৈক্লব্য, অনাশক্তি, অনিচ্ছা—এই ভেবে এই অর্জুন নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'তৃতীয় পাণ্ডবের প্রবেশ ও প্রস্থান' প্রবন্ধে ঠিক কথাই বলেছেন এই নিঃসম্বল অর্জুন বিষয়ে—"ক্লৈব্যের অপবাদকে সে এড়াতে চায়। তার বক্তব্য, সে তার ভূমিকা পালন করতে পারে নি তা নয়, সে পালন করতে চায় নি। চতুর্দিকবর্তী লাম্পট্যের মাঝে সে এখনো আপন সাধুত্বের অভিমানটুকু বাঁচিয়ে রাখতে চায়।"

বিষ্ণু দে গোপদস্যুদের মধ্যে দেখেছিলেন কালের বিবর্তনে শ্রমজীবীর জাগরণ, অর্জুনের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তের স্মৃতিভারাতুর অক্ষমতা। নীরেন্দ্রনাথও পেয়েছেন অর্জুনের মধ্যে সেই ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত মানসিকতা, কিন্তু তাঁর রচনায় গোপদস্যু সহানুভূতির ফলে শ্রমজীবী হয়ে ওঠে নি, রয়ে গেছে

লুঠেরা দুর্বৃত্তই; তাঁর কবিব্যক্তিত্বের একাত্মতা বরং অশক্ত নির্বল অর্জুনের সঙ্গে। বিষ্ণু দে আর নীরেন্দ্রনাথের স্থান হয়তো বিপরীত পক্ষে—প্রথমজনের আভীরদের সঙ্গে, দ্বিতীয়জনের অর্জুনের সঙ্গে, কিন্তু অর্জুন ও গোপদস্যুদের আধুনিক ব্যাখ্যা করেছেন তাঁরা একইরকমভাবে। আরো সাম্প্রতিককালে বাঙলাদেশের চেহারা ফোটাতে গিয়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন মৌষলপর্বের পুরাণকাহিনী ব্যবহার করেন তখন কিন্তু অর্জুন ও আভীরদস্যুদের ভূমিকা পরিবর্তন ঘটে যায়। হঠকারী বামপন্থী রাজনীতিকে রুখতে শাসকশক্তি ব্যবহার করে যে 'সংগঠিত দক্ষিণপন্থী সন্ত্রাস' তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই সশস্ত্র লেঠেলদের বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চিনে নেন আভীরদস্যু বলে, আর অক্ষম ঐক্যহীন বামপন্থী রাজনীতিকে চিনে নেন হৃতশক্তি অর্জুন হিসাবে। গোলাম কুদ্দুসকে সম্বোধন করে একটি কবিতায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন:

> গোলাম কুদ্দুস! তুমি লিখেছিলে 'ইলা মিত্র'—বিখ্যাত কবিতা···
> গাণ্ডীব দিয়েছো ছুঁড়ে? কিন্তু তুমি সাংবাদিক লেখ তো কাগজে
> প্রত্যহের রোজনামচা। তোমার কলমে তবে কী জন্য জ্বলে না আজ
> তুষার আগুন?
> যখন স্বপ্নেও রোজ হানা দেয় হাটে, মাঠে, অন্তঃপুরে, প্রকাশ্য রাস্তায়
> ভাড়াটে জল্লাদ—করে নির্বিকার শিশু, যুবা, এমন কি সীমন্তিনী
> কল্যাণীকে খুন!

এই পরিস্থিতিতে, অর্জুন যখন গাণ্ডীব ফেলে দিয়েছে তার হৃতশক্তি হাত থেকে, তখন সমাজে সংসারে আভীরদস্যুদেরই একাধিপত্য আজ।

> মাঝে মধ্যে কোলাহল ভেসে আসে, গুলিবিদ্ধ শার্দুলের
> মাংস ছিঁড়ে নিতে সারমেয়গণ দ্রুত ছুটে যায়;
> তাদের অশ্লীল রাহবায় কাঁপে ভুবনমোহিনী রাত্রি,
> ম্লান হয়ে যায় জ্যোৎস্নার নক্ষত্র, বিতৃষ্ণায়
> মাথা নাড়ে দীর্ঘ তরুবীথি···
> হাসে দ্বারকার পথে ঘাটে ভাড়াটে জল্লাদ, জননীর
> পরিত্যক্ত নবজাত শিশুর কান্নার···।

দ্বারকায় দুর্লক্ষণের সমাবেশ থেকে ব্যাসদেব-অর্জুনের সংলাপ পর্যন্ত মহাভারতীয় মৌষলপর্বের সমস্ত রেখাটি বুদ্ধদেব বসু অনুসরণ করেছেন তাঁর

কাব্যনাটক 'কালসন্ধ্যা'-য়। পূর্বরঙ্গে দুর্লক্ষণের ইশারা, প্রথম অঙ্কে একটি সভ্যতার 'সার্বিক ও প্রতিকারহীন নির্বাপণ'-র কাহিনী, দ্বিতীয় অঙ্কে দস্যু-আক্রান্ত পার্থের ব্যর্থতা এবং উত্তর-কথনে ব্যাসদেব ও অর্জুনের কথোপকথন। যদুবংশের ধ্বংস ও আভীরদস্যুদের আক্রমণের মধ্যে কবি দেখেছেন কালের অমোঘ নিয়মে একটি সভ্যতার বিনাশ ও অবক্ষয় এবং প্রবঞ্চিত শ্রমজীবীর জাগরণ। এই ক্রান্তিকালে বুদ্ধদেব বসু পক্ষাবলম্বনের কথা ভাবেন নি, তিনি নির্লিপ্তভাবে, প্রায় মৌষলপর্বের কৃষ্ণের মতো, লক্ষ্য করেছেন "কালের পর্যায়"। যদুবংশীয় নরনারীদের "আচরণে নেই কৌলীন্য", "বানরের মতো নির্লজ্জ" তারা যৌন-ব্যভিচার ও সুরাবিহ্বল নৃত্যগীতে মত্ত। আর ত্রিলোকজয়ী অর্জুনও আজ কিঞ্চিৎ ক্লান্ত, ঈষৎ অবসন্ন। যাদবের অনাচার অর্জুনের অবসাদ—সব এক কথাই বলে, মধ্যবিত্ত-মহিমা ইদানীং অস্তংগমিত। পূর্বের সেই প্রতাপশালী যাদবেরা বিনষ্ট-আভিজাত্য, হৃতশক্তি এবং দূরদৃষ্টিরহিত, তখনই শ্রমজীবীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংঘবদ্ধ চেষ্টা ঘটেছে। লক্ষ করি, দ্বারকার পথে পথে যারা ভ্রাম্যমাণ উচ্চকণ্ঠ দাবি নিয়ে তারা লুম্পেনবাহিনী নয়। বুদ্ধদেব বসুর নাটকে তারা শ্রমজীবী—কবির সহানুভূতি যে অত্যন্ত ক্ষয়িষ্ণু যাদবজাতির প্রতিষ্ঠিত সমাজের প্রতি নয় তা এই থেকেই বোঝা যায়।

> কৃষক, তন্তুবায়, ধীবর, সূত্রধর,
> বণিক, নাবিক, কারুশিল্পী—
> ভূগর্ভ থেকে যারা টেনে তোলে দুর্জ্জেয় স্বর্ণ,
> সপ্তসিন্ধু ঘুরে এনে দেয় লবঙ্গ মৌরি,
> যাদের যত্নে পশু, পতঙ্গ, উদ্ভিদ
> দান করে অন্ন ও আবরণ,
> জোগায় দুগ্ধ, মধু, উজ্জ্বল, অংশুক, শঙ্খ···

আজ তারা নগরের পথে পথে দলবদ্ধ ঘোষণা করছে—"নিপাত যাক / নিপাত যাক / পাপিষ্ঠেরা নিপাত যাক।" বলছে, "যত অন্যায় যত অবিচার যত লজ্জা—/ চাই প্রতিশোধ! আজ প্রতিশোধ! চাই প্রতিশোধ!" এবং জানিয়ে দিচ্ছে "আজ আমরাই রাজা, আমাদের ইচ্ছেই ঈশ্বর।" দ্বিতীয় অঙ্কে দস্যুদলপতির সঙ্গে গলা মিলিয়ে যখন দস্যুদল দাবি করে "রত্নমণি সোনার খনি সুন্দরীদের স্বত্ব!" তখন বিষ্ণু দে-র 'পদধ্বনি'-র পরিষ্কার প্রতিধ্বনি শোনা যায়—

চায় তারা রঙ্গিলাকে, প্রিয়া ও জননী
প্রাণৈশ্বর্যে ধনী
চায় তারা ফসলের খেত, দিঘি ও খামার
চায় সোনাজ্বলা খনি।

যখন সত্যভামা সংশয়ান্বিত জিজ্ঞাসায় বিব্রত হয়ে বলে, বংশে-বংশে গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে হত্যা-প্রতিহত্যা, চলিত বাঙলায় যাকে বলে বদলা, যদি চলতেই থাকে—তাহলে মনুবংশ কি নির্বংশ হবে না? উত্তরে কৃষ্ণের মুখে নাট্যকার জানিয়েছেন, "দ্বন্দ্ব বিনা জীবনের স্রোত অসম্ভব!" এই ডায়ালেক-টিকের কথা এখানে বলা হয়েছে কৃষ্ণের প্রচ্ছদে, কিন্তু 'মহাভারতের কথা' বইতে প্রায় একই কথা বুদ্ধদেব বসু নিজ মুখেই জানিয়েছেন, "আসে এমন সময়, যখন সংগ্রহ ও সংহার সমার্থক হয়ে ওঠে, পূর্ণ হয় কোনো-এক বৃত্ত, বিশ্বসংসারে শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য রক্ষার জন্যই প্রয়োজন ঘটে ধ্বংসের।" স্থিতির ব্যত্যয়কে কেন সংশোধন করছেন না পার্থ, বিশেষত পার্থসারথি, সত্যভামা-সুভদ্রার এই প্রশ্নের জবাবে ইতিহাসপুরুষ কৃষ্ণ জানান—সেই বৃত্ত পূর্ণ হওয়ারই কথা। যাঁরা ছিলেন বিশ্রুত বীর তাঁরা এখন অনাবশ্যক বলেই প্রত্যাহৃত—"পূর্ণ হল কালের ঘূর্ণন"। কৃতবর্মা ও সাত্যকি "কালদষ্ট" বলেই "হৃতদৃষ্টি" এবং ফলে "বিলুপ্তসংবিৎ"—কালের অমোঘ ইঙ্গিতেই তারা বিতণ্ডার চূড়ায় পরস্পরকে আঘাত করেছে। কোনো কিছুই আকস্মিক নয়, সবই শৃঙ্খলিত ঘটনাপর্যায়ে বিধিবদ্ধ। কৃষ্ণ ক্ষান্ত করতে পারেন না কৃতবর্মা-সাত্যকিকে, রোধ করতে পারেন না যদুবংশের ধ্বংস, কারণ কালাধীশও কালাধীন; ইতিহাসপুরুষও ইতিহাসের নিয়মের বাইরে নন। ব্যাসদেব যেমন অন্তিমে বলেছেন, "স্রষ্টাও স্বরচিত নিয়মের বশবর্তী।"

'কালসন্ধ্যা' নাটকে বারবার কালের যে অমোঘ ঔচিত্যের কথা পাই তার ইশারা বুদ্ধদেব বসু মূল মহাভারত থেকেই পেয়েছিলেন। মৌষলপর্বে বারেবারে আমরা এই কালের কথা পাই; যা হচ্ছে সবই কালোচিতভাবে হচ্ছে। যদুবংশীয়রা "কালপ্রেরিত" হয়ে মুষল দ্বারা পরস্পরকে সংহার করেছিল, শ্বেতবর্ণ ও রক্তচরণ কপোতপক্ষিগণ "কালপ্রেরিত" হয়ে বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের গৃহে বিচরণ করতে লাগল, ভোজ ও অন্ধকেরা সকলে "কালপ্রেরিত" হয়ে একযোগে সাত্যকিকে পরিবেষ্টন করল, এ দৃশ্য দেখেও মহাতেজা কৃষ্ণ "কালের পরিবর্তন" জেনে ক্রুদ্ধ হলেন না, মহাবাহু কৃষ্ণ সেই মুষলচূর্ণসম্ভূত শরমুষ্টি ধারণ করে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং "কালের পরিবর্তন" দেখতে লাগলেন, দূর থেকে অর্জুনের মনে হল

দ্বারকানগরী "কালপাশগ্রহাৎ" ইত্যাদি ইত্যাদি। পর্বের অন্তিমে ব্যাসদেব অর্জুনকে জানিয়েছিলেন :

কালমূলমিদং সর্বং জগদ্বীজং ধনঞ্জয়।
কাল এব সমাদত্তে পুনরেব যদৃচ্ছয়া ॥—অর্জুন,

কালই স্বেচ্ছাক্রমে এই সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করে, আবার কালপ্রভাবেই সমুদায় সমুৎপন্ন ও বিলীন হয়ে যায়। 'কালসন্ধ্যা'-য় ব্যাসদেব এই কথাই সম্প্রসারিত করেছেন :

কাল সেই গর্ভ; বীজ, ধাত্রী ও শ্মশান,
যা ঘটায়, নিরন্তর আবর্তনে, জন্ম, বৃদ্ধি, অবক্ষয়, অবলুপ্তি,
আনে কীর্তি, এবং কীর্তির ধ্বংস,
আনে, যাকে লোকে ভাবে যুগান্তর,
কিন্তু যা নিতান্ত পুনরাবৃত্তি, শুধু বধ্য-ঘাতকের স্থান-বিনিময়।

বাস্তবিক 'কালসন্ধ্যা' নাটকের সর্বাঙ্গে পাই নাট্যকারের এই কালজ্ঞানের পরিচয়। যখন আভীর দস্যুদের কাছে অর্জুন নির্জিত তখন মন্তব্য করে তার অনুচরেরা "চঞ্চল এই সংসার; / পরিবর্তন সার সত্য।" এই চঞ্চল কালের প্রকোপেই যে অর্জুন একদিন কিরাতবেশী পশুপতিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রসন্ন করেছিল সেই অর্জুন আজ হতবল, গাণ্ডীব তুলতে সে অক্ষম, তার একদা-অক্ষয় তূণ শরশূন্য। এই কথাই বারবার বলা হয়েছে—যত্নবংশ যে ধ্বংস হল, অর্জুন যে অক্ষম হল, জয়ী হল প্রাক্তন প্রবঞ্চিতেরা—সে সবই কালের অমোঘ বিধান। ব্যাসদেব বলেছেন অর্জুনকে "সব দান ছদ্মবেশী ঋণ"। কালের নিয়মে, ইতিহাসের বিধানে যে শ্রেণী একদিন শক্তিসামর্থে ঐশ্বর্যে ভরপুর, তার সামাজিক ভূমিকা ফুরিয়ে গেলে, তাকে হতে হয় হৃতশক্তি নিঃসম্বল। ইতিহাসের এই শিক্ষাকে মেনে নেওয়াই প্রজ্ঞা।

বুদ্ধদেব বসু নবীন যত্নর বংশ ধ্বংসের ঘনঘটার মধ্যে দাঁড়িয়ে অতীতের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন নি, ভবিষ্যৎকে ভর্ৎসনা করেন নি—সাম্প্রতিক বিক্ষোভে জড়িয়ে না পড়ে, নির্লিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে তিনি দেখেছেন "কালের পর্যায়"। তিনি নীরেন্দ্রনাথের মতো এই গোধূলিসময়কে "অকাল" সন্ধ্যা বলেন নি।

সুভদ্রার একবার মনে হয়েছিল বটে, অন্তকাল এসেছে অকালে—"মধ্যদিনেই নামে সন্ধ্যা"—কিন্তু সুভদ্রার খেদোক্তিকে নাট্যকার আমল দেন নি। তিনি বোঝেন কালের পর্যায়ে অমোঘভাবে এসেছে যে সন্ধ্যা সে অকালসন্ধ্যা নয়, সে "কালসন্ধ্যা"। তাই বুদ্ধদেবের বেদব্যাস বলেন, "যা-কিছু সময়োচিত তা-ই যথাযথ"। নির্লিপ্ত কালজ্ঞানের এই আশ্চর্য সাহিত্যরূপায়ণের সামনে দাঁড়িয়ে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বোক্ত প্রবন্ধে যখন আবিষ্কার করেন "পরাভূত, ভূমিকাহারার আত্মসান্ত্বনা" এবং "শ্মশান বৈরাগ্য", তখন হতবাক হতে হয়। 'কালসন্ধ্যা' নাটকে আত্মসান্ত্বনা বা আত্মকরুণা নেই, পরিতাপ বা অনুশোচনা নেই, আছে এক মহান ঔচিত্যবোধ। যদুবংশের বিনষ্টি, অর্জুনের ক্লান্তি ও অবসাদ শ্রমজীবীর জাগরণের জয়নাদ "এই সব-কিছুর মধ্যে এক মহান ঔচিত্য অনুভব করে আমরা স্তব্ধ হয়ে যাই।"*

* প্রবন্ধটি সম্পর্কে আমরা পাঠকদের মতামত আহ্বান করছি।—সম্পাদক

মধ্যবিত্তসংকট ঃ শাস্ত্রবিরোধী ভাবনাচিন্তা

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

হ্বালটের বেঞ্জামিন তাঁর শার্ল বোদিল্যার প্রসঙ্গে আলোচনায় মালার্মে সম্বন্ধে একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন। মালার্মের শুদ্ধ কবিতার তত্ত্ব তখনই এসেছে —কবির কাছ থেকে তাঁর শ্রেণীর নিমিত্ত, অস্তিত্ব যখন দূরে চলে গেছে, বিষয়হীন বস্তুহীন সাহিত্য হয়ে উঠেছে আলোচনার কেন্দ্রভূমি। নিজ শ্রেণী থেকে এই বিচ্ছিন্নতাই মালার্মের কাব্যতত্ত্বের পটভূমিকা নির্মাণ করেছে। অথচ বোদল্যারের ক্ষেত্রে ঘটনা অন্য রকম—Baudlaire was a secret agent—an agent of the secret discontent of his class with its own rule. বড়র সঙ্গে যদি ছোটর উপমা দেওয়া যায়, তাহলে 'এই দশক' বা 'শাস্ত্রবিরোধী গল্পগোষ্ঠী'র গল্প-আলোচনা পড়তে পড়তে এসব কথা মনে পড়তে পারে। সংকটটা মূলত মধ্যবিত্তশ্রেণীর—১৯৬০-এর দশক থেকে যে সংকট দ্রুত ও তীব্রভাবে সমগ্র মধ্যবিত্তশ্রেণীকে শুধু গ্রাস করেছে নয়, অসহায় অসাড় বিমূঢ় করে তুলেছে। এই অসহায়তাই, শ্রেণীর সামগ্রিক ভাঙনই গল্পলেখককে করে তুলেছে শ্রেণীবিচ্যুত : "কারও কথাই আমি বলতে চাই না, বলতে পারব না। সামান্য যা জানি, সামান্য যা বুঝি, অনুভব করি তা নিজের কথা। সেজন্য নিজের কথাই আমি বলব।" ('গল্প', চতুর্থ সংকলন)। "সারাদিনের ক্লান্তির পর আমার নিচু ছাদ ঘরটাকে একটা ড্রয়ার মনে হতেই পারে। আমার অনুভবের কাছে ড্রয়ারই বেশি সত্য।" (ঐ)। এই চূড়ান্ত অণু-ব্যক্তিগত চিন্তা থেকেই বাস্তব, বস্তুর লোপ আসে : "তাই সাহিত্যের 'বিষয়' বা বক্তব্য এসব জটিল ব্যাপারে আমার কোনো উৎসাহ নেই।...আমার তো মনে হয়, গল্পে এখন নিজের মুখোমুখি বসে থাকা ছাড়া লেখকের আর কিছুই তেমন করার নেই। কারণ তার বাইরে তিনি যা জানেন, দেখেন বা বোঝেন তা সামাজিক; আন্তরিক নয়, ব্যক্তিগত নয়।" ('এই দশক', ত্রয়োদশ সংকলন)। "আজ গল্পকারের প্রধান সমস্যা কিভাবে লিখব, কি লিখব নয়।" (ঐ)। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, গল্পকারের বৃত্তটি ছোট হতে হতে আত্মমগ্ন, এমনকি আত্মরতির বালিতে এসে ঠেকেছে। অথচ খুব যে প্রত্যয়ের সঙ্গে, দৃঢ়তার সঙ্গে এসব কথা তাঁর

বলতে পারছেন তাও নয়। এঁদের একজনের সাক্ষ্য অনুযায়ী ১৯৭৪-এ শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের সাত বছর হয়ে গেল, অর্থাৎ ১৯৬৭-র সেই উল্লেখযোগ্য বছরে এই আন্দোলনের জন্ম—যুক্তফ্রন্টের মারাত্মক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অন্যদিকে নকশালপন্থী আন্দোলনের সূত্রপাত যে বছরে, অর্থাৎ বাঙালি মধ্যবিত্তর যে ভাঙন অসহায়তা কয়েক দশক ব্যাপী চলছিল, তারই চূড়া স্পর্শ ঘটছে যে সময়ে—সন্ত্রস্ত, বিমূঢ়, চরিত্রহীন মধ্যবিত্ত প্রতিক্রিয়ার হাতের পুতুল হল যার পরে। আর এই বিমূঢ়তাই, দোলাচল শিকড়হীনতাই, প্রকাশ পায় শাস্ত্রবিরোধীর আশ্রয়ে। এঁদের কারুর সাক্ষ্যে মনে হয়, আন্দোলনটা বুঝি গোষ্ঠীগত। "আমরা চাই আমাদের সমবেত প্রচেষ্টায় সাহিত্য আন্দোলনকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করতে।" কারুর উক্তিতে ব্যাপারটা মনে হয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঃ "ঈপ্সিতার মৃত্যু" গল্পের মধ্য দিয়ে আমি যে শাস্ত্রবিরোধিতার সূচনা করেছিলাম এবং পরবর্তীকালে 'এই দশক'-এর গল্প আন্দোলন ও আমার "বারান্দা"র গল্পগুলির মধ্য দিয়ে যা পরিণতি লাভ করেছে, আজ এই প্রথম শাস্ত্রবিরোধী উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তার দ্বিতীয় পর্যায় সূচিত হল।" আবার কেউ বলেন, তাঁরা সবাই একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী এমন ভাববার কোনো কারণ নেই। এঁরা প্রত্যেকে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী। কেউ ঐতিহ্য ব্যাপারটাকেই মানেন না, একটি শ্রেণীর চূড়ান্ত সংকটে যেমন হয় তেমনি মধ্যবিত্ত এই লোকদেরও নিজেদের স্বয়ম্ভু মনে হয় ঃ বাঙলা সাহিত্য তো তুচ্ছ। ("এক 'গোরা' উপন্যাসেই সব পাওয়া যাবে, সেকেলে উপন্যাসে বিষয়গত, ভাবগত, ভাষাগত, গঠন-প্রক্রিয়াগত যত রকম ত্রুটি আছে যত রকম হাস্যকর ব্যাপার আছে, সব কিছুর একটি অপূর্ব সংগ্রহ এই 'গোরা' উপন্যাস।" "কাঁটালপাড়া থেকে কলকাতা হয়ে লাভপুর পর্যন্ত চলে যান, সবারই বই পড়লে মনে হয় ভারি ভারি কতকগুলি উচ্ছ্বাসে ভরা শব্দ লাগালেই বুঝি বাঙলা হয়ে যায়।" এই গল্প লেখকের কাছে রবীন্দ্রনাথ এবং কুমুদ মল্লিক তুল্যমূল্য। এ না হলে বিদ্রোহ!) ফ্লব্যের, দস্তয়েভস্কি, কাফকা, প্রুস্ত, জয়েস, এমনকি বেকেট, ফরাসী নব্য ঔপন্যাসিক—সবাই এঁর মতে ডুবিয়েছেন! (অথচ এই লেখকের উপন্যাস 'অভিযোগ'-এ কাফকার গন্ধ বোটকা বাঙালি হয়ে এমন বেরোচ্ছে যে নাক টিপতে হয়, আর গন্ধের যে কি অসামান্য ভূমিকা তা শাস্ত্রবিরোধীদের গল্প পড়লেই বোঝা যাবে।) পক্ষান্তরে এরই পাশাপাশি যুক্তিসম্মত মাথা ঠাণ্ডা উক্তি এঁদেরই একজন করেন, "ঐতিহ্যের শেকড় যদিও প্রাচীনতার মধ্যে, প্রাচীনতাই ঐতিহ্যের প্রাণ কদাপি হতে পারে

না। অর্থাৎ ঐতিহ্য ব্যাপারটা প্রাচীনতা-সর্বস্ব ধরলে বোধহয় মস্ত ভুল করা হবে। তা ছাড়া ঐতিহ্য বলতে তো কোনো একটা অনড় কিংবা সুনির্দিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ কিছু বোঝায় না। ধারাবাহিকতাই এর প্রাণ। পুরনোকে আশ্রয় করেও নতুনের মধ্য দিয়ে ঐতিহ্য তাই নিয়মিত সজীব ও নতুনতর হয়ে উঠতে থাকে। এই ক্রমাগত হয়ে উঠতে থাকার কোনোরকম শেষ নেই বলেই ঐতিহ্যের সঙ্গে যে কোনোরকম নতুনতারও কোনো বিরোধ আছে বলে তো মনে হয় না। যে ঐতিহ্যের ক্ষেত্র যতখানি উর্বর, নতুনের সম্ভাবনা সেখানে ততটাই প্রবল। সেই অর্থে নতুন সাহিত্যের আন্দোলনমাত্রই সর্বত্র ও সর্বথা ঐতিহ্যের এমনি পরম্পরাগত বিকাশ বলতে হবে।" একদিকে যেমন এঁরা বলেন শিল্প-সাহিত্য কেবল আঙ্গিক বিবর্তনের ইতিহাস, বিষয় বা গভীর অর্থে কনটেণ্ট নিয়ে এঁরা মাথা ঘামায় না[১], তেমনি অন্যদিকে একজন চমৎকার বলেন; "শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্যের অর্থ আঙ্গিকের চর্চা নয়। কারণ, আঙ্গিক কোনো সময়েই বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, আঙ্গিকের মাধ্যমে প্রতিটি বিষয় প্রকাশিত হয়। আঙ্গিক এবং বিষয় এমন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত যে একটাকে আর-একটা থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়, যেমন চেয়ার বা টেবিলকে তাদের বিশেষ বিশেষ আকার থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়।" শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্যের প্রথম সংকলন থেকে এইসব উক্তি ও অন্যান্য উক্তি একসঙ্গে মিলিয়ে পড়লে বোঝা যায় গোষ্ঠীগতভাবে এদের ভাবনা-চিন্তায় কোনো ঐক্য নেই : পরস্পরবিরোধী কথা বলেন। আসলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে বিভ্রান্তি, বিমূঢ়তা—তাই এখানে ক্রিয়াশীল। শ্রেণী হিসাবে বাঙালি মধ্যবিত্তর যখন কিছুমাত্র যাথার্থ ছিল তখন ভঙ্গিমাত্র নয়—নতুন জীবন-বোধের অঙ্গীকারের কথা তারা বলত, সে উত্তরাধিকার বা চিন্তার অভ্যাস শাস্ত্রবিরোধীরা কাটাতে পারছেন না, অথচ শ্রেণীর উদ্‌ভ্রান্তিতে, ইতিহাসের তীব্র তালফেরতায় এরা বাস্তবের মুখোমুখি হতে না পেরে চূড়ান্ত ব্যক্তিগতর কূপে আশ্রয় খুঁজছেন। প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রবিরোধী বলতে তাঁরা কি বোঝেন তাই স্পষ্ট নয়—অনেক 'না'-এর কথা তাঁরা বলেন, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট 'হ্যাঁ' নেই। এঁরা বুঝতে পারছেন যে মধ্যবিত্ত ভাষা সার্কাসের ক্লাউন, নেতা, পুরনো গৃহিণী, সাংবাদিক বা রেডিয়োর সংবাদদাতা, ক্যাবারে নর্তকী বা সোনাগাছি

---

১ একজনের মতে আবার কথাসাহিত্যের ইতিহাস নায়কের বিবর্তনের ইতিহাস—এই নায়কই নাকি গল্পকে কবিতা হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করবে। লক্ষণীয় স্ববিরোধ : বিষয় নেই, নায়ক আছে।

কর্তৃক ব্যবহারে দুর্নীতিগ্রস্ত, জীর্ণ, অন্তঃসারশূন্য ; এর প্রতিপক্ষে "একজন শাস্ত্রবিরোধী লেখক তার সমস্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে তৈরি থাকবে, কিন্তু ইচ্ছে করলেই লিখতে পারবে না। এ ব্যাপারে কিছুটা দৈবের ওপর নির্ভরশীল। তাই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে লিখতে না পারার এক অদ্ভুত নারকীয় অথবা স্বর্গীয় যন্ত্রণায় জ্বলতে থাকবে এবং তার সমাধিতে অথবা মশান-ফলকে শুধু লেখা থাকবে : লেখা হচ্ছে না, লেখা হল না, লিখতে পারছি না।" নিজশ্রেণীর চরম চরিত্রহীন বিমূঢ়তাতেই এই বন্ধ্যাত্ব আসে : এমনি করেই গ্রীক অ্যাটমের মতো যে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে এই সময় বড় করে দেখা হয়, প্রস্তুত করা হয় চরম প্রতিক্রিয়ার মধ্যবিত্ত পটভূমি, তার সম্পর্কে, তার অনুভূতি-বোধ সম্পর্কেও নির্দিষ্টতা আসে না : "আজ সারাদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি হলে আমার খুব ভালো লাগে। নাকি আমার খুব খারাপ লাগে আমি বুঝতে পারি না। অনেক সময় আমি অনেক কিছু ঠিক বুঝতে পারি না। যেমন আমার শীত ভাল লাগে না গ্রীষ্ম ভাল লাগে, আমি ধরতে পারি না। আমার চা ভালো লাগে না কফি ভালো লাগে; আমার একলা থাকতে ভালো লাগে না খারাপ লাগে, সিগারেট খেলে কেমন লাগে, মালার সঙ্গে দেখা হলে কেমন মনে হয় অথবা অনেকদিন মালার সঙ্গে দেখা না হলে কি বোধ হয় ইত্যাদি সব সময় আমি ঠিকমত বুঝতে পারি না।" (বৃষ্টি : সুনীল জানা)। যে উপন্যাসটিকে শাস্ত্র-বিরোধিতার দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা বলে দাবি করা হয় তাতেও "নায়ক" বলে : "সবাই বুঝতে পারে কোনটে বেশি জরুরি, কি আগে করতে হবে, কি পরে করতে হবে, সবাই জানে, আমিই কেবল জানি না, আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারি না, আমার সব কিছু কেমন গুলিয়ে যায়।" ('অভিযোগ' : অমলচন্দ)। বস্তুত "কেমন গুলিয়ে যায়" এই শব্দকটি মধ্যবিত্তশ্রেণীর লেখকের অকপট স্বীকৃতি, একদিক থেকে মধ্যবিত্ত বাস্তবেরই ছবি। আর ~~সেই কারণেই~~ কি শাস্ত্রবিরোধী গল্পকারদের অধিকাংশ কুশীলবকেই মনে হয় মানসিকভাবে অসুস্থ ? যে পরিপ্রেক্ষিত-চেতনায় পট-সংলগ্নতায় এই কুশীলবরা হয়ে উঠতে পারতেন মধ্যবিত্ত বিমূঢ়তার যথার্থ প্রতিনিধি, তার অভাবে এঁরা হয়ে উঠেছেন কিন্তু অসুস্থ মনের মনোরোগের রুগীমাত্র।

ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, 'শাস্ত্রবিরোধী' 'এই দশক'-এর গল্পকাররা সচেতন চিন্তাভাবনায় ঐক্যবদ্ধ নন, প্রায় পরস্পর-বিরোধী টানাপোড়েনে দ্বিধাবিভক্ত, অথচ আন্দোলন, গোষ্ঠীবদ্ধতার কথা তাঁরা বলেন। নিজ শ্রেণীর

বিমূঢ়তায় আক্রান্ত এই গল্পকারদের গল্পও সেই বিমূঢ়তাতেই আশ্রিত। আর মাঝে মাঝেই এঁরা এঁদের গল্পের নতুনত্ব সম্পর্কে অঙ্গুলি সংকেতে ব্যস্ত। অথচ-এঁদের অনেক বৈশিষ্ট্যই আমরা আগেই কি বাঙলায়, কি ইংরেজীর মারফৎ ইয়োরোপীয় সাহিত্যে পেয়েছি। ফ্রান্সের avant-garde সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে, স্যুররিয়ালিস্টদের প্রসঙ্গে Roger Shaltuck বলেছেন : the call of childhood, humour as a major discipline, direct-use of unconscious and dream materials, acknowledgement of the essential ambiguity of experience and the empolished style of juxtaposition that suited those preoccupations. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অস্তিত্ববাদে বা নব্য উপন্যাস আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে অভিজ্ঞান ও অ-সত্তার প্রাচীন সমস্যা, গল্পের উপন্যাসের গঠনকৌশলে আকস্মিকতার আমদানী ও শিল্পর জন্য শিল্প-র তত্ত্বর পশ্চাদপসরণের পর সামাজিক দায়বদ্ধতা। শাস্ত্রবিরোধী গল্পে এই সব বৈশিষ্ট্য কোনো না কোনো ভাবে উপস্থিত। অর্থাৎ সেই ১৯২০র দশক থেকে যে সব বৈশিষ্ট্য প্রচলিত শাস্ত্রবিরোধীরাও সেই বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত, নতুন কিছু নয়। কেবল ঐ সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা বোধহয় এঁরা মানেন না। (যদিও বলেন, সামাজিক অস্তিত্ব কিংবা গণচেতনা কি আকাশের তারা ? উঠতে, বসতে, ঘরে বাইরে, মার খাওয়া মার দেওয়ায়, প্রেমে, বিরহে—কোথায় না এরা আছে ?) বাঙলাভাষাতেও এ সবের চর্চা ইতিপূর্বেই নানা ভাবে হয়েছে : 'ছোট গল্প : নতুন রীতি,' 'ছোট গল্প : নব নিরীক্ষা' ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এই দশকের চিন্তাভাবনা ভালোভাবেই প্রচারিত হয়েছিল, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায় বা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে শাস্ত্রবিরোধীদের গল্পের অনেক বৈশিষ্ট্যই বিধৃত ছিল, এক হিসেবে এঁদেরই ধারাবাহিকতা এঁরা, কিন্তু এঁদের পটচেতনা, ইতিহাসবোধ বা নেহাৎ তীব্রতার শক্তি উত্তর-সাতষট্টি পর্বের শাস্ত্রবিরোধীদের নেই। এখনও পর্যন্ত এমন শক্তিমত্তার পরিচয় এঁদের গল্পে পাওয়া যায় নি যাতে দীর্ঘ ও গভীর মনোযোগের দাবি এঁরা করতে পারেন। তবু শাস্ত্র-বিরোধীদের গল্পে যে বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিশ্রুতিময়, বাঙলা গল্পে অ-পূর্ব মনে হয়েছে—সেগুলির উল্লেখ করা গেল।

[ক] শাস্ত্রবিরোধী গল্পকাররা প্রত্যক্ষত এখনও পর্যন্ত সাহিত্যগোষ্ঠীই। তবে নিজ পটভূমি ও যুগ তাঁদের কাছ থেকে যে ধরনের কাজ বা গল্প আশা করে, তার অকার্যকারিতা সম্পর্কে তাঁরা নিশ্চিত। কিন্তু পাতি-বুর্জোয়াসুলভ-

এক ধরনের ক্রোধ ও ধ্বংসপ্রবণতা এঁদের মধ্যে আছে। যেমন রমানাথ রায়ের 'আগুন, আগুন', আশিস ঘোষের 'খুন', 'চাকু' ইত্যাদি গল্প। রমানাথ রায়ের গল্পটিতে নিজের বাড়ি, ট্রাম বাস ট্যাক্সি, গাড়ি, বাড়ি, দোকান, টাটা সেণ্টার, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল, যাদুঘর, ফোর্ট, মনুমেণ্ট, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, রাইটার্স বিল্ডিং, নিউ সেক্রেটারিয়েট রাজভবন ···সব তাতে আগুন ধরিয়ে, "আগুনের ভিতর দিয়ে আমি ছুটতে লাগলাম।" লক্ষণীয়, নিজের গায়ে আগুন লাগানো হল না, অর্থাৎ পরিবেশের বিরুদ্ধেই ক্রোধটা প্রকাশ পাচ্ছে। আশিস ঘোষের গল্প দুটিতেও এই ক্রোধ ঝলসে ওঠে: "রাস্তার পাশে সুন্দর সব বড় বড় বাড়ি। দেখলেই থাকতে ইচ্ছে করে। আর আমাদের বাড়িটা? পুরনো। স্যাঁতসেঁতে। দেয়াল জুড়ে উইয়ের বাসা। জামাকাপড়, বই-পত্তর সব কেটে নষ্ট করে দেয়। বাড়ির কলে জল ওঠে না। অথচ একটু বৃষ্টিতেই বাড়ির চারদিকে জল দাঁড়িয়ে যায়। বাড়িওয়ালাকে কত আর বলবো। লোকটা কালাও না, কানাও না। সবই দেখে। শোনে। আবার কিছুই যেন জানে না। দেবো আজ ব্যাটাকে শেষ করে।" ('চাকু')। বস্তুত শাস্ত্রবিরোধীদের গল্পে যে চরম নিশ্চেষ্টতার একটা ছবি পাওয়া যায় বা শব্দের ডিগবাজী লক্ষ্য করা যায়, তার মধ্যে এই ক্রোধটি একটু বেমানান হলেও প্রতিশ্রুতিময়। এই লক্ষ্যভ্রষ্ট ক্রোধের চেতনাই এঁদের নিয়ে যেতে পারে সেই সামাজিক দায়বদ্ধতায়, যার অভাবে গল্পগুলি হয়ে উঠছে রক্তহীন। এখানে একটা কথা পরিষ্কার বলা ভালো, শব্দগত বা আঙ্গিকগত যে পরীক্ষানিরীক্ষার কথা এঁরা বলেন তা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে ঐ ইতিহাস-সময়-চেতনার সূত্রেই। টেকনিকের চর্চাও লেখককে নিয়ে যেতে পারে জীবনের কূলে। আর এক্ষেত্রে বোধহয় লুকাচপন্থীদের থেকে ব্রেখটের বক্তব্যই বেশি যুক্তিসম্মত: উত্তর-বুর্জোয়া পর্বের কাফকা, জয়েস বা প্রুস্তকে কেবল অবক্ষয়ের প্রতিনিধি হিসাবে অপাংক্তেয় করা ঠিক নয়। দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে সাহিত্যিক বিবর্তনে ঐ রকম কোনো সাদা-কালো ক্যাটিগরি নেই। উত্তর-বুর্জোয়া পর্বের লেখকেরা যে টেকনিকের চর্চা করেছেন তাতে বাস্তবের স্রোতের অনেকটাই উদ্ঘাটিত, তবে ঈপ্সিত সার্থকতা তাঁরা পান না তার কারণ তাঁদেরও দৃষ্টি যান্ত্রিক, দ্বান্দ্বিক নয়। শাস্ত্র-বিরোধীদের সীমাবদ্ধতা তাঁদের টেকনিক নয়, ঐ দ্বান্দ্বিক দৃষ্টির অভাব। যাতে ভালোবাসাও যেমন তাৎপর্যহীন, ক্রোধও তেমনি লক্ষ্যভ্রষ্ট, যে দৃষ্টির অভাবে উদ্‌ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি পর্বকেই মনে হয় চূড়ান্ত।

[খ] শাস্ত্রবিরোধী গল্পকারদের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ইন্দ্রিয়চেতনা : বিশেষত শব্দ গন্ধ ইত্যাদির প্রায় স্পর্শযোগ্য বর্ণনা। রমানাথ রায়ের 'গন্ধ' 'বোবা', অমল চন্দের 'জল', সুব্রত সেনগুপ্তের 'চারিদিকে', শেখর বসুর 'খেলা', কল্যাণ সেনের 'শব্দ' ইত্যাদি গল্পে এই অতি-ইন্দ্রিয়বোধের পরিচয় রয়েছে। এই অতি-ইন্দ্রিয়বোধ অবশ্যই গল্পের পরিসরকে একেবারে ব্যক্তিগত করে ফেলার প্রক্রিয়া থেকেই এসেছে। অন্ধের যেমন স্পর্শচেতনা, শব্দচেতনা, গন্ধচেতনা প্রবল হয়—শাস্ত্রবিরোধী গল্পের কুশীলবদেরও তাই। তাঁরা যেন বন্ধঘরে আবদ্ধ—ফলে তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়ের অধিকারী। কিছুটা আতঙ্কগ্রস্তও—উত্তর সাতষট্টির মধ্যবিত্তর মতোই কারণে-অকারণে ভীত : কখনও জন্মদাগ নিয়ে, কখনও শব্দ শুনে, কখনও কেউ ডাকতে আসছে জেনে। কিন্তু যখনই এই ইন্দ্রিয়বোধ ব্যক্তিগত সীমা অতিক্রম করে ছড়িয়ে যেতে পারছে, তখনই তাৎপর্যপূর্ণ গল্প সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন, কল্যাণ সেনের 'শব্দ'। একটি অফিসের কনটেন্টে যখন শব্দটা ধরা হল, তখনই তা প্রায় প্রতীকী হয়ে উঠেছে—একগাদা মধ্যবিত্ত মানুষ শব্দ খুঁজছে, আর শব্দটা বেজেই চলেছে, তার উৎস আর পাওয়া যাচ্ছে না। সর্বদিকে সব কিছু ছাপিয়ে ঐ শব্দ। যেমন আশিস ঘোষের 'যদি' গল্পে দরজা ভেঙে, দেওয়াল ভেঙে বাইরে আসার প্রাণান্তকর চেষ্টায় অনেক কিছু আভাসিত; যদিও জানলা ভাঙবে না, দরজা ভাঙবে না, দেওয়ালের ইঁট খসবে না—এই সিদ্ধান্তেই আশিস ঘোষ আপাতত পৌঁছেছেন—তথাপি এর মধ্যেই ভবিষ্যতের বেরিয়ে আসার কথাটি বোধহয় লুকিয়ে আছে। কল্যাণ সেনের গল্পই প্রমাণ করে উপযুক্ত চেতনায় তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়চেতনাও ব্যক্তিগতর কূপ থেকে বেরিয়ে বাইরের জীবনকে ধরতে পারে। ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রাথমিক ব্যাপার, কিন্তু প্রকৃতি-পরিবেশ-অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সংযোগে-বিয়োগেই তো তার অস্তিত্ব, তাৎপর্য বা তাৎপর্যহীনতা। বর্তমানের ভাঙনের নিরাসক্ত ছবিও তো তখনই আঁকা যাবে—যখন বর্তমানের অর্থহীনতা, শূন্যতাকে বিভিন্ন সম্পর্কের অর্কেস্ট্রায় বাজানো হবে।

[গ] অবশ্য শাস্ত্রবিরোধী গল্পকারদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বস্তুচেতনা। একদিক থেকে এটি একটি প্যারাডক্সই—বিষয়কে মানতে চান না এঁরা, কিন্তু নির্জীব বস্তুকে সজীব করে তোলেন, চতুর্দিকের ইঁটকাঠ-পাথর দৈনন্দিন আসবাবপত্রকে করেন গল্পেরই কুশীলব। সাম্প্রতিক ফরাসী গল্প-উপন্যাসে, শুনতে পাই, এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে বাঙলাভাষায়

এটি নতুনই বলতে হবে—এযাবৎ প্রকৃতি যে ভূমিকা পালন করেছে, এঁদের গল্পে দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র সেই ভূমিকা পালন করছে। বিষয়কে বাষ্পের মতো উড়িয়ে দিতে গিয়ে, শাস্ত্রবিরোধীরা বস্তুতে আরও স্পর্শযোগ্য, সত্তাসম্পন্ন করে তুলেছেন। অমল চন্দর একাধিক গল্পে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়ঃ 'একসঙ্গে', 'কালো পা', 'আসবাব'। শেখর বসুর 'কেবিন', সুনীল জানার 'স্টিল-লাইফ', 'কম্পোজিশন ১' ও আরও অনেকের গল্পেই এই বস্তু-চেতনা কাজ করছে। "হাসির ধাক্কায় পার্টিশন মচমচ করে উঠল। বেঞ্চি নড়ল, টেবিল কাঁপল, সুইং-ডোর খুলল। ওপাশের চোখের-মতকে হঠাৎ চোখ বলে মনে হল। পাখার ব্লেডগুলো হঠাৎ জোরে ঘুরতে লাগল। সেই হাওয়ায় আলমারির ভেতর পাহাড়ের ছবি নেচে উঠল। হাত ঢুকিয়ে সেটা থামাতে গিয়ে আলমারির পাল্লাদুটো খুটখুট, বোয়েম, দড়ি—ঠুং, খসখস,
—এবার বিশ্বাস হলতো ?" ('কেবিন')
"এখানে আমি, আঙটি ও ঘড়ি একসঙ্গে থাকি। আমরা কথা বলতে পারি না, কেননা…। আমরা শুনতে পাই না, কেননা…। আমরা দেখতে পাই না, কেন না…। আমি আঙটির হাতে চিমটি কাটি, আঙটি ঘড়ির হাতে চিমটি কাটে, আমরা বুঝতে পারি এবার খেতে যাবার সময়।" ('একসঙ্গে')
"একজন শুয়ে একটা খাট খাটের ওপর একজোড়া চোখ…চেয়ার নড়ে ওঠে—কালো পা—একজন বসে একটা চেয়ার চেয়ারের ওপর একজোড়া ঠোঁট…টেবিল নড়ে ওঠে—কালো পা—একজন দাঁড়িয়ে একটা বারান্দা বারান্দার ওপর এক-জোড়া হাত…খাট নড়ে ওঠে—কালো পা—" ('কালো পা')
"এমন সময় তিনটে কাপ খালি দুটো সিগারেট শেষ এবং তখনও কোনো একজন কিংবা দুজন কিংবা তিনজন না আসায় শুধু তারা তিনজন তিন চেয়ারে তিনজন তিনটে চেয়ার খালি।" ('কম্পোজিশন ১')

উপরিউক্ত তিনটি উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায়, চতুর্দিকের বস্তুকে তাঁরা কেবল পরিবেশ সৃষ্টির জন্যই ব্যবহার করেন না, তাঁদের স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট করে তুলতে চান। শাস্ত্রবিরোধীদের নিজসীমা উত্তরণের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে এই বস্তুনিষ্ঠতার মধ্যেই—কংক্রীটের প্রতি নিষ্ঠাই তাঁদের বিষয়হীনতার, ব্যক্তিগত ভাবনার উদ্বায়ু বিমূর্ততা থেকে মুক্তি দেবে। এর সঙ্গেই জড়িত তাঁদের তীক্ষ্ণ-তীব্র ইন্দ্রিয়চেতনা। কবিতা সম্পর্কে আলোচনায় এঁদের একজন লিখেছেন, বস্তুকে অবিকল উদ্ধারের এমন উপায় যখন পাওয়া গেছে তখন এই পদ্ধতির

সাহায্যে শব্দ দিয়ে বা শব্দের সহযোগে এই প্রকরণে কবিতার নতুন ভাষা তৈরি হবে।" গল্পের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হয়তো অন্যরকম, কিন্তু বস্তুকে উদ্ধারের মধ্য দিয়েই মানুষের কাছাকাছি আসার পথ আছে। বাইরের বস্তুর নিজস্বতাকে স্বীকার করলেই বহির্মুখী হতে হয়, অনুব্যক্তির জলাভূমি থেকে বেরিয়ে বাইরের নদী পাহাড় পাথর ইঁট কাঠ টেবিল চেয়ার দরজা জানলা ছাতা আঙটি বোতাম ইত্যাদির সূত্র ধরে আরও ব্যক্তির কাছে পৌঁছনো যেতে পারে, আর তখনই নতুন টেকনিকের, আঙ্গিকের তারে এই বিরাট জটিল জীবনকে ধরা যায়। নিছক 'শাস্ত্রবিরোধী' না থোক সদর্থক সমর্থকের ভূমিকায় আসা যাবে। নচেৎ আত্মরতিতে, মুহূর্ততত্ত্বে মুমূর্ষার ক্ষিপ্রতালেই এই শিল্পনিষ্ঠ গল্পকাররা ফুরিয়ে যাবেন। আর সেটা ক্ষতিই, কারণ চতুর্দিকের পরিকীর্ণ বিকৃত আনন্দমেলায়, আনন্দলোকে, আনন্দবাজারে এঁদের নিরানন্দও অন্তত কিছুটা সিরিয়সনেসের হাওয়া আনছে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। তবে এরাই যখন বড় পত্রিকায় লেখেন, তখন আর শাস্ত্রবিরোধিতা দেখি না, বিদ্রোহও উধাও। এটা যেমন দুঃখের, তেমনি গভীর সংকটেরই বহিঃপ্রকাশ।

জীয়ান পালা

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

দোহার ১। সোনার চান্দ লখিন্দররে বাঁচাইয়্যা গ্যাও গো গায়েন, জীয়্যাইয়্যা তোলো। সোনার অঙ্গ তার কালি বন্ন হইল। সনকার বুক ফাটে। দশ গেরামের লোকে কাইন্দ্যা মরে।

গায়েন। কিন্তু চান্দের চোখে তো জল নাই।

দোহার ২। বাজ-পড়া বিক্ষে জল সব শুকাইয়্যা যায়।

দো ১। গায়েন গো, বাসর-পালা যে মরণ-পালা হইল। লখিন্দররে পরান গ্যাও গো। বাসর হউক বাঁচনের পালা।

গা। তাই তো করবার চাই। কিন্তু পারি না। পুষ্প সাজাই বাসরে, তার থিক্যা বাইরয় সপ্প।

দো ১। সপ্প থিক্যা বাইর করো পুষ্প। মরণের মইধ্যেও তুমি বাঁচন আনবার পারো।

গা। পারতাম। আইজ বাঁচনের মইধ্যেও দেখি মরণ। পুষ্পের মইধ্যে সপ্প।

দো ২। তুমি বুড়া হইছ গো গায়েন।

দো ১। তোমার বেভ্রম হইছে।

গা। তা হবার পারে। ভদ্র পঞ্চজন, আপনারা পালাটা শোনেন, তারপরে কন—বেভ্রম কার, কোথায়? ওরে ভাসান পালাটা একটু ধইর‍্যা দে। তাই ধইর‍্যা যাব জীয়ান পালায়।

দো ১। মান্দাস ভাসে রে, বেহুলা ভাসে।

দো ২। লখিন্দর কোলে লইয়্যা, সতী ভাসে রে, সতী ভাসে।

গা। বেহুলার মাথায় সিঁদুর। নতুন বৌর সাজ আর গহনা তার অঙ্গে। গ্যাখলে মনে হয়, বাসরের হাসি-গান-নাচের সে-সাজ। কিন্তু বেহুলা বাসরবিধবা। আবার পতির মরণের পরেও সে শাঁখা ভাঙ্গে নাই, সিঁদুর মোছে নাই, পরে নাই সাদা সাজ। বেহুলা চিরসধবা।

দো ১। মান্দাস চলে রে, বেহুলা টলে।

দো ২। তীরের সকলে হায় হায় কইর‍্যা ওঠে।

গা। বেহুলা কয়—মা, আশীর্বাদ করো।

দো ১। সনকা কয়—সিঁদুর লইয়্যা ফিরো।

গা। বেহুলা ডাকে—বাপো।

দো ১। বাজ-পড়া বিক্ষ জাইগ্যা ওঠে। কয়—জয় লইয়্যা আইসো মা।

দো ২। গাঙ্গুড়ের জল ফুইল্যা ফুইল্যা ওঠে। আছড়াইয়্যা পড়ে মাটির উপর। ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ মান্দাসে।

দো ১। জয় লইয়্যা আইসো। জয় লইয়্যা আইসো।

গা। ভাসতে ভাসতে উজানির ঘাটে আসে মান্দাস। বেহুলারে দেইখ্যা তার বাপ-মা কাইন্দ্যা ওঠে। কই ভাইস্যা যাস, পাগল মাইয়্যা। এইখানে থাক। ঘৃত-অন্নে থাক।

দো ১। না মা। যদি সতী হই, তয় পতিরে লইয়্যা ফেরব।

দো ২। পাগল মাইয়্যা, এ কি পারে কেউ?

দো ১। আমি যে সতী, মা। যে সৎ, সে মড়া মানুষও জীয়াইতে পারে। দেবতাদের শুধাব—বাসর থিক্যা পতিরে ছিনায়্যা লও ক্যান, কী তার দোষ, কী আমার দোষ? শুধুই তোমাগো খেয়ালে সংসার চলবে?

গা। মান্দাস ভাইস্যা চলে। গাঙ্গুড়ের পাড়ের সে মানুষ। গাঙ্গুড় তারে কোলে লইয়্যা বিদায় দিয়্যা আসে বড় নদীতে। গাঙ্গুড় জলে ভাইস্যা খাড়াইয়্যা থাকে—সনকার মতো। বড় নদীর ঢেউ ধাক্কা দিয়্যা ফ্যালতে চায় লখিন্দররে। এ নদীর কূল নাই। যত দূর চাও, শুধু জল আর ঢেউ। জনমনিষ্যির নামগন্ধ নাই। সেই নির্মনিষ্যি অতল জলের উপরে ভাইস্যা চলে—একা বেহুলা। কোলে লখিন্দর। মরা, বিষে কালি, শীতল।

দো ১। পাড়ে বড় জঙ্গল। জঙ্গলে ঘন অন্ধকার। অন্ধকারে বাস করে নিদয় পশুরা। একটা বাঘ আইস্যা খাড়ায়। চোখে তার ক্ষুধা—খাবে লখিন্দররে, বেহুলারে। জল থিক্যা মান্দাসের উপর মুণ্ডু বাড়ায় কুমীর। জিভ তার লকলক করে। ঝকঝক করে করাতের মতো দাঁত।

গা। বেহুলা কয়—পতিরে খাইয়ো না। আমি পতিরে জীয়াইতে যাই। আমারে খাইয়ো না। আমি দেবতাগো শুধাব—ক্যান আমার পতিরে তারা কাটছে, কী তার দোষ!

দো ১। বাঘ মাথা নিচু কইর‍্যা বনে ঢোকে।

দো ২। কুমীর মাথা নামায় জলে।

গা। কাক-চিল-শকুনি উপর-আকাশ থিক্যা শাঁ কইর‍্যা নামে। ছোঁ মাইর‍্যা ছিঁড়্যা লইতে চায় লখিন্দরের শরীর।

দো ১। বেহুলা বুকে আগলায় পতিরে।

গা। স্রোতের পথে একের পর এক দেখা দেয় গোদা, আপু, ধনা, মনা।

দো ১। সবাই চায় বেহুলারে।

দো ২। কারুর আছে গায়ের জোর। কারুর কড়ির জোর। কেউ বা কৌশলী।

দো ১। কেউ লোভ দেখায়। কেউ জোর করে। কেউ টোপ ফেলে।

দো ২। প্রতি ঘাটে এরা আছে। বাঘের থিক্যা বড় এগো মাংসলোভ। কুমীরের থিক্যা বেশি এগো দাঁতে ধার।

গা। বাঘ-কুমীরের হাত থিক্যা বাঁচছিল বেহুলা। কিন্তু এগো হাত থিক্যা বুঝি নিস্তার নাইরে নিস্তার নাই।

দো ১। বেহুলা কয়—দোহাই তোমাগো। এক পতি থাকতে কি নারী অন্য পতি নেয়!

দো ২। হাইস্যা ওঠে গোদা আর ধনা-মনার দল। বলে—ও পতি তোমার নাই গো কইন্যা। পতির পচা মাংসটা আছে। পচা মাংস ছাড়ো। আমরা তাজা মাংস দেব।

দো ১। আমি অসৎ হইতে পারি না। অন্যরে পতি নিলে নারী নষ্ট হইয়া যায়।

দো ২। তুমি এখন অরক্ষিতা নারী। তুমি না হয় তাই হইলা। তুমিও আরামে থাকবা, আমরাও আরামে থাকবো।

গা। মুখে তাদের লালা ঝরে। তারা আউগ্যায় বেহুলার দিকে। মানুষরে এরা ভালো থাকবার দেবে না। আগুনের বেড়া বেহুলার চার দিকে—আর বাঁচন নাই তার।

দো ১। বেহুলা কয়—তোমরা সবাই আমার দিকে আউগাইতেছ ক্যান?

দো ২। তাঁরা চেঁচায়—আলিঙ্গন ছাও, আলিঙ্গন ছাও।

দো ২। আলিঙ্গন তো সবাইরে একসাথে দেওয়া যায় না।

দো ২। তা ঠিক। কে আগে যাবে? কে আগে যাবে? আমি আগে যাব। আমি আগে।

গা। তারা মারামারি করতে লাগল। মরল কয়েকটা। জখম হইল

কয়জন। কিন্তু নিব্বংশ হইল না। তারা আউগাইতে লাগল। তাদের মুখের লালার সঙ্গে মেশছে রক্ত।

দো ১। বেহুলা কয়—যে আগে আসবা সে এট্টু সাবধানে আইসো।

দো ২। ক্যান ? ক্যান ? সাবধান ক্যান ?

দো ১। আমায় বুকের মধ্যে কালনাগিনী লুকাইয়্যা ঘুমায়। নাড়া পাইলে সে জাইগ্যা ওঠবে। আলিঙ্গন পাইলে সে চুমা দেয়।

দো ২। ওরে পালা, প্যালা। এটা সাক্ষাৎ মনসা।

গা। ভাইস্যা চলে বেহুলার মান্দাস। রোইদে পোড়ে। বিষ্টিতে ভেজে। ঝড়ে উলট-পালট করে। মান্দাস পচে। লখিন্দরের হাড়-মাসে পচা ধরে। খসে, গলে। বদ গন্ধ ছড়ায়। তবু পুণ্যবতী বেহুলা চলে। সে দেবতাদের মুখামুখি হবে।

দো ১। বেহুলা শ্যাষে পৌছায় দেবলোকে। দেবতারা নাক কোঁচকায় লখিন্দর দেইখ্যা।

দো ২। বেহুলারে দেইখ্যা বড়ই গদগদ হয়। যোবতী বেহুলা।

গা। কী হেতু আগমন তোমার—শুধায় দেবতারা।

দো ১। আমার পতির মরণের কী হেতু ?

দো ২। পূজা দেয় না।

দো ১। দেয় না তো বাপে।

দো ২। ঐ একই হইল।

দো ১। বাপের দোষে ছাওয়ালের মরণ হয় কী কইর‍্যা ?

দো ২। হয়, হয়, দেবতাদের আশীর্বাদে সব হয়।

গা। দেবরাজ ইন্দ্র বলেন—আমি বড় কামপীড়িত। তাড়াতাড়ি ওর পতির প্রাণ দিয়্যা ছ্যাও।

দো ২। অন্য দেবতারা কয়—কিন্তু পূজাটা।

গা। ইন্দ্র কয়—যা হয় একটা ফুল ছিটাইয়্যা দিয়ো গো সোন্দরী। কাছে আইসো।

দো ১। বাঁ হাতে দিলে হবে ?—শুধায় বেহুলা।

দো ২। এক দেবতা খেঁকাইয়্যা ওঠে—বাঁ হাত ! বাঁ হাতে দিলে আমাগো অসম্মান হবে না !

গা। দেবরাজ কয়—না, না, হবে না। সোন্দরী কাছে আইসো। আলিঙ্গন দাও।

দো ১। আরো কয়জন দেবতা চনমন কইর‍্যা ওঠে। বোঝা যায়, তারাও পীড়িত। আউগাইয়্যা আসে তারা আগুনের বেড়ার মতো।

দো ১। এ কী করেন আপনারা দেবতা হইয়্যা। আমি সতী।

গা। তয় তো অসুবিধাই নাই। আমাগো ছোয়ায় অসতীও সতী হইয়্যা যায়। তুমি তো দেবী হইয়্যা যাবা। বড় সময় নষ্ট হইত্যাছে। আইসো।

দো ১। আমার বুকের মইধ্যে কালনাগিনী লুকাইয়্যা ঘুমায়। নাড়া পাইলে সে জাইগ্যা ওঠবে।

গা। ও নাগিনী আমাগোই দেওয়া। ও আমাগো দংশাবে না। বরং তুমি আমাগো কাছে না আইলে ও তোমারেই দংশাবে।

দো ১। আমারে সতী থাকবার দ্যাও।

গা। তয় থাকো সতী। ঐ মড়া পতি লইয়্যা ফিরা যাও।

দো ১। আমি যে বড় মুখ কইর‍্যা কইয়্যা আইছি—পতিরে জীয়াইয়্যা ফেরব।

গা। ফির‍্যা যাও। সনকা তোমারে ঘরে বরণ কইর‍্যা তোলবার জইন্যে পিছ্যা হাতে খাড়াইয়্যা আছে।

দো ১। না, না। আমি পতির জীবন চাই।

গা। তাইলে কিছু দাম দিতে হয়।

দো ১। হায় রে! বাঘ-কুমীরে রেহাই দেয়, মানুষেও রেহাই দেয়, কিন্তু দেবতার হাতে রেহাই নাই।

দো ২। একজন বুড়্যা দাড়িওয়ালা দেবতা দেবরাজের কানে কানে কয়—দেবরাজ, ব্যাপারটা একটু সম্পর্ক-বিরুদ্ধ হইয়্যা পড়তেছে।

গা। ক্যান, ক্যান?

দো ২। বেহুলা আপনের কন্যাতুল্য।

গা। কন্যা! কী গেরো! অমন সোন্দরী—কন্যা হইতে গেল ক্যান!

দো ২। হ্যাঁ, মহারাজ, ইনি শাপভ্রষ্ট দেবী।

গা। তবে বিনা মূল্যে মৃতের পরাণ লইয়্যা যাবে?

দো ২। অন্য মূল্য ধইর‍্যা লন।

গা। কী মূল্য? এর বিকল্পে আর কোনো মূল্যই হয় না।

দো ২। তা ঠিক। তবু—যতটা হয়। সর্বনাশ সমুৎপন্ন হইলে পণ্ডিতেরা অর্ধেক পরিত্যাগ করেন।

গা। বেশ, ওকে নাচতে বলো।

দো ২। হ, নাচবো। কয় বেহুলা।

গা। লাস্য নৃত্য চাই। অর্ধেক দাম য্যান ওঠে।

দো ১। রুমঝুম রুমঝুম নূপুর বাজে। বেহুলা নাচে। সুঠাম তরুতে বাতাস লাগে। পা থির, উর্ধ্ব অঙ্গ দোলে। তরুর পাতার মতো কেশ-বেশ ঝিরঝির কইর্যা ওঠে।

দো ২। বেহুলা নাচে রে, বেহুলা নাচে। সব্ব অঙ্গ নাচে।

দো ১। বেহুলা মুখ তোলে আকাশের দিকে—সূয্যের মুখ চাইয়া ফুল য্যান ফুইট্যা ওঠে।

গা। চারিদিকে দেবতা। তাদের চোখে লালা ঝরে।

দো ১। ফুলের গায়ে বিষরস পড়ে। পাপড়ি গুটাইয়া যায়। মরা পতির দিকে তাকাইয়া বেহুলা আবার পাপড়ি ম্যালতে চেষ্টা করে। কিন্তু বিষরসের বিরাম নাই। পতি গো, তোমার পরাণের জইন্যে এ দাম আমার দিতেই হবে।

দো ২। বেহুলা নাচে রে, সতী বেহুলা নাচে।

গা। দেবতারা অঙ্গ দোলায়, চক্ষু নাচায়। কেউ বা হঠাৎ চেঁচায়—ঘুইর্যা ফির্যা নাচো গো সতী, বসন উঘারি নাচো।

দো ১। বেহুলার তাল কাটে। পা চলতে চায় না।

গা। হা হা কইর্যা ওঠে দেবতারা। বলে—আমরা তাল দেই। আমাগো তালে তালে নাচো। আমরা সুর দেই। আমাগো সুরে সুরে নাচো।

দো ১। পতির মরা চোখ তাকাইয়া থাকে বেহুলার দিকে। পতিরে বাঁচাবার জইন্যে সতী তো সব করতে পারে।

দো ২। বেহুলা নাচে রে, বেহুলা নাচে।

গা। দেবতারা তাল দেয়। তাল মিল্যায় বেহুলা। দেবতারা উল্লাসে মাইত্যা ওঠে—বাহবা দেয়।

দো ১। তালটা য্যান বাইধ্যা ফেলে বেহুলার পা দুইটারে। তোলে, নামায়। টানে, ছাড়ে, আবার টানে।

গা। বেহুলা ভাবে—নাচবে না সে। কিন্তু চোখ পড়ে পতির দিকে। লখিন্দর কি নড়ে? তার শরীরে কি সাড় আসে?

দো ১। দেবতারা চেঁচায়—আর একটু লাস্য। আরো—আরো—

গা। বেহুলা মুখে হাসি ফোটায়। অঙ্গ দোলায়। চোখে আনে বিদ্যুতের ঝিলিক। কোমরে আনে ঢেউ।

দো ১। সাবাস! সাবাস! চেঁচায় দেবতারা।

দো ২। সতী নাচে রে, সতী নাচে।

গা। দেবতাদের চোখের লালা ঝরে—বেহুলার শরীরের উপর। অঙ্গ পোড়ে তার। জ্বলতে জ্বলতে বেহুলা নাচে, বেহুলা হাসে। দেবতারা চেঁচায়—আরো হাস্য, আরো লাস্য, আরো, আরো। বেহুলা ভাবে—থামবে। থামতে গিয়্যা ত্থাখে, পতির চোখ নড়ে, মুখ নড়ে, হাত নড়ে।

দো ১। দেবতারা চেচায়। উল্লাসে অশ্লীল। তাল দেয়। বেতালা। তবু সেই বেতালেই পা বান্ধতে হয় তার আবার। সব্ব অঙ্গ তরল কইর‍্যা বেহুলা ঢাইল্যা দেয় দেবতাগো ভাণ্ডে। দেবতারা ভাণ্ডে হুমড়ি খাইয়্যা চুমুক দেয়, চাটে। হঠাৎ বেহুলার চোখে মুখে হাতে কী এক অসোয়াস্তি। মড়া চাম-মাস আইস্যা লাগে য্যান গায়ে। বাইরে থিক্যা না। য্যান ভিতর থিক্যা। বেহুলা ঝড়ের মতো নাচে—ঝাইড়্যা ফ্যালতে চায়। কিন্তু সে যাবার না। মড়া চাম-মাস তারে কামড়াইয়্যা ধইর‍্যা আছে। না, এ যাবার না। এ তার নিজের চাম-মাস বুঝি—ধীরে ধীরে মইর‍্যা যাইতেছে, পইচ্যা যাইতেছে, গইল্যা যাইতেছে। কিন্তু তার অঙ্গ ছাড়ে না। দেবতারা চেঁচায়—নাচো বেহুলা। তালে তালে নাচো। আমরা তাল দেই। তালে নাচো। ঐ ত্থাখো পতি তোমার তালে তালে বাইচ্যা ওঠে।

গা। সত্যি তাই। লখিন্দরের মাথা কাপে। বক্ষ কাপে।

দো ১। বেহুলার মাথায় বুকে মরা চাম-মাসের ঢল নামে। ঘেন্না আসে, বমি আসে। বেহুলা মরতে থাকে। তবু বেহুলা নাচে।

গা। লখিন্দর চোখ ম্যালে।

দো ১। বেহুলার চোখের পাতা ভারী লাগে।

গা। লখিন্দরের শ্বাস আসে।

দো ১। বেহুলার শ্বাস বন্ধ হয়।

গা। লখিন্দরের বিষ নামতে থাকে।

দো ১। বেহুলার বুকের মইধ্যের কালনাগিনী বেহুলারেই দংশায়। জ্বলে বেহুলা। ছটফট করে।

দো ২। বেহুলা নাচে রে, সতী নাচে।

গা। লখিন্দরের শিরায় রক্তের স্রোত।

দো ১। বেহুলার রক্তে বিষের জ্বালা।

গা। লখিন্দরের গায়ের বন্ন ফুইট্যা ওঠে।

দো ১। বেহুলার অঙ্গ বিষে কালি।

দো ২। বেহুলা নাচে রে, পতি বাঁচে।

গা। বেহুলা সব ছাখতে পায় পরে কী হবে। পতিরে জীয়াইয়্যা সে ফেরবে চম্পকনগরে। চান্দো মাথা নিচ্যা করবে। আর কোনোদিন মাথা তোলবে না। সনকা করবে কলংকের সন্দেহ, কিন্তু লখিন্দররে পাইয়্যা মুখে কিছু কবে না। তারপর স্থখে ভাইস্যা যাবে চম্পকনগর। হাসি, রং, তামাসা, গান। সোনা, রূপা, টাকা। ঝলমল কইর‍্যা ওঠবে চম্পকনগর—নতুন পরাণ পাইয়্যা। শুধু সেই পরাণের সাগরে ভাইস্যা বেড়াবে এক ফোঁটা মরণ—বেহুলা। আলোর সাগরে ভাইস্যা যাবে এক বিন্দু অন্ধকার—বেহুলা। স্থখের সংসারে সারাক্ষণের দুঃখ—বেহুলা। সনকা শুধাবে বৌ, তোর কি শরীর খারাপ?

দো ১। না। ভালোই আছি মা। খুব ভালো।

গা। তয়। তয় শুকাস ক্যান? ব্যাজার ক্যান?

দো ১। না, ব্যাজার কই! এই তো নাচি হাসি গাই খেলি।

গা। বেহুলা কইতে পারে না—মা, আমি বাইচ্যা নাই। আমি মইর‍্যা গেছি। এ মরা বেহুলা।

দো ১। সনকা যদি বোঝে কিছু ঠারে-ঠোরে, তয় কবে—এই তো বাচন, বৌ—স্থখের বাচন। স্থখে বাচো। অনেক দিন বাইচ্যা থাকো। লখিন্দররে বাচাইয়্যা রাখো। স্থখে রাখো।

দো ২। বেহুলা বোঝে না, সে মরে না বাচে। সে নাচে। পাগলের মতো নাচে। ছটফট কইর‍্যা নাচে। তিক্ত মুখে হাস্য আনে। লাশের বুকে আনে লাস্য। বেহুলা নিশ্বাস বন্ধ কইর‍্যা নাচে।

গা। দেবতাদের লালা ঝরতেই থাকে। তারা তাল দিতেই থাকে।

দো ১। তালে পা পড়ে, ওঠে, নামে। বেহুলা নাচে। তার চাম-মাস-রক্ত পচে। পচা মরা বেহুলা পাগলের মতো নাচে। যন্ত্রণায় হাসে। বেদনায় তাল দেয়। মরা আর নাচা—এ বড় কঠিন গো গায়েন। এ কোথায় নিয়্যা আসলা বেহুলারে?

গা। আমি আনার কে ?

দো ১। তয় এ পালা সাজাইলো কে ?

গা। সাজাইতে পারি। কিন্তু সারাইতে পারি না। বড় বেভ্রমে আছি গো বাবুমশাইরা। রাইতের অন্ধকারে নাচের লাস্যটুক নিয়া বাড়ি যান। সুখে বাচেন। নাচের মরাটুক ফ্যালাইয়া যান এইখানে আমার জইন্যে। সুখী হন বাবুমশাইরা। ফিরা যান ঘরে—আপনাগো চম্পকনগরে। সুখে ভাইস্যা বেড়ান। আমি পইড়া থাকি এইখানে—মরাটুক গলায় ধইরা নীলকণ্ঠ গায়েন আমি সারা রাইত বিষের গলায় গান গাই, আর বেহুলা নাচে। নাচে না ছটফট করে বুঝি না। আমি গাই না গলা ছাইড়া কাঁদি তা জানি না। এই আমাগো পালা, বাবুমশায়রা, বড় বেভ্রমের পালা। দোষ নিবেন না। জীবনটাই য্যান এক বেভ্রম। আমাগো বেভ্রমের পালা এইখানেই শেষ। সপ্নটারে রাইখ্যা পুষ্পটারে লইয়া বাড়ি যান বাবুমশায়রা।

বুদ্ধিজীবীদের আরও কেচ্ছা

সৌরি ঘটক

জয় পরাজয়ের মাধ্যমে মীমাংসা হওয়ার আগে যে কোনো যুদ্ধ যদি মাঝ-পথে থেমে যায় তাহলে যুধ্যমান কোনো পক্ষেরই আক্রোশ মেটে না। এ সব ক্ষেত্রে উভয়পক্ষই গর্জায়, মনে মনে ভাবে থেমে না গেলে সে অপরপক্ষকে একেবারে ঠাণ্ডা করে দিত।

সেদিনও তাই হল। এসপ্ল্যানেডের কাছে 'ছোট ব্রিস্টল' পানশালায় একটা খণ্ডযুদ্ধ করে রাস্তায় বেরিয়ে এল দেশের দুদল বুদ্ধিজীবী। এর একদলে ছিল খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক অঞ্জনকুমার, বর্তমান যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি আলো বোস, আর তাদের দুই সাকরেদ গল্পকার সজল দাস আর আখর দে। এরা লেখে বড় কাগজে, লেখার জন্যে পয়সা পায় অঢেল। গ্রহ বলয়ের মতো এদের চারি ধার ঘিরে জ্বলজ্বল করে খ্যাতি, প্রতিপত্তি, চাটুকারিতা এইসব।

'ছোট ব্রিস্টল'-এ এদের বিরুদ্ধ দলে ছিল কবি অভিক রায়, গল্প লেখক রুদ্র দে আর বিপ্লবী প্রবন্ধকার অনুপ ঘোষ। এরা নিজেদের দাবি করে প্রগতিপন্থী বলে, লেখে বামপন্থী কাগজে। লেখার জন্যে প্রায়শঃ কোনো অর্থ পায় না। এদের পাঠক সংখ্যা কম, পরিচিতি সীমাবদ্ধ, বুদ্ধিজীবী সমাজে এরা অনেকটা নিষ্প্রভ জ্যোতিষ্কের মতো।

পানশালার মধ্যে এই খণ্ডযুদ্ধটা হওয়ার কথা ছিল না কিন্তু হয়ে গেল। সন্ধ্যাবেলায় পানশালায় আগে ঢুকেছিল অঞ্জনকুমাররা। তাদের যখন রাম, হুইস্কি মিলে আড়াই পেগ করে খাওয়া হয়ে গেছে, যখন বেশ ঘোর হয়ে জমতে শুরু করেছে নেশাটা, যখন কল্পনাগুলো হয়ে উঠেছে সজীব আর মেজাজটা হয়ে উঠেছে লড়াকু ঘোড়ার মতো টগবগে, তখন এল অভিক রায়, রুদ্র দে আর অনুপ ঘোষ।

তারপর তর্ক শুরু হল সাহিত্যের মান নিয়ে। আলো বোস বিদ্রূপ করল প্রগতি সাহিত্যকে। অনুপ ঘোষ রুখে দাঁড়াল এর বিপক্ষে। আলো বোস উত্তেজিত হয়ে অনুপ ঘোষের নাকে মারল এক ঘুষি, অভিক রায় মারল আলো বোসের গালে এক চড়, অঞ্জনকুমার ধাক্কা মারল রুদ্র দে-কে, সেই ধাক্কায় পড়ে

গিয়ে মাথা ফাটাল রুদ্র দে। টেবিল চেয়ারগুলো গেল উলটিয়ে, বেয়ারা এসে ধাক্কা দিয়ে পথে বের করে দিল ওদের। এমনি ভাবেই শেষ হল খণ্ডযুদ্ধটা। গরজাতে গরজাতে পথে বেরিয়ে দুদল দুদিকে হাঁটতে শুরু করল। রাত তখন আটটা।

অঞ্জনকুমাররা হাঁটতে হাঁটতে এসে ধর্মতলা স্ট্রীট পার হয়ে ঢুকল ম্যাডান স্ট্রীটে। এই রাস্তার চার নম্বর বাড়ির দোতালায় একটি পানশালা, নাম ম্যাজেষ্টিক। ফুটপাতের মুখেই ওপরে উঠবার সিঁড়ি। সিঁড়িটার দুপাশে বাঁদিকে একটা ওষুধের দোকান আর ডানদিকে একটা বন্দুকের দোকান। সিঁড়ির মুখেই দাঁড়িয়ে থাকে বেয়ারা, খরিদ্দার যাওয়া মাত্র হাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে সেলাম দেয়।

ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেই একটা বড় হল। পূর্বদিকের দেওয়ালের গায়ে কাউণ্টার, সেখানে বসে দোকানের বুড়ো কর্মচারী বেয়ারাদের ফরমাইস মতো মদ সরবরাহ করে। বাকি হলটার ফাঁক ফাঁক করে সাজানো টেবিল। তার চারধারে চেয়ার। মাঝখানে একটা টেবিলে ক-বোতল ভিনিগার আর কতকগুলো মদের গ্লাস সাজানো।

হলটার বাইরে রাস্তার ওপর বেশ প্রশস্ত খোলা বারান্দা। বারান্দাটার তিনধার কোমর ভোর নিচু রেলিং দিয়ে ঘেরা। রেলিংটার গা বরাবর লম্বালম্বি অনেকটা ফাঁক ফাঁক করে কতকগুলো টেবিল তার তিন দিকে তিনটে করে চেয়ার।

এই পানশালার পরিবেশটা বেশ শান্ত। সাধারণত এখানে পান করতে আসে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সেই ধরণের লোকজন, যারা একটু শান্তিতে অথবা নিরিবিলিতে বসে পান করতে চায়। এরা কেউ আসে একা, কেউ বা দু-তিন জনে দল বেঁধে, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে অনুচ্চ কণ্ঠে। এখানে হল্লা মারামারি হৈ চৈ এর ঘটনা ঘটে ক্বচিৎ কখনও।

অঞ্জনকুমার, আলো বোস, সজল দাস আর আখর দে পানশালায় ঢুকে হলের ভেতর দিয়ে সোজা বাইরের বারান্দায় গিয়ে রেলিঙের ধারের একটা টেবিলে বসল। তিনখানা চেয়ার ছিল, বেয়ারা আর একখানা চেয়ার এনে দিল। অঞ্জনকুমার আর আলো বোস বসল মুখোমুখি। সজল দাস আর আখর দে পাশাপাশি।

মারপিট করে এসে চারজনেই মনে মনে ফুঁসছে, কিন্তু ওপরে রয়েছে নীরব,

চুপচাপ। আলো বোস ভাবছে, তার গালে চড় মারল অভিক? একটা তৃতীয় শ্রেণীর কবি? এত বড় সাহস ও পেল কোথা থেকে? একঘর লোকের সামনে চড় মেরে অপমান করল তাকে?

'অপমান করেছে আমাকে' নেশাগ্রস্ত মনে এই কথাটাই বারবার ঘুরপাক খেতে লাগল তার। আর কথাটা ঘুরে ফিরে মনে পড়া মাত্র এক-একবার মনে হতে লাগল এখনই উঠে গিয়ে অভিক রায়কে আচ্ছা করে পিটিয়ে দিয়ে আসে। আবার একবার মনে হতে লাগল গলা ছেড়ে হাউ হাউ করে কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বলে..., 'ছাখো, ছাখো। আমায় অপমান করেছে অভিক রায়! একটা ফতো কবি, যাকে কেউ চেনে না, বাজারে যার টিকে ধরাবার জামিন পর্যন্ত নেই! সে মেরেছে আমার গালে চড়।'

এই দু ধরণের প্রতিক্রিয়া তীব্রভাবে কাজ করছে তার মনে। ফলে এক-একবার সে উত্তেজনায় রুখে উঠছে আবার এক-একবার ঝিমিয়ে এলিয়ে পড়ছে চেয়ারের ওপর।

আর অঞ্জনকুমার ভাবছে দোষটা তাদেরই। এত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা, এক টেবিলে বসে মদ খাওয়া, পথে ঘাটে দেখাসাক্ষাৎ হলে কথাবার্তা বলা, এতেই সাহস বেড়ে গিয়েছে ওদের। তা নাহলে আলো বোসের মতো একজন সর্বশ্রেষ্ঠ কবির গালে চড় মারতে সাহস পান অভিক রায়ের মতো একজন নগণ্য কবি।

'ভবিষ্যতে চাকর-বাকরের মতো ব্যবহার করতে হবে ওদের সঙ্গে'—তার উত্তেজিত মন শপথ নিতে লাগল ঘনঘন 'হ্যাঁ। ঠিক চাকর-বাকরের মতো। কিম্বা কুকুরের মতো। ওদের বিষ দাঁত একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। ওদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত লিখতে হবে কাগজে। সামাজিক বয়কট করতে হবে ওদের। হ্যাঁ, একেবারে সামাজিক বয়কট। সেই তেষট্টি-চৌষট্টি সালে যেমন করা হয়েছিল, সেই রকম। ওদের পথে বেরোনো বন্ধ করতে হবে। ওদের লেখা ছাপা বন্ধ করতে হবে, ওদের, মানে একেবার,—মানে একেবারে'—কঠিন একটা কিছু ভাবতে গিয়ে নেশাগ্রস্ত মনে চিন্তাটা জড়িয়ে এলোমেলো হয়ে গেল।

ওরা বসার পর থেকে অর্ডার নেওয়ার জন্যে বেয়ারা একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ সেদিকে খেয়াল পড়তেই সজল দাস বলল, "চারটে হুইস্কি।"

চলে গেল বেয়ারা। সজল দাস একেবার অঞ্জনকুমার আর আলো বোসের মুখের দিকে তাকাল। থমথমে গম্ভীর মুখ। ফিরে তাকাল সে আখর দে-র মুখের দিকে। সেও নীরব চিন্তায় মগ্ন। নিজেকে কি রকম অপরাধী মনে হতে লাগল সজল দাসের। ছোট ব্রিস্টলে অভিক রায়, রুদ্র দে আর অনুপ ঘোষকে সেই ডেকেছিল টেবিলে। আর তা থেকেই এই ঝগড়া মারামারি। সে যদি ওদের না ডাকত তো ওরা কাছে আসতেই সাহস পেত না, অন্য টেবিলে বসে মদ খেয়ে চলে যেত। গোটা ঘটনাটার জন্য নিজেকেই অপরাধী মনে হতে লাগল তার।

চুপ করে সে তাকিয়ে রইল নিচে রাস্তার দিকে। রাত প্রায় সাড়ে আটটা। ঘর ফেরতা পরিশ্রমী মানুষদের স্রোত একটা বিশৃঙ্খল মিছিলের মতো ফুটপাত বোঝাই হয়ে হাঁটছে। দোতালার ওপর থেকে দেখতে বেশ লাগছে ওদের। কোনো কেরানী হয়তো আপনমনে একা একা শশা চিবোতে চিবোতে চলেছে, কেউ চলেছে কাগজের ঠোঙায় মুড়ি খেতে খেতে, চার জনের প্যাণ্ট শার্ট পরা একটা দল গেল বাদাম ভেঙে খেতে খেতে, দুজন গেল ভীষণ উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত নেড়ে তর্ক করতে করতে, এক জোড়া তরুণ-তরুণী গেল গুজ গুজ করে যুক্তি করতে করতে, দেখে মনে হল খুব অল্পদিনই প্রেমে পড়েছে তারা এবং এখনও ফুসফুস গুজগুজের স্তর পার হয়নি। উগ্র সুসজ্জিতা এক নারী হেলেদুলে ঢং করতে করতে করতে গেল। আর তাকে ঘিরে গেল চারজন তরুণ, একজন কালো কোট পড়া বুড়ো এ্যাডভোকেট আপন মনে বিড়বিড় করে বকতে বকতে হাঁটছিল, তাকে একটু ধাক্কা দিয়ে অতিক্রম করে গেল ঠোঁটে লিপষ্টিক আর রাতেও চোখে গগলস পরা এক বিদঘুটে আধুনিকা।

সজল দাস চুপ করে বসে দেখতে লাগল। বারান্দার ওপর দিয়ে হু হু করে দক্ষিণের হাওয়া বয়ে যাচ্ছে, মাথার ওপর আকাশে ফুটফুট করছে ছোট ছোট তারা, রাস্তার ওপারের বাড়িতে তেতালার একটি ঘরে এক তরুণী মা দাঁড়িয়ে ছেলেকে দোলনায় দোল দিচ্ছে, একটি ঘরে টেবিলে বসে পড়েছে একটি ছাত্র, একটি নির্জন ঘরে একটি কিশোরী নাচের ভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে হাত নেড়ে কি যেন আবৃত্তি করছে।

একটু পরে বেয়ারা এসে প্লেটে করে পাঁপড় সেঁকা আর চারটে গ্লাস নামিয়ে দিয়ে গেল। তারপর নিয়ে এল এক বোতল জল আর মদের বোতল। জলের বোতলটা টেবিলে নামিয়ে মদের বোতল খুলে চারটে গ্লাসে চার পেগ মদ ঢেলে

দিল। সজল দাস বোতলটা খুলে খানিকটা করে জল ঢেলে দিল চারটে গ্লাসে। চারজনেই গ্লাস তুলে নিল। কিন্তু মুখে 'চিয়ার্স' বলে কোনো শব্দ বেরোয় না। গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে নীরবে চুমুক দিল।

তারপর গ্লাসটা টেবিলে রেখে অঞ্জনকুমার মাথাটা হেলিয়ে দিল চেয়ারে। আলো বোস দুই চেয়ারের হাতকে দুটো হাত রেখে গোঁজ হয়ে বসে রইল। আখর দে মাথা হেঁট করে কি যেন ভাবতে লাগল চুপচাপ। একটু পরে সে নীরবতাকে ভঙ্গ করে সজল দাস শান্ত স্থির গলায় বলল, "ওদের সাহস আজকাল ভীষণ বেড়ে গিয়েছে।"

অঞ্জনকুমার তেমনিভাবে মাথাটা হেলিয়ে রেখেই মুখটা বিকৃত করে জড়িত গলায় বলল, "বাদ দে! শালা হা ঘরের দল সাতদিন পরেই আবার কোনো কাজ নিয়ে আমাদের কাছে এসে ঘুরঘুর করবে। সাহস! হা! কেঁচোর আবার ফণা।"

কথাটা বলে জোরে একটা নিশ্বাস ফেলল সে। তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসল চেয়ারে, গ্লাসটা তুলে একটা চুমুক দিল মদে, তারপর মুখখানা কঠোর করে বলল, "শালারা আমাদের বলে দালাল। আরে, আমরা তো এক জায়গাতেই আছি। যা লিখছি, লোকে পড়ছে, ভালো বলছে। আর তোরা? না আছে চাল না আছে চুলো। প্রগতিশীল? শালা প্রগতিশীল শব্দটা শুনলেই এখন আমার ঘেন্না লাগে।"

আখর দে অন্য সবাইকে থামিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে হাত তুলে উত্তেজিত গলায় বলল, "এবার দেখা হলে শালাদের সঙ্গে আর কথা বলব না।"

সজল দাস তাকে সমর্থন করে বলল, "চড়িয়ে দেব গালে।"

"না রে, কথা বলব" যেন হঠাতই কথাটা বেরিয়ে এল অঞ্জনকুমারের মুখ দিয়ে। এতক্ষণ সে যা চিন্তা করছিল এ কথাটা হল তার বিপরীত। কথাটা বলে সে নিজেও একটু চমকে উঠল। চমকে উঠে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল সজল দাস আর আখর দে।

কিন্তু অঞ্জনকুমার সঙ্গে সঙ্গে সামলিয়ে নিল নিজেকে। মনে ভাবল—ঠিকই বলেছে। ওরা যা বলেছে তার উল্টোটাই বলতে হবে। এটাই হল প্রতিভার লক্ষণ। সাধারণে যা বলে, যা করে, তা থেকে নতুন কিছু করার নামই হল প্রতিভা। আর যেহেতু সে প্রতিভাবান সেজন্য কিছু নতুন কথা বলতেই হবে তাকে।

ভাবতে ভাবতে একটা প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে ভরে উঠল তার মন। মদের গ্লাসে আর একটা চুমুক দিয়ে সে বলল "প্রগতিশীলতা ওদেরই এক চেটে থাকবে কেন? আমরাও প্রগতিশীল হব।"

একটু চিন্তা করে নিল সে। তারপর জোর দিয়ে বলে উঠল, "শত্রুকে কখনও সংহত হতে দিতে নেই।"

"কিন্তু এই করেই ওদের আস্পর্দ্ধা বেড়েছে অঞ্জনদা"—সজল দাস সাবধান বাণী উচ্চারণ করল।

অঞ্জনকুমার ও-কথা গ্রাহ্য না করেই বলল, "শত্রুর চক্রকে ভেঙে দিতে হবে। একটা পাথরে মাথা ঠুকলে মাথা ভেঙে যায়। কিন্তু সেই পাথর ভেঙে কুচি কুচি করে দিলে তার ওপর দিয়ে হাঁটা যায়। বুঝলে।"

উপমাটা বেশ যুৎসই হয়েছে বলে মনে হল অঞ্জনকুমারের। সবাই এটা বুঝল কিনা পরখ করার জন্য তাকাল অন্যদের মুখের দিকে। তারপর বলল, "ভেঙে দিতে হবে ওদের। ওদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে সংশয় আর অবিশ্বাস। ওরা খ্যাতি আর অর্থের কাঙাল। সেই প্রলোভন দেখাতে হবে ওদের। হাতছানি দিতে হবে। বলতে হবে 'এসো। এসো। আমাদের কাছে এসো। এক মাসে একটা বইয়ের সংস্করণ শেষ হবে, টাকা পাবে, খেতে পাবে। ছারপোকা ভর্তি খাটে না শুয়ে এমনি বার হোটেলে রাত কাটাতে পারবে'।"

"কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে"—আবার সংশয় ফুটে উঠল সজল দাসের কণ্ঠে।

"আলবত ঠিক হবে। আমি যা বলছি তাই হবে"—উত্তেজিত গলায় জবাব দিল অঞ্জন কুমার।

আলো বোস কিন্তু কোনো কথাই বলছিল না। রাগে উত্তেজনায় সে এক-একবার খাড়া হয়ে উঠে বসছিল, আবার এক-একবার ভেঙ্গে পড়ে ভাবছিল বেশ একটা নরম কোলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদে। এমনি ভাবে কাঁদলে হয়তো তার মনের ব্যথা অনেকটা কমবে।

কিন্তু আলো বোসের এই মানসিকতাকে লক্ষ্য করার মতো মেজাজ কারো ছিল না। মারপিটের ঘটনায় উত্তেজিত সজল দাস আর আথর দে ছটফট করছিল আর অঞ্জনকুমারের মাথায় ক্রমাগত ভিড় করে আসছিল নানা ধরণের দার্শনিক চিন্তা। চুপ করে সে তাকিয়ে ছিল সামনের দিকে। ওধারের টেবিলে দুজন মাদ্রাজি ব্যবসাদার মদের গ্লাস সামনে নিয়ে মৃদু স্বরে কি যেন আলোচনা করছে আর সিগারেটের প্যাকেটের ওপর অঙ্ক লিখছে। তারও ওধারের

টেবিলে মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গায়ে ফুল তোলা আর্দির পাঞ্জাবি, দেখতে জামাইয়ের মতো এক ভদ্রলোক নীরবে বসে এক চুমুক করে মদ খাচ্ছিল আর মাঝে মাঝে মুখ তুলে দেখছিল আকাশের গায়ে ফুটে ওঠা তারাগুলোকে। অঞ্জনকুমার নীরবে ওদের একটুখানি লক্ষ্য করে হঠাৎ জোর দিয়ে বলে উঠল, "ওরা দেশটাকে, সমাজটাকে, লেখকদের ভাগ করতে চায় প্রগতিশীল আর প্রতিক্রিয়াশীল বলে। কিন্তু আমরা তা হতে দেব না। প্রগতিশীলতা ওদের বাবার একচেটে সম্পত্তি নয়। ওদের কোনো অধিকার নেই আমাদের প্রতিক্রিয়াশীল বলার।"

"তা নেই"—অঞ্জনকুমারকে এবার সমর্থন করল সজল দাস—"ওরা কে যে এইভাবে প্রগতিশীল প্রতিক্রিয়াশীল বলে ভাগ করবে? কে ওরা?"

"কেউ নয়। বাজারে ওদের টিকে ধরাবার জামিন পর্যন্ত নেই, হ্যাঁ।"

মদের গ্লাস শেষ হয়ে গিয়েছিল। আখির দে আরও এক পেগ করে মদ দেওয়ার জন্য বেয়ারাকে ডাকতে যাচ্ছিল এমন সময় হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াল আলো বোস। অঞ্জনকুমার ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "কি রে, কোথায় চললি?"

"ভালো লাগছে না।"

"তবে চ উইণ্ডসরে যাই।"

বিল মিটিয়ে দিয়ে দোতালা থেকে নেমে এল ওরা। ফুটপাথে সিঁড়ির মুখে বেয়ারা গেলাস দিতেই তাকে একখানা পাঁচ টাকা নোট বকশিস দিল। তারপর ধর্মতলা স্ট্রীটে এসে একটা একুশ নম্বর ট্রাম ধরে এসে নামল পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে। নেমে মোড়টা পেরে হল ওরা, তারপর আচার্য জগদীশ বসু রোডের বাঁ ধারের ফুটপাথ ধরে কটা বাড়ি পেরিয়ে গিয়ে ঢুকল উইণ্ডসর বারে।

উইণ্ডসর বারটা মোটামুটি একটা অভিজাত বার নামে খ্যাত। এখানে নারী-পুরুষের অবাধ গানের ব্যবস্থা আছে।

উইণ্ডসর বারটা আগে ছিল কোনো সাহেবের বাংলো। ভেতরে ঢুকেই মস্ত উঠোন, চওড়া বারন্দায় বড় বড় থাম, দুপাশে বড় বড় হলঘর, মাঝে খোলা করিডোর। একতলা এই বাড়িটা এককালে কোনো ধনী সাহেবের বাংলো ছিল। এখন এটাকে আধুনিক কায়দায় বার বানানো হয়েছে।

সারা বাড়িটায় অনুজ্জ্বল নীলাভ আলো। উঠোনে ছোটো ছোটো টেবিলের চারপাশে চারটে করে চেয়ার, তার মাঝে মাঝে টবে ফুলের গাছ।

আর উঠোনটার তিন ধারে দেয়ালের ধারে ধারে ছোট ছোট কেবিন, সেগুলোর দরজায় দামী পর্দা টাঙানো, ভেতরে মেয়েদের নিয়ে মদ খাওয়ার ব্যবস্থা। বারান্দাতেও টেবিল, চেয়ার, ফুলের টব। গোটা উঠোনটা আবার প্রয়োজন হলে ছাদ থেকে শাটার টেনে ঢেকে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ফলে আকাশে মেঘ বা বৃষ্টি হলে শাটার টেনে সেটাও হয়ে যায় ঘরের মতো।

অদ্ভুত শান্ত পরিবেশ এই পানশালার। কথাবার্তার কোনো শব্দ নেই, বেয়ারারা চলাফেরা করে নিঃশব্দ পায়ে, রেডিওতে খুব আস্তে গান বাজে, অস্পষ্ট আলোয় ফুলের টবের ফাঁকে ফাঁকে টেবিলে বসা মদ্যপায়ীদের দেখে মনে হয় যেন অস্পষ্ট জ্যোৎস্না রাতে আবছায়া ঘেরা কোনো কুঞ্জবনে বসে রয়েছে একদল প্রেমিক।

ওরা ভেতরে এসে কোণের একটা কেবিনে গিয়ে ঢুকল। অস্পষ্ট আলোয় টেবিলটার দুদিকে মুখোমুখি বসল চারজন। বেয়ারা নীরবে এসে সেলাম দিল। অঞ্জনকুমার বলল, "চারটে বড় হুইস্কি।"

বড় হুইস্কি মানে এক সঙ্গে দু-পেগ। এখানে মদের সঙ্গে খাদ্য হিসাবে দেয় ছাড়ানো বাদাম ভাজা। বেয়ারা আগে এক প্লেট বাদাম ভাজা দিয়ে গেল। তারপর একটা জলের বোতল। শেষে নিয়ে এল চারটে গ্লাসে দু-পেগ করে মদ।

আস্তে করে গ্লাসে গ্লাস ঠেকাল ওরা, তারপর নিঃশব্দে চুমুক দিল। রেডিওতে খুব আস্তে হিন্দী গানের হালকা সুর বাজছে, ফ্যানের হাওয়ায় টবের ফুলের গাছগুলো দুলছে অল্প অল্প। আবছা অন্ধকারে বেয়ারাদের নিঃশব্দ চলাফেরা পরিবেশটাকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে। মদের গ্লাসে পরপর দুটো চুমুক দিয়ে অঞ্জনকুমার সেই আগেকার আলোচনার জের টেনে বলে উঠল, "সাহিত্য! সাহিত্যের ওরা কি বোঝে—কি জানে! সাহিত্যের রাজা হলাম আমরা। আমরা যাকে সাহিত্যিক করব সেই সাহিত্যিক হবে, আমরা যাকে করব না সে হবে না। তা সে যাই লিখুক আর যত ভালোই লিখুক, আমরা যে ভাবে নির্দেশ দেব সেই ভাবেই চলতে হবে সাহিত্যের জগতকে। আমরা যাকে ওঠাব সে উঠবে, যাকে ফেলব সে পড়বে।"

কথাগুলো বলতে বলতে মনের মধ্যে বেশ একটা আত্মবিশ্বাস ফিরে এল তার। ছোট ব্রিস্টলে মারপিটের পর যে একটা অবদমিত ভাব এসেছিল সেটা কেটে যেতে লাগল আস্তে আস্তে। প্রায় সাড়ে পাঁচ পেগের মাথায় নেশার ঘোরে বেশ একটু টলতে লাগল হাত-পা, মনে ফিরে এল প্রভুত্বের ভাব। কণ্ঠস্বর

যদিও জড়িয়ে যাচ্ছিল তবু কর্তৃত্বের স্বর ফুটে উঠতে লাগল সেখানে। গ্লাসে আর একটা চুমুক দিয়ে সে বলল, "সাহিত্য লিখে অমর হব ওসব ছেঁদো কথায় বিশ্বাস করি না আমি। মরার পরে কে আমায় মনে রাখল কি না রাখল তা নিয়ে আমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই। 'রেখো মা দাসেরে মনে' বলে আমি কারো পা ধরে সাধতেও রাজি নই, আবার 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' বলে কাতর প্রার্থনাও করতে চাই না, আমি চাই যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন রাজা হয়েই থাকব— নইলে থাকব না।"

সজল দাস সঙ্গে সঙ্গে তাকে সায় দিল, "আমারও তাই মত।"

আখর দে কোনো কথা বলল না। কারণ তার মুরুব্বি আলো বোস একেবারে নীরব। সে অপেক্ষা করতে লাগল আলো বোস কিছু বললে সঙ্গে সঙ্গে সায় দেবে বলে।

অঞ্জনকুমার গ্লাসে আর একটা চুমুক দিয়ে বলল, "না কি আলো। কথা বল। আরে, বারে মারপিট হয়েছে, তা নিয়ে অত মন খারাপ কেন? ও তো কত করেছি আমরা। বাদ দে ওসব চিন্তা। কতকগুলো হ্যাগার্ড। জীবনে না পেল অর্থ, না পেল যশ, না পেল সম্মান। একখানা বইয়ের সংস্করণ কাটতে ছ-বছর লাগে! ওদের সাহিত্যিক বলে ভাবাটাই ভুল। ছেড়ে দে ও সব চিন্তা। বল আমরা কিভাবে বাঁচতে চাই!

একটা ফুলের মতো না কি? যতদিন ফুটে থাকব লোকে দেখবে, যখন ঝরে যাব তখন ফুরিয়ে যাব—"বনের পাখিরে কে মনে রাখে গান হলে অবসান?"

"অঞ্জনদা নয়?" হঠাৎ কেবিনের সামনে সরু পথে একটা ফুল গাছের টবের আড়াল থেকে ভেসে উঠল একটি নারী কণ্ঠ।

চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল অঞ্জনকুমার "আরে গীতিকা? তুমি? সঙ্গে কে আছে?"

টলতে টলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে এল অঞ্জনকুমার। টবের আড়ালের মেয়েটি শ্যামাঙ্গী, স্খলিতবসনা, টলমল ভঙ্গী। অঞ্জনকুমারের পূর্ব পরিচিতা, কলকাতা বেতারকেন্দ্রের একজন উঠতি গায়িকা, আকাঙ্ক্ষা সিনেমা অভিনেত্রী হওয়ার। অঞ্জনকুমারের কথার জবাবে সে জড়িত গলায় বলল, "কেউ নেই। একা এসেছি।"

"তবে এসো। বসো।"

"শুনুন !" সারা শরীর নাচিয়ে বলে উঠল মেয়েটি, "চলুন অন্য কোথাও যাই ।"

"কোথায় ?"

"অলিম্পিয়ায় ?"

"তার চেয়ে চলো মির্নাভা হোটেলে, আমার স্যুটে"—টলতে টলতে এগিয়ে এসে তার কোমরটা জড়িয়ে ধরল অঞ্জনকুমার। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে সেই হাতের ওপর একটু ঢলে পড়ে বলল, "ধেৎ, কি যে বলেন !"

সঙ্গীদের দিকে ফিরেও তাকাল না অঞ্জনকুমার। সোজা মেয়েটিকে নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল পানশালা থেকে।

আর এই দৃশ্য দেখা মাত্র রক্ত উঠে গেল আলো বোসের মাথায়। মনে হল অঞ্জনকুমারও অপমান করল তাকে। ওদের হাতে সে আহত, অপমানিত। কিন্তু তাকে ও সান্ত্বনা দিল না। মেয়েটাকে নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল ফুর্তি করতে।

"তা হলে এটাই হল বন্ধুর কাজ। বেশ"—মনে মনে এক লহমা ভেবে নিল সে। 'বিপদের সময় বন্ধুর পাশে না থেকে তাকে ত্যাগ করা। এ্যা। তবে আলো বোসও দুনিয়ায় কাউকে পরোয়া করে না। সে একাই সবকিছু-মোকাবিলা করার মতো হিম্মত রাখে। আজকেই সে ঐ অভিক রায়, রুদ্র দে আর অনুপ ঘোষকে খুঁজে বের করবে, প্রচণ্ড পেটাবে তাদের। রক্তারক্তি-কাণ্ড করবে। হ্যাঁ ! খুন-খারাপি করবে সে। আজ রাতেই করবে। শ্যামবাজার থেকে টালিগঞ্জ—যেখানেই ওরা লুকিয়ে থাক খুঁজে বের করবে ওদের—।'

চিন্তাটা মাথায় আসামাত্র সে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে গিয়ে টলে পড়ল একটা চেয়ারের গায়ে, তারপর সামনে গিয়ে টলমল করতে করতে এল বাইরে।

রাত তখন দশটা। বাইরে বেরিয়ে মনে হল মারপিট করতে হলে আরও কড়া নেশা দরকার। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে সে একটা ট্যাক্সিতে উঠে চলে এল ওয়েলিংটনের মোড়ের কাছে। এসে থামল রফি আহমদ কিদোয়াই রোডে খালাশিটোলা নামে—যাকে মাতালরা ডাকে কে. টি. বলে—দেশী মদের দোকানটার সামনে। দোকানের গেটটা তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু হাঁকাহাঁকি করাতে পরিচিত বেয়ারা গলা চিনতে পেরে দরজা ফাঁক করে টেনে নিল ভেতরে।

কে. টি. দোকানটা একটা ঘরের মধ্যে। প্রায় বুক সমান উঁচু কাউন্টার। তার ওধারে দাঁড়িয়ে কর্মচারীরা মদ সরবরাহ করে। এধারে ঘরের সামনে একটা বিরাট আটচালার মতো হল। এখন রাত দশটায় ভীড় অনেক ফাঁকা। তবু কিছু রিক্সাওয়ালা, ঝাঁকামুটে, করপোরেশনের কুলি, মোটর ড্রাইভার, বুড়ো কেরাণী, তালিমারা জামা গায়ে দেওয়া উকিল তখনও বসে মদ খাচ্ছে আর এলোপাথাড়ি কলরব করছে। আলো বোস ঢোকা মাত্র তার সামনে এগিয়ে এল একটা ফর্সা যুবক, এসেই বলল, "গুরু এত রাতে?"

যুবকটির নাম সুবীর রায়, চিত্রশিল্পী। আলো বোস চিনতে পারল তাকে; বলল—"আছে?"

"এই যে গুরু"—নিজের আধখানা খাওয়া বোতলটা ওর হাতে এগিয়ে দিল সুবীর।

বোতলটা মুখের ওপর তুলে ঢক ঢক করে সবটা খেয়ে ফেলল আলো বোস। মদ থেকে দেশী মদের কটু গন্ধ বেরুতে লাগল ভকভক করে। সবটা খেয়ে শূন্য বোতলটা সুবীর রায়ের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আলো বোস বলল, "সুবীর, অনুপ আমায় চড় মেরেছে!"

"চড় মেরেছে? সে কি গুরু! কি বলছ তুমি?"

"হ্যাঁ। অনুপ আমায় মেরেছে। অঞ্জন ছিল, সজল ছিল, আখর ছিল। ওরা কেউ কিছু বলে নি, আমি এখনই তার শোধ নিতে যাব। তুই যাবি?"

"তোমার জন্যে জান লড়িয়ে দেব গুরু।"

"তবে আর এক বোতল নিয়ে আয়। খেয়ে চল। আজ রাতেই শোধ নেব"—পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট বের করে সুবীরের হাতে দিল আলো বোস। তারপর টলতে টলতে বসে পড়ল মাটির উপর।

সেদিন রাত দুটোর সময় পুলিশের একটা টহলদারি গাড়ি থিয়েটার রোড ধরে যেতে যেতে দেখল একটা খাদের নিচে খাকির প্যান্ট পরা একটা লোক সাটপাট হয়ে পড়ে আছে। সন্দেহ হওয়াতে তারা গাড়ি থামাল। তারপর কাছে এসে মদের গন্ধ পেয়ে পাঁচ আইনে গ্রেপ্তার করে চালান দেবে বলে টেনে তুলতে গেল মাতালটাকে। এমন সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য বি. এ. পাশ করা ছোকরা সার্জেন্ট ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে নেমে এসে মুখে টর্চের আলো ফেলে চিনতে পারল তাকে।

"আরে, এ যে বিখ্যাত কবি আলো বোস"—মনে মনে কথাটা উচ্চারণ করে সে। তারপর ড্রাইভারকে বলল, "গাড়ি ঘোরাও।"

পুলিশের গাড়িতে দু-চার জন পুলিশের পায়ের গোড়ায় শুইয়ে দেওয়া হল তাকে। গাড়িটা হু হু করে বেরিয়ে গিয়ে থামল আনোয়ার শা রোডে একটা বাড়ির সামনে। সেখানে দরজায় কড়া নাড়তেই খিল খুলে বেরিয়ে এল একটি পূর্ণগর্ভা মহিলা—আলো বোসের স্ত্রী, নাম রীতা বোস।

সার্জেন্ট তাকে বলল, "আজ বেশি হয়ে গিয়েছে। থিয়েটার রোডে পড়ে ছিলেন, তুলে নিয়ে এলাম।"

রীতা বোস শুকনো গলায় বলল, "ধন্যবাদ।"

পুলিশরাই ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে আলো বোসকে বাইরের ঘরে খাটের ওপর শুইয়ে দিল। তারপর সার্জেন্ট রীতা বোসকে একটা নমস্কার করে দরজা ভেজিয়ে চলে গেল। এই নড়াচড়ায় আলো বোসের একটু জ্ঞান ফিরে এল। সে একবার দেখল রীতা বোসকে। তারপর খাট থেকে এক গুলটানি দিয়ে দড়াম করে মেঝেয় পড়ে রীতা বোসের পা দুটো জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, "রীতা, আমি পাপী। আমার অধঃপতন হয়েছে। তুমি আমায় যীশুর মতো ক্রুশে বিঁধে হত্যা করো। আমি যীশু হতে চাই। সমস্ত দুনিয়া আমায় ঘেন্না করুক, তুমি আমায় উদ্ধার করো, তুমি আমায় আলো দেখাও। একবার বলো আমি যীশু।"

পূর্ণগর্ভা হওয়ার জন্য রীতার পক্ষে পা ছাড়িয়ে নেওয়া অসম্ভব হচ্ছে। এধারে যতবড় কবিই হোক রাত দুটোর সময় মাতাল স্বামী, স্ত্রীর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদছে এ দৃশ্য মোটেই সম্মানজনক নয়। একটু চেষ্টা করে অতিকষ্টে পা দুটো ছাড়িয়ে, সে চলে গেল পাশের ঘরে। আর আলো বোস তখন খাটের একটা পায়া জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল, "আমি যীশু। আমি পবিত্র। নিষ্পাপ। আবার আমি পাপীও।"

এমনি করে কাঁদতে কাঁদতেই হঠাৎ প্যান্টের ভেতর প্রস্রাব করে ফেলল আলো বোস। সেই প্রস্রাবের ধারা গড়াতে লাগল মেঝেয় আর সেই প্রস্রাবের মধ্যেই সে পড়ে রইল নিঝুম হয়ে।

রীতা বোস একটু পরে দরজা ফাঁক করে ম্লান চোখে দৃশ্যটা দেখল। তারপর এই স্বামীকে সামলানো তার পক্ষে অসম্ভব বুঝে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দরজা ভেজিয়ে ভেতরে চলে গেল।

দেশের দুই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের জীবনে সে রাতটার যবনিকাপাত এমনি ভাবেই হল। আর তাদের বাকি দুই চেলা সজল দাস আর আখর দে নেশার ঘোরে এধার ওধার ঘুরে লাস্ট ট্রামে যখন নিজ নিজ বাড়ির গলির মোড়ে নামল তখন রাত একটা। পথে তখন জনপ্রাণী নেই। শুধু একটা ঘুপচি রোয়াকে কটা মস্তান অন্ধকারে চুপচাপ বসে ছিল। তারা সজল দাসকে টলতে টলতে বাড়ি ফিরতে দেখে বলাবলি করল, "শালা শিখ্‌খিতো লোক রে। শাহিত্তিক। আমাদের মতো নয়।"

কথাটা শুনতেও পেল না সজল দাস।

কাজিসাহাব

জ্যোৎস্নাময় ঘোষ

"হাত্তিকা দাঁত, আর মরদকা বাত। হো যায় শাললে"—রামকৃষ্ণ সিনেমা হলের পোস্টার সেঁটে বেড়ানো কাঠি কাঠি আবাত্তি চেহারার রামনগিনা দু হাতে উরত চাপড়ে তীব্র উত্তেজনায় চিৎকার করে ওঠে। আর ঠিক তখনই উবু হয়ে বসে থাকা পর্‌মেশ্বর মুখখানা মাটির ওপর নামিয়ে এনে গোটাকতক সিটি বাজিয়ে দেয় সটাসট। সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধ এই ভাঁটিখানায় নানা কণ্ঠের ঝাঁঝালো উল্লাসের টালমাটাল একটা আওয়াজ পাক খেয়ে যায়। যেমন তেড়েফুঁড়ে ওঠা, ঠিক তেমনিই ঝপ করে পড়ে যাওয়া। কেবল সুখ কিংবা জমাটি নেশার এক নিবিষ্ট উচ্চারণ পর্‌মেশ্বরের বুকের ভেতর থেকে বুগবুগ করে উঠে আসে অনেকক্ষণ ধরে। পিচ পিচ করে চারধারে থুথু ছিটিয়ে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে খুশির স্বরে সে বলে ওঠে, "হাঁ-আ, হাঁ-আ আ, হুব-হুবা—বহুৎ শালে, লাগ যা শালে—হাঁ-আ-হাম কা দত্তা সাহাবকা থোড়হাই পরোয়া করতা রে, শালে, উঁ—'নোকরি খা লেংগে'—এ্যা—এ ক্যা শালে তুমারা বাপ কা নোকরি –হারামি—আবে এ মোতি, উঠ্‌ শালে ট্যাংকি পর, উঠ্‌, নেইতো ফেক্‌ রুপাইয়া—" ধমকের স্বরে কথাটা বলেই উঠে দাঁড়ায় পর্‌মেশ্বর। সারা শরীর টলে টলে ওঠে তার, ভেতর থেকে দুরন্ত এক আবেগ তাকে ক্রমাগত সামনের দিকে ঠেলে ঠেলে দেয়, হড়হড় করে সামনের দিকে খানিকটা এগিয়ে যায় সে, তারপর ডান দিকে টলে পড়তে পড়তে ঠিক শেষ মুহূর্তে ধপ করে বসে পড়ে।

পর্‌মেশ্বরের দিকে পিট পিট করে তাকিয়ে ফিকফিক হাসতে থাকে গনোরিয়া। দেখতে দেখতে সারা শরীরে হাসির কম্পন ছড়িয়ে পড়ে তার। দু হাঁটুর ভাঁজে মাথা রেখে দশ আঙুলের মুঠোয় চুল চেপে ধরে দু-চার মুহূর্ত-বাদেই সশব্দে হেসে ওঠে গনোরিয়া, "খি্‌ক-খি্‌ক-খি্‌ক…হেই পর্‌মেশ্বরোয়া, তু ঘর যা বাই, যা যা—খি্‌ক-খি্‌ক…"

গনোরিয়ার দিকে কতোক্ষণ তেরচা চোখে তাকিয়ে থাকে পর্‌মেশ্বর, তারপর হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, "গনুয়া, হাম পর্‌মেশ্বর। য়্যাদ রাখ শাল্‌লে—"

গনোরিয়া তেমনি খি্ক-খি্ক হাসি হাসতে হাসতেই বলে, "ল্লো শালে। হাম ক্যা ইতনেহি বেওকুফ বে যো কি তুহারা নাম ভুল যাওগে; শালে! পিণ্ডা পর মঁয়নে দশ খোড়্আ তক পঢ়া থা। শুনোগে? তো শুন শালে। দুক্কা দু, দু দুনে চার, দু তিয়া ছে, দু চৌকা আঠ—অর শুনোগে—তো শুন—তিন কা তিন, তিন দুনে ছে, তিন তিয়া—শালে—"

"তিন তিয়া? বোল শালে, বোল"—তীব্র উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায় পর্মেশ্বর।

"হাম তুকারা নোকর, শালে, ক্যা, উঁ?"—বলে হাঁটুর ভাঁজে মাথা গুঁজে দেয় গনোরিয়া।

"শালে খোড়্হাবাজ। তো শুন, শালে—" বলে সমগ্র ভাঁটিখানার ওপর চোখ বুলিয়ে হঠাৎ শটকে পড়ার সুরে চেঁচিয়ে ওঠে পর্মেশ্বর, "এক পর এক গগ্যারা, এক পর দুই বারা, এক পর তিন তেরা, এক পর চার চৌদা—অর শুন, ককাহরা শুন শালে। কা খা গা ঘা ঙা, চা ছা জা ঝা আইগ্যা শুনা শালে? ইয়া রা লা—"

"চোপ, চোপ!" প্রবল ধমকে ভাঁটিখানা যেন কেঁপে ওঠে। পর মুহূর্তেই অন্ধকার ঠেলে দীর্ঘ কাঠামোর যে লোকটি উঠে দাঁড়াল, এ-তল্লাটে সবাই তাকে 'মোতি চোরা' বলে ডাকে। মতি এক সময়কার দাগী চোর। বেশ কিছুদিন হল যদিও চুরি-টুরির সঙ্গে তার খুব একটা সম্পর্ক নেই, তবুও সাধারণের চোখে এখনও সে চোরই। পুরনো সাঙাতরা ঠাট্টা করে ডাকে, 'সন্ত্ মোতি'। "ও শালে তো বিলকুল সন্ত্ ভৈল্ বাম্নু," ঠোঁট বেঁকিয়ে রামপুরিয়া ছুরির মতো ধারাল দৃষ্টিতে মতিকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়ে চাপা হাসিতে ফেটে পড়ে তারা। মতি চটে যায়। খিস্তি-খেউড়ের তুফান ছোটে কতোক্ষণ, কখনো কখনো হাতটাত ছুরিটুরিও চলে।

উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশের সবাইকেই বেশ ভালো করে দেখে নিতে চাইল মতি। কিন্তু যতবারই সে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল, ততবারই তা গুটিয়ে গুটিয়ে তার নিজের কাছেই চলে এল। মনে মনে ভীষণ চটে যায় মতি। দু-চার মুহূর্ত চুপ করে থেকে বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে ওঠে সে, "চোপ—হালারা। রুজ রুজ হালা এই দুই বাইনচোৎ এই খানে পাঠশালা খুইলা বহে। এ্যাক হালার 'খুড়্আ' আর এ্যাক হালার ককাহরা—চোপ—বাইনচোৎ—ককাহরা! তাও নাকি পুংগিরপুইত উচ্চারণটা করতে পারে—কা খা গা ঘা—তর মুখে ঘা

হালা 'পুক' পড়ছে। এই যে বাইনচোতরে এত কইরা কই যে, হালায় কথা গুলান হইল ক খ—তা না ; কাগের মত হালা রুজই চিল্লায় কা কা—চোপ—তাও যদি হালারা আমার মত ইংরাজী কইতে পারতিস—"

"চাচা, ম্যঁয় কুছ বলুংগে আংরেজি ?"

শব্দের উৎসের দিকে কতোক্ষণ ভুরু কুঁচকে চেয়ে থাকে মতি, তারপর গলায় সন্দেহ নিয়ে প্রশ্ন করে, "কেডা রে ?"

"ম্যঁয় বুধন, চাচা।"

"অ-অ !" খানিকবাদে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলে, "ক !"

"লাব ইন টাকিও।" বলে বুধন খিল খিল করে হেসে ওঠে, "হুয়া কি নেই বোলো, চাচা।"

মনে হয়, কথাগুলো নিয়ে মতি যেন নাড়াচাড়া করে, হঠাৎ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার, পরিতৃপ্তির স্বরে হাসতে হাসিতে বলে, "বুধইনা, কানডা লইয়া আয় এইদিকে, বান্দর। হিন্দি সিনেমার নাম কইরা তুই আমারে ভোগা দিতে চাস, বদমাইস।"

"এ চাচা, এ সাচমুচ আংরেজি—সচ।"

"চুপ কর। অসইভ্য। তুই কি আমারে গনোরিয়া পর্‌মেশ্বর মনে করছস, এ্যা ! লাব ইম টকিউ হালা হইয়া গেল রামকৃষ্ট হলে।- হিন্দী ছবির নাম হালা ইংরাজি হয় ? এ্যা বি সি ডি—নাম্‌ডার মইধ্যথন এর এউকগা অক্ষর তুই বাইর কর—কয়, হারামজাদ ! লাব ইন টকিউ—বদমাইস।" বলে ভেংচে ওঠে মতি।

"য্‌যা বাব্‌বা !" অবাক স্বরে বুধন বলে ওঠে। তারপর হতাশ ভঙ্গিতে জানায় "ঠিক হ্যায় চাচা, আপ্‌হি ঠিক বোলা —"

বুধনের কথাটা শেষ হতে না হতেই গৌরীপুর চটকলের ট্রাক ড্রাইভার পীতাম্বর মিত্তির হেঁকে উঠল, "হাম বোলতা হ্যায় শালে লাব ইন টকিও আংরেজি লব্‌জ। বোলতা হ্যায়। হ্যায় ইঁহা কোঁই চ্যালেঞ্জ করনেবালে,—হ্যায় ? আ যাও—" বলে ঝটিতি উঠে দাঁড়ায় পীতাম্বর। সঙ্গে সঙ্গে তার লুঙ্গি খুলে যায়। বাঁ হাত দিয়ে খপ করে লুঙ্গির মুখ চেপে ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ক্রমাগত ডাইনে বাঁয়ে দুলতে থাকে সে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে মতি। নেশার ঘোর মাঝে মাঝে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায় তার। অস্পষ্ট কুয়াশার ওপার থেকে পীতাম্বর যেন ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে হয়ে

ওঠে। এই সময়ই পীতাম্বর যেন নিলামের শেষ হাঁক হাঁকে, "আও শ,শালে—" মতি এবার পীতাম্বরকে স্পষ্ট দেখতে পায়। মুহূর্তেই পীতাম্বরের দিকে ছুটে যেতে যেতে ঝাঁঝাল আক্রোশে ফেটে পড়ে, "আয় বাইনচোৎ—"

পীতাম্বর সঙ্গে সঙ্গে একটা জান্তব চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে ওঠে, "ইয়াহু—" সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতের মুঠো থেকে লুঙ্গির মুখ ফসকে যায় তার, আর বিব্রত গলায় সে চেঁচাতে থাকে, "এই-মতি, লুঙ্গিটা নিয়ে এরম করছিস ক্যানো—এ্যাই—আরে আমি শালা ন্যাংটো হয়ে গেলাম, এ মতি—"

হো হো করে হেসে ওঠে মতি, মতির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভাঁটিখানাটা। মতি দমকে দমকে হাসে আর বলে, "লুঙ্গি রাখতে পারছ না, আর লড়াই করতে চাস এদিকে, এ্যা। লুঙ্গি পর—"

পীতাম্বর মতির কাছে ঘুরঘুর করতে করতে করুণ গলায় বলতে থাকে, "লুঙ্গিটা দে না মাইরি—এ মতি—কি ইয়ার্কি করছিস—"

বুধন লুঙ্গিটা তুলে এনে পীতাম্বরের হাতে দিয়ে বলে, "পিন্দ লো, চাচা" পীতাম্বর লুঙ্গি পরতে পরতে চাপা আক্রোশে বিড় বিড় করতে থাকে, "মোতি, তুম শালে হামারা লুঙ্গি খুল লিয়া, হাম তুমারা শালে—দেখ শালে, ক্যা করতা—" বলতে বলতে লুঙ্গি ক্রমশই সে ওপরের দিকে গুটিয়ে আনে। এক সময় তা প্রায় নেংটির মতো দেখায়। চারদিক টেনেটুনে দেখে নিয়ে যেন বা নিশ্চিন্ত হয়ে সে ঘুরে দাঁড়ায়। তারপর ডান পা সামনের দিকে মেলে দিয়ে উরত চাপড়ে বলে ওঠে, "আও শালে আভি। আ যা, আ-আ—"

মতি এগোয় না, তরল স্বরে বলে, "অম্বইরা, হালায় ইষ্টিয়ারিং তর হাতে নাই এখন। বইয়া পড়, বইয়া পড়।" পীতাম্বর ঠোঁট কামড়ে তেরচা চোখে মতির দিকে চেয়ে থাকে কতোক্ষণ, তারপর বলে—কথাগুলো কেমন যেন এলিয়ে এলিয়ে যায় তার, "হাম শালে নম্বরী ডেরাইবার। হাম ক্যা কোই ধুর পার্টি শালে, আঁ! ইষ্টিয়ারিং হ্যায় কি নেই, দেখ—" বলে মতিকে লক্ষ্য করে পেল্লাই এক ছুট লাগায়।

কিন্তু, পীতাম্বর ক্রমশই বাঁ দিকে টাল খেতে খেতে মতিকে ছাড়িয়ে চলে যেতে থাকে, হাত-পাগুলো কেমন যেন ঢলঢলে হয়ে আসে তার, অবিকল ন্যাকড়ার পুতুলের মতো দেখায় তাকে। বাঁ দিকে গোত্তা খেতে খেতে ঘুম ঘুম আড়ষ্ট গলায় সে চেঁচায়, "বিরেক, হামারা বিরেক কাঁহা—আউ শালে মোতি—" বলতে বলতেই অর্ধবৃত্তাকারে একটা পাক খেয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে এক

সময়। নানা গলার নানা ছন্দের হাসির ভেতর হাত পা টান টান করে চিত হয়ে পড়ে থাকে পীতাম্বর। হাসির শব্দটা মরে এলে জিব দিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে শেষবারের মতো সে বলে, "হামারা ইঞ্জিন ইস্টার্ট নেহি লেতা শালে—বহৎ আচ্ছা মোতি, শা-লে, তু-উ-ম, আ-হাঁ-আ-আ "বলতে বলতে থেমে যায় এবং গভীর শব্দে তার নাক ডাকতে থাকে। এরপর বেশ কিছু সময় ভাঁটিখানাটা স্তব্ধ হয়ে রইল। অন্ধকার মুড়ি দিয়ে যে যার মতো শুয়ে বসে থাকল সরাই। এক চাতাল স্বেচ্ছা-দৃষ্টিহীনের ভেতর একক চক্ষুষ্মান বেআইনি এই ভাঁটিখানার মালিক প্রেমার চোখদুটিই যা শুধু ইতি-উতি ঘুরে বেড়ায়। বাইরে একদা বি. টি. রোড, এখনকার ঋষি বঙ্কিম রোড—কাঁপিয়ে বাস যায়, ট্রাক যায়, রিকসা যায়; প্রেমা ভাবে, হয়তো বা আদমি লোগও যায়। যায় তো জরুর, শুধু তার ভাঁটিখানায় আসে না শালেলোগ। যদি না পিঅব্, তো রাস্তেমে এ-সাঁনঝকা টাইম চলাউলা কাঁহে বাই? ঘরমে বৈঠ্ কর জরু-বিবিকা গোর দাবা শালে লোগ। লোকজনের ওপর ক্রমশই বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে প্রেমা। তার রাগ এক সময় পুলিশের ওপর গিয়ে পড়ে। কেননা, সে জানে, মাটি কালো হতে না-হতেই গৌরীপুরের বস্তিগুলো এক-একটা ভাঁটিখানা হয়ে ওঠে। হাত বাড়ালেই গ্লাস বোতল কিংবা ভাঁড় উঠে আসে। অথচ, মাত্র ন-দশ বছর আগেও এ-দিগড়ে চোলাইর দোকান ছিল মাত্র দুটি। একটি তার নিজের, আর-একটি সুরজরামের। কিন্তু দেখতে দেখতে বস্তিগুলো চোলাইর আড্ডায় ছেয়ে গেল। থানাদারলোগ কা করতা, বাই? প্রশ্নটা তার বুক ভর্তি জ্বালা কাঁপিয়ে উঠে এল। শালেলোগকো পিটো, ফাটকমে দো। তব তো বন্ধ হোগা এ্যায়সে গায়েরকানুনি কারোয়াই। ক্যা করতি হ্যায় উ লোগ কোন জানে!

কথাটা ভাবতে ভাবতেই বুকের ভেতরটা ধ্বক করে ওঠে তার, জিব শুকিয়ে কাঠ কাঠ। অদূরের খাকি রঙের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বুকের উপর দুহাত জড়ো করে উঠে দাঁড়ায় প্রেমা, নিবু নিবু গলায় বিগলিতভঙ্গিতে বলে, "হুজোর—" পরের কথাগুলো ভেতরকার চাপ চাপ আতঙ্কের ভেতর তলিয়ে যায়।

এই সময়েই তারা এগিয়ে আসে, আর ঋষি বঙ্কিম রোডের পথছুট একফালি তেরচা আলোয় তাদের মুখগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেদিকে তাকিয়ে মুহূর্তেই প্রেমা সহজ হয়ে ওঠে। বসে পড়তে পড়তে বিরক্তির সুরে নিজেকেই যেন বলে, "চাঅল পুলিশ শালেলোগ—"

কর্ডন পুলিশ চলে যাবার খানিক বাদে উবু হয়ে বসে থাকা মতি সিধা খাড়া

হয়ে প্রায় স্বাভাবিকভাবেই প্রেমার কাছে চলে এল। প্রেমার সামনে এসেই তার দীর্ঘ শরীরটা নুয়ে পড়ে, মুখের কঠিন রেখাগুলোয় প্রার্থনার দীনতা ফুটে ওঠে, অনুনয়ের স্বরে বলে, "আউজগা এ্যাক টাকার মদ ধার দে ভাই। কাউলকা দুপুরের মইধ্যে তরে যদি পাঁচ সিকা না দেই তো হালা আমি মাইনষের বাচ্চা না। সইত্য কই—মা কালীর কিরা। আমি তর কদ্দিনকার খরিদ্দার ক—প্রেমা, অই, হুঃ হুঃ হুঃ—ত্থাখ ত্থাখ—"

প্রেমা স্থির চোখে মতিকে দেখে। কী এক দুর্বোধ্য উল্লাসে মাঝে মাঝে তার চোখ জোড়া চকচক করে জ্বলে ওঠে। ঠোঁটের ভাঁজে তীক্ষ্ণ হাসির একটি রেখা ধরে রেখে বলে, "উধার মাংতা কাঁহে বে? মরদ হো তো কামাই কর্‌লো। ট্যাঙ্কি পর উঠ, ত্রিশ রুপাইয়া লে, হাম তো বোলা।"

নিশানের মতো করে, হাত দোলাতে দোলাতে ঠিক তখনই তারস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে গনোরিয়া; "উঠ শালে—" চারধার থেকে ধুয়োর মতো করে কথাটা ফিরিয়ে দেয় অন্যেরা। "উঠ্‌, শালে।—সব কণ্ঠ থেমে গেলে প্রেমা নিজেই কথাটা আবার ছড়িয়ে দেয়, "উঠ—মরদ হো তো উঠ—"

মতির চোখদুটো হঠাৎ ধ্বক করে জ্বলে ওঠে, মুখের রেখাগুলো সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে আসে তার, ভরাট একজোড়া দৃষ্টি ভাঁটিখানার ওপর দিয়ে এক পাক ঘুরে যায় শুধু, ঘুরে এসে প্রেমার মুখেই তা স্থির হয় আবার। পরমুহূর্তেই সবাইকে চমকে দিয়ে ভীষণ তেজি গলায় চিৎকার করে ওঠে মতি, "চল শালে ট্যাঙ্কিবাজ—"

অন্ধকারে হাত ডুবিয়ে একটা বোতল উঠিয়ে আনে প্রেমা, মতির দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে, "পৈলে পী লে বাই—" বলে, আর মৃদু মৃদু হাসে। মাথা উঁচু করে খাড়াই সিঁড়িটিকে একবার দেখে নিল মতি। হাতখানিক চওড়া লোহার দীর্ঘ সিঁড়িটাকে প্রসারিত একটা হাতের মতো দেখায়। সিঁড়ির মাথার ওভারহেড ওয়াটার ট্যাঙ্কটা যেন পাকানো রাগী একটা মুঠির মতো শহরের বুকে উঁচিয়ে রয়েছে। সে দিকে তাকিয়ে মতির গা-টা যেন আচমকাই কেঁপে ওঠে। উদ্যত সেই মুঠি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে নিতে রুক্ষ কণ্ঠে সে হেঁকে ওঠে, "নিতাই"—

নিতাই গা ঘেঁষে দাঁড়ায়, বাপের মুখের দিকে চেয়ে ভয়ে ভয়ে বলে, "এই যে তোমার কাছে খাড়াইয়া।" মতি তার সামনেকার উৎসুক মানুষগুলোর দিকে অবজ্ঞার চোখে তাকিয়ে ঝট করে নিতাইকে কাঁধে তুলে নেয়। নিতাই বাপের

গলার দুপাশ দিয়ে পা ঝুলিয়ে দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে দুহাতে তার চুল চেপে ধরে। মতি আর কোনো দিকে তাকায় না, দুহাত দিয়ে সিঁড়ির হাতল চেপে ধরে তরতর করে উঠতে থাকে।

নিচে বিলাপের সুরে ডুকরে কেঁদে ওঠে মালতী, মতির বৌ, "পোলাটারে আমার খুন কইরা ফ্যালাইলো গো—বাপ না, ডাকাইত, ডাকাইত—ওরে নিতাই রে-এ···" মতি ওপর থেকেই ধমকে ওঠে, "চুপ করলি মাগী। নাইমা লই খাড়। হ্যার পরে 'তুম্‌ছাদানা' কারে কয় দেহিস্‌অনে—"

জটলার ভেতর থেকে গিরিয়া দোসাদের বুড়ি মা সান্ত্বনার স্বরে বলে. "হে বহু চুপ যা, চুপ যা—মৎ রো-ও বেটি—"

নিচের মানুষগুলোর মাথা ক্রমশই পেছন দিকে হেলতে থাকে। অন্ধকারে গাঢ় কালো রেখার দাঁতাল সিঁড়ি বেয়ে অবিকল একটা সরীসৃপের মতো মানুষটা উঠে উঠে যায়। প্রেমার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে থাকে। মনে মনে আকুল স্বরে সে বলে, 'হে ভগোয়ান, তেরা গোড় লাগি···

ডর লাগে, বাপ—নিতাই? ডর কি। গলাখান সাপ্‌টাইয়া ধর। নিচে লাইমাই দুগা রাজভুগ খাওয়ামু, দেখিস। চোরের ব্যাটা রাজভুগ খাবো—হ্বা-হ্বা-হ্বা···কোন চোর, শালে—মোতি? হাঁ-আ, মোতি তো চোরই হ্যায়। দো-দশ দফে ফাটক খাটা, খাতাপর নাম পাক্কা হো গিয়া শালেকো। বস্‌। একদফে কা চোর তো বরাব্বরকা চোর। নিতাই, বাপ, চুরি করিস না কিন্তু। লোকে তরে চোরের ব্যাটা কয়। কারো ঘরে গেলে লোকেরা জিনিস সামলায় তরে দেইখ্যা। তুইও য্যান চোর! না চোরের ব্যাটা, না চোরের বৌ, মাইনষের ধন-ইজ্জত পায় না, বাপ। ইজ্জত না থাকলে কী আর থাকল, ক?—তুমি চুরি করো ক্যান, মাইনষের তা বুঝনের গরজ নাই। তুমি দাগী হইয়া গেছ, এইয়াই হৈল আসল কথা। দাগী ফল যেমন কারো 'ভুগে' লাগে না, দাগী মানুষও তেমনি হালায় কোনো কামে লাগে না। নিতাই, তুই য্যান কাঁপছ।—আরে ডর কি। এই ট্যাঙ্কির উপরে উইঠ্যা কত শুইয়া থাকছি। সেই যেবার যোগেন ডাক্তারের বাড়িৎ চুরি হৈল—তুই তো তখন তিন বছরের পোলা, এখন তুই ছয় পারাইয়া সাতে, য্যান ব্যাটাহান—তা হালা ডাক্তারতো থানায় এ্যাজাহার দিল, যে, মতি চুরি করছে—হালায় য্যান এ্যাক্কেবারে চাক্ষুষ ছাখছে আমারে চুরি করতে। নৈহাটি-গৌরীপুরে মতি ছাড়া য্যান আর চোর নাই

—আমি সত্যই চুরিটা করি নাই। কামটা করছিল বুলাকিরা। হালারা সিঁদ কাটায় উস্তাদ। আমি কাম করি জানলার রডটড বাঁকাইয়া, হগলতেই জানে তা। কিন্তু জানলে হইব কী, এ্যাজাহার! থানা লাগল পোন্দে। আমি হালা এ্যাখন যাই কই? কোঁনো গতিক না দেইখ্যা ট্যাঙ্কির উপরে হালা দুই দিন দুই রাত শুইয়া থাকলাম টান টান। বাইর কর্ অ হালারা—হ্যা-হ্যা…তর মায় অবশ্য রাত্র কইরা ভাত লইয়া আইতো। খাইয়া লইয়া শহরের সব হালাগো মাথার উপর ঠ্যাং ছড়াইয়া দিয়া মৌজ কইরা বিড়ি টানতাম। বুলাকি যেদিন ধরা পড়ল, সেইদিন নামলাম। জায়গাডা বেশ ভালো, বুঝলি। ফ্যালাগ টাঙ্গানের জন্য এউকগা শিক পোঁতা আছে, হ। গামছাখান দিয়া, বোজঝ্স, কইস্যা নিজেরে বাইন্ধা ফ্যালাইতাম শিকটার লগে। বাইস, আর পড়নের ভয় রইল না, যা খুশি করো—গাঁজা খাও, মদ খাও, মোদক খাও—খাও, কিন্তু পড়বা না। বেশ একটা ভালো ট্যাঙ্কি বানাইছে 'ছ্যাম্‌ডিয়ে'। ভিত্রে জল, উপ্রে আসামী—ব্যবস্থাখান চমৎকাইর। আর কী হাওয়া! য্যান পাঁচশ উয়াটের ফ্যান ঘুইরতে আছে। এ-ই আসল কথাখানই কওয়া হৈল না। রাত্র তর তখন, ধর গিয়া, দুইটা। ট্যাঙ্কির ঠিক নিচাডায় বঙ্কিম রোডে এউকগা লরি থামল, হ। আমি হালায় আল গোচ্চে ঘেট্টিখান বাড়াইয়া কুচি দিয়া দেখি বাইনচৎ রামজনম পিতল পাচার করে। আমার তো হৈয়া গেল রাগ। করন যায় কি? করুম আর কি, ক। আস্তে আস্তে খাড়ৈয়া হালাগো উপর দিলাম ছ্যাচ্ছ্যার কইরা মুইতা। সে যে কি কাণ্ড, তুই যদি দ্যাখতি নিতাই হাঃ হাঃ-হাঃ…এই নিতাই, কি কছ? ঘুম পাইছে! হালার পোলা, তোমারে পিটাইয়া আমি সিধা কইরা ফ্যালাইয়া দিমু না। ঘুম পাইছে! এখনতরি আর্ধেকটা সিঁড়ি পইড়া রইছে, আর হালার ঘুম পাইছে! ধর শক্ত কইরা, ধর—মুইক্কা মাইরা একেবারে—বান্দর। তুমি হালায় পইড়া যাও আর আমার ত্রিশখান টাকা যাউক। কদ্দিন এ্যাকলগে ত্রিশটা টাকা দেখি না, তা নাকি খ্যাল আছে হালার। আমি যদি বিশ টাকার ন্যাশাও করি, দশগা টাকাও তো তোগো দিমু নাকি। বান্দর—নিতাই, বাপ, রাগ করছস। দিমু, দিমু, দুগা রাজভুগ দিমু তরে। রাজভুগ খাইছিলাম এ্যাকদিন আশ মিটাইয়া, বুজ্ঝস। গোপীবাবু যেবার ভুটে দাঁড়াইলেন, বুঝলি, কইলেন, মতি, তগো বস্তির ভুটগুলা পাওয়াইয়া দে, চটকলে একটা কাম তরে আমি কইরা দিমু, আর থানার খাতাখন তর নামটাও কাটাইয়া দিমু। গুইনা গুইনা পাঁচশ বায়ান্নটা ভুট গোপীবাবুরে

পাওয়াইয়া দিলাম। সে অবশ্য ভোগা দিছিল। কিন্তু এ্যাকদিন রাজভুগ খাওয়াইছিল প্যাট ভইরা। কি সাইজ! এক একখান যান এ্যাক্কেরে এ্যাটম বুম। —পীনেবালে কো পীনে কা বাহানা চাহিয়ে—হা-হ্বা, হা-হ্বা…উঁ— প্রেমা, শালে, ত্রিশ রুপাইয়া, হু-হুঃ,হু-হুঃ—হাম শালে মোতি, হাম কোইকো পরোয়া নেই করতা—কাঁহে করেংগে, কোন শালেকো করেংগে উ—ইহা হ্যায় কোই ইমানদার, হ্যায় হ্যায়—এক্কো ভি নেহি—মোতি চোর, অঁ। অর তুমলোগ সব শালে সন্ত্, অঁা-শালে—এই নিতাই, কি কস—এ্যা, তিষ্টা পাইছে—কাম সাইরূছে—এইখানে জলপাই কই, 'স্থনা'—আর তিষ্টাই যদি পায়, তয় রাজ-ভুগের পাউক, জলের ক্যান—এট্টা গল্প কই শোন—এখন হইছে কী, দুই চোরের মধ্যে লাগছে ঝগড়া। এক হালায় বাসন চোর, আর এক হালায় 'স্থনা' চোর। বাসন চোর কয় যে, আমি বড়।—ক্যান? —না, আমি এত বড় বড় বাসন চুরি করি। হ্যাতে মেলাই বুদ্ধি দরকার। আর তুমি হালা এইটুক এইটুক গয়নাগাটি চোরাও। এ্যার মধ্যে কোন ম্যাজিস্টরি আছে হে? স্থনা চোর হাসে, আর কয়, আরে ব্যাটা, আমি এক রাইতে যা কামাই, তুই নি এক-মাসে তা কামাও। আমি মোকান বানাইছি, জমি-জিরাত করছি। আর তুমি হালায় করছটা কী? লুকজন আমারে কত সন্মান করে—তরে করে? বাসনচোরের আবার একটা কোনো ইজ্জত আছে নাকি, আউ।—শ্যাষ কাটালে দুই জনই ঠিক করল, চল, কাজীর কাছে যাই। তেনিই বিচার কইরা দিবেন আমাগো মইধ্যে কেটা বড়। দুইজনেই তো কাজীর কাছে গিয়া হাজির। কাজী সব কিছু শুইনা কোতোয়ালেরে ডাক দিয়া কইলেন, এই দুই হালারে বাইন্ধা ফ্যালাও। তারপরে এউকগা ধমক দিয়া দুইজনরে কইলেন, চোরের আবার ছোট বড় কি। চোর চোরৈ। যাও, ফাটক খাটো।—নিতাই, এ্যাম করে না বাপ। তর মতন বয়সে আমি আইড়ল্ খায় সাতরাইছি কত। আইড়ল্খা হ্যাখলে বুকের মইধ্যে পাক ধরে। নামে বিল, কামে সমুদ্র, আর এ তো জল না, কিছু না, সিঁড়িগা পাতা আছে, উইঠ্যা যাও সরসরাইয়া। তুই কান্ধের উপর বইয়া আছ, তাই একটু হাঁপ ধরে যান। একলা থাকলে কয়বার এ্যার মইধ্যে উঠা-নামা করতাম, হ।—মা কালীর পাও ছুঁইয়া কিরা কাটছি প্রেমার কাছে। তরে লইয়া যদি উঠতে না পারি প্রেমা যা কইব তাই শুনুম। প্রেমা কি কইব আমি জানি রে নিতাই। প্রসাদী সাউর সিন্দুকের থন্ এউকগা বন্ধকী কাগজ চুরি কইর্তে হইব হালার লেইগ্যা। —নিতাই,

একটু খাড়াই রে, দম লই। পাও য্যান কাঁপে রে নিতাই। তুই কিন্তু ছাড়িস না। আঃ কথাখান মনে রাখিস, চোর চোরৈ। ;মিন্‌ছিপালিটির চ্যারম্যানই হউক, দারগাই হউক, আর চটকলের সাহেবই হউক, চোর চোরৈ। ফাটক খাটব একলা মতি চোর; এ্যা! ওই হালারা সাধু হৈলে, হাম ভি সন্‌ত্‌। এই শালেলোগ, হাম সন্‌ত্‌। শুনতা কি নেই, হাম সন্‌ত্‌, মোতি—এ-ই শালে লোগ—কাজিসাহাব কাঁহা ভাগ গিয়া—এ লিতাই, কাজী, উঁ? হেই কাজি-সা-হা-আ-আ-ব—এ্যাই, নিচে তাকাইস না নিতাই। কী আন্ধার। মাথাখান য্যান পাক খাইয়া উঠল। নিচে তাকাইস না, কইলাম—আর দশখান সিঁড়ি বাকি। ঠিক উইঠ্যা যামু, নিতাই। আকাশখান য্যান মাথায় ঠ্যাকে মনে লয়।—আপ্‌সে জরুর মিলুংগা কাজিসাহাব, জরুর···স্তব্ধ রাতের বুক চিরে শহরের ওপর দিয়ে পাক খেয়ে খেয়ে শব্দগুলো ক্রমাগত ছড়িয়ে যায়, জরুর মিলুংগা কাজি-সাহাব—কা-জি সা-হা-আ-আ-ব, কাঁহা ছিপাকে হ্যায় হো-ও-ও-ও···

মুঘল চিত্রকলা ঃ অনুচিন্তন

নীহাররঞ্জন রায়

মুঘল চিত্রকলা ঐহিক, অভিজাত ও নাগরিক এ-কথা বলা সম্ভবত বাহুল্যমাত্র। তথাপি এই বৈশিষ্ট্যগুলির এমন কিছু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য আছে যার বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

যে কোনো সুঅঙ্কিত রেখা বা চিত্রই তাঁকে ঈশ্বরের কথা মনে করিয়ে দেয়—আবুল ফজল কর্তৃক উদ্ধৃত আকবরের এই কথাটি খুব গভীর অর্থে গ্রহণের কোনো প্রয়োজন নেই, বলা বাহুল্য, তাঁর সহধর্মীদের অপেক্ষাকৃত গোঁড়া অংশই ছিল উক্তিটির লক্ষ্য। মুঘল চিত্রকলার ঐহিক চরিত্র স্বপ্রতিষ্ঠ, বিষয়ে-মননে এই পৃথিবী ও এর প্রত্যক্ষ, জীবন্ত বর্তমানের প্রতি এই শিল্পের বিশ্বস্ত আনুগত্য খুবই স্পষ্ট। পারত্রিক বা জ্ঞানাতীতের প্রতি এর কোনো অভীপ্সা নেই। কিন্তু, শুধুমাত্র এই ঐহিকতার জন্য এই শিল্পকে হীনজ্ঞান করার কোনো কারণ নেই। চিরায়ত ভারতীয় শিল্পে লোকায়ত ও প্রচলিত প্রকাশমাধ্যম থেকে স্বতন্ত্র উচ্চাঙ্গের রচনার সঙ্গে তুলনা করারও কোনো প্রয়োজন নেই। চিরায়ত ভারতীয় শিল্প আধ্যাত্মিক ও জীবনের একটি ভাবমূর্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এ কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে। আরো বলা হয়ে থাকে যে, যেহেতু মানবজীবন ও অভিজ্ঞতার কিছু চিরকালীন বৈচিত্র্য এই শিল্পে অন্তরশায়ী, সেই হেতু এই শিল্প বিশ্বজনীন। ঐতিহ্য-আশ্রয়ী ভারতীয় শিল্পের উন্নত পর্যায়ের কোনো কোনো প্রধান অংশ সম্পর্কে এ-কথা সত্য বলে নিশ্চয়ই মেনে নেয়া যায়। কিন্তু তাই বলে আধ্যাত্মিকতা ও ভাববাদ উচ্চতর আদর্শ আর ঐহিকতা ও বস্তুবাদ নিম্নতর, এ ধরনের যুক্তি অবান্তর কারণ একটি বস্তু বা রীতি বা প্রস্থান অপরটির চাইতে শ্রেয় কি না এই বিচারে সেযুক্তি প্রাসঙ্গিকই নয়। পরন্তু, শিল্পপ্রসঙ্গে ব্যবহৃত ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, ভাববাদী, ঐহিক, বস্তুবাদী এই সব বিশেষণ সাধারণত একটি নির্দিষ্ট শিল্পের উদ্দেশ্য ও চারিত্রের বিবরণমাত্র দেয়—শিল্পের তুলনামূলক মূল্য নির্ধারণের কোনো ইঙ্গিতই দেয় না।

যে বিচিত্র কারণমালা ও ঘটনাপুঞ্জের দ্বারা একটি বিশেষ দেশকালের শিল্পের অন্বিষ্ট ও চরিত্র, প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, নিয়ন্ত্রিত ও নির্দিষ্ট হয়, তার ভেতর,

প্রেমিকা লয়লার বিরহে মজনু তার পোষা ঘোড়া ও কুকুর নিয়ে চলেছে। চারপাশের নগ্ন, ঊষর, বন্ধ্য পটভূমি, রঙের স্বল্পতম ব্যবহার, মজনু ও পশুদুটির সূক্ষ্ম বিবরণ নিশ্চয়ই কোনো দুর্ভিক্ষের অবস্থাকে চিত্রিত করেছে। লয়লা ও মজনুর কাহিনীকে চিত্রশিল্পী বসাওয়ান বাস্তব দুর্ভিক্ষ চিত্রণের অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বাঁ-হাতি নিচের কোণায় শিয়ালটির পালানোর ভঙ্গিতে বাস্তবতা আরো প্রকট হয়েছে—দুর্ভিক্ষে তো এক শিয়ালেরই খাবারের অভাব নেই!

মুঘল 'ন্যাচারালিস্ট' ঐতিহ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা বসাওয়ান-এর এই চিত্র ব্যক্তিক-অঙ্গ-বৈশিষ্ট্যের অন্যতম প্রধান ভাষ্য।

[মুঘল চিত্রকলা : নীহাররঞ্জন রায়]

সামাজিক ঐতিহাসিক হেতু ও পরিস্থিতিই ব্যক্তি-অনির্ভর সমাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ও তাৎপর্যপূর্ণ। অন্তত মুঘল দরবারি চিত্রের বিশ্লেষণ থেকে এই সংকেতই আসে। মুঘল রাজতন্ত্রের, অভিজাততন্ত্রের ও অমাত্যতন্ত্রের, এক কথায়, মুঘল দরবারের, ঐহিকতা, আভিজাত্য ও নাগরিকতা আর বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে তার মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক থেকেই মুঘল শিল্পের ঐহিক অভিজাত ও নাগরিক চরিত্র নিয়ন্ত্রিত ও নির্দিষ্ট হয়েছে। সামাজিক দলিল হিসেবে মুঘল শিল্প এই জীবনেরই "দর্পণে ইব" প্রতিচ্ছায়া। মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজ-জীবনের সামগ্রিকতায় এর অর্থ কী ছিল? অন্য কথায়, অক্রিয়মান কিন্তু দৃষ্টিগ্রাহ্য প্লাষ্টিক শিল্পের ইতিহাসে মুঘল চিত্রকলার সামাজিক তাৎপর্য কি?

খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে, যাকে আমরা মধ্যযুগ বলি, সেই কয়েক শতাব্দী ধরে, বিন্ধ্যের উত্তরবর্তী ভারতবর্ষের সামাজিক-ঐতিহাসিক পরিস্থিতি আত্মিক দিক থেকে নিঃস্বপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। যে আত্মিক অন্বেষা ভারতীয় জীবনের প্রাচীন ও ক্লাসিকীয় পর্বগুলিকে চিহ্নিত করেছিল, তা আর সক্রিয় নেই এবং নতুন অন্বেষা যদিও দেখা দিয়েছে (উদাহরণ—সুফি ও ভক্তি আন্দোলন, নির্গুণ সম্প্রদায়ের শান্তগণ) ইসলাম, বা হিন্দুব্রাহ্মণ্য ধর্ম কেউই সেগুলিকে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিচ্ছে না। মননচর্চার দিক থেকে অবস্থা ছিল শাস্ত্রান্ধ, প্রথাবদ্ধ সুতরাং বন্ধ্য,—টীকা আর ভাষ্যচাতুর্যের মরুবালুতে লুপ্ত। সামাজিক ধর্মীয় অবস্থা ছিল আচারসর্বস্ব, পশ্চাৎমুখী, গুহ্যপন্থী। আর ভারতবর্ষে এই অবস্থা যেমন হিন্দুব্রাহ্মণ্যধর্ম সম্পর্কে সত্য, তেমনি ইসলাম সম্পর্কেও সত্য। সৃজনচর্চার দিক থেকে পুথিচিত্রণের পশ্চিম ভারতীয় ধারা, সংখ্যায় তখনো সমৃদ্ধ হলেও অত্যন্ত রীতিবদ্ধ, অলঙ্কৃত ও অতিসজ্জিত আঙ্গিক কুশলতার শেষে এক অন্তিম অবস্থায় এসে ঠেকেছে। সাহিত্যে অবশ্য উজ্জীবনী বাতাস বইছিল, নতুন রচনারীতি তৈরি হচ্ছিল কিন্তু তার ভাষা ছিল আঞ্চলিক, তার উৎস ছিল অশাস্ত্রীয় ও প্রতিবাদস্পর্ধী,—তাই মুসলমান বা হিন্দুব্রাহ্মণ্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকেই তার সরকারি স্বীকৃতি জোটে নি। মিষ্টিক ও দেহবাদী কিন্তু প্রতিবাদ-মুখর আচারপন্থী অনেকগুলি গোষ্ঠীর ভেতর আধ্যাত্মিক ও মননশীল সৃজনশীলতা সম্যক ছিল। কিন্তু প্রধান প্রধান শক্তিশালী সরকারি সামাজিক ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি এদেরও কোনো স্বীকৃতি দেয় নি।

আমার মনে হয়, সেকালের সামাজিক-ধর্মীয় পরিস্থিতিতে আকবর ও

জহাঙ্গীরের মতো মুঘল সম্রাটদের ঐহিক জীবনদৃষ্টি ও মুঘল চিত্রকলায় শিল্পিত ঐহিকতার বিশেষ সামাজিক তাৎপর্য কখনোই ভোলা উচিত নয়। প্রথমত, কেবল সামাজিক-ধর্মীয় ক্ষেত্রেও একদিকে দরবারের ভেতরের ও চারপাশের লোকজনের প্রাণহীন আচারসর্বস্ব ধার্মিকতা ও অপরদিকে পণ্ডিত ও উলমাদের বন্ধ্যা শাস্ত্রীয়তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এই ঐহিকতাবোধের ভেতর নিহিত ছিল। দ্বিতীয়ত, এই ঐহিকতা বোধই কল্পনা ও দৃষ্টিগত উপলব্ধির ভাববাদী ভঙ্গী বদলে স্বতন্ত্র এক স্বাভাবিক ভঙ্গী সৃষ্টি করেছিল। বস্তুত পরোক্ষভাবে, এই ঐহিক জীবনধারণার ফলেই যতোটা সম্ভব জীবনঘনিষ্ঠ থাকার আবেগ মুঘলদের ভেতরে জন্মেছিল আর তাঁদের পৃষ্ঠপোষিত শিল্পকলায় এই আবেগই মুখর ও বাঙময় হয়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে এ কথা বলা প্রয়োজন যে তিমুরিদ ও সফবিদ চিত্রকলায় যে জীবনদৃষ্টি প্রকাশিত, তা থেকে মুঘলদের জীবনদৃষ্টি স্বতন্ত্র। বস্তুত পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের ইরানীয় চিত্রকলা—গীতিধর্মী, ভাববাদী, আর রোম্যান্টিক, প্রতীকী আর চিত্রবহুল, কোনো বিচারেই স্বাভাবিক ন্যাচারালিষ্টিক নয়। তৃতীয়ত, ব্যক্তির মর্যাদাবৃদ্ধি, প্রতিকৃতি (পোর্ট্রেট) চিত্রের গুরুত্ববৃদ্ধি ও সম্ভবত চিরাগত অপরিচয় থেকে শিল্পীর মুক্তি সম্ভব হয়েছিল এই ঐহিক জীবনবোধের ফলেই। বস্তুপুঞ্জের পুঙ্খানুপুঙ্খ ও তীব্র পর্যবেক্ষণ এবং আবেগঘন রেখায় ও রঙে সমস্ত সূক্ষ্ম ভেদাভেদসহ তার রূপায়ণ,—এই পার্থিব জীবনের প্রতি ও সেই জীবন যা কিছু দিতে পারে সে সব কিছুর প্রতি তীব্র আসক্তি থেকেই এসেছে। মুঘল চিত্রে যে গতি ও নাটকীয়তা, যে ঐশ্বর্য ও সমারোহের উপাদান লক্ষ্য করা যায়, তা ছিল সেই সময়ের শিষ্ট ও অভিজাত জীবনেরই অপরিহার্য অংশ। যে-কথাটি আমি বলবার চেষ্টা করছি তা হলো, সেই সময়ের ঐতিহ্যাশ্রয়ী ভারতীয় জীবনবোধের বিপরীতে এই জীবনবোধ ও তার বিভিন্ন প্রকাশ, জাতিগত ও ঐতিহাসিক নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও, সম্পূর্ণতই নতুন। এই জীবনবোধ যতটা নতুন ছিল আর ঐতিহ্যাশ্রয়ী ভারতীয় দৃষ্টি ও জীবনবোধের সঙ্গে এই নতুন জীবনবোধের সমন্বয় ও সংহতিসাধন করতে মুঘল চিত্রকলা যতটা সাহায্য করেছে, সেই বিশেষ সময়ের ঐতিহাসিক দায়িত্ব মুঘল চিত্রকলা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে ঠিক ততোটাই পালন করেছে। সেদিক থেকে এটা ঐতিহ্যের সমৃদ্ধিসাধনও বটে, কারণ, মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতিতে এর ফলে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে এবং ঐতিহ্যাশ্রয়ী ভারতীয় জীবন ও মননে সুস্থ ঐহিকতার

প্রবণতা ও ঝোঁকের অবশেষটুকু এর ফলে শক্তিশালী হয়েছে। যাই হোক না কেন, কৌটিল্য আর বাৎস্যায়ন তো আর মিথ্যা ছিলেন না, আর, চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যা, স্থাপত্য ও ভিত্তিবিদ্যা, রাজনীতি ও অর্থনীতি, প্রেম ও কামবিদ্যা ইত্যাদি সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি রচনাগুলো তো আর ঐহিকতার বোধ-শূন্য কোনো সামাজিক শূন্যতায় রচিত হয় নি!

মুঘল চিত্রকলা দরবারী শিল্প, চরিত্রে অভিজাত। শুদ্ধ শৈল্পিক ও নান্দনিক অর্থে বৃত্তিগত জিজ্ঞাসা ছাড়া কোনো ধরনের মননশীল জটিলতার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এর ভেতর নিহিত নেই, এমনকি সে ভানটুকুও নেই। এর বাজার-সংস্করণে ও পরবর্তীকালের আঞ্চলিক বিকাশের সময়ও এই শিল্পের দরবারী অভিজাত ঐতিহ্য ছিল পরিবর্তিত। কিন্তু সম্রাটের দরবারে যা ছিল সূক্ষ্ম ও জটিল, বাজারে ও আঞ্চলিক সামন্তদের সভায় তা হয়ে পড়লো স্থূল, কঠিন, উচ্চকিত। চিরায়ত ভারতীয় শিল্পের উচ্চাঙ্গিক ধারাও প্রধানত শাস্ত্রীয়—তার তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা ধর্মীয় রীতি, সম্প্রদায় ও আচারের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে নিয়ন্ত্রিত ও/বা নির্দিষ্ট হয়েছে। ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক বা শাস্ত্রীয় নিয়ন্ত্রণের গ্রাস থেকে মুক্ত করে শিল্পকে ধর্মনিরপেক্ষ কর্তৃত্বের অধীনে আনায় প্রথম সংগঠিত প্রয়াস—মুঘল চিত্রকলা। দিল্লিতে ও প্রাদেশিক রাজধানীতে কিছু অসংগঠিত প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষ কর্তৃত্ব এক রাজদরবারেরই ছিল। মুঘল চিত্রকলার অভিজাত চারিত্রের কারণ এখানেই নিহিত। মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থায় অন্য রকম হওয়ার উপায় ছিল না। কিন্তু এই পরিবর্তনের ফলে শিল্পকলা এতটাই বৃত্তিমুখী হয়ে উঠলো যে, শিল্পী হিসেবে বৃত্তিগত ক্ষমতা ও সামর্থ্যের নিরিখেই শিল্পীর উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির সাফল্য পরীক্ষিত ও নির্ধারিত হতো,—অঙ্কিত চিত্রবহির্ভূত আর কোনো ঘটনার দ্বারা নয়। অন্য ভাষায় বলা যায়, শিল্পগত ও নান্দনিক বিবেচনার ভেতরই শিল্পীর উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সীমাবদ্ধ ছিল, তাঁর বিষয় ও দৃষ্টিক্ষেত্রকে কোন উপায়ে ও পদ্ধতিতে দর্শকের দৃষ্টিতে সম্ভাবনাপূর্ণ, বিশ্বাসযোগ্য ও রমণীয় করে তোলা যায় তাই নিয়েই ছিল তাঁর প্রধান ভাবনা। বিষয়ের দিক থেকে এই শিল্প যে অভিজাত সে তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু এমনকি তার আঙ্গিক ও নকশায়, রঙ-নির্বাচনে ও রঙ-পরিকল্পনায় এবং রচনাগত সংগঠনে-ও এই শিল্পের অভিজাত প্রকৃতি সবসময় প্রত্যক্ষ। এমনকি এই শিল্পের বাজার-সংস্করণও এই অভিজাত প্রকৃতি ছাড়াতে পারে নি, কারণ এই প্রকৃতি এই

শিল্পের বিষয় ও আঙ্গিকের ওতপ্রোত।

দরবারী ও অভিজাত পৃষ্ঠপোষকতায় এই শিল্প লালিত হয়েছে এবং সর্বদাই সেই পৃষ্ঠপোষকদের রুচি ও কৌতূহল চরিতার্থ করাই এই শিল্পের উদ্দেশ্য ছিল। সেই কারণেই শিল্পীদের পেশাদারি দক্ষতা ও যোগ্যতার ওপর জোর পড়েছে।

কখনো কখনো সাধারণ জীবনযাত্রার চেহারা ধরা পড়লেও মুঘল চিত্রকলা নগরকেন্দ্রিক। আর সেই সাধারণ জীবনযাত্রার মূল প্রকৃতিও ছিল নাগরিক-ই। তা-ছাড়া অন্য কোনো উপায়ও ছিল না, কারণ, এর উৎসই নাগরিক। পরন্তু ঐতিহাসিক পরিবেশগত ও মূলগত কারণে ইসলামী সংস্কৃতি প্রকৃতিতে ও চরিত্রে ছিল নাগরিক। "সংস্কৃতি"-বাচক বিশিষ্টতম আরবি শব্দ "তমদ্দুন" এসেছে প্রাতিপদিক "মুদন" থেকে—তার অর্থ মরুভূমি অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র নগর। এবং এই নগরপ্রাকারের ভেতরেই আদি মুসলিমদের জীবন ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। সেই কারণে, মরুচর বা "বেদুইন"দের সংস্কৃতি থেকে এই সংস্কৃতি বহুকাল সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। পরবর্তীকালেও, সরকারি ইসলাম ও প্রভাবশালী শ্রেণীর উচ্চ-ইসলাম-সংস্কৃতি আকার ও গড়ন পেয়েছে নগরকেন্দ্রেই ও সেখানেই এই উভয় সংস্কৃতি-কেন্দ্রিভূত হয়েছে। সামাজিক-ধর্মীয় পরিস্থিতির সামগ্রিক পার্থক্য সত্ত্বেও ভারতবর্ষেও সেই একই ঘটনা ঘটলো। মুসলমান তুর্কি, আফগান ও মুঘল—প্রত্যেকেই বিজয়ী হিসেবে এসেছে। তাদের রাজন্যবর্গ, অমাত্যবর্গ ও অভিজাত-বর্গের প্রত্যেকেই ছিল নগর-লালিত। খুব সহজবোধ্য কারণেই দুর্গবেষ্টিত নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন নগরে বসবাস করতেই তাঁরা পছন্দ করতেন আর বাইরের জীবন থেকে সেই নগরের জীবন ছিল আলাদা। বাইরের যে গ্রামজনপদ থেকে রাষ্ট্র ও সরকারের ভরণপোষণ চলতো সেখানে ক্রমবর্ধমান ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের নতুন ধর্মান্তরিত অধিকাংশ মানুষজন বসবাস করতেন। সেখানে, ঐতিহ্যাশ্রয়ী ভারতীয় কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির জীবন যেভাবে চলতো, তাঁদের জীবনও সে-ভাবেই চলতো। কিন্তু ব্রাহ্মণ বা অ-ব্রাহ্মণ হিন্দু সমাজের মতো স্থানীয় সামাজিক ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা সামাজিক-ধর্মীয় আচরণের ধরনধারণ ভারতীয় মুসলিম সমাজে নির্দিষ্ট হতো না।—প্রধানত ছোট বড় নানা নগরকেন্দ্রিক ধর্মীয় ও নৈতিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা তা নির্ধারিত হতো। ফলে তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত ছিল—তারা উভয়েই রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রকাশ্য বা আধা-প্রকাশ্য শাস্ত্রবচনের দ্বারা শাসিত হতো। এতৎসত্ত্বেও স্থানীয় মিশ্রিত সমাজ-

জীবনের চাপে ইসলামের স্থানীয় সংস্করণ ও গ্রামীণ কৃষিজীবী ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের স্থানীয় সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-আচরণের জন্ম ঘটে গেল। এমনকি স্থানীয় প্রথা ও রীতিরও। এতে অবশ্য হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য এই উভয় অংশেরই একটি ভূমিকা ছিল। কিন্তু এ সমস্তকে নাগরিক ও সরকারি ইসলাম কখনোই স্বীকৃতি দেয় নি। ভারতবর্ষের ইসলামের সুফি-সংস্করণের বেলাও, এক না হলেও, প্রায় অনুরূপ ঘটনাই ঘটলো। ধর্ম ও আচারের দিক থেকে ভারতবর্ষে সুফিবাদের খুবই প্রচলন ছিল। মিষ্টিক হিন্দুধর্ম ও মিষ্টিক ইসলাম গ্রামাঞ্চলে ও নগরকেন্দ্রগুলিতে সুফিতে এসে এক সমক্ষেত্রে দাঁড়ালো। কিন্তু সরকারি ইসলাম, অন্তত ভারতবর্ষে একে কোনো স্বীকৃতিই দিল না। অন্যসব সাক্ষ্য বাদ দিলেও শুধু চিত্রশিল্পের সাক্ষ্যের জোরেই বলা যায়, আকবর ও জহাঙ্গীর উভয়েই সুফি ধর্ম সুফি মিষ্টিক ও তাঁদের আচার-আচরণের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু তৎকালীন সমাজ-পরিবেশে ঐতিহ্যাশ্রয়ী গ্রাম-নগর সম্পর্কের বেলায় এর সামাজিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য কেউ-ই বুঝতে পেরেছিলেন মনে হয় না। প্রাকারবেষ্টিত নগরের বাইরে মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের জীবন ও সংস্কৃতি স্থানীয় গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছিল ও গ্রামীণ কৃষিনির্ভর সম্প্রদায়গুলি নগরকে আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাসহ বৈষয়িক শক্তি ও কর্তৃত্বের কেন্দ্র ছাড়া আর কিছুই ভাবতো না—এই ঘটনার প্রতি সচেতন থাকা "গ্র্যাণ্ড" মুঘলদের পক্ষে সম্ভবই ছিল না—ইরান ও মধ্য এশীয় নাগরিক ঐতিহ্যে তাঁরা এমন মগ্ন ছিলেন। বস্তুত, ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মেই হোক আর জনপ্রিয় লৌকিক স্তরেই হোক মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের আঞ্চলিক সাহিত্যগুলোতে, খুব বিরল ক্ষেত্রে ছাড়া, নগর প্রায় কখনোই জীবন ও কর্মের কেন্দ্র হিসাবে উল্লেখিত হয় নি। প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই সাহিত্যের পরিবেশ স্থানীয় গ্রামীণ কৃষিনির্ভর জীবনের সঙ্গে অন্বিত; প্রতিমা ও প্রতীকও তাই। ব্রাহ্মণ্য হিন্দু বা অ-ব্রাহ্মণ্য লোকায়ত প্লাষ্টিক আর্টের বেলাতেও ঘটনা অন্যরকম কিছু হয় নি। অপরদিকে, মধ্যযুগের ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায় কোনো লোকায়ত বা সাধারণ্যে প্রচলিত প্লাষ্টিক আর্টের ধারা সৃষ্টি করতে পারে নি এবং যে রোম্যান্টিক কিস্‌সা বা লিরিক কবিতা তারা সৃষ্টি করেছিল, সে সবই নাগরিক ধরন-ধারণে অত্যন্ত প্রভাবিত বা অতিরঞ্জিত। ভারতীয় মুসলিম সাহিত্যের এই ধারাকে রাষ্ট্রীয় ইসলাম যে কখনোই কোনো-ভাবে স্বীকার করেনি এটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সঙ্গীতেও, ভারতীয় মুসলিম

নাগরিকতার প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। পাঁচ শতাধিক বৎসর ব্যাপী মুঘল ও তুর্কি শাসনের ফলে উপরোক্ত অবদানের অনেকগুলিই মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজে সামন্ততন্ত্রের উচ্চতর স্তরে স্থায়ীভাবে থেকে গিয়েছিল,—সে যতই সরল বা তরল সংস্করণে ও পরিবর্তিত আকারে হোক না কেন। মুঘল শিল্পের সামাজিক অবদান হিসেবে এই গুণগুলিরই প্রকাশ ঘটেছে—এমনকি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আঞ্চলিক ইসলামি দরবারগুলিতে বা দিল্লি ও লখনউ-এর বাজারগুলিতেই শুধু নয়, রাজস্থানী ও পাহাড়ী মিনিয়েচারের বিস্তৃত অংশে, বিশেষত রাজসভার দৃশ্যে ও প্রতিকৃতিতে এবং শিখ ও মরাঠা চিত্রকর্মেও। আমি এই কথাটি বলতে চাইছি যে, ঐতিহ্যাশ্রয় ভারতীয় শিল্প ও জীবন থেকে যতই দূরবর্তী বা কিছুটা ঐতিহ্যবিরুদ্ধ হোক না কেন, এই অবদানকে ভারতীয় জনধারার অন্তত একটি অংশ,—নাগরিক ও অভিজাত সামন্ততান্ত্রিক সংখ্যালঘু অংশ,—প্রত্যাখ্যান করে নি এবং সেদিক থেকে এই অবদানগুলি মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতিকে পুষ্ট করেছে। সুতরাং ভারতীয় শিল্প, জীবন ও সংস্কৃতির দীর্ঘ ইতিহাসে মুঘল চিত্রকলাকে একটি বিচ্ছিন্ন অধ্যায় হিসেবে বাতিল করার কোনো যুক্তি নেই।

সেই সঙ্গে এটাও স্বীকার করতে হয় যে গঠনচারিত্রে ও সামাজিক নান্দনিক আবেদনে মুঘল চিত্রকলা নাগরিক, রীতিসিদ্ধ, শিষ্ট ও অভিজাত হওয়ায় শুধুমাত্র নাগরিক, ভদ্র, শিষ্ট ও অভিজাত সমাজের ভেতরই সীমাবদ্ধ ছিল। বস্তুত, এই শিল্প কেবল তাঁদের জন্যই রচিত হতো—রাজকীয় গ্রন্থাগারে মূলচিত্রটি রক্ষিত হতো আর প্রতিলিপি বিতরণ করা হতো বন্ধু রাজাদের ভেতর, সভাসদ ও অমাত্যবর্গের মধ্যে। সমগ্র সাধারণ জনসমাজ ছিল শিল্পী, তাঁর পৃষ্ঠপোষক ও শিল্পের সীমার বাইরে। রাজসভা, অভিজাততন্ত্র ও অমাত্যবর্গ থেকে দূরে, নগরকেন্দ্রগুলির বাইরে সাধারণ মানুষের শিল্প সম্পর্কে কোনো অবহিতি বা অভিজ্ঞতা ছিল না—আসলে শিল্পের কোনো প্রয়োজনই তাঁদের ছিল না, তাই কোনো উপলব্ধিও ছিল না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পূর্বভারতের বৌদ্ধ পুথিচিত্রণ ও পশ্চিম ভারতের জৈন ও বৈষ্ণব চিত্রকলা সম্পর্কে-ও এই একই কথা প্রযোজ্য। উভয় ক্ষেত্রেই শিল্প একটি নির্দিষ্ট অংশের ভেতর ব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু ঐতিহ্যাশ্রয়ী ভারতীয় শিল্প, এমনকি এর উন্নততম স্তরেও, শ্রেণী ও গোষ্ঠী-নিরপেক্ষভাবে সাধারণত সমগ্র সমাজের জন্যই রচিত হতো। কারণ এই শিল্পগুলির প্রদর্শনশালা, মন্দির ও সংঘ বা যাই হোক না কেন সবই ছিল উচ্চতম

থেকে নিম্নতম শ্রেণীর সকল মানুষেরই বিচরণ ভূমি—অবশ্যই যদি সেই নিম্নতম পর্যায়ের কেউ অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত না হয়। এখানেই মুঘল শিল্পের সামাজিক সীমাবদ্ধতা। কিন্তু, অনুমান করি, সেই কারণে ভারতীয় জনধারায় নাগরিক ও অভিজাত অংশের জীবনে ও সমাজে এবং উন্নত ভারতীয় শিল্পে নতুন মাত্রাযোজনার যে ঐতিহাসিক ভূমিকা এই শিল্প পালন করেছে তা খর্ব হয় না।

কিন্তু আমার মনে হয়, মুঘল শিল্পের আরো তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল।

"গ্র্যাণ্ড" মুঘলরা যখন ভারতবর্ষে রাজত্ব করছিলেন তখন (ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী) ভারতবর্ষের বৃহত্তর অংশে, যাকে হিন্দুস্তান ও দখন বলা হতো সেই ভূখণ্ডে, বিভিন্ন বিশ্ব-সংস্কৃতির প্রতিনিধিস্থানীয় কোনো কোনো ধারা বহমান ছিল। হিন্দুস্তান ও দখন তার আগের দুই শ বছর বা তার বেশি সময় ধরে ধারাবাহিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু বিশ্বসংস্কৃতির এই প্রতিনিধি-স্থানীয় ধারার বাহকগণ যখনই উপলব্ধি করলেন যে তাঁরা এখানে স্থায়ীভাবে থেকে যেতে পারেন তখনই তাঁরা এই ভূখণ্ডে অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল জীবন যাপনের উপায় ও শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন এবং এইভাবে নিজেদের সংহত করতে চাইলেন। এই কাজের ভেতর দিয়ে তাঁরা তাঁদের ঐতিহাসিক ভবিতব্যতা সম্পর্কে সচেতন হলেন এবং এই সচেতনতা এই রাজবংশের তৃতীয় ও মহত্তম সম্রাট, আকবরের ভেতর মূর্তিগ্রহণ করলো। সময়—ষোড়শ শতকের তৃতীয় পাদ। নিজের চার পাশে বিভিন্ন সংস্কৃতির বিচিত্র উপাদানগুলির সমন্বয়ে, যদি একটি সংহত সংস্কৃতি গড়ে তোলা নাও যায়, অন্তত পক্ষে একটি যৌগিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা ছিল তাঁর ঐতিহাসিক দায়িত্ব। দেশকাল কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার ভেতর তাঁর ভূমিকা যথার্থ ও প্রশংসনীয়ভাবে তিনি পালন করেছেন এবং তাঁর পরিকল্পিত সমন্বয় সাধনের একটি নীতিপদ্ধতি তিনি প্রণয়ন করে গিয়েছিলেন। মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের পরবর্তী অধ্যায়ে ভারতীয় জীবনে ও কর্মে আকবরের পরে যাই ঘটে থাকুক না কেন, অন্তত মুঘল চিত্রকলায়, এমন কি এর আঞ্চলিক ও বাজার-সংস্করণেও, এবং সম্ভবত ভূমি ও রাজস্বব্যবস্থায় কিছুটা,—এই নীতিপদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিল। কিন্তু চিত্রকলা ও স্থাপত্য এই দুই প্লাষ্টিক আর্ট ছাড়া শিল্পের আর কোনো ক্ষেত্রেই মুঘলরা তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা এত কৃতিত্ব ও সাফল্যের সঙ্গে পালন করতে পারে নি।

বর্তমান আলোচনার প্রসঙ্গে মুঘল চিত্রকলা সম্পর্কে এই উক্তির একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

মুঘলদের জাতিগত উৎস যাই হোক না কেন, আবেগ ও আদর্শের দিক থেকে তাঁরা সেই বুনিয়াদি সংস্কৃতির সঙ্গে অন্বিত ছিলেন, যাকে আমি বলেছি —ইরান-মধ্যএশীয়। ধর্মীয় ও ধর্মতত্ত্বীয় বিষয়ে ও প্রকৃতিতে এই সংস্কৃতি ছিল ইসলামীয়। কিন্তু মুঘলরা যখন ভারতীয় ইতিহাসে আবির্ভূত হলেন, বিশেষত কাবুল-লালিত হুমায়ুনের কাল থেকে, তখন যে প্রধান সংস্কৃতি তাঁদের পুষ্ট করেছে তা ততটা মধ্যএশীয় নয়, যতটা ইরানীয়। বাবুরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই মধ্যএশীয় স্মৃতি-আতুরতা ক্ষীণ হয়ে গেছে, যদি সম্পূর্ণ উবে গিয়ে না-ও থাকে। ভারতীয়দের কাছে এই দুই সংস্কৃতি ছিল প্রায় তুল্যমূল্য। বস্তুত, চিত্রকলার ইতিহাসে নবম-দশম শতাব্দীতে ইলোরার জৈনগুহাচিত্রে যখন এই অভিঘাত প্রথম বোঝা গেল তখন থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে পশ্চিম ভারত, রাজস্থান ও মালবের পুথিচিত্রের বিশাল সাক্ষ্য-প্রমাণ যখন মিললো তখন পর্যন্ত কোন উপাদানগুলি ইরানীয় আর কোন উপাদানগুলি মধ্যএশীয় ও কতটা, তা নির্দিষ্ট ও বিচ্ছিন্ন করা খুবই কঠিন। মধ্য এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল দুই পথে— একটি পথ তাজিকিস্তান (পশ্চিম চালুক্য ও রাষ্ট্রকূটদের খোদাইলিপিতে তাজিকদের উল্লেখ আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না) ও উজবেকিস্তান থেকে সোজা আফগানিস্তান হয়ে ভারতে এসেছে এবং আর একটি পথ ইরাক ও ইরানের মধ্য দিয়ে উপকূলপথে গুজরাটে এসে পশ্চিম উপকূলে ধরে নিচে চলে গেছে। সুতরাং চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় পুঁথিচিত্রের কতকগুলি উপাদান হেরাট ও বুখারার মতো মধ্যএশীয় কেন্দ্রগুলি ও আজারবাইজান থেকে এবং আর কতকগুলি উপাদান ইরান ও ইরাক থেকে সরাসরি এসে থাকতে পারে। পরাক্রান্ত ও প্রণোদনাশীল ইরানের ভেতর ইরাক লুপ্ত হয়ে গেছে। অতএব, বাস্তবক্ষেত্রে, অন্ততপক্ষে হুমায়ুনের কাল থেকে, মুঘল দরবারী সংস্কৃতির উপর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব এসেছে ইরান ও ইরাক থেকে, উৎস বিচারে যাকে ইরানীয় বলা হয়ে থাকে। আকবরের দরবারে ইরানীয় অমাত্য, সেনাধ্যক্ষ ও পণ্ডিতদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি ও প্রভাব এই অবস্থাকেই সুনিশ্চিত করেছে। কিন্তু কেউ যেন ভুলে না যান যে উৎসবিচারে ইরানীয় সংস্কৃতির ভেতরও অনেকখানি মধ্য এশীয় উপাদান সক্রিয় ছিল।

চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষচিত্রকলায় (ও স্থাপত্যে)

প্রকাশিত এই ইরানীয়-মধ্যএশীয় সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ স্বাদ ও অভিজ্ঞতা লাভ করলো। কিন্তু হুমায়ুন যখন কাবুলে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে তখন হুমায়ুন ও তাঁর তরুণ-পুত্র আকবর যে চিত্রশিল্পের সম্পর্কে এসে প্রেরণা ও উৎসাহ পান, সে চিত্রশিল্প নিশ্চিত ভাবেই শিষ্ট ইরানীয়। ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দে আব্‌দ্-উস-সামাদ কাবুলে এলে সপুত্র সম্রাট যে "চিত্রশিল্প বিষয়ে আগ্রহী হন" সে-বিষয়ে নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আছে। এবং ধরে নেয়া যায় তাঁর কাছ থেকে তাঁরা শিক্ষালাভ শুরু করেন। তেহ্‌রানে গুলিস্তান প্রাসাদ গ্রন্থাগারে গুলসান অ্যালবামে আব্‌দ্-উস-সামাদ অঙ্কিত দুটি চিত্র আছে। দুটিতেই তরুণ রাজপুত্র আকবর উপস্থিত। কিন্তু এই দুইটি মিনিয়েচার চিত্রের জোরে এ-কথা বলা কঠিন যে মুঘল চিত্রকলার জন্ম কাবুলে হয়েছিল। কারণ এই চিত্র দুটির প্রতিলিপি থেকে যতটা বিচার করা যায় তাতে এতে এমন কিছুই নেই যা তৎকালীন ইরানীয় চিত্রকলা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। মাত্র এইটুকুই বলা যেতে পারে যে পিতাপুত্র আব্‌দ্-উস-সামাদ ও মীর সয়িদ আলির মতো শিল্পীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং এই শিল্পীরা চিত্রকলায় তাঁদের রুচি ও প্রবণতা গঠনে সাহায্য করেছেন।

সে যাই হোক, মুঘল শিল্পরীতি গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে আকবর যখন তাঁর রাজকীয় গ্রন্থাগার ও দরবারী শিল্পাগার গড়ে তুলছিলেন তখন তিমুরিদ্ ও সফবিদ রীতির বুনিয়াদি ইরানীয় ঐতিহ্য ছাড়াও ইরানীয়-মধ্যএশীয় এক বিশেষ ঐতিহ্যও সক্রিয় ছিল। চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত দিল্লি ও প্রাদেশিক সুলতানদের দরবারে এবং অংশত পশ্চিম ও মধ্যভারতীয় নাগরিক পুঁথিচিত্রণে এই ঐতিহ্যেরই সাক্ষাৎ আমরা পাই।

দ্বিতীয়ত, জৈন প্রতিষ্ঠানগুলি, নগরের ব্যবসায়ী ও বণিক আর অ-মুসলিম বৃহৎ ভূস্বামীদের দ্বারা সক্রিয়ভাবে সমর্থিত ও পোষিত পশ্চিম ও মধ্যভারতীয় রাজস্থানী ও অবধী দেশীয় চিত্রকলা-ঐতিহ্য অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। মুঘলদের সঙ্গে সংযোগের ফলে এই ঐতিহ্যই পরবর্তীকালে রাজস্থানী চিত্রকলারূপে বিকশিত হয়ে ওঠে।

তৃতীয়ত, শুধুমাত্র সুদূর নেপাল, লদক ও কাশ্মীরেই নয়, এমনকি উত্তর-ভারতের সমতলে মৃৎশিল্পী, ধাতুশিল্পী, দারুশিল্পীদের ভেতর ভারতীয় ক্ল্যাসিক চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের তখনো সম্ভাবনাময় ঐতিহ্য দুর্বল হলেও সক্রিয় ছিল। মুঘল শিল্পের গঠনপর্বে ও পরবর্তীকালেও এই ঐতিহ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

সর্বশেষে, তৎকালে প্রচলিত য়ুরোপীয় রেনাসাঁস-চিত্রকলার উপাদানগুলি সক্রিয় ছিল, এমনকি, মুঘল আঙ্গিক ও রীতি গঠনের প্রাথমিক পর্বেও। পরবর্তীকালে এই য়ুরোপীয় অভিঘাতের ফল ক্রমেই গভীরতর হয়। শেষ পর্যন্ত, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, তখনো পর্যন্ত মুঘল শিল্পরীতি বলতে যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তার ওপর, এই য়ুরোপীয় উপাদন-গুলি চেপে বসতে শুরু করে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের য়ুরোপীয় চিত্রকলার সঙ্গে আকবরের যোগাযোগের কথা বিশেষত ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ফতেহ্‌পুর-সিক্রির দরবারে গোয়া থেকে জেস্থইট মিশনকে আমন্ত্রণ করে আনার ফল কি হয়েছিল তা সুবিদিত। কিন্তু হম্‌জা ও তুতিনাম-এর কয়েকটি চিত্র বিশ্লেষণ করে আমার সন্দেহ হয়েছে যে এই যোগাযোগ ১৫৬০ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল, যদিও ১৫৭৩ সাল থেকে জোরদার হয়,—সে সময় আকবর গুজরাটে জীবনে প্রথম য়ুরোপীয় মানুষ দেখেন। সেখানে তিনি পর্তুগিজ বণিকদের সম্পর্কেও আসেন। য়ুরোপীয় শিল্প ও কারিগরির সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ এরও অনেক আগে থেকে শুরু হয়ে থাকতে পারে। ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামা কালিকটে নামেন এবং ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের মধ্যে পর্তুগিজরা গোয়া, কোচিন ও কালিকটে কারখানা স্থাপন করেছে। ১৫৭০ সাল নাগাদ লিসবনের ব্রাদার অরণহ্ গোয়া ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন। তিনি নিজে যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন চিত্রশিল্পী, কারিগর ও স্থপতি ছিলেন। আকবরের মতো মননশীল, কৌতূহলী ও অনুভূতিপ্রবণ একজন মানুষ যে এই সব ক্রিয়া-কর্মের খোঁজ রাখতেন না,—এটা প্রায় অসম্ভব ঠেকে। এবং ধর্মপ্রচারের পক্ষে দৃশ্যগ্রাহ্য শিল্পই সবচেয়ে কার্যকর ও সম্ভাবনাপূর্ণ মাধ্যম, এ-কথা জানা সত্ত্বেও পর্তুগিজ মিশনারিগণ গোয়া, কোচিন ও কালিকট থেকে দূর-দূরান্তে তাঁদের খৃস্টান-চিত্রমালা ছড়িয়ে দেন নি ও আকবর বা তাঁর শিল্পীরা এই চিত্রগুলির কোনো একটি দেখেন নি—একথা কল্পনা করা বেশ কঠিন। নইলে, সেই অঞ্চল থেকে শুধু সংবাদ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নয়, শিল্পকলার মৌলিক নিদর্শন সংগ্রহ করে নিয়ে আসার জন্য ও তা নেহাৎই সম্ভব না-হলে সেই মৌলিক নিদর্শনগুলির প্রতিলিপি ও রেখাচিত্র অন্তত এঁকে নিয়ে আসার জন্য শিল্পী ও কারিগরদের এক দলসহ তাঁর অন্যতম বিশ্বস্ত দূত, হাজী হবীবুল্লাহ্‌-কে আকবর ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে গোয়ায় পাঠালেন কেন? কিন্তু এইসব তথ্য বাদ দিলেও, এমন কি প্রথম পর্বের আকবরী-চিত্রের সাক্ষ্যেও প্রমাণিত

হয় যে আকবরের দরবারে তৎকালীন শিল্প-পরিবেশে, য়ুরোপীয় রেনাসাঁস-চিত্রকলাও একটি উপাদান ছিল। এই ঘটনা সম্পর্কে বাবুর বা হুমায়ুন সচেতন ছিলেন না, বস্তুত তাঁদের সচেতন হওয়ার কোনো অবকাশও ছিল না—যদিও হুমায়ুন যখন তাঁর রাজ্য ফিরে পেলেন তখন গোয়া, কোচিন ও কালিকটে য়ুরোপীয়রা প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল জুড়ে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে।

এইভাবে, ইতিহাস আকবরের সম্মুখে আগ্রহোদ্দীপক অথচ অত্যন্ত জটিল এক সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি উপস্থিত করেছিল। বিচিত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে শিল্পী নির্বাচন করে তিনি যে-ভাবে তাঁর শিল্পশালা সংগঠিত করেছিলেন ও তাঁর প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় যে-সব চিত্র রচিত হয়েছিল, তাতে এটা পরিষ্কার যে পরিস্থিতির জটিল বিন্যাস তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং তাঁর সামনে উপস্থিত সমস্যাবলী সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। তিনি কিভাবে এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন ও সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন, চিত্রমালাতেই তার প্রমাণ আছে।

তাঁর আবিষ্কৃত সমস্যা ও সমাধানের দিকে শিল্পীদের উপলব্ধি ও অনুভূতিকে তিনি কিভাবে জাগ্রত করেছিলেন সেই স্তরপরম্পরাগত পদ্ধতির ইতিহাস এই প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত চিত্রমালায় বিধৃত হয়ে আছে। তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছিল ইরানীয় পরিবেশে। কিন্তু ভারতবর্ষে এসে ও সিংহাসনারোহণের পর এ-কথা বুঝতে তাঁর কণামাত্র দেরি হয় নি যে এইটিই তাঁর জীবনের বিকাশভূমি এবং সেই কারণে সঙ্গে সঙ্গেই দূর ও নিকট অতীত থেকে ও য়ুরোপসহ অন্যান্য সমসাময়িক উৎস থেকে উৎসারিত এই দেশের বিচিত্র সাংস্কৃতিক ধারা ও ঐতিহ্যকে তিনি যতটা সম্ভব স্বীকরণের চেষ্টায় বৃত হন। তাঁর স্বদেশের অতীত ও যে-দেশকে তিনি তাঁর স্বদেশরূপে গ্রহণ করেছিলেন সেই দেশের অতীতের সঙ্গে তিনি বর্তমানের সমন্বয়সাধন করে ভবিষ্যতকে সুনিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। এই ছিল তাঁর কল্পনা ও পরিকল্পনা এবং মুঘল-চিত্রকলা এই কল্পনা ও পরিকল্পনারই একটি ফল। তাঁর আবিষ্কৃত সমস্যার সমাধানস্বরূপ সংস্কৃতিসমন্বয়ের মানসিকতারই প্রতিফলন ঘটেছে এই চিত্রকলায়—চিত্রকলায় ইরানীয়, ক্ল্যাসিক ও আদি মধ্যযুগীয় ভারতীয়, সমসাময়িক ভারতীয় ও য়ুরোপীয় রেনেসাঁস ঐতিহ্যের সমন্বয়। মুঘল চিত্রকলা তাই নিজস্বচারিত্রচিহ্নিত একটি বিশিষ্ট অস্তিত্ব, দেশকালকর্তৃক উপস্থাপিত চ্যালেঞ্জের উত্তরে এই চিত্রকলা এক সৃজনশীল ভাষ্য আর সেই কারণেই সমাজের দিক থেকে প্রামাণিক, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ।
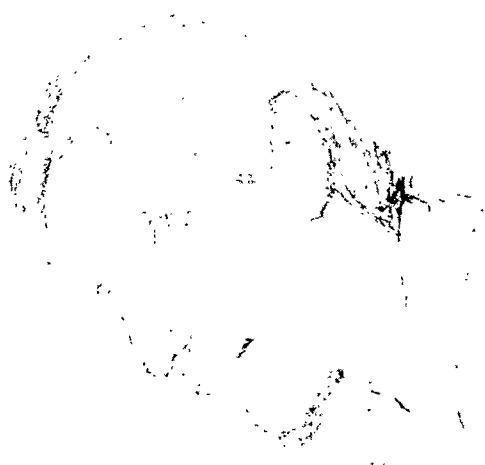
।বি গান গাইছে”ঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

গাওয়া, না-গাওয়া

দেবব্রত বিশ্বাস

[জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী' নাটকের প্রুফ দেখার সময় রাজপুত মহিলাদের চিতাপ্রবেশের দৃশ্যের গদ্যবক্তৃতা পাশের ঘর থেকে শুনতে পেয়ে ১৮৭৫ সালের নভেম্বর মাসে চোদ্দ বৎসরের বালক রবীন্দ্রনাথ পড়া থেকে উঠে এসে রচনা করে দিয়েছিলেন, "জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ।" সেই শুরু। তারপর বিংশ শতকের চল্লিশের দশক পর্যন্ত চলেছে গানের ভিতর দিয়ে ভুবনকে জানা। নেহাত সংখ্যাতেই তা বিস্ময়কর—প্রায় আড়াই হাজার। আজ রবীন্দ্র-সঙ্গীত বাঙালীর জাতীয় জীবনের অপরিহার্য অংশ। গান-ই রবীন্দ্রনাথকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আমরা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অন্যতম প্রধান শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের এই রচনা প্রকাশ করছি। এই লেখার প্রতিটি শব্দ দেবব্রত বিশ্বাসের নিজস্ব রচনা। তাঁর ব্যক্তিগত ফাইল থেকে সংগৃহীত এই রচনার সম্পাদনা ও টীকা সংযোজন আমাদের।

দেবব্রত বিশ্বাসের ভেতর এসে মিলেছে রবীন্দ্রসঙ্গীতচর্চার প্রধান প্রধান ধারা—যাকে হয় তো ঐতিহ্যই বলা যেত, যদি ইতিমধ্যে শব্দটির অর্থ বহু ব্যবহারে বিপর্যস্ত না হত। জন্ম—১৯১১ সালে মামাবাড়ি বরিশালে, মৈমনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ মহকুমার কিশোরগঞ্জ শহরে দেবব্রত বিশ্বাসের পৈতৃক নিবাস। তাঁর পিতামহ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। তাঁর মা ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে পড়েছেন, রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেন। পারিবারিক সূত্রেই ব্রাহ্মসমাজের রবীন্দ্রসঙ্গীত ধারা দেবব্রত বিশ্বাস পেয়েছিলেন। ১৯২৭ সালে কলেজে পড়াশোনার জন্য কলকাতায় এলে ব্রাহ্মসমাজে ও শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন উৎসবে তিনি গেয়েছেন। তারপর ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রধান শিল্পীদের অন্যতম দেবব্রত বিশ্বাস সারা দেশে গণজাগরণের গান গেয়ে বেড়িয়েছেন ও সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের গানে এক নতুন প্রাণবান গায়নরীতি সৃষ্টি করেছেন। পরবর্তীকালে দেবব্রত বিশ্বাস নিজেই নিজের এক নিজস্ব গায়নরীতির প্রবর্তক

হয়ে পড়েছেন। তার ঔচিত্য-অনৌচিত্য নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। তাঁর জনপ্রিয়তা যেমন একদিকে বেড়েছে, অপরদিকে তেমনি তাঁর বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক বিরুদ্ধতাও বেড়েছে। ভারতের "সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্র"র সম্পাদকীয় পাতায় তাঁর নাম ধরে বিরুদ্ধতা করা হয়েছে। বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড তাঁর রেকর্ড আটকে দিয়েছেন। রেকর্ডের জন্য দেবব্রত বিশ্বাস গত পাঁচ বছর কোনো নতুন গান গান নি। এই সব বিষয় নিয়ে এই প্রথম দেবব্রত বিশ্বাসের নিজস্ব মতামত তাঁর সারাজীবনের সঙ্গীত-সাধনার পটভূমিতে এই রচনায় প্রকাশিত হল।

আমরা আশা করি, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই আলোচনা আরো চলবে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের শ্রোতারা ও পরিচয়ের পাঠকরা অংশ নেবেন, রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিল্পীরা ও সঙ্গীতজ্ঞরা তাঁদের মতামত জানাবেন।—সম্পাদক]

ব্রাহ্ম পরিবারে জন্ম হয়েছিল বলে বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চায়, রবীন্দ্রসঙ্গীতের রসে, মনটা আমার রসিয়ে উঠেছিল। ১৯২৭ সনে কলেজের পড়ুয়া হয়ে কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে কলকাতার বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলাম। সেই সময় থেকে ব্রাহ্ম সমাজের পাল্লায় পড়ে বহু ব্রহ্মসঙ্গীত এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাকে শিখতে এবং গাইতে হয়েছে। যাঁদের কাছে শিখতাম তাঁরা কেউ আজ আর জীবিত নেই।

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নানা উৎসবের গানের মহড়ায়ও আমার যাতায়াত ছিল। হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্সে চাকুরির সময় স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল—সেই সূত্রে পাম এ্যাভিন্যুর বাড়িতে স্বর্গীয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর স্নেহ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি।

তাঁর কাছে বহু গান শুনেছি ও শিখেছি। আমার মনে আছে পিয়ানো বাজিয়ে রবীন্দ্রনাথের অনেক গান নিয়ে তিনি নানা ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করতেন—ছাপানো স্বরলিপির সামান্য অদলবদল করে আমাদের শেখাতেন ও আমাদের মতামত জিজ্ঞাসা করতেন। কতকগুলি রবীন্দ্রসঙ্গীতের হার্মনি করা সুরে তিনি আমাদের দিয়ে নানা অনুষ্ঠানে গাইয়েছিলেন। "আমি চিনি গো চিনি তোমারে" গানটির হার্মনাইজড স্বরলিপি তৈরি করে 'আনন্দ-

সঙ্গীত' পত্রিকাতে প্রকাশ করেছিলেন। এই গানটি হার্মনাইজড ভাবে আমাদের বহু অনুষ্ঠানে গাইতে হয়েছে।

রথীদা[১] এবং চারুবাবু[২] আমার গান অত্যধিক পছন্দ করতেন। অনাদিদার[৩] দৌলতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে গান শুনিয়ে খুশি করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

এতো কথা বলার উদ্দেশ্য বাল্যকাল থেকে শুরু করে নানা ধরনের রবীন্দ্র-সঙ্গীত নানাভাবে গাইতে গাইতে এবং রেকর্ড করে আমার জীবনের তেষট্টি বৎসর কেটে গেল। কাজে কাজেই যতই বিনয় করি না কেন—এ-টুকু না-বলে থাকতে পারছি না যে সুষ্ঠুভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করার ব্যাপারে আমার 'বেশ কিছুটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমার রেকর্ড করা গানগুলি যে-ভাবে রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রসঙ্গীত রসিক ব্যক্তিদের দ্বারা সমাদৃত হয়েছে তাতে আমার মনে এইটুকু বিশ্বাস জন্মেছে যে নিছক "শস্তা রুচি" পরিবেশন করে তা সম্ভব হয় নি।

প্রসঙ্গত এ-টুকুও বিনীতভাবে না বলে থাকতে পারছি না যে আমার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতালব্ধ গায়নশৈলীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী ও সুরের সমন্বয়, রবীন্দ্রনাথের গানের মর্ম গভীর ভাবে উদ্‌ঘাটিত করে ব্রাহ্ম সমাজের পরিমণ্ডলের বাইরেও যে অসংখ্য রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগী রয়েছেন তাঁদের ইনটিলেক্ট ও ইমোশনকে গভীরভাবে নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছে, এ আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

এই প্রসঙ্গে বেশ কয়েক বৎসর আগেকার একটি ঘটনাও উল্লেখ করছি।

কলকাতার রীতিমতো নামজাদা কয়েকজন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পীর সমাবেশে একজন বিদেশী (ইয়োরোপীয়) কম্পোজারকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সেই আসরে আমিও উপস্থিত ছিলাম। বিদেশী কম্পোজারটি তাঁরই রচিত একটি যন্ত্রসঙ্গীতের অর্কেস্ট্রার টেপ করা রেকর্ড শোনালেন! বাজানো শেষ হয়ে গেলে অনেকেই নানা ধরণের প্রশংসাবাণী বর্ষণ করলেন। একজন নামকরা বাঙালী যন্ত্রশিল্পী এক কোণায় বসে নীরব হয়ে কী যেন ভাবছিলেন। তাঁর বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে তিনি মুখ খুললেন—বাজনাটি শুনে তাঁর মনে কী ধরণের প্রতিক্রিয়া হল সেটা বলতে শুরু করলেন। তাঁর কথাগুলি হুবহু আমার মনে নেই। তবে তিনি যা বলছিলেন তার ভাবার্থ সংক্ষেপে হচ্ছে—বাজনা শুনে তাঁর মনে হচ্ছিল, তাঁরা যেন দল বেঁধে কোনো এক মরুভূমির ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন—হঠাৎ তুমুল

ঝড় উঠল—ঝড়ের বেগে বালুকণা উড়তে শুরু করল—চোখ প্রায় অন্ধ—কিছুক্ষণ বাদে ধীরে ধীরে ঝড় থেমে গেল—আবার তাঁরা চলতে লাগলেন—জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রি—অপূর্ব শান্ত পরিবেশ।

তাঁর কথা শেষ না হতেই সেই বিদেশী কম্পোজার হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন, আমার এই কম্পোজিশনটির নাম—ক্যারাভ্যান'। আমি অবাক।

সেই বাঙালী যন্ত্রশিল্পীটি হলেন শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র।

রাধিকাবাবুকে কোনোদিন পাশ্চাত্য সঙ্গীত নিয়ে চর্চা করতে দেখি নি, শুনিও নি। অথচ ইয়োরোপীয় বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনির ভাষা তাঁর হৃদয়ে যে আবেগ সৃষ্টি করেছিল তা দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি। তিনি নিজে যন্ত্রী, তাই বাদ্য-যন্ত্রের ভাষা তাঁর হৃদয়ঙ্গম হয়েছিল।

রাধিকাবাবুর হয়তো এই ঘটনাটির কথা মনে নেই, কিন্তু সেই ঘটনাটি আমার মনে যে দাগ কেটেছিল তা কোনোদিন মলিন হবে না। সেদিন আমার মনে হয়েছিল বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের বিভিন্ন আওয়াজ এবং বিভিন্ন সুর আমার মনেও তো বিভিন্ন আবেগ সৃষ্টি করে, যেমন সানাই, বাঁশি বা অন্য কোনো তারযন্ত্র—কীভাবে এবং কেন এই আবেগ সৃষ্টি হয় তা আমার পক্ষে বোঝানো সম্ভব না!

এর পর থেকে আমি অনেক ভেবেছি। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কথা আমাকে প্রেরণা যোগাল। তিনি বলেছিলেন, "য়ুরোপীয় সংগীতে যে হার্মনি বা স্বরসংগতি আছে আমাদের সংগীতে তাহা চলিবে কিনা। প্রথম ধাক্কাতেই মনে হয়—'না, ওটা আমাদের গানে চলিবে না, ওটা য়ুরোপীয়।' কিন্তু হার্মনি য়ুরোপীয় সংগীতে ব্যবহার হয় বলিয়াই যদি তাকে একান্তভাবে য়ুরোপীয় বলিতে হয়, তবে এ-কথাও বলিতে হয় যে, যে দেহতত্ত্ব অনুসারে য়ুরোপে অস্ত্রচিকিৎসা চলে সেটা য়ুরোপীয়, অতএব বাঙালীর দেহে ওটা চালাইতে গেলে ভুল হইবে। ইহার অভাবে আমাদের সংগীতে যে অসম্পূর্ণতা সেটা যদি অস্বীকার করি, তবে তাহাতে কেবলমাত্র কণ্ঠের জোর বা দম্ভের জোর প্রকাশ পাইবে। তবে কিনা ইহা নিশ্চিত আমাদের গানে হার্মনি ব্যবহার করিতে হইলে তার ছাঁদ স্বতন্ত্র হইবে। যাই হোক, আমাদের সংগীতের পক্ষে এই একটা বড়ো মহল ফাঁকা আছে, এটা যদি দখল করিতে পারি তবে এই অনেক পরীক্ষা ও উদ্-ভাবনার জায়গা পাইব ; যৌবনের স্বভাবসিদ্ধ সাহস যাঁদের আছে এবং লক্ষ্মী-ছাড়ার খ্যাপা হাওয়া যাঁদের গায়ে লাগিল, এই একটি আবিষ্কারের দুর্গমক্ষেত্র

তাঁদের সামনে পড়িয়া। আজ হোক্, কাল হোক্ এ-ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই লোক নামিবে।[৪]"

লক্ষ্মীছাড়ার খ্যাপা হাওয়া আমার গায়ে লাগে নি। কিন্তু ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে এই ব্যাপারে নানা ধরণের একসপেরিমেণ্ট করতে আমি দেখেছি। রাধিকাবাবুর কথাগুলি আমায় একটা ভাবনার যোগান দিয়ে দিল।

পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার কোনো জ্ঞানই নেই। কিন্তু ভেবে দেখেছি কণ্ঠের এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের বিভিন্ন ধ্বনি এবং সুর মানুষের হৃদয়ে যে আবেগ সৃষ্টি করে তা তো কোনো দেশকালের নিয়ম মানে না! রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নিজস্ব একটি আবেগসৃষ্টিকারী ক্ষমতা আছে—সেই ক্ষমতাটিকে ধার দিয়ে, আরো বেশি জোরাল করেন শ্রোতাদের ইনেটেলকট ও ইমোশনকে আরা গভীর ভাবে নাড়া দেবার উদ্দেশ্যে আমার রেকর্ড করার সময় দেশী বিদেশী নানাধরণের বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনির সাহায্য নিয়ে নানা ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমি করেছি। ঐ বাদ্য যন্ত্রের ধ্বনি আমার নিজের মনে যে আবেগ সৃষ্টি করে তার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের মনের মতো ছাঁদে সুরের জাল বুনে গানগুলির সুররূপের কাঠামো জখম না করে ঐ সব বাদ্যযন্ত্রের সাহায্য আমি নিয়েছি।

অকপটে স্বীকার করতে আমার কোনো বাধা নেই যে গানগুলি গাইবার সময় একসপ্রেশনের স্বাধীনতা আমি নিয়েছি কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ ব্যাপারে পথ দেখিয়েছেন। বাদ্যযন্ত্রের সুর সাজিয়ে গান ফুটিয়ে তুলবার ব্যাপারে আমি কতখানি সফল হয়েছি তার বিচারের ভার শ্রোতাদের উপর। তাদের ভার্ডিকট (Verdict) আমি মাথা পেতে গ্রহণ করি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি দেখেছি আমি সম্পূর্ণ সফল হই নি। তাতে আমি দুঃখ পেয়েছি, অবশ্য সব একসপেরিমেন্টই সফল হবে তা জোর করে বলা যায় না। এটা ঠিক যে এতে আমার অভিজ্ঞতা বাড়ল।

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নকে একটা বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টায় আমি কোমর বেঁধে লেগে গিয়েছিলাম। হঠাৎ বাধা পেলাম ১৯৬৯ সনে। আমার দুটো গানের রেকর্ড[৫] বোর্ডের[৬] অনুমোদন গেল না। কারণ দেখানো হলো—

১। পুষ্প দিয়ে মারো যারে—"Excessive music accompaniment hampers the sentiment of the song"

২। তোমার শেষের গানের—"The tempo of the song is too quick. Music accompaniment is too much and the song itself

is not sung according to notation.

নোটেশনের ব্যাপারে কী ভুল হয়েছে তার উল্লেখ নেই।

হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি আমার মতামতের জন্য অনেকদিন পীড়াপীড়ি করছিলেন এই ব্যাপারে। শেষ পর্যন্ত কোম্পানিকে জানাতে হয়েছিল[৭] যে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার এবং রেকর্ড করার ব্যাপারে আমার কর্তব্যজ্ঞান এবং দায়িত্বজ্ঞান অন্য কারোর চাইতে কম আমি তা বিশ্বাস করি না। তাছাড়া মিউজিক বোর্ডের পরীক্ষকটির মতামত নিতান্তই সাবজেকটিভ। অতএব এ ব্যাপারে আমার বলার কিছুই নেই।

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রেকর্ড করা বন্ধ করতে হল।

১৯৭০ সনের শেষের দিকে হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানির মালিক শ্রীচণ্ডীচরণ সাহা মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে ঐ সময় আরো কয়েকটি গান টেপ করিয়েছিলাম। সেই গানগুলির মধ্যে কয়টি অনুমোদন লাভ করেছে তা আমার জানা নেই।

কিছুকাল পরে রেকর্ড কোম্পানি আমায় জানালেন, যে, রেকর্ড করার ব্যাপারে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড নতুন কতকগুলি নিয়ম[৮] প্রবর্তন করেছেন। যে নতুন নিয়মগুলি প্রবর্তিত হয়েছে তা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম। এইসব নিয়ম কার অথবা কাদের ভাবনাপ্রসূত তা আমার জানার কথা নয়। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের ভাবনা দিয়ে ভাবিত হয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের জাত বাঁচানো যাবে এমন কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই ভাবতে পারতেন না! কারণ আমি জানি তিনি দিলীপবাবুকে[৯] বলেছিলেন, "গানের গতি অনেকখানি তরল, কাজেই তাতে গায়ককে অনেকখানি স্বাধীনতা তো দিতেই হবে, না-দিয়ে গতি কী? ঠেকাবো কি করে? আদর্শের দিক দিয়েও আমি বলি নে যে, আমি যা ভেবে অমুক স্বর দিয়েছি তোমাকে গাইবার সময় সেই ভাবেই ভাবিত হতে হবে। তা যে হতেই পারে না"[১০]

সুতরাং, কার কথা মেনে চলব—রবীন্দ্রনাথের? না, যাঁরা নতুন নিয়মগুলি করছেন তাঁদের?

এবার আমাদের রেকর্ড কোম্পানিকে লেখা মিউজিক বোর্ডের ২২/১১/৭২ তারিখের চিঠি থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি।[৮]

সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই সাবজেকটিভ। "Discordant to the ear"—সব ক্ষেত্রে সত্য হয় না, কানে কানে ভেদাভেদ থাকবেই, সব কাণ একরকম হয় না।

কোনটা "true spirit of the song" তা জানতে চাইলে দেখা যাবে "true spirit" ব্যক্তি বিশেষে আলাদা। যে সব শ্রোতা নিজের পয়সা খরচ করে রেকর্ড কিনে আনন্দ পান তাঁদের যে একেবারেই রবীন্দ্র সঙ্গীতের রস আস্বাদন করার মতো বুদ্ধি ও ক্ষমতা নেই এমন কথা বলতে পারি না। শ্রোতাদের গ্রহণ ও বর্জন দিয়েই প্রমাণিত হয় কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ।

"Style and mode of Rabindra Sangeet"—কথাগুলি নিতান্তই অর্থহীন। কারণ শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওস্তাদদের মধ্যেই এই ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ ছিল এবং এখনো বোধ হয় আছে। কলকাতায় যতগুলি রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতিষ্ঠান আছে, প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের ওস্তাদেরা বলেন বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসংগীত কাকে বলে তাঁরাই শুধু জানেন কিন্তু দেখা যায় প্রত্যেকেরই গাইবার ও গান শেখানোর ধরণ আলাদা। সুতরাং আসল নকল বোঝা মুশকিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ-বিষয়ে স্পষ্ট কোনো মাপকাঠির ব্যবস্থা করে যান নি।

কিন্তু উপরোক্ত ইংরেজি ভাষায় লিখিত নির্দেশের শেষের অংশটুকু পড়লে মনে হয় মিউজিক বোর্ডের যত ক্রোধ সব যেন বাদ্যযন্ত্রের ওপর। বোর্ড বাদ্য যন্ত্রের ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব থেকে রক্ষা করতে চাইছেন। সেই উদ্দেশ্যে কী কী বাদ্যযন্ত্র রবীন্দ্র সঙ্গীতের উপযোগী এবং সেই যন্ত্রগুলি কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তার নির্দেশ বাঙলা ভাষায় দিয়েছেন।৮

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের স্বরসঙ্গতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামতের কথা আমি আগে একবার উল্লেখ করেছি। সেই ব্যাপারে তাঁর আরো সুস্পষ্ট মতামত তিনি নানা লেখায় নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। কয়েকটি উক্তি নিচে উদ্ধৃত করলাম।

১। "আমাদের দেশের অনেক জিনিসকেই য়ুরোপের হাত হইতে পাইবার জন্য আমরা হাত পাতিয়া বসিয়াছি। আমাদের সংগীতকেও একবার সমুদ্র পার করিয়া তাহার পরে যখন তাহাকে ফিরিয়া পাইব, তখনই হয় তো ভালো করিয়া পাইব। আমরা বহুকাল ঘরের কোণে কাটাইয়াছি, এইজন্য কোনো জিনিসের বাজারদর জানি না। ...আমাদের শিল্পকলায় সম্প্রতি যে উদবোধন দেখা যাইতেছে তাহার মূলেও য়ুরোপের প্রাণশক্তির আঘাত রহিয়াছে। আমার বিশ্বাস সংগীতেও আমাদের সেই বাহিরের সংশ্রব প্রয়োজন হইয়াছে। তাহাকে প্রাচীন দস্তুরের লোহার সিন্দুক হইতে মুক্ত করিয়া বিশ্বের হাটে ভাঙাইতে

হইবে। য়ুরোপীয় সংগীতের সঙ্গে ভালো করিয়া পরিচয় হইলে, তবেই আমাদের সংগীতকে আমরা সত্য করিয়া, বড়ো করিয়া ব্যবহার করিতে শিখিব।"১১

২। "সমুদ্র পারের রাজপুত্র এসে মানুষের মনকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগিয়ে দেয় এটা তার ইতিহাসে চিরদিন ঘটে আসছে। আপনার পূর্ণশক্তি পাবার জন্য বৈষম্যের আঘাতের অপেক্ষা তাকে করতেই হয়। কোনো সভ্যতাই একা আপনাকে সৃষ্টি করে নাই।"১২

৩। "কাঠি ছোঁয়ার প্রথম অবস্থায় ঘুমের ঘোরটা যখন সম্পূর্ণ কাটে না, তখন আমরা নিজের শক্তি পুরোপুরি অনুভব করি নে, তখন অনুকরণটা বড়ো হয়ে ওঠে, কিন্তু ঘোর কেটে গেলেই আমরা নিজের জোরে চলতে পারি। পথ নানা, কিন্তু অভিপ্রায়টি আমার, শক্তিটি আমার। যদি পথের বৈচিত্র্য রুদ্ধ করি, যদি একই বাঁধা পথ থাকে, তাহলে অভিপ্রায়ের স্বাধীনতা থাকে না—তাহলে কলের চাকার মতো চলতে হয়। সেই কলের চাকার পথটাকে চাকার স্বকীয় পথ বলে গৌরব করার মত অদ্ভুত প্রহসন আর জগতে নেই।"১২

৪। "আমাদের সাহিত্যে চিত্রে সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে পৌঁছেছে। কিন্তু সংগীতে পৌঁছয় নি। সেই জন্যেই আজও সংগীত জাগতে দেরি করছে। অথচ আমাদের জীবন জেগে উঠছে।"১২

৫। "দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের মধ্যে ইংরেজি সুরের স্পর্শ লেগেছে বলে কেউ কেউ তাকে হিন্দুসংগীত থেকে বহিষ্কৃত করতে চান। যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসংগীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন, তবে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্বাদ করবেন।১২

সুতরাং "Influence of western music" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কী ধারণা তা আমাদের জানা। এ কথা আজ সবাই জানে যে জ্যোতিদাদার পাশ্চাত্য কায়দায় পিয়ানো বাজনার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের জন্ম হয়েছিল। তাছাড়া অনেকেই জানেন যে অনেক বিদেশী সুরে রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর অনেক গান বেঁধেছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করার প্রথম যুগের গানের রেকর্ডগুলি শুনলে দেখা যায় যে তখন শুধু হারমনিয়াম অথবা অর্গ্যান বাজিয়ে গান রেকর্ড করানো হত। তখনকার দিনে রেকর্ডে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করার ব্যাপারে শিল্পীদের এবং উদ্যোক্তাদের মনে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না বলেই তখনকার দিনে অন্যান্য গান রেকর্ড করার বেলাতেও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারের কোনো বিশেষ একটি রূপ ধরে নি—সবই মামুলি ধরণের হত।

পঞ্চাশ বৎসর আগে যে রূপে ও ভঙ্গীতে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া অথবা রেকর্ড করা হত, বর্তমান কালের রবীন্দ্রসঙ্গীতের চেহারার এবং ভঙ্গির সঙ্গে তার কোনো মিলই নেই। কালের গতিতে সেই চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে এবং ভবিষ্যতে যে আরো পরিবর্তন হবে না, তা কি কেউ জোর করে বলতে পারে?

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "গানের গতি অনেকখানি তরল, কাজেই তাতে গায়ককে খানিকটা স্বাধীনতা তো দিতেই হবে, না দিয়ে গতি কী? তাই আদর্শের দিক দিয়েও আমি বলি নে যে, আমি যা ভেবে অমুক স্বর দিয়েছি তোমাকে গাইবার সময়ে সেই ভাবেই ভাবিত হতে হবে।...স্বরকারের স্বর বজায় রেখেও এক্সপ্রেসনে কম-বেশি স্বাধীনতা চাইবার এক্তিয়ার গায়কের আছে। কেবল প্রতিভা অনুসারে কম-বেশির মধ্যে তফাৎ আছে এ-কথাটি ভুলো না। প্রতিভাবানকে যে স্বাধীনতা দেব অকুণ্ঠে, গড়পড়তা গায়ক ততখানি স্বাধীনতা চাইলে 'না' করতেই হবে।"[২]

রবীন্দ্রনাথ যখন জীবিত ছিলেন, তখন এ-ব্যাপারে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু এখন? কে বেশি প্রতিভাবান, কে কম প্রতিভাবান আর কে গড়পড়তা গায়ক তার বিচার এখন কে করবেন? আর বিচার করতে গেলেই বিবাদ, বিদ্বেষ এবং পরস্পরের প্রতি ক্লেদক্ষেপণ শুরু হয়ে যাবে।

তাই বলছিলাম সেই উদার দৃষ্টিভঙ্গি এখন আর নেই। অনাদি-দার[৩] গোঁড়ামি ছিল সত্যি, কিন্তু তাঁর যথেষ্ট উদারতাও ছিল। মনে আছে, অনেকদিন আগে স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী সুপূর্ণার কচি-গলায় একটি সুন্দর গান শুনেছিলাম। গানটির দু-একটি জায়গায় স্বরলিপির একটু ব্যতিক্রম ছিল। জিজ্ঞাসা করে জানলাম ইন্দিরা দেবীর কাছে ও শিখেছে। তখুনি গানটি ওর কাছে শিখে নিলাম। পরে অনাদিদাকে শুনিয়েছিলাম। তিনি দারুণ খুশি হয়েছিলেন।

এ-ব্যাপারে আরেকটি মজার ঘটনার উল্লেখ না-করে থাকতে পারছি না। ১৯৬৪ সনে, আমার একটি রেকর্ড করা গান, "এসেছিলে, তবু আস নাই"— বোর্ডের অনুমোদন পেল না। ভুল গাওয়া হয়েছে বলা হল। পরে শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়কে যখন গানটি শোনানো হল তখন তিনি লিখলেন,

ম´ —খা´
জ্ঞ´
চ ন

"এইভাবে সুর অবশ্যই হতে পারে। এতে কোনো দোষ নেই। আমার মনে হয় ছাপায় কোন গোলমাল ঘটেছে। স্বাঃ শান্তিদেব ঘোষ। ১৯।১।৬৫।"

শান্তিদেব বাবুর স্বাক্ষর করা লেখা এখনো আমার কাছে রয়েছে। আমার মনে হয়, বোর্ডের কাছেও আছে। শান্তিদেব বাবুর যা মনে হয়েছে তাই তিনি ব্যক্ত করেছেন।

দেখা যাচ্ছে এই "মনে হওয়া" ব্যাপারটি বেশ গোলমেলে। যিনি আমার ঐ গানটি অনুমোদন করতে চান নি তাঁর নিশ্চয়ই কিছু মনে হয়েছিল। আবার শান্তিদেব বাবুর অন্যরকম মনে হল।

অবশ্য, এ-কথা স্বীকার করতেই হয় যে একটা কিছু নিয়ম মানা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কোনো নিয়মের কথা বলে যান নি। সুতরাং ছাপানো স্বরলিপি বইগুলোকে এ-ব্যাপারে প্রাধান্য দিতে হয়। যদিও তাতে অনেক সময় ভুল থাকে, তবুও তা দেখে সুরের স্ট্রাকচারের একটা ধারণা করা যায়। স্বরলিপিতে যা স্বর অথবা সুর লেখা থাকে সেগুলি strictly মেনে চললেও গান বিভিন্ন ঢঙের হতে পারে—রবীন্দ্রনাথও তাই বলেছেন।

তবে বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্রে শ্রুতির খাতিরে স্বরলিপিতে যে-মাত্রাভাগ দেয়া থাকে তার সামান্য একটু অদল-বদল করতেই হয়। তা না-করলে গান শুকনো কাঠ হয়ে যেতে বাধ্য। আমি এ-ধরণের অদল-বদল দিনেন্দ্রনাথকেও করতে দেখেছি, ইন্দিরা দেবীকেও দেখেছি। স্বরলিপি প্রস্তুত করার সময় শুধুমাত্র স্বরের broad outline-টাই দেয়া সম্ভব। শ্রুতি এবং গায়নভঙ্গি স্বরলিপি করে বোঝানো কিছুতেই সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও গায়কের নিজস্ব ঢঙের ব্যাপারে গায়ককে স্বাধীনতা দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন না।

আমি শুনেছি, এখন যাঁরা মিউজিক বোর্ডের পরীক্ষক তাঁদের অনেকেই বয়সে আমার চাইতে অনেক ছোট। তাঁরা যদি ভাবেন যে বিশেষ কোন গানের ইণ্টারপ্রিটেশন এবং এক্সপ্রেশনের ব্যাপারে তাঁদের যা ধারণা সেটাই ঠিক এবং সেইভাবেই আমাকে ভাবিত হতে হবে—তা হলে আমার বলার কিছুই নেই।

যাইহোক, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাকে কোনো মূল্য না দিয়ে এবং তাঁর নির্দেশ অমান্য করে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে মাঝারি কর্তাদের নির্দেশ এবং বিধিনিষেধ মেনে আর রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করার মতো ধৃষ্টতা আমার নেই—প্রবৃত্তিও আমার নেই। এই ব্যাপারে যুক্তিহীন কতগুলি নিয়ম যতদিন

বলবৎ থাকবে, ততোদিন নিজেকে দূরে সরিয়েই রাখব। আমাদের মাতামহীর আমলের জীর্ণ কাঁথা দিয়ে ঘিরে রাখলে এবং পলতে করে ফোঁটা ফোঁটা নিয়মের বিধান খাইয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে টিকিয়ে রাখা যাবে এমন কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই ভাবতে এবং বলতে পারেন নি।

আমি দেখেছি হালের কয়েকজন তরুণ রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক-গায়িকা অতি সুন্দর গাইছেন। মনে হয় তাঁদের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। লক্ষ্য করেছি তাঁরাও এ-ব্যাপারে বেশ ভাবনা চিন্তা করেন। কিন্তু এই নিয়মের শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার মত সাহস ও ক্ষমতা তাঁদের নেই।

শেষ করবার আগে, রবীন্দ্রনাথের একটি বাণীর উল্লেখ না করে পারলাম না। তিনি লিখেছিলেন, "কিন্তু সরস্বতীকে শিকল পরাইলে চলিবে না, সে শিকল তাঁরই বীনার তারে তৈরী হইলেও নয়। কেননা মনের আবেগই সংসারে সবচেয়ে বড় বেগ। তাকে ইনটার্‌ন্‌ করিয়া যদি সলিটারি সেলের দেয়ালে বেড়িয়া রাখা যায় তাহাতে নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা হইবে। সংসারে কেবলমাত্র মাঝারির রাজত্বেই এমন সকল নিদারুণতা সম্ভবপর হয়। মানুষের পক্ষে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মাঝারির শাসন। এই শাসনে যা কিছু সবুজ হলদে হইয়া যায়, যা কিছু সজীব তা কাঠ হইয়া ওঠে।"

টীকা

১। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২। চারুচন্দ্র ভট্টাবার্য

৩। অনাদি কুমার দস্তিদার

৪। 'সংগীতের মুক্তি' ('সংগীত চিন্তা,' পৃষ্ঠা ৬৩)

৫। To
Messers Hindusthan Musical Products Ltd.
6/2 Akrur Dutt Lane
Calcutta-12

July 25, 1969.

Dear Sirs,

Re : Tune approval of Rabindranath Tagore's songs.

On the basis of the report received from the examiner who heard the tune of the following songs sung by Shri Debabrata Biswas, we give below our views on them :...

1. HSB 8445 Pushpa diye Maro Jare

Excessive music accompaniment hampers the sentiment of the song.

2. HSB 8472 Tomar Shesher ganer

The tempo of the song is too quick. Music accompaniment is too much and the song itself is not sung according to the notation.

The above two songs should be re-recorded after eliminating the above defects and submitted to the board for re-examination.

The recorded tape has already been sent back to you.

Yours faithfully
Sd.
Hony. Secretary
Visvabharati Music Board.

৬। "উনিশ শ বেয়াল্লিশে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, শান্তিদেব ঘোষ, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, অনাদি দস্তিদার—এঁদের মিলিত প্রচেষ্টায় বোর্ড গঠন করা হলো। ."

"মিউজিক বোর্ডের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র নামে জনৈক 'এ্যাডভোকেট' বোর্ডের সদস্য ছিলেন। পড়ে তিনি ট্রাষ্টিও হয়েছিলেন।" ..."১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে মিউজিক বোর্ডকে ঢেলে সাজানো হয়।... বিশ্বভারতী কর্মসমিতি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ইতিহাসের অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্র গুপ্তকে একমাত্র ট্রাষ্টি করে মিউজিক বোর্ডকে ঢেলে সাজালেন। অনারারি সেক্রেটারী হলেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। এস-এ-মাসুদ, সুধীরঞ্জন দাস, অরুণ মুখোপাধ্যায়, রণজিৎ রায় (বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের অধ্যক্ষ), ও শান্তিদেব ঘোষ যোগ দিলেন স্থায়ী সদস্য হিসেবে।

...যাঁদের নির্বাচিত করা হলো তাঁরা সকলেই, একা শান্তিদেব বাদে, জাষ্টিস, এ্যাডভোকেট বা বিশ্বভারতী অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ...মিউজিক বোর্ডের অগাইয়ে স্থায়ী সদস্যরা কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক-গায়িকাকে পরীক্ষক হিসেবে বেছে নিলেন। ...পরীক্ষকের সম্মতি ছাড়া রেকর্ড প্রকাশিত হয় না।"

—'বিশ্বভারতী সংগীত পর্ষদ', অনুত্তম বিশ্বাস

৭। M/s. Hindusthan Musical Products Ltd.
6/2 Akrur Dutt Lane
Calcutta-12.

Dear Sirs,

Ref: Your letter dated 4. 8. 69 enclosing a copy of a letter dated 25. 7. 69 from the Hony. Secretary Visvabharati Music Board.

Mr. Nirode Banerjee of your company is pressing me hard for my comments on the views of the Music Board regarding recording of two songs (1) Puspa diye Maro Jare (2) Tomar sesher ganer. As a matter of fact the points referred to by the Examiners of the Music Board are absolutely subjective and as such, any comment is absolutely unnecessary. Formerly, in the matter of recording of Tagore songs it was the function of the Music Board to check up whether there was any deviation from the printed notation. I have thoroughly gone through the works of Tagore and also listened to his speeches relating to this subject but no where in his writing I have found the poet prescribing any limit to "Music accompaniment" and also "tempo" for recording of his songs. As such it occours to me that the Examiner of the Music Board has assumed the role of a "dictator" and I am not aware since when this dictatorship was introduced in the Music Board.

You are surely aware that I have been singing and recording Tagore songs for a long time and I feel that my sense of responsibility and seriousness in this regard are in no way less than anybody else. I dont know what and how much I have done, but it is a fact that much remain to be done. It is a pity that I have to stop with a heavy heart and it will take some time before I can remould my mind to work according to directions of the cultural dictator of the Visvabharati Music Board.

174E. Rash Behari Avenue
Calcutta
the 16th August, 1969

Yours faithfully
Debabrata Biswas

Phone 44-9868/69

Visvabharati Music Board

৮। 10, Pretoria Street, Calcutta-16

MB/261 Registered Dt· 22. 11. 72

M/s. Hindusthan Musical Products Ltd.
6/1. Akrur Dutt Lane
Calcutta-12

Dear Sirs,

It has been noticed for sometime past that there is a growing tendency amongst the artists to make use of interlude music at the time of recording Rabindra Sangeet by taking help of various types of musical instruments and also foreign tunes during recital of songs which sound discordant to the ear and militates against the spirit of songs. By doing so, sometime it so happens that the interlude music gains precedence over the original tune of Rabindra Sangeet thereby subduing the real flavour of rendering of the songs.

It has already been impressed upon you the importance of making use of subdued music in order to maintain the style and mode of Rabindra Sangeet but in the absence of any method for eliminating influence of the Western style of music in the recorded songs by determining the basic requirements of musical accompaniments no suitable arrangements could be made so far in the matter.

As already communicated to you that the basic requirements as indicated in the attached sheet are to be strictly adhered to at the time of recording of Rabindra Sangeet in future.

Your co-operation in the matter is earnestly solicited.

Yours faithfully
Sd. Nripendra chandra Mitra
Hony. Secretary, Visvabharati Music Board

এস্রাজ, বাঁশি, সেতার, সারেংগি, তানপুরা, দোতারা, একতারা, বেহালা, বাঁশবেহালা, অর্গান, পাখোয়াজ, বাঁয়া তবলা, খোল, ঢোল, মন্দিরা

৯। দিলীপকুমার রায়

১০। 'সংগীতচিন্তা' পৃষ্ঠা ১২৮

১১। 'সংগীতচিন্তা' পৃষ্ঠা ৪২

৮১। 'সোনার কাঠি' ('সংগীতচিন্তা' পৃষ্ঠা ৪৪)

এ্যাটমীয় কূটনীতি

দিলীপ বসু

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে ত্রিশ বছর আগে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মান-ইতালি-জাপানী ফ্যাসিবাদের পরাজয়, সোভিয়েত লালফৌজের বার্লিনকে মুক্ত করা এবং ৮ মে ফ্যাসিস্ত* (বা নাৎসি) জার্মানির বিনাশর্তে আত্ম-সমর্পণের পরে বার্লিনের কাছে পটসড্যামে বিজয়ী ত্রি-শক্তির (সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন ও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র) বৈঠকে যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে কূটনৈতিক সম্পর্ক ইত্যাদি কিভাবে গড়ে উঠবে তার পরিকল্পনা করা হয় (বিশেষ করে জার্মানিকে ত্রিশক্তির মধ্যে প্রভাবিত এলাকা হিসাবে কিভাবে শাসন করা হবে সে সম্পর্কে), তেমনি ঠিক করা হয় যে ইয়োরোপে যুদ্ধবিরতির ঠিক তিন মাস পরে, অর্থাৎ ১০ আগস্ট ১৯৪৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দূরপ্রাচ্যে যুদ্ধে যোগদান করে ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করতে চূড়ান্ত আঘাত হানবে।

মিত্রশক্তিরা জানত, সোভিয়েত এই চুক্তিমতো কাজ ঠিকই করবে; স্বয়ং চার্চিলের যুদ্ধ সম্পর্কে ১২ খণ্ডের স্মৃতিকথাতে তিনি অকুণ্ঠ ভাষায় বলেছেন যে, চুক্তিমতো ঠিক ঠিক কাজ করার যে উদাহরণ সোভিয়েত সরকার রেখেছে—তার আর দ্বিতীয় নজির নেই।

এ্যাটম বোমার প্রোজেক্ট

১৯৩৯ সালে বৈজ্ঞানিক মহলে ক্রমশ ধারণা হতে লাগল যে, পরমাণুর (বা এ্যাটমের) কেন্দ্রককে (বা নিউক্লিয়ার্সকে) বিভাজন করা সম্ভব এবং

---

* হিটলার তার পার্টির নাম দিয়েছিল 'জার্মান জাতীয় সমাজতান্ত্রিক শ্রমিকদের পার্টি'—যার নামের আদ্যাক্ষর নিয়ে শব্দটি দাঁড়িয়েছিল NAZI বা নাৎসি। এর পূর্বে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের প্রতীক নিয়ে ইতালির মুসোলিনি ফ্যাসিস্ত শব্দটি ব্যবহার করে। হিটলার-মুসোলিনি ধরনের একচেটিয়া পুঁজির একনায়ক শাসনকে বোঝাতে আমরা ফ্যাসিস্ত আখ্যাটি দিলেও ত্রিশ দশকে 'ফ্যাসিস্ত' অর্থে নাৎসি আখ্যাটিও চালু ছিল।

তা করতে পারলে প্রচুর তেজঃশক্তি পাওয়া যাবে। আমেরিকাতে প্রবাসী হাঙ্গেরীয় বৈজ্ঞানিক লিও সিলার্ড জার্মান পত্রপত্রিকা দেখে এটাও বুঝলেন যে, হয়তো নাৎসি-অধিকৃত জার্মানিতে বৈজ্ঞানিকরা পরমাণু কেন্দ্রকের বিভাজনের কাজে বেশ খানিকটা এগিয়েছেন এবং তাহলে এ্যাটম বোমা ধরনের প্রচণ্ড ধ্বংসকারী কোনো বোমা হয়তো তাঁরা তৈরি করে ফেলবেন।

প্রসঙ্গত এটা বলে রাখার দরকার আছে যে জার্মান বৈজ্ঞানিকদের কয়েক জন যাতে হিটলার-ফ্যাসিস্তদের হাতে এই দারুণ ধ্বংসকারী বোমা না পড়ে সেজন্য রিসার্চ খানিকটা ভুল পথে চালিয়েছিলেন, এবং এর ধ্বংসকারী চরিত্র না বুঝতে পেরে হিটলারও ভি-২ রকেটের দিকেই বেশি ঝোঁক দিয়েছিল।

যাই হোক, সিলার্ড আইনস্টাইনের শরণাপন্ন হলেন, আইনস্টাইন এ্যাটম বোমার সম্ভাবনা সম্পর্কে চিঠি লিখলেন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে; এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝখানে, ১৯৪২ সালে, আমেরিকার লস্ এলামোসে 'ম্যানহাট্টান প্রোজেক্ট' নাম দিয়ে এ্যাটম বোমা তৈরি করার জন্য কাজ ও রিসার্চ আরম্ভ করা হয়। ম্যানহাট্টান প্রোজেক্টের উদ্দেশ্য কি তা পরে তার সামরিক প্রধান জেনারেল গ্রোভস ব্যক্ত করেছেন। এ্যাটম বোমার পরিকল্পনার প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা ডঃ রবার্ট ওপেনহাইমারকে 'আন-আমেরিকান একটিভিটিস কমিটি'-র সামনে অভিযুক্ত করার সময়ে জেনারেল গ্রোভসের সাক্ষ্য নেওয়া হয়। তখন তিনি বলেছিলেন, "এ্যাটম বোমার পরিকল্পনার পেছনে গোড়া থেকেই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল পরিষ্কার—প্রয়োজনমতো এ্যাটম বোমাকে ব্যবহার করতে হবে। আমি নিশ্চয়ই তখনকার সাধারণ মতবাদের আবহাওয়া দ্বারা প্রভাবিত হই নি, যে, রাশিয়া আমাদের বীরত্বপূর্ণ (gallant) সহযোদ্ধা।" (প্রফেসার ব্ল্যাকেটের এ্যাটম বোমা সংক্রান্ত বইতে 'Atomic Energy in East-West Relations' এবং অধ্যাপক ফ্লেমিংয়ের 'History of the cold war' বইতে এর সম্পর্কে পুরো তথ্য পাওয়া যাবে)।

এ্যাটম বোমা

পটসড্যাম কনফারেন্স চলার সময় প্রেসিডেণ্ট ট্রু ম্যানের কাছে সাংকেতিক টেলিগ্রাম এল: "শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে", অর্থাৎ প্রথম এ্যাটম বোমার সফল বিস্ফোরণ ঘটানো গেছে। পটসড্যাম কনফারেন্স থেকে ফিরে এসেই

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান জাপানে এ্যাটম বোমা ফেলার সিদ্ধান্ত নিলেন। এবং ঠিক হল ৬ ও ৯ আগস্ট জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে ফেলা হবে।

তারিখ দুটি লক্ষ্য করা দরকার। ইয়োরোপে হিটলার-মুসোলিনি পরাজিত, যুদ্ধ শেষ, দূরপ্রাচ্যে জাপানের অবস্থা ভালো নয়, তার উপর পটসড্যাম চুক্তি অনুসারে ১০ আগস্ট (ইয়োরোপের যুদ্ধ শেষ হওয়ার তিন মাস পরে) দূরপ্রাচ্যে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত যোগদান করবে এবং সেইমতো সৈন্য সমাবেশও করছে।

কাজেই জাপানে আমেরিকার এ্যাটম্ বোমা ফেলার একটাই উদ্দেশ্য ছিল—**দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে শেষ করা নয়, ভবিষ্যতের তৃতীয় মহাযুদ্ধের মহড়া হিসাবে এ্যাটম বোমা ব্যবহার করে শীতল যুদ্ধ (Cold War) আরম্ভ করা**; দুনিয়াকে দেখানো যে আমেরিকার হাতে এমন মারণাস্ত্র আছে যার আর জবাব নেই।

জাপানে এ্যাটম বোমা ফেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের অবস্থাতে এ্যাটম বোমার পরীক্ষা সারা।

হিরোশিমা-নাগাসাকিতে এ্যাটম বোমার আঘাতের বিশদ তথ্য পাওয়া গেছে। জমি থেকে প্রায় ১০০০ ফুট উচ্চে বোমা দুটির বিস্ফোরণ ঘটানো হয় এবং যেখানে ফাটানো হয়েছিল সেই কেন্দ্রের বারো মাইল বৃত্তের মধ্যে একটি রি-ইন-ফোর্সড কংক্রিটের আটতলা বাড়ির একতলাটি মাত্র অবশিষ্ট ছিল। হতের সংখ্যা এক লক্ষ, আহতের সংখ্যা লক্ষাধিক—নিহতরাই ভাগ্যবান, যারা আহত হয়েছিলেন—তাঁদের অশেষ যন্ত্রণার পর তিলে তিলে মৃত্যু হয়েছে।

শীতের যুদ্ধের আরম্ভ

আমেরিকার এ্যাটম বোমার তড়পানিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন অবশ্য ভয় পায় নি।

১০ আগস্ট সোভিয়েতের দূর প্রাচ্যের লালফৌজ অমিত বিক্রমে ও অতিদ্রুত উত্তর-কোরিয়া ও উত্তর-চীনে প্রবেশ করল, জাপানের দুর্ধর্ষ কোয়ানটুং সামরিক বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, জাপান ২ সেপ্টেম্বর বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হল এবং উত্তর-কোরিয়া ও উত্তর-চীনও মুক্ত হল।

জাপানের কোয়ানটুং বাহিনীর সমস্ত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন

কোরিয়ার ও চীনের জনগণের মুক্তিফৌজকে দিয়ে দিল, উত্তর-কোরিয়া ও চীনে সফল জনগণের বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র গঠনের পথ প্রশস্ত হয়ে গেল। প্রসঙ্গত, কোরিয়ার ও চীনের বিপ্লবে সোভিয়েতের এই বিশিষ্ট অবদানের কথা চীন ও কোরিয়া স্বীকার করে না।

এ্যাটম বোমা হাতে পেয়ে তখনকার সদ্যগঠিত সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জে (ইউনাইটেড নেশানস-এ) আমেরিকার বারনার্ড বারুক-এর সদম্ভ উক্তি—পারমাণবিক শক্তির উৎস পৃথিবীর যেখানে যেখানে আছে সেখানে সেখানে আমেরিকার সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপন করতে হবে (অর্থাৎ সেখানকার জাতি ও দেশের সার্বভৌম কর্তৃত্ব লঙ্ঘন করে) এবং তা না করলে "instant and condign punishment" (অর্থাৎ, তৎক্ষণাৎ ও যথোপযোগী শাস্তি) দেওয়া হবে।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন অবশ্য মোটেই ঘাবড়ায় নি। একদিকে তখন পূর্ব-ইয়োরোপের দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক ও গণবিপ্লবের শক্তি দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে। একের পর এক সেখানে জনগণতান্ত্রিক তথা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপিত হচ্ছে। তারপর ১৯৪৯-এ চীনেও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারা সমাজতন্ত্র* গঠনের পথে প্রাথমিক পদক্ষেপ নেওয়া হল।

অন্যদিকে সোভিয়েতের বৈজ্ঞানিকরা পারমাণবিক পরীক্ষা চালিয়ে ১৯৪৯ সালে প্রথম এ্যাটম বোমা তৈরি করলেন।

এ্যাটম বোমাতেই সোভিয়েত থেমে রইল না। আরও পরীক্ষা চালিয়ে ১৯৫২-তে তারাই প্রথম হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করল (পরে আমেরিকাও ১৯৫৩-তে হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করল)।

আমাদের একটু সময় নিয়ে এ্যাটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার গঠন-পদ্ধতি বুঝে নিলে সামনে এগোবার সুবিধা হবে।

পরমাণু কেন্দ্রকের বিভাজন ও সঙ্গম

এ্যাটম বোমা তৈরি করতে পরমাণুর কেন্দ্রককে (এ্যাটমের নিউক্লিয়াসকে) ভাঙতে বা বিভাজন করতে হয়। অবশ্য বিভাজনের কাজটা একবার শুরু হলে

---

* ১৯৪৯-এ ১ অকটোবর বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদ প্রচণ্ড ঘা খেল যখন সমগ্র চীন (তাইওয়ান বাদে) মুক্ত হল। আজকের দিনে চৈনিক বিপ্লবের বিচ্যুতি যতই পীড়াদায়ক হোক—এবং ইতিহাসের বিচারে তা নিশ্চয়ই সাময়িক—এশিয়াতে সাম্রাজ্যবাদ প্রচণ্ড ঘা খেল চীনে এবং পরে আমাদের ভারতে, যার গুরুত্ব কোনো রকমেই খাটো করে দেখলে চলবে না।

শেকল ছেঁড়ার মতো ছিঁড়তে ছিঁড়তে বা ভাঙতে ভাঙতে চলে, যতোক্ষণ না সেটা সন্ধিক্ষণকালীন ভর (critical mass) পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এই সন্ধিক্ষণ কালীন ভর হচ্ছে একটা বিশেষ পরিমাণের, যার নিচে গেলে বা যা থেকে কম হলে পরমাণু কেন্দ্রকের বিভাজনের কাজটা বন্ধ হয়ে যাবে।

পরমাণু কেন্দ্রককে বিভাজন করলে যে প্রচণ্ড তাপশক্তি পাওয়া যায় সেটাই হল এ্যাটম বোমা।

হাইড্রোজেন বোমার প্রক্রিয়াটি এই বিভাজন প্রণালীর **ঠিক উল্টো** সেখানে চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে একত্র সঙ্গম ঘটিয়ে (বা গরম করে) হিলিয়াম পরমাণুর উদ্ভব হয়, যা থেকে প্রচণ্ড তাপশক্তি আমরা পেয়ে থাকি।

এখন চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে একত্র করে সঙ্গম ঘটাতে কিন্তু দারুণ তাপশক্তির দরকার—অর্থাৎ যেন একটি পারমানবিক চুল্লিতে চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে 'ফুটিয়ে' একটি হিলিয়াম পরমাণু তৈরি করা হচ্ছে।

পারমানবিক চুল্লিতে এই ফোটানোর কাজটা করার জন্য একটা এ্যাটম বোমাকে ফাটানো হয়। ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াল—চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে একত্র করে তাদের সঙ্গম ঘটানোর জন্য যে তাপশক্তির দরকার হয়, সেটা একটি এ্যাটম বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ একটা এ্যাটম বোমাকে যেন ফিউজের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে একটা হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করতে।

এইজন্যই হাইড্রোজেন বোমার সাধারণ বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক নাম হচ্ছে —তাপ-পারমানবিক, ইংরাজিতে বলা হচ্ছে thermonuclear বা fission-fusion bomb (বিভাজন সঙ্গম বোমা)।

সহজেই বোঝা যায়, এ্যাটম বোমার অপেক্ষা হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংসশক্তি হবে অনেক বেশি। হিরোশিমা-নাগাসাকিতে এ্যাটম বোমার ধ্বংসশক্তি ছিল ২০,০০০ টন্ টি, এন, টি,* আর একেবারে সাধারণ হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংসশক্তি হল ৪, ০০০,০০০ টন্ টি, এন্, টি, বা এ্যাটম বোমার চেয়ে

---

* টি, এন্, টি হচ্ছে ট্রিনাইট্রো-টোলুয়েন। নাইট্রিক এসিড ও সালফুরিক এসিডের সঙ্গে টোলুয়েন মেশালে বেনজিনের মতো পদার্থ পাওয়া যায়। কয়েক পাউণ্ড ওজনের (এটা মাপের ওজন) টি, এন্, টিতে একটা দেওয়াল উড়িয়ে দেওয়া যায় বা সোজা আঘাত করতে পারলে মানুষকে প্রাণে মারতে পারা যায়।

কুড়ি গুণ বেশি। ১৯৫২-৫৩ থেকে হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংস ক্ষমতা বাড়াতে বাড়াতে আজ কোটি টন, টি, এন্‌টির (যাকে মেগাটন বলে) হিসাব ধরা হয়।

সত্যিই মেগাটন বোমার ধ্বংসক্ষমতার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। দশ, কুড়ি, একশ বা ততোধিক মেগাটন (বা কোটি টন, টি এন, টি) বোমা তৈরি করে দেখা যাচ্ছে, **পৃথিবীতে প্রাণী জগৎ (মানুষ তো বটেই) নিশ্চিহ্ন করার শক্তি আজ আমাদের করায়ত্ত**।

চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গম ঘটিয়ে একটি হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরণের ফলে দারুন তাপশক্তির সৃষ্টি হয়। সূর্যদেহে অবিরত এই কাজটিই হচ্ছে। অবশ্য 'সূর্যদেহ' বলতে আমরা কঠিন কিছু ভাবিনা। মানুষের সামনে এতদিন প্রশ্ন ছিল: সূর্যের এই দারুণ তাপশক্তির উৎস কি? পৃথিবীর জন্ম হয়েছে ৪৫০ কোটি বৎসর আগে। ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান থেকে আমরা বুঝছি এই ৪৫০ কোটি বৎসর ধরে সূর্য প্রায় আজকেরই মতো সমান তাপবিকীরণ করে যাচ্ছে—কী এ শক্তির উৎস? কোনো বৈদ্যুতিক বা রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে তো এতো তাপ উৎপন্ন করা যায় না। আজ আমরা জানি—সূর্য যেন একটি হাইড্রোজেন বোমা।

এখন প্রশ্ন মানুষের সামনে—সূর্যশক্তিবলে বলীয়ান মানুষ সেই অমিত শক্তিকে ধ্বংসের না কল্যাণের জন্য প্রয়োগ করবে?

শীতল যুদ্ধ থেকে সহাবস্থানের পথে—১৯৪৭ থেকে ১৯৬২

শীতল যুদ্ধের তীব্রতম রূপ আমরা দেখেছি, ১৯৪৭ থেকে পঞ্চাশের দশকে। ১৯৪৭-এ মার্শ্যাল প্ল্যানের মারফৎ ও চার্চিলের কুখ্যাত ফুলটন বক্তৃতার মারফৎ ইয়োরোপকে দুটো ভাগে বিভক্ত করা হল—চার্চিলের ভাষায় সমাজতান্ত্রিক পূর্ব-ইয়োরোপে নাকি লৌহ-যবনিকা* টানা হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যেই স্তালিনগ্রাদের মরণপণ লড়াইয়ের সময়েই তাঁর গুপ্ত মেমোরাণ্ডামে 'রাশিয়ান বর্বরতা'-র কথা চার্চিল উল্লেখ করেছিলেন। এবার তিনি খোলাখুলি ঘোষণা করলেন।

---

* 'Iron curtain' প্রেসিডেন্ট ট্রুমানের উপস্থিতিতে চার্চিল ফুলটনে 'লৌহ-যবনিকা' শব্দটি ব্যবহার করেন তাঁর বক্তৃতায়। এবং লোকে ভাবত শব্দটি তাঁরই সৃষ্টি। তখন কিন্তু অনেকেই জানতো না যে, সমাজতান্ত্রিক জগতকে এই আখ্যাটি প্রথম দিয়েছিল ডঃ গোয়েবলস্—হিটলারের কুখ্যাত প্রচারমন্ত্রী।

এরপর ১৯৫০ সালে আমেরিকা দক্ষিণ-কোরিয়ার আড়ালে উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণ করলো এবং উত্তর-কোরিয়াকে রক্ষা করতে ইয়ালু নদী পার হয়ে এগিয়ে এলো নতুন চীনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। আর ঠিক এই ১৯৫০ সালের জুন-জুলাই মাসে কোরিয়ার যুদ্ধ থেকেই স্বাধীন ভারতে পররাষ্ট্রনীতিতে প্রথম পরিবর্তন দেখা যেতে লাগল। প্রধানমন্ত্রী নেহরু ষ্টালিনকে চিঠি লিখলেন। ষ্টালিন তার জবাব দিলেন নেহরুর 'শান্তিকামী উদ্যোগ"কে ধন্যবাদ জানিয়ে ("I thank you for your peaceable initiative) এবং ১৯৫৪ সালে দিয়েন-বিয়েন-ফুতে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় ও ভিয়েতনামে গণতান্ত্রিক শক্তির জয়ের পরে ভারত জেনিভা শান্তি সম্মিলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করল, এবং চীনের সঙ্গে তিব্বত নিয়ে পঞ্চশীল চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। ১৯৬২-তে অকটোবরে চীন পঞ্চশীল চুক্তি লঙ্ঘন করে ভারতকে আক্রমণ করলেও ভারত পঞ্চশীল চুক্তি থেকে সরে যায় নি।

১৯৫৬-তে সুয়েজ খাল নিয়ে যুদ্ধ লাগে-লাগে অবস্থায় সোভিয়েতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারত আবার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও শান্তির স্বপক্ষে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করল।

১৯৬২-তে একদিকে চীন-ভারত সংঘর্ষ, অন্যদিকে কিউবাকে নিয়ে বিশ্বযুদ্ধ লাগবার মতো অবস্থা। বিখ্যাত মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর "unarmed victory' বইতে লিখছেন, 'পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রনীতিবিদদের কাছে আপীল করে সাড়া পেলুম একমাত্র সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রধান ক্রুশ্চেভের কাছে,' এবং যে বার্ট্রাণ্ড রাসেল চল্লিশ দশকের শেষে বলেছিলেন 'সোভিয়েতকে এ্যাটম বোমা মেরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে', সেই রাসেলই বিশ্বশান্তির পক্ষে অন্যতম প্রধান অভিযাত্রী হয়ে দাঁড়ালেন।

বিশ্বশান্তির জন্য ব্যাপকতম আন্দোলন

পঞ্চাশ দশকের স্থরু থেকেই বিশ্বে শান্তি বজায় রাখার ও সুরক্ষিত করার জন্য ব্যাপকতম আন্দোলন স্থরু হয়ে গেল। একদিকে বিশ্বশান্তি সংসদের স্টকহোলম অধিবেশনের পর থেকে এ্যাটম বোমার ব্যবহারকে নিষিদ্ধ করার জন্য সর্ব-সাধারণের সহি সংগ্রহের অভিযান স্থরু হয়ে গেল। কয়েক বছরের মধ্যে দেখা গেল পৃথিবীর বৃহত্তম জনসংখ্যা বিশ্বশান্তি সংসদের স্টকহোলম্ আপীলে

সহি করে এ্যাটম বোমার ব্যবহারকে নিষিদ্ধ করে শান্তির স্বপক্ষে স্বাক্ষর দিয়েছে। অন্যদিকে দুনিয়ার বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকরা কানাডার পাগ্‌ওয়াস গ্রামে মিলিত হয়ে তাপ-পারমাণবিক অস্ত্রের পৃথিবী-বিধ্বংসী ক্ষমতার কথা ঘোষণা করে বিশ্বশান্তির স্বপক্ষে রায় দিলেন ও একটি সংগঠনে সমবেত হলেন।

বৈজ্ঞানিকদের পাগওয়াস আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বার্ট্রান্ড রাসেল, আর আইনষ্টাইন ১৯৫৫-তে তাঁর মৃত্যুর ঠিক পূর্বেই যে শেষ কাজটি করে গিয়েছিলেন তা হলো পাগওয়াস আন্দোলনের স্বপক্ষে স্বাক্ষর।

এর পর থেকে পৃথিবীর 'বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকরা পাগওয়াস কনফারেনস্' করেছেন বছর বছর এবং প্রত্যেকবারই শান্তির স্বপক্ষে দৃঢ়মত ঘোষণা করেছেন।

কিউবার সংকটের (১৯৬২) পরে

তাহলে আমরা দেখলাম, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে ১৯৬২ সালের কিউবার সংকট ও চীন-ভারত সংঘর্ষ অবধি দুটি পাশাপাশি অবস্থা প্রায় সমান্তরাল ভাবে চলছে—একদিকে দুনিয়াতে সাম্রাজ্যবাদের বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদের* রণহুংকার, শীতল যুদ্ধ লাগানো এবং চালিয়ে যাওয়া, অন্যদিকে বিশ্বশান্তি সুরক্ষিত করতে ব্যাপকতম গণ-আন্দোলন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-তান্ত্রিক শিবিরের, শুধু রাজনৈতিক নয়, সামরিক শক্তিবৃদ্ধিও ঘটে। এ্যাটম, বিশেষ করে হাইড্রোজেন বোমা সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতেও রয়েছে এবং বিশেষ করে যে আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়া হাইড্রোজেন বোমাকে ঠিকমতো ব্যবহার করা যায় না (সামরিক ভাষায় যাকে 'delivery weapon' বলে), সেই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারে সোভিয়েত তার চরম উৎকর্ষ প্রমাণ করলো ১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর মহাকাশে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্পুটনিক প্রেরণ করে।

বিশেষ করে ১৯৪৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর সোভিয়েতের দ্বিতীয় লুনিক

---

* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে পৃথিবীতে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী শিবির ছিল—ইঙ্গ-ফরাসি-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বনাম জার্মান-ইতালিয়ান-জাপানী ফ্যাসিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শিবির আর ছিল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের পরে দাঁড়ালো একটি সাম্রাজ্যবাদী শিবির আর অবিসম্বাদী নেতা হল মার্কিন বা আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র।

রকেট যখন চাঁদের ভূমিতে আছড়ে পড়লো, তখন বোঝা গেল ক্ষেপণাস্ত্রকে সঠিক নির্ভুল নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সোভিয়েতের বিজ্ঞান অসম্ভব পারদর্শিতা লাভ করেছে। যেখানে পৃথিবী ও চাঁদ দুই-ই ভ্রাম্যমান বস্তু এবং দূরত্ব ২,৪০,০০০ মাইল—সেখানে হিসাবে বোঝা যায়, এই ২,৪০,০০০ মাইল পৃথিবী-চাঁদ গমন পথের মধ্যে মাত্র অর্ধ-ডিগ্রির চেয়ে বেশি বিচ্যুতি হলেই চন্দ্রগামী রকেট চাঁদে আঘাত করতে পারতো না।

এর তুলনায় ধরাপৃষ্ঠের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছতে ক্ষেপণাস্ত্রকে যদি ২০,০০০ মাইলও (সমগ্র ভূ-মণ্ডলের পরিধি যেখানে ২৫,০০০ মাইল) যেতে হয়, তাহলেও সেটিকে নির্ভুল লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়া সম্ভব।

১৯৬২ সালে কিউবার সংকটের সফল সমাধানের পর থেকেই এ্যাটমীয় কূটনীতির বদল হচ্ছে, যুদ্ধের আস্ফালন কমাতে হচ্ছে এবং শীতল যুদ্ধের বাতাবরণ ক্রমশ দূর হয়ে শান্তির হাওয়া বইতে সুরু হয়েছে।

১৯৬২ থেকে ১৯৭৫ এই ১৩ বছরে দেখছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েতের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথে অগ্রসর হতে ক্রমশই বাধ্য হচ্ছে, এবং সম্প্রতি ইয়োরোপের ৩৫টি রাষ্ট্র (ক্ষুদ্র আলবানিয়া বাদে) হেলসিঙ্কিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও উত্তেজনা প্রশমনের * জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যাতে ইয়োরোপীয় মহাদেশের বাইরের কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও উপস্থিত ছিল এবং স্বাক্ষর দিয়েছে।

এই হেলসিঙ্কি কনফারেনসের তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী, কারণ মনে রাখতে হবে যে, এই ইয়োরোপীয় মহাদেশ থেকেই দুবার মহাযুদ্ধ সুরু হয়েছে।

যে এ্যাটমীয় কূটনীতি থেকে শীতল যুদ্ধের আরম্ভ, তার সম্পূর্ণ পরাভব বিশ্বসাম্রাজবাদ একেবার ধ্বংস না হলে অবশ্য হবে না, কিন্তু দাঁতাতের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও উত্তেজনা প্রশমনের নীতি আজ দুনিয়াতে শুধু বিশ্বশান্তিকে সুরক্ষিত ও সুস্থিত করছে তাই নয়, জাতীয়মুক্তি স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের শক্তিও আজ দুর্বার গতিতে অগ্রসর।

মানবসভ্যতার স্বর্ণযুগ সামনে, এ নিশ্চিত ভবিষ্যতে আস্থা রেখে আমরা এগোতে পারি।

---

* যাকে এক কথায় বলা হচ্ছে দাঁতাত, শব্দটি-র ফরাসি-অর্থ relaxation বা disengagement, বলা যেতে পারে 'উত্তেজনা প্রশমন'।

দানিকেন ও মানুষের বুদ্ধি

শঙ্কর চক্রবর্তী

এরিখ ফন দানিকেন সম্প্রতিকালে কলকাতায় এসেছিলেন। তার কথা শোনার জন্যে যে দুটি সভা হয় সেখানে লোক প্রায় ভেঙ্গে পড়েছিল। দানিকেনের একধরণের জনপ্রিয়তার প্রকাশ্য পরিচয়টা এভাবে পাওয়া গেল। এই জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে দানিকেনের খান কয়েক বই (যার কয়েকটি বাংলায় অনুদিতও হয়েছে) এবং সেই বইগুলোতে প্রকাশিত তার বক্তব্য এবং সেই প্রসঙ্গে তার মতামত।

দানিকেন তার বক্তব্য রেখেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার প্রত্নতাত্ত্বিক নানা নিদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে। (দানিকেন নিজেকে self-made প্রত্নতাত্ত্বিক রূপে পরিচয় দিয়ে থাকেন)। দানিকেনের যে বক্তব্যটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি মাতামাতি চোখে পড়ে, সেটা হল পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে অগ্নিময় রথে চড়ে যে দেবতাদের আগমনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, সেই দেবতারা আর কেউ নন—অন্য কোন সৌরজগতের এক মহাউন্নত সভ্যতার অধিকারী। এরা আমাদের পৃথিবীতে এসে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার নানা বিষয়ে তৎকালীন পৃথিবীর কিছু নির্বাচিত মানুষকে নাকি তাত্ত্বিক জ্ঞান দান করেছিলেন, যার পরিচয় এখনো আমরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় দেখতে পাই—যেমন মিশরের পিরামিড,মমি ইত্যাদি আরো অনেক কিছু। এ প্রসঙ্গে দানিকেনের বক্তব্য হল তৎকালীন পৃথিবীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সমৃদ্ধির বিচারে ঐ বস্তুগুলোর অস্তিত্বের কোন সঙ্গত ব্যাখ্যাই নাকি পাওয়া যায় না। অতএব কি? না, পৃথিবীর বাইরে থেকে আসা অন্য কোন সৌরজগতের ঐ উন্নত সভ্যতার ধারক ও বাহকেরাই ওদের বিধিবিধান আমাদের বাতলে দিয়েছিলেন।

নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার অধিকার যে কোন ব্যক্তির মত দানিকেনেরও নিশ্চয়ই আছে। ব্যক্তিগত অনুমানের ভিত্তিতে প্রত্যয়সিদ্ধ কণ্ঠেও তিনি কথা বলতে পারেন। দানিকেনের মতামত কিন্তু পৃথিবীর বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা বা কোনো বিজ্ঞানী মহল গ্রহণ করেন নি। তার কারণ, দানিকেনের কোন বক্তব্যের

পেছনেই বিজ্ঞান সম্মত কার্যকারণসম্পর্কবাদের (causality) ভিত্তি নেই।

আমাদের বুদ্ধিটাও নিজস্ব নয়

উন্নততর সভ্যতার অধিকারীরা পৃথিবীতে এসেছিলেন কিনা এবং এ প্রসঙ্গে দানিকেনের বক্তব্য কিন্তু আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। তাঁর কিছু বইতে এবং কলকাতার আলোচনা সভাগুলিতেও যে কথাটা তিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে বলবার চেষ্টা করেছেন, তা হল এই যে; আমাদের বুদ্ধির ব্যাপারটাও নাকি উত্তরাধিকারগত বিবর্তন-সূত্রে আমরা পাই নি। আমাদের বিবর্তনের যে পর্যায়কে বলা হচ্ছে missing link অর্থাৎ বিবর্তনের যে পর্যায়ে আমাদের পূর্বপুরুষের দেহে একই সঙ্গে anthropoid ape বা নররূপী বানর এবং মানুষের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল (দানিকেনের মতে এই missing link-এর সন্ধান নাকি এখনো পাওয়া যায় নি), সেই পর্যায় থেকে আধুনিক মানুষ পর্যন্ত বুদ্ধির বিবর্তনের ব্যাপারটা এতই নাকি বৈপ্লবিক যে তাকে স্বাভাবিক একটি ঘটনা বলে কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না। দানিকেন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে চাইছেন, ঐ একই উন্নত সভ্যতার অধিকারীরাই নাকি বানররূপী আমাদের পূর্বপুরুষদের মগজে বুদ্ধিবৃত্তিকেও কৃত্রিম বংশগতির পদ্ধতিতে (artificial mutation) আরোপ করে একেবারে সরাসরি তাদের বন্য ও অন্ধকারের জগত থেকে আলোর জগতে উত্তরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

দানিকেনের এই বক্তব্য শুধু যে বিজ্ঞানবিরোধী তা নয়, বিজ্ঞানের স্বীকৃত ও প্রমাণসিদ্ধ তত্ত্ব ও তথ্যকে অস্বীকার করে নিছক কল্পনাবিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এ জাতীয় একটি ধারণার সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর আয়ার্ল্যাণ্ডের আর্চবিশপ Usher-এর মতামতের ভাবগত পার্থক্যটা খুব বেশী নয়। Usher-এর ধারণাটি ছিল, পৃথিবীর সৃষ্টি হয় খ্রীষ্ট জন্মাবার ৪০০৪ বছর আগে নভেম্বর মাসের কোন একটি পবিত্র মুহূর্তে। পৃথিবী সৃষ্টি হবার পর তার মাটি ফুঁড়ে বেড়িয়ে এল যত রাজ্যের গাছপালা এবং যত প্রাণীকে আজ আমরা দেখি তারা সবাই। তারপর একদিন আরো এক পবিত্র মুহূর্তে হাওয়া থেকে পরম করুণাময় ঈশ্বরের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আবির্ভূত হল মানুষ। অর্থাৎ সোজা কথায় পৃথিবীর তাবৎ নোংরা প্রাণীকুলের সঙ্গে মহৎ প্রাণী মানুষের বিবর্তনগত কোন সম্পর্কই নেই।

আত্মীয়তার পুরনো সম্পর্ক

অন্য প্রাণীকুল থেকে বিবর্তনের বিচারে মানুষকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি প্রাণী হিসেবে যে বিচার করা যায় না, ডারুইন-এর ১৮০৯-৮২-র বিবর্তনবাদের মোদ্দা কথাটা হল তাই। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার সম্পর্কটি বাঁধা—কেউ আমাদের দূরের জ্ঞাতি, কেউ কাছের জ্ঞাতি। যেমন মাছেরা অনেক দূরের জ্ঞাতি (৩৩ কোটি বছর আগের আত্মীয়তা, যখন প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণী মাছেরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়, তেমনি নররূপী বানরেরা (গিবন, শিম্পাঞ্জী, ওরাংওটাং এবং গরিলা) হল আমাদের সবচেয়ে কাছাকাছির আত্মীয়, যাদের রাস্তা থেকে আমাদের বিবর্তনের রাস্তাটা পৃথক হয়ে গেছে আজ থেকে প্রায় তিন, সাড়ে তিন কোটি বছর আগে।

মানবভ্রূণ যে দশ মাস দশ দিন মাতৃগর্ভে অবস্থান করে, সেই স্বল্প সময়টুকুর মধ্যে তার ক্রমবর্ধমান দেহের মধ্যে মাছ, সাপ, ব্যাঙ, স্তন্যপায়ী প্রাণী, বানর প্রভৃতি প্রাণীদেহের কিছু কিছু লক্ষণ স্বল্পকালের জন্যে দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে যায়। অর্থাৎ, মানবভ্রূণ পেছনে ফেলে আসা বিবর্তনের প্রায় ৪০ কোটি বছরের যে পুরনো রাস্তাটা, তার প্রধান খুঁটি বা বুড়িগুলোকে যেন একটি একটি করে ছুঁয়ে আসে। এই আশ্চর্য ব্যাপারটা আজও প্রতিটি মানবভ্রূণের ক্ষেত্রেই ঘটেছে।

নর-বানর থেকে মানুষ

Ape বা নর-বানররূপী একটি পর্যায় থেকেই যে মানুষের উদ্ভব, ডারুইন তাঁর The descent of Man গ্রন্থে (১৮৭১ সালে প্রকাশিত) পরিষ্কারভাবেই তা বলেছেন। এর জন্যে ডারুইনকে কম গঞ্জনা সহ্য করতে হয়নি। ডারুইনের মতে বংশগতির ধারা এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে নর-বানর পর্যায় থেকে আমাদের খাঁটি পূর্ব পুরুষরূপী পর্যায় পর্যন্ত মানুষের দেহের যেমন বিকাশ ঘটেছে তেমনি বিবর্তন ঘটেছে তার মগজের ক্ষেত্রেও। এঙ্গেলসের মতে নর-বানরের স্বল্প আয়তনের মগজ থেকে মানুষের বিশাল আয়তনযুক্ত মগজে যে রূপান্তর, তার পেছনে দুটি বিরাট ঘটনা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল—একটি হল, সামনের দুটো পা-কে হাতের মত ব্যবহার করা এবং তা দিয়ে কাজ করা, অপরটি হল অর্থবোধক শব্দের (articulate speech) মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলা। কিন্তু এই বিবর্তন ঘটেছে খুব ধীর এবং মন্থর গতিতে।

ইংরেজ জীববিজ্ঞানী অ্যালফ্রেড ওয়ালেস (১৮২৩-১৯১৩) কিছুতেই মানতে

রাজি হন নি যে মানুষের এত অসাধারণ উন্নত মগজ নর-বানর জাতীয় একটি জন্তুরূপী পর্যায় থেকে বিকাশ লাভ করেছিল। তাঁর মতে, এর উৎস অন্যত্র। এই বিরাট মহাবিশ্ব জুড়ে যে অদৃশ্য মহাশক্তির খেলা, মানুষের মগজের বুদ্ধির পেছনেও সেই মহাশক্তিরই অবদান রয়েছে। ওয়ালেসের অপার্থিব মহাশক্তি আর দানিকেনের বুদ্ধিদাতা 'দেবতা'—এই দুই চিন্তার মধ্যে তফাত বিশেষ কিছু নেই। দানিকেন প্রকৃতই ওয়ালেসের মন্ত্রশিষ্য।

দানিকেনের বক্তব্য নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন দেখা দিত না, যদি না আমাদের দেশের বেশ কিছু শিক্ষিত মানুষ দানিকেনের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হতেন। কোন বৈজ্ঞানিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হতে আপত্তি নেই, কিন্তু যে চিন্তা মানুষের যুক্তিবিজ্ঞানকে খণ্ডন করে, বস্তু ও প্রকৃতিজগতের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে অস্বীকার করে, তাকে গ্রহণ করা যায় না। দানিকেনের বক্তব্য এবং চিন্তা এই পর্যায়ভুক্ত এবং তা বিজ্ঞান-বিরোধী বলেই সর্বতোভাবে বর্জনীয়। দানিকেন যে কথাটা বলছেন, অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধির ব্যাপারটা নাকি তার নিজস্ব নয়—আরোপিত একটা ব্যাপার, এটা যতই হাস্যকর মনে হোক না কেন, নৃ-বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রসংগটা নিয়ে খানিকটা পর্যালোচনা নিশ্চয়ই করা যেতে পারে।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা

দানিকেন একটা কথা ঠিকই বলেছেন যে ডারুইন মানুষের বিবর্তনের ছকের মধ্যে missing link-এর কালানুক্রমিক পর্যায়ই ঠিক করে উঠতে পারেন নি। তার একমাত্র কারণ হল, তখনও পর্যন্ত আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবাশ্মরূপী প্রাণীদেহের অবশেষ খুব বেশি কিছু পাওয়া যায় নি। এই missing link-এর প্রকৃত সন্ধান পান ডাচ নৃ-বিজ্ঞানী ইউজিন ডুবোয়া। এ প্রসঙ্গে মানুষের বিবর্তনের সিঁড়িটির পূর্ববর্তী দু-চারটি ধাপ সম্বন্ধে একটু কথা বলে নেয়া দরকার।

স্তন্যপায়ী প্রাণীকুলে প্রাইমেটের আবির্ভাব ঘটেছিল আনুমানিক পাঁচ কোটি বছর আগে। এই প্রাইমেট হল বানর, নররূপী বানর এবং মানুষের আদি পূর্বপুরুষ। বিবর্তনের সিঁড়ি ধরে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে আসার পর আনুমানিক তিন থেকে সাড়ে তিন কোটি বছর আগে প্যারাপিথেকাস ও প্রপলিওপিথেকাসরূপী দুটি পূর্বপুরুষের মধ্যবর্তী কোন পর্যায় থেকে চারটি নর-বানর ওদের বিবর্তনের আলাদা রাস্তা বেছে নিল।

আনুমানিক দেড় কোটি বছর আগে ড্রায়োপিথেকাস নামে আমাদের একটি পূর্বপুরুষ তার গাছের নিরাপদ আশ্রয় থেকে মাটিতে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছিল খাদ্যের অন্বেষণে। মিশর দেশে নীল নদের ধারে ফায়ুম উপত্যকায় আমাদের এই পূর্বপুরুষটির বহু জীবাশ্মরূপী অবশেষ পাওয়া গেছে।

গাছ থেকে মাটি—জীবনযাত্রার পদ্ধতির মধ্যে এ ছিল একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। মাটিতে বাস করে যে হিংস্র জন্তুরা, তাদের সঙ্গে এঁটে ওঠার মত শারীরিক শক্তি ড্রায়োপিথেকাসের ছিল না। অগণিত সংখ্যায় তারা মারা পড়ল, যার নিদর্শন ফায়ুম উপত্যকায় ছড়িয়ে আছে। এর পরবর্তী যে পূর্বপুরুষটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটছে, তিনি হলেন অষ্ট্রালোপিথেকাস (অষ্ট্রালো মানে দক্ষিণদেশীয় আর পিথেকাস মানে বানর)। আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে ১৯২৪ সালে প্রথম এর জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া যায় বলে এর এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। আনুমানিক ১০ থেকে ৩০ লক্ষ বছর আগে আমাদের এই পূর্বপুরুষটি বসবাস করত।

অষ্ট্রালোপিথেকাস একদিন হয়তো আকস্মিকভাবেই এক অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল—হঠাৎ মাটি থেকে একখণ্ড পাথর কুড়িয়ে নিয়ে কোনো জানোয়ারকে অনায়াসে ঘায়েল করে বসলেন, আগে খালি হাতে যার সঙ্গে লড়াই করতে হত। প্রকৃতির পাথরের মধ্যে হাতিয়ারের সন্ধান পেল আমাদের পূর্বপুরুষ, এ যেন প্রকৃতির ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল তার, মার্কস যাকে বলেছেন extension of human limbs। আমাদের এই পূর্বপুরুষটি ছিল প্রথম মাংসাশী, ফলে তার দৈহিক পুষ্টি বেড়ে উঠল; এর মগজের আয়তন ছিল ৭৫০ ঘন সেন্টিমিটার, যেখানে প্রাণীজগতে আমাদের নিকটতম আত্মীয় গরিলার মগজের আয়তন হল ৬০০ ঘন সেন্টিমিটার, অর্থাৎ কিনা ape বা নর—বানর পর্যায় থেকে আমাদের পূর্বপুরুষ মানুষ হবার দিকে একধাপ এগিয়ে গেছে।

মিসিং লিংক

ডারুইন বলেছিলেন, যেহেতু দুটি নর-বানর শিম্পাঞ্জী ও গরিলার সঙ্গে মানুষের নানাবিষয়ে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায় এবং এদের বসবাস হল আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলে, মানুষের missing link বা বিবর্তনের হারানো সূত্রের সন্ধান করতে হবে ঐ অঞ্চলেই; ঐ দুটি প্রাণী থেকেই হয়তো বিবর্তনের

ধারাপর্যায়ে মানুষ এসেছে।

ডাচ নৃবিজ্ঞানী ইউজিন ডুবোয়া ডারুইনের এই মত মানতে পারেন নি। তিনি প্রায় অনুমানের ওপর নির্ভর করে ১৮৯১ সালে এলেন জাভা দেশে, সেখানে বাংগাওয়ান নদীর ধারে টিনিল্ গ্রামে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করলেন এবং সন্ধান পেলেন কয়েকটি শ্বা-দন্ত, একটি উরুর হাড় এবং একটি মাথার খুলির জীবাশ্ম। মাথার খুলির মাপ নিয়ে দেখলেন, আয়তনে প্রায় ৯০০ ঘন সেন্টিমিটার অর্থাৎ কিনা অষ্ট্রালোপিথেকাসের চেয়েও এ আধুনিক মানুষের (মাথার খুলির মাপ আয়তনে ১৬০০ ঘন সেন্টিমিটার) দিকে আরো খানিকটা এগিয়ে এসেছে। উরুর হাড় পরীক্ষা করে বোঝা গেল এরা সোজা হয়ে হাঁটতে পারত। ডুবোয়া এর নাম দিলেন পিথেক্যানথ্রোপাস ইরেকটাস, অর্থাৎ যে বানর-মানুষ সোজা হয়ে হাঁটতে পারত। এর আর এক নাম হল জাভা মানুষ। এই সর্বপ্রথম আমাদের পূর্বপুরুষের পরিচয় দেবার জন্যে অ্যানথ্রোপাস বা মানুষ এই শব্দটিকে ব্যবহার করা হল, অর্থাৎ ইনি হলেন আমাদের এমন এক পূর্বপুরুষ যার দেহে একইসঙ্গে বানর ও মানুষের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। ডুবোয়া আমাদের এই পূর্বপুরুষটিকে অভিহিত করলেন missing link বা মানুষের বিবর্তনের হারানো সূত্ররূপে। এরা আনুমানিক আট থেকে দশ লক্ষ বছর আগে বসবাস করত। এরা শুধু পাথর নয়, গাছের ডালকেও হাতিয়াররূপে ব্যবহার করতে শিখেছিল।

জাভা মানুষের প্রায় সমসাময়িক হল আমাদের আর একটি পূর্বপুরুষ—সিথান-থ্রোপাস বা পিকিং মানুষ। পিকিং শহরের কাছে চৌকুতিয়েন পাহাড়ের গুহায় প্রথম এর জীবাশ্ম পাওয়া যায়। এর মাথার খুলির মাপ নিয়ে দেখা গেল, আয়তনে প্রায় ১০৫০ ঘন সেন্টিমিটার অর্থাৎ আধুনিক মানুষের দিকে আরো এক ধাপ এগিয়ে এসেছে। পিকিং মানুষ বনের দাবাগ্নি থেকে জ্বলন্ত কাঠ কুড়িয়ে এনে আগুনের ব্যবহার শিখেছিল এবং সেই আগুনে কাঁচা মাংস ঝলসে খেতে আরম্ভ করল। ফলে দেহের ও মগজের পুষ্টি দুই-ই বেড়ে উঠল। আমাদের এই পূর্বপুরুষটি সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা হল এই, এরা পরিষ্কার অর্থবোধক শব্দের মাধ্যমে কথা বলতে পারত।

নেয়ানডার্থাল ও ক্রো-ম্যাগনণ

এরপর আমাদের পূর্বপুরুষের সন্ধানে এশিয়া ভূখণ্ড ছেড়ে ইয়োরোপে আসতে

হবে। প্রায় তিন থেকে পাঁচ লক্ষ বছর আগে এখানে বসবাস করত নেয়ানডার্থাল মানুষ (জার্মানীর নেয়ানডার্থাল উপত্যকায় ১৮৫৬ সালে যার দেহের জীবাশ্ম সর্বপ্রথম খুঁজে পাওয়া যায়)। এদের মাথার খুলির মাপ ছিল ১৪০০ ঘন সেন্টিমিটার, প্রায় আধুনিক মানুষের কাছাকাছি। এরা জানোয়ারের চামড়া সেলাই করে পরিধেয় বস্ত্ররূপে ব্যবহার করে নগ্নতাকে ঢাকলেন এবং পশুপালন শিখলেন, ফলে আর একটি পুষ্টিকর খাদ্য দুধের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটল। আমরা জানি খাদ্যের সঙ্গে মগজের পুষ্টির একটি নিকট সম্পর্ক রয়েছে। মারা যাবার পর আমাদের এই পূর্বপুরুষেরা মৃতদেহ কবর দিত। পৃথিবীর প্রথম তুষার যুগের প্রচণ্ড শীতল পরিবেশে এদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ছিল খুবই দুঃখদায়ক।

আধুনিক মানুষের খাঁটি পূর্বপুরুষ হল ক্রো-ম্যাগনন (১৮৬৮ সালে ফ্রান্সের ক্রো-ম্যাগনন উপত্যকায় প্রথম এর জীবাশ্মরূপী দেহাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়), প্রায় এক লক্ষ বছর আগে যারা বসবাস করত। এদের মাথার খুলির মাপ ছিল প্রায় আমাদের মতই। এরা পাথরে পাথর ঘষে ধারাল হাতিয়ার তৈরি করে গাছের ডালের মাথায় বেঁধে প্রথম কুড়ুল তৈরি করেছিল। এরা ইন্দ্রজালে বিশ্বাস করত এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার পেছনে এক অতিপ্রাকৃত শক্তি বা দেবতার অস্তিত্বের কথা এরাই প্রথম ভাবতে আরম্ভ করেছিল।

এছাড়াও বিবর্তনের মধ্যবর্তী পর্যায়গুলোতে আমাদের আরো কিছু পূর্বপুরুষের সন্ধান পাওয়া গেছে, যেমন হাইডেলবার্গ, গ্রিমালডি, ফতেশভাদ এবং সোঁয়াশকুম্ব মানুষ, যাদের প্রত্যেকেরই ছিল একটি স্বতন্ত্র জীবনযাপনের বৈশিষ্ট্য। আমাদের পূর্বপুরুষের জীবাশ্মরূপী দেহাবশেষের সন্ধান এখনো চলছে, যাতে কালানুক্রমিক বিচারে জাভা মানুষ (একে যদি আমরা 'হারানো সূত্র' বলে মেনে নিই) থেকে ক্রো-ম্যাগনন পর্যন্ত ছোট-ছোট ফাঁকগুলোকে পূর্ণ করা যায়।

এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক

প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিমুহূর্তে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আমাদের পূর্বপুরুষদের টিঁকে থাকতে হয়েছিল এবং এই পারস্পরিক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক যে বিরাট বিপুল সমস্যাকে প্রতিদিন তাদের মগজের কাছে পৌঁছে দিত সমাধানের জন্যে, তারই ক্রমবর্ধমান চাপে মগজের পরিমানগত এবং গুণগত বিকাশ ঘটেছিল একই সঙ্গে। এরই ফলে একটি নর-বানররূপী পর্যায় থেকে মগজের বিকাশ ঘটতে

থাকে ধীরগতিতে এবং কালক্রমে তা মানুষের পূর্ণবিকশিত মগজে (যার মধ্যে রয়েছে প্রায় ১৩০০ কোটি স্নায়ুকোষ) পরিণত হয়। জীবনে অভিজ্ঞতা এবং সমস্যাকে বাদ দিয়ে মগজের সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভবপর নয়। এটা বর্তমান যুগেও যেমন সত্য, আমাদের বানর-মানুষরূপী পূর্বপুরুষদের ক্ষেত্রেও ছিল সমান সত্য।

দানিকেনের বহির্জগতের দেবতাদের কাছ থেকে আমাদের 'হারানো সূত্র'রূপী পূর্বপুরুষদের বুদ্ধি ধার করার কোন প্রয়োজন ছিল না, বিবর্তনের ধারাপর্যায়ে যেটুকু মালমশলা তারা মগজের খুলিটার মধ্যে পেয়েছিলেন, সমস্যাসংকুল জীবনে নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলার পাথেয়রূপে তাই ছিল যথেষ্ট।

ফসিল

বনস্পতি গুপ্ত

কবরের মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে
খুঁড়তে খুঁড়তে খুঁড়তে খুঁড়তে কবরের মাটি
খুঁড়তে খুঁড়তে
হাহাকারের শব্দ
শতাব্দীর যন্ত্রণা শতাব্দীর পর শতাব্দীর
কাজ আর ঘাম
মরা আর বাঁচা বাঁচা আর মরা

খুঁড়তে খুঁড়তে খুঁড়তে খুঁড়তে
ফসিল

হাতে হাত লাগা
দীঘল কেশের মায়ায়
জড়াতে জড়াতে জড়াতে জড়াতে
ডীপ ফ্রীজের মতো বরফ জমানো
শীতল হৃদয়
বরফ জমানো শীতল হৃদয়
দীঘল কেশের মায়াতে জড়াতে
জড়াতে জড়াতে জড়াতে জড়াতে
ফসিল

দিনে দিনে

মনীন্দ্র রায়

একদিন কেউ একজন
আমার কাঁধের ওপর হাত রেখেছিল।
তার আঙুলগুলো ছিল গাছের শিকড়ের মতো,
আর তা চামড়া ভেদ ক'রে নেমে যাচ্ছিল আমার
হৃদপিণ্ডের দিকে।—
আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম।

লোকটা তখন তার হাত সরিয়ে নিয়ে
পায়ের ওপর রাখতে চাইল তার পা ;
আর তখনই যেন গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ওজন
আমাকে পুঁতে ফেলতে চাইল মৃতের মতো
পাতালের অন্ধকারে।—
আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম।

তৎক্ষণাৎ সেই লোকটা
মেঘের কার্ণিশের ওপর পা রেখে
চলে গেল বিদ্যুতের সিঁড়ি দিয়ে কালপুরুষের দিকে।

দিনে দিনে তারপর তৈরী হলাম আমি।
আমার রক্তকে করলাম আমি
কলকাতার ড্রেনের মতো দীন এবং সেবাপরায়ণ ;
আমার ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ করে তুললাম
সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতো ;
আর আমার ভালোবাসা—
না, সেখানেই আমার দিনরাত্রির দাহ।

যদি সে ফিরে আসে আবার,
তার হাতে তুলে দেবার জন্যে
আজো আমার এই সাপের নিশ্বাসে ভরা
বদ্ধ জলার পাঁকের ভেতর থেকে
পদ্ম ফোটানো হল না।

মাথা উঁচু রেখে দাঁড়াবার জন্যে

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

মাথা উঁচু রেখে দাঁড়াবার জন্যে
একবার এসো এই খোলামেলা জায়গায়,
বিশাল বটগাছটার ছায়ায়।

মাথা উঁচু রেখে দাঁড়াবার জন্যে
উন্মুক্ত জায়গায় এলেই
গাছগুলোকে খুব আত্মীয় মনে হয়,
হাওয়াকে সুহৃদ স্পর্শের মতো লাগে,
নদীকে তৃষ্ণার অঞ্জলি।

মাথা উঁচু রেখে দাঁড়াবার জন্যে
ঝোপেঝাড়ে পথের খোদলে
অনিশ্চিত বিপদের ছায়াগুলোকে হটিয়ে দিয়ে
হাওয়া, আরো হাওয়া,
স্রোত, আরো স্রোত···
জীবনটা সুন্দর করবার জন্যে তখন শপথ নিতে আবার ইচ্ছা হয়॥

অভিমন্যু দৈনন্দিন

কৃষ্ণ ধর

সে তখন হাবার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে
রক্ষীরা ঘিরেছে তাকে
ট্রেন ভরতি মানুষের কৌতূহলী চোখ।
'কী হলো? হলোটা কী?'
পুঞ্জ পুঞ্জ ভিড় জমে ভিড় গলে যায়
আপিস টাইমের তাড়া
'লাইনে নতুন মনে হচ্ছে।' কথা ছোঁড়ে কেউ
কেউ বলে, হাড় বদমাস এদের চেনেন না?
ছিনতাই পার্টির লোক ঝানু স্মাগলার
উচ্ছন্নে দিল দেশটাকে।
'কী আছে বার কর দেখি? আর কে কে দলে আছে বল্?'
ছেলেটা কেঁদেই সারা
'ওসব অনেক দেখা আছে, বার কর মাল।'
'ডুচার ঘা দিলেই বেরুবে এমনিতে কি হয়?'
শ্বাপদনখীরা সব ঝাঁপিয়ে পড়ে।
ট্রেন ভরতি মানুষ মিনিটে মিনিটে পার হয়
সিনেমায় ফেড ইন ফেড আউট যেরকম দেখায়
পুঁটুলিটা ততক্ষণে ছিন্নভিন্ন পড়ে আছে প্ল্যাটফর্মে
ছোট বোনের জন্য বুঝি বা একটা পুতুল,
মায়ের সিঁদুর পাতা আর
শিউলি ফুলের মতো কিছু মুড়ি গুঁড়ো গুঁড়ো পায়ের তলায়।
উল্টোডিঙ্গি ইস্টিশানে চিলের গলায় কাঁদে
অভিমন্যু দৈনন্দিন
অভিমন্যু দৈনন্দিন
মিনিটে মিনিটে ট্রেন যায়।

দখল

সিদ্ধেশ্বর সেন

১

তোমার দখল নিয়েছি
এবার ঘরবাড়ি বানিয়ে—
বসত

লোকে বলে, ঘরবাড়ি
কেমনতর, ভালো ?
খুঁটি-খোঁটা পোক্ত ?

দখল তো নিয়েছি,
খানিক ছেড়ে দিয়ে
খানিক মেনে নিয়ে,
হয়তো !

২

এই প্রথম
একটা ঘরে ঢুকছি

মনে হল তাই
জানলা-দরজা রয়েছে ঠিকই

মনে হল তাই
ছাদ আর দেয়ালটাও নেহাৎ কমজোরী
নয়

তবে পরখ,
করতে লাগবে মনের
রোখ

খুঁটিনাটি চেনবার সময়
বাছবিচার করবার সময়—

৩

ইতিমধ্যে
পাড়ার পাঁচজনা

দোর-গোড়ায়
পেতে রাখল আড়ি

আর, আমাদেরই বলতে হবে কিনা
কখন, কেমন

পাতা হল ধ্যানের ঘরবাড়ি
তুলছি ধ্যানের ঘরবাড়ি ॥

একেকটা ছবি

সতীন্দ্রনাথ মৈত্র

একেকটা ছবি যেন এমন যা ভোলা যায় না,
দু-একটি মুখের আদল মৃত্যুও ভাঙতে পারে নি,
কামানের শব্দকে ডুবিয়ে দেয় এমন কণ্ঠস্বর
বিশ্বাসঘাতকের অট্টহাসিকেও ছাপিয়ে ওঠে।

অথচ রক্তমাংসের শরীরটা এত ভঙ্গুর
একটা ছোট শিশের টুকরোর আঘাতও সয় না,
এক তাল মাংসকে মাটির তলায় পুঁতে
জহ্লাদ বারে বারেই ভাবেঃ যাক বাঁচা গেল।

অথচ তখনো পাখি ডাকে, আকাশ নীল,
শিশু জন্ম নেয়, দিনের পরে রাত, রাতের পরে দিন আসে,
মনে হয়, কই যা হবার কথা, তাতো হল না!
একটা আশ্চর্য নিশ্চিন্ততা, একটা প্রশান্তি নামতে থাকে।

আর ঠিক তখনই, যখন সেই ভয়ঙ্কর প্রশান্তি নামে,
খুনীদের চিৎকার আর অস্ত্রের আস্ফালনে সব চুপ,
এমনকি পাখিরাও গান গাওয়ার আগে ওদের চোখে তাকায়—
ঠিক তখনই হঠাৎ মাটি কেঁপে ওঠে, গম গম করে ওঠে সেই আশ্চর্য গলাঃ

আমি মুজিব বলছি…

পালাতে পারি না

ধনঞ্জয় দাশ

আমি আর পালাতে পারি না !

কেননা যে-বৃক্ষে বাস
যার শাখা আমার আশ্রয়
আদিম শিকড় তার
ভল্গা-গঙ্গা পার হয়ে চলে গেছে
শত শত শতাব্দীর পার।

প্রাচীন এ-বৃক্ষ তবু জাদু জানে
আমাকে সে নিত্য বাঁধে কঠিন মায়ায়
সালোক-সংশ্লেষ কিংবা প্রস্বেদনে
দিন-রাত্রি মন্ত্র প'ড়ে
সে আমাকে ফুটতে বলে
তার ঐ প্রবীণ শাখায়।

অথচ জানে না সে
প্রাচীন বৃক্ষের কাণ্ড জীর্ণ হয়
কালাতিক্রমণদুষ্ট পুরু ত্বক ফেটে যায়
শুষ্ক শাখা টানে না মাটির রস
বিষাক্ত লতার ফাঁস নেমে আসে
শীর্ণ ডালে প'ড়ে থাকে সাপের খোলস।

সব জানি, তবু ঐ শাখার আশ্রয় ছেড়ে
চলে যেতে বড় মায়া লাগে
বৃন্তচ্যুত হতে খুব ভয়
তাই আমি পালাতে পারি না।

পুরাণ কথন

তরুণ সান্যাল

এক চক্ষু সাইক্লোপস-এর দ্বীপ থেকে ওডেসিয়ুস তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে পালালেন। হোমর লিখছেন, ক্ষুধার্ত তাঁর সহনাবিকেরা যারা ইনিয়াসকে মিশিয়ে দিয়েছে ধুলোয়, বিশাল লবণদ্রবণের ক্ষার ও কষায় টেনে নামিয়েছে বুকের রক্ত জমিয়ে দেওয়া সমুদ্র-দেবতার মূর্তি, যারা ছিল উদ্ধত আর বীর, লাফিয়ে নামলো তারা উপলআকীর্ণ আরো এক জনশূন্যতার বেলাভূমিতে। মুঠো মুঠো করে খেতে শুরু করলো কাঁচাই, খোলা না ভেঙে সিন্ধু- শামুক, গুগলি আর ঝিনুক, তারপর ক্ষুধার নিবৃত্তিতে ক্লান্ত তারা ঘুমিয়ে পড়লো। তপ্ত, বালুভূমির মধ্যে ঢুকে গেছে তাদের হাত, ভূমধ্যসাগরের ফেনাস্ফুরিত গরম আক্রমণগুলি লাফিয়ে পড়ছিল তাদের দেহে। তারা স্বপ্নে দেখছিল ইথাকার রমণীদের, তাদের বর্তুল স্তন, জানু পেঁচিয়ে উঠে আসা হাল্কা সাদা পোষাক। বাহুগহ্বরের পিঙ্গল কলার ঝোপের মতো রোম আর বিব্রত অথচ সাহসী পুরুষদের পাঞ্জার আকুঞ্চনের দিকে প্রসারিত সূর্যোদয়ে বাক্সপাহাড় রঙের বড়ো একা ও উদাস বৃন্তগুলি। দৌড়ে চলে যাচ্ছিল তাদের মাথার মধ্যে তাদের ক্ষেত। অথচ, বুনো শুয়োরের পিছে ভারি বল্লম হাতে ধাবন, রমনীর নিঃশ্বাসে তাজা দ্রাক্ষারসের গন্ধে আচ্ছন্ন শয্যা, চোখের মণিগুলি ঢাকা পাতার নিচে ঘুরছিল বামে আর ডাইনে। ককিয়ে উঠে বসলো তারা। আর মনে পড়ে গেল সাইক্লোপস-এর দাঁতে ঝুলন্ত সাথীদের কথা, হাপুস হয়ে কাঁদতে শুরু করলো তখন। বন্ধুগণ, জীবন ঠিক এরকমই পুরোপুরি, এমনিই হতে বাধ্য যখন নীল মরুভূমির বালিচিক্কন ফেনায় কালো ঝড়ের মধ্যে পেরিয়ে যেতে যেতে মায়াবিনীদের বাঁশি, স্বদেশী বধূদের উপমায় নকল শয্যাসঙ্গিনী আর মাঝে মধ্যে বজ্রের করাতে আকাশ চিরে বিদ্যুতের গুঁড়ো মাথায় নিয়ে আয়ুর মতো ঐ জাহাজ খুনি আর হাওয়ায় টালমাটাল হতে হতে কোন রহস্যময় পোকা যার নাম বছরগুলি যখন কুঁরে কুঁরে ছিদ্র করে দেয় তলা, একপাল

ছাগলের মতো একদা রুস্তম যায় হারিয়ে দশটা-পাঁচটার ট্রামে বাসে পদচারণায়। গীতায় কৃষ্ণ যখন বিশ্বচরাচর অঙ্গে ধারণ করে দাঁড়ালেন, কোথায় তাঁর হাতে বাঁশি বা রথের রশি বা চাবুক, অর্জুন সন্ত্রস্ত করজোড়ে বসলেন তাঁর পায়ের কাছে, আর বন্ধুকেই ভয়ের কারণ ভেবে স্বেদে আকুল হলেন। এমনিই, বন্ধুগণ, জীবনও। যাকে ভীষণ চেনাজানা মনে হয়, যার সঙ্গে উঠবোস ঘরকন্না, এমনকি ঘরের কুলুঙ্গিতে পাতা জালের মধ্যে গ্রাম্য মহাজনের মতো মাকড়সাটি কখন কোন ভঙ্গি বা ভেক নেবে যখন হাতের রেখার মতো জানা, তখন ঘর বাহির, চেনা রমণীর চক্ষু ওষ্ঠাধর নাক পাছা ও স্তন, শিশুদের হাতের লোহার বালা চোখের কাজল কোমরের জালের কাঠি, পুরুষদের পাঞ্জাবির খোলা বোতাম ও বুকের লোম—সব একাকার হয়ে ছড়িয়ে যায় ব্যপে যায় প্রসারিত হয়ে যায় এক বিপুল মহাশরীর। সেও জীবনই, যাকে দেখে ভয় হয়, অথচ স্বজন আর শত্রুদের মধ্যে স্থাপিত একটি রথে আলুলিত গাণ্ডীব হাতে উঠে আসে অজানতে। জীবন ঠিক এ রকমই আবার।

এবার কী কোনো দ্বীপে প্রায় উষ্ণজলশয়নে আপনারা! যদি পেট ভরে গিয়ে থাকে এমন কি গেঁড়ি গুগলিতে, তাহলে ঘুম ভেঙে খানিকক্ষণ কাঁদুন ডাক ছেড়ে সঙ্গী সাথীদের কথা মনে করে। গাণ্ডীব তুলে নিন হাতে না হয় বিমূঢ় সেনানীব্রতেই। তা না হলে, আপনি জানেন কত ক্ষুধার্ত আপনি, হাত মেলে তুলে নিন আমাদের এই নোনা সমুদ্রের বালুবেলা ভূমিতে যা জোটে তাই। আপনার খিদে পেয়েছে। না কি আপনি এখন স্বপ্ন জাগরণে দেখছেন ইথাকার শ্বেত পাথরের মূর্তিমতী প্রতীক্ষা, নাকি বুনো শুয়োরের পিছু ধাওয়া। আরেকবার মাটির কথা ভাবুন, ভাবুন কুসীদ ব্যবসায়ীর একচক্ষু অমানুষতা। সাইক্লোপস-এর দ্বীপ থেকে সঙ্গী সাথীদের নিয়ে যখন পালালেন ওদেসিয়ুস তখনো ইথাকা পৌঁছাতে তাঁর ঢের দেরি…॥

ভ্রমণ

মানস রায়চৌধুরী

দীর্ঘ পর্যটনে যাবো এই ভেবে তোরঙ্গ সাজাই
পাঁচ পা এগোতে গিয়ে মনে হয় পিছনে সর্বস্ব পড়ে আছে
দুধের দোকানে কিছু ধার আছে
রুটি ও মাখনে কিছু চিনি দিতে হবে
ভাবনাগুলি ডালপালা শিকলের মতই মেলেছে।

এই তো ধরোনা ওরা বলেছিলো কতদূরে যাবে
কতদূরে সে কথা জানার চেয়ে
তোমাদের কথা ভাবি অত্যন্ত জটিল

তোরঙ্গে ঘুমোয় জামা কব্জিতে বোতাম
কমবেশি যানবাহনের দ্রুত পদ সঞ্চালনে
ভঙ্গুর শরীর পায় আলস্য সহজে
ইস্পাতে মরীচা ধরে, কি আশ্চর্য হাড়ে ঘুন ধরে
সংসার রোদ্দুরে পোড়ে, বুভূক্ষু সন্তান
তোরঙ্গের তালা খুলে
গৃহস্থকে লুট করে ভ্রমণবিলাস।

পাবন

শিবশম্ভু পাল

কার চোখে সর্বনাশ দেখেছি আমার চৈত্রে? তেমনি কোন
অবিকল্প চোখ
খুঁজে পাই নি, চৈত্রমাসে প্রহরশেষের আলো প্রাকৃতিক অভ্যাসের
অতিরিক্ত নয়।

নিশ্চরিত্র প্রবহমানতা
ঘাটে আর আঘাটায় আমার মতি ও গতি নির্ধারণ করে।
তার কোন উপকূলে নেই কোন চমৎকার কালাতিক্রমণ,
শব্দহীন প্রতিবাদ ব্রেবোর্ণ রোডের পাশে; নীলিমা সেনের
জ্যোৎস্নাজড়িত কণ্ঠ দুমড়ে মুচড়ে যাবতীয় ট্রানজিস্টার
তীব্রনাদে ছড়িয়ে দেয় জঙ্গলঘনানো যৌন প্লুতস্বর দিনদুপুরেই…

না, আমার সর্বনাশ মনোনীতা মহিলার চোখে নয়,
ছ'ফুট আয়নায়
গন্ধমাদনক্লান্ত রুগ্ন আত্মপ্রতিবিম্ব ফোটে
আমি তো স্বর্গের শাদা পোশাকের কুলি, রোজ সিঁড়ি ভাঙতে
হাঁফ ধরে, আমার উদ্দেশে
বিবাহের যৌতুকের মতো কোন সংগ্রামহীন
লিফটের আমন্ত্রণ নেই।

আয়না ভেঙে লাভ নেই, এমনিতর বিবেচনা যুদ্ধশাস্ত্রবিধিমত
গৌরবজনক
পিছুহাঁটা; শিরা আর রক্ত আর মীমাংসার চক্রবৎ ক্রমে
বাহিত আমার পাপ, আইনের ছিদ্র খোঁজা প্রচল চালাকি।

স্বীকারোক্তি শোনাব যে, কেউ নেই। যাজকেরও চোখে
আমারই আদল ফোটে, পাবনের খোঁজে ফিরছি, ওই—
ওই তো পুতুল খেলছে সিঁড়ির নিচেই দেখ আমার
ছোট্টমত মা,
ওরই কাছে মনে মনে ক্ষমাভিক্ষা করি।

বন্ধন

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

তোমার ভিতরে তুমি, আর বন্ধ পারিপার্শ্বিক—
মুক্ত বলো, অথচ সর্দির মতো ঘন
সে আছে, আঙুল জুড়ে আছে। সেই আঙুল কি এখনো
তোমাকে দৃশ্যত রাখে ঠিক।
কাঠের দরজার শক্ত লোহার শিকের
মধ্যে মূঢ়, অতিজীবিত সে—
আঁধারে জড়িত একা বসে
পরিপ্রেক্ষিতের।

পাঁচটি জানলার মুখে সমগ্র যে-লাল
আমাদের একান্ত, অস্ফুট;
জিভের ওপর থেকে গড়িয়ে সকাল
তোমার একক দৃশ্য ভেঙে করে দুটো।
আমরা শালিখ পাঁচজন
উড়তে শিখেছি বলে থেকে গেছে তোমার বন্ধন।

দিয়ে যায় ঋণ শুধু ঋণ

আবুলকাশেম রহিমউদ্দীন

মিলন মহেন্তা আর অঞ্জনা মহেন্তা দুটি বোন
রুগ্ন-ঈপ্সিতের বৃন্তে শুভ্রময়ী পাহাড়ের ফুল
বার বার ফোটে আর ভীরু রক্তে সলাস্য পরাগে
বুলিয়ে ঘ্রাণের উষ্ণ, নিত্য বলে নিষাদ শীতল

দেবনা দেবনা আসতে; শবাধার শয্যায় তখন
সুস্থ নিরাময় তোলে সংগ্রামের নিষ্কোষিত অসি—
ফলকে আসীন সূর্য জলে
দিগ্বিজয়ী দিবাভাগে; বিভালগ্নে স্বপ্নদাত্রী শশী ॥

মিলন মহেন্তা আর অঞ্জনা মহেন্তা দুটি ফুল
রুগ্নতার বর্ণভিক্ষু কর্কশ প্রাচীরে স্বপর্শের
নানাবর্ণ দীপ্ততায় কী নবীন অক্ষয়ের ছবি
সস্নেহে রচনা করে! তারপর ছবি সরে যেতে
চেয়ে থাকে দুটি ফুল কুয়াশার মুগ্ধ নেত্রপাতে!
স্রষ্টাও জানে না জানি এ-ফুলের কিবা সত্য নাম,
থাকে কোনো প্রিয় নাম যদি
জানে শুধু কার্শিয়াং, জানে শুধু স্যানাটোরিয়াম ॥

এ-ফুল বাসিও হয় না, ঝরে যায় না রৌদ্রে জলে ঝড়ে,
এ-ফুল হবে না কোনো অর্থদর্পী বিলাসের শোভা;
এ-ফুল বাসর শয্যা রচনা করে নি কারো ঘরে
এবং কেবল কোনো বিশেষের তরে মনলোভা
নয় তারা; সমাহৃত প্রতীতির শিখরে শিখরে
দূষিত সৎকার করে কৃতকীর্তি চায় না কোনো দিন;
সংক্রামক অরণ্য সমীপে
অমৃত অস্তিত্বে তারা দিয়ে যায় ঋণ শুধু ঋণ ॥

কুকুর

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

দিয়েছ সর্বস্ব তাকে যে তোমাকে ভুক্তাবশিষ্ট দেয় অকৃপণ হাতের অভ্যাসে;
আনাচে কানাচে ঘুরে মরে হাড্ডিসার হলে অন্দরের প্রবেশ দুয়ারে
লাল আলো জলে ওঠে; তোমার চীৎকার ক্ষুৎ পিপাসার—ভেঙে যায়
প্রভুর আরাম।
ঘৃণা ও বিদ্বেষ শ্লেষ্মা ভারি হয় বুকে তার, খোঁজেন লগুড়, হাতছড়ি;
হত্যা নয়—পথে পথে ঘাটে আঘাটায় নিত্য খাদ্যগন্ধ শুঁকে
ফেরার আসামী, চোরা গলি ঘুঁজি পার হয়ে সুখী গৃহস্থের আধখোলা
দরজা দিয়ে
যাতে ঢুকে পড়ে তুমি দেখতে পাও স্বচ্ছলবসন্ত ফেরে কোন পথে
কি রকম নির্ভার জীবন;
অবিমিশ্র অন্নকূট, দৈন্য নেই ; শীতরাতে তোষক, গরমলেপ, ঈষদুষ্ণ
ভাতের সুঘ্রাণ;

দিয়েছে সর্বস্ব তাকে যে তাহাকে ভুক্তাবশিষ্ট দেয়; কিংবা মানুষেরও
স্বপ্নেরও নাগালে নেই—এরকম ভোজ্য ও বিছানা, ঋতুকালীন পোষাক
দিতে পারে;
ঘুমোয় নিশ্চিন্তে তার পদপ্রান্তে, চেটে দেয় মসৃণ শরীর, ঘোরে ফেরে
চারপাশে; অথবা নিদ্রাও নেই ;
জেগে থেকে সারারাত প্রভুর সুনিদ্রাভঙ্গকারীদের খোঁজে;
গলার মসৃণ চেন মুঠোয়, হাঁটেন প্রভু—সান্ধ্যভ্রমণের সঙ্গী পিছু পিছু ফেরে
সুন্দরীর কোলে নাচে, আড়মোড়া ভাঙে, সুখ জানায় মধুর ডেকে
কোমলাঙ্গ চেটে

ইছামতী

গণেশ বসু

না, নেই এখানে ভালোবাসার গান।
কাঁটাঝোপে ঘাড় গুঁজেছে স্বপ্নভূমি
হ্যাঁ, তুমি বলো না, মরা পেঁচা, কাঠ পিঁপড়ের ঠ্যাং-এ তুমি
কি করে কোরাস জলতরঙ্গে শোনাবে অনির্বাণ
নিরুপায় বুকে চিৎকার-ই নির্মাণ
ভালোবাসা ভালোবাসা।

রাজপুত্রের পোশাক পরেছি কবে
রাজপুত্রের পোশাক ছেড়েছি কবে
অঙ্গে জ্বলেছে গাঢ় শ্যাম্পেন দুপুর বাঘের মতো
ছেঁড়া তালি জামা কর্ণতিমির বেকারের উৎসবে
প্রতিমা সেসব মনে নেই মনে নেই
অন্ধরাগেতে খোবলায় ক্ষোভ যতো।
ভালোবাসা ভালোবাসা।

শুয়োর-বাথানে জীবনের ক্যানভাস
পুড়ে যাক পুড়ে যাক
সংকটে ক্ষতবিক্ষত ক্যাকটাস
অসহ্য নির্বাক!

মরা বিকেলের ছায়া কেন বারবার,
বারবার কেন মরা বিকেলের ছায়ারা আমার ঘাড়ে
বারবার কেন লুথার কিংয়ের ছায়ারা আমার ঘাড়ে
বিশাল আকাশ হয়ে দোলে বারবার।

বাতাসের বুকে আরেক বাতাস মাইলের পর মাইল
ও কারা ঘুমায়, ঘুমায়;
মহাসাগরের ডানায় ঝুঁটিতে ও কারা স্ফুরিত হীরে
আলো ঠিকরায়, অবিরল ঠিকরায়
ভালোবাসা ভালোবাসা।

ক্যান্সারগ্রীবা সন্ধ্যার ভৌতিক
উগ্রমধুর বিচিত্র সংগ্রামে
চাঁদের কাঁচুলি ছিঁড়ে নিক ছিঁড়ে নিক।

লোকরঞ্জনে উমা
সাহসের পিঠে সে কোন্ সাহস
লুমুম্বা নক্রুমা ?
ভালোবাসা ভালোবাসা।

না নেই এখানে ভালোবাসবার গান
নিরপেক্ষর পোড়ো বাড়িটায় মধ্যযুগের রাতে
মেরুপ্রস্থান আক্রোশে পুরু পেশীকম্পাসে মাতে
নাড়ী ধরে দেয় টান
ভালোবাসা ভালোবাসা।

কন্যা আমার পুত্র আমার কি যে করেছিস ভুলে
বড়ো অসহায় অসহ্য অম্লান !
ইতিহাস ক্রূর নোন্‌তা ধূসর রূপনারাণের কূলে ?
মেঘমণ্ডলে জীবন কি নির্মাণ ?

শস্যের ইছামতী,
তোমাকে ঘিরেই নাড়ী ধরে দেয় টান
ভালোবাসা ভালোবাসা।

তুমি শুধু ঘৃণায়

(মুজিবর রহমানের হত্যাকাণ্ডকে মনে রেখে)

আশিস সান্যাল

ঘৃণায় তুমি ফিরিয়ে নিয়েছিলে মুখ।

চোখ মেলতেই
যখন তুমি দেখতে পেয়েছিলে সেই পরিচিত মুখগুলি,

যারা এতদিন বন্ধুর মতো তোমাকে ঘিরে
সহাস্য কলরব করছিল,
তাদের লুব্ধ চাহনি
কুটিল নেকড়ের মতো এগিয়ে আসছে তোমার দিকে,
তখন তুমি ঘৃণায়
ফিরিয়ে নিয়েছিলে তোমার করুণ মুখশ্রী।

রাতের গহন অন্ধকারের মধ্যেও
তুমি দেখতে পেয়েছিলে
কৃতঘ্নতার আগুনে দাউ দাউ
সেই চোখগুলি
অবিশ্বাস্য ক্রূরতায় যেন ঝলসে উঠেছিল।
সমস্ত জীবন ধরে
অপরিসীম ভালোবাসায়
যাদের তুমি
আঁকড়ে রেখেছিলে স্নেহপ্রধান বুকের মধ্যে,
তাদের বিশ্বাসঘাতকতায়
হয়তো ভিসুভিয়াসের মতো
একবার প্রচণ্ড নির্ঘোষে
কেঁপে উঠেছিল তোমার তেজোদীপ্ত সমস্ত শরীর।

তুমি কি একবারও বুঝতে পেরেছিলে,
রাতের অন্ধকারে
হিংস্র শাবকের মতো ওরা জেগে উঠবে—
তোমার দেহ ছিন্ন-ভিন্ন করে
পরম তৃপ্তির অট্টহাসিতে ভরিয়ে তুলবে চতুর্দিক ?
কৃতঘ্নতার আগুনে দাউ দাউ
তোমার পবিত্র রক্তে শরীর রঞ্জিত করে

ঘৃণ্য উৎসবের আনন্দে
সমস্ত চরাচর সৌখিনতায় ভাসিয়ে দেবে ?

তুমি শুধু ঘৃণায়
ফিরিয়ে নিয়েছিলে তোমার করুণ মুখশ্রী ॥

একটি কবিতা

বিনয় মজুমদার

এই পৃথিবীতে আজ এ অবধি আমার সকল
কীর্তি, কাজ ইত্যাদির বিষয় স্মরণে
এসেছে এখন এই শ্রাবণ মাসের
দ্বিপ্রহরে, গ্রামাঞ্চলে—শিমূলপুরের
উদ্যানকাটিতে, তবে জীবনের বাল্যকাল থেকে এ অবধি
যেমন নিচের থেকে খালবিলে মাছ ধরা থেকে
শুরু ক'রে শেষাবধি যে রকম উন্নতি করেছি
তার কথা মনে পড়ে, দুপুরের অলস বেলায়।
আমি এক কমিউনিস্ট—এই কথা উচ্চারিত হোক
দিকে দিকে পৃথিবীতে—এ আমার সঙ্গত কামনা।

নিষিদ্ধ ছিদ্র

সমরেশ বসু

'শুয়োরের বাচ্ছা!' কান্ত কুণ্ডুর হুংকার।

'আজ্ঞে।' বৃন্দাবন—বৃন্দা—বেন্দার জবাবের স্বরে অন্যমনস্কতা।

'বান্‌চোত!' কান্ত কুণ্ডুর হুংকারে পূর্ব সম্বোধনের তুলনায় ঝাঁজের মাত্রা তীব্রতর।

'বলেন কত্তা।' বেন্দা ছুটে কাছে এল, পূর্ণ সচেতন স্বর, মুখে কাচুমাচু ভাব, কপট ভয়। আসবার আগে, স্টেশনারি কাউণ্টারে দাঁড়ানো দশ-এগারো বছরের ছেলেটাকে চোখের ইশারা করল।

কান্ত কুণ্ডু বলল, 'ভেড়ার বাচ্ছা, কানে শুনতে পাস না, না? তিন নম্বরের তাক থেকে মিছরির টিনটা ঈশেনকে দে।' কান্ত কুণ্ডু হুস হুস করে ভাজা তামাকের সিগারেটে টান দিল, মুদিখানার কাউণ্টারের সামনে ধুতি পাঞ্জাবী পরা প্রৌঢ় লোকটির দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'লোকে এসব জানে না। চিনি দিয়ে পায়েস খায়। আরে শীতের সময় পায়েস খেতে হলে নলেন গুড়ের পায়েস খাবে, নয় তো অন্য সময় মিছরি দিয়ে। মিছরি হল ঠাণ্ডা জিনিস। মিছরির পায়েসে পেট ঠাণ্ডা থাকে। আমি রোজ পায়েস খাই, মিছরির পায়েস। হ্যাঁ, আপনার কী চাই? দালদা? নেই।...তুমি কি চাইলে? ভেলি গুড়?'

কান্ত কুণ্ডু ক্যাশ বাকসের সামনে, শীতল পাটি পাতা গদীতে বসে এক-একজন খরিদ্দারকে জিজ্ঞেস করছে, কর্মচারীদের সওদা মেপে দিতে বলছে। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কী হল ঈশেন? দেড় কে. জি. মিছরি ওজন করতে কতোক্ষন লাগে? ...ভেলি গুড় কতোটা? পাঁচ কে. জি.? আচ্ছা। এই—এই ভোঁদড়ের বাচ্ছা!'

বেন্দা স্টেশনারি কাউণ্টারে দাঁড়ানো সেই ছেলেটার সঙ্গে তখন কথা বলছিল, 'পটলা? যে পটলা রোজ এখান থেকে চারটে লজেন্স কেনে? ও গোল দিল? ওর পায়ের ডিম খুব শক্ত, না?

ছেলেটি বলছিল, 'হ্যাঁ, ও রোজ নাকি কচ্ছপের মাংস খায়। আমাকে একটা ছ-পয়সার টফি দে।'

বেন্দা বলছিল, 'দিচ্ছি। আচ্ছা, ইস্কুলের মাঠে বিকালে রোজ খেলা হয়?' এই জিজ্ঞাসার সময়েই, 'ভোঁদড়ের 'বাচ্ছা' ডাক শুনে ও জবাব দিল, 'বাবু।'

'গুখেগোর ব্যাটা, এদিকে আয়, ভেলি গুড়ের টিনটা এক নম্বরের তাক থেকে ঈশেনকে দে।' কান্ত কুণ্ডু হুকুম করল।

বেন্দা কাউন্টারের সামনে ছেলেটাকে আবার চোখের ইশারায় দাঁড়াতে বলে মাল ঠাসা তাকের দিকে ছুটে গেল। ওর বয়স বারো। খালি গা, হাফ প্যান্ট পরা। গায়ে ময়লা থাকলেও, আশ্চর্য রকমের ফরসা, গোরাচাঁদ বললেই হয়। আরো আশ্চর্য, ও মোটেই হাড় জিরজিরে রোগা না। একটু যেন থলথলে নরম শরীর। খোঁচা খোঁচা পাঁশুটে চুল, চোখ দুটো প্রায় গোল। নাকটা বড়ির মতো। ময়লা দাঁত বের করে হাসলে, চোখ দুটো বুজে যায়। অথচ দাঁতগুলো সবই নতুন। এক নম্বর তাক থেকে প্রায় কুড়ি কে. জি. ওজনের ভেলি গুড়ের টিনটা দাঁতে দাঁত চেপে তুলল। তুলে ধরতে পারল না, মেঝের ওপর দিয়ে ঠেলে ঠেলে ঈশেনের কাছে, পান্নার সামনে রাখল। ঈশেন বেন্দার পশ্চাদ্দেশে একটি চিমটি কাটল। বেন্দা পাছায় হাত ঘসে, স্টেশনারি কাউন্টারে গিয়ে, টফির বোয়েম থেকে রঙিন কাগজে মোড়া একটা টফি বের করে ছেলেটার দিকে এগিয়ে দিল। ছেলেটি একটি পাঁচ, আর একটি এক পয়সা বেন্দার হাতে দিল। বলল, 'তুই কলেজের মাঠে খেলা দেখতে আসতে পারিস না?'

বেন্দা বলল, 'ছুটি পাই না।'

ছেলেটা বলল, 'কেন, বেম্পতিবার তো দোকান বন্ধ থাকে।'

বেন্দা বলল, 'বেম্পতিবার কাঁচরাপাড়া কলোনিতে মার কাছে যাই। যেতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু না গেলে মা রাগ করে, আর বাবুও প্যাঁদায়।' বলে কান্ত কুণ্ডুকে চোখের ইশারায় দেখাল।

ছেলেটা মোড়ক ছাড়িয়ে টফি মুখে দিয়ে বলল, 'মার কাছে তোর যেতে ইচ্ছে করে না কেন?'

বেন্দা মুখ বিকৃত করে বলল, 'মায়ের লোকটাকে আমার ভাল্ লাগে না। আমাকে খুব খাটায়, আর খিস্তি দেয়।'

ছেলেটা অবাক চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোর মায়ের লোকটা কে? তোর বাবা না?'

বেন্দা বলল, 'আমার বাপ তো কবেই পটল তুলেছে। এখন মায়ের একটা লোক আছে। আর মায়ের অনেক ছেলে মেয়ে। আমার ভাল্ লাগে না। একটা বেস্পতিবার আমি কাট মারব, মেরে খেলা দেখতে যাব।

ছেলেটা নির্ভেজাল অবুঝ বিস্ময়ে বেন্দার দিকে তাকিয়ে রইল। বেন্দা আবার বলল, 'আমার খুব খেলতে ইচ্ছা করে। ফুটবল। এয়সা গেদে শট মারতে ইচ্ছা করে যে বল ফাটিয়ে দিই।'

ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, 'তুই কোনো খেলা করিস না?'

বেন্দা ঘাড় কাত করে, চোখ ঝলকিয়ে বলল, 'খেলি, রোজ রাত্রে ইঁদুর মারা খেলি।' বলতে বলতে ওর মুখে কঠিন খুশি ঝলক দিল, 'আমি তো রাত্তিরে দোকানের পেছনকার ঘরে থাকি। ঘর অন্ধকার করে ইঁদুর মারা খেলি। আমি অন্ধকারে দেখতে পাই—।'

'এই কুত্তারবাচ্ছা!' কান্ত কুণ্ডুর হুঙ্কার শোনা গেল, 'খইলের বস্তা থেকে ঠোঙায় করে পাঁচ কে. জি. খইল ভরে দে।'

বেন্দা বলল, 'যাই বাবু।' যাবার আগে ছেলেটাকে আবার চোখের ইশারা করে গেল।

কান্ত কুণ্ডু নরম স্বর চড়িয়ে বলল, 'গোপাল তুমি কী কর, বান্‌চোতটা খালি গল্প করে।

স্টেশনারি কাউন্টারের এক পাশে, প্রৌঢ় স্বাস্থ্যহীন গোপাল একটি টুলে বসে ঝিমুচ্ছিল। সে কান্তর আগের পক্ষের শালা। স্টেশনারি বিভাগ সে দেখাশোনা করে। সে কান্তর কথার কোনো জবাব না দিয়ে ছেলেটিকে বলল, 'তোমার কী চাই খোকা?'

ছেলেটা মাথা নাড়ল। গোপাল বলল, 'তা হলে এখন চলে যাও, ও কাকের বাচ্ছাটা খালি গল্প মারে।'

এই সময়ে একজন খরিদ্দার এসে টুথপেস্ট চাইল। ছেলেটা দাঁড়িয়েই থাকল। বেন্দা ঠোঙায় খইল ভরে, ঈশেনের কাছে এগিয়ে দিলো। দিয়ে আবার স্টেশনারি কাউন্টারে এল। গোপাল তখন আলমারি খুলে খরিদ্দারকে টুথপেস্ট দিচ্ছে। ও সব কাজ বেন্দার না। তেল সাবান টুথপেস্ট স্নো পাউডার হিমানী খাতা কাগজ কলম পেনসিল, এ সবে ওর হাত দেবার হুকুম নেই। ও কেবল লজেন্স আর চানাচুর দিতে পারে। আর গোটা দোকানের ফাইফরমাস খাটে। ও সামনে আসতে ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে তোকে কেউ নাম ধরে ডাকে না কেন?'

বেন্দা কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ছেলেটা বলল, তোকে সবাই শুয়োরের বাচ্ছা নয়তো কাকের বাচ্ছা, এসব বলে কেন ?'

বেন্দা হেসে নিচু স্বরে বলল, 'ওহ্! ওরা তো সব ইঁদুরের বাচ্ছা।'

'বাঁদরের বাচ্ছা।' হঠাৎ আবার কান্ত কুণ্ডুর হুংকার, 'ঠোঙায় আড়াইশোর সরষে দে।'

'এই যে বাবু।' বেন্দা ছুটে চলে গেল।

কান্ত কুণ্ডুর জমজমাট দোকান। স্টেশনারি, মুদীখানা। পাশেই র‍্যাশনশপ। র‍্যাশনশপের দায়িত্বভার এ পক্ষের শালার ওপর। হিসাবনিকাশ সলাশরামর্শ সব কান্তর সঙ্গেই। কান্ত সব কিছুর মালিক। বেন্দা তার সব থেকে অল্প বয়সের কর্মচারী। খাওয়া পরা পায়, মাইনে কুড়ি টাকা ওর মা এসে মাসে মাসে নিয়ে যায়। খেতে যায় কান্ত কুণ্ডুর বাড়িতে। তার আগে রাস্তার কলে চান করে যায়। কান্তর প্রথম বউ মরেছে। ছেলেপিলে ছিল না। এ পক্ষে বিয়ে করেছে চার বছর। ছেলেপিলে হয় নি। এ বউটার বয়স কম, দেখতে সুন্দরী। নিজের বিধবা মাসীকে হেঁসেলে রেখেছে। সে বেন্দাকে বলে বোঁটকা পাঁটা। ওর গায়ে নাকি বোঁটকা গন্ধ। কান্তর বউ বলে ওল কচু। ওর মুখটা নাকি ওল কচুর মতো দেখতে। ওর নিজের মা বলে, 'খ্যাংরামুখো, ষেঁড়ো, ড্যাকরা, মড়া ভাতারের ছাঁ...।' বাদ বাকি উচ্চারণের যোগ্য না। উচ্চারণের যোগ্য না, এমন অনেক বিশেষণ কান্তর আছে।

বেন্দার তাতে কিছুই যায় আসে না। ও সবাইকে মনে মনে ইঁদুর বলে, বা ইঁদুরের বাচ্ছা। কান্তর মাসী-শাশুড়িটা খেতে কম দেয়। তবু ওর কিছু যায় আসে না। জীবনে একটি মাত্র উত্তেজনা নিয়ে ও বেঁচে আছে। একটি মাত্র কারণে। ইঁদুর মারা খেলা। এই খেলার সঙ্গে আছে উত্তেজনাময় বাজী। জুয়ার মতো। এক নেংটি ইঁদুরে পাঁচ পয়সা। একটা ধাড়ি ইঁদুরের জন্য দশ পয়সা। কান্ত কুণ্ডু দেয়।...

রাত্রি সাড়ে ন-টা। বেন্দা খেয়ে এল। কান্ত কুণ্ডু এ পক্ষের শালার সঙ্গে বসে, হিসাবপত্র শেষ করে, চাবির গোছা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। দোকানের সামনের দরজা আগেই বন্ধ হয়েছে। দোকানের পিছনে একটি খালি গুদামঘর

আছে। বেন্দা রাত্রে সেই ঘরে থাকে। সেই ঘরের পিছনে যাবার একটি দরজা আছে। দরজার বাইরে তিন-ফুট চওড়া লম্বা ফালি, তার পশ্চিম সীমান্তে খাটা পায়খানা। ফালি জমিটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের মাথায় কাঁচের টুকরো গাঁথা, তার ওপরে তিন প্রস্থ কাঁটাতারের বেড়া। দোকানঘর থেকে গুদামঘরে ঢোকার একটিমাত্র দরজা। বেন্দাকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে কান্ত কুণ্ডু চারটে তালায় চাবি দিল। তারপরে বাইরের দরজা, তার ওপরে কোলাপসিবল গেট টেনে, এক ডজন তালা মেরে চলে গেল। ব্যবস্থা সব পাকা।

বেন্দা এখন গুদাম ঘরে একলা। মোমবাতি আর দেশলাই এক জায়গায় রাখা থাকে। এ ঘরে বিজলিবাতি আছে, তার সুইচ দোকান ঘরে। রাত্রে নিভিয়ে দেওয়া হয়। বেন্দাকে আলোর প্রয়োজনে মোমবাতি জ্বালাতে হয়। ও অন্ধকারে এগিয়ে গেল একটা পিপের কাছে। হাত বাড়াল পিপের ওপরে অব্যর্থ জায়গায়। দেশলাই হাতে নিয়ে, কাঠি জ্বালিয়ে, পিপের ওপরে দাঁড় করানো সরু মোমবাতি জ্বালল। দুই বস্তা ভুঁষির ফাঁক থেকে টেনে বের করল কাঁথা আর তেলচিটে বালিশ। ভুঁষির বস্তার ওপরে তা পাতল। একটা বার্লির ছোট কৌটো বের করল ছোলার বস্তার আড়াল থেকে। খুলে দেখল তিনটি বিড়ি আছে। একটি বিড়ি নিয়ে, কৌটো যথাস্থানে রেখে, মোমবাতির শিসে বিড়ি ধরাল। তারপর গুদাম ঘরটার চারিদিকে দেখল।

সরু মোমবাতির আলোয় লম্বা ফালি গুদামঘরের সবটা দেখা যায় না। রক্তিম আলোর গায়ে বস্তা টিন পিপে, নানা কিছুর ফাঁকে ফাঁকে খামচা খামচা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে আর লাল আলোয় ওর ছায়াটা বিরাট, যার অবয়বটা অমানুষিক। বেন্দা বিড়ি টানতে টানতে, পাঁচিলের দিকের দরজাটা খুলল। প্যান্ট তুলে প্রস্রাব করল। পাঁচিলের ওপাশে বাজার। ও প্রস্রাব করে দরজা বন্ধ করে আবার পিপের কাছে ফিরে এল। স্থির অপলক চোখে চারিদিকে দেখতে লাগল। বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তে লাগল নাক মুখ দিয়ে। ওর মুখের চামড়া টান টান হয়ে উঠছে, চোখ জ্বলতে আরম্ভ করেছে। ভিতরে বাইরে, যে-কোন শব্দ ও উৎকর্ণ হয়ে শুনছে। সারাদিনের কাজের মধ্যে ওর এই চেহারা দেখা যায় না। ও যেন কোন মন্ত্রের সাধনে শরীরে শক্তি সঞ্চার করছে, উত্তেজনা ছড়াচ্ছে চোখে মুখে। বিড়ি টানতে লাগল, ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। চোখ দপ দপ্ করতে লাগল, ওর নরম থলথলে শরীরের পেশিগুলো

শক্ত হয়ে উঠতে লাগল। মুখে ফুটে উঠতে লাগল একটা কঠিন হিংস্রতা। গুদামের কোথায় খুট করে একটা শব্দ হল। ও মুখ ফেরাল না, চোখের পাতা নামিয়ে ঘাড় কাত করে উৎকর্ণ হয়ে শুনল।

বিড়ি টানা শেষ হল। বিড়ির অঙ্গারটা একবার চোখের সামনে তুলে দেখল, তারপর অনায়াসেই অঙ্গার দুই আঙুলে টিপে নিভিয়ে বিড়িটা ফেলে দিল। পিপের পিছনে হাত বাড়িয়ে বের করে নিয়ে এল একটা বাঁশের লাঠি। তেল চকচকে, এক দিক মুগুর মতো মোটা। লাঠিটা তুলে একবার চোখের সামনে দেখল। তারপর সরু দিকটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরল। মুখ ফিরিয়ে মোমবাতির শিসটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল। অন্ধকার ঝুপ করে নামল একটা ভারি পর্দার মতো। বেন্দা পিপের কাছ থেকে আস্তে আস্তে নিঃশব্দে হেঁটে কয়েক পা গিয়ে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো এসে দাঁড়াল।

বেন্দার পৃথিবীও এখন নিশ্চল। জগত সংসার অন্ধকার, মানুষ নামক জীবদের অস্তিত্বহীন। সময় থমকিয়ে আছে।

বেন্দা দেখতে পেল, দুটি ছোট লাল অঙ্গারের বিন্দু। দেখা দিয়েই তা এক দিকে ছুটে চলে গেল। বেন্দা স্থির। আবার দুটি অঙ্গারবিন্দু ওপরের চালের কাছে ফুটে উঠেই, দ্রুত নিচের দিকে অন্ধকারে মিশে গেল। বেন্দা নিশ্চল। চারটি অঙ্গারবিন্দু ওর কয়েক হাত দূর দিয়ে এপার ওপার চলে গেল। বেন্দা পাথরের মূর্তি। দুটি অঙ্গারবিন্দু ঝটিতি এগিয়ে এল, মুহূর্তেই থমকিয়ে পিছনে হারিয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ আবার দুটি অঙ্গারবিন্দু ওর বাঁ পাশ থেকে, পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল, চকিতেই পায়ের পাশ দিয়ে ডান দিকে চলে গেল।

এইরকম জোড়া জোড়া অঙ্গারবিন্দুরা, ওপরে নিচে, দূরে সামনে, ছুটে ছিটকে বেড়াতে লাগল। তারপরে যেন মন্ত্রমুগ্ধ সম্মোহিতের মতো, কতগুলো অঙ্গারবিন্দু ওর সামনে এসে লাফালাফি করতে লাগল। বেন্দার হাতের মুঠি শক্ত হল, লাঠি উঠল এবং অবিশ্বাস্য দ্রুত লাঠি প্রচণ্ড আঘাতে উঠল, থামল। ও লাফিয়ে দাপিয়ে লাঠির মোটা মুণ্ড দিয়ে পেটাতে লাগল। তারপরেই আর এক পাশে সরে গিয়ে আবার পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়াল। পৃথিবীও আবার থমকিয়ে নিশ্চল হয়ে গেল।

সময়ের কোনো হিসাব নেই, অন্ধকারের গাঢ়তার কোনো মাপজোক নেই। আবার জোড়া জোড়া অঙ্গারবিন্দু ওপরে নিচে মেঝেয় বস্তায় পিপেয় জেগে উঠতে লাগল। ছুটে ছিটকে ঘুরে ফিরে আবার সম্মোহিতের মতো বেন্দার

কাছাকাছি কতগুলো অঙ্গারবিন্দু লাফালাফি করতে লাগল। বেন্দার হাত আবার উঠল, আর প্রতিটি আঘাত যেন বিদ্যুচ্চকিতের মতো পড়তে লাগল। তারপরে পিপের কাছে সরে এসে, দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে মোমবাতি ধরালো। মোমবাতির আলো আস্তে আস্তে অন্ধকারে ঠেলে ঠেলে সরালো। বেন্দা এদিকে ওদিকে চোখ বুলিয়ে, মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিল তিনটে নেংটি একটা ধাড়ি ইঁদুরের মৃতদেহ। তুলে রাখল পিপের ওপরে মোমবাতির কাছে। চকচকে চোখে তাকিয়ে দেখল। ওর উত্তেজিত মুখে হিংস্র হাসি। গায়ে মুখে ঘাম চিকচিক করছে। মাথার চুলগুলো কপালে গালে ছড়িয়ে পড়েছে। বলল, 'শালা, ইঁদুরের বাচ্ছা ইঁদুর।'···লাঠিটা পিপের পিছনে রাখল। ফুঁ দিয়ে নেভাল মোমবাতি। অন্ধকারে অব্যর্থ ভুষির বস্তার ওপরে পাতা কাঁথার ওপরে গিয়ে, চিটে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল।

সারাদিন নামহীন জীবনের দুর্জয় পরিশ্রমের পরে, অনেক অপমান আর অপূর্ণ খাওয়ার পরে, এই এক সুখের খেলা। এতো সুখ, গভীর ঘুম আসতে দেরি হয় না। এই সুখ আর আরাম ভোর পর্যন্ত। তারপরে আবার শুরু, আর একটা অভিশপ্ত দিনের। রাত্রি ন-টার পরে আবার সেই খেলা, খেলার উত্তেজনা আর সুখ, তারপরে গভীর নিদ্রার আরাম।

বৃন্দার ভাববার অবকাশ নেই, কোন্ অজ্ঞাত শক্তির হাতে, ওর এই দিন ও রাত্রের জীবন নির্ধারিত আর পরিচালিত হয়। এই জীবনের শেষ কোথায়, ওর জানা নেই। এই জীবনযাপনের শরীরে কতগুলো ছিদ্র ক্ষণেকের জন্য ফেটে বেরোয়। সেই সব ছিদ্রে ভেসে ওঠে খেলার মাঠে খেলার ছবি। অনেক কিশোরের উল্লাসের ধ্বনি। সেই সব ছবি আর শব্দ থাকে নিষেধের গণ্ডীতে। ছিদ্রগুলো নিষিদ্ধ।

মাওবাদ বনাম মার্কসবাদ

প্রদ্যোৎ গুহ

বলা হয়ে থাকে, মার্কস হেগেলকে পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। এই কথার তাৎপর্য যদি হয় হেগেলের ডায়ালেকটিকসকে ভাববাদ থেকে বিযুক্ত করে মার্কস তাঁর বস্তুবাদী দর্শন প্রতিপাদনে কাজে লাগিয়েছেন তাহলে বলতে হয় মাও মার্কসকে মাথায় উপর দাঁড় করিয়েছেন; অর্থাৎ মার্কসীয় ডায়ালেকটিকসকে মাও নিয়োগ করেছেন মূলত এক ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিপাদনে। মার্কসবাদের সঙ্গে মাওবাদর মৌলিক পার্থক্য এইখানেই।

মার্কসবাদ একটা বস্তুবাদী দর্শন। মার্কসের মতে সত্তা মুখ্য, চৈতন্য গৌণ। চৈতন্য বস্তুতপক্ষে কোন-না-কোনভাবে জড়জগতেরই প্রতিফলন। চৈতন্যের অবশ্য একটা নিজস্ব ভূমিকা আছে, কিন্তু শেষ বিচারে প্রত্যক্ষভাবেই হোক আর পরোক্ষভাবেই হোক, তা জড়জগতের অধীন। চৈতন্য জড়জগতকে প্রভাবিত করে, পরিবর্তিত করে এবং তার ফল পরিণামে নিজেও প্রভাবিত, পরিবর্তিত হয়। চৈতন্যের এই সক্রিয় ভূমিকার স্বীকৃতিতেই নিহিত যান্ত্রিক বস্তুবাদের সঙ্গে মার্কসীয় বস্তুবাদের পার্থক্য।

মাওবাদের ভিত্তি মূলত ভাববাদ। "সত্তা মুখ্য চৈতন্য গৌণ," "জড়জগতই সমস্ত সংবেদনার উৎস" এই ধরনের উক্তি যদিও তাঁর রচনায় নেই তা নয়, কিন্তু জড়জগত এবং চৈতন্যের জটিল পারস্পরিক সম্পর্ক বিচারে বা মানব-চৈতন্যে জড়জগতের প্রতিফলনের আপাত-বিপরীত প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণে তিনি মূলত ভাববাদী মেটাফিজিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন।

তাঁর 'দার্শনিক চিন্তার' ফসল বিশ্লেষণ করতে গেলে এইটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে "সত্তা মুখ্য, চৈতন্য গৌণ" এই সব কথা তিনি আপ্তবাক্যের মতো উচ্চারণ করেন নিজেকে সুসংগত বস্তুবাদী বলে জাহির করার তাগিদে। এটা তাঁর পক্ষে প্রয়োজন, নইলে তিনি মার্কসবাদের সৃষ্টিশীল বিকাশ ঘটিয়েছেন, এই দাবি যে প্রথমেই নাকচ হয়ে যায়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, দর্শনের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে

তিনি যে সব "মৌলিক" ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং যার মধ্যে দিয়ে তার বুনিয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে মার্কসীয় তত্ত্বের সঙ্গে তাকে মেলানো অসম্ভব।

দুই

দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে মার্কস এবং এঙ্গেলস বলেছেন, "সমগ্র দর্শনশাস্ত্রের, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক দর্শনশাস্ত্রের, আলোচ্য মূল প্রশ্ন হল চিন্তা এবং সত্তা সংক্রান্ত প্রশ্নটি।" এই প্রশ্নের জবাব কোন্ দর্শন কীভাবে দিয়েছে তার দ্বারাই নির্ধারিত হয় কোন্ দর্শন বস্তুবাদী আর কোন্ দর্শন ভাববাদী। এই ধারণাটিকে এঙ্গেলস যেভাবে আরও বিকশিত করেছেন তার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লেনিন বলেছেন, "তাঁর 'লুডভিগ ফয়ারবাখ'-এ এঙ্গেলস ঘোষণা করেন দর্শনের দুটি মৌল ধারা হল বস্তুবাদ এবং ভাববাদ। বস্তুবাদ মনে করে প্রকৃতি মুখ্য এবং ভাব গৌণ, বস্তুবাদ সত্তাকে দেয় প্রথম স্থান এবং চিন্তাকে দেয় দ্বিতীয় স্থান। ভাববাদ সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করে।[১]

এই বক্তব্যের সঙ্গে মাওয়ের প্রাসঙ্গিক উক্তিসমূহের তুলনা করলে আপাত-দৃষ্টিতে মনে হতে পারে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বকে মাও তাঁর নিজের ভাষায় প্রতিপাদন করেছেন, তফাৎ যা কিছু তা ভাবের নয় ভঙ্গির। যেমন ধরা যাক মাওয়ের এই উক্তিটি: "মানুষ তার চারপাশের বিষয়মুখ জগতকে তার শারীরিক ইন্দ্রিয়স্থান দিয়ে যেভাবে প্রত্যক্ষ করে, সমস্ত জ্ঞানের উৎস তার মধ্যে নিহিত।" কিংবা, "মানুষের সামাজিক সত্তা তার ভাবাদর্শ নির্ধারণ করে।"

মাও তাঁর 'ডায়ালেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজম'[২] গ্রন্থেও বলেন, "দর্শনের সমগ্র ইতিহাস হল দুটি পরস্পরবিরোধী দার্শনিক ধারার, ভাববাদ ও বস্তুবাদের সংগ্রাম ও বিকাশের ইতিহাস।" যদিও মাও ভাববাদী দর্শনের বিকাশের কারণের অপব্যাখ্যা করেন, তাহলেও অন্তত পক্ষে দর্শনের দুই পরস্পরবিরোধী ধারার অস্তিত্ব তিনি এখানে স্বীকার করেছেন। শুধু তাই নয়, ডায়ালেকটিক্যাল বস্তুবাদের প্রতি তিনি তাঁর প্রকাশ্য সমর্থনও ঘোষণা করেন। "ভাববাদ এবং

---

১. লেনিন: সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ১৪, পৃ ৯৯

২. এক সোভিয়েত পণ্ডিত দেখিয়েছেন, ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত মিতিন-এর 'ডায়ালেকটিক্যাল অ্যাণ্ড হিস্টরিক্যাল মেটিরিয়ালিজম' গ্রন্থ থেকে মাও বিনা স্বীকৃতিতে লাইনের পর লাইন তুলে দিয়েছিলেন। মিতিনের বইটি চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

বস্তুবাদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য কি ?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে মাও তার জবাবে বলেন, "দর্শনের মৌল প্রশ্ন, ভাব (spirit) এবং বস্তুর (চৈতন্য এবং সত্তা) পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত প্রশ্নের বিপরীত জবাবের মধ্যেই নিহিত" এই পার্থক্য।

"ভাববাদ মনে করে ভাবই (চেতনা, ধারণা, বিষয়), পৃথিবীতে যা কিছু বিদ্যমান তার সকলের উৎস এবং বস্তুর (প্রকৃতি ও সমাজ) স্থান গৌণ এবং পরোক্ষ। বস্তুবাদ ভাব থেকে বিযুক্ত বস্তুর অন্য-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং মনে করে ভাব গৌণ এবং পরোক্ষ। এই প্রশ্নের বিপরীত জবাবই অন্য সব প্রশ্নে মতপার্থক্যের প্রস্থানবিন্দু।"

এই বক্তব্যের মধ্যে হয়তো কিছু অতিসরলীকৃত এবং অতিতরলীকৃত ধারণা আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও একে ঘোষিতমূল্যে গ্রহণ করলে মানতেই হয়, মাও একজন ডায়ালেকটিক্যাল বস্তুবাদের একনিষ্ঠ সমর্থক। তাঁর বক্তব্যে কিছু হয়তো অসঙ্গতি আছে, কিছু ভুল-ভ্রান্তি আছে; একটি কঠিন ও জটিল বিষয়কে সহজ, সরল, সকলের বোধগম্য ভাষায় বলতে গেলে একটু অতি-সরলতা দোষও হয়তো অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে।

বস্তুতপক্ষে, ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। মাওবাদী দর্শন ডায়ালেকটিক্যাল বস্তুবাদের ভান করে বটে, কিন্তু তার অঙ্গের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পরিভাষাগুলি কাকের ময়ূরপুচ্ছ ধারণের মতো ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়। এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর শিষ্যদের রচনা পাঠ করলে।

যেমন ধরা যাক ১৯৬১ সালে পিপল্‌স ইউনিভার্সিটি প্রকাশিত 'ডায়ালেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজম' শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটির কথা। এই বইটিতে দর্শনের মৌল প্রশ্ন সম্পর্কে এঙ্গেলসের জবাবটি উদ্ধৃতি সত্ত্বেও, মন এবং বস্তু সম্পর্কে মূল প্রশ্নটিকে এই গ্রন্থে বিষয়-বিষয়ীর পারস্পরিক সম্পর্ক, বিষয়মুখিতা-আত্মমুখিতার পারস্পরিক সম্পর্কতে পর্যবসিত করা হয়। "দর্শনের মৌল প্রশ্নটি কোনোক্রমেই বিশুদ্ধ তত্ত্বের প্রশ্ন নয়, এটা হল পারিপার্শ্বিক জগতকে অনুধাবন ও রূপান্তরিত করার মৌল প্রশ্ন। মূলত এটা হল আত্মমুখিতা ও বিষয়মুখিতার সম্পর্কের প্রশ্ন। বিশ্বকে অনুধাবনের (cognisance) প্রক্রিয়াটির মধ্যে নিহিত আছে চিন্তায় সত্তার প্রতিফলন, আত্মমুখিতায় বিষয়মুখিতার প্রতিফলন; বিশ্বকে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়ার অন্তর্গত হল সত্তার ক্ষেত্রে চিন্তার প্রয়োগ, বিষয় সম্পর্কে বিষয়ীর দৃষ্টি।[১]

১. Altaisky & Georgiyev: *The Philosophical Views of Mao Tse-tung.*

একটু পরে গ্রন্থকারেরা আরও লেখেন, "কোন্‌টা মুখ্য—আত্মমুখিতা না বিষয়মুখিতা —বস্তুবাদ এবং ভাববাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের এইটাই হল একমাত্র নিরিখ, অন্য কোনো নিরিখ থাকতে পারে না।[২]

এখানে দেখা যাচ্ছে লেখকেরা বস্তুর বদলে বিষয় ব্যবহার করেছেন, মন ও বস্তুর সম্পর্কের বদলে বিষয়-বিষয়ীর সম্পর্ক নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। আপাত-দৃষ্টিতে এটাকে একটা টেকনিক্যাল ত্রুটি বলে মনে হতে পারে কিন্তু ব্যাপারটা তা মোটেই নয়। শব্দ-ব্যবহারের এই হাত সাফাইয়ের মধ্য দিয়ে লেখকরা মাওয়ের আত্মমুখীন ভাববাদ এবং পল্লবগ্রাহিতাকে চাপা দেবার চেষ্টা করেছেন। এই হাত সাফাইয়ের মধ্যে দিয়ে তাঁরা ভাববাদ ও বস্তুবাদের মৌলিক পার্থক্যকেই লোপ করে দিয়েছেন, কেননা হেগেলও মানেন মানবমনের বাইরে এবং তা থেকে স্বতন্ত্রভাবে বিষয়গত সত্যের অস্তিত্ব আছে। তা ছাড়া 'বিষয়' বলতে যা বোঝায় তা শুধু বস্তুর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। বিষয়ের প্রকৃতি বস্তুগতও হতে পারে, ভাবগতও হতে পারে।

প্রশ্নটির এই ব্যাখ্যা, তা যতভাবে আট-ঘাট বেধেই করা হোক না কেন, বিষয়কে বিষয়ীর উপর নির্ভরশীল এবং তার দ্বারা সীমাবদ্ধ করে। দর্শনের মৌলিক প্রশ্নের মার্কসীয় ব্যাখ্যাকে মাওবাদীরা এইভাবে সংশোধন করে আর এটাই তাদের আত্মমুখীন ভাববাদের, দর্শনের ক্ষেত্রে গোঁড়ামি এবং রাজনীতিক্ষেত্রে পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লববাদের উৎস।

এইসব তত্ত্ব থেকে মাওবাদীরা সিদ্ধান্ত করে, 'বস্তুজগতে'র রূপান্তর নির্ভর করে মনোজগতের রূপান্তরের উপর। আর এর অর্থ প্রাক-মার্কসীয় ঐতিহাসিক ভাববাদে প্রত্যাবর্তন ছাড়া আর কি!

তত্ত্ব যখন জনসাধারণকে তার প্রভাবাধীন করতে পারে তখন তা হয়ে ওঠে একটা বস্তুগত শক্তি, মার্কসের এই সিদ্ধান্তকে তার মূল অনুষঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মাও তার 'চিন্তাধারা'র সঙ্গে মিশিয়ে একটা জগাখিচুড়ি তত্ত্ব প্রতিপাদন করেন। এই তত্ত্বের আলোকে চীনের জনসাধারণকে তাঁর মনে হয় "এক টুকরো সাদা কাগজ" যাতে "নতুনতম এবং সুন্দরতম বাক্য রচনা করা যায়", যাতে "নতুনতম এবং সুন্দরতম চিত্র অঙ্কন করা যায়।"

এই তত্ত্বের সঙ্গে মার্কসবাদের সঙ্গতি কোথায়? এমন মানুষ, তা সে যত অজ্ঞ

২. *Dialectical Materialism*, People's University, Peking.

এবং নিরক্ষরই হোক, কি কল্পনা করা যায় সমাজের প্রচলিত মুখ্য ভাবধারার দ্বারা যে প্রভাবিত নয় ?

'অন কনট্রাডিকশন' শীর্ষক রচনায় মাও বস্তুজগতের উপর অধ্যাত্ম জগতের প্রতিক্রিয়ার কথা তোলেন। "…আমরা স্বীকার করি যে ইতিহাসের বিকাশ ধারার সামগ্রিকতায় বস্তুজগতই অধ্যাত্মজগতকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সামাজিক চৈতন্যকে নিয়ন্ত্রণ করে সামাজিক অস্তিত্ব, একই সঙ্গে আমরা এও স্বীকার করি এবং স্বীকার করতে বাধ্য যে অধ্যাত্মজগতের এবং সামাজিক চৈতন্যেরও সামাজিক অস্তিত্বের উপর প্রতিক্রিয়া আছে এবং অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপরও উপরিতলের সৌধ (super-structure) প্রতিক্রিয়া বিস্তার করে।"

মাও-এর এবংবিধ উক্তির সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে এঙ্গেলস-এর অনুরূপ বক্তব্যের মিল আছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু একটু সতর্কভাবে মাও-এর বক্তব্য অনুধাবন করতে গেলে দেখা যাবে বর্তমান কালের বাস্তব অস্তিত্বের ক্ষেত্রে বস্তুগত ও সামাজিক অস্তিত্বের মুখ্য স্থান মাও স্বীকার করেন না, এই মুখ্য স্থান তিনি স্বীকার করেন ইতিহাসের, এক বিমূর্ত "ইতিহাসের বিকাশধারার সামগ্রিকতার" ক্ষেত্রে এবং এইভাবে প্রাত্যহিক রাজনৈতিক আচারের ক্ষেত্রে আত্মমুখিতার সাফাই রচনা করেন।

মাও তাঁর আত্মমুখিতার সাফাই হিসেবে দ্বিতীয় যে যুক্তি হাজির করেন তা হল এই যে, নির্দিষ্ট বাস্তবতার বিকাশে অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ামক উপাদান হয়ে দাঁড়ায় আদর্শ। মানুষের মন সাদা পাতার মতো, তাকে নেতার ইচ্ছামতো যে কোনো ভাবে ব্যবহার করা যায়, মাওয়ের এই তত্ত্বেরই সম্পূরক তত্ত্ব এটি।

"বস্তুজগতকে অধ্যাত্মজগতে রূপান্তরিত করা যায় এবং অধ্যাত্ম জগতকে রূপান্তরিত করা যায় বস্তুজগতে" এই তত্ত্বের ইচ্ছানির্ভর (voluntarist) ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে মাও এবং তাঁর অনুগামীরা এইটাই প্রমাণ করতে চান যে সমাজের উপর যে কোনো ভাবধারা চাপিয়ে দেওয়া যায়। 'মাও সে-তুঙের চিন্তাধারা'কে চাপিয়ে দেবার উন্মাদ প্রচেষ্টার উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে এই তত্ত্বের মধ্যেই।

আত্মমুখী উপাদানের ভূমিকা সম্পর্কে মাওয়ের ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পূর্বোক্ত পাঠ্যপুস্তকের লেখকরা বলেন, "…জগতের রূপান্তর দুটি কর্ম সম্পাদনের উপর নির্ভরশীল—বস্তুজগতের রূপান্তর ও ভাবজগতের রূপান্তর।" তাঁরা আরও দাবি করেন, মাও সে-তুঙ "ভাবজগতের রূপান্তরের নীতির সৃষ্টিশীল বিকাশ ঘটিয়েছেন…ভাবজগতের রূপান্তরের বিপুল গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন,

জোর দিয়েছেন রাজনৈতিক শিক্ষা এবং নিয়ামক শক্তি হিসাবে রাজনীতিকে ব্যবহার করার উপর।"

"বস্তুজগতকে রূপান্তরিত করার আগে প্রয়োজন ভাবজগতকে রূপান্তরিত করা, তার মানে হল বস্তুজগতকে অনুধাবন করার জনসাধারণের ক্ষমতার রূপান্তর ঘটানো এবং ভাবজগত ও বস্তুজগতের সম্পর্কের রূপান্তরসাধন।" এখানে এই মাওবাদী তাত্ত্বিকেরা মানুষ এবং সমাজের রূপান্তরের জটিল প্রক্রিয়াটিকে একেবারে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। তারা যা বলেছেন তার মানে দাঁড়ায় ঘোড়ার আগে গাড়ি জোতা। তাদের বক্তব্য হল বিপ্লব এবং সমাজের রূপান্তরের আগে প্রয়োজন মানুষের, তার ভাবজগতের রূপান্তরসাধন। এ-ধারণা পুরোপুরি মার্কসবাদের পরিপন্থী।

এই বক্তব্যের অর্থ দাঁড়ায় মানুষ যে ঐতিহাসিক অবস্থার মধ্যে বাস করে তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নতুন মানুষ গড়া যায় আর তারপর এই "নতুন মানুষের ধারণা" সমস্ত সামাজিক সম্পর্ককে রূপান্তরিত করবে এবং "নিজের আদর্শ মডেল অনুসারে প্রকৃতিকে বশ মানাবে।"

এইভাবে মানব-তৎপরতার আত্মমুখ দিকটাকে মাওবাদে চরম সত্য বলে পূজা করা হয়, তাকে মুখ্য এবং নিয়ামক উপাদান বলে গণ্য করা হয়, অন্যদিকে বিকাশের বস্তুগত দিকটাকে, যে বাস্তব অবস্থার মধ্যে সেই প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হয় তাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়, নয়তো দেওয়া হয় গৌণস্থান।

এইভাবে মাওবাদ রাজনীতি, আইডিয়া, আত্মমুখ তৎপরতাকে সমাজ বিকাশের নিয়ামক উপাদান বলে গণ্য করে। তারা মুখে নিজেদের ডায়ালেকটিক্যাল বস্তুবাদের অনুগামী বলে দাবি করে, আনুষ্ঠানিকভাবে বস্তু এবং সামাজিক অস্তিত্বের মুখ্যস্থান স্বীকার করে কিন্তু কার্যত তারা অধ্যাত্মজগতকে, আদর্শ ইত্যাদিকে মুখ্যস্থান দিয়ে থাকে। এটা মূলত একটা ভাববাদী অবস্থান।

তিন

মাওবাদকে মার্কসবাদ হিসেবে পরিবেশন করা কঠিন, এইটা উপলব্ধি করেই সম্ভবত মাওবাদীরা দর্শনের মৌল প্রশ্নের একটা নিজস্ব সংযোজন উদ্‌ভাবন করেছে। তারা বলে, দর্শনের মৌল প্রশ্নের যে সব দিকের কথা এঙ্গেলস উল্লেখ করেছেন তা ছাড়াও আরও একটা দিক আছে। সেটা হল অধিবিদ্যা (metaphysics) এবং ডায়ালেকটিকসের পারস্পরিক সম্পর্কের দিক। যে পাঠ্যপুস্তকটির

কথা আমরা আলোচনা করছি ততে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, "বস্তুবাদ এবং ভাববাদের মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গিগত বিরোধিতা আছে, যে মতপার্থক্য আছে, তাই আছে ডায়ালেকটিকস এবং অধিবিদ্যার মধ্যে।

সমস্ত দর্শনকে নিশ্চয়ই অধিবিদ্যক এবং ডায়ালেকটিক্যাল এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। কিন্তু এই ভাগ আর ভাববাদ এবং বস্তুবাদ হিসেবে দর্শনের বিভাগ এক এবং সমার্থক, একথা বলা হাস্যকর। ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি আছে যেখানে দেখা যাবে বস্তুবাদী অধিবিদ্যায় বিশ্বাসী আর ভাববাদী ডায়ালেকটিকসের অনুগামী। হেগেল ভাববাদী হয়েও ডায়ালেকটিকসের উদ্গাতা।

মাওবাদীরা এই সত্যটি উপেক্ষা করে। তারা বলে, "আমরা যদি এই প্রশ্নটিকে (অধিবিদ্যা এবং ডায়ালেকটিকসকে পরস্পরবিরোধিতার প্রশ্নটি) মৌল প্রশ্ন বলে গণ্য করি, তাহলে অন্তর্দ্বন্দ্বের অস্বীকৃতি, অন্তর্দ্বন্দ্বকে বিশ্লেষণ ও তার মীমাংসায় অস্বীকৃতির ফলে অনিবার্যভাবেই আমরা বিষয়মুখী বাস্তবতার উপর সুসংগতভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে অসমর্থ হব, অসমর্থ হব বিশ্বকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে, তাকে রূপান্তরিত করতে এবং চিন্তা ও সত্তার প্রশ্নটিকে পুরোপুরিভাবে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে সমাধান করতে পারব না।"

এই 'সংযোজনটি' মাওবাদীদের রাজনৈতিক ফেরব্বাজির পথ প্রশস্ত করে দেয়। অতঃপর যিনিই 'মহান কাণ্ডারী'র ডায়ালেকটিকসের সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করবেন তিনিই আপনা থেকেই হয়ে যাবেন অধিবিদ্যাবাদী, অতএব ভাববাদী, অতএব প্রতিবিপ্লবী। আর তারপর তার উদ্দেশ্যে যে কোনো কটুকাটব্য বর্ষণ করা চলবে।

মাওবাদীদের দ্বিতীয় 'সংযোজনটি' হল সামাজিক চৈতন্যের একটি বিশিষ্ট রূপ হিসেবে দর্শনের এবং মানবজাতির সাধারণ অগ্রগতিতে তার ভূমিকা সংক্রান্ত ধারণা সম্পর্কে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ দর্শনকে দেখে একই বিশ্ববীক্ষা হিসেবে, দেখে একটা বিজ্ঞান হিসেবে যা প্রকৃতি, সমাজ এবং মানবজ্ঞানের বিকাশের সাধারণ নিয়মগুলিকে প্রকাশ করে। মার্কসবাদের মহান প্রবক্তারা মার্কসীয় দর্শন এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আচারের মধ্যে আত্যন্তিক যোগসূত্রের উপর যেমন জোর দিয়েছেন, তেমনি আবার দর্শন এবং আচার, তত্ত্ব এবং আচারের মধ্যে পার্থক্যের উপরও জোর দিয়েছেন। তাঁরা সাধারণ দার্শনিক উপপাদ্য থেকে সরাসরি নির্দিষ্ট বাস্তব সমস্যার সমাধান খুঁজতে যাওয়ার যান্ত্রিক ঝোঁকের তীব্র নিন্দা করেছেন। মাও-

বাদীরা কিন্তু ঠিক এ-কাজটিই করে থাকে। তারা দার্শনিক সাধারণ নীতি থেকে কী করে ভালো করে চুল-কাটা যাবে, বধিরতা নিরাময় হবে বা কোষ্ঠ সাফ হবে তা বার করার চেষ্টা করে। এটা দর্শন নয়, দর্শনের ক্যারিকেচার—ডায়ালেকটিক্যাল বস্তুবাদ তো নয়ই।

তত্ত্ব এবং আচারকে মাও একাকার করে ফেলতে থাকেন সেই চল্লিশের দশক থেকেই। মাও লেখেন, "আমাদের বিপ্লবী আচার একটা বিজ্ঞান, যা সমাজ বা রাজনৈতিক বিজ্ঞান হিসেবে পরিচিত আর আমরা যদি ডায়ালেকটিকস না বুঝি তাহলে আমরা খুব একটা সফল হতে পারব না।" পরে মাও "দর্শন এবং ডায়া-লেকটিসকে অতীন্দ্রিয়ভাবাদ থেকে মুক্ত" করতে প্রয়াস পান। তিনি লেখেন, "আমরা শুনতে পাই ডায়ালেকটিকস এত জটিল এবং গভীর একটা তত্ত্ব যা সাধারণ লোকের অনধিগম্য। এটা সত্য নয়। ডায়ালেকটিকসে অনুস্যূত আছে প্রকৃতি, সমাজ এবং চিন্তার নিয়মগুলি। সুতরাং যারই কিছু সামাজিক অভিজ্ঞতা আছে (উৎপাদন বা শ্রেণীসংগ্রামের অভিজ্ঞতা) সে-ই ডায়ালেকটিকসের কিছুটা বুঝতে পারবে আর যার সামাজিক অভিজ্ঞতা যত বেশি হবে ডায়ালেকটিকসও সে তত বেশি করে বুঝতে পারবে।"

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে তত্ত্বের সঙ্গে, এক্ষেত্রে ডায়ালেকটিকসের সঙ্গে একাকার করে মাওবাদীরা ঘোষণা করে, "দর্শনের মৌল প্রশ্নটি আবার ব্যবহারিক কর্মেরও মৌল প্রশ্ন।" 'সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক' মাও এভাবে দর্শনকে সাধারণ জ্ঞানের পর্যায়ে নামিয়ে আনেন। না বলে পারা যায় না, এটা দর্শনের ভালগারাইজেশন ছাড়া আর কিছু নয়।

চার

ভক্তমহলে দাবি করা হয় মাও নাকি, বিশেষ করে বিপরীতের ঐক্য এবং সংগ্রামের তত্ত্বের সৃষ্টিশীল বিকাশ ঘটিয়েছেন। দাবিটা কতদূর সত্য একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক।

সন্দেহ নেই, অন্তর্দ্বন্দ্ব (contradiction) এবং বিপরীতের ঐক্য এবং সংগ্রাম সম্পর্কে মাও অনেক কথার জাবর কেটেছেন। কিন্তু তার এইসব উদ্গারের সঙ্গে মার্কসবাদের মিল যৎসামান্য।

মাও বলেন, "পৃথিবীর সমস্ত বস্তু এবং ব্যাপারের একটা বৈশিষ্ট্য যেমন তার দ্বৈতচরিত্র (বিপরীতের ঐক্য এবং সংগ্রামের নিয়মের এইটাই হল সারকথা),

তেমনি এই দ্বৈতচরিত্র সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বপ্রকার প্রতিক্রিয়াশীলেরও বৈশিষ্ট্য—তারা একই সঙ্গে আসল এবং কাগুজে বাঘ। ইতিহাস দেখিয়ে দেয় ক্ষমতাসীন হবার আগে পর্যন্ত দাসপ্রভু, সামন্ত-ভূস্বামী এবং বুর্জোয়ারা প্রাণধারণক্ষম, বিপ্লবী এবং অগ্রসর শ্রেণী ছিল, তারা ছিল আসল বাঘ। পরবর্তীকালে যখন তাদের বিপরীত শ্রেণী, ক্রীতদাস, কৃষকসম্প্রদায় এবং প্রলেতারিয়েত একটু একটু করে গড়ে উঠল, শক্তিসঞ্চয় করল এবং তাদের বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম চালাতে শুরু করল, তখন দাসপ্রভু, সামন্তভূস্বামী এবং বুর্জোয়াদের একটা বিপরীত রূপান্তর ঘটল, তারা হয়ে পড়ল প্রতিক্রিয়াশীল, পিছিয়ে পড়া শ্রেণী; তারা রূপান্তরিত হল কাগুজে বাঘে এবং শেষ পর্যন্ত জনসাধারণ তাদের ক্ষমতাচ্যুত করল অথবা করবে।"

'আসল', 'কাগুজে' বাঘ ইত্যাদি অবৈজ্ঞানিক কথাগুলি না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, কিন্তু উদ্ধৃত অংশটিতে বিপরীতের ঐক্য এবং সংগ্রামের নিয়মের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছাড়া আর কি আছে! এই সংগ্রামের প্রক্রিয়াটি যে কি এবং কেমন করে তা অগ্রসর হয় মাও তা দেখাতে পারেন নি। পারা তার পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা তিনি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন, নেতির নেতির (Negation of Negation) এঙ্গেলস সূত্র তিনি মানেন না। এঙ্গেলস-এর তিনটি সূত্র অবিচ্ছেদ্য, তার একটিকে বাদ দিয়ে প্রকৃতির ডায়ালেকটিক প্রক্রিয়াকে বোঝা সম্ভব নয়।

একথা সত্য যে ইতিহাসের বিকাশের প্রক্রিয়ায় দাসপ্রভু সামন্ত-ভূস্বামী এবং বুর্জোয়ারা একসময় আর প্রগতির বাহক থাকে না, অপেক্ষাকৃত অগ্রসর শ্রেণী ক্রমশ তাদের স্থান দখল করে। কিন্তু একথা বলা আর কিছু না-বলা একই কথা। কেননা স্বীকৃত ঐতিহাসিক সত্যগুলির যোগফল বিজ্ঞানসম্মত ডায়ালেকটিক নয়। যিনি নিজেকে মার্কসবাদী তাত্ত্বিক বলে দাবি করবেন তাকে দেখাতে হবে কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একশ্রেণীর সংস্থান অন্য শ্রেণী গ্রহণ করে। কেন এমনটা হয়, অন্তর্দ্বন্দ্বসংকুল সমাজের গতি এবং বিকাশের উৎস কি—এটা জানা থাকলে তবেই মানুষ সচেতনভাবে পৃথিবীর বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্য প্রয়াস করতে পারে।

বিপরীত সত্তার পরস্পরে অনুপ্রবেশ এবং বিযুক্তি তাদের ডায়ালেকটিক্যাল প্রকৃতি দ্বারা নির্দিষ্ট। বিপরীত সত্তা পরস্পরে অনুপ্রবিষ্ট অবস্থায় থাকে। সেই কারণেই তাদের অস্তিত্বের শুরু থেকেই দাসপ্রভু, সামন্ত-ভূস্বামী এবং বুর্জোয়াদের উপর চেপে থাকে ক্রীতদাস, কৃষক এবং প্রলেতারিয়েতরূপী বিপরীত শক্তির গুরুভার। এই বিপরীত শক্তির ঐক্যটা হল এই যে অপর না থাকলে এক থাকে

না, আবার অপর একেকে বাদ দিতে চায়। এই ঐক্যের বিলোপ ঘটাতে হলে, যা বিপরীত শক্তির সৃষ্টি করে সেই অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক সমাজের বিলোপ ঘটাতে হবে। শ্রেণীসংগ্রাম ও সমাজবিপ্লবের মধ্য দিয়ে এই ঐক্য বিনষ্ট হয়।

মাও লেনিনের নাম করে প্রায়ই বলেন, বিপরীত সত্তার ঐক্য অস্থায়ী এবং আপেক্ষিক, তাদের মধ্যে সংগ্রামটাই পরম সত্য। মাও একথা বলেন বটে, কিন্তু এর তাৎপর্য অনুধাবন করেন বলে মনে হয় না। বিরোধী সত্তার ঐক্যকে মাও নিছক সহাবস্থান বলে গণ্য করেন এবং তাদের একে অপরটিতে রূপান্তরকে তিনি নিছক পরস্পরের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন বলে মনে করেন।

লেনিনের কথার আসল অর্থ যে এই যে বিপরীত সত্তার অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমশ গভীর হয় এবং প্রকট হয়—মাও তা উপলব্ধি করতে পারেন না। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমশ গভীর ও প্রকট হয়ে ওঠে বলেই শেষপর্যন্ত তার মীমাংসা হয়, তা দূরীভূত হয় এবং তার স্থলে সৃষ্টি হয় নতুন অন্তর্দ্বন্দ্বর। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঘটে একটা গুণগত রূপান্তর, সৃষ্টি হয় একটা নতুন সত্তার। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, প্রলেতারিয়েত বুর্জোয়াশ্রেণীতে রূপান্তরিত হয় না বা তাদের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করে না। যা হয় তা হল পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের বিপরীত শ্রেণী হিসেবে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের গুণগত রূপান্তর, তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বর বিকাশের একটা স্তরে এসে বুর্জোয়ার প্রগতিশীল ভূমিকা অবসিত হয়ে যায়, সে ভূমিকা তখন গ্রহণ করে শ্রমিকশ্রেণী। আর তার ফলে বুর্জোয়াশ্রেণীর পরাজয় এবং শ্রমিকশ্রেণীর জয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে, বিপরীত সত্তার ঐক্যটি ভেঙে পড়ে, পুঁজিতন্ত্রের অবসান হয়, তার স্থানে গড়ে ওঠে সমাজতন্ত্র। মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের 'দ হোলি ফ্যামিলি'তে লিখেছেন, "যখন প্রলেতারিয়েত জয়ী হয় তখন তারা সমাজে পরম শক্তি হয়ে দাঁড়ায় না, কেননা তারা জয়ী হয় নিজেদের এবং তার বিপরীত শক্তির বিলোপ ঘটিয়ে। তখন প্রলেতারিয়েত এবং তার বিরোধী শক্তি যা তাকে নির্দিষ্ট করে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি—দুই-ই বিলুপ্ত হয়।"

কিন্তু মাওয়ের মতে যখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হয় তখন প্রলেতারিয়েত বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে স্থান-পরিবর্তন করে। অর্থাৎ প্রলেতারিয়েত হয় শাসক এবং বুর্জোয়াশ্রেণী শাসিত, প্রলেতারিয়েত হয় শোষক এবং বুর্জোয়া শ্রেণী শোষিত। বলা বাহুল্য এই মাওবাদী ব্যাখ্যার সঙ্গে মার্কসবাদের কোনোই মিল নেই। মার্কস মনে করতেন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হলে, তার ফলে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিলোপ ঘটবে আর সেই সঙ্গে বিলুপ্ত হবে প্রলেতারিয়েতও। তার কারণ,

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের শর্ত ব্যক্তিগত পুঁজিতান্ত্রিক সম্পত্তির অবসান ঘটানো। এর ফলে শ্রেণী হিসেবে বুর্জোয়ার বিলোপ ঘটে, যদিও বুর্জোয়া ভাবধারার কিছু প্রভাব থেকে যায়। অন্যদিকে উৎপাদনের উপায় এবং উপকরণ শ্রমিক-শ্রেণীর আয়ত্তে আসায় এবং বুর্জোয়া শোষণের অবসান ঘটায় প্রলেতারিয়েতও আর প্রলেতারিয়েত থাকে না। সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রলেতারিয়েত, বা আরও সঠিকভাবে বললে, শ্রমিকশ্রেণী হয়ে ওঠে একটা সম্পূর্ণ নতুন শ্রেণী, যে সমাজকে চালায়, যে উৎপাদনের উপায় ও উপকরণের মালিক, এমন এক সমাজ গড়ে যেখানে মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণের অবসান ঘটেছে।

মার্কসীয় ডায়ালেকটিকস দেখায় সমাজতান্ত্রিক সমাজে পুরনো অর্থে বুর্জোয়া বা প্রলেতারিয়েত কারুরই অস্তিত্বই থাকে না, কেননা সমাজতন্ত্র গুণগতভাবে একটা সম্পূর্ণ নতুন সামাজিক সত্তা এবং তার মধ্যে বিপরীত সত্তার ঐক্য সম্পূর্ণ নতুন ধরনের।

পাঁচ

দ্বন্দ্বের মাওবাদী ধারণাও নিতান্ত যান্ত্রিক এবং অনেক ক্ষেত্রে হাস্যকর। তিনি বিপরীত ধারণার দৃষ্টান্ত হিসেবে সু-কু, ভালো মন্দ, গরম-ঠাণ্ডা ইত্যাদি যমক ব্যবহার করেন। এগুলি আর যাই হোক ডায়ালেকটিক বিপরীত সত্তার দৃষ্টান্ত নয়। আজকের প্রযুক্তি বিপ্লবের জয়যাত্রার যুগে মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দিগন্ত যখন নিত্য প্রসারিত হচ্ছে তখন এই ধরনের নিতান্ত কতগুলি ছেঁদো যমকের সাহায্যে ডায়ালেকটিকসকে ব্যাখ্যা করতে যাওয়া অর্বাচীনতা ছাড়া আর কিছু নয়। বিজ্ঞানসম্মত ডায়ালেকটিকস কতগুলি বিরোধী শব্দের সংকলনে সীমাবদ্ধ নয়, তার কাজ বস্তু এবং সত্তার অভ্যন্তরের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে খুঁজে বের করা, দুই বিপরীতের ঐক্যে গঠিত বস্তু ও সত্তার বিকাশের প্রকৃত প্রক্রিয়াটি উদ্‌ঘাটন করা। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ডায়ালেকটিকসের কাজ আত্মগতিকে বিশ্লেষণ করা।

প্রকৃতি ও সমাজে নিত্য নিয়ত যে জটিল এবং বিপরীত প্রক্রিয়া চলছে বিপরীতের মাওবাদী সংজ্ঞা তার সঠিক কোনো ধারণা দিতে পারে না। এই সংজ্ঞা শুধু অর্থহীন তাই নয়, রীতিমতো ক্ষতিকর। যেমন ডায়ালেকটিকসের মাওবাদী কদর্থ অনুসারে সমাজতান্ত্রিক দেশে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান ভালো, কেননা তা নাকি নতুন সমাজব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে; সমাজবিপ্লবে

বহুসংখ্যক লোকের মৃত্যু ভালো কেননা তাতে নাকি জনসাধারণ জয়যুক্ত হয়; বিশ্বযুদ্ধ ভালো কেননা তাতে পুঁজিবাদের অবসান ঘটে। একজন সোভিয়েত পণ্ডিত এই সব মাওবাদী ডায়ালেকটিকসের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন, রসায়নের সঙ্গে অ্যালকেমির মিল যতটুকু এই ডায়ালেকটিকসের সঙ্গে মার্কসবাদেরও মিলও ততটুকু।

সাধারণভাবে বললে, স্বতঃসিদ্ধ কতকগুলি বিপরীতের যান্ত্রিক চয়নের যোগফল বিজ্ঞানসম্মত ডায়ালেকটিকস নয়। বরং ডায়ালেকটিকসের বিকৃতি। দ্বিতীয়ত এই ধরনের স্বতঃসিদ্ধ বিপরীত সব সময় কোনো একটি ঐক্যের দুটি অংশ নাও হতে পারে। যেমন আজকের পৃথিবীতে এমন অনেক উন্নয়নশীল দেশ পাওয়া যাবে যেখানে বুর্জোয়া আছে (ব্যবসায়িক, কমপ্রাডোর বা আমলাতান্ত্রিক) কিন্তু প্রলেতারিয়েত নেই, তেমনি সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রলেতারিয়েত থাকতে পারে বুর্জোয়াশ্রেণী না থাকলেও। যুদ্ধ ও শান্তিকেও মাও একটি বিপরীতের যমক হিসাবে ব্যবহার করেন। কিন্তু যুদ্ধ ও শান্তি কোনো রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ব্যাপার নয়, পুঁজিবাদী সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বই যুদ্ধের উৎস।

বিপরীতের ঐক্য এবং সংগ্রামের নিয়মটিকে মাও ব্যাখ্যা করেন সম্ভাবনা ও বাস্তবের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নয়, যদিও একথা স্পষ্ট যে সম্ভাবনার বাস্তবে রূপায়নের মধ্যে দিয়েই দ্বন্দ্বের মীমাংসা হতে পারে।

কোনো একটি সত্তার বিপরীতের দ্বন্দ্ব থাকে বলেই সম্ভাবনার কথা ওঠে। একটি শক্তি বাড়তে বাড়তে তার গুণগত রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হয়। মাওবাদ ডায়ালেকটিকসের এই ধর্মকে উপেক্ষা করে বলেই হঠকারি রণনীতি গ্রহণ করে আর তার ফলে বিপ্লবী আন্দোলনই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ছয়

মার্কসীয় ডায়ালেকটিকস বা তার মাওবাদী বিকৃতির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এটা নয়। একটা প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে তা সম্ভবও নয়। কিন্তু এতাবৎ যে আলোচনা এ-প্রবন্ধে করা হয়েছে তা থেকে অন্তত এই সিদ্ধান্ত করা যায় মার্কসবাদের সঙ্গে মাওবাদের পার্থক্য আকাশ-পাতাল। মাওবাদীরা মার্কসীয় পরিভাষা ব্যবহার করে বটে, কিন্তু ব্যবহার করে ভিন্ন অর্থে। অসতর্ক পাঠকের কাছে তাই মাওবাদ অনেক সময় মার্কসবাদ বলে ভ্রম হয়। মাওবাদ মূলত

জ্ঞানলব্ধ মহৎ একতা

জ্যোতি দাশগুপ্ত

পল্লী ভারতের নিঃস্ব শ্রমজীবী মানুষ আজ হঠাৎ দেশের জীবন-নাট্যের রঙ্গমঞ্চে দুর্দান্ত স্রোতে আবির্ভূত হয়েছে। পেশা হিসেবে ক্ষেতমজুর গরিব কৃষক এবং সম্প্রদায় হিসেবে হরিজন আদিবাসীদের নিয়ে ভারতবর্ষের এত মাথাব্যথা এর আগে আর কোনোদিন দেখা যায় নি।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর বিশদফা কার্যসূচী যা নির্বাচিত রাজনীতিকদের থেকে শুরু করে প্রশাসনিক রাজপুরুষদের পর্যন্ত নিয়ত আলোড়িত করছে তার অধিকাংশ গ্রামের গরিবদের সাহায্যার্থে প্রণীত। এ শুধু গরিবদের কিছু দানখয়রাত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। গরিবদের স্বার্থে ভূমিসংস্কার সম্পূর্ণ করা, দাস-শ্রম থেকে গ্রাম-ভারতের মুক্তি, বিপুল ও বকেয়া মহাজনী ঋণ খারিজ, বাস্তু প্রদান ও গৃহ-নির্মাণ প্রভৃতি প্রতিজ্ঞাগুলি রিলিফের সীমানা ছাড়িয়ে মৌলিক পরিবর্তনধর্মী। সামন্ততন্ত্রের অবশেষগুলির নিশ্চিহ্নকরণ সম্পর্কিত এক মহাযজ্ঞ দেশে আরম্ভ হয়েছে। এ শুধু কথার কথায় নয়। তড়িঘড়ি আইন প্রণয়ন, পরপর সংবিধান সংশোধন, প্রশাসনিক ঢিলেঢালা ভাবের বিরুদ্ধে জেহাদ এমন আর কবে দেখা গেছে?

সুপ্রিম কোর্টের কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন সংক্রান্ত আপিলের মামলায় বিচারকগণ এবং বিচারদপ্তরই যেরকম বিচারের মধ্যে পড়েছে তা বিশাল সামাজিক পরিবর্তনের পরিচায়ক। ২৮ জুন ১৯৭৫, জরুরী অবস্থা ঘোষণাতে এর সূত্রপাত হয়েছে এমন ধারণা ভ্রান্ত। ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডঃ পি. বি. গজেন্দ্র গদকর এবছরেরই ২৮এপ্রিল নয়াদিল্লীতে আইনজীবীদের এক সম্মেলনে ভবিষ্যদ্বক্তার মতোই বলেছিলেন: "খুব শীঘ্র অথবা সামান্য বিলম্বে সুপ্রিম কোর্টকে পুনরায় এই প্রশ্নের বিবেচনায় বসতে হবে যে মৌলিক অধিকার সংক্ষিপ্তকরণে পার্লামেন্টের অধিকার আছে কি নেই। খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরূপ একটা সাংবিধানিক বিষয়ে কোর্টের চারটে পরস্পরবিরোধী রায় রয়েছে। ঘটনাপুঞ্জের চাপে কোর্টকে হয়তো ১৯৫২ সালের শঙ্করীপ্রসাদ মামলার সেই প্রথম ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্তটাই পুনর্বার বলতে হবে যে সংবিধানে যে নির্ধারক নীতিগুলি আছে তা কার্যকর করার উদ্দেশ্যে মৌলিক অধিকার সংক্ষেপিতকরণের ক্ষমতা পার্লামেন্টের আছে।"

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি বোম্বাইয়ে যে আইনজীবী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সেই সম্মেলনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত একটি বার্তায় এ-সম্পর্কে আরও খোলাখুলিভাবে বলেন: "মুক্তির একটা কাঠামোর মধ্যে সামাজিক ও আর্থিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করা আমাদের সংবিধানের লক্ষ্য। এটা পরিবর্তন আনয়নের চার্টার, স্থিতাবস্থা রক্ষার কৈফিয়ৎ নয়। জীবন্ত সংবিধান কিছুতেই ভবিষ্যৎ-প্রজন্মদের পথ আটক করতে পারে না। ভবিষ্যতকে বাধা দিতে চায় এমন কোনো মনুষ্যসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান বাঁচতে পারে না। মৌলিক মূল্যবোধগুলিকে বজায় রেখেও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে নতুন পরিস্থিতি-নির্ভর ও তার প্রতি প্রতিবেদনশীল হয়, সেই সক্ষমতা আইনকে অর্জন করতে হবে।"

রাষ্ট্রের সুউচ্চ আদালত যখন এই চুলচেরা বিচারে প্রবৃত্ত হয়, সংবিধানকে কিভাবে সমাজ-পরিবর্তনের হাতিয়ার করা যায়, তখনই নিজেদের শ্রেণীর মধ্যে শাসকদল এই প্রশাসনিক কড়া নির্দেশও জারি করছেন যে, জমির মালিকানা-সম্পর্কিত রিটার্নে যদি কেউ মিথ্যে হিসেব দিয়ে থাকে তবে ২ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা ও ২ বছর আবশ্যিক কারাদণ্ডের বিধান রচনা করতে হবে এবং তা কার্যকর করতে হবে। অর্থাৎ এ আর শুধু কথা নয়, সমাজ পরিবর্তনকে কার্যকর করার হুকুম। এসব ঘটনা যে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি নয় সেকথা বলাই বাহুল্য—যখন ভোট সংগ্রহ করার জন্য প্রতিজ্ঞা করা এবং নির্বাচনের পর শপথভঙ্গ করা একেবারে রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল।

এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আছে। তা হল গ্রামের গরিবদের ডাক দেওয়া হচ্ছে সংগঠিত হবার জন্য। দেশে যখন ধনতন্ত্র অটুট, তখনই শাসকদের একাংশ শহরের শ্রমিকদের এই আহ্বানও জানাচ্ছেন যে গ্রামের গরিবদের সংগঠিত হতে তারা যেন সাহায্য করে।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী যাঁরা তাঁরাও কী এতটা আশা করেছেন? একথা ঠিক যে অন্য কোনো শ্রেণীর সহায়তা ছাড়া পৃথিবীর কোথায়ও গ্রামের গরিবরা ও কৃষকরা সামন্ততন্ত্রবাদকে নির্মূল করতে সক্ষম হয় নি। সাম্রাজ্যবাদ-পূর্ব বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবগুলি সম্পন্ন হয়েছে ধনিকশ্রেণীর নেতৃত্বে, আর সাম্রাজ্যবাদের কালপর্বে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে। আর আজ সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তাড়ার মধ্যে মৃত্যুপথযাত্রী সাম্রাজ্যবাদের চরম সংকট কালে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রেণীর এবং অংশের সামন্ততন্ত্র নির্মূলীকরণের ব্যাপারে ও জনহিতকর গণতন্ত্র বিকাশের প্রশ্নে যে আচরণ ও

ব্যবহার দৃষ্ট হচ্ছে। তার অনেকখানি মূল্যায়ন আজ ভারতবর্ষের সমাজ-বিজ্ঞানীদের নিজেদেরই করে নিতে হবে।

গ্রামের গরিবদের কাছে ডাক যাচ্ছে। তাকে সাহায্যের শক্তি প্রবল হয়ে উঠছে। তবু সামন্তবাদ নির্মূলীকরণে যারা উপকৃত হবে, গ্রামের সেই গরিবরা না জাগা পর্যন্ত প্রাচীন কোনো শোষণ-প্রথার শিকড় বাইরের কারোর উপড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

একথা ঠিক যে অপরাপর শ্রেণীর গরজ খুবই প্রবল হয়ে উঠতে পারে। শ্রমিকশ্রেণীর তো কথাই নেই—গ্রামের গরিব ও কৃষকদের সঙ্গে যতদিন না তার মিতালি দৃঢ় হচ্ছে ততদিন তার নিজের মুক্তি অকল্পনীয়। তাছাড়া শাসকশক্তি ও গোষ্ঠীগুলিও যেমন নয়া উপনিবেশবাদ ও নয়া ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে গ্রামের গরিবদের পেতে চায়, তেমনই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রসারের জন্য, মূলধন সৃষ্টির জন্য ও উৎপাদিত পণ্যসমূহের বাজারের জন্য গ্রামের গণতান্ত্রিক মুক্তির প্রবক্তা হতে পারে। এসব যুক্তি নিশ্চয়ই অলঙ্ঘনীয়। তত্ত্বের অস্ত্রাগারে ওসব কথা রয়েছে। তথাপি একটা প্রশ্ন থেকে যায়। রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির একেবারে কর্মকৌশলের মধ্যে কোনো একটা তত্ত্বের এরূপ বাস্তব প্রতিফলনের জন্য যে বিপুল আবেগ ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় তার যোগান কে দিল?

পল্লী-ভারতই তার যোগানদার; আর কেউ নয়। গ্রামের শিকড়ে কীভাবে সেই শিহরণের সৃষ্টি হয়েছে তা খুঁজে পাওয়া অবশ্যই একটা প্রয়াসলব্ধ বস্তু। কিন্তু সে যে পৌঁছে গেছে তার পরিচয়গুলি চাক্ষুষ।

এসময়ে গ্রামের গরিবদের গরিবী বেড়েছে। বাঁচার অবলম্বন জমি হোক ও লাঙ্গল হোক, জল হোক ও জাল হোক, তাঁত হোক কিংবা কামারশালা হোক—সবই এমন দ্রুতগতিতে তাদের হাতছাড়া হয়েছে যে এমন আর কখনো ঘটেনি। পরিসংখ্যানের ভাষায়, ১৯৬১ সালে গ্রামীণ জনসংখ্যার ৫২.৮ শতাংশ স্বত্ববান চাষী ১৯৭১ সালে ৪৩.৪ শতাংশে নেমেছে এবং ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের হার ১৬.৭ শতাংশ থেকে ২৬.৩ শতাংশে উঠেছে। গ্রামের গরিবদের ও প্রান্তিক চাষীদের ৪ হাজার টাকা ঋণের পরিমাণ এই দশ বছরে আরও ২ হাজার কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৬ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

তবু অনেক কিছু হারাতে হারাতেও গ্রামের গরিবরা যে কিছু একটা সঞ্চয় করছিল তার প্রমাণও পাহাড়ের মতো জমছিল। প্রাপ্তিযোগে যাদের স্থান শূন্যের কোঠায়, কেন হারাই সেটি জানার তৃষ্ণা বোধহয় তাদেরই সবচেয়ে

বেশি হয়। গ্রামের গরিবরা পৃথিবীটাকে এসময়ে অনেক বেশি যে জানতে শিখেছে তাতেই তাদের শক্তি বেড়েছে। প্রচলিত অর্থে তাদের জ্ঞানগম্যি কিছু বাড়ে নি। এমনকি নিরক্ষরতার গ্লানি পর্যন্ত বেড়েছে বই কমে নি। কিন্তু জগতটাকে জানার দৌলতেই রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিতে প্রতিবেশী সম্পত্তিবানদের তুলনায় গ্রামের নিঃস্বরা অনেক বেশি যোগ্যতা অর্জন করেছে।

তার পরিচয় এক-আধটা বিষয়ে নয়, অনেক ঘটনায় বিকশিত। দেশকে শতধা বিভক্ত করার জন্য সম্পত্তির মালিকদের দ্বারা পুষ্ট প্রতিক্রিয়ার উদ্যত ছোরা অন্ধ্ররাজ্যে যে ভোঁতা হয়ে গেল তা গ্রামের অনুন্নত গরিবদের সমুন্নত রাজনীতির ফল। বিহার রাজ্যে ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলি গ্রামের গরিবদের তাড়া খেয়েই পালাতে বাধ্য হয়েছে। তাছাড়া একের পর আর-এক রাজ্যের সাধারণ নির্বাচনে প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি যে আরাধ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে, তার ষোলআনা গৌরব গ্রামের গরিবদের প্রাপ্য।

অথচ পরিস্থিতির যে জটিলতা ছিল তাতে বিদ্ধ জনতা হিমসিম খায়। প্রতিজ্ঞা যারা করে গেছে কিন্তু রক্ষা করে নি, সেই শাসকগোষ্ঠীকেই ভোট দিতে হচ্ছিল। ফলে কেবলমাত্র দারিদ্র্য নয়, মানুষের প্রতি শ্বাসরোধকারী অবিশ্বাসের জন্ম হয়। এরই মধ্যে আবার প্রতিবেশী উচ্চবিত্ত ও স্বচ্ছলরা রাজনীতি বলতে দুহাতের লুটকেই বুঝেছে ও বুঝিয়েছে—এবং সমগ্র সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতার যে বান তারা ডেকে এনেছে তার কোনো বাঁধ ছিল না। আস্থা স্থাপন করার কোনো ভূমি নেই; শঠতার বন্যায় সব প্লাবিত। আইন-আদালত, বিদ্যালয়, পূজামণ্ডপ কোথায়ও পবিত্রতার চিহ্নমাত্র নেই।

গ্রামের গরিবরা এরই মধ্যে মেরুদণ্ড যে খাড়া রাখতে পারল এবং মাথা যে সাফ করতে পারল সেই জীবনীশক্তির উৎস অবশ্যই তাদের উৎপাদকের জীবনযাত্রা। উৎপাদনের স্বার্থের সঙ্গে যার স্বার্থ জড়িত, বহুধা চিন্তা ও দায়িত্ব, বিবিধ কর্মবিভাগ ও পরস্পরনির্ভরতা, বাস্তবতাবোধ ও সহনশীলতা তার চরিত্র হয়ে যায়। যারা সৃজনশীল তাদের উড়নচণ্ডী হওয়া চলে না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করার ধর্ম সমাজ-সংরক্ষণের প্রধান অবলম্বন, সামাজিক শৃঙ্খলার মূল উপাদান। গ্রামের গরিবরা এসময়ে উৎপাদনের উপকরণ হারিয়েছে বটে, কিন্তু তারা ভিখারি হতে রাজি হয় নি, নিজের শ্রমকে তারা বাঁচার অবলম্বন করেছে। আর এই স্বাবলম্বী মানসই গ্রামের গরিবদের শক্তির উৎস হয়েছে।

গ্রামের গরিবদের কাছে যুগের বাণীও পৌঁছে গেছে। দেশের সীমানা

পেরোলেই শ্রমজীবী জনতার মুক্তির দেশ সমাজতন্ত্রের খবর কে না জানে? সেই আলো আসার কত যে জানালা তার কোনো ইয়ত্তা সেই। বাঁচবার জন্য বাসনাই সমাজতন্ত্রের খবরের জন্য তাকে তৃষ্ণার্ত করে তোলে—এবং ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ থেকে বাঙলাদেশ সৃষ্টি পর্যন্ত বড় বড় ঘটনাগুলি থেকেও বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক জগতের শৌর্য তারা টের পায়। সমাজতন্ত্রকে গাল দেবার জন্য, তাকে শাপান্ত করার জন্য অনেকে যে মিথ্যে প্রচার করে—নিজেদের শ্রেণীসহজাত চিন্তা থেকে গ্রামের গরিবরা তার মধ্য থেকেও জ্ঞান আহরণ করে।

সর্বোপরি অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। মানুষের প্রধান শিক্ষাগুরু হল অর্জিত অভিজ্ঞতা। গ্রামের গরিবরা স্বচক্ষে দেখছে ক্লীব, অকর্মণ্য, পরগাছা শয়তানরা দিনের পর দিন ফুলছে, এবং তা এমন উপায়ে যা সমাজ-বিরোধী মানব-বিদ্বেষী ও স্পষ্টতই বেআইনী। বড়লোক হবার সেই প্রক্রিয়াটার কোনো আবডাল নেই, নেই তাতে লেশমাত্র রহস্যময়তা—একেবারে স্রেফ মেরে খাওয়া, ছিঁচকে চুরি... নির্লজ্জ, উলঙ্গ, অসভ্য। আর এরাই যখন প্রতিক্রিয়ার রাজনীতি নিয়ে এসেছে—তা যত বাগাড়ম্বরপূর্ণ বাক্যচ্ছটা নিয়েই আসুক—গ্রামের গরিবরা ঠিক তার উল্টোটাকেই নিজ-স্বার্থের বলে বিবেচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে।

এভাবেই গ্রামের গরিবরা প্রতিবেশী স্বজনদের তুলনায় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতির জ্ঞানে যে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠল—তার পদ্ধতিটা সহজ বা প্রক্রিয়াটি মসৃণ ছিল না। তবে কষ্টোপার্জিত বলেই তাদের সেই জ্ঞান পোড়খাওয়া, অগ্নিশুদ্ধ, পরিপক্ক।

তবু এখনো যে ঘাটতি রয়েছে তা আয়ত্ত করা কম কষ্টসাধ্য। শ্রমজীবী জনতার ঐক্য, শহরের শ্রমিক ও গ্রামের গরিবদের নিখাদ একতা হল বনিয়াদ যার উপর অতীত সভ্যতার ফলগুলি যেমন বাঁচবে, তেমনই মানবতার ভবিষ্যৎ কার্যসূচীগুলিও রূপায়িত হতে থাকবে।

প্রাচীন থেকে নবীনের জন্মের প্রক্রিয়াটা এমন নয় যে যা প্রাচীন তা সবই পরিহার করা এবং খাপছাড়া ও মনগড়া কতকগুলি নতুন ব্যবস্থা তৈরি করা। কার্ল মার্কস বলেছিলেন: "মানুষ যা অর্জন করেছে তা কখনো পরিত্যাগ করে না, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সে নির্দিষ্ট কিছু উৎপাদিকা শক্তি যে-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে অর্জন করেছে তা কখনো পরিত্যাগ করে না। বিপরীতে, যে ফললাভ করা গেছে তা থেকে এবং সভ্যতার ফল থেকে

তারা যাতে বঞ্চিত না হয় সেজন্য…সামাজিক কাঠামো পরিবর্তন করতে তারা বাধ্য।" (মার্কস-এঙ্গেলস নির্বাচিত পত্রাবলী, ইংরেজী সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৫-৩৬)।

বর্জন-গ্রহণ দ্বান্দ্বিক এই সংঘাতের মধ্যে যখন ভারতবর্ষ পড়েছে, তখন ভারতের শ্রমজীবী জনগণই যে প্রতিবেশী ধনবান ও স্বচ্ছলদের তুলনায় সঠিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিচ্ছে তা খুবই মূল্যবান শিক্ষা এবং একটা মহৎ অভিজ্ঞতা।

বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তার পুরোধা বলে যারা পরিচিত তাদেরই এক অংশ হল আইনজীবীগণ। সম্প্রতিকালের কয়েকটি ঘটনা মিলিয়ে দেখলে বোঝা যা'কে এমনকি তাদের বুদ্ধিমত্তাও কত উজ্জ্বল ও তার মধ্যে কত ভেজাল। পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়ে বিচারালয়কে তার সহায়ক শক্তি হতে হবে, এই নীতি প্রতিষ্ঠার্থে সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতিকে যখন সিনিয়রিটির নিয়ম উপেক্ষা করে নিযুক্ত করা হয়েছিল, তখন আসমুদ্র হিমাচল আইনজীবীদের প্রতিবাদের সে কি উত্তাল তুফান। কিন্তু সেই আইনজীবীদেরই সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বেশি দিন লাগে নি। বোম্বাইয়ের আইনজীবীদের বিশাল সম্মেলন যে নতুন প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তাতেই তার প্রমাণ মেলে। চিন্তার এই যে অস্থিরতা তা কি একারণেই নয় যে শ্রমজীবীদের সঙ্গে সম্পর্কহীন বুদ্ধিমত্তা একাকী কোনো ঠাঁই পায় না?

প্রধানমন্ত্রীর বিশদফা কার্যসূচীতে গ্রামাঞ্চলে মৌলিক পরিবর্তনের কর্মসূচীর সমকক্ষীয় না হলেও শহরের ও শিল্পের শ্রমিকশ্রেণীকে সমাজের অনেক ভার গ্রহণ করার জন্য যে ডাক দেওয়া হয়েছে তার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য আছে। উৎপাদন-ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীকে অংশ গ্রহণ করতে বলা হচ্ছে—অন্যথায় মাত্র শিল্পপতিদের নায়কত্বে দেশ আর চলতে পারছে না। পুনর্বার স্মরণ করা দরকার আমাদের দেশে পুঁজিবাদ এখনো অটুট। তৎসত্ত্বেও বর্তমান জরুরী অবস্থার মধ্যে কোনো একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা যখন বন্দী হন নি তখনই প্রায় দু হাজার শিল্পপতি ব্যবসায়ী ও অর্থনৈতিক কারান্তরালে। এসব ঘটনার সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যকে ছোটো করে দেখা খুবই ভুল হবে। কারণ ভারতের শ্রমজীবী জনতা নিজেদের শক্তি, বুদ্ধি, সামর্থ্য ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির প্রমাণ হাজির করেই যে মর্যাদার অধিকারী হয়েছে এবং যতখানি লাভ করেছে—এইরূপ নঙর্থক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হলে তা থেকেই তাদের বঞ্চিত করা হবে।

ভারতের শ্রমজীবী জনগণ মহান। মহৎ আমাদের ভারতবর্ষ। ভারতের গণতন্ত্র শ্রমজীবী জনগণের মহত্ত্বকে যখন জানছে ও বুঝছে এবং মহতী এক ঐক্য সৃষ্টির জন্য যখন ভারতের গণতন্ত্র ব্রতী হয়ে উঠেছে—তখন অবশ্যই আমরা নির্ভয়ে ঘোষণা করতে পারি যে জয় আমাদের অনিবার্য। তবু জয় আপনাআপনি আসে না, তাকে ছিনিয়ে আনতে হয়। শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের অটুট একতাই ভারতের নতুন নতুন সাফল্যের হাতিয়ার হবে।

মধ্যবিত্ত মানসিকতা ও ফ্যাসিবাদের স্বরূপ

বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়

কোনো কোনো বামপন্থী রাজনৈতিক মহল মনে করেন—জয়প্রকাশ-জনসঙ্ঘ-স্বতন্ত্র জোট, আর ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক আধিপত্যের মধ্যে বেছে নেওয়ার কিছু নেই। সরকারি ব্যবস্থার বখরায় যাঁরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন—কখনো কোথাও মুখ্যমন্ত্রী বা কোথাও উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে—সেই সব বামপন্থী নেতা মনে করেন, ক্ষমতাসীনদের তাড়াতে, দরকার হলে, লালঝাণ্ডা পকেটস্থ করেও ক্ষমতায় এখনো অধিষ্ঠিত নন যাঁরা তাঁদের সঙ্গে হাত মেলানোও যেতে পারে, যেমন ৬৭ সালে করা হয়েছিল। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে বাম-দক্ষিণ নির্বিশেষে সুব্বারাওকে সমর্থন করা হয়েছিল। কিন্তু, এমনকি তখনো ঝাণ্ডা পকেটে পুরতে হবে এমন শর্ত দক্ষিণপন্থী পক্ষ উপস্থিত করেন নি, করার সাহস হয় নি। আজ হয়েছে সে সাহস।

একই ধ্যানধারণার বশবর্তী হয়ে এখন বলা হচ্ছে, শেখ মুজিবও তো ফ্যাসিস্টই ছিলেন বলতে গেলে, অতএব, তাঁকে খুন করে ফৌজী শাসনের মুখোস হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে পরিস্থিতির এমন কিছু হেরফের ঘটে না। এই দৃষ্টিভঙ্গিরই উপর আর-এক পোঁচ পালিশ লাগানো একটা তত্ত্ব সম্প্রতি কিছু কিছু বামপন্থী বুদ্ধিজীবী মহলে চালু হয়েছে। সেটা হল, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অনেকটা মার্কস-কথিত 'এইটিনথ ব্রুমেয়ার'-এর নায়ক লুই বোনাপার্ত-এর মতো। এ দেরই কেউ কেউ কিছুকাল আগে মাইকেল কালেস্‌কির অন্তর্বর্তী রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থা—Intermediate Regime-তত্ত্বর উপর খড়্গহস্ত হয়েছিলেন। এই স্তরেরই উপর আরো এক পোঁচ পলেস্তারা লাগিয়ে বিজ্ঞজনেরা বলেন, আসলে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের ঢিলেঢালা ব্যবস্থায় আমাদের মতো জগাখিচুড়ি সামাজিক পরিস্থিতিতে একটা চলনসই গোছের কর্মক্ষম ধনতন্ত্রও চালানো যাচ্ছিল না। তাই প্রয়োজন হল জরুরি ব্যবস্থার ফাঁস পরিয়ে একটা স্বৈরতন্ত্রী, কিন্তু, চলনসই গোছের কর্মক্ষম ধনতন্ত্র চালু করার প্রচেষ্টা। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল, তাতে আর কোনো উপায়ও ছিল না। এই শেষোক্ত মতাবলম্বীরা সকলে আবার জরুরি ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও নন।

এঁদের সকলের মতের একটা গ. সা. গু. কষলে দেখা যায় যে, একটি মৌলিক উপপাদ্যের দ্বারা এঁরা সকলেই পরিচালিত। সেটি হল নিম্নরূপ :

ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থায় ধনিকশ্রেণীর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যদিও ধনিকশ্রেণীর নানা অংশের মধ্যে অন্তর্বিরোধও রয়েছে; কিন্তু ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থার মূল চরিত্রলক্ষণ উক্ত ধনিকশ্রেণী ও আপামর শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বৈরীভাবাপন্ন (antagonistic) সংঘর্ষ। ফলত, ভারতের সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্র ও ভাবরাজ্যের উপর সাম্রাজ্যবাদ তথা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব যৎসামান্য। সেদিক থেকে কোনো মৌলিক বিপদ নেই। যেটুকু আছে, সেটুকুও উক্ত ধনিকশ্রেণীরই চরিত্রবিকৃতি বা অন্তর্নিহিত দুর্বলতার ফলশ্রুতি।

যাঁরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের লেনিন বনাম মানব রায়, বা লেনিন-স্তালিন বনাম ট্রটস্কির তর্কাতর্কির খবর রাখেন, তাঁরা সহজেই উল্লিখিত উপপাদ্যটির বংশপঞ্জী ধরে ফেলবেন। মানব রায় ও ট্রটস্কির ধ্যানধারণাতেই এর উৎস। এর সঙ্গে এমনকি মাও ৎসে-তুঙের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের চীনবিপ্লব-সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণারও গভীর পার্থক্য চোখে পড়বে। কিন্তু, এসব কথার আজকাল আর কোনো দাম নেই এই সব রাজনৈতিক মহলে। ক্ষমতালিপ্সার এমনই তাড়না। মানব রায় বা ট্রটস্কির ঔপনিবেশিক দেশ সংক্রান্ত ধ্যানধারণার বিষয়ে অনীহা, বা লেনিন- স্তালিনের তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রস্তাবনাসমূহ বিষয়ে স্বাভাবিক মমতা বর্তমানের এই নব্য "মার্কসবাদী" চিন্তাবীরদের কাছে আশা করা যায় না। এঁরা মনে করেন বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলন যেহেতু এখনো সোভিয়েত-চীন মতান্তর জনিত বিভেদ সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারে নি, অতএব হাতির কাদায় পড়ে ব্যাঙের লাথি খাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

দিব্যি চলে যাচ্ছিল। গোল বাধল ভিয়েতনামকে নিয়ে। বিকৃতমস্তিষ্ক না হলে ভিয়েতনামকে ইন্দিরা গান্ধী বা সোভিয়েত ইউনিয়নের দালাল বলা যায় না। গোল বাধল, ভিয়েতনাম যখন নির্দ্বিধায় জানিয়ে দিল যে তারা ইন্দিরা গান্ধী ও ভারতবর্ষ, শেখ মুজিব ও বাঙলাদেশ এবং পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টি ও পর্তুগালের ব্যাপারে চীনের নেতৃত্বর সঙ্গে একমত নয়। এর মূল কারণ, ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি চীনের বর্তমান নেতৃত্বের সোভিয়েত বিরোধিতার অংশীদার নয়, এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে বিশ্বের সমস্ত দেশের মুক্তি ও স্বাধীনতার পয়লা নম্বরের শত্রু, এই নির্মম সত্য ভিয়েতনাম বিস্মৃত হতে

রাজি নয়, এমনকি চীনের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর অঙ্গুলিহেলনেও নয়। জনৈক ভিয়েতনামী বন্ধু, অন্তত পদাধিকারবলেও যিনি মোটেই হেলাফেলার যোগ্য নন, যাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সমস্ত সন্দেহের উর্ধ্বে, কিছুকাল আগে বলেছিলেন, শুনেছি :

"নেরুদা একবার চিলিকে বলেছিলেন 'নিঃশব্দ ভিয়েতনাম' ; বলা যেতে পারে, 'ভারতবর্ষ ততটা নিঃশব্দও নয়, এমন ভিয়েতনাম'।" শেখ মুজিবের হত্যার পরে তিনি বাঙলাদেশকে কী বলবেন জানিনা।

'অল্ ফতা' নামে একটি সাপ্তাহিক কাগজ আছে পাকিস্তানে। তারা লিখেছে যে, ষাটের দশকে সি. আই.-এর একটি পরিকল্পনা ছিল : তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করে দরকার হলে ইন্দোনেশিয়া থেকে সৈন্য আনিয়ে সরাসরি মার্কিন তাঁবেতে "সার্বভৌম" পূর্ব পাকিস্তান ঘোষণা করা। ১৯৬৮ সালের সারা পাকিস্তানব্যাপী আয়ুববিরোধী বিক্ষোভের ধাক্কায় সে পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। সেই পুরাতন কার্যক্রমেরই নবরূপ আমরা আজকের বাঙলা দেশে দেখছি। 'অল্ ফতা'-র তাই মত।

গত বছর দুয়েক যাবতই ইন্দোনেশিয়া ও সিঙ্গাপুরের পর ঢাকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এ তল্লাটে মার্কিন গুপ্তচরবৃত্তির প্রধান ঘাঁটি। শোনা যায়, ইন্দোনেশিয়ায় হাত পাকিয়েছিলেন এমন একজন ভদ্রলোক ১৯৭০ সালে কলকাতায় আসেন ; গত বছর ভারত সরকারের আপত্তিতে তিনি কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় আসর জমিয়ে বসেন। গোটা পূর্বভারতে দ্বিতীয় ইন্দোনেশিয়া সৃষ্টি করে ভিয়েতনামের বদলা নিতে হবে। আবার কনটিনেন্টাল শেল্ফের তেলও নাকি বঙ্গোপসাগরে রয়েছে। শেখ মুজিব বেঁচে থাকতে থাকতেই তৎকালীন বৈদেশিক বাণিজ্যদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী—যিনি বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী —বাঙলাদেশের সুন্দরবনের তীরবর্তী অঞ্চল মার্কিন তেল কোম্পানিকে ইজারা দিতে চেয়েছিলেন। তা নিয়ে ভারত সরকারকে প্রতিবাদ জানাতে হয়েছিল। সম্প্রতি, মুজিব সাহেবের মৃত্যুর পর, তেল কোম্পানিরা সে অধিকার লাভ করেছেন।

তবে, তেল আরো পরের কথা। আপাতত প্রধান জরুরি কথা হল হ্যানয় থেকে নম্ফেন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে বিপর্যয় ঘটে গেল তার ক্ষতিপূরণ করা। সে ভূখণ্ড আবার চীনের সোভিয়েত-বিরোধী জেহাদেও মদত দেবে না। থাইল্যাণ্ড আর মালয়েশিয়ার কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভেদ আছে। তা সত্ত্বেও, বিপদ

হল যে, মার্কিন কাউণ্টার ইন্সারজেন্সী বিভাগের হিসাব মতোই, থাইল্যাণ্ড ও মালয়েশিয়ার হাতে আর মাত্র ১৮ মাস সময় আছে। তারপর ইন্দোনেশিয়া বড্ড কাছে। সেখানে আবার ১৯৬৮ ও ১৯৭২ সালেও ছোটখাট অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়েছে। ওখানে জাপানও জোর প্রতিদ্বন্দী। শাসকশ্রেণীর মধ্যেই দুই দল হয়েছে—জাপানী ও মার্কিনপন্থী। অতএব ভরসা দক্ষিণ এশিয়া—বাঙলাদেশ, ভারতবর্ষ, সিংহল। সিংহলের সরকারের মধ্যেও তাই সম্প্রতি নানা গোলমাল দেখা দিয়েছে।

আর ভরসা প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের ছোট ছোট অগুণতি দ্বীপ। ১৯৭২ সালে মার্কিন অ্যাডমিরাল জুমওয়ল্ট Jane's Fighting Ships-এর প্রতিনিধিকে বলেছিলেন যে, ভিয়েতনামের যুদ্ধ শেষ হলে তবেই বোঝা যাবে মার্কিন রণসজ্জার আসল লাঠিটি কি। সে লাঠি হল নৌবহর। তিনি বলেছিলেন, কার্নেগি সাহেবের নকলে, এই নৌবহর দিয়েই "বন্ধুদের ভরসা দিতে, আর জোট-নিরপেক্ষদের হুঁশিয়ার করতে" হবে। সুয়েজ হয়ে, ভারতমহাসাগর দিয়ে মলক্কা প্রণালী পেরিয়ে জাপান সাগর পর্যন্ত তৈলবাহী জাহাজের পথটা যদি মার্কিন ফৌজী ও রণতরী ব্যবস্থা সুরক্ষিত না রাখতে পারে, তাহলে জাপানকে ঠেকানো যাবে কী করে? স্রেফ তেলের জন্যেই তো জাপান সাইবেরিয়ায় গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। চীন যতই লোভ দেখাক, কত তেল আর চীন দিতে পারবে। জাপান তো পেট্রল খেয়েই বেঁচে থাকে বলতে গেলে! ওদিকে আবার মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, অসহ্য সামাজিক উদ্বায়ুগ্রস্ততার চাপে জাপানের সনাতন শৃঙ্খলার বেড়ি যাচ্ছে ভেঙে, গত ২ বছর যাবৎ জাপানের সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে বিপুল বেগে। তারা আবার মূলত সোভিয়েত-বিরোধীও নয়। জাপান শেষে যদি ফিনল্যাণ্ডের মতো হয়ে যায়?

অতএব, মুজিবকে খুন করো, জয়প্রকাশকে ঠাণ্ডা ঘর থেকে বের করো, মাসানিকে দিয়ে 'রীডার্স ডাইজেস্ট'-এ জয়প্রকাশের প্রশস্তি লেখাও, জর্জ ফার্নাণ্ডেজকে ভারতীয় পরিবহন ব্যবস্থার উপর লেলিয়ে দাও, ললিতনারায়ণ মিশ্রের উপর আনন্দমার্গীদের লেলিয়ে দাও, কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির মধ্যে ইন্দিরা গান্ধীর সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিৎ টলিয়ে দাও। দেশে বন্ধুর তো অভাব নেই; হয়তো খাস সফদরজঙ্গ রোডের বাড়ির ধারে কাছেও নেই। কে জানে?

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে আড়ালে রেখে, তার কলকাঠির হদিশ ঠিক না করে, আজকের পৃথিবীতে কোথাও—বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দুর্বল রাষ্ট্রশক্তিসম্পন্ন দেশ-

গুলিতে—এমনকি আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিরও তাৎপর্য নির্ধারণ সম্ভব নয়; আনন্দবাজারী কেউ কেউ যে আপৎকালীন জরুরী অবস্থার ঘোষণার পরই মাথা পর্যন্ত কামিয়ে ফেলল, এই নিতান্ত আভ্যন্তরীণ ঘটনারও তাৎপর্য নির্ধারণ সম্ভব নয়; বা, বলতে দ্বিধা নেই শ্রীমান সঞ্জয় গান্ধীর সাম্প্রতিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে খবরের কাগজী উৎসাহের হদিশ পাওয়াও বোধহয় সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের "স্বদেশী শুঁড়"গুলির সন্ধান না করে তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশে ফ্যাসিবাদের স্বরূপ উপলব্ধি আদপেই সম্ভব নয়। এককালের বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা নাম্বুদ্রিপাদ নানান কষ্টকল্পনা করে নতুন তত্ত্ব আমদানি করেছেন যে, আজকাল আর তৃতীয় বিশ্বে পুরাতন বা নয়া সাম্রাজ্যবাদী অপকৌশলের সঙ্গে লড়াইয়ের প্রাধান্য নেই, তার স্থান অধিকার করছে আভ্যন্তরীণ শ্রেণীসংগ্রাম। এর ফলে, অবশ্য "আভ্যন্তরীণ শ্রেণীসংগ্রাম"-এর যেটুকু সম্ভাবনা ছিল সেটুকুও ঘুচে যাবে, কারণ, শত্রুমিত্র জ্ঞান চলে গেলে "সংগ্রাম" শেষপর্যন্ত আত্মঘাতীই হয়ে যায়।

তৃতীয় বিশ্বে নয়া ফ্যাসিবাদের মূল উৎস মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু, যে-কোনো দেশেই, আজকের দিনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কার্যসিদ্ধির জন্য প্রয়োজন দেশের মধ্যে উপযুক্ত জমি, "স্বদেশী শুঁড়", চেলাচামুণ্ডা। একটা কথা এদেশে এখন প্রথমেই স্পষ্ট বুঝে নিতে হবে: স্বাধীন ভারতবর্ষ আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারি, এই দুই-এর মধ্যে কোনটা কার পছন্দ। মার্কসবাদের নাম করে ওপর-চালাকির দিন ঘনিয়ে এসেছে। পছন্দটা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে যাবে। তখন আর তর্কেরও অবকাশ থাকবে না। এমনকি কয়েক প্রস্থ "মার্কসবাদ"-এর শাক দিয়েও মাছ ঢাকা যাবে না। সাম্প্রতিক যুগে, সাম্রাজ্যবাদের, মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদের, কিছু নতুন পোষাকের অনুচর জুটেছে। এতকাল তারা হত দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট। আজকাল তারা অনেকে ঘোর বামপন্থী। সামাজিক ও আদর্শগত নৈরাজ্য সৃষ্টি করে, বামপন্থী আন্দোলনে হাজারো চক্র, বিভেদ, হানাহানি, ভ্রাতৃহত্যা আমদানি করে এরা সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের পথ খুলে দেয়। চিলিতে দিয়েছে, পর্তুগালে দিচ্ছে—দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে—আঙ্গেলায় দিচ্ছে, থাইল্যাণ্ডে দিচ্ছে, সিংহলে দিয়েছে এবং দিচ্ছে, বাঙলা-দেশে তারা অনেকেই খুনীদের দুই হাত তুলে অভ্যর্থনা জানিয়েছে—একদা ঘোর "বামপন্থী" 'Holiday' পত্রিকার সম্পাদক তো এখন সরকারী মুখপত্র 'Bangla-desh Times'-এর সম্পাদক, মুজিবপন্থী সম্পাদককে খুন করে। এখানেও অনেক

"বামপন্থী"র চেহারা স্পষ্ট হচ্ছে, আরো হবে। জার্মানিতেও নাৎসিরা অ্যানার্কিস্টদের কাজে লাগিয়েছিল; ডিমিট্রভের বিচারের সময় সেকথা প্রকাশ পেয়েছিল। এখানে অবশ্য সম্প্রতি অনেক নব্যবাম গজিয়েছেন, যাদের বিষয়ে ডিমিট্রভের জবানিতে—যতদূর মনে পড়ে, সরকারী সাক্ষী ভ্যাণ্ডারলিউবকে দেখিয়ে ডিমিট্রভ বলেছিলেন—বলতে হয়, "Communist! He is not even an anarchist!" অ্যানার্কিস্ট, পুরোপুরি নৈরাজ্যবাদী হওয়ারও মুরোদ নেই। কারণ, তাতেও খরচা দিতে হয়, পার্থিব আরামের সাজানো বাগান শুকিয়ে যায়।

এতে অবশ্য আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই। দেবতারা যাকে মারতে চান, তাকে নাকি আগে পাগল বানিয়ে দেন। নয়তো ষাটের দশকে কেরল ও পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী যুক্তফ্রন্ট অমনভাবে চরম কলঙ্কজনক ভ্রাতৃঘাতী রক্তক্ষয়ের মধ্যে রসাতলে যাবে কেন? সেই দুই সরকার যদি টিকতে পারত এবং পার্লামেন্টারি প্রথার চৌহদ্দির মধ্যেই বিকল্প রাজ্যশাসনের একটা সৎ, সভ্য, সুস্থ, ন্যায়সঙ্গত রূপ দিতে পারত, তাহলে আজ পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা এই চরম সংকটের মধ্যে পড়ত না, গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ কেবল দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াকেই বলীয়ান করে—এই হতাশ খেদোক্তিও এমন অনায়াসে করা যেত না; আবার লালঝাণ্ডা বেমালুম পকেটে পুরে জয়প্রকাশী-প্রফুল্ল সেনী ছাতার তলায় আশ্রয় নেওয়ার দুর্মতি হত না, বা সেদিনের বিপুল জনসমর্থন ও গণ-সংগঠনের শক্তি এমন পঙ্গুও হয়ে যেত না।

তৃতীয় বিশ্বে নয়া-ফ্যাসিবাদের প্রধান উৎস যদি হয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তবে ভারতবর্ষের মতো রাজনৈতিক দিক থেকে অগ্রসর দেশে তার আভ্যন্তরীণ জমি তৈরির অন্যতম প্রধান উপাদান বামপন্থীর আদর্শগত দুর্বলতা, বিভেদ, শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে অর্থরতির (economism) মানসিকতার প্রাদুর্ভাব, নির্লজ্জ দলবাজির আধিপত্য। অনিবার্যভাবে এর ফলে বামপন্থী দলগুলির মধ্যেও চরম সুবিধাবাদী রীতিনীতি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসমূহ শক্তিসঞ্চয় করে, সংগঠনকে দখল করে; তাকে ভেতর থেকে তখন আর বদলানো যায় না; আর কেবলই ভাগ হতে থাকে। শ্রমজীবী জনতার সংগ্রামী হাতিয়ার ভোঁতা হয়ে যায়।

অনগ্রসর, অপরিণত ও বিকৃত ধনতন্ত্রের দেশসমূহে বামপন্থী আন্দোলনের এই আভ্যন্তরীণ দৈন্য, সুবিধাবাদের কাছে দলবাজির কাছে হীনমন্যতার কাছে আদর্শের এই চরম পরাজয়েরও একটা সামাজিক উৎস আছে। সে উৎস, এই

ধরনের সমাজব্যবস্থায় এক বিপুল পেটিবুর্জোয়াশ্রেণীর প্রাদুর্ভাব, যার জগাখিচুড়ি চরিত্রের ফলে তাকে একটা সমধর্মী শ্রেণী হিসেবেও চিহ্নিত করা যায় না। এই পেটিবুর্জোয়া মনোবৃত্তি যখন একটা মুদ্রাস্ফীতি-তাড়িত, জন্মেই জরাগ্রস্ত, উৎপাদন-বিমুখ অপধনতন্ত্রের সঙ্গে মেশে, রাতারাতি বড়লোক বনতে চায়, নামকাম চায়, তখন তার মধ্যে ফ্যাসিস্ত মতিগতির প্রাবল্য দেখা দেয়। বামপন্থী রাজনীতিও তখন নিতান্তই ক্ষমতালিপ্সার গুণ্ডামিতে পর্যবসিত হয়, শ্রেণীসংগ্রাম অবসিত হয় "এলাকা সাফ" করার হানাহানিতে। প্রকৃতপক্ষে, বামপন্থীর মধ্যেই ফ্যাসিস্ট মনোবৃত্তি দেখা দেয়। আর, একটা দেশে একবার যদি বামপন্থী রাজনীতি এই-ভাবে পেটিবুর্জোয়া মনোবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে, তারপর "এলাকা সাফ" করার কলাকৌশল সে সমাজের ঘাড়ে ভূতের মতো চেপে বসে, কোনো রাজনৈতিক দল তার হাত থেকে রেহাই পায় না, কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মায় হাসপাতালও তার কবল থেকে বাঁচে না, "শিক্ষা বাঁচাও" বলে শিক্ষাব্যবস্থার টুঁটি টিপে হত্যা করতেও আর বাধে না কারোর। আসলে হত্যা ব্যাপারটাই আর গায়ে লাগে না কারোর—যে কোনোরকম হত্যা, যখন হত্যাই ফ্যাসিবাদের মূল উপজীব্য।

এমন কি শিল্পায়নে অগ্রসর দেশ জার্মানিতেও নাৎসিবাদের অভ্যুদয়ের সময়ে পেটিবুর্জোয়া, মধ্যবিত্তশ্রেণীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। রজনী পাম দত্তর বইতে বলা হয়েছে :

"জন্মলগ্নে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব অনেক সময়েই মধ্যবিত্ত (পেটিবুর্জোয়া) উপাদানসমূহে ; ক্ষুদে ব্যবসায়ী থেকে বৃত্তিজীবী নানা স্তর পর্যন্ত মধ্যবিত্তের বিবিধ অংশের প্রতি ফ্যাসিবাদের আবেদন উদ্দিষ্ট হয় ; তার অনুচরবৃন্দ, বিশেষত নেতৃত্বের ব্যাপক অংশ মধ্যবিত্ত থেকেই সংগৃহীত হয় ; সংকটকালীন অবস্থায় মধ্যবিত্ত বা পেটিবুর্জোয়া ভাবাদর্শে ফ্যাসিবাদ জারিত হয়।"

এদের মধ্যে থেকে তখন "দার্শনিক" গজান হত্যার আর্যামি প্রমাণ করতে। হত্যাই ফ্যাসিবাদের মহত্তম পেশা। মার্কসবাদের সঙ্গে হত্যার রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই, চারুবাবু-প্রমোদবাবুরা যাই বলে থাকুন না কেন। অবশ্যই এই মধ্যবিত্ত শেষপর্যন্ত জার্মানির মতো অগ্রসর দেশে, বৃহৎ পুঁজির কামানের রসদ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়, তার কোনো স্বতন্ত্র শ্রেণীভূমিকা নেই বলে। অনগ্রসর দেশগুলিতে, যেখানে উৎপাদন-সম্পর্কের পশ্চাদ্‌পদতার দরুণ গ্রামশ্চি-কথিত "মৌলিক" শ্রেণীর গঠন অসম্পূর্ণ সেখানে এই মধ্যবিত্ত স্তরগুলির প্রাধান্য আরো ব্যাপক। মৌলিক শ্রেণীসমূহের অসম্পূর্ণ বিকাশের ফলে আর্থিক-সামাজিক

সংকটের একান্ত জাতীয় সমাধানের কার্যক্রম নাগালের বাইরে থেকে যায়, রাজনৈতিক পর্যায়ে গৃহীত হলেও লৌকিক সমাজে কার্যকরী হয় না। তখন এই মধ্যবিত্ত সমাজের ইলেক যাঁরা (Elite) তাঁরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শরণাপন্ন হন। ভারতবর্ষের মতো ইংরেজিনবীশ বুদ্ধিজীবীর দেশে আবার সমাজের ইলেক যাঁরা তাঁদের পক্ষে এইটাই সহজে আসে। পশ্চিম তো এদেশে এসেছে ভিক্টোরীয় ইংরেজ সভ্যতার রসে জারিত হয়ে, ফরাসী মুক্তবুদ্ধির ছোঁয়াচ থেকেও যা নিজেকে সন্তর্পণে বাঁচিয়ে চলেছে—যেখানে ধরুন ইন্দোচীন ভূখণ্ডের বুদ্ধিজীবী ফরাসী জ্যাকবিন ধারার মুক্তবুদ্ধির সুযোগ পেয়েছে। ওই তল্লাটের বৈপ্লবিক রূপান্তরে ফরাসী জ্যাকবিন মুক্তবুদ্ধির প্রভাব লাতিন কোয়ার্টারের সেই দরিদ্র, প্রায় ভবঘুরে শীর্ণকায় যুবক হো চি মিনের উপর বর্তেছিল, আর বর্তেছিল সেই জ্যাকবিন ঐতিহ্যের উত্তরসূরী প্রবল প্রতাপান্বিত ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব সমগ্র ইন্দোচীন ভূখণ্ডের কমিউনিস্ট আন্দোলনের উপর। ভিয়েতনামী নেতারা মুক্তকণ্ঠে সে কথা স্বীকার করেন।

হয়তো সেই কারণেই চীনের নেতৃত্বের আত্মকেন্দ্রিক সংকীর্ণ মতিগতির সঙ্গে ভিয়েতনামের উন্নতরুচি মুক্তবুদ্ধি যুক্তিনিষ্ঠ নেতৃত্বের খাপ খেলো না। আবার সেই কারণেই সম্ভবত ভিয়েতনামের নেতৃত্ব অনায়াসেই তাঁদের দেশজ কনফিউসীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে একটা আত্মিক সাযুজ্য স্থাপন করতে পারেন, আর চীনে এতকাল বাদে হঠাৎ বৃদ্ধ কনফিউসিয়াসের বিরুদ্ধে প্রবল জেহাদ ঘোষণা করা হয়। বোঝা দায়, অবশ্য, চৈনিক সান্ধ্য পরিভাষায় আবার কনফিউসিয়াস লোকটি কে! হয়তো একেবারেই হাতের কাছের নেহাতই জীবিত কোনো ব্যক্তি! ৫০ বছরের মার্কসবাদ সত্ত্বেও চীন তো সেই রহস্যময়ই রয়ে গেল, মিসেস রবিনসনদের মতো ভুঁইফোড় "নব্য মার্কসবাদী"দের সর্ব রহস্যহর নানা বিধান সত্ত্বেও।

বিশ্বের দরবারে ভিয়েতনামের অন্যতম প্রধান ভাষ্যকার, শান্ত ক্ষীণদেহ একটি ফুসফুসহীন কিন্তু ক্ষুরধার মানুষ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং 'ভিয়েতনাম ক্যুরিয়র' ও 'ভিয়েতনামিজ স্টাডিজ'-এর সম্পাদক ন্‌গুয়েন থাক ভিয়েন সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বইতে লিখেছেন (এঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছিল বর্তমান লেখকের):

"কনফিউসিয়সের অনুগামীদের পক্ষে মার্কসবাদ হতবুদ্ধিকর নয় মোটেই, যেহেতু মার্কসবাদ মানুষের চিন্তাকে নিবদ্ধ করে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলীর উপর। মানুষকে তার সামাজিক সম্পর্কনিচয়ের সমষ্টি রূপে সংজ্ঞাবদ্ধ করার

ফলে মার্কসবাদের সংস্পর্শে কনফিউসীয় বিদ্বান ব্যক্তিরা চমকিত হতেন না, কেননা তাঁরা বরাবর সামাজিক কর্তব্য পালনই মানুষের শ্রেষ্ঠ অন্বিষ্ট মনে করতেন। যদিচ কনফিউসীয় মতবাদে সামাজিক কর্তব্যের সংজ্ঞা কেবলমাত্র নৈতিকবোধের দ্বারা নির্দিষ্ট, যার সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কের মার্কসবাদী বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার নিশ্চয়ই যথেষ্ট তফাৎ, তবু উভয় মতবাদেরই দিগদর্শনের মূল কাঠামো (frame of reference) ও প্রাথমিক সমস্যাবলী সমধর্মী। বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, যা ব্যক্তিস্বার্থকে সমাজের উপরে স্থান দেয়, এবং পেটিবুর্জোয়া নৈরাজ্যবাদ, যা কোনোরকম সামাজিক শৃঙ্খলারই ধার ধারে না, উভয়ই মার্কসবাদ ও কনফিউসীয় মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। কনফিউসীয় মানুষ সনাতন সমাজ থেকে সোজা উত্তীর্ণ হয় সমাজতন্ত্রী সমাজে।…

"মার্কসবাদী কর্মীরাও কনফিউসিয়সের অনুগামীদের রাজনৈতিক নীতিবোধ থেকে অনেক কিছুই দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করেছে। নেতাদেরকে উন্নত নৈতিক মানের পরিচয় দিতে হবে, এটা কনফিউসীয় দেশসমূহে নিবিড়ভাবে উপলব্ধ। নিজেদের কাজকর্মকে আজকের মার্কসবাদীরা ভিন্নতর তাৎপর্যে মণ্ডিত করলেও আগেকার কালের বিখ্যাত বিদ্বান মানুষদের ঐতিহ্যের তারা উত্তরসূরী। তারা এখনো কনফিউসীয় প্রবাদ বাক্য সব আওড়ায়, যেমন: "ঐশ্বর্যে মজে দুর্নীতি-গ্রস্ত হয়ো না", "বাধাবিপত্তিতে বিচলিত হয়ো না", এবং "শক্তির আস্ফালনের সামনে মাথা নিচু করো না।"

ভিয়েতনামের মার্কসবাদ, বর্তমান লেখকের ধারণা, ফরাসী বিপ্লবী মুক্তবুদ্ধি ও কনফিউসীয় নৈতিক সাধনার এক প্রগাঢ় সমন্বয়। সে দিক থেকে ভিয়েতনামের বিকাশ এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে বলে বর্তমান লেখকের গভীর বিশ্বাস। এই সমন্বয়েরই অভিব্যক্তি আমরা দেখতে পাই যখন জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের সময়কার একটি ছোট্ট পুস্তিকায় দেখি লেখা রয়েছে: "বিপ্লবীর গুণ পাঁচ রকমের: মানবতাবোধ, কর্তব্যবোধ, জ্ঞান, সাহস ও সততা।" আর বলা হয়েছে: "নদী তার উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হলে শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। গাছ তার শিকড়চ্যুত হলে শুকিয়ে মরে যায়। আর, একজন বিপ্লবীর যদি নৈতিক বোধ না থাকে, তবে সে যতই প্রতিভাবান হোক না কেন, জনসাধারণকে নেতৃত্বদানের লক্ষ্য-সিদ্ধি তার কখনোই হবে না।"

"সবার আগে কষ্ট বুক পেতে নিতে হবে, আর সুখের ভাগ নিতে হবে সবার শেষে", এই হল ভিয়েতনামের বামপন্থী নেতা ও কর্মীদের জীবনের মূল সুর।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে, নিজেকেও মনে আয়নায় দেখলে, সহজেই বুঝতে পারি, বামপন্থী রাজনীতির এই ধর্ম থেকে আমরা কত দূরে সরে এসেছি। আজ তাই দেখতে পাই, বিগত দশকে গরিবের ভাত কাপড় জোটাতে পারে নি যে অর্থনীতি, সেই অর্থনীতি কী নির্মম উল্লাসে বিলাস-দ্রব্যের বেসাতি সাজিয়ে বসেছে সারা দেশের শহরে গঞ্জে। আর তার পিছনে দৌড়চ্ছে বড়লোক শুধু নয়, কেবল মধ্যবিত্তও নয়, গরিব মানুষও। গরিবের, শ্রমিকের বঞ্চনাবোধও আজ ভারতবর্ষে বহুলাংশে ওই বিলাসদ্রব্যের অভাববোধসঞ্জাত হতে বসেছে। গ্রামে, রাস্তায়, শহরের দোকানে, মোড়ে মোড়ে টেলিভিশন বসলে আরো জমবে ভালো। নিরক্ষরও তখন পার্ক স্ট্রীটের এল্ ডোরাডোর স্বপ্ন দেখতে পাবে চর্মচক্ষু দিয়ে। এইভাবেই মার্কিন মালটিন্যাশনাল কারবারের শিকারে পরিণত হচ্ছে দেশ; কনজিউমার সোসাইটির, ভোগসর্বস্ব সমাজের পণ্যরতির ধ্যানধারণায় রুচিতে আচ্ছন্ন হচ্ছে; গরিবের শ্রমজীবীর স্বাভাবিক আত্মসম্ভ্রম-বোধ, তার অস্তিত্বের নিজস্ব মানবিক ইজ্জতের অপমৃত্যু ঘটছে। আর সমগ্র রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা অর্থরতির (Economism) ক্লেদে, মার্কস যাকে বলেছিলেন সামাজিক দ্বেষে (social Envy), হিংসায়, পরশ্রীকাতরতায় আচ্ছন্ন হচ্ছে। খুন করতে, নিজের দলেরই মধ্যেকার বিরুদ্ধপক্ষীয় উপদলকে তাড়িয়ে "পাড়া সাফ" করতে, ব্যাপকভাবে পরীক্ষায় নকল সংগঠিত করে নেতা সাজতে, নেতা সেজে সম্পূর্ণরূপে পাহারাদারহীন "মুক্ত এলাকায়" নিজে পরীক্ষা দিতে, ছুরি দেখিয়ে জবরদস্তি কলেজে ছাত্র ভর্তি করতে, হাসপাতালে রুগী ভর্তি করতে বাধছে না একটুও। ছাত্র-যুবদের পাণ্ডা যারা তাদেরই যে কেবল বাধছে না তাই নয়, যাঁরা নাকি শিক্ষাব্যবস্থার দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা তাঁদেরও বাধছে না দুই চোখ ভরে এই ভূতের নৃত্য দেখে মাস গেলে মাইনের টাকাটি পকেটস্থ করে "এবারে একেবারেই টোকাটুকি হয় নি" বলে বিবৃতি দিতে। অথচ, একদিন ছিল যখন ছাত্র ফেডারেশনের কোনো সভ্য পরীক্ষার হলে অসদুপায় গ্রহণ করলে তাকে প্রকাশ্যে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হত। আর আজ? যে সব "দাদা"দের "চিন্তাধারা" দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে বলে দেওয়ালে লেখা হয়, সেই "দাদারা" কেউ কেউ কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাড়পত্র যোগাড় করেছেন খোঁজ নিলে শ্রদ্ধায় নতমস্তক হওয়া ছাড়া আর উপায় থাকবে না। তারপর আর জয়প্রকাশ-জনসঙ্ঘকে কোন নৈতিক বলে পরাজিত করা যাবে? "দাদা"রা অনেকে শেষপর্যন্ত ওদেরই দলে ভিড়ে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

আরো উচ্চ কোটির মানুষ যাঁরা তাঁদের কথা না তোলাই ভালো। রোটাণ্ডার আশপাশে কী হয় না হয় সে কথা বর্তমান লেখকের বিশেষ জানা নেই। লিখতে বসেছি প্রত্যাশা ছিল যাঁদের কাছে, যাঁদের জয়লাভে হতভাগ্য কলকাতার মানুষ দিন রাত্রির তফাৎ ভুলে গিয়েছিল কোনো এক ১৩৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁদের কথা, অর্থাৎ নিজেদের চরম ব্যর্থতা ও গ্লানির কথা। কারণ এমনকি জার্মানির শিক্ষাও এই যে, সে দেশের বামপন্থী আন্দোলন প্রথম দিকে দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী পঙ্ককুণ্ডে ও শেষের দিকে অতিবাম সংকীর্ণতার গহ্বরে না পড়লে হয়তো রুশবিপ্লব-পরবর্তী অধ্যায়ের ইয়োরোপের প্রত্যাশিত রূপান্তর অমনভাবে বিপথগামী হত না। একটা দেশে ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান ঘটলে, তার জয় হলে সে পাপের দায়ভাগ বর্তাবে জীবিত প্রতিটি সাবালকের উপর—ন্যুরেমবার্গ বিচারের অসামান্য ছবিটির কথা যাঁদের মনে আছে তাঁরা সেই বাগানের মালিটার কথা স্মরণ করুন। দায়ভাগ থেকে সেও মুক্তি পায় নি। আর, আমরা তো সব বুদ্ধিজীবী, তায় মার্কসবাদী, বামপন্থীর চরম পরাকাষ্ঠা আমরা অনবরত জনপ্রদর্শনীতে জাহির করে থাকি, লোকে টিকিট কেটে দূর গ্রামাঞ্চল থেকে এসে দেখেও যায়। আমাদের নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো আশাই নেই—যতই নানান কৌশলে কেটে পড়ার রাস্তা করে রাখি না কেন। শেষের সেদিন হবে ভয়ঙ্কর। "অনেক দিনের অনেক পাপের ঋণ, থাক করে দেয় প্রাসাদের উঁচু মাথা"—বিষ্ণু দে যাদের কথা ভেবেই লিখে থাকুন, চমকে ওঠার কথা আমাদেরও, চোখের সামনে যখন "পিশাচেরা আর পিশাচসিদ্ধ দলে ছেয়ে গেল সন্ত্রাসে", মুখে তবু কুলুপ আঁটা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

পেটিবুর্জোয়া লোভের, ক্ষমতালিপ্সার, নির্লজ্জ স্বার্থপরতার, হীনমন্যতার নরক থেকে বামপন্থী আন্দোলনকে টেনে বের করতে না পারলে এদেশে ফ্যাসিবাদের রাজনৈতিক জয়লাভের সম্ভাবনা ষোল আনা। সামাজিক ক্ষেত্রে অনেকখানি জয়লাভ তো হয়েই গিয়েছে, আজ নয়, ১৯৭০ সাল থেকেই, যখন মানুষকে স্রেফ অন্য দলের সমর্থক হওয়ার অপরাধে ঘরবাড়ি ছেড়ে, অনেক সময়ে চাকরি-বাকরি ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়েছে। রাজনৈতিক মুখোশটাই শুধু সম্পূর্ণ খসে পড়তে বাকি। পরস্পরের দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। মনে মনে আমরা অনেকেই কথাটা জানি, মর্মে মর্মে বুঝি, যখন দেখি, আজ আর সহকর্মী সহমর্মী সহযোদ্ধা বন্ধুর সম্পর্কের প্রায় কোনো দামই নেই, নেই কোনো শক্ত জমি, যে যার মতন একা একা, প্রয়োজন হলে পরস্পরকে আঁচড়ে কামড়ে যেমন করে পারো বাঁচো,

নয়তো মরো! বড়জোর একত্রে একটা শোকসভা করলেও করতে পারে এক-কালের সহকর্মী বন্ধু সহযোদ্ধারা অতীতের স্মৃতির প্রতি অবশিষ্ট মমতার তলানি ছেঁকে। ফ্যাসিবাদের এও একটা উৎস, এই যে সব মানবিক স্বাভাবিক সম্প্রীতির সম্পর্কের, সংহতিবোধের অপমৃত্যু, নৈতিক নৈরাজ্য। টমাস মান 'ম্যাজিক মাউন্টেন' থেকে 'ডক্টর ফাউস্টুস' পর্যন্ত একের পর এক উপন্যাসে ইয়োরোপের এই নৈতিক নৈরাজ্যের মড়া কেটে গেছেন বৈজ্ঞানিক মমতায় ও নির্মমতায়। নৈতিক নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট-পার্টি একদা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘোর দুর্দিনে, দুর্ভিক্ষ মহামারী মুদ্রাস্ফীতি কালোবাজারির শ্মশানের উপর দাঁড়িয়ে সে লড়াইও করেছিল; তার থেকে জন্মেছিল যে মহৎ সংস্কৃতি-আন্দোলন তারই ভগ্নাবশেষ নিয়ে আজ আমরা সখেদে গর্বিত—রবিশঙ্কর, শম্ভু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিজন ভট্টাচার্য থেকে ঋত্বিক ঘটক পর্যন্ত। নৈতিক সংগ্রামের মেরুদণ্ড ছাড়া কোনো সংস্কৃতি-আন্দোলন দাঁড়াতে পারে না। ভিয়েতনামী নেতার কথা অনুসারে এমনকি নিছক রাজনৈতিক আন্দোলনেরও লক্ষ্যসিদ্ধি সম্ভব নয়। তাই ইতি-হাসের নিষ্ঠুরতম ফ্যাসিস্ট আক্রমণকে পর্যুদস্ত করেছে যে ছোট্ট ভিয়েতনাম, তার নৈতিক আগুনের শিখার আলোটুকু আমাদের দরকার বড় বেশি। আমাদেরও আজ যখন শিয়রে শমন হাজির।

কিন্তু, জীবনের প্রাত্যহিক আচরণে নৈতিক মান বিদেশ থেকে ধার করা যায় না। দেশজ ঐতিহ্যের গভীরে ডুব দিয়ে তাকে উদ্ধার করে আনতে হয়। বিদেশের উদাহরণ থেকে নিশানা স্থির করার কাজে সাহায্য নেওয়া যায়, এই পর্যন্ত। কনফিউসীয় বিদ্বান ব্যক্তিদের সঙ্গে বিদ্যাচর্চা ও আচারনিষ্ঠার দিক থেকে তুলনীয় চরিত্র যদি আমরা ভারতীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে খুঁজি, মার্কস যাদের প্রাচীন গ্রীকদের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, তবে কিন্তু বিপদে পড়ার সম্ভাবনা। অনেক মহৎ গুণের অধিকারী হয়েও ভারতীয় ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তিও যে ব্রহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তার সঙ্গে কনফিউসীয় ধারায় সামাজিক-ঐহিক সম্পর্ক চয়নের দ্বারা লৌকিক পুরুষকারের জোরে মোক্ষলাভের ধ্যান-ধারণার কোনো মিল তো নেইই, বরং বিরোধ আছে আদিতেই। ম্যাক্স হেবের সাহেব কথাটা ঠিকই বলেছিলেন যে, হিন্দু ধর্মের মধ্যে লৌকিক পুরুষকারের ঐহিক-সামাজিক দায়-দায়িত্বের ব্যাপারটা বর্ণাশ্রম প্রথা, কর্মফল ইত্যাদির চাপে লুপ্ত হয়েছে। অন্যদিকে heresy-র কালাপাহাড়ি বিদ্রোহী ধারাও সামাজিক

দায়দায়িত্ব অস্বীকার করে উন্মার্গগামী হয়েছে তান্ত্রিকের সাধনমার্গে। বৌদ্ধ-ধর্মের অপঘাত মৃত্যুতে ভারতবর্ষ বোধহয় একটা মৌলিক রূপান্তরের ঐতিহাসিক সুযোগ হারিয়েছিল। হিন্দুর ব্রহ্মণ্যতেজ তাই আজ গোলওয়লকর-ভক্তদের একচেটিয়া ব্যবসায়ের মূলধন, আর তান্ত্রিকের সাধনমার্গ আনন্দমার্গী খুনের কারবারের বহিরঙ্গে পরিণত। তবে, ভারতবর্ষের মতো প্রাচীন দেশে প্রতিক্রিয়ার মার্কিন যুদ্ধবিশারদদের তারিফ না করে পারা যায় না যে, তারা তাদের পক্ষে বেশ নির্ভুলভাবেই এই দুই সনাতনী ঐতিহ্যকে জিঘাংসাবৃত্তির কাজে লাগিয়েছে।

অথচ, বিগত কয়েকবছর উত্তর-ভারতে কিছুটা ঘুরে বেড়িয়ে এবং দিল্লী শহরে মাস্টারি করে বর্তমান লেখকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, সমগ্র হিন্দী ভাষাভাষী তল্লাটে জনসঙ্ঘর প্রবল প্রতাপের একটা সাংস্কৃতিক-নৈতিক ভিত্তি হল ভারতবর্ষের সমাজের বর্তমান ইলেক (Elite) যাঁরা তাঁদের বেসরম পণ্যরতি ও পশ্চিমী নকলিয়ানার বিরুদ্ধে শহুরে নিম্নমধ্যবিত্ত দোকানি, কেরানি আর গ্রামাঞ্চলের উঠতি সম্পন্ন জোতের মালিকদের প্রতিক্রিয়া। সে প্রতিক্রিয়ার তরুণ বাহনরা অবশ্যই ড্রেইন পাইপ, গো হত্যা নিবারণ আর হিন্দির জঙ্গীপনার এক অপরূপ সংমিশ্রণে গড়া। কিন্তু, আমি দেখেছি, কীভাবে জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে মার্কিনী ঢঙের ইংরেজিয়ানার এবং চরস-হাসিস-মদ ও যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার আবহাওয়ার বিরুদ্ধে শান্ত রুচিবোধসম্পন্ন বা কিছুটা "গেঁয়ো" ছেলেমেয়েদের প্রতিক্রিয়াকে জনসঙ্ঘ-রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অনুচররা বিবেকানন্দ-রামকৃষ্ণর নাম করে গুরুদীক্ষা ও সংযম সাধনার হাতছানি দিয়ে বিপথচালিত করে। এই প্রতিক্রিয়ার বাস্তবতাকে উড়িয়ে দিলে চলবে না। মনে রাখতে হবে, শুধু উত্তর-ভারতের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেই জনসঙ্ঘ-রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সভ্য ও সমর্থক সংখ্যা সরকারি হিসাব অনুসারেই (১৯৭২ সালে) ছিল ৩ লক্ষাধিক—অনায়াসেই ভারতের বৃহত্তম যুব-সংগঠন।

বেশিদিনের কথা নয়, কয়েক বছর আগেই আন্দোলনের লক্ষ্য ও পথ সম্পর্কিত আলোচনায় বৃদ্ধ পি. সি. জোশী নাকি বলতে শুরু করেছিলেন যে, ভারতের কমিউনিস্টদের খুঁজতে হবে ঐতিহাসিক যোগসূত্র নানক কবীর তুলসীদাস চৈতন্যের মরমী মানবিকতার উত্তরাধিকারের সঙ্গে। স্বদেশের জনজীবনে ও জনরুচির ঐতিহাসিক গভীরে বিপ্লবীর নৈতিক জীবনচর্যাকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে আসন্ন বিপর্যয়ে কিছুকালের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাওয়ার সম্ভাবনা নেহাৎ অমূলক নয়। হাতে সময়ও বেশি নেই।

ভারতবর্ষের মতো বিচিত্র ও সুপ্রাচীন দেশে এই উত্তরাধিকারের সূত্রসন্ধান ও তাকে সমকালীন জীবনে রূপায়ণের ক্ষমতা বর্তমান লেখকের সাধ্যাতীত। সে চেষ্টাও করব না। মৃতদের মধ্যে কোশাম্বী আর জীবিত বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে হয়তো গোপালদার (গোপাল হালদার) মতো দিগ্‌গজ পণ্ডিত যাঁরা দেশের ইতিহাস ভূগোল ভাষা সংস্কৃতি আমাদের মতো অর্বাচীনদের চেয়ে অনেক বেশি জানতেন—তাঁরা সময় থাকতে চেষ্টা করলে পারতেন। এখনো যেসব কথা আমরা ঘষা পয়সার মতো ব্যবহার করে থাকি, তারও অনেকটাই ওঁদেরই লেখা ও মুখের কথা থেকে ধার করা। কিন্তু, ব্যাপারটা শুধু ইতিহাস-সংস্কৃতির জ্ঞান ও গবেষণার অভাবের সমস্যা নয়। সমস্যাটা আসলে প্রত্যহের ব্যবহারিক প্রয়োগের, রাজনীতির নিত্যকর্মপদ্ধতির সমস্যা। বিজ্ঞজনেরা আজকাল যাকে ইংরিজি করে বলেন "Praxis"। রাজনীতির এই নিত্যকর্মপদ্ধতির আধার হিসেবেই ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের কথাটা উঠছে। রাজনীতি বলতে বামপন্থী রাজনীতি—মার্কসবাদের চৌহদ্দির মধ্যে। বছর তিরিশেক, কখনো সক্রিয় কর্মী কখনো-বা বেদনার্ত সহযাত্রী হিসেবে, বামপন্থী রাজনীতির তল্লাটের স্থায়ী আমরণ বাসিন্দা হিসেবে গোটাকতক কথা এই নিত্যকর্মপদ্ধতির বিষয়ে পেশ করতে চাই।

আমাদের অনেকেরই জীবনের অতীতের আলোআঁধারিতে হাতড়ালে কিছু নিজেদের অভিজ্ঞতা ও কিছু বাবা-কাকাদের মুখে শোনা বা তাঁদের দেখে অনুভব করা স্মৃতির সূত্র ধরে দুই ধরনের চরিত্রের দিকে নজর যাবে: (ক) বিশ-ত্রিশের দশকে গান্ধীজীর ডাকে যে হাজার হাজার ইংরিজি শেখা "ভদ্রসন্তান" সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, স্কুল গড়েছিল, আর্তত্রাণ ও দরিদ্রের সেবায় সারা জীবন উৎসর্গ করেছিল; (খ) ত্রিশ-চল্লিশের দশকে বামপন্থীদের মধ্যে আইনী কংগ্রেস-সোশ্যালিস্ট পার্টি ও গোড়ার দিকের বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির যে শত শত কর্মী অপরিসীম দুর্যোগ, দুঃখ-দারিদ্র্য ও শারীরিক কষ্ট স্বীকার করে শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে প্রথম গণসংগঠনগুলির সূত্রপাত করেছিল।

দধীচির মতো এই সব চরিত্রের ভগ্নাবশেষ এখনো আশে পাশে দেখা যায়। কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভিন্ন অংশের মধ্যেও এরকম চরিত্র বেশ কিছু এখনো আছেন; হয়তো কিছুটা কাতর ও বিভ্রান্তভাবেই তাঁরা জীবনের বাকি কটা দিন পার করে দেওয়ার প্রতীক্ষাতেই কাল যাপন করছেন। জনসাধারণের মধ্যে গ্রামে বস্তিতে কর্মরত এই লুপ্তপ্রায় মানুষগুলি, গান্ধীবাদী মার্কসবাদী

নির্বিশেষে, আমাদের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ; ধরুন মৈমনসিংহ জেলার মণি সিং—পূর্ববাঙলা বা বাঙলাদেশের প্রিয় "মণি মহারাজ"—যার একটি সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পশ্চিম বাঙলাতেও এরকম কিছু যাদুঘরের উপযোগী চরিত্র আছেন, তাঁদের বিব্রত করতে চাই না বলে নাম করছি না।

এঁরা যে যাদুঘরের উপযোগী চরিত্র হয়ে গেলেন, এইটাই স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগের রাজনীতির মৌলিক বিপথগামিতার লক্ষণ। স্বর্গত অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু একসময়ে ভারতীয় সমাজে "সন্ন্যাসী" চরিত্রের নিগূঢ় তাৎপর্যের কথা লিখতেন ও বলতেন। গান্ধীজীর প্রবল আবির্ভাবের অন্তরালে ভারতীয় সমাজের অন্তরস্থ অগ্নির যে রূপ সন্ন্যাসীর "ideal type"-এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, তার অন্তর্লীন ভূমিকার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করাই নির্মলবাবুর উদ্দেশ্য ছিল। দা-ঠাকুর, ধনঞ্জয় বৈরাগী থেকে 'ডাকঘর'-এর ফকির আর 'রক্তকরবী'র বিশু পাগল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের একটি স্থায়ী মৌল স্বর এই "ideal type"-কে ভর করেই প্রকাশ পেয়েছে। বহুকাল বাদে, স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে, মৌলিক ভ্রান্তি সত্ত্বেও, ওড়িশা-অন্ধ্রপ্রদেশের প্রান্তদেশে নাগভূষণ পট্টনায়কের মতো চরিত্রের ধূমকেতুর মতো আবির্ভাবে চমকিত হয়ে স্মরণ করতে হয় ভারতীয় সমাজের অন্তরস্থ সেই অগ্নির দুর্মর ঐতিহাসিক তাৎপর্য। এই "সন্ন্যাসী" সমাজের ভিতরে থেকেও সম্পূর্ণ বাইরের লোক, কারণ কোনো স্বার্থসূত্রের টানে সে ধরা পড়ে না, অথচ সে সংসারী মানুষের অনন্ত দৈনন্দিন লীলার পরম রসিক, পথের ধূলার লোকায়তে তার বাস, দেবতাদের তর্জনি ও সর্দারদের ছড়ির সংকেত সে গায়ে মাখে না, অচলায়তনের কারাগারে মুক্তধারার বান ডেকে নিয়ে যেতে তার পরম উৎসাহ, ডাণ্ডা-বেড়ি পরিয়েও তার আনন্দের উৎসমুখ বন্ধ করা যায় না।

বিশ-ত্রিশের যুগের জনজোয়ারে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের প্রথম অর্গল-মুক্তির সময়কার অনেকটা স্বতঃস্ফূর্ত সেই নৈতিক আবেশের পুনরুজ্জীবন আজ নিতান্ত প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক কার্যক্রমের সজ্ঞান নিত্যকর্মপদ্ধতিতে। ফ্যাসিবাদের সমাসন্ন দুর্যোগের বিরুদ্ধে লড়াইতে নয়তো জেতা যাবে না। ভালো করে লড়াই শুরু করাই যাবে না। নগুয়েন খাক ভিয়েন বলেছিলেন, যাত্রারম্ভের সময় থেকেই (১৯৩০ সালে ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির পত্তন হয়) পশ্চিমের বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাপুষ্ট "থুদে বিয়ান"রা ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে মিশে গিয়েছিল ভিয়েতনামের দরিদ্রতম শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে। তাঁরই ভাষায় বললে, এই "কলমহাতে কুলি"-রা শহরে রিকসা টেনেছে, খনিতে কোদাল

চালিয়েছে, গ্রামের চাষীর সঙ্গে বুকজলে দাঁড়িয়ে বাঁধ বেঁধেছে; তবেই না আমেরিকানরা যখন জল আর মাছ আলাদা করতে চাইল, তখন দেখল জাল ফেলে লাভ নেই, জলটাকেই শুষে বার করে নিতে পারলে তবে মাছগুলো ধরা পড়বে। গ্রামকে গ্রাম উৎখাত করে কৃষক-জনতার জল থেকে কমিউনিস্ট মাছকে আলাদা করার ব্যর্থ চেষ্টা তাই করতে হয়েছিল। সেই পরীক্ষা আমাদেরও দিতে হবে। ফ্যাসিবাদের সঙ্গে লড়াইয়ে নৈতিক বলে প্রাথমিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন না করতে পারলে জেতবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

আর এইখানেই বর্তমানে ভারতের মূলত শাসনযন্ত্রনির্ভর ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতার প্রধান দুর্বলতা। দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার তুলনায় শাসনযন্ত্রের বর্তমান কর্ণধারদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব স্বত প্রতীয়মান নয়। যতক্ষণ না সেই চারিত্র শাসনযন্ত্রের কর্ণধাররা সমবেতভাবে অর্জন করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাপক জনসাধারণ এই লড়াইয়ে অংশীদার হবে না, মনে মনে সহানুভূতি থাকলেও কার্যত নিরপেক্ষ থেকে যাবে। আর তারা নিরপেক্ষ রয়ে গেলে শাসনযন্ত্রনির্ভর ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতা পঙ্গু ও ভঙ্গুর হতে বাধ্য। তাতে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা, যে ধরনের বিপদ দেখা গিয়েছে সম্প্রতিকালে অগণিত সদ্যস্বাধীন দেশে—ঘানা, মিশর, চিলি থেকে মালাগাসি, বাঙলাদেশ পর্যন্ত।

জগাখিচুড়ি মধ্যবিত্তপ্রধান তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এই আর-এক বিপদ ঃ রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্রের আপেক্ষিক স্বয়ংক্রিয়তা, আপাতদৃষ্টিতে শ্রেণীনিরপেক্ষ ভাবগতিক। এরই ফলে একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপে এই শাসনযন্ত্র যথেষ্ট সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা অবস্থাবিশেষে গ্রহণ করতে পারে, আবার তেমনিই বেশ অনায়াসেই খুব একটা মৌলিক ওলটপালট না করেও কড়া সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রশাসনের জায়গায় তাঁবেদার প্রশাসন চালু করে দেওয়া যায়। ঘানা, ইন্দোনেশিয়া, চিলি থেকে মিশর, বাঙলাদেশ পর্যন্ত এই ঘটনা বার বার প্রত্যক্ষ করেছি আমরা বিগত কয়েক বছরে। এরই ফলে রাষ্ট্র ও শাসনযন্ত্র হয়ে পড়ে অতিমাত্রায় ব্যক্তিনির্ভর। আর তখন, মাত্র একটি লোককে জখম করার অপেক্ষাকৃত সহজ কাজটা মার্কিন যুদ্ধবিশারদরা বেশ অনায়াসেই হাসিল করতে পারে। এইটিনথ ব্রুমেয়ারের সঙ্গে একটা আপাত-সাদৃশ্য এইখানেই। মার্কস বলেছিলেন, লুই বোনাপার্ত-এর রাজত্বকালে কিছুদিনের জন্য ফরাসী দেশে মূলত পেটিবুর্জোয়া কৃষিনির্ভর অংশবিশেষের প্রাধান্য ও ধনিকশ্রেণীর মধ্যে তীব্র অন্তর্বিরোধের ফলে রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থা

এক ধরনের স্বয়ংক্রিয় শ্রেণীনিরপেক্ষ আপাতস্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিল। অধ্যাপক কে. এন. রাজ সম্প্রতি লুই বোনাপার্ত-এর যে কৃষি-কার্যক্রম আবিষ্কার করেছেন, তাতেও একই কথা প্রমাণিত হয়। কিন্তু, মার্কস পরে একথাও বলেছেন যে, রাষ্ট্রের এই আপাত-শ্রেণীনিরপেক্ষ স্বয়ংক্রিয়তার আড়ালে ওই সময়ে ফরাসী ধনতন্ত্র আসলে একটা দ্রুততর পুঁজিসঞ্চয়ের যুগে প্রবেশ করে। সম্ভবত, এই কথা মনে রেখেই বিজ্ঞজনেরা বলেন যে, ভারতবর্ষেও একটা চলনসই গোছের কর্মক্ষম ধনতন্ত্র গড়ার জোড়জোড় চলছে—তারই নাম জরুরি অবস্থা। সে ধনতন্ত্র পরিবহন বিদ্যুৎশক্তি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহব্যবস্থা ইত্যাদি একটা ন্যূনতম কর্মদক্ষতা অর্জন করবে।

শাসকবর্গের অনেকেরই যে জরুরি অবস্থা থেকে এইরকম একটা সুযোগ নেওয়ার অভিলাষ আছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু, মনে রাখতে হবে, লেনিন যখন ফেব্রুয়ারি বিপ্লবোত্তর রুশ রাষ্ট্রের উপর সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিভিন্ন সুড়ঙ্গপথের কথা লিখেছিলেন তখন তিনি জ্বালানি, পরিবহন ও খাদ্যব্যবস্থা (fuel, transport and food) এই তিনদিক থেকে রুশ অর্থনীতিকে অচল করে দেওয়ার সাম্রাজ্যবাদী অপচেষ্টার কথা বলেছিলেন। হাতের কাছে ইন্দোনেশিয়া ও চিলির উদাহরণ তো রয়েইছে, সেখানে কল্পনাতীত মুদ্রাস্ফীতি, খাদ্যব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিকল পরিস্থিতি ও পরিবহণব্যবস্থায় অরাজকতা এই ত্রিমুখী আক্রমণের দ্বারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কাজ হাসিল করে। কাজেই, খাদ্য ও বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং পরিবহনব্যবস্থার প্রশাসন—যার বেশির ভাগই রাষ্ট্রায়ত্ত—যদি গত কয়েক বছরের অরাজকতা কাটিয়ে উঠতে পারে, তবে তার তাৎপর্য শুধু চলনসই গোছের ধনতন্ত্র গড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। তৃতীয় বিশ্বের যে-কোনো দেশে যে-কোনো অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কের নিরিখে বিচার না করার মতো মূর্খতা আর কিছু হতে পারে না। আবার, এ কথাও ঠিক যে বর্তমান শাসকবর্গের মধ্যে যাঁরা জরুরি অবস্থাকে স্রেফ প্রশাসনিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখতে চান, গণউদ্যোগের অর্গলমুক্তি ঘটতে দিতে চান না, তাঁরা শেষপর্যন্ত চলনসই ধনতন্ত্র গড়ার নামে দেশটাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতেই তুলে দেবেন। "কর্মক্ষম ধনতন্ত্র" ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অনেকটা সোনার পাথরবাটির মতো বস্তু। কোনোদিন হবার নয়।

কিন্তু যেটা নিশ্চয়ই হতে পারে, সেটা হল অপেক্ষাকৃত কর্মক্ষম রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনীতি। অধ্যাপক কালেস্কি যখন "অন্তর্বর্তী শাসনব্যবস্থা"র কথা লিখে-

ছিলেন, তখন তিনি এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর মধ্যবিত্ত ও সম্পন্ন জোতের মালিকশ্রেণীসমূহের প্রভাবের ফলে, ধনতন্ত্রের আপেক্ষিক্ষ দুর্বলতার দরুণ, বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সাহায্যে রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনীতির বিকাশের পথ এই সব দেশগুলির সামনে খোলা আছে। কিন্তু, আবার একই কারণে, এই সব দেশের প্রশাসনব্যবস্থায় স্থিতিশীলতার একান্ত অভাব, এবং বিশেষত ফৌজিব্যবস্থার উপর সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবের ফলে যে-কোনো সময়ে তার সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল দিকে ঝুঁকে পড়ারও সম্ভাবনা থাকে। সে কথাও অধ্যাপক কালেস্কি স্পষ্টভাষায় বলে গিয়েছিলেন। আমাদের দেশে নিশ্চয়ই বিপুল প্রশাসনিক কাঠামোর অন্তর্নিহিত পশ্চিমী নকলিয়ানা—যার অংশীদার প্রায় সমগ্র শিক্ষিত সমাজ—আর-একটা বিপজ্জনক দুর্লক্ষণ। ভারতবর্ষের ধনতন্ত্রও তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো অতো দুর্বল নয়। একই কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনীতিকে কেবলমাত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্বারা কর্মক্ষম করে তোলা যাবে না, যদিও এই বিপুল ব্যয়বহুল প্রশাসনকে ন্যূনতম দায়িত্বপালনে বাধ্য করতেই হবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনীতি ক্ষেত্রে ও বিপুল গ্রামসমাজের প্রান্তরে—উভয় ক্ষেত্রেই ধনতন্ত্রের আপেক্ষিক দুর্বলতার ফলেই—সাম্রাজ্যবাদকে সম্মুখসমরে হারিয়ে দেওয়া সম্ভব, যদি এই দুই অংশে কর্মরত শ্রমজীবীর শক্তিকে স্বাবলম্বী সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ করা যায়, যে সংগঠন কেবল "দাবি আদায়" করার তালেই ঘুরবে না, উপরন্তু উৎপাদনব্যবস্থার উপর স্বাধীন হস্তক্ষেপেরও পথ তৈরি করবে। গত দুই বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত কারবারে যে উন্নতি ঘটেছে, তার পিছনেও কেবল প্রশাসনিক ব্যবস্থা নয়, ফতোয়া নয়, প্রশাসন ও শ্রমিকের মধ্যে নতুন ধরনের সম্পর্ক-চয়নের প্রচেষ্টার উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। ভারত হেভি ইলেকট্রিকালসের মতো দেউলে প্রতিষ্ঠানের সাম্প্রতিক চমকপ্রদ পুনরুজ্জীবনের ইতিহাস এই নতুন ধরনের সম্পর্ক-চয়নেরই উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

কিন্তু, সমগ্র রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে, বিশেষত গ্রামীণ অর্থনীতিতে, ব্যাপক গণ-উদ্যোগ সংগঠিত করার প্রাথমিক শর্ত বামপন্থী আন্দোলনের নৈতিক পুনরুজ্জীবন। বিশেষত পশ্চিম বাঙলার ক্ষেত্রে এই শর্ত পূর্ণ না হলে ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামের কোনো অর্গলমুক্তিই সম্ভব নয়। কারণ পশ্চিমবাঙলা হল সেই প্রদেশ যেখানে দেশের লোকের সামনে আসতে হলে সব দলকেই অল্পবিস্তর বামপন্থী সাজতে হয়, সেই প্রদেশ যেখানে বামপন্থীদের উপর দেশের লোক অগাধ আস্থা স্থাপন করে

হতাশ হয়েছে, সেই প্রদেশ সেখানে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির প্রভাব ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশি, সেই প্রদেশ যেখানে কর্কট রোগের মতো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরাঞ্চল রয়েছে—যে শহরের সংকট সমগ্র পূর্বভারতের আর্থিক সামাজিক সংকটের দায়ভাগ বহন করছে, যে শহর সম্প্রতিকালে মার্কিন আন্তর্জাতিক গুপ্তচরবৃত্তিরও অন্যতম প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। আবার পশ্চিমবাঙলা হল সেই প্রদেশ যেখানকার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সংস্কৃতি উৎপাদনব্যবস্থা থেকে সবচেয়ে বেশি বিচ্ছিন্ন—পাঞ্জাব-হরিয়ানা-মহারাষ্ট্রের পৌর ও রাজ্যশাসনব্যবস্থার সঙ্গে পশ্চিমবাঙলার পৌর ও রাজ্য শাসনব্যবস্থার তুলনা করলে সে তফাৎটা স্পষ্টই ধরা পড়ে। পশ্চিমবাঙলার মতো অপদার্থ, সম্পূর্ণ উদ্যোগবিহীন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অলস মানসিকতায় আচ্ছন্ন প্রশাসনব্যবস্থার জুড়ি সারা ভারতে মেলা দুষ্কর। সম্প্রতি শিক্ষাব্যবস্থার গরিমাটুকুও ধুলায় বিলুণ্ঠিত।

বামপন্থী আন্দোলনের সম্পূর্ণ নবরূপায়ণ ও পুনরুজ্জীবন ব্যতিরেকে পশ্চিমবাঙলার সংকটমুক্তির, ফ্যাসিবাদের আসন্ন দুর্যোগমুক্তির কোনো সম্ভাবনাই নেই। তারও প্রাথমিক শর্ত সমগ্র বামপন্থী আন্দোলনের নির্মম প্রকাশ্য নৈতিক আত্মসমীক্ষা—সমষ্টিগত এবং ব্যক্তিগত। কেউ বাদ যাব না। সেই সমুদ্রমন্থন থেকে হলাহল অনেক উঠবে—ওঠা দরকার—তবে কিছু অমৃতও উঠবে। সে প্রক্রিয়া শুরু হলে দেখবেন সেই সব দধীচি চরিত্র যাঁরা অবান্তর হয়ে গেছেন, তাঁদের বুড়ো হাড়ে আবার বিদ্যুৎ খেলছে—সে বিদ্যুৎ সমগ্র যুবসমাজকে আবার মাতিয়ে দেবে। মনে রাখা দরকার এই যুবসমাজেরই একটা বিরাট অংশ গত পাঁচ বছরে শুধু হত্যাই করে নি, খুনও হয়েছে। ডাণ্ডা-বেড়ি পরে হাজারে হাজারে কয়েদখানায় রয়েছে, ভ্রান্ত পথে হলেও সমাজ-পরিবর্তনেরই মহত্তম আদর্শের তাড়নায় বলি হয়ে যেতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নি। নির্মম ও প্রকাশ্য আত্মসমীক্ষা ছাড়া এদের আস্থা অর্জন করা যাবে না। আর, তা না হলে যুগ-সন্ধিক্ষণের সব অর্গলমুক্তিও ঘটবে না।

---

* এই প্রবন্ধের কিছু সিদ্ধান্ত ও বক্তব্য সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ আছে। রচনাটি সম্পর্কে আমরা পাঠকদের লিখিত মতামত আহ্বান করছি।—সম্পাদক

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চাশ বছর
পূর্তি উপলক্ষে দশ টাকা হারে ডিসেম্বর
'৭৫ পর্যন্ত গ্রাহক করা হচ্ছে।

প্রাপ্তিস্থান

মনীষা গ্রন্থালয় (প্রা.) লি.
৪/৩ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০১২

পরিচয়

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রাবণ ১৩৩৮

৪৫

পরিচয়

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট ১৯৩১

॥ সম্পাদকীয় দপ্তর ॥
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

॥ ব্যবস্থাপনা দপ্তর ॥
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২

দাম ঃ পাঁচ টাকা
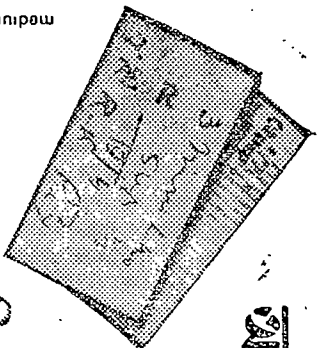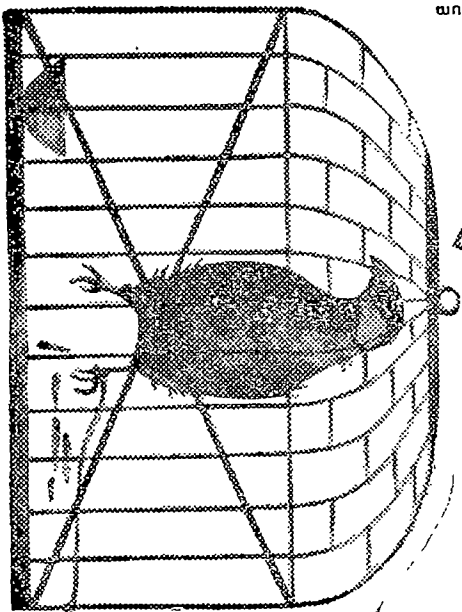
অস্বস্তি আর দুশ্চিন্তার
হাত থেকে বাঁচুন
নিজের সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করুন।
অন্যের নামে সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করে হয়ত সময়ে সময়ে পার পেয়ে গেলেন। কিন্তু অস্বস্তি আর দুশ্চিন্তায় কণ্টকিত এই বেনামী ভ্রমণের কথা নিশ্চয়ই আপনি মনে রাখতে চাইবেন না। যে কোন সময়েই তো ধরা পড়তে পারতেন। ঝঞ্ঝাটের শেষ থাকত না।
পুরো ভাড়া এবং জরিমানা, মাঝ পথেই বাধ্য হয়ে নেমে যাওয়া; ২৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা তিনমাস পর্যন্ত হাজত বাস; ভাগ্য খারাপ হলে হয়ত দুই-ই একসঙ্গে।
অথৈ জলে শুধু শুধু ঝাঁপ দিতে যাবেন কেন? মান-সম্মানের প্রশ্নও তো রয়েছে। পূর্ব রেলওয়েতে অন্যের সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করতে গিয়ে প্রতিদিন অসংখ্য লোক ধরা পড়ছেন।
টাকা দিয়ে ঝঞ্ঝাট পোয়াবেন না। অনুমোদিত সংস্থা থেকেই শুধু আপনার টিকিট কিনবেন।
পূর্ব রেলওয়ে
medium

পরিচয়

বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ৬-৭ পৌষ-মাঘ ১৩৮২ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬

সূচীপত্র

পরিচয়

প্রচ্ছদপট : বিশ্বরঞ্জন দে

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস,

৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড,

কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

কুষাণ সভ্যতা ও বিশ্বসংস্কৃতি

আচার্য ব. জ. গফুরভ
সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান অকাদমির
প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর

মনুষ্যজাতির ইতিহাসে বহু অধ্যায় আমাদের মধ্যে এই স্থির বিশ্বাস জন্মায় যে অতীতে প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের মধ্যে অনেক ফলপ্রসূ সংযোগ ছিল। যে সব পৃষ্ঠা নানা কারণে এখনো অবগুণ্ঠন খোলে নি কিংবা অস্পষ্ট রয়েছে সেগুলোর পুনরুদ্ধার ও ব্যাখ্যা আমাদের লক্ষ্য।

ভারত, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, মধ্য-এশিয়া ও ইরানের ইতিহাসে কুষাণ আমলের এক বিশেষ স্থান রয়েছে। কিন্তু কুষাণ যুগে প্রাচ্যের এবং সমগ্রভাবে পৃথিবীর ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক প্রগতিতেও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, একটি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছিল, ভিন্ন নৃকুলগত পটভূমি ভাষা সংস্কৃতি ও ধর্মের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির একীকরণ। দু-হাজার বছরেরও আগে মধ্য-এশিয়া, উত্তর-ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরান একটি মাত্র রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মধ্যে মিলিত ছিল। এই পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল আরল সাগর থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত এবং সেই যুগের অপর তিনটি রাষ্ট্রশক্তি—রোম, পার্থিয়া ও চীন—এদের সঙ্গে এক পংক্তিতে তার স্থান ছিল এবং তা প্রাচীন পৃথিবীর রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি হিসেবে বিরাজ করছিল।

বিশ্ব-ইতিহাসের কাহিনীতে কুষাণ আমল শুধুমাত্র প্রাচ্যের বহুজাতির মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্যের একটি যুগ বলেই লিপিবদ্ধ ছিল না, এটি ছিল প্রাচ্যের এবং বিশ্বসভ্যতারও সাংস্কৃতিক বিকাশের এক নতুন স্তর, এমন এক কালপর্ব যখন পরবর্তী যুগগুলিতে সাংস্কৃতিক শ্রীবৃদ্ধির দৃঢ় বনিয়াদ রচিত হয়েছিল।

একই সময়ে কুষাণ আমল ছিল ভারত, আফগানিস্তান, মধ্য-এশিয়া, পাকিস্তান, ইরান ও অপর একাধিক দেশের জাতিগুলির বিকাশের এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফল। এই দেশগুলির প্রতিটিই আগে ছিল বড় বড় রাষ্ট্রসংগঠনের অংশ। মৌর্য সাম্রাজ্য ভারতের বৃহত্তম অংশ ও আফগানিস্তানে কিছু অঞ্চল সহ

এক বিরাট ভূখণ্ড জুড়ে বিস্তৃত ছিল। তা ছাড়া ছিল আকিমিনীয় ও পার্থীয় রাজ্য। এমনকি আকিমিনীয় যুগেও মিশর ও ইজিয়ানা সাগর তীরের গ্রীক নগরগুলি থেকে শুরু করে মধ্য-এশিয়ার স্তেপভূমি ও সিন্ধুনদ বরাবর এলাকাগুলি পর্যন্ত বহুজাতি ও দেশ একটি রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে ঐক্যবদ্ধ ছিল। লিখিত সূত্রে বিধৃত নানা তথ্য এবং প্রচুর পুরাতাত্ত্বিক মালমশলা আকিমিনীয় যুগে এই বিশাল এলাকার জাতিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের নৈকট্যের সাক্ষ্য বহন করছে। ইরান, মধ্য-এশিয়া, আফগানিস্তান এবং পার্শ্ববর্তী ভারত ও পাকিস্তানের অঞ্চলগুলির জাতিসমূহের সংস্কৃতির এই সাযুজ্য একটি বিশেষ প্রকৃতির ছিল। তারা যে বহু অভিন্ন নৃকুলগত ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল এবং আকিমিনীয় যুগের আগে তারা যে যোগাযোগ বজায় রেখেছিল সেটিই এর কারণ।

কুষাণ রাজ্যের প্রথম নিউক্লিয়স ছিল ব্যাকট্রিয়া। যাযাবর বিজাতিগুলি যখন এখানে এসে হাজির হয়েছিল (খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে), সে সময়ের আগেই ব্যাকট্রিয়ার ছিল উন্নত রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। এই যাযাবর উপজাতিগুলির মধ্য থেকেই সম্ভবত কুষাণ রাজবংশের উদ্ভব ঘটেছিল। ব্যাকট্রিয়ার ভূখণ্ডে এবং মধ্য-এশিয়া ও আফগানিস্তানের অঞ্চলগুলিতে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের আবির্ভাব এবং প্রথম রাষ্ট্রসংগঠনের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল প্রাক্-আকিমিনীয় যুগে। বিপুল পরিমাণ মালমশলা পরীক্ষা করার পর সোভিয়েত পুরাতাত্ত্বিকগণ খ্রীষ্টপূর্ব এক সহস্রাব্দের অনেক আগে মধ্য-এশিয়ার একাধিক জেলায় সে-সময়কার পক্ষে এক সু-উন্নত স্থায়ী বসতকারী কৃষকদের সংস্কৃতির অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন।

সেই সহস্রাব্দের প্রথম শতকগুলিতে উৎপাদনের বিভিন্ন শাখায় উৎপাদক শক্তিগুলির অধিকতর বিকাশ ঘটেছিল: বেশ বড় আকারে লোহাগালানোর কৃৎকৌশল আয়ত্ত হয়েছিল; যে-কৃত্রিম সেচব্যবস্থা ইতিমধ্যেই মধ্য-অঞ্চলের বহু এলাকায় কৃষির ভিত্তি সৃষ্টি করেছিল—তার প্রকৃতি বদলেছিল এবং জটিল সেচব্যবস্থা নির্মিত হচ্ছিল। প্রাকার ও প্রাসাদ ধরনের অট্টালিকা সমন্বিত বড় বড় বসতি কাছাকাছি ও এই সেচব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে গড়ে উঠেছিল। এইসব অট্টালিকা কাঁচা ইট বা মাটির তৈরি কৃত্রিম পাটাতনের উপর নির্মিত হত। খ্রীষ্টপূর্ব নবম ও সপ্তম শতকে মারজিয়ানায় (ইয়াজ তেপে ও আরাবলী তেপের শহরগুলির মরূস্থানে), উত্তর-পার্থিয়ায় (ইয়েলকেম তেপে) ও অন্যত্র নিশ্চিতভাবেই এ ধরনের বসতি ছিল। এমন হতে পারে একটি কালপর্বে অন্যান্য অঞ্চলে প্রাচীরঘেরা বসতিগুলির আবির্ভাব ঘটেছিল। ব্যাকট্রিয়ায় প্রাপ্ত

মালমশলা থেকে এরূপ অনুমান করা সম্ভব হয়েছে যে, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের আগে সেখানে এক নাগরিক সভ্যতার আবির্ভাব হয়েছিল। উত্তর-ব্যাকট্রিয়ার ভূখণ্ডে তেরমেজের কাজে কুচুক তেপেতে নতুন খননকার্যের ফলে প্রাচীরঘেরা প্রাসাদ ধরনের বসতির অবশেষ লোকলোচনে এসেছে ; এ ধরনের বসতির অস্তিত্ব ছিল খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের গোড়ার দিকে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের অনুরূপ প্রক্রিয়া ঘটছিল সংলগ্ন আফগানিস্তানের জেলাগুলিতে—যার সাক্ষ্য মেলে নাদ-ই-আলি ও অন্যত্র খননকার্য থেকে। উল্লেখ করা দরকার যে, মার্ভ (গিয়াউর-কালা), সমরখন্দ (প্রাচীন লেখকদের দ্বারা বর্ণিত মারাকান্দা : আফ্রাসিয়ার খননকার্যস্থল), এবং দক্ষিণ-ব্যাকট্রিয়ার ব্যাকট্রা (বলখ্)—পরবর্তী যুগে যে শহরটি মধ্য-এশিয়ার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল—প্রভৃতি শহর প্রাকার-সমন্বিত বৃহৎ জনপদ হিসাবে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকেও বিদ্যমান ছিল।

অন্য কোনো কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ সহ বৃহৎ সেচব্যবস্থার নির্মাণ এবং প্রাকার ও প্রাসাদ ধরনের অট্টালিকাসমন্বিত বৃহৎ দুর্গের ন্যায় সুরক্ষিত জনপদগুলির আবির্ভাবের তারিখ এই আভাস দেয় যে, মধ্য-এশিয়ায় বহু অঞ্চলের ইতিহাসে নবম-ষষ্ঠ শতকের কালপর্বটিতে একটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ও সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রাষ্ট্রযন্ত্র গঠিত হয়েছিল।

পুরাতাত্ত্বিক তথ্যাদি থেকে লিখিত সূত্রগুলির সাক্ষ্যের পূর্ণ মূল্যায়ন করা সম্ভব হচ্ছে যার ফলে প্রাক-আকিমিনীয় আমলে মধ্য-এশিয়ার বৃহৎ রাজনৈতিক জোটগুলির অস্তিত্বের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করা যায়। সম্ভবত এগুলির একটির অন্তঃপাতী ছিল খোরেজ্‌ম থেকে পার্থিয়া ও আরেয়া (জেরাত জেলা) পর্যন্ত ভূখণ্ড। অপর এবং স্পষ্টই দৃঢ়তর সংগঠনটি ছিল ব্যাকট্রিয়াকে কেন্দ্র করে, মার্জিয়ানা ও সম্ভবত সোগদিয়ানা এর অন্তঃপাতী ছিল। আকিমিনীয় যুগে আকিমিনীয় রাষ্ট্রের পূর্ব-অঞ্চলগুলির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাকট্রিয়া এক নেতৃস্থানীয় অবস্থান গ্রহণ করেছিল। এ কথা তর্কাতীত যে, ব্যাকট্রিয়া এই সম্মানভোগী হয়েছিল বহুল পরিমাণে তার উচ্চস্তরের বিকাশের দরুন এবং পূর্ববর্তী যুগে সে যে মর্যাদা অর্জন করেছিল তার দরুন। স্পষ্টতই একই কারণে ব্যাকট্রিয়া ছিল প্রাচ্যে গ্রীক রাষ্ট্রশক্তির প্রধান কেন্দ্র এবং অতি শিগগীরই এক স্বাধীন গ্রীক ব্যাকট্রীয় রাজ্য হিসেবে গড়ে উঠেছিল।

কাজেই খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে যে উপজাতিগুলি ব্যাকট্রিয়ায় এসেছিল তারা মুখোমুখি হয়েছিল এক অতি উন্নত সভ্যতার, সরকার চালনার সুদৃঢ় স্থানীয়

প্রথার, এই বিকশিত অর্থ-ব্যবস্থার এবং এক মৌলিক সংস্কৃতির। এই অবস্থায় নবাগতরা নিজেরা তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে দ্রুত প্রগতিসাধন করেছিল এবং গঠিত হয়েছিল এক নতুন রাজনৈতিক সংঘ। এই সংঘ হয়ে উঠেছিল তৎকালের অন্যতম বিশ্বশক্তি কুষাণ সাম্রাজ্যের নিউক্লিয়স।

এই নতুন উপজাতিগুলির উৎস ও ব্যাকট্রিয়ায় তাদের আবির্ভাব আজও পর্যন্ত অস্পষ্ট। তবে, সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ায়, বিশেষ করে দক্ষিণ-তাজিকিস্তানে অর্থাৎ প্রাচীন ব্যাকট্রিয়ার ভূখণ্ডে সোভিয়েত পুরাতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধানের কল্যাণে প্রাক-কুষাণ আমলে ব্যাকট্রিয়ায় আগত যাযাবর উপজাতিগুলির বসতি করার কিছু কিছু দিক সম্পর্কে আজকে অধিকতর নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে। কুরগান সমাধিগুলির (বিশেষ করে বিশকেন্ত উপত্যকা) খননকার্য থেকে প্রমাণ হয়েছে যাযাবরদের বড় বড় গোষ্ঠী (পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে দেখা যায় এরা সবে থিতু হয়ে বসেছিল) খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের শেষ দিকে কৃষি-এলাকাগুলির বাইরে বসবাস করত। এ থেকে স্পষ্টই আমরা বুঝতে পারি, যাযাবর আগন্তুকরা কৃষি-মরূদ্যানগুলিতে অনধিকার প্রবেশ করতে চায় নি। আমরা আরও জানি যে, এই যাযাবর গোষ্ঠীগুলি আমুরিয়ার নিকটে এবং উত্তর ও দক্ষিণ ব্যাকট্রিয়ার মধ্যে সীমানায় আমুদরিয়ার ধারে বাস করত।

এই ধরনের তথ্যাদির বিশ্লেষণ থেকে কুষাণ রাজত্ব গড়ে ওঠার আগে পর্যন্ত ব্যাকট্রিয়ার ভূখণ্ডে যাযাবরদের রাজনৈতিক ভূমিকার সাক্ষ্য মেলে এবং সেখানে অনেকদিন থেকে বসবাসকারী জনসমষ্টির সঙ্গে তাদের সম্পর্কের প্রকৃতির চিত্র পাওয়া যায়।

শত শত সহস্র সহস্র বছর ধরে কৃষিজীবী অঞ্চলগুলির এবং যাযাবর উপজাতিগুলির এলাকায় সহাবস্থান ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা মধ্য এশিয়ার এবং প্রাচ্যের অন্য বহু দেশের ঐতিহাসিক বিকাশের একটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত লক্ষণ। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের আগে মধ্য-এশিয়ার দক্ষিণে কৃষিমরূদ্যানগুলির প্রসার যে-যুগটিতে ঘটেছিল, তৎসম্পর্কিত পুরাতাত্ত্বিক মালমশলা এইসব মরূদ্যানের অধিবাসী ও স্তেপভূমির আধা যাযাবর পশুপালনকারীদের মধ্যে জীবন্ত যোগা-যোগের সাক্ষ্য বহন করছে। পরবর্তী কালপর্বের লিখিত সূত্রগুলি যাযাবর এবং বসতকারী চাষীদের মধ্যে বিরোধ ও সংযোগের বহু স্পষ্ট উদাহরণ যোগাচ্ছে।

একথা সত্যি, দুটি জগতের মধ্যে সম্পর্কের ইতিহাস নানা বিয়োগান্তক ঘটনায়—যেমন লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে হানা, হত্যালীলা, বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সম্পদের বিনাশ প্রভৃতিতে পূর্ণ। কিন্তু আমাদের অবশ্যই ভুললে চলবে না যে,

যাযাবর এবং বুদ্ধিজীবী উপজাতি ও জাতিগুলির মধ্যেকার সংযোগের বহু কল্যাণকর পরিণতিও হয়েছিল। তাদের সংস্কৃতির পারস্পরিক সমৃদ্ধি ঘটেছিল, অর্থনৈতিক জ্ঞান-অভিজ্ঞতার বিনিময় হয়েছিল এবং প্রায়শই এই সংযোগের আওতাধীন দেশ ও এলাকাগুলিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশে নতুন নতুন আর প্রগতিশীল প্রক্রিয়ার জন্ম হয়েছিল।

উদাহরণস্বরূপ স্মরণ করা যেতে পারে মধ্য-এশিয়ার প্রধান কৃষি-অঞ্চলগুলিতে শ্রেণীভিত্তিক সমাজ ও প্রথম রাষ্ট্রতন্ত্রগুলির প্রতিষ্ঠা সন্নিহিত স্তেপভূমি থেকে এইসব এলাকায় প্রবেশ বা "জয়"-এর সঙ্গে মিলে গিয়েছিল (এই ঘটনাকে মধ্য-এশিয়ার দক্ষিণাংশের উপর "বর্বরদের অধিকারের কালপর্ব" বলা হয়ে থাকে)। একই জিনিস পরিলক্ষিত হয়েছিল ব্যাকট্রিয়ার আদি ইতিহাসে, সেখানে নিশ্চয়ই সপ্তম-ষষ্ঠ শতকে রাষ্ট্রতন্ত্রের আদি রূপটির অস্তিত্ব ছিল। একথা জানা আছে সেই সময়ে পূর্ব-ইরানীয় শক উপজাতিগুলি পামিরের মালভূমিতে ও ভারতের সীমান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। দক্ষিণ-তাজিকিস্তানে,—অর্থাৎ প্রাচীন ব্যাকট্রিয়ায় —নতুন নতুন খননকার্য থেকে দেখা গেছে যে, নবাগত পশুপালনকারী উপজাতিগুলির,—স্পষ্টতই ইরানীয় বা ইন্দো-ইরানীয় বংশোদ্ভূত,—(তুলখার ও আরাকতাউ সমাধিক্ষেত্রগুলি থেকে প্রাপ্ত নিদর্শন অনুসারে)- নানা গোষ্ঠী খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শেষদিকে এবং প্রথম সহস্রাব্দের গোড়ার শতকগুলিতে এখানে বসতি করেছিল। স্পষ্টতই এসব প্রক্রিয়াই ছিল পরস্পর-সম্পর্কিত এবং প্রাচীন সমাজ ও ব্যাকট্রীয় রাষ্ট্রের বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

রাজনৈতিক সংহতিসাধনকে এগিয়ে নেবার ব্যাপারে যাযাবর উপজাতির ভূমিকা ইয়োরোপীয় সিদিয়ার ইতিহাসে অতি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত। পূর্ব দিক থেকে আগত যাযাবর সিদীয়দের একটি গোষ্ঠীর প্রভাবেই কৃষ্ণসাগর সংলগ্ন সমভূমিতে কৃষিজীবী ও যাযাবর সিদীয় উপজাতিগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এই কনফেডারেশন পরে সিদীয় সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল এবং প্রাচীন দুনিয়ার ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিগুলির ইতিহাসে এক বিশিষ্টতম ভূমিকা পালন করেছিল।

স্পষ্টতই অনুরূপ এক প্রক্রিয়া ঘটেছিল যখন কুষাণ রাজ্য গড়ে ওঠে। উপজাতীয় ব্যবস্থা ও শক্তিশালী সামরিক সংগঠনের জীবন্ত ঐতিহ্য নিয়ে যাযাবরদের আবির্ভাব এইসব বিশাল অঞ্চলকে একটি অখণ্ড রাজনৈতিক সংগঠনে মিলিত হতে প্রবুদ্ধ করেছিল। দেশান্তর গমনের যে-তরঙ্গ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের শেষদিকে মধ্য-এশিয়া, আফগানিস্তান, পশ্চিম-পাকিস্তান ও উত্তর

ভারতের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল এবং গ্রীক রাজ্যগুলো গ্রাস করেছিল—সেটি কুষাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি তৈরি করে।

যাযাবর উপজাতিগুলি কুষাণ সংস্কৃতিতে এক বড় অবদান রেখেছিল। সিদীয়-সার্মাসীয় ঐতিহ্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় কুষাণ শিল্পকলার বহু রচনার মধ্যে, এবং কুষাণ সমাজে তারা যে-গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তার মর্ম আজকে আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করা যাচ্ছে মধ্য-এশিয়ার দক্ষিণাংশে প্রাক্-কুষাণ ও গোড়ার দিককার কুষাণ স্থলীগুলির খননকার্য থেকে প্রাপ্ত নতুন নতুন সাক্ষ্যপ্রমাণের আলোকে। এ থেকে দেখা যায় বিদ্যমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমূহ মধ্য-এশিয়ার উত্তরাঞ্চল ও এমনকি সার্মাসীয় এলাকার সঙ্গে যুক্ত ছিল।

যে-উপজাতীয় জোটগুলি গ্রীক-ব্যাকট্রীয় রাজ্য ধ্বংস করে দিয়েছিল, তাদের গঠনবিন্যাস এবং উদ্ভবের প্রশ্নটি এখনো অতি জটিল ও অস্বচ্ছ। কিন্তু পুরাতাত্ত্বিকরা এই কঠিন প্রশ্নটির উপরও কিছুটা আলোকপাত করছেন। কিছু পণ্ডিত মধ্য-এশিয়ার উত্তরাঞ্চল থেকে আগত উপজাতিগুলির ভূমিকাকে হুনদের চাপে পূর্বদিক থেকে আগত উপজাতিগুলির—ইউচি, উ-স্যুন ও শকদের—ভূমিকার সঙ্গে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। পুরাতাত্ত্বিকরা এখন তাঁদের সেই মতামতকে সমর্থন করার প্রবণতা দেখাচ্ছেন।

নতুন নতুন লিপির—বিশেষ করে সুরখ-কোতালে লিপিগুলির—আবিষ্কার গবেষকদের ব্যাকট্রিয়ায়—কুষাণ ও কুষাণোত্তর আমলের তোখারিস্তানে—বিদ্যমান ভাষা সম্পর্কে একটি অভিমত গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। আজকে অধিকাংশ পণ্ডিতব্যক্তিই অধ্যাপক উ. ব হেনিং-এর অভিমতের সঙ্গে একমত। তিনি মনে করেন 'ব্যাকট্রিয়ান' ছিল ব্যাকট্রিয়ার প্রাচীন ভাষা ও খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে যাযাবর উপজাতিদের হানার অনেক আগে এখানে এই ভাষায় কথা বলা হত। এই সিদ্ধান্ত আরও একবার প্রমাণ করছে যে কুষাণ-ব্যাকট্রিয়ার ইতিহাসে স্থানীয় জনসমষ্টিই প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। নতুন উপজাতিদের ভূমিকা যত গুরুত্বপূর্ণই হোক, উপরে বর্ণিত ব্যাপারটি ছিল কুষাণ সংস্কৃতি ও জাতি গড়ে ওঠার ব্যাপারে মৌল উপাদান।

ব্যাকট্রিয়ায় যাযাবর উপজাতিগুলির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে গ্রীকশাসকদের ক্ষমতা ভেঙে পড়েছিল। এর ফলে পরে হিন্দুকুশের দক্ষিণের অঞ্চলে গ্রীক শাসনের পতন হয়েছিল।

মুষ্টিমেয় বাছাই করা গ্রীকদের শাসনের উচ্ছেদ বলতে মোটেই ব্যাকট্রিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির রাষ্ট্রসংগঠন ও সংস্কৃতির প্রত্যাগতি বোঝায় নি। ব্যাকট্রিয়া

ও ভারতের গ্রীক শাসকরা খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় কিংবা প্রথম শতক নাগাদ ভূমধ্য-সাগরীয় জগতের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে সম্পর্ক-ছিন্ন অবস্থায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজ-প্রতিনিধিতে পরিণত হয়েছিল, একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিল এবং ক্ষমতার লড়াইয়ে ও নতুন নতুন ভূখণ্ডদখলের চিন্তায় মগ্ন ছিল। সুপ্রাচীন ক্লাসিকাল যুগের মহৎ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বাহকরূপে এদের গণ্য করা অবশ্যই ভুল হবে। বিপরীত পক্ষে এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে যথেষ্ট পরিমাণে স্থিতিশীল স্থানীয় শাসন বিবদমান গ্রীক শাসকদের স্থলাভিষিক্ত হবার পরেই শুধু এই ঐতিহ্য ব্যাপকভাবে গৃহীত ও বিকশিত হতে শুরু করেছিল। একই সময়ে, প্রাক্-কুষাণ ও আদি-কুষাণ আমলে গ্রীক প্রভাবকে অবশ্যই ছোট করে দেখা উচিত নয়। গ্রীক ও স্থানীয় ব্যাকট্রীয় সংস্কৃতির পরস্পর-ক্রিয়া স্পষ্টতই গ্রীক-ব্যাকট্রীয় ও কুষাণ রাজ্যের আমলে ঘটছিল, কিন্তু এর উৎপত্তি হয়েছিল অনেক আগে। একথা জানা আছে যে, হেলেনিক কুলোদ্ভব লোকেরা সেই আকিমিনীয় যুগে মধ্য-এশিয়ায় উপস্থিত হয়েছিল এবং সেই সময়ের গ্রীক বসতকারীদের জনপদগুলি গড়ে উঠেছিল। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের প্রাচ্য-কর্মনীতিতে এবং প্রাচ্য জাতিগুলির সঙ্গে গ্রীকদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তাঁর কামনায় ব্যাকট্রিয়া এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

কুষাণযুগে ব্যাকট্রীয় সংস্কৃতিতে গ্রীক ঐতিহ্য সংরক্ষিত হয়েছিল এবং এর আরও আত্তীকরণ ঘটেছিল। সেই সময় 'কুষাণ লিখনপদ্ধতি'র ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল। এর উৎপত্তিস্থল ছিল গ্রীক, এবং স্থানীয় ব্যাকট্রীয় বাচনে এটিকে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়েছিল। এই হরফ ব্যবহার করে ব্যাকট্রিয়ায় কোনো কোনো চীনা ও আরবী সূত্রমতে আদি-মুসলিমযুগের আগে পর্যন্ত তোখারিস্তানে —এই ভাষায় পুস্তক লিখিত ও সংরক্ষিত হয়েছিল। 'কুষাণ লিখনপদ্ধতি'র আবির্ভাব ছিল বিরাট সাংস্কৃতিক তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনা। গ্রীক হরফ গ্রহণ করা ছাড়াও কুষাণ আমলের ব্যাকট্রিয়ায় সুপ্রাচীন ক্লাসিকাল যুগের বহু কৃতির (গ্রীক শিল্পকলার বিস্ময়কর ঐতিহ্য এর অন্তর্ভুক্ত) আত্তীকরণ ঘটেছিল।

স্থানীয় ব্যাকট্রীয়, হেলেনিক ও যাযাবর এই তিনটি ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক অঙ্গ পার্শ্ববর্তী মধ্য-এশিয়ার অঞ্চলগুলির—আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত ও ইরানের—জাতিসমূহের স্বাধীন মৌলিক ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিতভাবে সৃষ্টি করেছিল জাতিগত—সাংস্কৃতিক-সামাজিক রাজনৈতিক—প্রতীত ব্যাপারের জটিল ও মৌলিক এক সমষ্টি। আর এই সমষ্টির রূপেই বহু ব্যাপারে আজও পর্যন্ত রহস্যাবৃত কুষাণ জগত আজকে আমাদের সামনে প্রকাশিত।

পূর্বদিকে হান রাজবংশ-শাসিত চীন ও পশ্চিমে পার্থীয় রাজ্যের সংলগ্ন পরাক্রান্ত কুষাণ রাজ্যের আবির্ভাব যে-পুরোনো জগতের যোগসূত্রগুলি আগেই ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, সেই জগতে সভ্যতার প্রাচীনতম কেন্দ্রগুলিকে বৃহৎ চতুঃশক্তির একটি অখণ্ড ব্যবস্থার মধ্যে মিলিত করেছিল। এর পর থেকে কয়েক শতক পর্যন্ত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে শুরু করে প্রশান্ত মহাসাগর তীর পর্যন্ত পুরোনো জগতের সবগুলি সুসভ্য দেশ ও অঞ্চলের উপর রোম, পার্থিয়া হান রাষ্ট্র ও কুষাণ সাম্রাজ্য হয় প্রভুত্ব নয় প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই চতুঃশক্তি একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও বহুবিধ সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। একটি চীনা পাঠে রোমান ও হান শাসকদের পাশাপাশি কুষাণ শাসকদের 'দেবপুত্র' আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে, পৃথিবীকে এদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

মনুষ্যজাতির ইতিহাসে প্রথম আন্তঃমহাদেশীয় কূটনৈতিক ও বাণিজ্যপথ রেশম মহামার্গটি কুষাণ ও পার্থীয়দের ভূমি হয়ে চীন থেকে ভূমধ্যসাগরীয় রোমক সাম্রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই একই যুগে—ভাস্কো-ডা-গামার এক হাজার বছরেরও আগে—নাবিকরা জাহাজ নিয়ে নিয়মিত ভারত মহাসাগর পাড়ি দিত, তারা যাতায়াত করত তৎকালে রোমকদের দ্বারা বিজিত মিশর এবং কুষাণ সাম্রাজ্যের সামুদ্রিক প্রবেশপথ পশ্চিম-ভারতীয় বন্দরগুলি হয়ে। এরূপ অনুমান করার কারণ আছে যে, আমুদরিয়া ও সিরদরিয়ার স্রোতবিধৌত অঞ্চল থেকে স্তেপভূমি হয়ে কৃষ্ণসাগরের উত্তরে প্রাচীন পূর্ব-ইয়োরোপীয় শহরগুলি পর্যন্ত যে-পথটি কালক্রমে অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছিল, সেটি নির্মিত হয়েছিল এই একই কালপর্বে। এ থেকেই দেখা যাচ্ছে যে ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলি, নিকট ও মধ্য প্রাচ্য, মধ্য-এশিয়া, ভারত উপমহাদেশ ও দূরপ্রাচ্যের জাতিগুলির মধ্যে ব্যাপক ও বহুবিচিত্র সংযোগ কুষাণযুগে বিশেষভাবে বিকাশলাভ করেছিল।

পুরাতাত্ত্বিকরা কিয়েভের কাছে, ইথিওপিয়ায়, স্ক্যান্দিনেভিয়ায় এবং রোমক সাম্রাজ্যের শহরগুলিতে কুষাণ মুদ্রা এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের শহরগুলিতে অগাস্টাস, টাইবেরিয়াস ও অন্যান্য সম্রাটদের রোমক মুদ্রা পেয়েছেন ও পাচ্ছেন। উত্তরে কুষাণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে উরালের পশ্চিমে কামা-এলাকায় এবং একটি রৌপ্যনির্মিত খোরেজ্‌ম্‌ পাত্র পাওয়া গেছে উরালের পূর্বে। বর্তমান দুশান বে-তে এককালে স্থিত প্রাচীন শহরের হস্তশিল্পীরা গ্রীক দেবতা ডায়োনিসাসের মূর্তিশোভিত প্লেট তৈরি করত, আর রোমক অভিজাতরা ভারতীয় বণিকদের কাছ থেকে কেনা হাতির দাঁতের তৈরি ক্ষুদ্র মূর্তি দিয়ে ঘর সাজাত। কুষাণ আমলের ভারতের হাতির দাঁতের সামগ্রী পাওয়া গেছে পম্পেইতে, আর রোমক

কাচের জিনিসপত্র পাওয়া গেছে বেলগ্রামে কুষাণ শাসকদের প্রাসাদে। একথা সাধারণভাবে জানা আছে যে, এশিয়ার মিত্র পূজাপদ্ধতি রোমক সাম্রাজ্যে প্রসারিত হয়েছিল (একেবারে ব্রিটেন পর্যন্ত); প্রাচ্য রেশম আর মশলার ব্যবহার রোমে একটা ফ্যাশান ছিল; এবং রোমক জিনিসপত্র প্রায়শই আবিষ্কৃত হয়েছে নিকট প্রাচ্যে—ট্রান্স-ককেসিয়া, ভারত, মধ্য-এশিয়া ও ইন্দোচীনে।

দাসিয়ানদের বিরুদ্ধে ট্রাজানের জয় উপলক্ষে রোমে যে অনুষ্ঠান হয়েছিল তাতে কুষাণ দূতরা যোগ দিয়েছিলেন, এবং রোমক বণিক টাইটিয়ান পুবদিকে চীনের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। কাজেই কুষাণ আমল শুধু যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত যোগাযোগ বজায় রেখেছিল তা নয়, পরন্তু এই ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার বিকাশে এই আমল ছিল গুণগতভাবে এক নতুন স্তর।

মধ্য-এশিয়ার সাংস্কৃতিক সম্পদ প্রাচীন জগতের নিকট ও দুর দেশগুলি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, এবং তা গ্রীক-রোমক ও ভারতীয় কৃতিসমূহ আরও পুবদিকে জাতিগুলির কাছে পৌঁছে দিতে এক অসাধারণ তাৎপর্যপুর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। লিখিত সূত্র ও পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার (মুখ্যত পুর্ব-তুর্কিস্তান থেকে 'পুরোনো সোগদীয় পত্রগুচ্ছ') থেকে জানা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রেশম মহামার্গের গোটা পুর্ব অংশটি দিয়ে সোগদীয় বণিকরা যাতায়াত করত এবং ওরা মধ্য-এশিয়ায় ওদের বসতি ও উপনিবেশ স্থাপন করেছিল ও বিভিন্ন জাতির সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছিল। চীন ও নিকট-প্রাচ্যের রেশমের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে সোগদীয় রেশম শেষ পর্যন্ত বাইজানটিয়াম ও পশ্চিম ইয়োরোপে প্রবেশ করেছিল, ইয়োরোপের গির্জাগুলির ভাঁড়ারে সোগদীয় ছাপমারা রেশম সম্প্রতি আবিষ্কৃত হওয়ায় একথা প্রমাণিত হচ্ছে। এক বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সোগদীয় ভাষা ব্যবহৃত হত। বিশিষ্ট রুশ পণ্ডিত উ. বার্থোল্ড খুব সঙ্গতভাবেই সোগদীয়দের কার্যকলাপকে প্রাচীন ফিনিশীয়দের সাংস্কৃতিক তৎপরতার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

মধ্য-এশিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত ও ইরানের আর্থব্যবস্থার শ্রীবৃদ্ধি শুরু হয়েছিল যখন তাদের জাতিগুলি একটিমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং বিদেশী সামরিক অভিযানের হাত থেকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বোধ করছিল। শহরের পর শহর গড়ে উঠতে লাগল, শহরের হস্তশিল্পের বিকাশ ঘটল, বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটল, চাষের পদ্ধতি উন্নত হল। মধ্য-এশিয়ায় পুরাতাত্ত্বিক খননকার্য থেকে দেখা গেছে কৃষি ও সেচের উল্লেখযোগ্য বিকাশ ছিল কুষাণ আমলের বৈশিষ্ট্য।

কুষাণ আমলে বিভিন্ন নৃকুলগত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের, নানা ধর্মতন্ত্র ও বিশ্বাসের সহাবস্থান ছিল অপর একটি তাৎপর্যমণ্ডিত বৈশিষ্ট্য। কুষাণ নৃপতিদের —এবং প্রথমত কনিষ্ক ও হুবিষ্কের ধর্মীয় সহনশীলতার নীতি এতে যথেষ্ট পরিমাণ উৎসাহ যুগিয়েছিল। এই ধর্মীয় সহনশীলতার এবং বিভিন্ন নৃকুলগত ও ভূখণ্ডগত অঞ্চলের নানা ভাবাদর্শ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জাজ্বল্যমান প্রমাণ কুষাণ নৃপতিদের মুদ্রায় চিত্রিত কুষাণ দেবতামণ্ডলীর মূর্তি। উদাহরণস্বরূপ, কনিষ্কের মুদ্রায় আমরা দেখতে পাই ভারতীয়, ইরানীয়, গ্রীক দেবতামণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত নানা দেবদেবীর নাম ও মূর্তি। ন্যায়বিচারের প্রতীক মিত্র ও উর্বরতার দেবী অর্দোক্ষ ছাড়াও আমরা দেখতে পাই শক্তিমান যুদ্ধদেবতা বেরেত্রাগ্ন, ভারতের শিব ও বুদ্ধ, হেলেনীয় মিশরে পূজিত হেলিওস, সেলেনা ও এমনকি সেরাপিসকেও।

বিশাল সাম্রাজ্যের জনসমষ্টির নৃকুলগত ও সাংস্কৃতিক নানারূপত্বের প্রতীক কুষাণ দেবতামণ্ডলীর এই মিলিতরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, পারস্পরিক প্রভাব ও সমৃদ্ধি সাধনের ফলে সমগ্র সাম্রাজ্যের পক্ষে অভিন্ন যে বহু আচার ও ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল—তা তার পরিপক্কতারই প্রকাশ।

ব্যাপক অর্থে এই সহনশীলতা ছিল সেই বিশাল অঞ্চলের অভিন্ন সাংস্কৃতিক সম্পদের বিস্তৃতির ও সংস্কৃতির বিকাশের অত্যাবশ্যক সত্তা এবং এর দরুন স্থানীয় ঐতিহ্য ও স্থানীয় সংস্কৃতি নিজ অনন্যতা বজায় রাখতে পেরেছিল। এই কারণে আমরা যুক্তিযুক্তভাবেই সমগ্রভাবে কুষাণ সংস্কৃতি ও কুষাণ শিল্পকলার কথা নয় পরন্তু স্থানীয় জাতীয় ঘরানা ও প্রবণতার কথাও বলতে পারি।

কুষাণ সাম্রাজ্যে বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠী ও ধর্মতন্ত্রের—বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, শৈবধর্ম ও জরথুষ্ট্রবাদের অস্তিত্বের প্রমাণ নানা তথ্য থেকে মেলে। জনসাধারণ বহু স্থানীয় ধর্মবিশ্বাস ও উপজাতীয় পূজাপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত ছিল এবং সম্ভবত ধর্মমতে দ্বৈতবাদেরও সঙ্গে। একটিমাত্র রাজনৈতিক সংগঠনের কাঠামোর মধ্যে বিদ্যমান এরূপ নানা ধর্মীয় ও দার্শনিক প্রণালী ও প্রবণতা বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা।

কুষাণ যুগেই মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ঘটেছিল এবং মধ্য এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের দেশগুলিতে বহুল প্রচলিত হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকলা এসব দেশে প্রবেশ করেছিল।

যে সব ধর্মতন্ত্র একটি দেশের সীমানা পেরিয়ে উৎপত্তিস্থলের বহু দূরে পর্যন্ত বহুল প্রচলিত হয়েছিল সেগুলির সঙ্গে স্থানীয় ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ক এক

অসাধারণ আগ্রহোদ্দীপক সমস্যা উপস্থিত করে। বৌদ্ধধর্মের ন্যায় বড় বড় ধর্মগুলির বিস্তারের অর্থ স্থানীয় ধর্মবিশ্বাস ও ঐতিহ্যের বিনাশ কিংবা আত্তীকরণ ছিল না। এ ছিল পারস্পরিক প্রভাবে এক জটিল প্রক্রিয়া, স্থানীয় ঐতিহ্যের অভিঘাতে নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টিশীলভাবে গ্রহণের ও বাইরে থেকে আসা ঐতিহ্য সংশোধনের প্রক্রিয়া। মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস-গবেষককে অতিশয় চিত্তাকর্ষক ও গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ যোগায়, যদিও বৌদ্ধধর্ম সেখানে সর্বপ্রধান ধর্ম ছিল না।

ব্যাকট্রিয়ায় বৌদ্ধ পণ্ডিতরা শুধু বৌদ্ধশাস্ত্রাদি সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করে মুখস্থ করতেন না পরন্তু নিজেদের মতো করে সেগুলি ব্যাখ্যা করেছিলেন ও ভাষ্য রচনা করেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে এই সৃষ্টিশীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছিল বৌদ্ধমন্দির-স্থাপত্যের মধ্যে : নক্সা ও বিন্যাসের দিক থেকে ব্যাকট্রিয়ায় (ও পরে সমগ্র মধ্য-এশিয়ায়) বৌদ্ধবিহারগুলি সাধারণভাবে প্রাক-কুষাণ ও আদি-কুষাণ ভারতের বৌদ্ধবিহার ও চৈত্যগুলির অনুকৃতি ছিল না, বরং অনুকরণ করেছিল নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যের মন্দির-সমাহারগুলিকে। এগুলিতে থাকত সংকীর্ণ পরিক্রমা-বারান্দা দ্বারা বেষ্টিত রুদ্ধদ্বার গর্ভগৃহ (কারা-তেপে খননকার্য থেকে পাওয়া গেছে)। মধ্য-এশীয় বৌদ্ধ ধর্মে এই নতুন জাতিটি পরবর্তী এক আমল পর্যন্ত টিকেই ছিল। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে দক্ষিণ তাজিকিস্তানে একটি বৌদ্ধমঠ আদাঝিনা-তেপায় খনন কার্য থেকে।

ভারত থেকে ব্যাকট্রিয়া তোখারিস্তানে আগত বৌদ্ধধর্ম ছাড়া কুষাণদের অধীনে সেখানে স্থানীয় ধর্মবিশ্বাস ও পুজাপদ্ধতিরও প্রচলন ছিল। তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, কুষাণ মুদ্রায় স্থানীয় ভাখ্‌শ্‌ নদীদেবতা অক্শোর মূর্তি খোদিত ছিল। মূর্তিতত্ত্বের বিচারে এই দেবতাটি ভারতের শিবের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল বলে পণ্ডিতদের অনুমান।

কুষাণদের অধীনে তোখারিস্তানে স্থানীয় মধ্য-এশীয় ধর্মবিশ্বাসগুলির ভূমিকা সম্পর্কেও আমাদের যে জ্ঞান তা আসছে সমাধিক্ষেত্রগুলির খননকার্য থেকে।

কুষাণ আর্টের স্থানীয় মধ-এশীয় ঐতিহ্যের উপরে যে ব্যাকট্রীয় তোখারীয় ঘরানা পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছিল সেটি মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধ শিল্পকলায় প্রভূত অবদান রেখেছিল। মধ্য-এশিয়া থেকেই বৌদ্ধসংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল পুবদিকে, চীন, জাপান ও কোরিয়ায়। মধ্য-এশিয়ায় প্রাপ্ত নতুন নতুন পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির আলোকে মধ্য-এশিয়ায় ও চীনে বৌদ্ধধর্মের শিক্ষাকে আরও ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে এখানকার বৌদ্ধ-পণ্ডিতদের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্য-

মণ্ডিত। চীনা রচনাদির সাক্ষ্য স্মরণ করিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট। এসব রচনায় ব্যাকট্রিয়া, সোগদ ও পার্থিয়া থেকে আগত প্রায় দশজন বৌদ্ধ শ্রমণের নাম দেওয়া আছে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ঈশ্বরতত্ত্ব-সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ও সেগুলি চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। মধ্য-এশীয় শ্রমণরা না থাকলে চীন দ্বিতীয়-চতুর্থ শতকে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানতে পারত না, পণ্ডিতদের এই বক্তব্য পুরোপুরি যুক্তিযুক্ত।

নতুন নতুন পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের আলোকে এশিয়া ও চীনের জাতিগুলিকে গ্রীক-রোমক জগতের কৃতিসমূহের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়ায় মধ্য-এশীয় কারিগরদের ভূমিকা এবং রোমক সাম্রাজ্যের ভূমধ্যসাগরীয় জগতে দূর প্রাচ্যের রেশম ও অন্যান্য পণ্য জনপ্রিয় করায় মধ্য-এশিয়ার বণিকদের ভূমিকা অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছে।

কুষাণ যুগে মধ্য-এশিয়া ও চীনের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল এবং মধ্য-এশিয়া থেকে চীনারা আলফালফা, আঙুরলতা ও সম্ভবত তুলা সমেত একাধিক গাছগাছড়া ধার করেছিল।

চীনের প্রাচীর দূর-প্রাচ্যের জাতিগুলিকে প্রাচীন ভারতীয় ও মধ্য-এশীয় সভ্যতার কৃতিসমূহ দিয়ে নিজেদের সমৃদ্ধ করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারে নি, ঠিক যেমন পারে নি মধ্য এশিয়ায়, ভারত ও ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলিকে চীনা জনগণের সাংস্কৃতিক কৃতিসমূহের সঙ্গে পরিচিত হওয়া থেকে ঠেকাতে। মধ্য-এশিয়ায় স্থানীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বহু সাংস্কৃতিক কৃতিকে সংশোধিত করে নিয়েছিল। এ হয়ে উঠেছিল নিকট ও দূর প্রাচ্যের মধ্যে যোগসূত্র, কিন্তু এটা এক জাতির কাছ থেকে অন্য জাতির কাছে সাংস্কৃতিক সম্পদের যান্ত্রিক প্রেরণামাত্র ছিল না, এ ছিল এক সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া যার মধ্যে সাংস্কৃতিক কৃতিসমূহ অন্যের কাছে পৌঁছে দেবার আগে সেগুলিকে এক উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা যায়। এই ব্যাপক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং অন্য দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে বিভিন্ন জাতির পরিচয়-সাধনের প্রথা বিভিন্ন সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ও বিকাশে আনুকূল্য করেছিল। এক কৃত্রিম প্রাচীরের দ্বারা জনগণ বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে এটি কল্পনাও করা যেত না।

কুষাণ যুগে প্রাচ্যের জাতিগুলি সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ও সংযোগের উপকার যত হৃদয়ঙ্গম করেছিল আগে আর কখনো তেমন করে নি, এবং তারা বিরাট সাম্রাজ্যের অধিবাসী প্রত্যেকের জন্য অভিন্ন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ উদ্ভাবন করতে এবং সংস্কৃতির এক অভিন্নতা গড়ে তুলতে শুরু করেছিল। এই সাংস্কৃতিক সংযোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ ছিল এই যে সহযোগিতার প্রক্রিয়ার মধ্য

দিয়ে প্রতিটি সংস্কৃতি তার স্থানীয় ঐতিহ্য, মৌলিক প্রকৃতি ও জাতীয় অনন্যতা বজায় রেখেছিল।

সম্প্রতি বিরাট আকারে ভারত, আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, পাকিস্তান ও ইরানে যে অনুসন্ধান চালানো শুরু হয়েছে সেই অনুসন্ধানে স্থানীয় ধারা ও ঘরানার এইসব বৈশিষ্ট্য ও অনন্য-প্রকৃতি বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়েছে। আমরা এখন কুষাণ শিল্পকলার রহস্য সমাধানের, বলা যায়, দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছি। এই শিল্পকলার কারুকার্য, বৌদ্ধিক উৎকর্ষ ও তীক্ষ্ণ সৌন্দর্যবোধ আমাদের বিস্মিত করে।

কুষাণ শিল্পকলার উৎপত্তি ও প্রকৃতি নিয়ে কয়েক দশক ধরে পণ্ডিত ব্যক্তিরা উত্তপ্ত বিতর্ক চালাচ্ছেন। প্রথমে গান্ধারে প্রাপ্ত কুষাণ শিল্পকলার নিদর্শন সমূহের সে-সময় মুল্যায়ন করা হয়েছিল শুধুমাত্র রোমক ঐতিহ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে কিংবা আধেয়র দিক থেকে বিশুদ্ধ বৌদ্ধ শিল্পকলা হিসেবে। ভারতে প্রাপ্ত মথুরা ঘরানার নিদর্শনগুলি, পাকিস্তানে (তক্ষশিলা, কুটকারা), আফগানিস্তানে (বেগ্রাম, হাড্ডা ও সর্বশেষ স্থরখ কোটালে), সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ায় (আইতমি ও সম্প্রতি খালচায়ান ও দালভেৰ্জিন তেপ-এ খননকার্য) আবিষ্কারগুলি কুষাণ শিল্পকলার মতো সূক্ষ্ম ও বহু বিচিত্র এক শিল্পকলার উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিদ্যমান ধারণা আমুল বদলে দিয়েছে। স্থরখ কোটালে ড. শলুম্বার্গারের অভিযাত্রীদলের অনুসন্ধানে কুষাণ শিল্পকলা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ইরানীয় ও গ্রীক-ব্যাকট্রীয় প্রভাবের গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে। খালচায়ান ও দালভেৰ্জিন-তেপ-এ আবিষ্কারগুলির মধ্যে এই ভাবধারার অধিকতর সমর্থন মেলে।

আমরা পরিপুর্ণ আস্থা নিয়ে বলতে পারি যে কুষাণ শিল্পকলায় নানা ঘরানা ও ধারার অস্তিত্ব ছিল এবং প্রায়শই যে এগুলি একত্রে গ্রন্থিবদ্ধ হত, এ-ঘটনা সত্ত্বেও কিন্তু এই ধারা ও ঘরানাগুলি ছিল স্বাধীন। ব্যাকট্রীয় ঘরানার ছিল এক পৃথক স্থান, এর শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মগুলি গত কয়েক বছরে উত্তর আফগানিস্তান ও সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ায় আবিষ্কৃত হয়েছে। ব্যাকট্রিয়াতেই কুষাণ শিল্পকলার উদ্ভব ঘটেছিল ও এ রূপ পরিগ্রহ করেছিল। পরবর্তীকালে অন্যান্য ঘরানা একে বিকশিত করেছিল।

দক্ষিণ উজবেকিস্তানে সোভিয়েত পুরাতাত্ত্বিক অভিযান থেকে দেখা গেছে যে সেই আদি কুষাণ আমলে, অর্থাৎ কুষাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আগে, স্থানীয় শাসকরা মৃৎনির্মিত চিত্রিত ভাস্কর্য কর্ম দিয়ে প্রাসাদ ও মন্দিরের অঙ্গসজ্জা করত।

উপকরণ ও চিত্রকল্পের দিক থেকে একান্তভাবেই স্থানীয় হলেও এই ভাস্কর্যকর্মগুলি শৈলীর দিক থেকে এবং কিছু কিছু মূর্তিতত্ত্বগত চিন্তাধারা উপস্থাপনের পদ্ধতির দিক থেকে হেলেনিক শিল্পকলার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল।

কুষাণ আমলে ব্যাকট্রিয়া শুধু গ্রীক-রোমক সংস্কৃতির সর্বোত্তমটুকুই নয় পরন্তু ভারতের শৈল্পিক ঐতিহ্যের উপাদানগুলিও গ্রহণ করেছিল। তেরামজ-এর কাছে সোভিয়েত পুরাতাত্ত্বিকরা উচ্চাবচ প্রণালীর যে বিখ্যাত শিল্পকর্মগুলি আবিষ্কার করেছেন সেগুলি থেকে দেখা যায় ব্যাকট্রিয়াবাসীরা গ্রীক-রোমক ও ভারতীয় এই উভয়বিধ ভাস্কর্যের সঙ্গে পরিচিত ছিল। কুষাণ যুগে ব্যাকট্রিয়ার এবং আরও বিস্তৃতভাবে বললে মধ্য এশীয় ও পূর্ব ইরানীয় জাতিগুলির শিল্পকলা মথুরার ও প্রাচীন ভারতের অন্যান্য অংশের শিল্পকলার উপর তার প্রভাব রেখে গিয়েছিল।

ব্যাকট্রীয় ও অন্যান্য ঘরানার স্মারকগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যায় কুষাণ শিল্পকলার রূপ পরিগ্রহণে মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান, ইরান ও ভারতের জাতি-সমূহের স্থানীয় ঐতিহ্যগুলি এক নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছিল। এগুলি গ্রীক-রোমক শিল্পকলার মহত্তম ঐতিহ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলে গিয়েছিল।

কুষাণ শিল্পকলার সবচেয়ে বিশিষ্ট লক্ষণগুলির অন্যতম ছিল এই সৃষ্টিশীল আত্তীকরণ এবং স্থানীয় ও বিদেশী ঐতিহ্যগুলির অঙ্গাঙ্গী মিলন। স্থানীয় ঐতিহ্যগুলি সবচেয়ে প্রকট লোকায়ত শিল্পকর্মগুলির মধ্যে। নানা জাতি কুষাণ শিল্পকলার বিকাশে যে অবদান রেখেছিল তার প্রতিফলন এই লোকায়ত শিল্প-কর্মগুলির মধ্যে। এই লোকায়ত ধারা স্থানীয় ঐতিহ্য ও ধর্মবিশ্বাসের ভূমিকাকে আরও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে আমাদের বাধ্য করছে। আফগানিস্তান ও মধ্য-এশিয়ায় নতুন নতুন খননকার্যের আলোকে কুষাণ শিল্পকলাকে বিশুদ্ধ বৌদ্ধ শিল্পকলা বলে দেখার চিরাচরিত মনোভাবের অবশ্যই পুরোপুরি পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন।

গবেষকদের কাছে যে সব নতুন নতুন সাক্ষ্য জমা হয়েছে সেগুলি আমাদের সামনে সাধারণ নীতিবিষক একটি প্রশ্ন হাজির করছে: প্রাচ্য ও বিশ্ব সংস্কৃতির ইতিহাসে কুষাণ সংস্কৃতির কোন স্থান এবং তার গুরুত্বই বা কি? কুষাণ সংস্কৃতি ভূখণ্ডগত দিক থেকে অথবা পরম্পরাগতভাবে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ একটা স্থানীয় ব্যাপার ছিল না। মধ্য এশিয়া, ইরান, আফগানিস্তান, ভারত ও পাকিস্তানের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং গ্রীক-রোমক সংস্কৃতির কৃতিসমূহের দ্বারা সুসমৃদ্ধ এই সংস্কৃতি এমন একটি ভিত্তি গড়ে তুলেছিল যার উপর বিকশিত হয়েছিল প্রাচ্যের বহু জাতির মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি।

কুষাণ শিল্পকলা কুষাণ রাষ্ট্রের পরেও দীর্ঘকাল বেঁচেছিল এবং আদি-মধ্যযুগে মধ্য-এশিয়া, ভারত ও দুর প্রাচ্যের বহু শিল্পীর প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল। কুষাণ শিল্পকলার ঐতিহ্য পরিষ্কারভাবে পরিলক্ষিত হয় ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভাস্কর্যের মধ্যে, সোগদীয় দেয়ালচিত্র ও উচ্চাবচ প্রণালীর শিল্পের (পিয়ানজিকেন্ত ও বরাক্ষ) মধ্যে এবং পূর্ব তুর্কিস্তানে।

অভিঘাতের শক্তি, উচ্চ মানের বিকাশ ও মৌলিকতার দিক থেকে কুষাণ শিল্পকলা ও সমগ্রভাবে কুষাণ সংস্কৃতি বিশ্ব সংস্কৃতির ইতিহাসে এক অতি চমকপ্রদ প্রতীত ব্যাপার এবং যথার্থতই ক্লাসিক্যাল গ্রীক-রোমক সংস্কৃতির পরেই এর এক সম্মানের স্থান রয়েছে।

কুষাণ আমলে এই বিশাল সাম্রাজ্যের জাতিগুলির মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক-বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা পরবর্তী যুগগুলিতেই বিকশিত হয়ে চলেছিল। মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান ও ইরানের মধ্যযুগীয় শিল্পকলায় কুষাণ অবদান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পণ্ডিতদের সামনে এখনো একাধিক জটিল সমস্যা সমাধানের অপেক্ষায় রয়েছে। ভারতের পরের যুগের ধর্মতন্ত্রগুলিতে, উত্তর ভারত· পাকিস্তান আফগানিস্তান ও সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ার আধুনিক জাতিগুলির নৃকুলগত ইতিহাসে এবং তাদের সংস্কৃতির নির্দিষ্ট উপাদানগুলিতে কুষাণ বৈশিষ্ট্যকে তাঁদের শনাক্ত করতে হবে।

এটা সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে ঐ দেশগুলির জাতিসমূহ কুষাণ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। কুষাণ যুগ তাদের ইতিহাসের অঙ্গাঙ্গী অংশ। প্রতিটি বছর, প্রতিটি দশক নতুন সাক্ষ্য, নতুন তথ্য এনে দিয়েছে। নতুন বিজ্ঞান পণ্ডিতদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে—তবুও বহু রহস্য এখনো অমীমাংসিত। কুষাণ সাম্রাজ্যের ইতিহাসের যত অধ্যায়ের পাঠোদ্ধার হয়েছে তার চেয়ে বেশি অধ্যায়ের পাঠোদ্ধার হয় নি। এই পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাদের সম্পূর্ণ কালানুক্রম ও উৎপত্তির প্রশ্নটির সমাধান এখনো সবচেয়ে কঠিন রয়ে গেছে। কিছুটা পরিমাণে প্রগতি প্রশ্নাতীত ভাবেই হয়েছে। ১৯১৩ ও ১৯৬০ সনে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত কনিষ্কের তারিখ-সম্পর্কিত আলোচনাচক্রদুটির যদি তুলনা করি তাহলে পরিষ্কার দেখতে পাব কুষাণ-ইতিহাসের প্রধান প্রশ্নগুলির সমাধানের কাছাকাছি এসে আমরা পৌঁছেছি।

বিগত বছরগুলিতে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ উৎসাহব্যঞ্জক সব আবিষ্কার হয়েছে। আফগানিস্তান, ভারত, পাকিস্তান, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইরানে গবেষকদের, আফগানিস্তানে ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক মিশনের, ইতালীয় ও জাপানী পুরাতাত্ত্বিক অভিযানগুলির সম্মিলিত চেষ্টার—এবং অন্যান্য দেশে পরিচালিত গবেষণার

কল্যাণে কুষাণ যুগে মধ্য-এশিয়ার জাতিগুলির ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের নানা দিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সব মাল-মশলা সংগৃহীত হয়েছে। গবেষণা নিশ্চয়ই চালিয়ে যেতে হবে, কুষাণ যুগের সমস্যা নিয়ে অতি অবশ্যই আরও গভীর অধ্যয়ন করতে হবে। আমি নিশ্চিত অনতিকালের মধ্যে বিশ্বসভ্যতায় এই চমকপ্রদ কালপর্বের রহস্যের চাবি আমরা খুঁজে পাব।

মহাকবি নিজামির কবিতার চরণ মনে আসছে :

বয়সের ভারে নুয়ে পড়বার আগে
বাঁচি যতদিন ততদিন প্রাণপণে
পথ খুঁজে যাব দেখি সমর্থ কিনা
মহত্তম সে-লক্ষ্যটি অর্জনে।

কুষাণ ইতিহাস ও কুষাণ উত্তরাধিকার সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিষয়ানুগ জ্ঞান-লাভ করা আমাদের লক্ষ্য। এই মহৎ লক্ষ্যটি এখনো বিজ্ঞানের বিকাশ ও প্রগতির সহায়ক, এ বিদ্বজ্জনদের মধ্যে সংযোগ দৃঢ়তর করবে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার আনুকুল্য করার জন্য আমাদের প্রাচ্যের জাতিগুলির ইতিহাসে এই চমৎকার অধ্যায়টিকে জনপ্রিয় করতে হবে।

আজকে আমরা অতীতের দিকে তাকাচ্ছি শুধু এজন্য নয় যে অতীত আমাদের মধ্যে সবিস্ময় শ্রদ্ধা জাগায় ও আমাদের সমৃদ্ধ করে তোলে। অতীতের দিকে তাকাচ্ছি আরও এই কারণে যে এ আমাদের বাধ্য করছে নতুনভাবে বর্তমানকে দেখতে, আমাদের সাহায্য করছে ঐতিহাসিক বিকাশের নিয়মগুলি বুঝতে।

আমাদের কালে আমরা কুষাণ যুগের মহিমা সম্পর্কে তীব্রভাবে সচেতন। এ যুগটি ছিল ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ও পরস্পরকে সমৃদ্ধ করার কাল, বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির নৈকট্যের কাল, শান্তিপূর্ণ বিকাশ ও প্রগতির কাল।

অনুবাদ : শৈলেন চৌধুরী

প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা ও 'নাট্যশাস্ত্র'

শঙ্কর চক্রবর্তী

প্রাচীন ভারতীয়েরা চিন্তাধর্মে বিপুল ঐশ্বর্যবান ছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তারা যে সুগভীর মনীষা ও মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা অতুলনীয়। জীবনের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি উদার ও ব্যাপক ছিল বলেই এটা সম্ভব হতে পেরেছিল।

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতিচিন্তা বৈচিত্র্যকে অন্বেষণ করেছে। তখনকার মানুষেরা তাঁদের জীবনধারণের আনন্দ সম্বন্ধে পরিপূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন। ভারতীয় চিন্তার মধ্যে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের স্থান আছে ঠিকই, কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। বেদের প্রাচীনতম অংশে বৈরাগ্য বা মোক্ষের কোনো উল্লেখ আমরা পাই না; উপনিষদে সন্ন্যাসীর আদর্শের চেয়ে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শই প্রশংসিত হয়েছে; গীতাও সেই আদর্শকেই অনুসরণ করেছে। পৌরাণিক হিন্দুধর্মও কৃচ্ছ্রসাধন বা সন্ন্যাসের মহিমাকে ঘোষণা করে নি। আগম বা তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত সাধনায় সন্ন্যাস তো প্রকারান্তরে অনাদৃতই হয়েছে।

জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে এমন স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর ধারণা ছিল বলেই প্রাচীন ভারতের ঋষি আনন্দসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রকরণ নাট্যকলার সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। সকল শিল্প বা কলাবিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল এই নাট্য। তাই 'নাট্যশাস্ত্রে'র স্রষ্টার মুখে আমরা শুনি—

> ন তজ্‌জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
> ন স যোগো ন তৎ কর্ম নাট্যে হাস্মিন যন্ন দৃশ্যতে ॥

অর্থাৎ, এমন জ্ঞান নেই, শিল্প নেই, বিদ্যা নেই, কৌশল নেই, কর্ম নেই, যা এই নাট্যে দেখা যায় না।

প্রাচীন ভারতে নাট্যকলা সম্বন্ধে ধারণা কত উচ্চ ছিল এবং সে সময়কার মানুষের জীবনে নাট্যের প্রভাব কত গভীর ছিল—এই উক্তি থেকে তার একটি পরিচয় পাওয়া যায়।

The Natyashastras: Edited by Dr Manomohan Ghosh. Manisha Granthalaya Pvt Ltd., Calcutta-12.

নাট্যকলার প্রাচীনত্ব

নাট্যকলার প্রথম সূত্রপাতের কাল অনুসন্ধানের ব্যাপারে তথ্যমূলক কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো কঠিন ব্যাপার, তবে বিশেষজ্ঞদের মতে ঋগ্বেদে যে সমস্ত কথোপকথন (যেমন সরমা ও পনিস, যম ও যমী, পুরূরবা ও উর্বশীর মধ্যে) লিপিবদ্ধ আছে, তাদের মধ্যে নাট্যগঠনের সম্ভাবনার প্রকাশ ঋগ্বেদের আমলকেই ভারতীয় নাট্যপ্রচেষ্টার প্রথম অধ্যায় রূপে নির্দিষ্ট করে তোলে।

ঋগ্বেদ আর্যগণের ভারতে আগমনের পরে রচিত হয়েছে। আর্যদের পূর্বে ভারতে যে দ্রাবিড় সভ্যতা ছিল, ভারতীয় মহাসংস্কৃতির গঠন ও সমৃদ্ধিসাধনে তার অবদানও কম নয়। বৈদিক সভ্যতা আর্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার সম্মিলনের ফল। 'শিল্প ও কলা' কথা দুটি দ্রাবিড় ভাষারই কথা।

কথোপকথন থেকেই যে ভারতীয় নাটকের উৎপত্তি এবং বৈদিক শ্লোক-গুলিই যে এই নাট্যকলার সূচনাকে রূপায়িত করছে, এ ব্যাপারে ম্যাক্সমুলার, সিলভাঁ লেভি, হার্টেল প্রমুখ ভারততত্ত্বের বিদেশী পণ্ডিতগণ সকলেই একমত।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে নাট্যভাবমণ্ডিত অতি সুন্দর কথোপকথনের বিবরণ রয়েছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বিদুষী গার্গীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন এবং তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দান করছেন নাটকোচিত ভাষায়। কঠোপনিষদে যম ও নচিকেতা এবং পিতার সঙ্গে শ্বেতকেতুর যে কথাবার্তা—তার মধ্যেও নাট্যভাবের প্রকাশ রয়েছে।

বৈদিক যুগের শেষের দিকে, আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ শতকে ভারতের নাট্য-কলা মোটামুটি একটি রূপ লাভ করেছিল, বিশেষজ্ঞরা এটাই অনুমান করছেন।

রামায়ণ ও মহাভারত

বাল্মীকির রামায়ণেও আমরা নাটক, নট ও সঙ্গীতের উল্লেখ পাই। অযোধ্যাকাণ্ডেই আমরা দেখি, পিতা দশরথের মৃত্যু এবং পরমপ্রিয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্রের বনগমনের কালে মাতুলালয়ে অবস্থানকারী ভরত নানা অশুভ স্বপ্নের দর্শনে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছেন এবং তাঁর মিত্র ও আত্মীয়েরা নৃত্য, গীত ও প্রফুল্ল, মিলনান্তক নাটক পাঠের দ্বারা তাঁর সন্তোষ বিধানের চেষ্টা করছেন :

> বাদয়ন্তি তদা শান্তিং লাসয়ন্ত্যপি চাপরে।
> নাটকান্যপরে স্মাহুর্হাস্যানি বিবিধানি চ॥

তাঁর শান্তি বিধানের জন্যে কেউ বাদ্য বাজাচ্ছে, কেউ বা নৃত্য করছে। কেউ বা বিবিধ নাটকের অভিনয় করছে, আবার কেউ বা মধুর হাস্য করছে।

ভরত অযোধ্যায় ফিরে এলে মার্কণ্ডেয় ও অন্যান্য ঋষির পরামর্শে তাঁকে সিংহাসনে আরোহণ করতে হল। অরাজক রাজ্যের বিপদ ঋষিরা এভাবে বর্ণনা করেছেন :

নারাজকে জনপদে প্রহৃষ্ট নটনর্তকাঃ।
উৎসবাশ্চ সমাজাশ্চ বর্ধন্তে রাষ্ট্রবর্ধনাঃ॥

অরাজক রাজ্যে নট ও নর্তকবৃন্দ সুখী নয়। সেখানে উৎসব ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মও রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির হেতুস্বরূপ হয় না।

রামায়ণের আদিকাণ্ডে অযোধ্যা নগরীর বর্ণনায় নগরে মহিলাদের জন্য রঙ্গালয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে :

বধুনাটসংঘৈশ্চ সংযুক্তা সর্বতঃ পুরীম। অর্থাৎ মহিলাদের জন্য নাট্যসংঘ নগরীর সর্বত্রই দৃষ্টিগোচর হয়।

বংশানুক্রমিকভাবে এই মহাকাব্যটির পঠন-পাঠন ভারতীয় নাট্যের গঠনপর্বে বিপুলভাবে সহায়তা করেছে।

ভারতের আর একটি মহাকাব্য মহাভারতেও আমরা নানাস্থানে নাটকের কথার উল্লেখ পাই। বিরাটপর্বে এক বিশাল রঙ্গমঞ্চের কথা বলা হয়েছে। রাজ্যহারা পাণ্ডবেরা যখন রাজা বিরাটের রাজসভায় অজ্ঞাতবাস করছেন, তখন অর্জুন বৃহন্নলার ছদ্মবেশে রাজকুমারী উত্তরাকে সঙ্গীত, নৃত্য ও যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষা দান করছেন। অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিবাহ উৎসবে নট, বৈতালিক, সূত ও মাগধেরা (অভিনেতা, চারণ কবি, সঙ্গীতকার ও নৃত্যশিল্পী) সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে তাদের অনুষ্ঠানের দ্বারা আপ্যায়িত করেছিল। বাণপর্বে যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ যমের প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছেন যে সুযশ বৃদ্ধির জন্য তিনি প্রায়ই নট ও নর্তকদের অর্থদান করে থাকেন।

এভাবে কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের মহাকাব্যগুলির ভাষা কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাট্যরসমণ্ডিত হয়ে উঠছিল। গীতিকাব্য ও মহাকাব্যের কাঠামোর মধ্য থেকেই সংস্কৃত নাটক ধীরে ধীরে তার সম্ভাব্য রূপ অর্জনের পথে এগিয়ে চলেছিল।

নাট্যের উদ্দেশ্য

এখন কথা হল প্রাচীন ভারতের মানুষ নাটকসৃষ্টির মুল প্রেরণাকে লাভ করেছিল কোন ক্ষেত্র থেকে এবং নাটককে সে তার জীবনের কোন প্রয়োজন সাধনের জন্যই বা গ্রহণ করেছিল? মনে হয়, প্রাচীন ভারতের অন্যান্য কলা

এবং কাব্যসৃষ্টির মূলে যেমন ধর্মীয় প্রভাব রয়েছে, তেমনি নাট্যসৃষ্টির মূলেও সেই একই প্রভাব কার্যকরী হয়েছিল। দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনাকে কেন্দ্র করে যে সব সঙ্গীত ও নৃত্যাদির উৎসব অনুষ্ঠিত হত, নাট্যসৃষ্টির মূল প্রেরণা বোধহয় সেখান থেকেই উন্মেষিত হয়ে থাকবে।

নাট্যের সঙ্গে নৃত্যের যোগ ঘনিষ্ঠ। নাট্য হচ্ছে দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত কোনো পাত্রপাত্রীর অবস্থা অনুকরণ আর নৃত্য হচ্ছে কোনো গানের বা কবিতার অন্তর্গত বা নর্তকের কল্পিত ভাবকে রূপদান। নাট্যের দ্বারা দর্শকের প্রাণে রসের সঞ্চার হয় আর নৃত্য দ্বারা দর্শকের হৃদয়ভাবের উদ্বোধন ঘটে। প্রাচীন ভারতে নাট্য ও নৃত্য কথা দুটি খুবই সমার্থবোধক ছিল। শিবের আর এক নাম নটরাজ, কাজেই এই দেবতাটি প্রাচীন ভারতের সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পীদের অশেষ প্রেরণাস্থল ছিলেন। ক্রমেই সঙ্গীতসমন্বিত নৃত্যানুষ্ঠান নিয়মিত নাট্যানুষ্ঠানের মতো হয়ে দাঁড়াল এবং অনুষ্ঠানাদিও বিষয়বৈচিত্র্যের সন্ধানে ব্যাপৃত হল। একটি মাত্র দেবতার মাহাত্ম্যকীর্তনেই এখন আর শিল্পীর শিল্পপ্রেরণা তৃপ্তিলাভ করে না। মনে হয় এই ধরনের শিল্পসৃষ্টির মূলে ধর্মীয় ভাবের প্রেরণা ক্রমেই ক্ষীয়মাণ হয়ে এসেছিল এবং নিরপেক্ষ বিষয়কে অবলম্বন করে নাট্যরচনায় রচয়িতারা আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই পরিবর্তন লোকপ্রিয় দেবতাদের মাহাত্ম্য অবলম্বনে নাটক রচনার উৎসাহ স্রোতেও কিছু পরিমাণে শৈথিল্য এনেছিল, সন্দেহ নেই।

সম্ভবত এই কারণের জন্যই ভারতীয় নাটকের ধারাপর্যায়ে আমরা একদিকে যেমন পাই নীতিশাস্ত্রের অনুশাসন সম্বলিত বৌদ্ধ নাটক, তেমনি আবার অন্যদিকে পাই রুচিশীল, সংস্কৃতিবান দর্শকদের জন্য রচিত মহাকবি কালিদাসের সূক্ষ্ম সংবেদনশীল নাটকাবলি। আবার কোনো দেবতার উদ্দেশ্যে বিরচিত নাটকও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়—মহাকবি ভবভূতির কিছু নাটক যে পর্যায়ে পড়ে।

ভারতীয় নাটকের আর একটি বিশেষত্বের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বহুল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও ভারতীয় নাটকের বক্তব্য কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ আমোদপ্রমোদের চাহিদা মেটানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। ভারতীয় নাটক ছিল উদ্দেশ্যমূলক? রসভাবব্যঞ্জনাদ্বারা আনন্দসৃষ্টি এবং উপদেশ প্রদান এ দুইই ছিল ভারতীয় নাট্যপ্রয়োগের মূলগত বৈশিষ্ট্য। 'নাট্যশাস্ত্র' প্রণেতার কথায়:

> "এতদ রসেষু ভাবেষু সর্বকর্মক্রিয়াসু চ।
> সর্বোপদেশজননং নাট্যং খলু ভবিষ্যতি॥"

: অর্থাৎ অভিনয়ে প্রকাশিত নানা রসে, ভাবে ও আচরণে নাট্য সকলের পক্ষে উপদেশজনক হবেই।

'নাট্যশাস্ত্র' প্রণেতা

নাট্যশাস্ত্রকারের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কে এই 'নাট্যশাস্ত্র'কার স্বভাবতই সে প্রশ্ন জাগতে পারে।

প্রাচীন ভারতে নাট্যকলার উদ্ভব এবং তার ক্রমবিকাশ 'নাট্যশাস্ত্র'সৃষ্টির প্রয়োজনকে দৃঢ়ীভূত করে তুলেছিল, সন্দেহ নেই। এই বিষয়ের ওপর সুবিস্তৃত আলোচনা সমন্বিত 'নাট্যশাস্ত্র' নামে যে প্রামাণ্য গ্রন্থটি কালক্রমে প্রকাশিত হল, তার রচয়িতারূপে মহামুনি ভরতের নাম আমরা প্রাচীন ভারতের নানা গ্রন্থ থেকে লাভ করি। মহাকবি কালিদাস তাঁর 'বিক্রমোর্বশী' নাটকে ভরতকে স্বর্গলোকে দেবগণের নাট্যরচয়িতা এবং রঙ্গালয়াধ্যক্ষ বলে উল্লেখ করেছেন। ভবভূতি তাঁর 'উত্তররামচরিত'-এ ভরতকে 'তৌর্যত্রিকসূত্রকার' অর্থাৎ যন্ত্রসঙ্গীতের আদি গ্রন্থপ্রণেতা বলে নির্দেশ করেছেন। ভরত শব্দটির অর্থ হল নট এবং তৎকালীন অভিনেতাবৃন্দও ভরতপুত্র নামে আখ্যাত হতেন।

'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থে ভরত নিজেই প্রধান কথকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং লোকপিতা ব্রহ্মার কাছ থেকে নাট্যকলা সম্পর্কে জ্ঞান-অর্জনের কাহিনী পুস্তকের মুখবন্ধে বর্ণনা করেছেন। আশ্চর্যের কথাটা হল এই যে ভরত ভারতীয় নট-সূত্রকাররূপে এবং নাট্য ইতিহাসে এতখানি গুরুত্বপূর্ণ আসন গ্রহণ করে বসে আছেন, কিন্তু ভারতীয় পুরাণ কিংবা মহাকাব্যগুলিতে সে সম্পর্কে একটিমাত্র ক্ষেত্র ছাড়া আর কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ভরতমুনির নামের উল্লেখ রয়েছে। রামায়ণের এই অংশটির রচনাকাল খ্রীষ্টজন্মেরও দুশো বছরের পরবর্তী বলে ধরা হয়েছে, অর্থাৎ কিনা 'নাট্যশাস্ত্র' রচনার জন্য ধার্য সবচেয়ে পরবর্তী সময়েরও অনেকটা পরের দিকে।

'নাট্যশাস্ত্র'—নাট্যবেদ

'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থে এই বিশেষ শাস্ত্রটি নাট্যবেদ নামে আখ্যাত হয়েছে, যদিও 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থের নাম কোনো বেদ বা উপবেদে খুঁজে পাওয়া যায় না। 'গান্ধর্ববেদ' নামে একটি বেদের উল্লেখ আমরা বেদগ্রন্থগুলিতে পাই বটে, কিন্তু 'নাট্যশাস্ত্র' বা নাট্যবেদ ও গান্ধর্ববেদ একই ব্যাপার, এমন কথা কোথাও বলা

হয় নি। গান্ধর্ব ও নাট্য যে পৃথক বস্তু, একথা 'নাট্যশাস্ত্র'র রচয়িতার কাছেও অবিদিত নয়। তিনি বলছেন, "গান্ধর্বম চৈব নাট্যম্ চ ইষ্টাং দ্রষ্ট্য চিন্তাম উপাগমাৎ," অর্থাৎ গান্ধর্ব ও নাট্য উভয়কেই উত্তমরূপে দর্শন করে বিশেষরূপ মননের দ্বারা অধিগত করবে। আরো বলছেন, "গান্ধর্বম চৈহ নাট্যম চ যেহ সম্যক পরিপালয়েৎ" অর্থাৎ গান্ধর্ব ও নাট্য উভয়কেই সম্যকরূপে পোষণ করবে।

'নাট্যশাস্ত্র'কার অন্যত্র বলছেন, নাটকে অংশগ্রহণকারী অভিনেতৃবৃন্দ ও দর্শক বা শ্রোতৃবৃন্দ উভয়েই লাভ করেন, "ত্বম গতিম—যা গতিঃ বেদবিদুষম, যা গতি: যজ্ঞ-যাজীনঃ ভবতি," অর্থাৎ কিনা সেই পরম অবস্থা, যে অবস্থা বেদবিশেষজ্ঞ বা যজ্ঞানুষ্ঠানকারী লাভ করে থাকেন। যদি 'নাট্যশাস্ত্র'কে বেদ বলেই গ্রহণ করতে হয়, তাহলে এভাবে নাট্যকলার গরিমা কীর্তনের আবশ্যকতা ছিল কি?

প্রাচীন ভারতে নটেরা ছিল শূদ্রশ্রেণীভুক্ত ও সামাজিক বিচারে তাঁদের আসন ছিল খুবই নীচে এবং নটী কথার অর্থ ক্রমে এসে দাঁড়িয়েছিল গণিকাতে। শিল্পকলা সম্বন্ধে সুগভীর শ্রদ্ধা যেখানে বর্তমান, শিল্পীকুলের প্রতি সেখানে অবজ্ঞাজনোচিত মনোভাব সমাজতত্ত্বের এক পরম বিস্ময়। তবে এমন শ্রেণীর মানুষের সংখ্যাও খুব কম ছিল না, যাঁরা নটবৃন্দের অভিনয়চাতুর্য পরম উপভোগ করতেন এবং নাট্যকলার শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছিলেন। মনে হয়, সমাজের এই নাট্যরস-পিপাসু শ্রেণীর আগ্রহ ও প্রচেষ্টাতেই 'নাট্যশাস্ত্র' 'নাট্যবেদ'-এ নামাঙ্কিত হয়েছে এবং 'নাট্যশাস্ত্র'-প্রণেতাও মুনি নামে অভিহিত হয়েছেন।

ভরতমুনির ব্রহ্মার কাছ থেকে 'নাট্যশাস্ত্র' প্রণয়নের প্রেরণামন্ত্র লাভ এবং তৎসংশ্লিষ্ট নানা অতিলৌকিক কাহিনীর বর্ণনা রয়েছে 'নাট্যশাস্ত্রে'র মুখারম্ভে। এর অভীপ্সিত ফলও অবশ্য ফলেছিল। সমাজের প্রতিটি ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে নাট্যচর্চার যোগ খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। দেবতাদের পর্বদিনে, বিবাহে, গৃহপ্রবেশে ও বিজয়োৎসবাদিতে নাট্যানুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ। নাট্যবেদ-সংক্রান্ত অতিলৌকিক কাহিনী আর বাহুল্যভয়ে উল্লেখ করা হল না। তবে মনে হয়, এ ধরনের কাহিনী সৃষ্টির একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ছিল। সংস্কার-জর্জরিত সমাজের গোঁড়া আইন প্রণেতাদের শূদ্রবিরোধী মনোভাব কোমল করার জন্য 'নাট্যশাস্ত্র'কে নাট্যবেদে উন্নয়ন খুবই কার্যকরী হয়েছিল সন্দেহ নেই। ব্রাহ্মণ্য সমাজের এই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পাষাণ-হৃদয়কে নট ও নটীবৃন্দের সুকুমার অভিনয়-সৌন্দর্যও বোধহয় বিচলিত করতে পারে নি, তবে

নাট্যের সঙ্গে বেদ কথাটি সংযোজিত হবার পর থেকেই খুব সম্ভবত এই শাস্ত্রটি তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

নট-সূত্রকার শিলালি ও কৃশাশ্ব

প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণিক পাণিনি তাঁর পুস্তকে শিলালি ও কৃশাশ্ব নামে দুই ঋষিকে নটসূত্রকার রূপে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় অভিনয়কলা পাণিনিরও পূর্বে বর্তমান ছিল। পাণিনির কালকে অনেক পণ্ডিতই খ্রীষ্ট জন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্বে নির্দিষ্ট করেছেন। এ ব্যাপারে অবশ্য মতদ্বৈধতা রয়েছে। তাহলে শিলালি ও কৃশাশ্ব খ্রীষ্টজন্মের অন্তত ছ-শ বছর কিংবা তারও কিছু আগে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান করা যায়।

মহাপণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থ খ্রীষ্টজন্মের দু-শ বছর আগে রচিত হয়েছে। এই ধারণা অনুযায়ী শিলালি ও কৃশাশ্ব এবং 'নাট্যশাস্ত্র'-রচনার কালের মধ্যে প্রায় চারশ বছরের ব্যবধান থেকে যায়। অথচ 'নাট্যশাস্ত্র' এবং ওই শ্রেণীর অন্যান্য গ্রন্থে শিলালি ও কৃশাশ্বের কোনো উল্লেখ নেই। এই নীরবতার গূঢ় কারণ কি হতে পারে, এ প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক। আসলে, ভারতবর্ষের ওই চারশ বছরের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন নাট্যকলার চর্চা ও সমৃদ্ধিসাধনের পরিপোষক ছিল না। খ্রীষ্টজন্মের চারশ বছর আগে রচিত কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে নট এবং ঐ শ্রেণীর ব্যক্তিদের কোনোরূপ উৎসাহ প্রদানের কথার উল্লেখ নেই। কৌটিল্য ব্রাহ্মণদের অভিনয়ে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করেছেন, কারণ নটীবৃন্দের সান্নিধ্য ব্রাহ্মণদের ওপর কুপ্রভাব বিস্তার করতে পারে।

সেকালের রাজনীতিজ্ঞরা নটদের গুপ্তচরবৃত্তির কাজে নিয়োগ করতেন, ফলে সাধারণ মানুষও সর্বদাই এদের সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কাজেই যে সংস্কৃতিবান বিদগ্ধ জনগণ এই নটদের সক্রিয় সাহায্য করতেন এবং তাদের অভিনয়কলার গুণগ্রাহী ছিলেন, নট-সমাজের প্রতি রাষ্ট্রের বিরূপ মনোভাবের ফলে তাদের উৎসাহস্রোতেও ক্রমেই ভাঁটা পড়ে এসেছিল এবং এরই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ারূপে নাট্যানুষ্ঠানের সাধারণ মানের উৎকর্ষও বহুল পরিমাণে লাঘব হয়েছিল।

কৌটিল্য এবং তার অনুগামীদের পরে ভারতের ইতিহাসে বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের আবির্ভাব হল। প্রাচীনকালে বৌদ্ধেরা নাচ্চ-গীত-বাদিতানি, অর্থাৎ নৃত্য, গীত ও বাদ্যজাতীয় কলাবিদ্যার প্রতি কিরূপ বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিল, তা কারোর অবিদিত নয়। কি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে অশোক তার প্রজাবৃন্দের

মাঝে নীতিধর্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন, সে কথাও আমরা জানি। নৃত্য-গীত-বাদ্যবহুল নাট্যকলার চর্চা এবং পোষকতায় যে প্রজাবৃন্দের নীতিধর্ম-শিক্ষার পথ সুগম হবে না, সেকথাও মহামতি অশোকের অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। (বৌদ্ধেরা পরে নাট্যের প্রতি অনুরাগী হয়েছিলেন। বৌদ্ধ নাট্যকার অশ্বঘোষের নাম সুবিদিত)। অতএব এ ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে নটসূত্রকার শিলালি ও কৃশাশ্বের নাট্যসূত্র যদি বহুকাল চর্চা এবং প্রচলনের অভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালেই আত্মগোপন করে থাকে, তাহলে বিস্মিত হবার কোনো কারণ নেই। এরকম একটা সময়েই 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থ প্রণীত হওয়ার ফলে ভারতের সর্বপ্রাচীন নট-সূত্রকারদ্বয়ের কথা 'নাট্যশাস্ত্রে'র পৃষ্ঠায় অকথিতই থেকে গেছে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টিকর্মের এরূপ সাময়িক অবলুপ্তির নজির অবশ্য বিরল নয়।

প্রাচীন ভারতে ভরত নামে সত্যি সত্যিই কেউ ছিলেন কিনা, সেটিও বিচার্য বিষয়। ভরত শব্দটির অর্থ সংস্কৃতে নট হওয়ার জন্যই এরূপ অনুমান স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। শিলালি ও কৃশাশ্বই ভারতের দুই সর্বপ্রথম নটসূত্রকার। ভারতের তৎকালীন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের স্বাভাবিক পরিণতিরূপেই এদের নাট্যসূত্র বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে।

'নাট্যশাস্ত্র'

ভারতীয় কলাশাস্ত্রের ইতিহাসে ভরতমুনিই 'নাট্যশাস্ত্রে'র প্রণেতারূপে আখ্যাত হয়েছেন। কাজেই ভরতমুনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা, সে কথা বিচারের অপেক্ষায় রেখে 'নাট্যশাস্ত্র' প্রসঙ্গে আলোচনায় তাঁরই নামোল্লেখ করাটা সমীচীন হবে।

প্রাচীন ভারতীয় মনীষার এক পরম মূল্যবান অবদান হল এই 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থ। নাট্যকলা সম্পর্কে এরূপ প্রামাণ্য এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনাসমৃদ্ধ গ্রন্থ দ্বিতীয় আর একটি পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। সে যুগের জীবনধারার এক সর্বাঙ্গীণ রূপের আলেখ্যও এ গ্রন্থের মধ্য দিয়ে অপূর্ব দক্ষতায় প্রকাশিত হয়ে উঠেছে। তখনকার জীবন সত্যি সত্যিই কিরূপ ছিল, 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থে তারই পরিচয় আছে। জীবন কিরূপ হওয়া উচিত, মনুর এই 'ঔচিত্যধর্মে'র পরাকাষ্ঠা নির্ণয়ে 'নাট্যশাস্ত্রে'র প্রণেতা লেখনী ধারণ করে উঠতে পারেন নি। গণমানসের ওপর রঙ্গমঞ্চের প্রভাব সম্পর্কে মনু অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন এবং তাই তিনি তাঁর সংহিতায় নটের জীবিকাকে তীব্রতম ভাষায় হেয় প্রতিপন্ন করতে কুণ্ঠিত হন

নি এবং ব্রাহ্মণদের নটের জীবিকা গ্রহণ তিনি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক বা সামাজিক প্রয়োজনীয়তার গতিরোধ করা মনু বা ব্রাহ্মণ্যবাদী সামন্ততন্ত্রের অন্যান্য প্রতিভূদের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। মনুসংহিতারও আগে রচিত কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থেই আমরা দেখি যে সমাজজীবনে রঙ্গমঞ্চ আপন প্রতিষ্ঠাকে অর্জন করে নিয়েছে এবং কুশীলবরা (নটদের আর এক নাম ছিল কুশীলব। রামায়ণের লবকুশের নামানুসারেই বোধহয় এদের এই নামকরণ হয়েছিল) ক্রমেই সংখ্যাতীত হয়ে উঠছে।

সমস্ত 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থটিই শ্লোকছন্দে রচিত। সেকালের প্রচলিত প্রথানুযায়ী গ্রন্থটি কথোপকথনের ভঙ্গিতে লেখা। ভরত অন্যান্য মুনিদের নাট্যকলা সম্পর্কিত নানা তথ্য বিবৃত করেছেন। তিনিই প্রধান কথকরূপে আপন বক্তব্য-বিষয় ব্যাখ্যা করে চলেছেন।

'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থে তখনকার প্রচলিত নাট্যসূত্র বা সিদ্ধান্তের উল্লেখ আছে। নাট্যানুষ্ঠানের জন্যই প্রথমে নাট্যসূত্রের উদ্ভব হয়। কিন্তু পরে এই সূত্রেরও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হল এবং লেখা হল ভাষ্য। কিন্তু ক্রমেই এ সাহিত্য এত বিপুল আকার ধারণ করতে লাগল যে মূল রচনার সংক্ষিপ্তসাররূপে নানাবিধ গ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকল এবং অবশেষে খ্রীষ্টজন্মের দু-শ বছর আগে নাট্য-সংক্রান্ত সমগ্র সাহিত্যকর্ম ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থে একটি সুসমঞ্জস রূপ লাভ করল। 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থের বিরাট গুরুত্ব এখানেই। নাট্যকলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তত্ত্বগত বা প্রয়োগগত এমন কোনো বিষয় নেই, যা 'নাট্যশাস্ত্র' প্রণেতার লেখনীতে উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করে নি।

আটত্রিশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ এই গ্রন্থটি নাট্যকলার নানা খুঁটিনাটি বিষয়ের বর্ণনায় অত্যন্তই জটিলতাপূর্ণ। আঠাশতম অধ্যায়ে যন্ত্রসঙ্গীতের কথা একটি সূত্রকর্মের আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং পুরো সাতটি অধ্যায় জুড়ে তার জটিল বর্ণনা দীর্ঘায়িত হয়েছে। নটনটীদের পোষাক-পরিচ্ছদ, অভিনেতৃবৃন্দের নির্বাচন এবং নাটকের শ্রেণীবিভাগ-সংক্রান্ত অধ্যায়গুলিও যথেষ্টই জটিল। 'নাট্যশাস্ত্রে' যে কথাটি বারে বারেই বলা হয়েছে, তা হল এই পৃথিবী ও জীবনের কাছে যা কিছু প্রয়োজনীয়, নাট্যকার ও অভিনেতার কাছে তার প্রয়োজন সমপরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই প্রাচীন ভারতীয় জীবনের প্রতিটি কলাবিদ্যা অত্যন্ত সুচারুভাবে 'নাট্যশাস্ত্রে'র পৃষ্ঠায় পরিবেশিত হয়েছে।

'নাট্যশাস্ত্র'-প্রণেতা নাট্যকলার সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়কলারও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 'নাট্যশাস্ত্রে'র শ্রেষ্ঠ টীকাকার অভিনবগুপ্ত এই দ্বিবিধ

আলোচনার সমর্থন প্রসঙ্গে বলেছেন যে প্রযোজক এবং নাট্যকার উভয়কেই নির্দেশ দানের জন্য এর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। যেহেতু নাটক প্রধানত দৃশ্যবহুল, তাই নাটক প্রযোজনার নিয়মাবলি নাট্যকারের পক্ষে মেনে চলা যে অত্যাবশ্যক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 'নাট্যশাস্ত্রে'র প্রণেতা নাটকের সাহিত্যিক এবং প্রয়োগগত দিক—এ উভয়ের মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ রয়েছে সে সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন এবং উভয়ের ওপরেই অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

'নাট্যশাস্ত্র' কত প্রামাণ্য গ্রন্থ ছিল, পরবর্তীকালে অঙ্গবিন্যাস, অলঙ্কারশাস্ত্র, সঙ্গীতকলা, ছন্দপ্রকরণ এবং ব্যাকরণের ওপরে রচিত প্রায় প্রতিটি তত্ত্বমূলক পুস্তকে 'নাট্যশাস্ত্রে'র বহুল উধৃতি থেকেই তা প্রমাণিত হয়।

ভারতীয় নাট্যের বৈশিষ্ট্য

প্রাচীন ভারতীয় কাব্যকলার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ হয়েছিল সংস্কৃত নাটকে এবং এই নাটকের মধ্য দিয়েই অভিব্যক্তি লাভ করেছিল ভারতীয় সাহিত্যস্রষ্টাদের সাহিত্যকলা সম্বন্ধে চূড়ান্ত অভিমত।

সংস্কৃত আলঙ্কারিক পণ্ডিতদের মতে কাব্য দুভাগে বিভক্ত—দৃশ্য অর্থাৎ যা দেখা যায় এবং শ্রব্য অর্থাৎ যা শোনা যায়। দৃশ্যকাব্যগুলিকে অর্থাৎ যে কাব্যে বর্ণিত বিষয়গুলিকে চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা হয়, সেগুলোকে আবার তাঁরা দশ ভাগে ভাগ করেছেন, যথা—নাটক, প্রকরণ, অঙ্ক, ব্যায়োগ, ভাণ, সমাকার, বীথী, ঈহামৃগ, ডিম ও প্রহসন।

নাটক হল দৃশ্যকাব্যেরই এক বিশেষ রূপ। সংস্কৃত আলঙ্কারিক কিংবা সংস্কৃত ভাষার কবি—এদের দুজনের কেউই কাব্য ও নাটকের মধ্যে ধরাবাঁধা কোনো সীমারেখা টেনে দিতে সচেষ্ট হন নি, কারণ কাব্য ও নাটক এ দুয়েরই লক্ষ্য ছিল কলাসম্মত সূক্ষ্ম বর্ণনাশৈলী অথবা শিল্পসমন্বিত ভাবপ্রকাশের মাধ্যমে মানবমনের মুখ্য ও সুকুমার অনুভূতিগুলোকে উদ্বোধিত করে তোলা।

নাটককে ঘটনাস্রোতের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার সংঘাতক্ষেত্র কিংবা মানসিক প্রবল অনুভূতিগুলোর বিশ্লেষণের মাধ্যমস্বরূপ বলে মনে করতেন না বলেই সংস্কৃত নাট্যকারগণ রঙ্গমঞ্চে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা অথবা কোনো বীভৎস দৃশ্য কিংবা কোনো অশ্লীল পরিস্থিতির উপস্থাপন থেকে বিরত থাকতেন। ভারতীয় নাটক যে আদর্শগতভাবে কখনও বিয়োগান্ত হয়ে উঠতে পারেনি, তার মূলে ছিল এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আর ভারতীয় মনন ও দার্শনিকচিন্তার সেই বিশিষ্ট ধারা যা

সর্ববস্তুর মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছে এক মঙ্গলধর্মের, যার মর্মকথাটুকু হল—দুঃখবেদনাবহুল যে কোনো জাগতিক ঘটনারই পরিণামে আছে পরম সুখ ও শান্তি।

নাটকে উপস্থাপিত সমগ্র বিষয়টিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার জন্য নাটকের মুখারম্ভে ও পরিশেষে সংযোজিত হত সকলের শুভাকাঙ্ক্ষাজ্ঞাপক একটি শ্লোক, যাতে দর্শকসাধারণের মনের ওপর নাটকাভিনয়ের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়।

ভারতীয় সংস্কৃতিবিদরা যেমন এ কথাটা মানতেন যে জাগতিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট কার্যকরণ সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি আবার বিশ্বাস করতেন যে আকস্মিক দুর্ঘটনা কিংবা দৈবী ঘটনা মহৎ জীবন ও মহৎ অভিলাষকে পরাভূত করতে পারে না। ভারতীয় সংস্কৃতি ও দার্শনিক চিন্তার সবচেয়ে বড় কথাটি হল এই যে সমগ্র বাস্তব জগত ও তার ঘটনাবলি মানুষের অদৃষ্টের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং তার পরম উদ্দেশ্য হল মানুষের নৈতিক ক্রম-বিকাশের পূর্ণতাসাধন। এমনকি সুকঠোর যে স্মৃতিশাস্ত্র, মানুষের পাপবর্ণনায় ব্যগ্রতার যার অন্ত নেই, সেখানেও দেখি পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধি লিপিবদ্ধ আছে। কোনো পাপ কিংবা অপরাধের পরিমাণ কখনো এত গুরু হতে পারে না যে প্রায়শ্চিত্য কিংবা শাস্তিভোগের মধ্য দিয়ে তাদের ক্ষালন সম্ভবপর নয়।

প্রাচীন ভারতের এই যে জীবনদৃষ্টি, তা তার শিল্পের আদর্শকেও প্রভাবিত করেছে। যা পরিবর্তনশীল এবং আকস্মিক ঘটনাপ্রবাহজাত—তার গুরুত্ব সর্বাধিক হতে পারে না। শেক্সপীয়রের নাটকে যখন আমরা দেখি, রাজা লিয়ার, ওথেলো কিংবা হ্যামলেট অসহ্য মর্মযাতনায় পীড়িত হচ্ছেন, তখন আমাদের মনে যে ভাবের উদ্ভব হয়, তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের বিশ্বাস করতে হয় যে সমগ্র ঘটনাপ্রবাহ জাগতিক শক্তিব্যবস্থার বিশৃঙ্খল বিন্যাস ও পুনর্বিন্যাসেরই পরিণতি এবং আকস্মিক দুর্ঘটনা ও দৈবী ঘটনাই ঘটনাচক্রের সর্বপ্রধান নিয়ামক, অতএব পৃথিবীতে নৈতিক ধর্মানুপ্রাণিত রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা কষ্টকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু ভারতীয় চিন্তার পরিপন্থী।

মহৎ শিল্প আমাদের সত্ত্বগুণকে জাগিয়ে তোলে। এই যে সত্ত্বগুণাবলি, এদেরই তিন বিশেষ অবস্থা থেকে উদ্ভূত হয় সত্য, মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যের অনুভূতি। ভারতীয় শিল্পতত্ত্ব অনুযায়ী কোনো অবিশুদ্ধ কলাসম্মত আনন্দের উৎপত্তি সম্ভবপর নয় এবং সকল আনন্দই চিত্তকে সর্বোত্তম সুখ ও পবিত্র ভাবে মণ্ডিত করে তোলে। এই কারণেই নাটকের পরিণতি যদি বিয়োগান্তমুলক হয়, তাহলেও অন্যান্য ঘটনার সাহায্যে এই পরিণতিকে শান্ত ও কোমল করে তুলতে হবেই। মহাকবি ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' নাটকের মুখ্য বিষয়বস্তু হল সীতার পরিত্যাগ।

কিন্তু এই পরিত্যাগ পর্বের যে বিয়োগব্যথা তা বহুলপরিমাণে প্রশমিত হয়ে ওঠে, তৃতীয় অঙ্কের ছোট্ট ঘটনাটির দ্বারা, যেখানে সীতার প্রতি রামের সুনিবিড় ভালোবাসা অপূর্ব সূক্ষ্মতার সাথে প্রকাশ পেয়েছে আর নাটকটির সুখাবহ পরিণতিও এ দিক দিয়ে সাহায্য করে অনেকখানিই।

পাঠকের মনকে সহজেই আকর্ষণ করে নেবার ক্ষমতা আছে, এমন একটি লোকপ্রসিদ্ধ ঘটনাকেই সাধারণত নাটকের গল্পাংশরূপে গ্রহণ করে নেওয়া হয়। এর পরে ঐ কাহিনীর মধ্যে ভাবাবেগমূলক যেটুকু সম্ভাবনা আছে, তারই পূর্ণতম বিকাশের কাজে নিযুক্ত হয় নাট্যকারের নৈপুণ্য। সংস্কৃত নাট্যকারদের বিরুদ্ধে সাধারণত একটি অভিযোগ আনা হয় যে তারা নাকি নাটকীয় গল্পাংশের প্রতি পরিপূর্ণ সুবিচার সাধনে নিজেদের বিশেষ কুশলী বলে পরিচয় দিতে পারেন নি। এ অভিযোগের সবটাই ভিত্তিহীন, এমন কথা বলা যায় না। নাটকীয় ঘটনাবলি ও চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে জীবনের ছবি প্রতিফলিত করে তোলার ব্যগ্রতা তাঁদের ছিল না। তাঁরা চাইতেন, দর্শকসাধারণের মনে একটা বিশেষ রসের উদ্বোধন, তা সে রস আদিভাবমূলক, বীরত্বব্যঞ্জক অথবা শান্তিভাবমূলক হোক না কেন।

প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকারদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ভাব ও কল্পনার এত আধিক্য থাকার ফলেই ব্যক্তিচরিত্রের চেয়ে আদর্শ চরিত্রের নির্বাচনই তাঁদের কাছে বেশি বাঞ্ছনীয় বলে বিবেচিত হত। এর ফলে রাজা, রাণী, মন্ত্রী, প্রেমিক ও ভাঁড় শ্রেণীর কতকগুলো বাঁধাধরা চরিত্র সৃষ্ট হয়ে উঠেছিল, কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যারা রূপলাভ করেছিল কতকগুলো স্থায়ী চরিত্রে। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও যে ছিল না, তা নয়। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের চারুদত্ত শুধুমাত্র মহৎগুণের আদর্শদৃষ্টান্তস্বরূপ নয়, সে পৃথিবীর সমস্ত ছলাকলাকৌশল সম্বন্ধেও অভিজ্ঞ। কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের নায়ক দুষ্যন্ত আবার ঠিক সেই ধরনের রাজা বা প্রেমিক নন, নাটকীয় রীতির অনুশাসনে যার প্রতিটি গতিবিধি পূর্ব-নির্ধারিত হয়ে আছে।

যেহেতু নাটকের আদর্শ রূপায়নের জন্য নাটকীয় বিভিন্ন উপাদানের ঘাত-প্রতিঘাত থেকে সঞ্জাত পরিস্থিতির মধ্যে সাম্য ও শান্তির ভাবকে প্রতিষ্ঠা করতে হবেই, তাই এমন কোনো ঘটনাকে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হতে দেওয়া চলবে না, যার দ্বারা দর্শক-সাধারণের অনুভূতি এতটুকুও আহত হতে পারে। রঙ্গমঞ্চে শিষ্টাচার-পালন সম্পর্কিত যে সমস্ত বিধি প্রবর্তিত হয়েছিল তার মধ্যে একটি হল—রঙ্গমঞ্চের ওপর কোনো মৃত্যুদৃশ্য অভিনীত হতে দেওয়া যাবে না। নিষেধাত্মক এই বিধি ও জীবনের প্রতি ভারতীয় মানসের প্রসন্ন ও নির্মল দৃষ্টিভঙ্গির ফলে কাব্যের

মতো নাটকেও বিয়োগান্তমূলক কোনো ঘটনার গভীর ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বড় একটা চোখে পড়ে না। মর্মস্পর্শী কোনো ঘটনা অথবা মানবজীবনের বিপদ ও দুঃখ বেদনার চিত্র হয়তো নাটকীয় গল্পাংশের বিকাশ-সাধনে সহায়তা করতে পারে এবং অন্তর্নিহিত রসের অভিব্যক্তি সাধনেও কার্যকরী হতে পারে, কিন্তু অনৈক্যের মধ্যে নাটক যেন কখনো পরিণতি লাভ না করে—মোটামুটি বক্তব্যটা যেন এই।

সংস্কৃত নাটকে ট্র্যাজেডি বা বিয়োগান্তমূলক ঘটনা একেবারেই নেই একথা অবশ্য ঠিক নয়। মৃত্যুকে একটা ঘটনারূপে পরিদৃশ্যমান করানোতেই সংস্কৃত নাট্যকারদের যত আপত্তি। প্রেমের বিচ্ছেদের মধ্যে যে ব্যথা এবং হৃদয়ের বেদনাময় অনুভূতির প্রকাশের মধ্যে যে কারুণ্য, তার মধ্যে খানিকটা ট্র্যাজেডির ভাব আছে বই কি। তাত্ত্বিক পণ্ডিতদের মত হল এই, শুধু মৃত্যু বর্ণনার মধ্যে ট্র্যাজেডির ভাবটা আর কোথায়—এ বিরাগজনক, ভয়ানক অথবা প্রকট একটা দৃশ্যমাত্রও তো হতে পারে। সংস্কৃত নাট্যকারদের আপত্তিটা ছিল এখানেই।

'নাট্যশাস্ত্র'-প্রণেতা ভরত নাট্যের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলছেন যে, "নাট্য হল ধর্ম ও যশলাভের উপায়স্বরূপ, দীর্ঘজীবন এবং বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতিসাধনে সাহায্যকারী এবং সর্বসাধারণের পক্ষে পরম শিক্ষামূলক।" সকল জ্ঞান, শিল্প ও কলাবিদ্যার সামগ্রিক পরাকাষ্ঠা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে এই নাট্যকলার মধ্যে। মানবজীবনের বিভিন্ন ঘটনা এবং মানবচরিত্রকে অনুকরণের মাধ্যমে রূপদান করাই হল নাট্যের উদ্দেশ্য। আর্ত, ক্লান্ত, ও হতভাগ্য ব্যক্তির জীবনে এ নিয়ে আসে সন্তোষ ও বিশ্রাম এবং যারা দুঃখভারে জর্জরিত, তাদের এ দান করে সান্ত্বনা।

অনুকরণের মাধ্যমে পুনরায় বর্ণিত হয়ে যা শিল্পরূপ লাভ করে, ভরতের মতে তাই হল নাট্যশিল্প। এই বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই 'ধনঞ্জয়' নাট্যকে ব্যাখ্যা করেছেন কোনো অবস্থার পুনঃপ্রদর্শকরূপে এবং যেহেতু অভিনেতাদের ব্যক্তিচরিত্রের মধ্য দিয়ে নাটকের বিভিন্ন চরিত্র দৃশ্যমান রূপ লাভ করে, তাই নাটককে আবার অভিহিত করা হয়েছে 'রূপক' রূপে। অনুকরণের উদ্দেশ্য নিয়েই কোনো নাটকের অনুষ্ঠান কতখানি সার্থক বলে বিবেচিত হতে পারে, এ নিয়ে ভরতের সমালোচক ও টীকাকারেরা নানা পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

ভরতের টীকাকারদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন অভিনবগুপ্ত। প্রাচীন ভারতের এই অতি বিচক্ষণ ও বিশিষ্ট শিল্পসমালোচকটি নাটকের অনুকরণরূপী সংজ্ঞাটির তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে, সঙ্গীত নৃত্য অভিনয় সাজসজ্জা এবং রঙ্গমঞ্চের পরিবেশের মধ্য দিয়ে নাট্যানুষ্ঠান রুচিবিজ্ঞানসম্মত আনন্দ-উপভোগের মাধ্যমরূপে একটি সম্পূর্ণ নতুন শিল্পরূপ লাভ করে; তখন

তাকে শুধুমাত্র অনুকরণ নামে অভিহিত করা কোনোমতেই চলতে পারে না। অন্যের গতিভঙ্গির অনুকরণ হাস্যেরই উদ্রেক করে মাত্র এবং অন্য ব্যক্তির মানসিক অনুভূতি ও হৃদয়াবেগের অনুকরণ প্রায় অসম্ভব। সঙ্গীতের প্রভাব, অন্যান্য নটনটীদের সান্নিধ্য এবং রঙ্গমঞ্চের পারিপার্শ্বিক অভিনেতার মনকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যার ফলে সে তার পার্থিব অথবা তৎকালীন ব্যক্তিত্বকে বিস্মৃত হয়ে নিজেকে রূপান্তরিত করে এমন এক নাট্যোচিত ব্যক্তিত্বে, যার ফলে নাটকীয় ঘটনার সঙ্গে সাযুজ্যরক্ষাকারী এক সম্পূর্ণ নতুন জগত তার মানসদৃষ্টির সম্মুখে আবির্ভূত হয়। এরই সঙ্গে যেন সঙ্গতি রক্ষা করে তার নাট্যানুষ্ঠান এক নূতন ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে।

সংলাপরূপী আবৃত্তির সঙ্গে যখন যুক্ত হয় সাবলীল দেহভঙ্গিমা, গতিছন্দ, নৃত্য, সাজসজ্জা, সঙ্গীত এবং অভিনয়ের মধ্য দিয়ে হৃদয়ের অনুভূতি ও আবেগ যখন বাঙ্‌ময় রূপলাভে মণ্ডিত হয় সার্থকতায়, তখনই নাট্যানুষ্ঠান শিল্পের মর্যাদায় ভূষিত হয়ে ওঠে। অভিনয়ের মধ্যে শিল্পরূপের সুষ্ঠু প্রকাশে দর্শকবৃন্দের চিত্তও অনুরূপ হৃদয়াবেগে স্পন্দিত হয়ে ওঠে।

নাটকের কাঠামো অথবা ঘটনাংশ গড়ে উঠবে ঠিক এমনভাবে, যাতে ধর্ম অর্থ ও কামের মূলগত উদ্দেশ্য একে অপরকে অতিক্রম করার চেষ্টা না করে এবং এক অমঙ্গলজনক পরিণতির হাত থেকে নাটক রক্ষা পায়। কেননা, শিল্পকর্মরূপে নাটককে সমগ্রতা লাভ করতে হবেই—এ হবে, একটি চক্র যেমন আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, ঠিক তেমনি। আমরা দেখি, একমাত্র ভাসকে বাদ দিয়ে আর প্রায় সমস্ত সংস্কৃত নাট্যকারই এই কাব্যরীতিকে মেনে নিয়েছিলেন যে কোনো নাটকের পরিণতিই যেন অমঙ্গলজনক না হয়ে ওঠে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভারতীয় চিন্তাজগতে দুঃখ ও নৈরাশ্যবাদের আধিক্যের অভিযোগ পেশ করেছেন, কিন্তু যে বিষয়টি বিশেষরূপে বিচার্য, তা হচ্ছে এই যে, প্রাচীন ভারতীয়রা দুঃখকে ঘটনাচক্রের অংশমাত্ররূপে গণ্য করে নিলেও তাদের সমগ্রতা বা পূর্ণতার যে দৃষ্টিভঙ্গি তার কাছে এই দুঃখের রূপ হচ্ছে নেতিবাচক। সামগ্রিক রূপের মধ্য দিয়ে অন্যান্য শিল্পকর্মের মতো প্রত্যেক নাটকেরই লক্ষ্য হবে সত্যের উপলব্ধি। এই উপলব্ধির পথ পৃথক হতে বাধা নেই। এই কারণের জন্যই একটি পূর্ণসমৃদ্ধ নাটকের গল্পাংশ পাঁচটি বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ করা হত, যাদের নাম দেওয়া হয়েছিল মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও নির্বহন। এই পাঁচটি অংশের মধ্য দিয়ে নাটকের রূপটি ক্রমশ বিকশিত হয়ে ওঠে। নাটকীয় গল্পাংশের এই যে পাঁচটি বিশেষ অবস্থা, পরস্পরের সাথে এক ঐক্যের

যোগসূত্রে বাঁধা এরা। আমাদের সমগ্র জীবনের একটি ছোট চুম্বক যেন এই ঐক্যসূত্রের মধ্য দিয়ে প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে। জীবনে সংকটের আবর্ত আছে, দুঃখ আছে, বেদনা আছে, নৈরাশ্য আছে, কিন্তু সর্বশেষে আছে পূর্ণতা, যার মূর্তি আমরা আশান্বিত হৃদয়ে সযত্নে ধারণ করে রাখি। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির কাছে নাটক হচ্ছে সমগ্র জীবনের প্রতিচ্ছবিস্বরূপ। সমগ্রতার মধ্য দিয়েই যে সত্যের প্রকাশ, খণ্ডতা ও অপূর্ণতার মধ্যে জীবনের যে রূপ, তা তো অসত্যেরই নামান্তর মাত্র।

প্রাচীন ভারতীয় ও গ্রীক নাট্যের আলোচনা

সংস্কৃত নাট্য কথাটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল ড্রামা। ভারতীয় নাট্যকলার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের মূলে কোনো কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিত গ্রীক নাট্যকলার প্রভাবের কথা কল্পনা করেছেন। প্রাচীন ভারতের নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক নাটকের তুলনা করতে বসলে কোনো কোনো বিষয়ে মিল যে খুঁজে পাওয়া যাবে না, এমন নয়। তবে ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' নাটক মঞ্চস্থ করার যে রীতিপদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে, তার গভীর অনুধাবনের মধ্য দিয়ে দেখা যাবে ভারতীয় নাটক ও গ্রীক নাটকের মধ্যে মূলগত পার্থক্যও পরিস্ফুটরূপে বর্তমান।

রূপক বা রূপ ও প্রেক্ষ—এই যে শব্দগুলি, এরা নাটকের সঙ্গে সমার্থকরূপেই ব্যবহৃত হয়েছে। অভিনয় ও নৃত্যাদির সাহায্যে নটনটীরা নাটকের আখ্যানবস্তুকে রূপদান করে বলেই এর নাম হয়েছে রূপক বা রূপ। আর প্রেক্ষ শব্দটির অর্থ হচ্ছে দৃশ্য। ভারতীয় নাটকে এই দৃশ্যেরই প্রাধান্য আর গ্রীক নাটকে প্রাধান্য লাভ করেছে এ্যাকসন্ বা নাটকীয় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত। এ্যারিস্টটল্ গল্প বা নাটকীয় কাহিনীর ওপরে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ভূষণ বা সাজসজ্জা তার কাছে মোটেই তাৎপর্যপূর্ণ নয়। তিনি বলছেন—

'Terror and pity may be raised by decoration—the mere spectacle but they may also arise from the circumstance of the action itself, which is far preferable and shows a superior poet. For the fable should be so constructed that without the assistance of the sight its incidents may excite horror and commiseration in those who hear them only. .. But to produce this effect by means of the decoration discovers want of art

in the poet who must also be supplied with an expensive apparatus."

ভারতীয় নাটকে ভূষণ অর্থাৎ পরিচ্ছদ এবং ছদ্মবেশ ধারণের সাজ-সরঞ্জামাদি বিশেষ গুরুত্বের আসন লাভ করেছে। অভিনয়ের অন্যান্য উপাদান যেমন আঙ্গিক, বাচিক ও সত্ত্বের মতো এও নাট্যকে তার যথাযোগ্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে যথেষ্টই সাহায্য করে থাকে। গ্রীক থিয়েটারে ব্যাপারটা ছিল অন্য রকম। ট্র্যাজেডি বা বিয়োগান্তমূলক কোনো কাহিনীকে মঞ্চস্থ করার সময় যদি নাটকে বক্তৃতা বা কথা বলার দিকটা মোটামুটি সমৃদ্ধ থাকত তাহলে গ্রীকরা দৃশ্যের ব্যাপারে তত গুরুত্ব আরোপ করতেন না। এ্যারিস্টটল নিজেই বলছেন, "The power of tragedy is felt with representation and actors।"

নাট্য দ্বারা তিনি কি বোঝাতে চান তারই ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভরত তাঁর 'নাট্যশাস্ত্রে'র প্রথম অধ্যায়ে বলছেন—

"দেবতানাং মুনীনাং চ রাজ্ঞামথ কুটুম্বীনাম্
কৃতানুকরণং লোকে নাট্যমিতি অভিধীয়তে।"

অর্থাৎ কোনো রচনায় দেবতা, মুনি, রাজা, গৃহস্থলোক আদির আচরিত কর্মের অনুকরণ থাকলে তবে তাকে নাট্য বলা হয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিল পাওয়া যায় সিসারোর (Cicero) কথার, যখন তিনি বলছেন যে, "Drama is a copy of life, a mirror of customs, a reflection of truth."

ওয়েবার (Weber) নামে এক ইয়োরোপীয় পণ্ডিত সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন যে ভারতীয় নাট্যগঠনের সৃষ্টিশীল প্রেরণা গ্রীসের সাথে ভারতের যোগাযোগের মধ্য দিয়েই এসেছিল। ব্যাকট্রিয়া, পাঞ্জাব এবং গুজরাটে তখন যে সমস্ত গ্রীক রাজারা রাজত্ব করতেন তাদের রাজসভায় নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। এরা শুধু সৈন্য নিয়েই এ দেশ জয় করতে আসেন নি, গ্রীক সংস্কৃতিকেও তারা বয়ে এনেছিলেন এদেশের মাটিতে।

উইণ্ডিশ্ খ্ (Windisch) নামে আর এক পণ্ডিতের মত হচ্ছে এই যে ৩৪০ থেকে ২৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে গ্রীসে যে নিউ এ্যাটিক কমেডি (New Attic Comedy) সমৃদ্ধি লাভ করেছিল, তাই হচ্ছে ভারতীয় নাট্য-প্রেরণার মূল কেন্দ্রস্বরূপ। যে পণ্ডিত যত বড় কথাই বলুন না কেন, আসলে যোগসূত্রের মাধ্যমগুলো ছিল স্বল্পাধিক স্বল্প। রোমান বা গ্রীক নাটক ও সংস্কৃত নাটক দুইই কতকগুলো অঙ্কে ভাগ করা থাকত। সাধারণত

এ নাটকীয় অঙ্কের সংখ্যা হত পাঁচ আর প্রায় উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যেত যে কোনো অঙ্কের অভিনয় শেষ হলে নটনটীবৃন্দেরা প্রায় একই সাথে রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রস্থান করতেন। ভারতবর্ষে এই নাটকীয় অঙ্কের সংখ্যা কখনও কখনও একটু বেশি হতেও দেখা যেত। এই দু-একটি ব্যাপারে খানিকটা করে মিল খুঁজে পাওয়াটা ঘটনাচক্রের সামান্য একটা যোগাযোগ ছাড়া আর কিছুই নয়।

সংস্কৃত নাটকে অঙ্কবিভাগ করা হত সাধারণত ঘটনাচক্রের ঘাত-প্রতিঘাতের বিশ্লেষণের ধারার ওপর নির্ভর করে, কিন্তু গ্রীক অথবা রোমান নাটকে ঠিক এ পদ্ধতি অনুসৃত হতে দেখা যায় না। কিছু কিছু আরো মিল দেখা যায় দৃশ্যগত রীতিপদ্ধতির বিচারে, জনান্তিক অভিনয়ে ও অভিনেতাদের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ও ও নিষ্ক্রমণের মধ্যে। বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায় যে প্রথাটিতে, সেটি হল এই যে কোনো নূতন চরিত্রের রঙ্গমঞ্চে আগমনের অভিজ্ঞানটুকু রঙ্গমঞ্চে অভিনয়রত অন্য কোনো চরিত্রের মুখ দিয়ে দর্শকবৃন্দকে পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দিতে হবে। সংস্কৃত ও গ্রীক নাট্যাভিনয়ের মধ্যে এই যে কতকগুলো বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে, তা দেখে বস্মিত হবার কোনো কারণই নেই। প্রায় একই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে অনুষ্ঠিত নাট্যাভিনয়ের মধ্যে এ ধরনের আঙ্গিকগত মিল দেখতে না পাওয়াটাই কি বিচিত্র হত না ? আধুনিক থিয়েটারেও তো সেই একই প্রথার অনুকরণ দেখতে পাওয়া যায়।

ভারতীয় নাট্যকলার ওপর গ্রীক নাট্যকলার প্রভাবের বর্ণনা দিতে গিয়ে কোনো কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিত 'যবনিকা' শব্দটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই 'যবনিকা' শব্দটির দ্বারা রঙ্গমঞ্চের পশ্চাতপট ও নটনটীবৃন্দের বিশ্রামকক্ষের সামনেকার পর্দাকেই নাকি বোঝাত। কথাটি 'যবন' শব্দটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত কিনা তা অবশ্য আলোচনার অপেক্ষা রাখে। কেউ বলেন, মুল কথাটি হচ্ছে 'যমনিকা' যা সেকালের প্রাকৃতে হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'জবনিকা'। এ শেষোক্ত রূপে শব্দটি জ-কার পরিবর্তিত করে আবার 'যবনিকা' রূপ ছদ্ম-সংস্কৃত চেহারা নিয়েছে। আবার কারো মত হচ্ছে এই যে, যবনিকা শব্দটি বিশেষণ রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর অর্থ হল আয়োনিয়ান (Ionian)। যে গ্রীকদের সঙ্গে ভারতীয়েরা প্রথমে পরিচিত হয়েছিল, তাদেরই এ নামে ডাকা হত। তবে আয়োনিয়ান শব্দটির দ্বারা শুধু যে গ্রীকদেরই বোঝাত তা নয়, হেলেনীয় পারস্য সাম্রাজ্য, মিশর, সিরিয়া, ব্যাকট্রিয়া প্রভৃতি দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে কোনো কিছুকেই বোঝাত। পর্দার সাথে যখন সম্পর্কযুক্ত, তখন শব্দটির বিশেষণরূপে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, পর্দার

কাপড়টা ছিল বিদেশী—হয়তো পারস্য থেকে আনা এক জাতের চিত্রিত কাপড়, জাহাজে করে গ্রীক সদাগরেরা যাদের ভারতে নিয়ে আসতেন। রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থাপনার উপাদান হিসেবে গ্রীস দেশ থেকে যদি এ জিনিষটিকে আনাই হত, তাহলে ভারতে থিয়েটারের পর্দারূপে 'যবনিকা' শব্দটির বিশেষ প্রয়োগ আমাদের চোখে পড়ার কথা, কিন্তু আদতে তেমনটা হয় নি। আর প্রাচীন গ্রীক রঙ্গমঞ্চে কোনো যবনিকা বা পর্দার ব্যবহারই ছিল না।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, প্রাচীন গ্রীক ও সংস্কৃত নাটকের মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে বিশেষ সাদৃশ্য বা ঐক্যবোধ আছে বলে ধরে নেওয়া হলেও সংস্কৃত নাটকে গ্রীক নাটকের জোরালো কোনো প্রভাবের মূলকে খুঁজতে যাওয়ার চেষ্টা ব্যর্থতাতেই পর্যবসিত হবে। মৌলিক পার্থক্যের পরিমাণ এত বেশি যে একটির অপরকে প্রেরণাদান করা অথবা প্রভাবান্বিত করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না এবং যেটুকু সাদৃশ্য দেখা যায় তা দুটি শক্তিশালী নাট্যচেতনার স্বাধীনভাবে সমৃদ্ধি লাভ করারই পরিণতি। সংস্কৃত নাটকে ক্লাসিকাল ধারার চেয়ে বিশেষ করে কল্পনাপ্রবণতার আধিক্যটাই বেশি এবং গ্রীক নাটকের চেয়ে বরং এলিজাবেথীয় যুগের নাটকের সাথে এর অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত নাটকে নাটকীয় দুটি অঙ্কের মধ্যে অথবা একই অঙ্কের মধ্যে সময় এবং স্থানগত কোনো ঐক্যবোধ একেবারেই দেখতে পাওয়া যায় না। নাটকীয় দুটি অঙ্কের মধ্যবর্তী ঘটনার কাল বারো বৎসরেরও অধিক হতে পারে এবং কোনো অঙ্কের ব্যাপ্তি প্রায়ই চব্বিশ ঘণ্টার বেশি হয়ে পড়ে। কোনো দৃশ্যের ঘটনাচক্র অতি সহজেই পৃথিবী থেকে স্বর্গে স্থান বদল করে চলে। গ্রীক নাট্যকারেরা এই স্থানগত ও কালগত ঐক্যের নিয়মকে বিশেষ বাঁধবাঁধিভাবে মেনে চলতেন।

গ্রীক ও সংস্কৃত নাটকে আবার কতকগুলো চরিত্রের মধ্যে খানিকটা সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় বলেই বিশেষ কোনো সিদ্ধান্তে পৌছনো চলে না। সংস্কৃত নাটকের বীর, বিদূষক, শকর প্রভৃতি চরিত্রগুলির সমস্থানীয় চরিত্র হল গ্রীক ও রোমান নাটকের প্যারাসাইট বা চাটুকার। কিন্তু ভারতীয় বীট চরিত্রের মধ্যে যে রুচিসম্পন্ন মন ও সংস্কৃতিচেতনা আছে, গ্রীক প্যারাসাইটের মধ্যে তার অভাবটাই বিশেষ করে চোখে পড়ে।

গান্ধার-প্রদেশের গ্রীক-প্রভাবযুক্ত মূর্তিশিল্প দেখে কেউ কেউ অনুমান করেছেন ঐ শিল্পের প্রেরণা ভারতীয়েরা গ্রীকদের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে জোর করে কোনো কিছু বলা চলে না। কোনো কোনো পণ্ডিত

এ মতের খণ্ডন করে ভারতীয় মূর্তিশিল্পের স্বাধীনভাবে উৎপত্তির সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছেন। মূর্তিশিল্পের ক্ষেত্রে যাই হোক না কেন, নাট্যকলার মধ্যে গ্রীক প্রভাবকে আবিষ্কার করা একটু কষ্টকল্পনা বলেই মনে হয়। গ্রীক নাট্যকলার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলার মৌলিক ভেদগুলোর কথা স্মরণে রাখলেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ছাড়া গত্যন্তর আছে বলে মনে হয় না।

ভারতীয় নাট্যের প্রয়োগ-সমস্যা

ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থটি প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকারদের কাছে ছিল বেদস্বরূপ। ভারতীয় নাট্যচেতনা ও নাট্যধারার উন্মেষসাধনে এ পুস্তকখানির অবদান অসামান্য। অনুকরণের মধ্য দিয়েই অন্যের আচরণ ও অনুভূতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হবে নাটকে। মানুষ, দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব, দৈত্য, রাক্ষস আদির কার্যাবলির অনুকরণ নাটকে কিভাবে অনুসৃত হবে, 'নাট্যশাস্ত্রে' সে সম্পর্কে সুবিস্তৃত নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ আছে। পরিবেশনার এই নিয়মাবলির জন্যই ভারতীয় নাটক দৃশ্যকাব্য নামে অভিহিত হয়েছে। এভাবে নামাঙ্কিত হওয়ার ফলে মহাকাব্য অথবা আখ্যানমূলক কাব্য এবং উপন্যাসের সঙ্গে তুলনায় এর পৃথক সত্তাটুকু সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে। নাটক মুখ্যত দৃশ্যপ্রধান এবং মানুষ, দেবতা ও উপ-দেবতার কার্যাবলি অনুকরণের মাধ্যমে পরিস্ফুট হচ্ছে ঐসব দৃশ্যের মধ্য দিয়ে। এখন কথা হচ্ছে এই অনুকরণের দ্বারা ভারতীয় তত্ত্ববিদগণ ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন? বাস্তবের হুবহু বর্ণনাই হবে অনুকরণের উদ্দেশ্য, এই কি তাদের বক্তব্য ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর লাভের জন্য ভারতীয় নাট্যের রীতিধর্মের আলোচনা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

ভারতীয় তত্ত্ববিদগণ অতি প্রাচীনকাল হতেই নাটক পরিবেশনার সমস্যার ওপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন এবং একটি নাটক মঞ্চস্থ করতে গিয়ে ঠিক কতটুকু বাস্তবতাকে দেখাতে হবে আর কতটুকুই বা দৃষ্টির আড়ালে রেখে দিতে হবে, তা সঠিকরূপে নির্ণয় করার জন্য তারা বিশেষভাবে জিজ্ঞাসু হয়ে উঠেছিলেন।

তাঁদের এই তত্ত্বজিজ্ঞাসু মনের আন্তরিকতা ও বিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ভারতীয় নাট্যকলাকে স্বাভাবিক প্রথানুসারী এই দু-ভাগে বিভক্ত করার মধ্য দিয়ে। শাস্ত্রকার স্বাভাবিককে বলেছেন 'লোকধর্মী' (popular) এবং প্রথানুসারীকে নাম দিয়েছেন 'নাট্যধর্মী' (theatrical)। 'নাট্যশাস্ত্রে'র মতে লোকধর্মী অভিনয়কলা তাকেই বলা যেতে পারে যার দ্বারা মানবমানবীর স্বাভাবিক ব্যবহার ও ভাবভঙ্গি রঙ্গমঞ্চের ওপর রূপায়িত হয়ে উঠবে। নৃত্য, সঙ্গীত,

অঙ্গভঙ্গি ও বাকবিন্যাস প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে কিভাবে রূপলাভ করবে 'নাট্যশাস্ত্রে' তার রীতিপদ্ধতি সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনা আছে। তা থেকে এই কথাটাই নিশ্চিতরূপে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে যে প্রাচীন ভারতীয় রঙ্গালয়-পরিচালকেরা বহুকাল আগেই এই সরল সত্যটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে প্রকৃত শিল্পমাত্রেই কিছুটা কৃত্রিমতাদোষে দুষ্ট হতে বাধ্য। এই যে কৃত্রিমতা তা নাটকীয় বিভিন্ন রীতির মাধ্যমে স্বীকৃতি লাভ করেছে। রঙ্গমঞ্চের ওপর এই নাটকীয় রীতির অনুকূল প্রয়োগকলার একটি বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছে জনান্তিকে কথা বলা অথবা স্বগতোক্তি। নাট্যাভিনয়ে চরম বাস্তবতার যারা ধ্বজাধারী, তারা অভিনয়ের এই বিশেষ আঙ্গিকগুলোকে অস্বাভাবিকতা দোষে চিহ্নিত করতে পারেন। তাদের এ অভিযোগ অস্বীকার করা যায় না, তবে নাটকের রচনাশৈলী ও মঞ্চের ওপর অভিনীত রূপের সাথে সম্পর্কযুক্ত সমস্ত পরিস্থিতির গভীর পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে যে সত্যটুকু ধরা পড়বে তা হচ্ছে এই যে দর্শকসাধারণ যদি বাস্তবতাকে কঠোরভাবে দাবি করতে থাকেন, তাহলে কোনো প্রকৃতির নাট্যাভিনয়ই আর সম্ভব হয়ে উঠতে পারে না। প্রাচীন ভারতীয় ও গ্রীকরা কেউই এ ধরনের একটা অসঙ্গতি মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলার সমালোচনা যারা করে থাকেন, তারা যদি নাটকের মঞ্চরূপের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন নাটকীয় রীতির উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তাকে বুঝতে চেষ্টা করেন, তাহলে ভাস কালিদাস শূদ্রক ও বিশাখদত্ত প্রভৃতি প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের শিল্পধর্মের তাৎপর্য অনেক সহজেই তাদের কাছে প্রতিভাত হবে।

প্রাচীন গ্রীক নাট্যকারদের মতো ভারতীয় নাট্যকারেরা নাটকীয় আখ্যান-বস্তুর ঘটনাকালকে নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য প্রয়োজনীয় যে সময় তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে সচেষ্ট হন নি। আবার নাটকাভিনয়ে অংশগ্রহণকারী নট-নটীবৃন্দের অভিনয়কালীন স্থানকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া সম্পর্কেও বাঁধাবাঁধি কোনো নিয়ম তারা মানতেন না। তবে অভিনীত স্থান ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে, এইটেই বাঞ্ছনীয় বলে বিবেচিত হত।

নাটকের মুল কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ঘটনাবলির অভিনয়রূপ দান প্রসঙ্গে স্থানগত বা কালগত কোনো বাঁধাবাঁধি নিয়ম না থাকলেও ভাবগত যে ঐক্যবোধ নাটকাভিনয়ের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠবে তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নাট্যকারকে বিশেষরূপে অবহিত থাকতে হবে। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য 'নাট্যশাস্ত্রে' কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে।

নাটকের 'বীজ' হচ্ছে আখ্যানবস্তুর সেই অংশ যাতে নাটকীয় ব্যাপারের সূচনা পরিলক্ষিত হয়। আর 'বিন্দু' বলা হয় 'নাটকের' শেষ অংশটিকে যেখানে নাটকীয় ব্যাপার বাধা পেতে পেতে আবার বেগের সঙ্গে এগিয়ে চলে। 'নাট্য-শাস্ত্রে'র বক্তব্য হচ্ছে এই যে নাটকের প্রতিটি অঙ্কের সঙ্গে নাটকের 'বীজ' ও 'বিন্দুর' সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে এবং প্রধান নায়ককে প্রতি অঙ্কে একবার করে আবির্ভূত হতে হবে কিংবা সেখানে অন্তত তার উল্লেখ যেন থাকে, এরকম ব্যবস্থা করতে হবে।

একটি অঙ্কে খুব বেশি ঘটনার সন্নিবেশ করা চলবে না এবং সরাসরি পরিবেশনার মধ্য দিয়ে যে সব ঘটনার দৃশ্যরূপ নাটকের ভাবগত ঐক্যকে ব্যাহত করতে পারে তাদেরও মঞ্চাভিনয় থেকে বিরত থাকতে হবে। একটি প্রবেশক দৃশ্যে তাদের উল্লেখমাত্র করা চলতে পারে। এ ছাড়া নাটকের কোনো অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত কোনো ঘটনার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে অঙ্কের অভিনয়ের পূর্বে ছোট একটি ব্যাখ্যানমূলক দৃশ্যের অবতারণা করতে হবে। এ সমস্ত আঙ্গিকের সমন্বয় শুধু যে নাটকের ভাবগত ঐক্যকে পরিস্ফুট করে তুলতে সাহায্য করবে তাই নয়, নাটকের কাহিনীর ক্রমাভিব্যক্তির মধ্যে সঞ্চার করে তুলবে এমন এক গতিধর্মকে, নাট্যরূপের সার্থক পরিবেশনার জন্য যার প্রয়োজন অনুভূত হয় অপরিহার্যরূপে।

দর্শকসাধারণের ব্যক্তিগত রুচিবোধের এই যে বিচিত্রতা, তা 'নাট্যশাস্ত্র'-প্রণেতাকে তার নাট্যসাফল্য-বিষয়ক তত্ত্ব প্রতিপাদনের সময় বিশেষভাবে বিচার করে দেখতে হয়েছিল। নাট্যানুষ্ঠানের সাফল্যকে তিনি দৈবিকী ও মানষী, এই দুভাগে ভাগ করেছেন। অভিনয়রূপের মধ্য দিয়ে নাটকের গভীর মর্মকথা যখন বাঙ্‌ময় হয়ে ওঠে তখনই লাভ হয় দৈবিকী সাফল্য এবং এই সাফল্যলাভ সম্ভব হয়ে উঠতে পারে একমাত্র উচ্চ সংস্কৃতিচেতনাসম্পন্ন দর্শকবৃন্দের উপস্থিতিতেই। মানষী সাফল্যের প্রাপ্তি ঘটে নাটকের অগভীর ও বাহ্যিক রূপের সার্থক রূপায়নে এবং অতি সাধারণ রুচিজ্ঞানসম্পন্ন দর্শকসাধারণের উপস্থিতিতেই এই সাফল্য সূচিত হয়ে উঠতে পারে। এরাই আবার বিপুল হর্ষধ্বনি ও অন্যান্য ভাবপ্রকাশের মাধ্যমে এদের আগ্রহ বা অনাগ্রহের বাহ্যিক প্রকাশকে অত্যন্ত পরিষ্কার ও জোরালোভাবে রূপদান করতে পারে। উচ্চ অনুভূতি সম্পন্ন দর্শকবৃন্দ কিন্তু নাটকের গভীর ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণমূলক অংশের সার্থক অভিনয়ের প্রতি সমর্থনসূচক মনোভাব প্রকাশের মধ্য দিয়েই তাদের গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়ে থাকেন।

ভারতীয় সভ্যতার মধ্যযুগে শেষোক্ত দর্শকসাধারণের অভিমতের ওপরেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হত এবং সেই অভিমতের যথার্থ প্রকৃতির বিশ্লেষণে বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞ সমালোচকেরা ব্যাপৃত থাকতেন। নাট্যের প্রয়োগকলার প্রধান উদ্দেশ্য হল দর্শকের মনে রসসঞ্চার করে তাকে আনন্দ দান করা। ভরতমুনি তাঁর 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপরে তার রসতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই রসতত্ত্বের প্রতি পরম আনুগত্যের মনোভাব নিয়ে নাট্যসমালোচকেরা রুচিশীল দর্শকমনের ওপর নাট্যের প্রভাবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ পরম যত্নের সঙ্গে নিষ্পন্ন করেছেন।

পরবর্তীকালে অবশ্য 'নাট্যশাস্ত্র' বা নাট্যবেদের নিয়মাবলি ছাড়াও সাধারণ দর্শকবৃন্দের অভিমত নাট্যানুষ্ঠানের সামগ্রিক বিচারের অন্যতম মানদণ্ড হয়ে পড়ে। নাটক সামাজিক আনন্দভোগের উপায়স্বরূপ বলে বিবেচিত হত বলেই নাট্যবিশেষজ্ঞদের বিচারের ধারার মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন বলে বিবেচিত হয়েছিল। এ জন্যই দেখা যায়, পরবর্তীকালে নাট্যাভিনয়ের সামগ্রিক বিচারের প্রয়োজনে যে বিচারকমণ্ডলী গঠিত হত তাঁরা মনোনীত কয়েকজন দর্শকের সাহায্যে তাঁদের সিদ্ধান্ত প্রস্তুত করতেন এবং এই সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই কোনো নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যাঁরা নির্বাচিত হতেন তাঁদের পুরস্কৃত করা হত।

নাটক সমালোচনা

অনেক প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয়েরা নাটককে প্রধানত প্রেক্ষ অর্থাৎ দেখার বস্তুরূপে বিচার করে এসেছেন, কাজেই নাটকের অভিনয়দর্শনমানসে সমবেত মানুষেরা অভিহিত হয়েছেন প্রেক্ষক বা দর্শকরূপে। নাটকে কথার অংশ অর্থাৎ শ্রব্য বিষয় যথেষ্ট পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও এদের শ্রোতৃ বলা হত না কখনই, ফলে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকের দৃশ্যরূপ ছাড়া আর কোনো আঙ্গিকের সাহায্যে নাটককে বিচারের প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে না। ভাস, কালিদাস ভবভূতি, শূদ্রক প্রভৃতি প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারবৃন্দের নাটকাবলি প্রকাশিত হবার পরেও ভারতীয়দের কাছে নাটকের সমাদর ছিল প্রধানত তার দৃশ্যবহুল রূপের জন্যই। ঐতিহ্যগত কাঠামোর মধ্যে রচিত হওয়া সত্ত্বেও এই সব নাটক বিরাট সাহিত্যসৃষ্টির মর্যাদা লাভ করতে পেরেছিল।

যেহেতু নাটক হচ্ছে প্রধানত দেখার বিষয়, কাজেই নাটকাভিনয় দেখতে আসেন যারা, তারাই নাটকের যথাযথ বিচার করতে পারেন। এ যে শুধু

প্রাচীন ভারতের অভিমত তাই নয়, আধুনিক নাট্যপ্রযোজকেরাও তাদের নাটকাভিনয়ের প্রকৃত বিচারের অপেক্ষা রাখেন যারা নাটক দেখতে আসেন, সেই দর্শকসাধারণের মতামতের ওপরে।

অতএব নাটকের অভিনয়-রূপের বিচার নির্ভর করবে সমবেত সাধারণের ওপরেই। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, যে মানুষেরা ভিড় করে নাট্যানুষ্ঠান দেখতে আসবে, তাদের রুচি ও মানসিক প্রবণতা হবে বহুবিধ বৈচিত্র্য সম্পন্ন। দর্শকসাধারণের মতামতের ওপরে কতখানি গুরুত্ব আরোপ করা চলতে পারে সে সম্পর্কে খানিকটা আলোক এভাবে আমরা পেতে পারি। নাট্যের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে 'নাট্যশাস্ত্র'-প্রণেতা এক জায়গায় বলছেন যে, "এ নাট্য ধর্মাচারীদের শেখাবে ধর্ম, কামোপসেবীদের শেখাবে কামভোগ, দুর্বিনীতদের করবে নিগ্রহ, বিনীতদের বাড়াবে দমক্রিয়া বা ইন্দ্রিয়সংযম, ক্লীবদের করবে সাহসী, বীরদের বাড়াবে উৎসাহ, নির্বোধদের দেবে বুদ্ধি, বিদ্বানদের বাড়াবে বিদ্যা, বড়লোকদের শেখাবে বিলাসের পদ্ধতি, দুঃখগ্রস্ত লোককে দেবে স্থৈর্য, অর্থাজনকারীকে দেবে অর্থলাভের সংকেত, উদ্বিগ্নচিত্ত লোকদের দেবে ধৈর্য... . এরূপে সংসারে হতভাগ্য, দুঃখী, শোকার্ত ও শ্রমক্লান্ত লোকদের বিশ্রামদান করবে এই নাট্য।"

নাট্যের উদ্দেশ্যধর্মের এবম্বিধ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আপত্তি তোলা যেতে পারে এভাবে যে কোনো একটি মাত্র নাটকের পক্ষে সম্ভব নয় সর্বস্তরের মানুষের সন্তোষ বিধান করা। কিন্তু নাট্যানুষ্ঠান সম্পর্কে এ শ্রেণীর অভিমত পোষণ করার অর্থ হচ্ছে সামাজিক আনন্দভোগের উপায়রূপে নাটকের বিশিষ্ট ভূমিকাকেই অস্বীকার করা। কারণ স্বাভাবিক চেতনা সম্পন্ন সমস্ত মানুষের মধ্যেই দৃশ্যের অভিনয়রূপ দেখার বাসনা সহজাত। তাই যদি হয়, তাহলে নাটকের আখ্যানবস্তুর কাঠামো যাই হোক না কেন, প্রত্যেকেই নাটকের অভিনয়রূপের মধ্যে উপভোগের সামগ্রীর সন্ধান পাবে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হতে পারে যদি সমাজনীতিবিরুদ্ধ কোনো উপাদান নাটকের মধ্যে সংযোজিত হয়ে থাকে। নাটকের অভিনয়রূপ দর্শনে দর্শকসাধারণ যে বিচিত্ররূপে লাভবান হতে পারেন, সে সম্পর্কে 'নাট্যশাস্ত্র'-প্রণেতার পূর্ববর্তী অভিমত প্রকাশের মধ্য দিয়ে এই সত্যটুকুই প্রতিভাত হচ্ছে যে অগণিত দর্শকসাধারণের কাছে বিভিন্ন ধরনের নাটকের আবেদন কি বিচিত্রভাবেই না প্রকাশ পায়!

বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের রুচিবোধের দৃষ্টান্তদান প্রসঙ্গে 'নাট্যশাস্ত্র'-প্রণেতা অন্যত্র বলছেন যে, "তরুণসম্প্রদায় আনন্দ লাভ করে প্রেমমূলক কোনো

কাহিনী থেকে, বিদ্বান ব্যক্তি আনন্দ পান জ্ঞানগর্ভ কোনো বিষয়ের আলোচনায়, অর্থলাভেচ্ছু ব্যক্তির আনন্দ অর্থসংক্রান্ত কোনো বিষয়ে আর ভোগবাসনামুক্ত ব্যক্তি আনন্দ পান চিত্তের মুক্তি-সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনায়।

বীরভাবমণ্ডিত ব্যক্তির আনন্দ রুদ্রভাবসম্পন্ন ও প্রবল হৃদয়াবেগের প্রকাশক ব্যক্তিগত বিরোধ এবং সংগ্রামমূলক কোনো বিষয়ে এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিরা আনন্দ পান পৌরাণিক উপকথা ও ধর্মমূলক কাহিনীতে। আর সাধারণ নারী, শিশু ও অশিক্ষিত ব্যক্তিরা হৃষ্ট হয় হাস্যমূলক কোনো ভাবপ্রকাশে এবং জমকালো বেশভূষা ও ছদ্মবেশের দৃশ্যমূলক কোনো উপাখ্যানে।"

ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে'র মতো সুবিশাল গ্রন্থের আলোচনা স্বল্প পরিসরের মধ্যে সম্ভবপর নয়। প্রাচীন ভারতীয় নাট্যচিন্তার বিকাশে এই গ্রন্থটি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তারই খানিকটা পরিচয় এই প্রবন্ধে দেবার চেষ্টা করেছি।

সামন্তযুগের সংস্কৃতসাহিত্যের ভিত্তি

দামোদর ধর্মানন্দ কোসম্বী

["রাহুল সাংকৃত্যায়ন কর্তৃক ১৯৩৪ সালে সংগৃহীত তিব্বতের সংস্কৃতপুথির কিছু ফোটো-নেগেটিভ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের কাছে ১৯৪৬ সালে আসে।...এইগুলির ভেতর অধ্যাপক ভি. ভি. গোখলে—'সুভাষিতরত্নকোষ' ভীমার্জুনসোম কর্তৃক রচিত—এর উল্লেখ দেখেন।... পরে নানারকমভাবে চেষ্টা করেও আমি ও গোখলে এই অংশটির পাঠোদ্ধার করতে পারি নি...বা কোথাও ভীমার্জুনসোমের নাম পাই নি।...রাহুলের 'জার্নাল অফ দি বিহার অ্যাণ্ড ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটি, পাটনা' (JBORS)-তে দেখা যায় নেপাল রাজগুরু পণ্ডিত হেমরাজ-এর কাছে এই পুথির-ই আর-একটি কপি আছে।" বহু চেষ্টার পর রাজগুরুপুথি নকল করে ভারতে নিয়ে আসা হয় ও পূর্ববর্তী রাহুলপুথির সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার পর বিদ্যাকর সংকলিত ও সম্পাদিত 'সুভাষিতরত্নকোষ'-এর একটি সংস্করণ প্রস্তুত হয়। এই সংকলন দামোদর ধর্মানন্দ কোসম্বী ও ভি. ভি. গোখলে কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই সংস্করণে প্রকাশিত কোসম্বী-র ভূমিকার অংশবিশেষের ও তার প্রাসঙ্গিক টীকার অনুবাদ আমরা প্রকাশ করছি। নির্বাচন, সম্পাদনা ও অনুবাদ আমাদের।

কবি বিদ্যাকর আনুমানিক 1100 খ্রীষ্টাব্দে বাঙলাদেশে এই সংকলনটি সম্পাদনা করেন। এই সংকলনে ক্লাসিকাল যুগ থেকে তাঁর যুগ পর্যন্ত রচিত প্রকীর্ণ সংস্কৃত কবিতা নির্বাচিত ও সংগৃহীত হয়। এমন অনেক কবিতা এতে আছে যা প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বর্তমান নিবন্ধে কোসম্বী ক্লাসিকাল পর্বের সংস্কৃত কবিদের সামাজিক অবস্থান ও বাস্তবতার অন্বেষার একটি সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। —সম্পাদক। পরিচয়]

বিদ্যাকর সম্পাদিত ও সংকলিত 'সুভাষিতরত্নকোষ' পঞ্চাশটি অংশে বিভক্ত। এর ভেতর প্রথম ছয়টি অংশ দেবদেবীদের বিষয়ে লেখা—এই দেবদেবীদের ভেতর কিছুটা অযৌক্তিকভাবে বৌদ্ধ দেবদেবীরাও আছেন। সপ্তম অংশের বিষয় অপেক্ষাকৃত গৌণ দেবতা—সূর্য। তারপর ঋতুবর্ণনা।...প্রেম আর

প্রণয় নিয়ে রচিত ১৪শ ব্রজ্যার সঙ্গে সঙ্গে সংকলনের আসল বিষয় শুরু হয়। এই অংশটি ও এর পরবর্তী ১১টি অংশ-ই এই সংকলনের আসল বিষয়। যে-প্রণয়কেলিতে দুই জনের শরীরেই নখদন্তচিহ্ন থাকে—সেই খাঁটি ভারতীয় ঐতিহ্যে শারীরিক ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতার ধারাতেই এই অংশগুলি রচিত হয়েছে। ···বাকি অংশগুলিতে বিবিধ বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে।··· ৩২, ৪১ ও ৪৬ সংখ্যক অংশে রাজা ও রাজসভার নির্লজ্জ তোষামোদ—তাতে হয়তো কিছু দুষ্প্রাপ্য তথ্য পাওয়া যেতে পারত কিন্তু সেখানেও তো সংস্কৃত কবিতার সেই শব্দক্রীড়া, আঙ্গিকসর্বস্বতা। কবিদের প্রশস্তি করে লেখা শেষ অংশটিও মোটামুটি একই রকম—শুধু তা থেকে কবিদের কালানুক্রম খানিকটা অনুমান করা যায়।

এই সবের ভেতর "জাতিব্রজ্যা"-নামে ৩৫ সংখ্যক অংশটি সবচেয়ে আকর্ষণীয়। শ্লোকের বিচ্ছিন্নতা এখানে বিষয়ের ধারাবাহিকতায় ঢাকা পড়ে গেছে। তুচ্ছ, সাময়িক ঘটনার সৌন্দর্য ফোটাতে লিরিক ফর্ম আর লিরিক বিষয়ের সমন্বয় ঘটেছে। বিড়ালকে কুকুর তাড়া করেছে; চড়ুই পাখির কিচির মিচির[১]; ষাঁড় চাষানীকে চমকে দিয়ে বৃষ্টিতে গোয়াল ছেড়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে, যেতে যেতে বুড়ো কুকুর তার জীর্ণ লেজটি নাড়ায় কিন্তু খেঁকিয়ে ওঠার সময় সুন্দর শাদা দাঁতের সারি দেখায়[২]; মুরগির লড়াই; সারাদিনের ভিক্ষার শেষে বামুন লকড়ি-চিড়তে সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফেরে। সংস্কৃত কবিতার ক্ষেত্রে এই সমস্ত বিষয় একেবারেই অভিনব ও ব্যতিক্রম।···এই ধরনের আরো কবিতা পড়তে আমাদের যতই ইচ্ছে হোক—আজ এটা কল্পনা করাও মুশকিল সংকলক এই ধরনের কবিতা আর পেতেন কোথা থেকে? ··

ক্লাসিকাল যুগের সংস্কৃত কবিদের কাছে দারিদ্র্যই—তার নিজের শ্রেণীর দারিদ্র্যই—ছিল একমাত্র বাস্তবতা। এই বাস্তবতা-কে কবিতায় রূপান্তরিত-করার চেষ্টায় তিনি ব্যস্ত থেকেছেন। ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি তাঁর ছিল না, আবার কারিগরি কাজের শিক্ষা বা অভিজ্ঞতাও তাঁর নেই (জাতের ব্যাপারে!)। রাজসভার জীবনের প্রতি গভীরতর টান না থাকলে সংস্কৃত ব্যবসায়ী অধিকাংশের মতো তিনি পুরুতগিরি করতে পারতেন—কাব্যকল্পনা নিয়ে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত হতে হত না। তাঁর এই কল্পনার ফসলের জন্য তো অন্যত্র কোনো বাজার ছিল না। সাধারণ মানুষ তখনো কথাকোবিদ, গায়ক, চারণ বা পথিক ভিক্ষুককে কিছু দিতে পারত। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা তো সেই সাধারণ মানুষ থেকে বহুদূরে চলে এসেছে আর খুব সূক্ষ্ম ভাষায় নির্মিত এক একটি

'সুভাষিত'-এর রমনীয় বাক্যকূট একজন সাধারণ মানুষের কাছে ছিল অর্থহীন। পৌরোহিত্য-ব্যবসায়ে ভিড় বাড়ল আর বেদজ্ঞানের ফলে সামাজিক মর্যাদা না হারিয়েও প্রচুর আরাম ও বিলাসের সুযোগ নাগালে এসে গেল। ফলে সংকীর্ণ সামাজিক কাঠামোয় নতুন সমস্যা দেখা দিল। যেমন, বাড়ির কর্তা ক্ষুধায় কাতর হয়ে বলেন, বর্ষা এলে তাঁদের কুটিরের পাশে যে বুনো কুমড়ো ফলবে তা খেয়ে তাঁরা রাজার মতো জীবন কাটাতে পারবেন।

কিন্তু এতটা দারিদ্র্য সত্ত্বেও, দৈহিক পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জনের কল্পনাও এই বুদ্ধিজীবীরা করতে পারেন না। তৎকালীন সমাজ তাঁদের মানসিকতাকে প্রভাবিত করেছে এতটাই যে তাঁদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য অর্থকরী কাজের সম্ভাবনা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। কোনো জমি নেই ; পরিবারের উপার্জনের ভরসা হয়তো একটিমাত্র বলদ—সে-বেচারাও যখন ক্লান্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আর ওঠে না, তখন সকলে অসহায় ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। পরিবারের সবাই একটি মাত্র ঘরে থাকে—সেই একই ঘরে রান্না ও খাওয়া, শোয়া বসা থাকা, বাচ্চা রাখা। কোনো একদিন যদি বাচ্চাদের খাওয়া জোটে, মা প্রার্থনা করেন রাত যেন না পোয়ায়। তাহলেই তো আবার ভাতের চিন্তা। কোনো বড়লোক-প্রতিবেশীর দরজায় দাঁড়িয়ে বাচ্চারা লোভে চকচক চোখ নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে তাদের খেতে দেখে।

যাই হোক, এ-দারিদ্র্য কিন্তু বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর দারিদ্র্য। গ্রামীন সর্বহারা, পামর-এর দারিদ্র্যের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। শুকনো শরীরে কঠিন খাটুনি ছাড়া তার বাঁচার তো আর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই। তার সঙ্গে কিন্তু কবির কোনো সহমর্মিতা নেই। ক্লাসিকাল সংস্কৃত কবিতার জন্য খানিকটা নিশ্চিত জীবনযাত্রা আর মঠমন্দির বা রাজসভার সমর্থন ছিল অপরিহার্য। আর সে-কারণেই তার দ্বারাই ক্লাসিকাল সংস্কৃত কবিতার রীতি ও বিষয়ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার আনন্দে যখন কবিত্বের বিস্ফার ঘটত —আমাদের কবি-রা সে-সব দিন থেকে অনেক দূরে চলে এসেছেন।

"আগামী কালের আনন্দই মানবজীবনের সত্য প্রেরণা"—জীবনযাত্রার মানের ওপর তো এই সত্য নির্ভরশীল নয়। বাস্তবতা সম্পর্কে এক সৃষ্টিশীল আগ্রহ আর নতুন নতুন সাফল্যের সম্ভাবনাময় সচেতন প্রয়াসের ভেতর এই সত্য নিহিত আছে। কোনো প্রয়াসকে যদি ফলপ্রসূ হতে হয় তাহলে তাকে সমবেত প্রয়াস হতেই হবে, সমাজের সবাইকে নিয়ে সেই প্রয়াসে যুক্ত হতে হয়, সবাইকে বাদ দিয়ে নয়। যে-সংকীর্ণ শ্রেণীকে কবি সেবা করেছেন, সেই শ্রেণীর ব্যর্থতা

কবিতেও বর্তেছে। স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে, মহৎ স্বপ্নও আর জন্মায় না। সমস্ত সৌন্দর্য সত্ত্বেও 'জাতিব্রজ্যা' তা বলে ফাউস্টের মহৎ সৃষ্টিগর্ভ মুহূর্তে তো কখনোই পৌঁছতে পারে না।

অধিকাংশ সংস্কৃত কবি-ই সমাজের অভিজাতদের জন্য লিখেছেন আর সেই কারণেই অভিজাতদের সঙ্গে একই অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতার ভেতরেই তাঁদের লিখতে হত। নির্দিষ্টভাবে এর অর্থ ধর্ম ও কাম। আমরা এখানে "শ্রেণী" সাহিত্য নিয়েই আলোচনা করব। এই সমস্ত রচনা থেকে প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্রা সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার সময় এ-কথা মনে রাখা দরকার, অধিকাংশ ভারতীয়ের জীবনযাত্রা ঐ রকম ছিল না—কবির কালেই হোক বা অন্য কোনো কালেই হোক। আসলে, কবির নিজের জীবনযাত্রাই ও-রকম ছিল না। সংস্কৃত শ্লোক রচনায় এটা ধরেই নেওয়া থাকে, মন ও মেধা অন্য বিষয়ে ব্যস্ত নয়, বাক্যের দুই বা তিনপ্রকার অর্থ, পৌরাণিক প্রসঙ্গের সংকেত ও জটিল অলংকারের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের জন্য প্রচুর অবসর আছে। অতি সরল সংস্কৃত লেখার জন্যও যে দীর্ঘ শিক্ষা প্রয়োজন তার কথা না হয় বাদই দিলাম। এই সাহিত্যে যাঁদের কথা বলা হয়েছে তাঁদের অজস্র অর্থের সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত অবসরও আছে। মুক্তাহার, রত্ন, সিঞ্জনমুখর বলয় ও চীনাংশুকে মেয়েরা সাজতেন। জটিল ও উদ্ভট নানা নকশায় প্রসাধন লেপনে, চিত্রাঙ্কণে বা প্রেমিকের নিকট পত্রলেখায়, অগুরু ও তাম্বুল সেবনে প্রচুর সময় ব্যয় করতেন। বাড়িঘরের আসবাবপত্রের কথা আমরা খুব শুনি না কিন্তু বিলাসিতার আদর্শের সঙ্গে ওপরে বর্ণিত দারিদ্র্যের এক করুণ বৈপরীত্য সদা সক্রিয় ছিল। খুব বড় বড় দেবতারাও এই অভিজাতদের মতোই জীবনযাপন করতেন। চড়া বাজি রেখে বা রতিক্রিয়ার পণে স্বামী-স্ত্রী দ্যূতক্রীড়া করতেন। জীবন্ত কঙ্কাল ভৃঙ্গীও ভাবে শিব তার এই বারো ভূতের দলবলকে কী করে রক্ষা করবেন ঝগড়াঝাটি থেকে। মহাবিবাহে সে এবং তার অনুচর কুষ্মাণ্ড দুজনেই আশা করে বেশি আদর পাবে অন্যের থেকে। রাশভারি বরের ভয়াবহ সাহচর্যে কী করতে হবে, তার জন্য বাপের বাড়ির বড়াযি (গোত্র-জরতী) বিবাহের প্রাক্কালে সব রকমের পরামর্শ ও মায়ামন্ত্র পার্বতীকে শিখিয়ে দেয়। পার্বতীর মা তার মেয়েজামাইয়ের শরীরে একরাত্রির মিলনের চিহ্ন দেখে উৎসাহে কানাকানি করেন।[৩]

দেবীর পুত্রলাভ ঘটেছে এই খবর অনুচরদের দেওয়া হলে নাচ শুরু হয়ে যায়। ধরেই নেয়া যায় এ-রকম একটি পরিবারের বিরাট ভূসম্পত্তি আছে।

সে তুলনায় দরিদ্র কবির একটিমাত্র ঘর।—সেখানে সব রীতিনীতিই মানা হয় বটে, কিন্তু চিরকালই খুব সাদাসিধেভাবে। সেখানে প্রধান গৃহপরিচারক কর্তা-কর্ত্রী র ঘরেই শোয়, তেমন অস্বস্তিকর দৃশ্য দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বড় ভাইকে সসম্মান "আর্য" সম্বোধন করা হয়। বয়োকনিষ্ঠ দম্পতিদের খুব একটা নিভৃতিও জোটে না।[৪] গৃহশুক তাদের নৈশ প্রেমালাপ দিনের বেলায় বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে পুনরাবৃত্তি করে লজ্জায় ফেলে।

কবিও উচ্চতর এক গৃহশুকের-ই মতো এই জীবনেরই অংশ। সেই জীবনের কথাই তিনি নাটকে লেখেন, অধিকাংশ 'সুভাষিত'-ই নাটক থেকে গৃহীত। একমাত্র রাজানুগ্রহে তিনিও সেই জীবনে উন্নীত হতে পারেন। সুতরাং স্বভাবতই এই জীবনের মধুরতম দিকগুলিই তাঁর কবিতায় প্রধানতম প্রসঙ্গ হয়ে ওঠে। তার কাছে নারী এক অত্যন্ত পরিচিত পারিবারিক জীব—কিন্তু এই নারী-ই আবার ধনীদের বিলাসবস্তু, কামসূত্রের অত্যুন্নত কৌশল প্রয়োগ করে সে নারীকে ধনীরা ভোগ করতে পারেন। এই সংকলনের প্রত্যেকটি অংশ কামপ্রসঙ্গে পরিপূর্ণ। দেবতাদের প্রসঙ্গেও একই অসংযমে তাদের নৈশ-জীবনই বর্ণিত হয়েছে। এমনকি ধর্মীয় পণ্ডিতরাও কোনো রকম ব্যভিচার বা অসঙ্গতির বোধ ছাড়াই ও নীতিনির্দেশের গোঁড়ামি বা কঠোর তপস্বীর জীবন থেকে কিছুমাত্র বিচ্যুত না হয়েও এই যৌন কবিতাগুলি উপভোগ করতেন, কখনো কখনো লিখতেনও। জৈন আচার্য হেমচন্দ্র, যে-কোনো সংস্কৃত আলঙ্কারিকের মতোই, উৎসাহ ও আগ্রহে এই সংকলনের অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন ও টীকা লিখেছেন। আর এই কাজ কোনোভাবেই ধর্মীয় ব্রহ্মচর্যের প্রশ্নাতীত শুদ্ধতার বিচারে তাঁর মহৎ মর্যাদার হানি ঘটায় না। এ-ব্যাপারে তিনি এককও নন। এই সকল ব্যক্তি রাজার উপদেশকরূপে রাজসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু ষষ্ঠ আলেকজাণ্ডারের কালের রোমক ধর্মনেতা বা বোকাচ্চিও-র ফূর্তিবাজ সাধুসন্তরা দূরে থাকুন, একজন ভারতীয় আবেলার্দের কল্পনাই প্রায় অবান্তর। এরই ফলে শাসকশ্রেণী ও তাদের শিক্ষিত অনুগৃহীতদের ভেতর সংস্কৃত ভাষার মতো সংস্কৃত কবিতাও একটা ফ্যাশন হয়ে উঠেছিল। পেশাদার কবিদের দ্বারা উদ্ভূত প্রথাসমুহ হর্ষ ও ভোজ-এর মতো রাজাদেরও লাগসই ঠেকেছিল। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মোহান্ত ও পণ্ডিতরাও এই প্রথা গ্রহণ করলেন। স্বাদের দিক থেকে বৌদ্ধ ধর্মকীর্তি আর তাঁর শৈব বা বৈষ্ণব সহকর্মীদের রচনার ভেতর পার্থক্য প্রায় কিছুই ছিল না।

সৈনিকদের সামরিক মেজাজ তাদের নিজেদের ভাষায় তাঁদের নিজস্ব

কবিতাতেই তৃপ্ত হত। রাজস্থানের গাথা, কিছুটা পরিবর্তিত আকারে আজও যা পড়া বা গাওয়া হয়, সেই রাসসাহিত্য, একাদশ শতকেই যথেষ্ট উন্নত। হালের শ্লোক যদিও তখনো চর্চিত হত, কিন্তু সংস্কৃতের চাইতেও প্রাকৃত তখন মৃত ভাষা। সাধারণ মানুষের নতুন কবিতাকে সাহিত্য হিসেবে গণ্য করাই হত না, বরং এমনকি সত্তসঈ-তেও যে-হালিকাগুলি আমরা পাই সেইগুলি সম্পর্কে খানিকটা কৌতুক আর খানিকটা ভদ্র তাচ্ছিল্যই ছিল। তখনো আমরা 'বিসালদেবরাস'-কে পাই বটে কিন্তু সেই একই রাজা (বা তাঁর কোনো উত্তর পুরুষ) বিগ্রহরাজ এই সংস্কৃত নাম নিয়ে তাঁর ফলকে উৎকীর্ণ প্রাচীন রাজস্থানী গাথার বদলে সংস্কৃত নাটকই পছন্দ করলেন বেশি। 'পৃথ্বী-রাজা-বিজয়' নামে এক দুর্বল সংস্কৃত কবিতায় (তার কিছু অংশ পাওয়া যায়) মহান পৃথ্বীরাজ-চৌহান-চাহমান-কে স্মরণ করা হয়। পুরাণ-মহাভারতের আদর্শের ব্যাপক অনুকরণে তাঁর নির্দিষ্ট রাস-টি নষ্ট হয়ে যায়।

এই সব কবিতাতে নিশ্চয়ই হর্ষ ও ভোজ-এর চরিত্রও ছিল। কিন্তু সে-সব কবিতা নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে গেছে। তাঁরা ব্রিটেনের ম্যাকসিমাস, কনিতেবল বুরবঁ বা জেনারেল ডোভেটরের[৫] মতো খুব নির্বাচিত সেনাপতিদের মতো ছিলেন কিনা যাঁদের সৈন্যরা কোনোরকম পেশাদারি সাহায্য ছাড়াই তাঁদের নিয়ে গান লিখত—তা আর জানবার কোনো উপায়ই নেই।

এই সব ক্ষয়ক্ষতিসাধনের জন্য সংস্কৃতের প্রভাব নিয়ে যদি দুঃখ করতে হয় তাহলে সংস্কৃত ভাষার ও তার ওতপ্রোত কৃষ্টির যথার্থ মূল্য নির্ধারণ প্রয়োজন। লাতিন-এর সঙ্গে এ-বিষয়ে বিস্তর পার্থক্য – কারণ তার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় রূপ এক নয়। বৈদিক যুগের আর্যবিজয়ের ফলে তুলনামূলকভাবে কম-সশস্ত্র আদিবাসীদের ওপর এই ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই আর্যবিজয় আসলে উপজাতিবিজয়ের এক ধারা। এর সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলে রোমক অভিযানের কোনো তুলনা হয় না। বৈদিক থেকে ক্লাসিকাল যুগে উত্তরণের পর্বে জনসংখ্যার অধিকাংশের পক্ষেই সংস্কৃত হয়ে পড়েছিল মৃতভাষা। বুদ্ধ-র ধর্মপ্রচারের জন্য ও অশোকের ফলকের জন্য পালিভাষার ব্যবহারে এবং সমস্ত ক্লাসিক নাটকে স্ত্রীলোক ও সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা হিসেবে প্রাকৃতের ব্যবহারে—এর প্রমাণ মেলে। জনসাধারণের বাকি অংশের চাইতে ব্রাহ্মণরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভাবতেন। তাঁরাই আচার-অনুষ্ঠান ও ভাষা প্রবহমান রাখার জন্য প্রথমত দায়ী। শাসক শ্রেণীর সঙ্গে কার্যকর সমঝাওতা ছাড়া এ কাজ করা কখনোই সম্ভব ছিল না, তার অনেক

প্রমাণও আছে। হর্ষের পূর্বপুরুষ এমনকি পাঁচ পুরুষ আগেও সূর্যোপাসক উপজাতিভুক্ত ছিল। সামরিক শক্তিতে যে রাজকীয় মর্যাদা তিনি অর্জন করেছিলেন, সংস্কৃত অধিগত করায় তা অসম্ভব বৃদ্ধি পায়। এর ফলে তিনি পূর্বতন উচ্চ শ্রেণীর ভেতর মিশে যান আর শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রজাদের বাকি অংশের সঙ্গেও যুক্ত হতে পারেন। প্রথম দিকের রাষ্ট্রকূটদের, প্রথম পালদের ও পরমার গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভোজের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কেও এই একই কথা বলা চলে। কোনো শাসনকে আইনসঙ্গত করে নেবার উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতির প্রয়োগ এমনকি গুপ্তযুগে ও সম্ভবত রুদ্রদামন[৬] পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগের প্রাক-মুসলিম সমস্ত শাসককুল-ই যে এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তাঁদের উৎকীর্ণ লিপিতেই সে-প্রমাণ আছে। পূর্বপুরুষরা যে সব রাজ্যে শান্তিস্থাপন করে গেছেন সে-সব রাজ্যের উত্তরাধিকারীদের কাজে লাগে সংস্কৃতশিক্ষা ছিল এমনই অন্যতম বিলাস। ভাষা আর স্থিরশান্ত রাজসভা—উভয়ই ছিল শৃঙ্গারময়। হিস্টরিয়া অগাস্টা-য় যে-সব সম্রাটের বিবরণ দেওয়া আছে তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন পাপ আর শক্তির আধার। সংস্কৃতির দিক থেকে অন্তত মধ্যযুগের ভারতীয় রাজারা নিশ্চিতই তাঁদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। যখন সমগ্র উপজাতি ক্ষমতা দখলের জন্য লড়াই করত, যেমন আত্তিলা ক্লোভিস বা থিওডোরিক-এর সময়, তখনো সমতুল্য ইয়োরোপীয় সাংস্কৃতিক উন্নতির তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না। নিশ্চয়ই শার্লমানের চারপাশের বিদ্বজ্জনেরা হর্ষ বা ভোজের রাজসভার বিদ্বজ্জনদের সমতুল্য নন। প্যাগান জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ক্লাসিক সাহিত্য-ঐতিহ্যের সঙ্গে অপ্রতিরোধ্য বৈরিতার ভেতর দিয়েই খ্রীষ্টীয় চার্চ প্রথম সংগঠিত হয়। আর সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করে ব্রাহ্মণ পুরোহিত সম্প্রদায় নিজেদের সংহতি রক্ষা করতে পেরেছিল। স্মরণাতীত প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃত ভাষা চলে আসছে, এই ধারণার ফলে সংস্কৃত অনিবার্যভাবেই হয়ে উঠল দলিলদস্তাবেজ, ভূমিদান, প্রধান কর্মচারীদের ভেতর সংযোগ ও যে সব অঞ্চল তাদের নিজস্ব ভাষা তৈরি করতে পেরেছিল তাদের ভেতর বিনিময়—ইত্যাদি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় রাজকীয় ভাষা। সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তীকালে পারসিক বা আধুনিক কালে ইংরেজির মতো সংস্কৃত হয়ে উঠল একটি শ্রেণীর অভিজ্ঞান। সাধারণ মানুষ যারা এই উন্নত ভাষা জানত না এবং যাদের উচ্চজাতিসূচক চিহ্নও ছিল না (পরবর্তীকালে উচ্চজাতি সূচক চিহ্নের বদলে পোশাকআসাকের বিদেশী ফ্যাশন), তাদের জন্মসূত্রে ছোট মনে করা হত। যাই হোক, পরবর্তীকালের 'শ্রেণী ভাষা'-গুলি

ভারতীয় সংস্কৃতির গভীরে মূল প্রোথিত করার ব্যাপারে সংস্কৃতকে ছাড়াতে পারে নি। পারসিক বা ইংরেজি সাহিত্যের ভারকেন্দ্র বহু দূরে—তাই এই দুটি সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কোনো ভারতীয় অবদান নেই। অনুরূপভাবেই রেনাসাঁসের কাল থেকে লাতিন, আর জার্মান ও রুশ অভিজাতদের ভেতর ফরাসী ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে কোনো ভারতীয়ের জীবন ও মনন সম্পর্কে (এমনকি রামানুজের দর্শন সম্পর্কে-ও) যা জানা যায় তা অবাস্তব ও ভ্রান্তিজনক, যেন মুঘল-রাজপুত চিত্রে পৃথ্বীরাজের ছবি: মুঘল কায়দায় সজ্জিত, ক্রমস্ফীত শরীরে ও মুখে পুষ্ট একজোড়া গোঁফ। দুর্ধর্ষ প্রেমিক, দুর্মদ যোদ্ধা, ধর্মপ্রাণ বীর ভক্ত—রাজস্থানী সাহিত্য ঐতিহ্যের এই চরিত্র থেকে সেই মুঘলচিত্র কতই আলাদা।[৭]

এই রকম একটি অবরুদ্ধ সাহিত্য যে মাত্র একজন কালিদাসের জন্ম দিয়েছে (আর তাও শুধু সেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রথমকালে), ক্রমেই রাজশেখরের শূন্য শব্দাড়ম্বরের দিকে ও জটিল সূক্ষ্মতায় আকীর্ণ শ্বাসরোধকর 'সুভাষিত'-র দিকে চলে গেছে, এত আর আশ্চর্য কি? জনসাধারণের ব্যবহৃত ভাষাতেই নিহিত ছিল প্রকৃত সম্ভাবনা, কিন্তু আমাদের প্রাকৃত গায়কেরা কোনো দৃঢ় পৃষ্ঠপোষকতা পায় নি। ধর্মীয় সাহিত্যে কবীর-এর মতো এক কবি থেকে গিয়েছেন যেন শুধু এইটুকু প্রমাণ করতে—কী বিপুল ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। দুর্ভাগ্য, আমরা আমাদের ভাট আর চারণদেরও হারিয়েছি।

টীকা ও প্রসঙ্গ

১. হলাগ্রোৎকীর্ণায়াং পরিসরভুবি গ্রামচটকা
লুঠন্তি স্বচ্ছন্দং নখরশিখরাচ্ছোটিত মৃদঃ।
চলৎপক্ষদ্বন্দ্বপ্রভবমরুদুত্তম্ভিতরজঃ—
কণাশ্লেষভ্রামদ্রুত মুকুলিতোন্মীলিত দৃশঃ॥ ৩৫/১৫

২. কর্ণাগ্রস্থিতকিতনূর্ণতশিরা বিভ্রজ্জরাজর্জর—
স্ফিক্সংধিপ্রবিবেশিতপ্রবিচলল্লাঙ্গুলনালঃ ক্ষণম্।
আরাদ্বীক্ষ্য বিপক্ষসাক্রমকৃতক্রোধস্ফুরত্কন্ধরং
শ্বা মল্লীকলিকাবিকাশিদশনঃ কিংচিৎক্বণন গচ্ছতি॥ ৩৫/১১

৩. প্রাতঃ কালাঞ্জনপরিচিতং বীক্ষ্য জামাতুরোষ্ঠং
কন্যায়াশ্চ স্তনমুকুলয়োরঙ্গুলীভস্মমুদ্রাঃ।
প্রেমোল্লাসাজ্জয়তি মধুরং সস্মিতাভির্বধূভির্
গৌরীমাতুঃ কিমপি কিমপি ব্যাহৃতং কর্ণমূলে   ৫/১০

৪. অতিপ্রৌঢ়া রাত্রির্বহলশিখদীপঃ প্রভবতি
প্রিয়ঃ প্রেমারব্ধস্মরবিধিরসজ্ঞঃ পরমসৌঃ।
সখি স্বৈরং স্বৈরং সুরতমকরোদ্‌পীড়িতবপুর্‌,
যতঃ পর্যঙ্কোহয়ং রিপুরিপ কড়ৎকারমুখরঃ॥ ১৯/১৫

৫. ম্যাকসিমাস—রোমান সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব নিয়ে থিয়োডসিয়ুসের সঙ্গে যুদ্ধ করে হেরে গিয়েছিলেন। মোবিনোগিয়ন ও ওয়েল্যাণ্ড স্মিথ সাগায় তাঁর যুদ্ধকৃতি গাওয়া হয়েছে।
ডোভেটর—হিটলারবিরোধী যুদ্ধে সোভিয়েত নেতা।

৬. পুরাণ-এর মতে স্থানীয় শাসকরা আদিগুপ্তদের অপছন্দ করতেন। সুতরাং গুপ্তদের উৎকীর্ণ লিপির সংস্কৃত বাক্যাড়ম্বর ও কালিদাস যে তাঁদের সভা-কবি ছিলেন এই নিশ্চয়তা আমার বক্তব্য প্রমাণ করে। রুদ্রদমনের প্রসঙ্গে ১৫০ খ্রীষ্টাব্দের গিরণারলিপি দ্রষ্টব্য।

৭. অপরদিকে প্রায় অশিক্ষিত ও বর্বর শাসকদেরও কিছু সংস্কৃতশিক্ষা ছিল। তাঁদের নিয়ে যে শ্লোক লেখা হত তাঁরা তার অর্থ বুঝতে পারতেন। হরি কবি মারাঠারাজ সম্ভাজি-র (১৬৮০—১৬৮৯) প্রশংসা করেছেন। উদয়পুর রাজবংশের পুথিপত্রের ভেতর বহু ব্যবহৃত এমন একটি বই পাওয়া গেছে যাতে এমনকি 'পঞ্চতন্ত্র' বা ভর্তৃহরির 'শতক'-এর মতো প্রাথমিক পাঠ্য-পুস্তকও বাঁধানো হয়েছে। আমি যখন এই বইটি দেখি, তখন বইটি খুলতেই যে-পাতা বেরলো তাতে বড় বড় হরফে শিরোনাম—'লিঙ্গ-স্থূলী-করণম'। তার মানে রাজসভায় সংস্কৃতজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগও হত।

'গীতসূত্রসার' ও ভারতবর্ষের সংগীতচিন্তা

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত

১৮৮৫ সালে প্রথম প্রকাশিত কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'গীতসূত্রসার' গ্রন্থের পুনর্মুদ্রন করে প্রকাশক এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং একটা প্রয়োজনীয় কাজ করছেন। এতদিন ফুটপাথে পুরোনো বই-এর দোকান ঘাঁটাঘাটি করে যে বইখানির অতিশয় ভঙ্গুর পাতাবিশিষ্ট জীর্ণ কপি কালেভদ্রে এক-আধখানা পেয়ে গেলে আমরা যারপরনাই আহ্লাদিত হতাম, সে বই এখন নতুন সংস্করণে ঝকঝকে ছাপায় পাওয়া যাচ্ছে, এটা আনন্দের কথা।

গীতসূত্রসার সম্পর্কে ন্যূনতম উক্তি যা হতে পারে তা হল—বইখানি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, কৌতূহলোদ্দীপক। উনবিংশ শতাব্দী সম্পর্কেই পাঠকের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে। প্রকৃতপক্ষে গীতসূত্রসার ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ভারতীয় সঙ্গীত ও সঙ্গীত-চিন্তার ধারা যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে—প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগে, মধ্যযুগ থেকে মোগল যুগে—সামগানের যুগ থেকে প্রবন্ধের যুগে, প্রবন্ধের যুগ থেকে ধ্রুপদের যুগে। সে পরিবর্তন বিপুল, বিশেষত গীতরূপের ক্ষেত্রে। কিন্তু ধ্রুপদের যুগ থেকে বর্তমান যুগে উল্লম্ফন অনেক অনেক গভীরতর পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। এই দুই যুগের ক্রান্তিরেখায় গীতসূত্রসারের অবস্থিতি। তার চেয়েও বড় কথা—এই পরিবর্তনের প্রকৃতি যত স্পষ্টভাবে গীতসূত্রসারে আত্ম-প্রকাশ করেছে, তেমন বোধহয় অন্য কোনো গ্রন্থে করেনি। হয়তো গ্রন্থের এইসব লক্ষণই নতুন সংস্করণের ভূমিকা-লেখককে প্ররোচিত করেছে, "কৃষ্ণধনই আধুনিক সংগীতশাস্ত্রের (musicology) জনক" ইত্যাদি ঘোষণার কাজে।

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগীত-বিপ্লবী চরিত্র উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে উক্ত ভূমিকা-লেখক আরো বলেছেন: "সাম্প্রতিক কালে সঙ্গীত-জগতে যে পরিবর্তন ও উন্নতি লক্ষ্য করা যায়, আজ সঙ্গীতের যে বিকশমান রূপ বা নাট্যসঙ্গীতের যে অগ্রগতি দেখা যায়, সঙ্গীতে অধুনা স্বরলিপির ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত, আজ যে রাগ-রাগিনীর মিশ্রণযুক্ত ঠুংরী শৈলীর গানের মাধুর্যমণ্ডিত রূপ আমরা লক্ষ্য করি,—তার প্রায় সব কৃতিত্বই সংগ্রামী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাপ্য।

গীতসূত্রসার: কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা-১২।

সে যুগে নানা বাধাবিপত্তির মাঝেও তিনি সঙ্গীতের নব নব রীতিপদ্ধতিকে অকুণ্ঠচিত্তে স্বাগত জানিয়েছেন। কূপমণ্ডুক রূপী সনাতনীদের ও সংস্কারাচ্ছন্ন পুরাতনবাদীদের নিষ্ফল তর্কজালে আবদ্ধ না হয়ে এবং তাঁদের নিন্দাবাদে ভ্রূক্ষেপ না করে কৃষ্ণধনবাবু তাঁর স্বাধীন মতামত প্রকাশ করে গেছেন।" "কৃষ্ণধনবাবু তাঁর অকাট্য যুক্তি ও বিজ্ঞজনোচিত মননশীলতা দ্বারা চিরাচরিত সাঙ্গীতিক প্রথা ও তথাকথিত স্বীকৃত শাস্ত্রের ভ্রান্তি অপনোদন করে গেছেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এমন যুক্তিবাদী ও সত্যসন্ধ ছিলেন যে, সত্য-প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি তাঁর গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচরণ করতেও পশ্চাৎপদ বা কুণ্ঠিত হন নি। অন্ধ গুরুভক্তির আতিশয্যে তিনি কখনও অজ্ঞতা বা চিরকালাশ্রিত অবৈজ্ঞানিক রীতিনীতি ও প্রথাকে প্রশ্রয় দেননি।" "ইউরোপীয় সঙ্গীতালোচনা করতে গিয়ে তিনি পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গীত-গ্রন্থাদি দেখে মুগ্ধ হন ও সঙ্গীত-শিক্ষাদানের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আস্থাবান হন। ভারতীয় ওস্তাদদের খাপছাড়া শিক্ষাপ্রণালীর উপর তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং ভারতে বিধিবদ্ধ প্রণালীর সঙ্গীতশিক্ষা প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন ও আপসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যান। স্বরলিপির সাহায্যে ভারতীয় সঙ্গীতশিক্ষার সম্ভবপরতা নিয়ে তিনি নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সে সময় ওস্তাদগণ মুখে মুখে সঙ্গীতশিক্ষা দিতেন এবং প্রায়শঃ নিরক্ষর ছিলেন বলে তাঁরা স্বরলিপি ও সঙ্গীত-গ্রন্থাদির চরম বিরোধিতা করতেন।" "সঙ্গীত জগতে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রগতির জন্য কৃষ্ণধন যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন এবং সর্বসাধারণের সঙ্গীত শিক্ষার রুদ্ধদ্বার উন্মোচনে তিনি যে অলোকসামান্য অবদান রেখে গেছেন তার জন্য দেশবাসী কৃষ্ণধনবাবুকে চিরকাল স্মরণ করবেন।" (সমস্ত অধোরেখ চিহ্নই বর্তমান প্রবন্ধলেখকের)

ওপরের বিস্তৃত উদ্ধৃতি কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রচিত্রণ ছাড়াও আরেকটি মূল্যবান কাজ করে দিয়েছে। একালের একজন সংগীতজ্ঞের দৃষ্টিতে পুরাতন ভারতবর্ষের সংগীতভাবনা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এতে পরিস্ফুট। এই দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ব্যাপারে গীতসূত্রসার একদা কিছু সাহায্য করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই দৃষ্টি অনুযায়ী প্রাক্তন সংগীতভাবনা অবৈজ্ঞানিক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, প্রতিক্রিয়াশীল এবং এই ভাবনার প্রতিনিধি ওস্তাদসম্প্রদায় নিরক্ষরতাবশত এযাবৎ "স্বরলিপি ও সঙ্গীত-গ্রন্থাদির চরম বিরোধিতা" করে এসেছেন। তুলনায় আজকের উন্নত সংগীতচিন্তা বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তি-আশ্রয়ী ও প্রগতিপন্থী।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এরকম মতামত প্রকাশের মধ্যে যতখানি দুঃসাহসিকতাই থাকুক না কেন, বর্তমান পরিবেশে এরকম উচ্চারণ আমাদের এতই অভ্যাসগত যে এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনীয়তাও সচরাচর অনুভূত হয় না। তৎসত্ত্বেও এ-নিয়ে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে। পুরাতন ভারতবর্ষের সংগীতভাবনার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রথমত যার ঘাড়ে অপবাদ চাপানো হচ্ছে তাকে আত্মরক্ষা করার সুযোগ দেওয়াটা প্রচলিত রীতি এবং সে-রীতি অহেতুক নয়। দ্বিতীয়ত যে অপবাদ দিচ্ছে অর্থাৎ বর্তমান যুগ, তার সম্পর্কেও কিছু তথ্য এই অবকাশে আমাদের গোচরীভূত হয়ে যেতে পারে।

সমাজবিজ্ঞানে মার্কসবাদের একটা বড় শিক্ষা এই যে মূল্যনির্দেশক পরিভাষা বা শব্দাবলি ব্যবহারের সময় স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে চৈতন্য সজাগ না রাখলে মহা ভ্রান্তি উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বস্তুত ঐসব শব্দের স্থান-কাল-নিরপেক্ষ সর্ববাদীসম্মত অর্থের অস্তিত্ব কল্পনাটাই ভুল, বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গে যার পরিণাম খুবই মারাত্মক। 'অবৈজ্ঞানিক', 'অযৌক্তিক' ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রেও যে এই সতর্কবাণী প্রযোজ্য এটা বোধহয় আমরা অধিকাংশ সময়েই মনে রাখি না। 'বিজ্ঞান' শব্দটি প্রয়োগের সময় সাধারণত এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয় যার গঠনের পেছনে কাজ করছে উত্তর-দেকার্ত ইওরোপীয় দর্শন। এই দর্শনের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় তথা সবকটি প্রাচীন দর্শনের একটি গুরুতর বিষয়ে অমিল, এমনকি বিরোধ, অল্পবিস্তর সকলেই স্বীকার করবেন। সেটি হল বস্তু ও চৈতন্যের দ্বৈততা বিষয়ে। সাবেকী চিন্তাধারায় এই দুই ব্যাপারকে বহুক্ষেত্রেই পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে হয়তো, এমনকি নিত্যতা-অনিত্যতা বিচারে সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যের প্রশ্নও হয়তো এসে গেছে, কিন্তু দু-এর মধ্যে কোনো মৌলিক দার্শনিক বিরোধ বা বিভাজন কোনো সময়েই সে-চিন্তায় প্রশ্রয় পায় নি। কিন্তু দেকার্ত-এর পরবর্তী ইওরোপে এই বিভাজন এত সুস্পষ্ট যে একটিকে প্রধান অপরটিকে অপ্রধান করে দুই শ্রেণীর দার্শনিকদের মধ্যে তুলকালাম কাণ্ড চলেছে কয়েক শতাব্দী ধরে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রতিপালিত হয়েছে এই দার্শনিক আবহাওয়ায়। এ-সবের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ মার্কস্-এর ইতিহাসতত্ত্বে খুবই পরিষ্কার—সামন্ততন্ত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব, ধনতন্ত্রের অভ্যুত্থান ইত্যাদি ইত্যাদি। ইতিহাসের অগ্রগতির দিক থেকে এই ঘটনাবলির প্রয়োজনীয়তা ও অনিবার্যতা অনস্বীকার্য। সেইসঙ্গে এও মনে রাখতে হবে যে এটা ইতিহাসের একটা পর্যায় মাত্র। একে চরম অবস্থা বলে মনে করলে ভুল হবে। প্রাচীন দর্শনকে আঁকড়ে থাকাটা যেমন প্রতিক্রিয়াশীলতা, এখানে থেমে

থাকাটাও তেমনি আরেক পর্যায়ের প্রতিক্রিয়াশীলতা মাত্র। সুতরাং শুধুমাত্র ধনতান্ত্রিক যুগের বিজ্ঞান-দর্শনের নিরিখে প্রাচীন ভারতের কার্যকলাপ বিচার করে ক্ষান্ত হওয়ার মধ্যে যে প্রগতি উপলব্ধ হয় তা সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। এবং বিশেষ করে প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত-চিন্তা প্রসঙ্গে বস্তু-চৈতন্য-দ্বৈততা স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিলে আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ে এক উৎকট সমস্যা। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত রসতত্ত্ব একটা শিক্ষণীয় উদাহরণ।

এ-বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ সেন-এর একটি চমৎকার আলোচনা আমাদের পক্ষে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর বিবিধ অনুসন্ধানের ফলে আমরা জানতে পারি যে, নাট্যশাস্ত্রে ব্যবহৃত পরিভাষাগুলোর সঙ্গে ভারতীয় দর্শন ও আয়ুর্বেদের সংযোগ আশ্চর্যরকম গভীর। বস্তুত একই 'রস' শব্দ যে শিল্পতত্ত্বে ও আয়ুর্বেদে কেন্দ্রশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এটা মোটেই নিতান্ত আপতন নয়, এর তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। দেহস্থিত রস, দ্রবত্বগুণবিশিষ্ট বস্তু, যাকে নিয়ে রসায়নে এবং কাব্যপাঠে, চিত্রদর্শনে বা সঙ্গীতশ্রবণে সঞ্চারিত নান্দনিক রস এক বিশিষ্ট দার্শনিক অবিভাজ্যতায় সংযুক্ত—এ-সম্পর্কে ভরত ছিলেন নিঃসন্দেহ। এবং শেষোক্তের উপপত্তিতে তিনি চরক বা সুশ্রুতের কতখানি সাহায্য পেয়েছিলেন তা ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমাদের বুঝিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ সেন।

শারীরতত্ত্বের সঙ্গে রসতত্ত্বের এই প্রাচীন সম্পর্ক বিষয়ে আপাতদৃষ্টিতে অনবহিত থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে 'সংগীতদ্বারা রসের উদ্দীপনা' অধ্যায়ে যে-সব কথা লিখেছেন তার সঙ্গে ভরতের মৌলিক বিরোধ অতি অল্প। যেমন—"স্বর-শ্রেণীর আরোহন গতি দ্বারা আবেগ ও উৎসাহের বৃদ্ধি প্রকাশ পায়; এবং অবরোহন গতি দ্বারা তদ্বিপরীত ভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে।...স্বর সকল আশ্ ও মিড় বিহীনে পৃথক পৃথক স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া গাইলে, উৎসাহ, তেজ ও বীর ভাবাদির আবির্ভাব হয়; এবং তাহাদিগকে আশ্ ও মিড় যুক্ত করিয়া গাইলে তদ্বিপরীত রসের অর্থাৎ নিরাশা, দৌর্বল্য, ও শোকদুঃখাদি ভাবের উদয় হইয়া থাকে। স্বর-কম্পন ও গিট্‌কারী শৃঙ্গার ও করুণ রস-ব্যঞ্জক, রোদনের সময় কণ্ঠ কম্পিত হইয়া গদগদ স্বর হয়, এবং ভয় পাইলেও স্বর কম্পিত হয়।" লক্ষণীয় লেখক এ-সব তত্ত্বে চিত্তবিকারের সঙ্গে শারীরিক বিকারের প্রত্যক্ষ সংযোগদ্বারাই পরিচালিত হচ্ছেন। এর পেছনে উদ্দেশ্য অবশ্য একটাই—সংগীতে প্রযুক্ত রসতত্ত্বের একটা ব্যক্তিনিরপেক্ষ ভিত্তি খুঁজে বার করা। কৃষ্ণধন-বাবু যখন প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রকারদের সম্পর্কে অনাস্থা প্রকাশ করেন তখন

তিনি লক্ষ করেন না যে প্রাচীন শাস্ত্রকাররা আরো সচেতনভাবে একই লক্ষ্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন তাঁদের সংগীতভাবনাকে।

অথবা ধরা যেতে পারে স্বরের উৎপত্তি-বিষয়ক প্রসঙ্গকে। একথা সুবিদিত যে ভারতীয় সংগীতচিন্তায় সাংগীতিক ধ্বনিকে নানান পর্যায়ে নানান নামে কল্পনা করা হয়েছে। তার মধ্যে মূল হল নাদ। বলা হয়েছে ব্রহ্মগ্রন্থিতে বায়ু ও অগ্নির সংযোগে নাদের 'উৎপত্তি'। তারপর একদিকে এসে পড়েছে যোগদর্শনের দেহস্থ ষট্‌চক্রের রহস্য, অন্যদিকে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ—নাদব্রহ্ম—যার প্রভাব আবার দর্শনে পড়েছে স্ফোটবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে। এটা তো খুবই স্বাভাবিক, এইসব সিদ্ধান্তের অধিকাংশ সময়েই সমর্থন মিলবে না আধুনিক শব্দবিজ্ঞানে অথবা শারীরবিজ্ঞানে পরিজ্ঞাত তথ্যাদিতে। শরীর-বিষয়ে কিংবা পদার্থ-বিষয়ে সে যুগে মানুষের কাছে অনেক তথ্যই অজ্ঞাত ছিল, যে-সব তথ্য বহু ক্লেশে বহু অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা সংগ্রহ করেছেন পরবর্তী যুগে। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে সংগীততত্ত্বকে এইসব ভিত্তিতে দাঁড় করানোর প্রয়াসটা লক্ষ করার মতো। যে ব্যক্তি-নিরপেক্ষতায় নন্দনতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা তাঁরা করেছেন সেটা আজকের শিল্প-আলোচনাতেও অত্যন্ত করুণভাবে অনুপস্থিত—একথা ধনতান্ত্রিক পশ্চিমের অনুকরণকারী কলাতাত্ত্বিকদের খেয়াল করা প্রয়োজন। বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যে প্রাচীন যুগের উত্তরাধিকার হারিয়ে ফেলাটা সর্বক্ষেত্রেই খুব গৌরবের হয় নি। তাছাড়া শুধুমাত্র যুক্তিতর্কের চর্চাতেও প্রাচীনেরা অনেক সময় যে বিস্ময়কর উৎকর্ষ দেখিয়েছেন সে-সম্পর্কেও কিছু প্রশংসাবাণী তো তাঁদের প্রাপ্য।

নাদব্রহ্মের কল্পনাটাই পুনর্বিবেচনা করা যাক। সংগীত প্রাথমিকভাবে আমাদের কানে যে-ভাবে প্রবেশ করে সেটা সহস্র গুণাবলি বিভূষিত হয়ে সংগীতের প্রকৃত স্বরূপকে আচ্ছাদিত করে রাখে। তার মধ্যে থাকে স্বরসমন্বিত বাক্য বা তানের গঠন-বৈচিত্র্য। থাকে ছন্দ। যন্ত্র বা কণ্ঠের নিজস্ব শব্দগুণ, স্বরভঙ্গিমা, প্রয়োগের বিবিধ দিকগুলো। কলাকারের ব্যক্তিত্বের কথা না হয় বাদই দিলাম। এর মধ্যে অধিকাংশই কিন্তু তাৎক্ষণিক ও অনিত্য। শিল্পতত্ত্বকে বিজ্ঞান হিসেবে দাঁড় করাতে গেলে কিন্তু চিনে নিতে হবে কোনটা তাৎক্ষণিক, কোনটা নয়। অর্থাৎ প্রয়োজন নিত্যতা-অনিত্যতা বিচার। আধুনিক বিজ্ঞানের জনক গালিলিও-ই তো আমাদের বুঝিয়েছেন বিজ্ঞানে পরিশোধন প্রক্রিয়ার কী ভূমিকা। অনিত্য গুণগুলোর খোলস একটি একটি করে ছাড়িয়ে শুদ্ধ স্বরূপে পৌঁছনোর মধ্যেই সম্ভব হতে পারে বিজ্ঞানের প্রকৃত অগ্রগতি। এই পথেই প্রাচীন ভারতবর্ষে

আমরা অগ্রসর হয়েছিলাম অনন্ত স্বরপ্রবাহের বিশৃঙ্খলা থেকে সুবিন্যস্ত রাগ-রাগিণীর পারিপাট্যে, রাগ থেকে মূর্ছনায়, মূর্ছনা থেকে স্বরগ্রামে, স্বরগ্রাম থেকে একক স্বর হয়ে অবশেষে পৌঁছেছিলাম নির্গুণ নাদব্রহ্মের কল্পনায়। আজকের দিনে নানান গোলমালে হয়তো বুঝিয়ে বলা কঠিন হবে সংগীতের পথে এই সহস্রারসিদ্ধিতে কী পরম রসোপলব্ধি সুনিশ্চিত হয়ে যায়, কিন্তু এই যুক্তিক্রমের সঙ্গে প্রগতিশীল বিজ্ঞানের প্রকৃত কোনো বিরোধ নেই—এটা বোধহয় একটু সতর্ক চিন্তাতেই ধরা পড়ে।

আর ওস্তাদ বেচারীদের সপক্ষে কিছু না বলে থাকা যায় না। এঁদের গোঁড়ামি, অন্ধতা, নিরক্ষরতার নিন্দা যথেষ্টই করা হয়েছে। কিন্তু কখনও প্রশ্ন করা হয় নি যে পুরুষানুক্রমে এঁদের সংগীতে যে প্রয়োগকুশলতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় আমরা পেয়ে এসেছি সেটা কী ধরনের শিক্ষাপদ্ধতিতে সম্ভব হয়েছিল। সে শিক্ষার ভিত্তি কি পুরোপুরি এম্পিরিকাল, না তার কোনো ঔপপত্তিক ভিত্তিও ছিল? সচেতন ব্যক্তিমাত্রই সন্দেহ করবেন যে শুধুমাত্র এম্পিরিকাল পদ্ধতিতে এত দীর্ঘদিন ধরে সারা ভারতে এত ব্যাপকভাবে একই কলাবিদ্যাকে সমান উৎকর্ষে টিঁকিয়ে রাখাটা খুব সহজ না-ও হতে পারে। বস্তুত একটু অন্তরঙ্গ অনুসন্ধানেই খবর পাওয়া যায় যে, ভারতের সমগ্র সংগীতভাবনা-ই সযত্নে ধারণ করে রেখেছেন এই 'নিরক্ষর' ওস্তাদবৃন্দই। শুধু ধারণ করা নয়, নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যুক্তিতর্কের বিশ্লেষণে সেই সংগীতচিন্তাকে উন্নততর করার কাজটাও এঁরাই করে গেছেন। অন্যদিকে সে কাজে ব্যর্থ হয়েছেন মধ্যযুগীয় তথাকথিত শাস্ত্রকারবৃন্দ। এশীয় উৎপাদনব্যবস্থার স্থায়িত্বের দোষেই হয়তো সৃষ্টি হয়েছিল চিন্তাভাবনার কিছু কিছু অস্বাস্থ্যকর আবর্ত, যার মধ্যে পড়ে অর্বাচীন গ্রন্থরচয়িতারা প্রয়োগ প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাচীন সংগীততত্ত্বের এক উদ্ভট বিকৃতরূপ হাজির করে ফেলেছিলেন তাঁদের রচনার মাধ্যমে। ওস্তাদরা এইসব সংগীতগ্রন্থের বিরোধিতা করে গেছেন, তাঁরা নিরক্ষর বলে নয়। বরং কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিশ্লেষণে ঐসব গ্রন্থের যে অসম্পূর্ণতা, অসঙ্গতি ইত্যাদি লক্ষ করেছেন, সেইসব ত্রুটির কারণেই ওস্তাদরাও ছিলেন গ্রন্থগুলোর সম্পর্কে বিরূপ। অন্যপক্ষে তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগের সম্পর্কটাও কলাকারদের কাছেই সুস্পষ্ট ছিল। প্রয়োগের প্রয়োজনে যুক্তির সাহায্যে যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব শুধুমাত্র সেগুলোকেই তাঁরা শাস্ত্রসম্মত বলে স্বীকার করতেন। এবং ঐ পথেই তাঁদের এই কাণ্ডজ্ঞান জন্মেছিল যে ভারতীয় সংগীতকে ভারতীয় যোগ, দর্শন, ব্যাকরণ, আয়ুর্বেদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বোঝার চেষ্টা করাটা একটা অসম্ভব প্রচেষ্টা।

তাঁদের গোঁড়ামির দোষ নিশ্চয় নিন্দার্হ। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে ভারতীয় সংগীতশিক্ষণের ব্যাপারে যে মূল্যবান কাজটি করতে অগ্রসর হয়েছিলেন, ওস্তাদদের পক্ষে অবশ্যই সঙ্গত হত ঐ কাজে তাঁদের পূর্ণ সহযোগিতা করা। সেটা তাঁরা করেন নি গোঁড়ামির জন্যই, ভাতখণ্ডেজীর ব্যাপারে দু-একজন ওস্তাদ হয়তো ব্যতিক্রম ছিলেন। এটা কৃষ্ণধনবাবুর প্রতিভারই পরিচায়ক যে ঐ সাহায্য ছাড়াই গীতসূত্রসারে মূর্ছনা ও রাগরাগিনীর মধ্যে গূঢ় সম্বন্ধ প্রায় সঠিকভাবেই ধরতে পেরেছেন। ওস্তাদদের সহযোগিতা পেলে তিনি বিনাপরিশ্রমেই সম্পূর্ণ তত্ত্বটি জানতে পারতেন। জানতে পারতেন ঐ সম্বন্ধের প্রয়োগগত তাৎপর্যটুকুও—বিভিন্ন রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলোর শ্রুতিস্থান কিরকম সহজভাবে নির্ধারিত হয়ে যায় মূর্ছনার সাহায্যে। এরকম সহস্র ক্ষতি আমাদের হয়ে গেছে শুধুমাত্র কলাকার ও আধুনিক শাস্ত্রকারদের মধ্যে এক অনতিক্রম্য দূরত্ব থেকে যাওয়ার দরুণ।

উপন্যাস পাঠের প্রস্তুতি

গোপাল হালদার

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নতুন চেতনা ঃ প্রেম

নতুন রূপ-চেতনা বঙ্কিমের সৃষ্টির যেমন একটা স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য, প্রেমের নতুন সাধনাও তেমনি তার অন্য বৈশিষ্ট্য। দুটি একই সঙ্গে যুক্ত। রূপ শ্রেষ্ঠ রোমাণ্টিক কল্পনায় এক অদ্ভুত রহস্য। দেহাশ্রয়ী হলেও রূপ শুধু দৈহিক নয়, তা অপরূপ, এবং অপরূপ হয়ে রহস্যময়। দেহাশ্রয়ী রূপের মোহ, প্রণয়-বেদনা, আসক্তি ও উন্মাদনা হয়ে ওঠে। আবার, সে রূপ-সংবেদনা থেকে হৃদয়-বেদনা হয়ে, অন্তর-যন্ত্রণা হয়ে, পরস্পরের 'ইন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা' থেকে 'ভাব' হয়ে, ইন্দ্রিয়াতীত প্রীতি হয়ে, প্রেম হয়ে, আরেক গহন রহস্য হতে পারে। যেখানে রূপের এই প্রেমঘন রহস্য, সেখানেই জীবনের বিশিষ্ট উপলব্ধি। মানবাত্মা সেখানে অনুভব করে—'মোহ মোর মুক্তিরূপে' ফুটবার জন্যই এই দেহ, এই জন্ম, এই মানবজীবন।

এ তত্ত্বটাও আমাদের দেশে অজ্ঞাত নয়। আর, শুধু আমাদের কেন, ইউরোপ-এশিয়ার বহুদেশেই মধ্যযুগের মিস্টিক কবিরা প্রেমের এই পারমার্থিক পরিণতির কথা বলেছেন। মধ্যযুগের ইউরোপীয় মিস্টিক কবি, আরব-পারস্যের সুফী সাধকগণ, এবং আমাদের বৈষ্ণব ও সুফী সাধকদের কথা বিশদ করা নিষ্প্রয়োজন। ইউরোপে দান্তের পরে কী হয়েছিল জানি না, আমাদের দেশে সে প্রেম-সাধনা 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়-ইচ্ছা'রূপে একটা বিশিষ্ট সাধনপদ্ধতি হয়ে উঠেছিল। ফলে দ্বান্দ্বিক নিয়মেই প্রেমলীলার একদিকে যেমন 'নেড়া-নেড়ীর' বিকৃতি এসেছে, অন্যদিকে জনমনে পর্যন্ত তার সহজ স্বীকৃতি সুদৃঢ় হয়েছে : "অদ্যাপিও ব্রজলীলা করে শ্যাম রায়। কোনো কোনো ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়।"—এ বোধ নিতান্ত তত্ত্বকথা নয়। আমাদের ভাষায় 'পিরীত' কথাটায় তার যেমন এক পিঠ, 'পিরিতি' কথাটায় তার তেমনি উলটো পিঠ স্পষ্ট। বঙ্কিমের উপন্যাস থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে কথাটা পরিষ্কার করা যেতে পারে।

'মৃণালিনী' প্রবীণ বঙ্কিমের লেখা নয় ; উপন্যাস হিসাবে বঙ্কিম এই উপন্যাসখানাকে সামগ্রিক ঐক্য দিতে পারেন নি। মৃণালিনীর চরিত্র আশ্চর্য চিত্র হলেও তাই আখ্যানের সঙ্গে কিছুটা অসংলগ্ন, রহস্যাবৃত। কিন্তু একবার

'আমি ত উন্মাদিনী' (তৃতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) পাঠ করলে অনেক সন্দেহ দূর হয়। নীচেকার খণ্ডিত উদ্ধৃতিতে তার মূল্য খণ্ডিত হবে ; তবু তাতে বঙ্কিমের প্রেম-ভাবনার মূলসূত্র মিলবে, আশা করি।

মনোরমার উক্তি ঃ

"প্রণয় প্রথমে একমাত্র পথ অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত সময়ে শতমুখী হয় ;—প্রণয় স্বভাবসিদ্ধ হইলে শত পাত্রে ন্যস্ত হয়—পরিশেষে সাগরসঙ্গমে লয়প্রাপ্ত হয়—সংসারস্থ সর্বজীবে বিলীন হয়।"

(স্মরণীয়—'ধর্মতত্ত্বে'র আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি থেকে সর্বজীবপ্রীতি,—তাই ভগবদ্ভক্তি।) মূঢ় হেমচন্দ্রের মতো আমরা অনেকেই 'জ্ঞান' দান করতে চাইব ঃ

"প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই ? পাপাসক্তকে কি ভালবাসিতে হইবে ?"

মনোরমা ঃ

পাপাসক্তকে ভালবাসিতে হইবে। প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই। সকলকেই ভালবাসিবে, প্রণয় জন্মিলেই তাহাকে যত্নে স্থান দিবে ; কেননা প্রণয় অমূল্য। ভাই যে ভাল তাকে কে না ভালবাসে, আমি তাকে ভালবাসি। কিন্তু আমি যে উন্মাদিনী।

প্রেমোন্মাদ চৈতন্যের পরে এই চেতনা এদেশ থেকে লোপ পাবার কথা নয়—তবে অনেকটা তত্ত্বে (কাল্ট) পরিণত হয়েছে। তথাপি এরূপ 'উন্মাদ'দের বঙ্কিম যথেষ্ট দেখে থাকবেন—আমরাও বাঙলার আউল-বাউল লোকযানের নানা ধারার ভালোমন্দ সাধকদের মধ্যে তা দেখতে পাই।

কিন্তু বঙ্কিমের অভিজ্ঞতায় রূপ ও রূপজ মোহ যত বড় যন্ত্রণাদায়ক বাস্তব সত্য—প্রেমের এই দেহাতীত, প্রায় লোকোত্তর পরিণতি—'কামগন্ধ নাহি তায়' এমন প্রেম—তত সত্য নয়। অন্তত বঙ্কিমের উপন্যাসে তা নয়। বঙ্কিমের কোনো নায়ক, কোনো নায়িকার পক্ষেই নয়,—'সীতারামে'র সন্ন্যাসিনী স্ত্রীর পক্ষেও নয়—অন্যদের কথা না বলাই ভালো। "বাল্যপ্রেমেই শুধু অভিশাপ থাকে না", অন্য প্রেমেও থাকতে পারে। কারণ প্রেম দেহাবদ্ধ নয়, দেহাতীতও নয়—যতক্ষণ দেহ, ততক্ষণ দেহাশ্রয়ী আকুতির জ্বালা-যন্ত্রণা অনিবার্য। চৈতন্যের সেই যন্ত্রণাময় সুতীব্র স্ফূরণ এক রহস্যময় জীবনসত্য। তার আসক্তিতে আত্মনাশ,—আত্মসমর্পণে অধ্যাত্মাভিষেক, বঙ্কিমের উপন্যাসের তা এক নিগূঢ় ব্যঞ্জনা। হেমচন্দ্র যা বুঝুক,—প্রেমই মনোরমার উপদেষ্টা—"তিনি অগ্নিস্বরূপ—আলো করেন, কিন্তু দগ্ধও করেন।"

এই প্রেম নিয়তির মতো অপ্রতিরোধ্য—হয়তো বা তা মানব-নিয়তিরই

স্বরূপ। হেমচন্দ্র পরম শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানীর মতো 'বিধবা' মনোরমাকে স্বামী ব্যতীত অপর কাউকে মনেও স্থান দিতে নিষেধ করাতে তাই মনোরমা উচ্চহাস্য করে ওঠে, হাসি আর বন্ধ হয় না। "হাসিতেছ কেন ?" জিজ্ঞাসা করলে মনোরমা বলেন :

ভাই, এই গঙ্গাতীরে গিয়া দাঁড়াও ; গঙ্গাকে ডাকিয়া কহ, গঙ্গে তুমি পর্বতে ফিরে যাও।

হে। কেন ?

ম। স্মৃতি কি আপন ইচ্ছাধীন ? রাজপুত্র, কালসর্পকে মনে করিয়া কি সুখ ? কিন্তু তথাপি তুমি তাহাকে ভুলিতেছ না কেন ?

হে। তাহার দংশনের জ্বালায়।

ম। আর, সে যদি দংশন না করিত ? তবে কি তাহাকে ভুলিতে ?

বঙ্কিমের উপন্যাসের কেন্দ্রকথা নর-নারীর এই দংশন-জ্বালা,—প্রেমের তা কোন বিশেষ রূপ, আমরা তা পরে দেখছি। এখানে এইটুকুই লক্ষ্য করার যে, প্রেমের এই আকর্ষণ গঙ্গাস্রোতের মতো ; নিয়তির মতো প্রণয় অপ্রতিরোধ্য। বঙ্কিমের উপন্যাসে প্রেম-চেতনার প্রধানত এই ধরনের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই গঙ্গা সমুদ্রগামিনী। তার থেকে বেশি, এই গঙ্গা আবার পাতালমুখিনী, ভোগবতী। বঙ্কিম কিন্তু সমুদ্রগামিনী গঙ্গার স্বর্গগঙ্গায় রূপান্তর চান। সেখানে বঙ্কিম পৌরাণিক সমাজের নতুন সংহিতাকার—এই ভূমিকাও তাই তাঁর পালন করা চাই। ব্যর্থতা-ভার থেকে মুক্তির পথ তাঁকে পেতে হবে, এবং অন্যদের দেখাতে হবে। সেই কারণেই মনোরমার পরবর্তী কথা প্রথম কথাকেও ছাপিয়ে যায়। মনোরমা বলেন :

আমি অবলা ; জ্ঞানহীনা ; বিবশা ; আমি ধর্মাধর্ম কাহাকে বলে জানি না। আমি এই মাত্র জানি—ধর্ম ভিন্ন প্রেম জন্মে না।

সেই প্রথম পর্ব থেকে (১৮৬৮ সাল) বঙ্কিম এই বিশ্বাস আঁকড়িয়ে ধরতে চেয়েছেন। রস-চেতনায় নয়, শুধু প্রেম-সাধনায়ও নয়,—কারণ সমাজ-সংহিতাকার তাতেও সুস্থ বোধ করেন না। শৈবলিনী, প্রতাপ, লবঙ্গলতিকা ও অমরনাথ(?)-ও বঙ্কিমের সেই নীতিবোধের সাক্ষী। নবকুমার, নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, ভবানন্দ, মবারক কিন্তু সেই সঙ্গে চীৎকার করে জানায়—"ইয়া আল্লা আমাকে মরিতেই হইবে।" তারাও মানে—ধর্ম সত্য ; কিন্তু মানব-আসক্তি 'কেন বাধ্যতে' ?—হীরা, রোহিণীদের কণ্ঠ না হয় না-ই শোনা গেল। ভ্রমরের জিজ্ঞাসায় ('ধর্ম নাই কি ?') গোবিন্দলাল জানায়, 'বুঝি আমার তাও নাই।' (৩০ পরিচ্ছেদ)। নীতিবোধের মতোই এই উপলব্ধিও বঙ্কিমের অপরিহার্য।

হিন্দু উত্তরাধিকারসূত্রে অবশ্য বঙ্কিম জানেন ও বিশ্বাস করেন—মানুষ শুধু প্রবৃত্তির দাস নয়, প্রবৃত্তিজয়ও তার দায়িত্ব। আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায় বঙ্কিম আরও ভালো করে সেই নীতিবোধকে মানবীয় মূলে রোপিত করেন। জীবনের অভ্যন্তরেই স্ব-বৃত্তির বিকাশ ও সামঞ্জস্যের দাবি আছে; সেই সামঞ্জস্যেই মনুষ্যত্ব; মনুষ্যত্বেই ধর্ম, আর সেই ধর্মেই শান্তি,—যে শান্তি 'ভ্রমরেরও ভ্রমর'। সেই নীতিবুদ্ধিকে বঙ্কিম বারবার উপন্যাসের মধ্যে আরোপ করেছেন। তা শৈবলিনীর জন্য কৃত্রিম শুদ্ধি বা প্রায়শ্চিত্ত, লবঙ্গলতিকার জন্য আরও কঠিন জীবন-তপস্যা, প্রতাপের জন্য প্রাণবিসর্জন; গোবিন্দলালের জন্য (প্রথম সংস্করণে অনুতাপে মৃত্যু, পরবর্তী সংস্করণে তৎপরিবর্তে) সুদীর্ঘ তপস্যার ব্যবস্থা করে বঙ্কিম শান্তিপাঠ করেছেন। কিন্তু মবারক, ভবানন্দ, সীতারাম শেষ অবধিও বঙ্কিমের শিল্প-ধর্মের সাক্ষ্য অমান্য না করে জানায়—গঙ্গা পর্বতে ফিরে যায় না।[১]

বঙ্কিমের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সামাজিক নীতিধর্ম প্রচারের কলও বানাতে পারে, কিন্তু মনের গহন-তলে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি বিফল হয় না; মানবীয় নীতির, মানব-ধর্মের সাক্ষ্যই সৃজন-শক্তি গ্রাহ্য করে—গীতার বচন নয়।

সীমাবদ্ধতা

এ কথা পরিষ্কার—বঙ্কিমের শ্রেণীদৃষ্টি ও তার সীমাবদ্ধতা বোঝা তাঁর প্রতিভার সামাজিক তাৎপর্য সন্ধানে মুখ্য ব্যাপার নয়। শ্রেণী-সংকীর্ণতা কি শেক্সপীয়রের ছিল না? সে দিক থেকে দেখলে বঙ্কিমের অনুরূপ সীমাবদ্ধতারও কি আমরা উদ্দেশ পাই না? তা বঙ্কিমের উপন্যাসের ভাববস্তু বা থিম-এর সীমাবদ্ধতা।

ভাববস্তু: বঙ্কিমের উপন্যাসের ভাববস্তু প্রকৃতপক্ষে মাত্র একটি—রূপতৃষ্ণা ও রিপুর প্রাবল্য। 'বিষবৃক্ষ' থেকে 'সীতারাম' পর্যন্ত বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন অবস্থায়, এই একটি রিপুর নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপ বঙ্কিম বর্ণনা করেছেন। একটু স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়—তাঁর উপন্যাসের মুখ্য বিষয়বস্তু নর-নারীর আকর্ষণ-বিকর্ষণ—তার বিরুদ্ধে পরিবার-পরিজনের আকর্ষণ-বিকর্ষণের জটিলতা প্রায় অনুল্লেখিত। মুখ্য ভাববস্তু রমণীর রূপ, রূপজ মোহ, সে মোহের

১. রমানন্দ স্বামীর সমস্ত যোগবলও শৈবলিনীকে সম্পূর্ণ 'স্টেরিলাইজ' করতে পারে না। শৈবলিনী বলতে বাধ্য হয়—প্রতাপ জীবিত থাকতে তার মুক্তি নেই; আর তাই প্রতাপ বোঝে—তার মৃত্যু প্রয়োজন। এই বিশেষ সত্যটির দিকে শ্রীযুক্ত সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আবর্তন-বিবর্তন, তার ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রের বিবর্তন, বিকাশ ও বিপর্যয়। বিভিন্ন বিষয়বস্তুর অভ্যন্তরে ভাববস্তু মাত্র একটি। মূল ভাব—প্রণয়, মূল রস—যাকে বলে শৃঙ্গাররস, তা; এবং তার আবর্তন-বিবর্তন।

শৃঙ্গাররস আদিরস, শিল্প-সাহিত্যে তা স্বীকার্য,—জীবনে তার প্রাধান্য স্বীকৃত বলেই শিল্পেও তার প্রাধান্য স্বীকৃত। এই কথার জন্য ফ্রয়েড মহোদয়ের দোহাই নিষ্প্রয়োজন; পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়দের মতো তন্ত্রের প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বের নামে তত্ত্ব ও বাক্যের ধুম্রজাল বিস্তারও নিরর্থক।

বহ্নিই বলি বা লিবিডোই বলি, প্রকাশে তা বহুবিচিত্র।

বঙ্কিমের উপন্যাসে কিন্তু জীবনবহ্নির শিখা একটি—রূপবহ্নি, ভোগবহ্নিই প্রায় তাতে একমাত্র বহ্নি —অবশ্য সেই রূপবহ্নি থেকে ক্রোধ-ঈর্ষার অন্যবিধ বহ্নিও এক-আধটুকু জ্বলে বটে। কিন্তু মায়া-মমতার বহ্নি জ্বলে কতটা? সূর্যমুখী-ভ্রমর-চন্দ্রশেখর-প্রতাপ-লবঙ্গলতিকা-অমরনাথদের মধ্যে প্রেমবহ্নি সেই স্নেহশীলতা লাভ করে থাকতে পারে। কিন্তু 'বিষবৃক্ষ', 'কমলাকান্তের উইলে'র মতো বঙ্কিমের প্রধান উপন্যাস রিপু-প্রাবল্যেরই চিত্র। কোথায় বাৎসল্যরস? কল্যাণী-রমা-কমলমণিতে তার ক্ষীণস্বীকৃতি বড়ই গৌণ। কোথায় বা সখ্যরসের চিত্র? ইন্দিরা-সুভাষিণী-শৈবলিনী-সুন্দরীতে কতটুকু তার স্বীকৃতি? কোথায় হ্যামলেট, ওথেলো, ম্যাকবেথ (পশুপতি?), লীয়র—মানব-মহারসের এইসব বিচিত্র নিদর্শন বঙ্কিম-উপন্যাসে কোথায়?

এইরূপ ভাববস্তু বিষয়ে বঙ্কিমের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা মানতে হয়।

বিষণ্ণতা ও বিচ্ছিন্নতা

একটু অবান্তর হলেও জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে—মানব-প্রেমের মহিমা বঙ্কিম বিদেশীয় সাহিত্যে নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন;—ভারতীয় ক্লাসিকাল সাহিত্যেও দেখেছেন, কিন্তু মানুষের সেই মর্ত্যপ্রেমের সহজ উজ্জীবনের সার্থক চিত্র কেন তিনি বাঙলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারলেন না? সম্ভবত তার কারণ তখনো বঙ্কিমের অনুভূত হয় নি—কিন্তু হওয়া উচিত ছিল।

বঙ্কিমের উপন্যাসে তাঁর নায়ক-নায়িকারা প্রায় সকলেই পারিবারিক-সামাজিক সর্ববন্ধন থেকে মুক্ত,—প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত। কারণ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে স্বতন্ত্র ব্যক্তিকেই উপন্যাস দাবি করে, তাকেই 'চরিত্র'রূপে রূপায়িত করে। কিন্তু এই সর্ববন্ধনমুক্ত নারী বা পুরুষের বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা (আইসোলেশন), এই বিচ্ছিন্নতা মানব-সত্তার শ্রেষ্ঠ

বিকাশেরও আবার অন্তরায়। শুধু দুইজনাকে নিয়েই দুইজনা সম্পূর্ণ হয় না (রোহিণী-গোবিন্দলাল অথবা চিত্রাঙ্গদা-অর্জুনের মতো)। প্রেমের সেরূপ একান্ততা একটি বিমূর্ত তত্ত্ব, কার্যত তা মিথ্যা হয়। জগৎ ও জীবনের সকল দায়িত্ব-কর্তব্যের সঙ্গে ব্যক্তির আপন সত্তার প্রকাশ ও বিকাশের সাধনাকে সংযুক্ত ও সমন্বিত করলেই ব্যক্তিত্বের সিদ্ধি সম্ভব। সংসারের যোগাযোগের মধ্যেই নর-নারী বিশিষ্টরূপে প্রেমের মধ্য দিয়ে দুজনার একান্ত আত্মীয় হবে—জীবনের এরূপই দাবি। জীবনের সামগ্রিকতা থেকে বঙ্কিম তাঁর নায়ক-নায়িকাদের স্পষ্টত বা প্রকারান্তরে বিচ্ছিন্ন করে গ্রহণ করেন। এই জন্য বঙ্কিমের নর-নারীর প্রেমও শেষ অবধি সুস্থ অধ্যাত্মবিকাশ থেকে বঞ্চিত হয়। এই সত্য বঙ্কিম দেখেন নি; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের তখনো গৌরবের দিন, তখনো পাশ্চাত্য সমাজে এই সত্য সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয় নি; বঙ্কিমের দৃষ্টিতেও হওয়ার কথা নয়। এই বিচ্ছিন্নতাই বঙ্কিমের নরনারীর সেই প্রেমসাধনার অসম্পূর্ণতার বিশেষ হেতু, বঙ্কিম তা বোঝেন নি। কিন্তু তাদের অসম্পূর্ণতা তিনি দেখেছেন। তার ফলে, নরনারীসম্পর্ক বিষয়ে ব্যর্থতার বিষণ্ণ দৃষ্টি থেকে যায়। তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতে প্রেমের মোহ আর দ্বন্দ্বই বেশি, সুস্থ বিকাশ ও সম্পূর্ণতা নেই। এই কারণেই ভাবমার্গীয় সর্বজীবপ্রীতি, ভগবৎপ্রীতি, শান্তি প্রভৃতি আদর্শবাদী তত্ত্বে আশ্রয় নিয়ে একটা সান্ত্বনার উপায় খোঁজা ছাড়া বঙ্কিমের আর পথ থাকে নি। তাতে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন কি? বঙ্কিমের চৈতন্য—জীবন-জিজ্ঞাসা ও জীবন-বোধ—সুপারফিসিয়াল বা অগভীর নয়—অগভীর সমাধানও সহ্য করত না। তাই জটিল আবর্তের সম্মুখে তাঁর বুদ্ধি ও মনন-শক্তি যা-ই বলুক, জীবনের মধ্যে প্রেমের পূর্ণতা না দেখলে তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসা ব্যর্থ বিষণ্ণ থাকা স্বাভাবিক।—জীবনের মধ্যে চাই সম্পূর্ণতা। আদিরস আদিই থাকে, জীবনরসে মিলে পূর্ণতা লাভ করে না।

একবার মাত্র বঙ্কিম 'ইন্দিরা'য় 'স্পিরিট অব ডিলাইট'কে সম্পূর্ণ পরিণত মনের হাস্যমুখরতা দিয়ে স্বাগত করেছেন। না হলে, 'কমলাকান্ত' হোক, যাই হোক, বঙ্কিমের উপন্যাসে দেখি বিষাদের ছায়া পক্ষবিস্তার করে আছে। 'বুড়া বয়সের কথা' (কমলাকান্তের পত্র, ১৪শ) হয়তো বিষয়ের গুণেই বিষণ্ণ।

অমরনাথের সঙ্গে 'রজনী'র রজনীর স্রষ্টার মনের তার নিম্ন উদ্ধৃতিতে এক সুরে বাঁধা:

> সুখ, তোমাকে সর্বত্র খুঁজিলাম—পাইলাম না। সুখ নাই, আর আশায় কাজ কি? যে দেশে অগ্নি নাই সে দেশে ইন্ধন আহরণ করিয়া কি লাভ হইবে? ...প্রতিজ্ঞা করিয়াছি সব বিসর্জন দিব।

'জীবন লইয়া কি করিব'—এই কি তার উত্তর ? জীবন বুঝি সুখের আশায় শুধুই জীবন-জ্বালার জন্য 'ইন্ধন আহরণ'। বঙ্কিমের চিন্তা-ভাবনা ও শিল্পসাধনা সর্ববৃত্তির সামঞ্জস্যে সেই জ্বালার নিবৃত্তি চাইলেও বৌদ্ধধর্মের মতো 'নির্বাণ' চায় নি। জীবনের শান্তোজ্জ্বল পরিণতিই তাঁর কাম্য। শ্রদ্ধাহীন সিনিকের মতো বঙ্কিম কখনো জীবনকে বঞ্চনা করতে চান নি, ক্ষুদ্র করে দেখতে স্বীকৃত হন নি। অন্তরের গভীরতার বশে প্রায় প্রথম থেকেই তিনি জিজ্ঞাসু। সেই জন্যই প্রায় প্রথম থেকে তিনি ভাবনা-গম্ভীর, বেদনা গম্ভীর। তিনি গভীরভাবে জীবন-রহস্যকে অনুভব করেন, গভীরভাবে পরীক্ষা করেন, গভীরভাবে চান জীবনের রহস্য-উদ্‌ঘাটন। একমাত্র 'দুর্গেশনন্দিনী'তে তাঁর প্রথম যৌবনের রোমান্স-বিলাস একটু দেখা যায়—পরবর্তী উপন্যাসসমূহে বঙ্কিমের জীবন-দৃষ্টির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। 'দুর্গেশনন্দিনী' জীবন-রস আস্বাদনের প্রথম উল্লাস-ঔৎসুক্য। তারপরেই 'কপালকুণ্ডলা'—বঙ্কিমের জীবন-দৃষ্টির সত্যকারের উন্মেষে তা বিষাদকম্পিত। একদিক থেকে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বঙ্কিমের রহস্য-বিমূঢ় জিজ্ঞাসার, অনুভূতির ও কবিকল্পনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ 'কপালকুণ্ডলা'।

কপালকুণ্ডলার তাৎপর্য

'কপালকুণ্ডলা' অবশ্য কাব্যধর্মী উপন্যাস। উপন্যাসসুলভ জীবন-চিত্র তাতেও সার্থকভাবেই আছে। সপ্তগ্রামের ব্রাহ্মণগৃহের অ-রোমান্টিক সুস্থ জীবনচিত্র; আগ্রার বিলাসিনী মতিবিবির প্রেমের অগ্নিস্পর্শে রোমান্টিক পুনর্জন্ম; কপালকুণ্ডলার রূপে ও সহজ করুণাময় হতভাগ্য নবকুমারের উন্মাদনা—সে উন্মাদনাকে শুধু 'আসক্তি' বলা চলে না, ভ্রান্ত ঈর্ষাও না;—প্রেমের অসম্পূর্ণতার ব্যথায় অসহায়তা, আত্মদহন,—'আপনার হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিতে' আসা;—মতিবিবির ঈর্ষা-কুটিল প্রণয়-যন্ত্রণার মধ্যে মানুষীবৃত্তির ঈষৎ উন্মেষ,—এইসবে রোমান্টিক উপন্যাসের ধর্ম যথার্থ রূপে সুরক্ষিত হয়েছে। কিন্তু এসব 'কপালকুণ্ডলা'র মূলভাবের বিরোধী (কনট্রাসট) ভাব —অবান্তর নয়, কেন্দ্রীয় বিষয়ের প্রয়োজনীয় প্রতিকূলভূমি ('ফয়েল')। 'কপালকুণ্ডলা'র কেন্দ্রীয় ভাববস্তু আরও গভীরে নিহিত, তা অনুভব করা যায়। সে ভাববস্তু বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবনিয়তির যোগাযোগ। অনন্ত উদ্বেলিত সমুদ্রের সম্মুখে শান্ত সপ্তগ্রাম ও বিভ্রমময়ী আগ্রার জীবন চিত্রিত—একই রকম অসহায়, একই রকম নিষ্ফল, অর্থহীন।

অনিবার্যভাবেই কপালকুণ্ডলায় ওয়ার্ডসওয়ার্থের কথা মনে পড়ে—'প্রেলুডে'র

কোনো কোনো গভীর ভয়ঙ্কর অংশ নির্জন সমুদ্রোপকূলের অরণ্যানীর উপর যেন ছায়াপাত করেছে। অবশ্য এই প্রকৃতি-চেতনাও এ দেশে নতুন নয়; কিন্তু আমরা বলেছি, বঙ্কিমকে তা নতুন করে লাভ করতে হয়েছে ইংরেজি সাহিত্য থেকে। বঙ্কিম ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে এই নিসর্গচেতনা বাঙলা সাহিত্যে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন। বঙ্কিমের এই নিসর্গরহস্য রূপে রসে তাৎপর্যময়। কাব্যেরই তা উৎকৃষ্ট বিষয়—বঙ্কিমও তাকে কাব্যময় প্রকাশই দিয়েছেন। উপন্যাসের ধর্ম না খুইয়েও তাই 'কপালকুণ্ডলা' শ্রেষ্ঠ কাব্য। পৃথিবীতে নিসর্গ-চেতনার এমন অনৈসর্গিক পুষ্প আর কোনো সাহিত্যে ফুটেছে কিনা জানি না, —ফুটলে সে সাহিত্যেরও গর্বের কারণ আছে। কিন্তু সে সৌভাগ্যের কথা বলবার জন্য এখানে এ প্রসঙ্গের অবতারণা নয়। আমাদের উদ্দেশ্য—সেই নিসর্গ-রহস্য ও তার সঙ্গে সংলিপ্ত কপালকুণ্ডলার ভৈরবী-ভীতিভক্তিসংযুক্ত নিয়তি,—বঙ্কিমের অন্তর্জীবনের যে ভাবকে প্রকাশ করে, জীবন ও জগৎ বোধের যে আভাস বহন করে,—সেই ভাবকে অনুধাবন করা। এই ভাবের সঙ্গে জড়িত দেখতে পাই বঙ্কিমের সেই বিষণ্ণ-গম্ভীর অনুভূতি। বঙ্কিমের চেতনা বিশ্বপ্রকৃতির মহান ভয়ংকর দুর্নিবার্য শক্তির সম্মুখে একইকালে অ্যাণ্ড ওয়াণ্ডার-এ স্তব্ধ, আবার, দুর্বোধ্য মানব-নিয়তির ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখে শঙ্কায় বিমূঢ়ঃ—'সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে···আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?'

যৌবনের মধ্যগগনেই বঙ্কিমের অন্তরে এই যে বিষাদগম্ভীর অনুভূতি জন্মেছিল, কী বলব তাকে? একালের ভাষায় 'অ্যালিয়েনেশন'? 'অ্যাঙ্গস্ট'? যার সম্ভাব্য নিবৃত্তি ক্যাথলিক ধর্মোক্ত বিনম্র আত্মসমর্পণে? অর্থাৎ অসহায় ভক্তিবাদে? 'অন্ধকার, প্রভো, চারিদিকেই অন্ধকার।···আমায় কে রক্ষা করিবে?' এই রোদন কি সেই 'অ্যাঙ্গস্ট'-এর আর্তনাদ?

না। বঙ্কিমের জীবনবোধ সেই বুর্জোয়া বিচ্ছিন্নতা ('অ্যালিয়েনেশন') নয়, সেই সরলীকৃত আত্মনিবেদনের পথও তা গ্রহণ করে নি। বঙ্কিমের 'রোমাণ্টিক বিষাদ' রোমাণ্টিক বিষাদ-বিলাসও নয়,—তা জীবন-জিজ্ঞাসায় গভীর ও গম্ভীর। বঙ্কিমের সেই জীবন-জিজ্ঞাসা নিয়তিবাদকে ছাড়িয়ে মনুষ্যচরিত্রের মধ্যে উত্তর খুঁজেছে। নিয়তির মতোই অবাধ্য মনুষ্যপ্রবৃত্তি,—হয়তো বা নিয়তিরই প্রতিনিধি সেই প্রবৃত্তি। তার সম্মুখে মানুষের পুনঃপুনঃ পরাজয় সত্য বটে। হিন্দুসংস্কারদৃষ্টিতে তা সমাজ-বিহিত ব্যবস্থার নীতিভঙ্গ, এবং পাপ। সে পাপ থেকে উদ্ধারের পথ ভগবদ্ভক্তি,—এ বোধও তাই

হিন্দুসংস্কারপুষ্ট বঙ্কিমের চিত্তে সুদৃঢ়। কিন্তু বঙ্কিম সেই সঙ্গেই আধুনিক দৃষ্টিতে কোঁৎ-এর যুক্তিবাদী শিষ্য। মানব-প্রকৃতির জয়াশা তিনি পরিত্যাগ করেন না। তিনি অনুভব করেন—মানব-প্রকৃতির মধ্যেই সামঞ্জস্যের প্রেরণাও রয়েছে ; সেই সামঞ্জস্যেই মনুষ্যত্ব, আর মনুষ্যত্বই ধর্ম। ক্যাথলিক ধর্মোক্ত কোনো স্বর্গস্থিত বিধাতার কৃপার (গ্রেস) ওপর মানুষের সেই আত্মজয় নির্ভর করে না,—পৃথিবীর মানুষকে আপন প্রয়াসেই তা আয়ত্ত করতে হয়—মনুষ্যত্বেরই এই দায়িত্ব, আর এ দায়িত্বেই মানুষের মহিমা।—'জীবন লইয়া কি করিব', এ জিজ্ঞাসারও গোড়ায় নিহিত এই মানব-দায়িত্ববোধ।

উত্তরটা অবশ্য প্রধানত বঙ্কিমের মনন-প্রতিভার স্বাক্ষর। বঙ্কিমের উপন্যাসের মধ্যে এ উত্তর সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠতে পারে নি,—তা আমরা জানি। হলে উপন্যাসত্রয়ী প্রচারের ফল হত না। সেইখানেই ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের প্রতিভার জটিলতা। বঙ্কিমের বিষণ্ণ ব্যর্থতার গূঢ় কারণও সেইখানে। তা সত্ত্বেও কিন্তু 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যে তাৎপর্য প্রতিভাত হয় তার মুল জীবন সম্বন্ধে বঙ্কিমের গভীর শ্রদ্ধা ও অনুভূতি এবং দায়িত্ববোধ।

অনুভূতির সাক্ষ্য

বঙ্কিমের সৃজন-সাহিত্যে স্থূল ও সূক্ষ্ম দু-রকমের সীমাবদ্ধতাই আছে, আমরা তা দেখেছি। সে সব সেই সাহিত্যের নেতিবাচক দিক। তার সদর্থক দিকও আছে,—তাতেই সে সাহিত্যের সদর্থক তাৎপর্য। তথাপি কোনো দোষ-গুণের সম্বন্ধে বঙ্কিম-পাঠকেরা অনেকেই একমত হতে পারেন না। যথা, বঙ্কিমের শিল্প-কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের দিক সেরূপ একটি দিক। মুলত তা সর্বস্বীকৃত। সে প্রসঙ্গে 'ইন্দিরা'র আত্মকথার আঙ্গিক, রজনীর পারস্পরিক পরিপূরক কথার আঙ্গিক—এসব আঙ্গিকগত বিচারের কথাও স্বাভাবিকভাবেই ওঠে—তার সাফল্য-অসাফল্যের কথা। কিন্তু সে সব বিশেষ গুরুতর প্রশ্ন নয়। সে সব আঙ্গিক-কৌশলের আলোচনা বাহ্য। এমনকি, উপন্যাসে বঙ্কিমের অলৌকিকতা, বা জ্যোতিষবচন ও স্বপ্ন প্রভৃতির প্রয়োগও গৌণ ব্যাপার। শিল্পের দিক থেকে তা 'ফলস স্টেপ'– হাস্যকর অপপ্রয়োগ ; আর জীবন-দৃষ্টির দিক থেকে অবসকিউ-রেনটিস্ট ঐতিহ্যভার—এক-আধখানে তার শিল্পগত সাফল্যও আছে। যেমন, জ্যোতিষবচন কোথাও কোথাও গ্রীক নাটকের দৈববচনের মতো 'ট্রাজিক আয়রনি'-র কারণ হয়ে ওঠে। কপালকুণ্ডলার স্বপ্নদর্শন, শৈবলিনীর বিভীষিকাদর্শন

বিশেষ মানসিক অবস্থায় অস্বাভাবিক নয়, তা অনেকটা স্বীকার্য। কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন কিন্তু সে তুলনায় অপপ্রয়োগ। কিন্তু শৈবলিনীর আত্মদহন, তার গুরুত্ব, রমানন্দের যোগবলে বরং লঘু হয়ে যেতে পারত—কিন্তু তা হয় নি। শৈবলিনী স্বামীসেবার সংকল্প গ্রহণ করেও তাই জানাতে বাধ্য হয়—প্রতাপ এ পৃথিবীতে থাকতে তার আকর্ষণ থেকে শৈবলিনীর (রমানন্দের যোগক্রিয়া সত্ত্বেও) মুক্তি নেই। সন্ন্যাসীর ঝাড়ফুঁকে বা মেস্‌মারিজম্‌-এ 'রজনী'র শচীন্দ্রের নিজ্ঞান-চিত্তের অনুরাগের সম্ভাব্য বিবর্তন বঙ্কিম বিনষ্ট হতে দিয়েছেন। এসব শিল্পগত ত্রুটি তথাপি গৌণ হয়ে যায় কেন, তা আমরা দেখেছি—রোমান্টিক উপন্যাসে নাটকে অপ্রাকৃত তত অগ্রাহ্য নয়। এসব ঘটনার ত্রুটিপূর্ণ প্রয়োগই অগ্রাহ্য হয়—বঙ্কিমের গল্প বলার ক্ষমতায়, অদ্ভুত (রোমান্টিক) ঘটনাকে অদ্ভুততর (ক্লাসিক) শৃঙ্খলায় সমগ্রের দিকে পরিচালনার শক্তিতে, ইত্যাদি। চরিত্র-চিত্রণে দেখি—অদ্ভুত হলেও যুক্তিযুক্ত সংগতির সঙ্গে চরিত্র-উদ্‌ঘাটন, মনের ও কর্মের দলের পর দল উন্মোচন। বর্ণনার ও সংলাপের অপরূপ ইন্দ্রজালের বোধহয় উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন—বঙ্কিমের এই ভাষাকে না পেলে আধুনিক কালের বাঙালির মনও স্বপ্ন-সত্যে মুক্তি পেত না। তার এক-একটি উদ্ভাস অনুভূতিকে শিহরিত করে, এক-একটি ক্ষুদ্র উক্তি হীরক-দ্যুতির মতো একইকালে চিত্ত-চমৎকারিণী, ভাবে অতলস্পর্শী। এসব বিষয়ে পাঠকদের মধ্যে বিশেষ মতানৈক্য নেই।

অনুভূতির যে প্রমাণ দুর্নিরীক্ষ্য, তাও আমরা দেখেছি :—যথা, বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির আত্মীয়-সম্বন্ধের রোমান্টিক উপলব্ধি, নতুন নিসর্গ-চেতনা, নিয়তিবোধ, রূপ-রহস্যের চেতনা ও রূপাসক্তির আবর্তন-বিবর্তন, মানুষের অন্তরের অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য-অর্জনের শক্তি ; অবসকিউরেনটিস্ট ঐতিহ্যভার সত্ত্বেও মানবতায় এই আস্থা, ইত্যাদি। এ সকলের মধ্য দিয়ে, সম্পূর্ণতা-অসম্পূর্ণতা শুদ্ধ, বঙ্কিমের জীবন-জিজ্ঞাসা এক বিশেষ জীবনসত্য ও মানবসত্যের আভাস দান করে—পাঠকের অনুভূতি তার বিশিষ্ট প্রমাণ। 'এ জীবন লইয়া কি করিব ?'—এই জিজ্ঞাসার অনুভূতির মধ্যেই সৌন্দর্যের হিরণ্ময়পাত্র খুলে এই মর্মসত্যকে উন্মোচিত করে দেয়। সেই উপলব্ধি বঙ্কিমসৃষ্টির মূল তাৎপর্য,—সুসমাহিত সৌন্দর্য-অনুভূতিতেই এ সত্য অনুধাবন করা সম্ভব—অন্য কিছুতে নয়। তবে অন্য সকল তাৎপর্যের সমন্বয়ে সেই উপলব্ধি আরও সুনিশ্চিত হয়, তা সত্য।

বঙ্কিমের সমসাময়িক উপন্যাস

বাঙলা উপন্যাসের প্রথম যুগকে বঙ্কিমের যুগ বলা মোটেই মিথ্যা নয়। সমগ্র আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের দিক থেকে কালটাকে বঙ্কিম যুগ না বলে 'মধুসূদন-বঙ্কিমের যুগ' বলাই তবু সমীচীন। নিঃসন্দেহ সৃষ্টিপ্রতিভার বিপ্লবী সমৃদ্ধিতে মধুসূদনও যুগান্তকারী স্রষ্টা। মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যে সমস্ত বাঙলা কাব্যধারাকে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন, তিনি অলোক-সামান্য স্রষ্টা। কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভা 'সব্যসাচী'। মননে ও সৃজনে সমকুশল এবং বাঙলা সাহিত্যের সামগ্রিক গতি—তা সেই যুগে দোর্দণ্ডপ্রতাপে নিয়ন্ত্রিত করে—বাঙালি জীবন ও বাঙালি সংস্কৃতির পক্ষে তা সম্পূর্ণ কল্যাণকর হয়নি, তাও এখন স্বীকার্য। কথা-সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিম শুধু প্রথম নন, যুগের শেষেও রবীন্দ্রনাথের সেই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা-লাভের পূর্বে—'চোখের বালি'-র প্রকাশের (১৯০২) পূর্ব পর্যন্ত বঙ্কিমই বাঙলা উপন্যাসের যুগ-পুরুষ। কথাটা আরও বুঝতে পারি—যদি মনে রাখি প্রধানত তাঁরই সৃষ্টির ঐশ্বর্যে বাঙলা উপন্যাসে দীপ জ্বালাবার জন্য সেযুগেও ভিড় পড়ে গিয়েছিল। অথচ সেসব কোনো দীপই এখনো জ্বলছে আজ এমন কথা বলা দুঃসাহস। তখনকার মতো তা কিছু কিছু জ্বলেছিল, তা-ই যথেষ্ট। তাতেই 'বঙ্কিম একাই একযুগ', একথা তবু বলতে পারব না—বাঙলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ, কারণ সেই সময়টাকে বাঙালি জীবনের স্বর্ণযুগ বলা সুসাধ্য নয়। সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলতে হলে মধুসূদনকে সমভাবে গণনা করতে হবে—অবশ্য সত্য বলতে গেলে তিনিও অদ্বিতীয়, বঙ্কিমও তাই। কাব্যে মধুসূদনের অনুকরণ অসাধ্য ছিল। উপন্যাসে বঙ্কিমের অনুকরণ অসাধ্য না হোক, অসার্থক থেকে গেল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস কথক-সাহিত্যে বঙ্কিম ব্যতীত অন্য কোনো ঔপন্যাসিককে 'বড় লেখক' বলা কষ্টকর—'মহৎ স্রষ্টা' থাক, 'বৃহৎ স্রষ্টা'ও নয়।

স্কট ও বঙ্কিম দুয়ে মিলে ঐতিহাসিক উপন্যাসে বাঙালির নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। নবোদ্ভিন্ন স্বাজাত্যের পোষণ তারা খুঁজেছে অতীতের ভাণ্ডারে। মধ্যযুগের হিন্দুমুসলমান রাজাদের দ্বন্দ্ব প্রায়ই তাদের উৎস ছিল। লেখকরা চরিত্র অপেক্ষা ঘটনা নিয়েই ব্যস্ত হয়েছেন; প্রকাশপদ্ধতি ধরাবাঁধা। প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধীপ পরাজয়ে'র মতো বৃহৎ উপন্যাস ('দুর্গেশনন্দিনী'র প্রায় পূর্বে রচিত) এবং তার পরেকার আরও দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এসব লেখকদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রমেশচন্দ্র দত্ত ও মীর মশার্‌রফ্‌ হোসেন—সেই সঙ্গে গণনীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, স্বর্ণকুমারী দেবী, শিবনাথ শাস্ত্রী। বঙ্কিম-জগতের

ঐতিহাসিক রোমান্সের বাইরেকার দুজনার কীর্তিই বেশি স্মরণীয়—‘স্বর্ণলতা’র (১৮৭৪) লেখক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৪৫-১৮৯১) ও বাঙলার উদ্ভট কল্পনার অতুলনীয় শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৭-১৯১৯)। ত্রৈলোক্যনাথ অবশ্য ঠিক এযুগের নয়, বাঙলা উদ্ভট কল্পনার ও অদ্ভুত রসের সাহিত্যে তিনি একাই প্রায় একটি ঐতিহ্য, এবং অসামান্য তা স্বীকার্য।

বহুমুখী প্রতিভায় ও প্রচেষ্টায় রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮—১৯০৯) সম্ভবত অন্য দেশেরও স্বর্ণযুগের যোগ্য প্রতিনিধি হতে পারতেন। কিন্তু বাঙলা উপন্যাসে তাঁর কৃতিত্ব প্রথম শ্রেণীর নয়—তবে আমাদের সেই প্রথম পর্বের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য একজন। বঙ্কিমই তাঁকে বাঙলা সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করেন। অন্তরের স্বদেশপ্রীতিতে রমেশচন্দ্র স্বভাষার সেবায় প্রবৃত্ত হন। সেদিনের একজন সর্বসম্মানিত ‘ইংরাজিওয়ালা’ আই-সি. এস.-এর পক্ষে তা উল্লেখযোগ্য বৈকি। রমেশচন্দ্র তার কারণ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—“তখন (অর্থাৎ ১৮৬৫-১৮৭২) বাঙলা সাহিত্য বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে আদৃত হত না।” রমেশচন্দ্র নিজের কথা জানিয়েছেন। তিনি শেক্সপীয়ার ও স্কটের আকৈশোর ভক্ত ছিলেন, বিশেষ করে স্কটের ও গিবনের। তাই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনাতে রমেশচন্দ্রের স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল এবং বঙ্কিমের অপেক্ষা সে আকর্ষণ কল্পনায় কম অনুরঞ্জিত। তাঁর ঐতিহাসিকের দৃষ্টি যথেষ্ট বস্তুনিষ্ঠ। তবু ‘বঙ্গ-বিজেতা’ (১৮৭৪) ও ‘মাধবীকঙ্কণ’ (১৮৭৭) ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শে রচিত, ‘ঐতিহাসিক’ রচনা নয়। বঙ্কিমের ছায়াও তাতে যথেষ্ট। স্বকীয়তা বরং প্রতিষ্ঠিত দুখানা পারিবারিক উপন্যাসে—তবু তা রসোজ্জ্বল নয়। রমেশচন্দ্রের ‘মাধবীকঙ্কণ’ নরেন্দ্র-হেমলতার ব্যর্থ প্রেমের আখ্যান—চরিত্র রচনায়ও মোটামুটি সার্থক। দু-খানা উপন্যাসই সমাদৃত। মোঘল সাম্রাজ্যের শতবর্ষের ইতিহাসের (আকবর থেকে ঔরঙ্গজেব অবধি) দুই চিত্র ‘মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত’ (১৮৭৮) ও ‘রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা’ (১৮৭৯): এ গ্রন্থ দুখানা আরও অধিক পরিচিত। দুখানাই ঐতিহাসিক উপন্যাস, ইতিহাসের আকর্ষণ তাতে স্পষ্ট। রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক পরিবেশ রচনায়ও সচেষ্ট। সেদিনের পাঠকেরা ছিলেন হিন্দু। এই পাঠকদের কাছে ভারতের পরাধীনতার আরম্ভ হিন্দুর পরাধীনতায়; তাদের স্বাধীনতার ধারণাও অনেকাংশে হিন্দু-উদ্যোগে মুক্তি-অর্জন। রমেশচন্দ্রের হৃদয়ে ভারতের পরাধীনতার বেদনা এবং ভারতের ভাবী স্বাধীনতার স্বপ্ন, সেই প্রচলিত ধারণা দ্বারা অনুরঞ্জিত। এটা মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গির জের। বুর্জোয়া শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হলেও তখনকার শিক্ষিত ভদ্রলোক (হিন্দু) কলোনিয়াল

ইকনমির চাপে দেহমনে কতকাংশে খর্ব; আধুনিক শিক্ষা সত্ত্বেও অনেকক্ষেত্রে মধ্যযুগের বাসিন্দাই থেকে গিয়েছে। রমেশচন্দ্র নিজে ঐতিহাসিক ও আধুনিক দৃষ্টি-সম্পন্ন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। কিন্তু তিনিও এই খর্বতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন নন। রমেশচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতিও 'ভদ্রলোকীয় বিভ্রান্তি' থেকে মুক্ত নয়। এই 'হিন্দুস্বাদেশিকতা' সত্ত্বেও 'জীবনসন্ধ্যা' ও 'জীবনপ্রভাত' উপন্যাস দু-খানা মোটামুটি পাঠযোগ্য। কিন্তু তাতে বঙ্কিমের রোমাণ্টিক কল্পনার ও কাব্য-প্রতিভার চিহ্ন নেই। বরং ও দুই উপন্যাসের থেকে বেশি উল্লেখযোগ্য রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস দু-খানি—'সংসার' (১৮৭৫)—বিধবা বিবাহ সমর্থনের উদ্দেশ্যে রচিত—এবং 'সমাজ' (১৮৮৭)—হিন্দুসমাজে ধর্মান্তরে বিবাহ-প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে লিখিত। তখনকার পাঠকসাধারণ অবশ্য এই দুই উদ্দেশ্যকে সুনজরে দেখত না—রমেশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও এই উপন্যাস দু-খানায় স্বস্তিবোধ করতেন না। কিন্তু বাঙালি পল্লীগ্রামের সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারের ও জীবনযাত্রার চিত্ররচনায় রমেশচন্দ্রের বস্তুনিষ্ঠা নিশ্চয়ই কার্যকরী হয়েছে। 'স্বর্ণলতা' ব্যতীত বাঙলা উপন্যাসে এরূপ প্রয়াস তখনো কতকটা ব্যতিক্রম, অবশ্য বঙ্কিমের অভিজাত-প্রধান সমাজচিত্রের মধ্যে সেই সহজ গ্রাম্য জীবনের চিত্র অনুপস্থিত নয়, মন স্পর্শ করে। কিন্তু তা যেন 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর পাদটীকা।

'সংসার' ও সমাজ'-এর সামাজিক চিত্রও উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমের প্রভাবেও রমেশচন্দ্রের যুক্তিনিষ্ঠা ও বাস্তববোধ খর্বিত হয়নি। কিন্তু সে রচনায় সৃজনীশক্তির যাদুস্পর্শ কোথায়? সে বাস্তবদৃষ্টি সৃষ্টিশক্তির ততটা সহায়তা লাভ করে নি।

মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৮-১৯১১) সৃষ্টিশক্তি প্রায় ৩৫ খানি ছোটবড় সাহিত্যপ্রয়াসের মধ্যে বহুদিকে বিচ্ছুরিত, তা উপন্যাসে কেন্দ্রিত হতে পারে নি। একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—তখনকার মুসলমান সাহিত্যিকদের মন চারদিকের বাস্তবজীবনকে কৌতূহলের চোখে দেখতে অভ্যস্ত ছিল—এটি নিশ্চয়ই লক্ষণীয়। হয়তো হিন্দু সাহিত্যিকদেরও তা ছিল—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, টেকচাঁদ তার প্রমাণ। কিন্তু তাদের একটা ভাববস্তুর প্রবণতা ছিল। মুসলমান লেখক চলিত কথায় চলিত বাস্তবদৃষ্টির পরিচয় রাখতে চাইতেন। তাই নক্শা-প্রহসন-জাতীয় লেখার মধ্যেই তা নিবদ্ধ থেকেছে। আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা তখনো তাদের সমাজ-সুলভ নয়, আধুনিক দৃষ্টি আরও দুর্লভ। আধুনিক সাহিত্য চেতনা তাদের নিজ সমাজেও বিশেষ প্রবেশ লাভ করে নি—দোভাষী কেচ্ছা-সাহিত্য প্রবল। তাই, সেই নক্শা-জাতীয় লেখায় সৃষ্টির যথার্থ অগ্নিস্পর্শ নেই। সেই স্পর্শ মীর

মশাররফ হোসেনের লেখাতেই প্রথম স্পষ্ট। যা-ই তিনি লিখুন—নাটক-প্রহসন ('বসন্তকুমারী', 'জমীদার দর্পণ' প্রভৃতি) আত্মজীবনীমূলক রচনা ('উদাসীন পথিকের মনের কথা', 'আমার জীবনী', 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী', 'বিবি কুলসুম') কিংবা প্রবন্ধপুস্তিকা—তাতেই তাঁর শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষাদীক্ষা তাঁর ছিল না, তা নয়; অভিজ্ঞতা ছিল অপর্যাপ্ত; ছিল না দেখা যায় সুগঠিত রুচি—যা শিক্ষা ও সামাজিক পরিবেশে গড়ে ওঠে—এবং ছিল না শিল্প-সংযম—যা জন্মগত না হলে পরিশীলনে কিছুটা আয়ত্ত হয়। এ সবের অভাবে মীর মশাররফ হোসেনের স্বাভাবিক লিপিকুশলতা, শিল্পবুদ্ধি ও সাহিত্যিক মন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যকীর্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আত্মজীবনীমূলক তাঁর লেখাগুলি পড়ে সন্দেহ থাকে না যে মীর মশাররফ হোসেন চরিত্রচিত্রে সাফল্যলাভ করিতে পারতেন। সার্থক ঔপন্যাসিক হবার প্রধান গুণ তাঁর ছিল। কিন্তু তেমনি অবিসংবাদিত রূপে বোঝা যায় সৃষ্টিতে সংহত, সংযত হবার শক্তি তিনি আহরণ করতে বিমুখ। মীর মশাররফ হোসেনের প্রথম বই 'রত্নবতী' ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত—'দুর্গেশনন্দিনীর' মাত্র চার বৎসর পরে। 'কৌতুকাবহ উপন্যাস' বলে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কাজেই বোঝা যায় উপন্যাস লিখতে মীর সাহেব অবহিত, কিন্তু উপন্যাসের রীতিনীতিতে উদাসীন। রূপকথা-জাতীয় এই উপাখ্যানকে ১৮৬৫-এর পরে উপন্যাস বলা দুঃসাধ্য। ১৮৭৩-এর নাটক 'জমীদার দর্পণ'-এ দেখি মীর সাহেবের চরিত্র ও সংলাপ রচনার শক্তি উল্লেখযোগ্য। 'জমীদার দর্পণ' প্রগতিবাদী দৃষ্টিকোণের জন্য অবিসংবাদিতরূপে তখন ছিল 'বঙ্গদর্শন'-এর বঙ্কিমের নিকট অনভিপ্রেত। আর এখন আমাদের নিকট ঐ কারণেই অধিকতর আদরণীয়। মীর সাহেবের অন্য নাটকেও সংলাপ ও চরিত্রচিত্রের শক্তি দেখা যায়। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯১) কুষ্টিয়া অঞ্চলের নীলকরদের অত্যাচারের চিত্র উদ্‌ঘাটনের জন্য রচিত। কিন্তু বিশেষ করে তা আবার মীর সাহেবের জনক জননী ও পরিবারের কথা। তা উপন্যাস নয়, সম্পূর্ণ জীবনী-বিবরণও নয়। হিন্দু-মুসলমান সৌভ্রাত্র-প্রচার ও দেশপ্রীতি তাতে প্রবল। অনেক উল্লেখযোগ্য আত্মগত উক্তি আছে। লেখকের সে বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। সম্মান, যশ, সমাদর মীর মশাররফ হোসেনের সকল বাঙালির নিকট লভ্য হয়েছিল একখানা বিশাল গ্রন্থে—তা 'বিষাদ-সিন্ধু'। তিন পর্বে প্রকাশিত (১৮৮৫/১৮৮৭/১৮৯১) এ গ্রন্থকে কি ঐতিহাসিক-রোমাণ্টিক উপন্যাস বলে গ্রহণ করতে পারি? কারবালার শোকাবহ কাহিনী সকল যুগের

মানুষকেই ব্যথায় অভিভূত করে। বাঙলায় পদ্যে তা পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে, না হলে লজ্জার কথা হত। মীর সাহেব সে সবও পড়েছেন। কিন্তু এবিষয়ে বাঙলা ভাষায় 'বিষাদ সিন্ধু'-ই এখনো শ্রেষ্ঠ কাহিনী, কাব্যগত মর্যাদাও তার গদ্যে সুরক্ষিত।

'বিষাদ সিন্ধু' ইতিহাস নয়, যথার্থ উপন্যাস বলাও হয়তো দুরূহ। কিন্তু কাহিনীর উপস্থাপনায় মীর মশার্‌রফের দৃষ্টির অভিনবত্ব ও ভাবনার বৈশিষ্ট্যে তার চমৎকারিত্ব স্বীকার্য। জানিনা বঙ্কিমের পরোক্ষ প্রভাব মীর সাহেবের ভাবনায় ছিল কিনা, থাকা স্বাভাবিক। দুটি বঙ্কিমী ভাব 'বিষাদ সিন্ধু'তে সুস্পষ্ট—যেমন, একদিকে দেখি রূপজমোহে প্রবৃত্তি কবলিত মানুষ, কাহিনীটিও কল্পলোকের কথা নয়, মানবীয় বৃত্তির মানুষের কথা। দ্বিতীয় লক্ষণ নিয়তির অমোঘ বিধানে মানবভাগ্য সম্পূর্ণ পিঞ্জরাবদ্ধ। দুই লক্ষণই মীর-মানসের স্বভাব লক্ষণ হওয়া সুসম্ভব। 'বিষাদ সিন্ধু'র প্রথম থেকে শেষ অবধি নিয়তিনিবদ্ধ মানবজীবনের ও ভাগ্যনিপীড়িত পুরুষকারের শোচনীয় চিত্র। ইন্দ্রিয়তাড়িত এজিদ জীবন্ত চরিত্র, জানাবের রূপ ও জানাবের প্রত্যাখ্যান তাকে বিধ্বস্ত করে। এজিদ নৃশংস ধর্মহীন, কিন্তু লম্পট বা নীচ নয়। 'ভিলেন' হলেও মানুষ। মুনীর চৌধুরীর একথা অত্যন্ত সত্য।—"এ কর্ম আধুনিক শিল্পীর।·····ইতিহাসের প্রকৃত মরুপ্রান্তর নয়। এজিদের প্রেমদীর্ণ হৃদয়ই এখানে কারবালায় রূপান্তরিত হয়েছে। বিষাদের উত্তাল তরঙ্গসমূহের উৎস এজিদের হৃদয় সিন্ধু" ('মীর মানস'। পৃ ১৫০)। হাসানের দ্বিতীয় পত্নী সপত্নীবাদ-তাড়িতা জায়েদাও জীবন্ত মানবী। এই মানবসত্য-বোধ মশার্‌রফ-এর অভিজ্ঞতার সহজ স্বীকৃত দান। ইমাম পরিবারকেও তিনি সত্যের ঊর্দ্ধে স্থাপন করেন নি। সপত্নী-ঈর্ষাতেই জায়েদার আধ্যাত্মিক অপমৃত্যু। ঈর্ষা তো মানবীয় বৃত্তি। সেই সত্যবোধেই হাসানের হত্যাচিত্রেও জায়েদা পিশাচী নয়। তাই "কি ভাবিয়া জায়েদা বিষপুঁটলি না খুলিয়া হাসানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।" অবশ্য হাসানের মৃত্যুর পরেই 'বিষাদ সিন্ধুর'-ও সুর নেমে পড়ে—দীর্ঘায়িত ঘটনাসমূহকে তখন থেকে টেনে নিতে হয়েছে লেখকের। "মাইকেল-বঙ্কিমের জীবনোপলব্ধির উত্তরাধিকারী" মীর মশাররফ হোসেন, বিশেষ করে আত্মগত কথায় ও ভাবনায় কুশলী। 'বস্তানী' 'আত্মজীবনী' প্রভৃতিতে তা অনুভব করা যায়। কিন্তু যে বাস্তব-দৃষ্টিতে তিনি অভ্যস্ত তা উপন্যাস রচনায় তিনি বিনিয়োগ করলেন না। অথচ সামাজিকভাবে মুসলমান-চেতনা বাস্তববাদী ও জীবনমুখী। নরনারীর প্রেমে, এমনকি

ধর্মজীবনেও মুসলমান দৃষ্টি সাধারণত ভাবনাদের প্রশ্রয় দেয় না। তাই বাস্তববাদী জীবনচিত্র-প্রবণতা মুসলমান লেখকের পক্ষে স্বাভাবিক। যদি হিন্দু বাঙালি ও মুসলমান বাঙালির জীবনদৃষ্টির পার্থক্য কোথাও থাকে তবে তা এই ক্ষেত্রে—তাও গুণগত নয়, শুধু মাত্রার পার্থক্য। উপন্যাসসৃষ্টিতে বাস্তবচেতনার প্রয়োজন বেশি, তাই সেখানে মুসলমান বাঙালি ঔপন্যাসিকের পক্ষে (অবশ্যই অন্যান্য গুণ থাকলে) সাফল্যলাভ অপেক্ষাকৃত প্রত্যাশিত। মীর মশাররফ হোসেন তাই নিজের সম্ভাব্য কীর্তি থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখে গিয়েছেন,—মুসলমান বাঙালি লেখকদের মধ্যে সেই অভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে।

'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ বঙ্কিম বাঙালির সামাজিক, পারিবারিক জীবনকেই তাঁর উপন্যাসের পরিবেশ করেছেন—অবশ্য রোমাণ্টিক কল্পনায় তাকে মণ্ডিত না করে পারেন নি। তবে কল্পনার অত্যাচারে তা পরিণত হয় নি। তথাপি তাতে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার চিত্র কোথায়? বঙ্কিমের উদ্ভবের সময়ই কিন্তু তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদারবাড়ির জমকালো আড়ম্বর ছাড়িয়ে 'স্বর্ণলতা'য় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক গৃহস্থ বাঙালির সাধারণ সুপরিচিত জীবনকে উপন্যাসের বিষয়ীভূত করে তুলেছেন। 'স্বর্ণলতা'কে এভাবে দেখেই বাস্তবমুখী তারকনাথ বঙ্কিমের আতিশয্যবাদিতাকে মৃদু পরিহাস করেছেন। আর বঙ্কিম-বিরোধী তৎকালীন সমালোচকদল বঙ্কিমকে ইঙ্গিতে কেন, প্রায় স্পষ্ট ভাষাতেই উপেক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন। সত্যই 'স্বর্ণলতা' পারিবারিক উপন্যাস। তাতে গ্রামের জীবন সাংসারিক জীবন যথাযথ অঙ্কিত, সরলা ও প্রমদা দুই জায়ে দোকানের তুচ্ছ সওদা নিয়ে কলহ বাধে; যে একান্নবর্তী পরিবার ইংরেজি শিক্ষার যুগে ভাঙ্গা অনিবার্য, ভাঙছিলও, 'স্বর্ণলতা'য় তা ভাঙ্গে মেয়েদের এরূপ কলহ উপলক্ষ করে। খুবই স্বাভাবিক তা। তারপরে ঘটনার ক্রমিক ঘাত-প্রতিঘাতে পরিণত হয় ভয়াবহ ট্র্যাজিডিতে, সরলার মৃত্যুতে। এ পর্যন্ত সুগ্রথিত একটি আখ্যান, কিন্তু তখনো 'স্বর্ণলতা'র দেখা নেই; সরলার পুত্র গোপাল তখনও বালক। এরপরে প্রায় নূতন আখ্যান—গোপালকে ধরে উপন্যাস তাতে এগিয়ে চলে। স্বর্ণলতার সঙ্গে গোপালের পরিচয় থেকে শেষ অবধি দুজনার প্রত্যাশিত পরিণয়ের পূর্বে চমকপ্রদ ঘটনার অভাব নেই—স্বর্ণলতা-অপহরণ, গোপালের নানা বিপদ দুর্ভোগ ইত্যাদি উপন্যাসে আকর্ষণ জাগিয়ে রাখবার উপকরণ যথেষ্ট আছে। বিন্যাস-পদ্ধতিতে এ-সব ঘটনা রোমাণ্টিক নয়, তবে সাধারণত সচরাচর ঘটে এমন ঘটনাও নয়। সুস্থ সহজ

বাস্তবচিত্রে এসব অবাঞ্ছিত ও অস্বাভাবিক—এবং বিন্যাসে নিষ্প্রাণ। বাঙালি জীবনের পরিচিত কথা হলেও 'স্বর্ণলতার'র প্লটের দুইভাগের কথাবস্তুতে ও দৃষ্টিতে তাই মিল নেই। শুধু ধর্মের জয় ও পাপের শাস্তি দেখাবার উদ্দেশ্যেই তা পরিকল্পিত ও পরিচালিত; আর সেই উদ্দেশ্য দ্বারাই দুভাগে একত্র-গ্রথিত। অথচ 'স্বর্ণলতা'য় চরিত্র ছিল—প্রথম ভাগে চিত্র স্বাভাবিকভাবেই বয়ে চলেছে। তা ছাড়া, 'নীলকমল', 'গদাধরচন্দ্র' প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে লেখক যথার্থ সরল হাস্যরসে ও স্বচ্ছন্দতায় সার্থক। তথাপি 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের নিজস্ব ক্ষেত্রের দিকে বাঙলা ভাষায় প্রথম স্বাভাবিক প্রয়াস, যা বঙ্কিমের সাধ্য হয় নি। এবং বঙ্কিমের বিশিষ্ট জীবনদর্শনে বিত্তবান শ্রেণীর বাইরেকার বাঙালি জীবন বৈশিষ্ট্যহীন বলেই বিবেচিত ও বর্জিত। 'স্বর্ণলতা' সেই সহজ প্রাত্যহিক জীবনকে স্বীকার্য করে তুলেছিল—কিন্তু প্রধান করে তুলতে পারে নি। কারণ লেখকের গুণ ও দৃষ্টি ছিল পরিমিত, প্রতিভা ছিল না—বিশেষত, বঙ্কিমের তুলনায়। 'স্বর্ণলতা' র সার্থকতাও তাই পরিমিত।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলজানি'-ও বাস্তবমুখী চেষ্টার নিদর্শন। উপন্যাসে বহুদূর পর্যন্ত বেশ অগ্রসর হয়েছিল পুরন্দর-ফুলজানির কাহিনী, দুই পরিবারের কর্তৃপক্ষের সম্পত্তি-ঘটিত মনোমালিন্য, এবং দুর্যোগের শেষে দু-জনার মিলন পর্যন্ত বেশ তা স্বাভাবিক। কিন্তু সরল জীবনধারা হঠাৎ উল্টিয়ে লেখক যেন জোর করেই চাইলেন ঐতিহাসিক উপন্যাসের চমক—ফুলকুমারীর অপহরণ, যার নামগন্ধও ছিল না তেমনি সব নবাবী আমলের ঝটিকা ও কুজ্‌ঝটিকা—শেষে পুরন্দরের প্রাণদণ্ড, ফুলমণির বিষপান। রবীন্দ্রনাথের বিচার সম্পূর্ণ যথার্থ; "১২২ পৃষ্ঠায় যে একটি সুন্দর সমগ্র সরলকাব্য [শ্রীশচন্দ্র] গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসবশত শেষের ৪৬ পৃষ্ঠায় অতি সংক্ষেপে একটি আকস্মিক বজ্রনির্মাণ করিয়া তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন।" ফুলজানি তাই ঠিক পথে আরম্ভ হয়ে পথভ্রষ্ট। এ শুধু প্লটের ব্যর্থতা নয়—তারও গোড়ার কথা, সাহিত্যবোধের ব্যর্থতা।

শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজবৌ', 'যুগান্তর' প্রভৃতিও পথভ্রষ্ট এরূপ কারণে—শিবনাথ শাস্ত্রীর সমাজসংস্কারের অতিরিক্ত আগ্রহের জন্য। না হলে তিনি চমৎকার জীবনচিত্র রচনা করতে জানেন। সমাজ-সংস্কার বাঙালি ঔপন্যাসিকের অনেককে ডুবিয়ে দিয়েছে। তবে সেই সংস্কারকরা মাত্র দু-চারজন শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো প্রগতিবাদী সংস্কারক এবং অধিকাংশের সংস্কার-প্রয়াস প্রশংসনীয় ছিল, কিন্তু সাহিত্যিক শক্তি ছিল না। শিবনাথ শাস্ত্রীর সেই সাহিত্যবোধ

ছিল বলেই তাঁর সাহিত্যিক অমনোযোগ রবীন্দ্রনাথকেও ব্যথিত করেছিল। 'মেজবৌ', 'যুগান্তর' এখনো উল্লেখযোগ্য—যদিও তা আর পড়া হয় না।

সংস্কার-বিরোধী রক্ষণশীল ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস রচনার শক্তি ছিল। যোগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ক্ষমতা ছিল। কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের উপর যথেচ্ছ বিদ্রূপ করে তখনকার মতো 'মডেল ভগিনী' কিছু হিন্দুর নির্বোধ রুচিকে তৃপ্ত করেছিল। এখন তা স্মরণীয় তৎকালীন সমাজে একটি রোগলক্ষণ হিসাবে। সেই রোগটা কিন্তু মূল রোগ। কলোনিয়াল সমাজে বুর্জোয়া (ইংরাজী) শিক্ষায় মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের মধ্যে আলোড়ন জেগেছিল। বুর্জোয়া সভ্যতার সৃষ্টিসম্পদের জন্য মানসিক (subjective) আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছিল। বাস্তবকর্মে, বৈষয়িক উদ্যোগে সামাজিক বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে এই বুর্জোয়া ব্যবস্থা ও তার ধ্যানধারণাকে সাহসী ও দৃঢ়চিত্তে স্বাগত করা চাকুরিজীবী ও ভূমিস্বত্বভোগী এই মধ্যবিত্তের পক্ষে ছিল অসম্ভব। মানসিক আগ্রহও বাস্তবভিত্তি তৈরি করবার মতো প্রবল বা দৃঢ় হতে পারে নি। আত্মমুখিনতা ও স্বপ্নবিলাসই ছিল এই খণ্ডিত-চিত্তদের আত্মপ্রকাশের পথ—ঐতিহাসিক উপন্যাস, রোমান্টিক কল্পনা, অর্ধ-মধ্যযুগীয় ধার্মিকতার আশ্রয়ে হিন্দু স্বাজাত্য ও হিন্দু পুনরুজ্জীবনের মোহ, সেই অচল পথেই জাতীয় ঐক্যের প্রকৃত সাধনা থেকে পলায়ন—এইসব সেই মধ্যবিত্তের আত্মপ্রবঞ্চনার ও পঙ্গুতারই প্রমাণ। বাস্তবের স্বচ্ছন্দ পথ জীবনযাত্রায় ও সাহিত্য-প্রয়াসে গ্রহণ করা তাদের অসাধ্য। তাই উপন্যাসের রাজ্যেও তাঁদের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বঙ্কিম বাস্তবপন্থী নয়। আর অন্যেরাও বঙ্কিমের ছায়ায় কতকটা আচ্ছন্ন, আবার কতকটা বাস্তব আগ্রহে অগ্রসর হয়েও পথভ্রষ্ট, অক্ষম রোমান্টিকতার আশ্রয়ে পলাতক।

উপন্যাস বাঙালি শিক্ষিতের মনের দুয়ারে এসেছে। বঙ্কিমপ্রতিভা—কবিকল্পনা ও জীবন রহস্যের নিগূঢ় বোধ তাকে সমৃদ্ধি দিয়েছে, কিন্তু বঙ্কিম পথে পরিচালিত করেছে। জীবনের বাস্তবক্ষেত্রের দিকে বঙ্কিম বাঙলা উপন্যাসের পথ সুগম করে যান নি।

বাঙালির এই আত্মপ্রবঞ্চনা, বিড়ম্বিত জীবনযাত্রার প্রবঞ্চনা ও শূন্যতা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৭-১৯১৯) দৃষ্টিকে ও চিত্তকে বিদ্ধ করেছিল। তার পরিচয় তাঁর উদ্ভট রচনায়ও আছে। কালের দিক থেকে তিনি এ পর্বের আলোচনার প্রান্তবর্তী। তাঁর লেখক-জীবন ১৮৯২ থেকে ১৯১৯-এর মধ্যে। 'কঙ্কাবতী' ১৮৯২, 'ডমরু চরিত' ১৯২৩ সালের দিকে লেখা। তাই তাঁর লেখা বঙ্কিম-যুগের নয়, ভাবের দিক থেকেও নয়। এই কথা মনে রেখে—এই পটভূমিতে

ত্রৈলোক্যনাথের স্থান আমরা অনুধাবন করতে পারি—প্রতিভার দিক থেকে তিনি বাঙলা সাহিত্যে অনন্য এবং সর্বযুগের। এবং সমকালের দিকে বাঙালি মধ্যবিত্ত কর্মে বা চিন্তায় আধুনিক ধর্মকে ফাঁকি দিতে চাইলেও নিজেকে সম্পূর্ণ প্রতারিত করে উঠতে পারতনা—তাই তাঁর বাক্যে দেখি আত্মধিক্কার। আর কথাসাহিত্যে সেই প্রবঞ্চনাকেই কঠোর বেদনা-বিদ্রূপের মধ্য দিয়েই ত্রৈলোক্যনাথ উদ্ভট রসে ব্যক্ত করেছেন।

তাঁর মৃত্যুর ধারাবিবরণী

কার্তিক লাহিড়ী

তিনদিনে তিনি চারবার হৃৎশূলে আক্রান্ত হলেন।

প্রথমবার তাঁর একান্ত চিকিৎসক তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে দেখে সঠিক রোগ নির্ণয় করতে না পেরে ঘুমের ওষুধ বরাদ্দ করার মুখে একাধিক চিকিৎসক দেখানো সমুচিত হবে মনে হলে সেই রকম ব্যবস্থা হয়; অতঃপর পাঁচজন চিকিৎসকের দল তাঁকে পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখে নিভৃতে একেবারে নিরালা কক্ষে প্রায় শোনা যায় না এমন নিম্ন স্বরে শলাপরামর্শ করে সাব্যস্ত করেন যে তিনি হৃৎশূলে আক্রান্ত, তবু কিছু দ্বিধা থাকে বলে আবার দেখার জন্য তাঁরা প্রায় চারঘণ্টার ব্যবধানে আবার তাঁকে পরীক্ষা করে এবার নিশ্চিত হন যে তিনি হৃৎশূলে আক্রান্ত, অথচ এই সংবাদ তৎক্ষণাৎ প্রচারিত না হয় সেজন্য তাঁর অতি আত্মীয় পরিজন ঘনিষ্ঠ সচিব একান্ত সচিব সহ চিকিৎসক দল অত্যন্ত সচেতন ও সাবধান হলেন

ফলে রাজ্যবাসী প্রথমে জানতেই পারলেন না যে তিনি অসুস্থ হয়েছেন, অথচ শকুন যেমন মরার গন্ধ টের পায় যোজন যোজন দূর থেকে তৎক্ষণাৎ তেমন তড়িৎগতিতে না হলেও প্রায় তেমন ক্ষিপ্রতায় যেন বাতাসের বদলে ইথার-ই বহন করে চলল সেই সংবাদ

আর তা টের পেয়েই লোকের ভিড় জিজ্ঞাসা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রভৃতি কমানোর জন্য তাঁর একান্ত-নিভৃত পরিষদ সিদ্ধান্ত নেয় যে প্রতিদিন দু-বার তাঁর স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় বুলেটিন প্রচার করা হবে প্রধানত বেতার, সংবাদপত্র ও অন্যান্য প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে, প্রথমে সকাল ন-টায় দ্বিতীয়টি রাত ন-টায়,

প্রথম বুলেটিন বলল: তাঁর হৃদযন্ত্র স্বাভাবিক কাজ করছে নিঃশ্বাসও স্বাভাবিক কেবল রক্তের চাপ ঈষৎ বৃদ্ধি পেয়েছে তিনি এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন

রাতের বুলেটিনে সেই একই কথা কেবল শেষে যোগ করা হয় তাঁর অবস্থার উন্নতি হচ্ছে তিনি নির্বিঘ্নে বিশ্রাম করছেন

তৃতীয় দিনের প্রথম বুলেটিনে প্রায় এক কথাই বলা হল: তাঁর হৃদযন্ত্র স্বাভাবিক কাজ করছে নিঃশ্বাসও স্বাভাবিক শরীরে উত্তাপ নেই তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছেন এবং ঘুমিয়েছেন তাঁর অবস্থার সার্বিক উন্নতি হয়েছে তিনি সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত

তা সত্ত্বেও আদেশ জারি হল যে তাঁর দ্রুত ও সম্পূর্ণ আরোগ্য কামনায় মন্দির মসজিদ বা গির্জায় পূজা দেওয়া নামাজ পড়া বা প্রার্থনা করা হয় কারণ তিনি সকলের প্রিয়

(যেহেতু তাঁরই আদেশে পাঁচজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে

শহীদদের বয়েস ২৭, ২১, ২৪, ৩৩ এবং ২২)

চিকিৎসাগ্রন্থে হৃৎশূল সম্পর্কে এই সব বলা আছে—

হৃৎশূল নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক রোগ। হৃৎপিণ্ডে অকস্মাৎ ভীষণ যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, তাহা বাম স্কন্ধ হইয়া বাম বাহু এমন কি নখাগ্র পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ইহার আক্রমণ যেমন আকস্মিক হয় তেমনি ইহা ক্ষণস্থায়ীও হয়। সাধারণভাবে কয়েক মিনিট ইহার স্থায়িত্ব তবে বেশি হইলেও অর্ধঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে। ইহা সাধারণত রাত্রিকালে হয়, দিনের বেলায় কদাচিৎ হয়। ইহাতে ঘন ঘন নিঃশ্বাস, শীতল ঘর্ম, ভয়, মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়।

উপরিউক্ত উপসর্গগুলির সব ক-টি না একটি দু-টি তাঁর ক্ষেত্রে দেখা গেছে বুলেটিনে সে সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নি, হৃৎশূল হওয়ার কারণ সম্পর্কেও বুলেটিন আশ্চর্যভাবে নীরব, যদিও তাঁর দীর্ঘ বিরাশী বছরের জীবনে হৃৎশূল তো নয়ই হৃদ্‌যন্ত্রের আশে পাশে অবস্থিত শরীরের নানা অংশেও কোনও জীবাণু আক্রমণ করে নি কোনোদিন, বহাল তবিয়ৎ বললে যা বোঝায় তা সেদিন মানে হৃৎশূল আক্রমণ করার আগে পর্যন্ত তাঁর ছিল, ফলে হঠাৎ এই আক্রমণের সংবাদ শুনে সকলে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারে নি, এমনকি এখন পর্যন্ত তারা নিশ্চিত নয় যদিও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দল হৃৎশূলের কথাই ঘোষণা করেন।

তাঁর কর্মক্ষমতা অনমনীয়তা দৃঢ়তা সব মিলিয়ে তাঁকে এমন এক অ-মানব করে তোলে যে লোকে কারণ জানা না পর্যন্ত কিছুতেই বিশ্বাস করে না বা করতে পারে না, যেন হৃৎশূল আমাদের হতে পারে কিন্তু তাঁর কেন হবে বা তিনি তো এই এই এই……অতএব তিনি ঐ রোগে আক্রান্ত হতে পারেন না

অথচ কোনও কারণ না পাওয়া পর্যন্ত মানুষের প্রশ্নের অবধি থাকে না, দেখা হলে এ ওর মুখে চায় সেই প্রত্যাশা নিয়ে অর্থাৎ কিছু জানতে পারলেন কি, বাক্‌স্ফুট হয় না শুধু চোখের ইশারা ইঙ্গিতে সেই জিজ্ঞাসা সারতে হয়, কারণ দেওয়ালের কান আছে, তাঁর সম্বন্ধে কোনো কথাই চলতে পারে না

কারণ তিনি সকলের প্রিয়

(যেহেতু তাঁরই আদেশে পাঁচজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে

শহীদদের বয়েস ২৭, ২১, ২৪, ৩৩ এবং ২২)

উপরন্তু তিনি দয়ালু
(যেহেতু তিনি ছ-জনের মৃত্যুদণ্ড মকুফ করেন, যার
মধ্যে দু-জন হচ্ছেন নারী)
চিকিৎসাগ্রন্থে আছে—

অতিরিক্ত চিন্তা অত্যধিক পরিশ্রম অতিমাত্রায় ধূমপান অজীর্ণ কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে।

তাঁর অজীর্ণ কোষ্ঠবদ্ধতা আছে কিনা বুলেটিনে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি, বলার বোধ হয় প্রশ্নও ওঠে না, যেহেতু বুলেটিন শুধু তাঁর বর্তমান স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয়

আবার তিনি অতিমাত্রায় ধূমপান করেন কিনা বা অত্যধিক পরিশ্রম তা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ছাড়া বা অন্য প্রমাণের অভাবে বলা মুস্কিল, এমনকি তিনি অতিরিক্ত চিন্তা করতেন কিনা তা তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিজন বা সচিবরা না জানালে বলা যায় না, একমাত্র তাঁরাই হলফ করে বলতে পারেন এ সম্বন্ধে, কারণ তিনি এঁদের দ্বারাই পরিবৃত থাকেন সব সময়।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র যেমন মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছা ব্যতিরেকে কাঁটায় কাঁটায় কাজ করে যায়, তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিজন ও সচিবরা তেমন ভাবে নিশ্চুপে আপন আপন কাজ করে চলেন, এইগুলি যে তাঁরই কাজ তাঁরই নির্দেশিত তা তাঁদের হাবভাব আচার-আচরণের ফুটে ওঠে কোনও সচেষ্ট প্রয়াস ছাড়াই

ঈশ্বর সকলের আড়ালে থেকে যেমন সকলের সব কিছু দেখতে শুনতে পান, তিনিও তেমন নিজের প্রাসাদের কোন কক্ষ থেকেই সব টের পান, আর এমন কিংবদন্তী বাতাসে বাতাসে ভেসে বেড়ায় বলেই মানুষের মধ্যে যেমন একটা ভয় মেশানো সম্ভ্রম জেগে থাকে সর্বদা, ফলে মানুষজন নত দৃষ্টি হয়ে কাজ করে চলে, যেহেতু দেওয়ালেরও চোখ আছে

তাই তাঁকে ঈশ্বরের মত চাক্ষুষ করা যায় না, কেবল ছবি দেখেই আশ মেটাতে হয়, ভক্তরা যেমন ভগবানের মূর্তি বা তসবীরে আবিষ্ট হন

কারণ তিনি সকলের প্রিয়
(যেহেতু তাঁরই আদেশে পাঁচজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে
শহীদদের বয়েস ২৭,২১, ২৪, ৩৩ এবং ২২)
উপরন্তু তিনি দয়ালু
(যেহেতু তিনি ছ-জনের মৃত্যুদণ্ড মকুফ করেন, যার
মধ্যে দু-জন হচ্ছেন নারী)

দীর্ঘ বিরাশী বছরে সর্বপ্রথম ঠিক বিরাশী বছর পূর্ণ হয়ে গেলে হৃৎশূল

আক্রমণ করে কিনা তা-ও সকলের জল্পনা-কল্পনার বিষয় হয়, যদিও এ জল্পনা-কল্পনা বাক্যে স্ফুট হয় না, অথচ অগোচরে প্রত্যেকের চোখে মুখে সেই জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠে তবে কি তিনি সত্যই অসুস্থ নন, নাকি এ তাঁর আর এক অনবদ্য কৌশল যে কৌশলে তিনি নিজেকে আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন মানুষের কাছ থেকে

তিন দিন পরে আবার বুলেটিন বের হলো—

তাঁর হৃদযন্ত্র অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে নাড়ির স্পন্দন স্বাভাবিক শরীরে উত্তাপ নেই রক্তচাপ কমে এখন স্বাভাবিক পর্যায়ে তাঁর খাওয়ার রুচি জন্মেছে তিনি যথেষ্ট বিশ্রাম নিতে পারছেন

তা সত্ত্বেও লোকের সন্দেহ ঘোচে না, মনে হয় তাঁর গভীর অসুস্থতাকে চাপা দেওয়ার জন্য এমন স্বাস্থ্যবুলেটিন বের করা হচ্ছে

তিনি দীর্ঘজীবী হোন একথা সকলের মনে ওঠার আগেই আবার ঘোষণা করা হলো যে রাজ-জ্যোতিষীরা নিদারুণ শাস্ত্র-আলোচনা তাঁর কোষ্ঠি ও অবয়ব বিচার করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে তিনি আরও অন্তত এক যুগ বাঁচবেন

এ সংবাদে মানুষের দীর্ঘশ্বাস-ও অত্যন্ত চেপে চেপে স্বাভাবিক করতে করতে মুখের পেশী ইত্যাদি আচমকা যেন আনন্দের সংবাদে খুশি খুশি করে তুলতে হয়, তখন এ ওর মুখের দিকে সেই বিহ্বল করা হাসি দেখে. বোঝে কোথায় কিছু বিগড়ে যাচ্ছে কেবলি কেবলি

কিন্তু তাঁর হঠাৎ এই আক্রমণ হলো কেন সে বিষয়ে নানা প্রশ্ন লোকের মনে মনে তবু উত্তাল হয়ে ওঠে সংগোপনে

তবে কি তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, নাকি শরীরই অচল হয়ে উঠেছে

প্রশ্ন যাতে সোচ্চার না হয়ে ওঠে এজন্য যথেষ্ট সাবধান থাকতে হয়, কারণ এ ভাবে ভাবাও তো অনুচিত যেহেতু তিনি-ই তাঁদের চিন্তা মুক্ত করেছেন সকলের চিন্তা স্বয়ং তুলে নিয়ে অর্থাৎ তিনি যা ভাবেন লোকে তাই ভাবে

এতে সুবিধা অনেক,

কারণ তিনি সকলের প্রিয়

(যেহেতু তাঁরই আদেশে পাঁচজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে
শহীদদের বয়েস ২৭, ২১, ২৪, ৩৩ এবং ২২)

উপরন্তু তিনি দয়ালু

(যেহেতু তিনি ছ-জনের মৃত্যুদণ্ড মকুফ করেন, যার
মধ্যে দু-জন হচ্ছেন নারী)

দীর্ঘ বিরাশী বছর জীবনে একটানা প্রায় চল্লিশ বছরের মত দাপটে রাজ্য শাসন করে অবশ্য এই প্রথম অথচ ঘন ঘন হৃৎশূলে আক্রান্ত হলেন যখন পাঁচজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, শাসনের প্রথমদিকে যখন তিনি অল্প বয়স্ক শৌর্যেবীর্যে বলীয়ান তখন মাত্র অঙ্গুলি হেলনে শত শত মাথা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তাঁর ভ্রূ তাতে এতটুকু কাঁপে নি, তিনি জবরদস্ত হাতে প্রজাতন্ত্রীদের দমন করেছেন, উল্লাসে অট্টহাসে হা—হা করে উঠেছেন যদিও তখন রাজ্যের একোণ সেকোণ থেকে আর্ত ভয়ার্ত চীৎকার কান্না আকাশ বাতাস ফাটিয়েছে, সে সময় তাঁর স্বর্ণময় কাল, পরন্তু ঐ কাল অনেকদিন অটুট থাকে তাঁর আনমনীয় দৃঢ়তা তেজ অসমসাহসিকতার বলে, তিনি তখন ধরাকে সরা জ্ঞান করতেন, পৃথিবী তাঁর হুকুমে চলতো, আর পারিষদবর্গ রাজা ক্যানিউটের পারিষদ তুল্য ছিল, এবং আজও তারা তাই আছে

আগে শত শত মাথা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও নিকেশের কাজটি এতই সংগোপনে ঘটতো যে কাক চিলেরও টের পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল, কারণ অমুক নেই তমুককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে এই অনুসন্ধানে তাঁদের আত্মীয় বন্ধু তৎপর হওয়ার আগে প্রচারিত হতো অমুককে ওখানে বদলি করা হয়েছে তমুকের কর্মক্ষমতায় সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তাঁকে তাঁর রক্ষীবাহিনীতে নিযুক্ত করেছেন এবং আরও কত কি

তাছাড়া সংবাদ প্রচারের মাধ্যমগুলির টুঁ করার ক্ষমতা ছিল না, কারণ তারা জানে যে তিনি সকলের মঙ্গল চিন্তা করেন, আর যা হয় তা মঙ্গলের জন্যই হয় যেন ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য তেমন মনোভাব

বুলেটিন বলা হল—

তাঁর হৃদ্‌স্পন্দন হঠাৎ দ্রুত হয়েছে তাঁর নিঃশ্বাস ভারি তবে রক্তচাপ প্রায় একই আছে রাত্রে দু-একবার ঘুমের ব্যাঘাত হয়

প্রতিদিন মন্দির মসজিদ গির্জায় তাঁর দ্রুত আরোগ্যকামনা প্রার্থনা সভা নিরন্তর অনুষ্ঠিত হলেও (নিরন্তর কেন না একদল ওঠার সঙ্গে আর একদলের প্রার্থনা শুরু, অর্থাৎ প্রথম দলের পর দ্বিতীয় দল তারপর তৃতীয় দল তারপর প্রথম দল পরে তৃতীয় দল তারপরে দ্বিতীয় দল অর্থাৎ নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকই অষ্টপ্রহর কীর্তনের মতো চালিয়ে যাচ্ছে) ঈশ্বর তাঁর একমাত্র সুপুত্রের দিকে মুখ তুলে চাইছেন না কেন এ প্রশ্নও স্বভাবত ওঠে,

এরপর থেকে চব্বিশ ঘণ্টায় একবার মাত্র বুলেটিন প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হয়, কারণ দু-বার বুলেটিন প্রকাশ করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ দেখলেন মানুষজন

দিন রাতে ঐ বুলেটিন শোনা বা দেখার জন্য অন্তত পক্ষে আধঘণ্টার উপর সময় মিছিমিছি খরচ করে, আর এভাবে বুলেটিন প্রকাশ করলে জনসাধারণের ভিতর আলোচনার ঢেউ উঠতে পারে হয়ত তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও কারণ দু-দুবার এক জায়গায় কিছু লোক জমায়েত হয় বাধ্য হয়ে যেহেতু জনসাধারণ মনে করে বুলেটিন শোনা বা দেখা তাদের অবশ্য কর্তব্যের অন্তর্গত ; তিনি অসুস্থ যিনি তাদের লালন-পালন ভরণপোষণ করেন তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা না জানা গুরুতর অপরাধ নিঃসন্দেহে কারণ তিনি সকলের প্রিয়

(যেহেতু তাঁরই আদেশে পাঁচজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে
শহীদদের বয়েস ২৭, ২১, ২৪, ৩৩ এবং ২২)
উপরন্ত তিনি দয়ালু
(যেহেতু তিনি ছ-জনের দণ্ড মকুফ করেন, যার
মধ্যে দু-জন হচ্ছেন নারী)

চোদ্দজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের স্বাক্ষরিত বুলেটিন বলল,

দু-দিন বিরতির পর আজ তিনি মাত্র একবার হৃৎশূলে আক্রান্ত হন তবে তাতে জীবনের আশঙ্কা নেই কারণ রক্তচাপ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নাড়ির স্পন্দনও সঠিক তবু এখনও তিনি বিপন্মুক্ত নন কাল রাত্রে অবশ্য তাঁর ঘুম দু-তিন বার ভাঙে

এই বুলেটিন পড়ে বা দেখে মানুষজন চিকিৎসকদের কাণ্ডজ্ঞানের উপর বীতশ্রদ্ধ হতে শুরু করে, সামান্য হৃৎশূলই যদি বিশেষজ্ঞরা নিরাময় করতে না পারেন তবে তাঁদের সঙ্গে আনাড়ীদের তফাৎ কোথায় থাকে

সাধারণ চিকিৎসাগ্রন্থে আছে—

বায়ু নিঃসরণ, বমন বা অধিক পরিমাণে মূত্রত্যাগ হইলে যন্ত্রণার উপশম হয় এবং তাহার ফলে রোগ নিরাময় সহজতর হয়

তবে কি বিশেষজ্ঞরা ঐগুলি শরীর থেকে বের করার চেষ্টা করছেন না, নাকি এই পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁরা ওয়াকিবহাল নন, অথচ বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধে—কে-র মতো এরা কে আগ বাড়িয়ে বিশেষজ্ঞদের একথা জানাবে তা কিছুতেই স্থির করতে পারে না। অবশ্য খেয়াল থাকে এরা কেউ নিজেদের মধ্যে শলা পরামর্শ করে না তবে সকলের মনে সেই একই তরঙ্গ খেলে যায়, কিন্তু বিশেষজ্ঞদের বলা মানে তাঁদের রুষ্ট করা তার মানে স্বয়ং তাঁকেই অসন্তুষ্ট করা কারণ এঁরা তাঁরই নির্বাচিত ব্যক্তি, ফলে তাঁর অনুমোদিত বিশেষজ্ঞ সম্পর্কে কিছু বলা মানে তাঁর কর্তৃত্বকেই অমান্য করা অতএব—

আজকে যাদের বয়েস চল্লিশ কিংবা তার নীচে তারা তো বটেই এমনকি

যাদের বয়েস এখন পঞ্চাশ বাহান্নর মধ্যে তারাও জন্ম থেকে এঁকেই অধিপতি বলে জেনে এসেছে, এদের কাছে ইনি অনাদি আদ্যন্ত রূপে বিবেচিত কারণ তারা এর আগের অধিপতিকে একমাত্র জানতে পারে তাদের বাপ-ঠাকুর্দার কাছে শোনা কথায় বা ইতিহাসের পাতায়, ফলে মনের কোথাও অগোচরে সেই প্রত্যয় গেঁথে আছে এদের আয়ুসীমার মধ্যে অন্য কোনও অধিপতিকে তারা দেখে যেতে পারবে না, প্রথমত্ তাঁর স্বাস্থ্য অটুট আছে, ন-মাসে আঠারো-মাসে দেখলেও তাঁকে আগের মতোই মনে হত এই সেদিন পর্যন্ত, এখন অবশ্য তাঁর চেহারা কেমন হয়েছে বলা মুস্কিল তবে এদের ধারণা তাঁর চেহারা বা স্বাস্থ্যের খুব বেশি হের-ফের হবে না, যেন তিনি শালগাছ, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আরও পাকা দৃঢ় ও মজবুত হবেন ও হচ্ছেন ; দ্বিতীয়ত তাঁর কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, তৃতীয়ত তিনি অতি সহজেই সাংসারিক অশান্তি দুর করে ফেলেছেন এবং এটা একটা বিরাট লাভ কারণ মানসিক বাহ্যিক বা সাংসারিক যে কোনো অশান্তি আয়ু কমিয়ে দেবার পক্ষে বয়েস নিমেষে বাড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট, চতুর্থত পঞ্চমত ইত্যাদি……

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য কখনো অস্ত যায় না এ ধারণা যেমন বহুকাল প্রচলিত ছিল তেমনি তিনিও অনন্তকাল শাসন করবেন, এমন ধারণা লোকের মনে যে নেই তা হলফ করে বলা মুস্কিল, তিনি কোনও গভীর বিপদে পড়েছেন কিনা সে-সম্পর্কে কারুর বিশেষ ধারণা নেই, এবং তিনি বিপদে পড়তে পারেন এ-ধারণাও কেউ পোষণ করে কিনা বলা শক্ত।

এহেন তাঁর ঘন ঘন হৃৎশূলে বিধ্বস্ত হওয়ার কারণ জানার জন্য মানুষের আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক, অবশ্য এই আগ্রহের চিহ্ন মানুষের চোখের মুখের সীমা পর্যন্ত এসে থমকে থাকে, সবাই ব্যাপারটা বুঝতে চায়। অথচ মুখ দিয়ে কারোর 'রা'টিও বের হয় না, পাছে ঐ শব্দ বের হলে তিনি অসন্তুষ্ট হন তার জন্য

কারণ তিনি সকলের প্রিয়

(যেহেতু তাঁরই আদেশে পাঁচজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে

শহীদদের বয়েস ২৭, ২১, ২৪, ৩৩ এবং ২২)

উপরন্ত তিনি দয়ালু

(যেহেতু তিনি ছ-জনের মৃত্যুদণ্ড মকুব করেন, যার

মধ্যে দু-জন হচ্ছেন নারী)

চোদ্দজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক স্বাক্ষরিত বুলেটিন এবার বলল—

গত রাত্রে তাঁর পাকস্থলীর বিশেষ করে অন্ত্রের প্রদাহ ধরা পড়েছে কারণ পাকস্থলীতে রক্তক্ষরণ হয়েছে এবং অন্ত্রে পক্ষঘাতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা

দেখা দিয়েছে সেজন্য রাত্রে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হয় তবে রক্তচাপ ও দেহের উত্তাপ স্বাভাবিক আছে

এই বুলেটিন পড়ে বা শুনে জনসাধারণ হতভম্ব হয়, তারা বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠে, কারণ হৃৎশূল কি করে অন্ত্রপ্রদাহে রূপান্তরিত হতে পারে তা তাদের বোধের অগম্য; অন্ত্রশূল থেকে হৃৎশূলের উদ্ভব হতে পারে কিন্তু উল্টোটা সম্ভবে কিনা তা তাদের প্রশ্নের স্তরেও থাকে না যেহেতু তারা জানে তা সম্ভব নয়

কিন্তু অন্ত্ররোগই যদি শেষ সিদ্ধান্ত হয় এই রোগ তাঁর কেন হবে তা-ও জিজ্ঞাস্য হয়ে ওঠে, চিকিৎসাগ্রন্থে আছে—

পাকস্থলীর নিম্নদেশে অন্ত্র অবস্থিত। অন্ত্র বৃহৎ ও ক্ষুদ্র এই দুই ভাগে বিভক্ত। পাকস্থলী হইতে খাদ্য অন্ত্র মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে ক্ষুদ্র অন্ত্র ও পরে বৃহৎ অন্ত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। ইহার গতি খুবই মন্থর হইয়া থাকে, মন্থর চলমান অবস্থাতেই খাদ্য জীর্ণ হইয়া থাকে। আর জীর্ণ হইয়া ইহা পৌষ্টিক নালী হইতে রক্তে অবশোষিত হয়। মানুষের পৌষ্টিক নালী মাংসাশী জীব অপেক্ষা দীর্ঘ, কিন্তু নিরামিষাশী জীবদের তুলনায় ক্ষুদ্র।

বৃহদন্ত্র বহুদিন প্রদাহিত হইলে রক্ত আমাশয়ে পরিণত হয়, ক্ষুদ্র অন্ত্র প্রদাহিত হইলে কম্পজ্বর, পেটব্যথা অরুচি কোষ্ঠবদ্ধতা বা তরলভেদ, পেটফাঁপা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। উপরিউক্ত উপসর্গগুলির সঙ্গে হৃৎশূলের উপসর্গের কোনো মিল পাওয়া যায় না কেবল কোষ্ঠবদ্ধতা ছাড়া, তাই হৃৎশূল কিভাবে অন্ত্রপ্রদাহে রূপান্তরিত হয় তা রহস্যের বটে সকলের কাছে, তাছাড়া এত প্রার্থনা পূজা নমাজ পড়া কেন বিফলে যাচ্ছে তাঁর ক্ষেত্রে; এ-প্রশ্নও ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে বিশ্বাসীদের মনে;

তবে কি তিনি কোনও গুরুতর অপরাধ করেছেন ?

চকিতে এ ভাবনা ভেসে উঠে তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে যায় কারণ এ ভাবনা তিনি টের পেলে অসন্তুষ্ট হবেন সন্দেহ নেই, আর তাঁকে অসন্তুষ্ট করা উচিতও নয়

কারণ তিনি সকলের প্রিয়

(যেহেতু তাঁরই আদেশে পাঁচজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে

শহীদের বয়েস ২৭, ২১, ২৪, ৩৩ এবং ২২)

উপরন্তু তিনি দয়ালু

(যেহেতু তিনি ছ-জনের মৃত্যুদণ্ড মকুব করেন, যার

মধ্যে দু-জন হচ্ছেন নারী)

তাঁর দীর্ঘ বিরাশী বছর জীবনের প্রথম কয়েক বছরের বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ না জানা থাকলেও যখন তিনি অধিপতি হন প্রায় চল্লিশ বছর আগে তখন থেকে একটানা তিনি যাকে বলে দোর্দণ্ড প্রতাপ তেমন ভাবে শাসন করে গেছেন, তাঁর বিরুদ্ধাচরণের মানে হচ্ছে দেশদ্রোহিতা রাষ্ট্রদ্রোহ অতএব তেমন তেমন লোকের কিছুতেই বাঁচার অধিকার থাকে না ফলে ধড় ও মাথা ছিন্ন হয় অতি সহজে, এবং তাই নিয়ম, এই নিয়ম ও আরও কতকত নিয়ম যে তিনি রচনা করেন তার এক চুল নড়চড় হওয়ার নেই, অবশ্য তিনি খুশি হলে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নিশ্চয়

অথচ নিয়মের রাজত্বে হঠাৎ অনিয়ম কেন ঘটে অর্থাৎ তিনি কেন অসুস্থ হয়ে পড়েন সে প্রশ্ন এখন যেন মুখর হয়ে উঠতে চায়

বুলেটিন বলল—

তাঁর আন্ত্রিক পক্ষাঘাতের কিছুটা উন্নতি হয়েছে কারণ নতুন রক্তক্ষরণ বা রক্ত জমাট হবার চিহ্ন পাওয়া যায় নি উদরে এবং রক্তচাপ ও শরীরের উত্তাপ স্বাভাবিক আছে

হৃদয় থেকে উদরে এই রোগ সংক্রমণের ঘটনাটি ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা তা ভবিষ্যৎ বলতে পারে কারণ তাঁর প্রভাব ততদিন থাকবে কিনা বা ততদিনে তাঁর আদেশানুযায়ী ইতিহাস লেখা হবে কিনা বলা সহজ নয়, কিন্তু লোকের মনে এই প্রশ্ন এখন নিরন্তর উঠছে কেবলি উঠছে এবং তারা এর কারণ বার করার চেষ্টা করছে

তিনি বরাবরই ঘরের ভিতরেই থাকতে ভালোবাসেন যদিও দরজা জানলা খোলা থাকে সব দরজা জানলা যা দিয়ে ওখান থেকে দেখা যায় বাইরের নানা দৃশ্য ও ঘটনা, অসুস্থ হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি ঐসব পথ দিয়ে কদাচিৎ বাইরের জগতের খোঁজ খবর রাখতেন, নচেৎ তাঁকে খবর দেওয়ার মতো লোকের অভাব নেই, অবশ্য এরা তাঁকে কি খবর দিতেন বা দেন তা জানার উপায় নেই,

মনে হয় রাজ্যে সুখ শান্তি বিরাজিত অনাহার অর্ধাহারে কেউ নেই সকলেই তাঁর শাসনে তুষ্ট কারণ তিনি দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করেন ইত্যাদি সংবাদই তাঁর কাছে পৌঁছয়, তিনি কি কি খবর শুনতে চান ভালোবাসেন অথবা জানলে পর তুষ্ট হন তাঁর একান্ত ও প্রকাণ্ড কর্মীর দল তেমন সংবাদ-ই সরবরাহ করে থাকেন, অবশ্য সমস্ত সংবাদ-ই তাঁর কাছে পৌঁছয় সচিব-পরিষদে পরিশীলিত হয়ে, তাঁর একান্ত সংবাদ-সংগ্রাহকও এবিষয়ে ব্যতিক্রম নয়, কারণ

তারাও তাঁকে তাঁর মন জোগানো সংবাদই পরিবেশন করে থাকে, যেহেতু কোনো উত্তপ্ত সংবাদ শুনলে তাঁর প্রতিক্রিয়া কেমন হবে সেই আশঙ্কা প্রচণ্ড থাকে, আর তা জেনে কেই বা নিজের মাথা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দিতে চায়, ফলে প্রকৃত খবর তাঁর কানে যায় কিনা এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক

সারা বিশ্বে একমাত্র তাঁর ধরনের মাত্র এই একটি শাসনই টিঁকে আছে বলে পৃথিবীর লোক জানে, এবং তিনি যাঁদের সাহায্যে ক্ষমতায় আসেন তাঁদের নাম শুনলে বিশ্ববাসীর গা এখনও শিউরে ওঠে, আর তাঁরা আজ ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন বলে অনেকে মনে করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এতদিন রাজত্ব চালালেন কি করে বা শারীরিক ভাবে বা কি করে বিশ্বের ব্যতিক্রম হয়ে টিঁকে থাকলেন তা রহস্যের

তিনি নিজে থেকে নেমে না গেলে কেউই তাঁকে পদচ্যুত করতে পারবে না বলে অনেকে বিশ্বাস করেন, একথা সত্য কিনা তা তাদের বিবেচ্য, আপাতত তিনি যে অসুস্থ হতে পারেন, তার হৃৎশূল অন্ত্রশূলে পরিণত হয় এ-ও এক আশ্চর্য ধাঁধাঁর মতো লোকের মনে হয়

তিনি বোধহয় আজীবন বেঁচে থাকবেন
কারণ তিনি সকলের প্রিয়
(যেহেতু তাঁরই আদেশে পাঁচজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে
শহীদদের বয়েস ২৭, ২১, ২৪, ৩৩ এবং ২২)
উপরন্তু তিনি দয়ালু
(যেহেতু তিনি ছ-জনের মৃত্যুদণ্ড মকুব করেন, যার
মধ্যে দু-জন হচ্ছেন নারী)
বিশেষজ্ঞ স্বাক্ষরিত বুলেটিন বলল—

তাঁর অবস্থা অপরিবর্তিত আছে অবস্থার যদি কোনও উন্নতি না হয় তবে বিশেষজ্ঞগণ গভীর পরামর্শ করে ঠিক করেছেন আগামী তিনদিনের মধ্যে তাঁর উপর অস্ত্রোপচার করা হবে

এ সংবাদ জনসাধারণের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না কারণ তারা ততদিন চিকিৎসকদের হাতুড়ে ভেবে বসে আছে অথচ

সরকারী প্রচারযন্ত্রে প্রচার করা হলো যে অস্ত্রোপচার এক ভয়ঙ্কর সংকটের ব্যাপার এই সংকট উত্তরণের জন্য তাঁর আরোগ্য সমস্যায় নিরন্তর অথচ গভীর প্রার্থনা করা সকল দেশবাসীর পক্ষে কাম্য কারণ তিনি বাঁচলেই দেশ বাঁচবে ইত্যাদি

ফলে মন্দির মসজিদে প্রার্থনা শুরু হয়

অন্যদিকে তাঁর স্থলাভিষিক্তদের মধ্যে নীরব প্রতিযোগিতার সংবাদ প্রাসাদ চুঁইয়ে বাইরে আসতে থাকে, যেহেতু এক একজন প্রতিযোগী প্রায় মিউজিক্যাল চেয়ারে বসার খেলার মতো আউট হয়ে যাচ্ছেন, আর তাদের স্থান হচ্ছে হয় ভাগাড়ে না হয় জনতার মধ্যে কোনও এক কোণে, ফলে তাদেরই মারফৎ আস্তে আস্তে স্পষ্ট হতে থাকে নানা বিষয় নানা ভাবনাচিন্তা

তিনি কোনও দিন হেসেছেন কিনা একথা তাঁরাই বলতে পারেন যাঁরা তাঁর কাছে আছেন, অবশ্য শোনা যায় তাঁকে কেউ হাসতে বা কাঁদতে বা চোখে মুখের রেখা ঈষৎ বদলাতেও দেখি নি, তিনি যেমন ঠিক তেমন, পলকও পড়ে বোধ হয় অতি সাবধানে যেন পলক পড়ার ফাঁকে কিছু ঘটে যাবে এমন মনোভাব, অথচ সাধারণ কাণ্ড-জ্ঞানে বোঝা যায় বেশিক্ষণ ঋজু হয়ে থাকা অসম্ভব বা বেশিক্ষণ একই অবস্থায় থাকা কষ্টকর হয়, আর তাই ধন্ধ লাগে সকলের কেমন করে তিনি সারাজীবন বিশেষ করে অধিপতি হওয়ার পর থেকে ঐ ঋজু ভঙ্গি অপরিবর্তিত রাখেন, তবে কি ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার বলে বলীয়ান হয়ে তিনি এমন শক্তির অধিকারী হয়েছেন

কিন্তু তাই যদি সত্যি হয় তবে এখন কেন এমন কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে কেবলি—হৃদয় থেকে উদর, উদর থেকে হৃদয় ইত্যাদি ইত্যাদি

তিনি সমানে যুঝে চলেছেন মৃত্যুর সঙ্গে, এখন পাঞ্জা লড়াও তো মুখের কথা নয়, মৃত্যু তাঁকে কুপোকাৎ করতে পারছে না, নাকি তিনি স্বাভাবিক নিয়মেই বেঁচে যাচ্ছেন আজও, লোকে তাই ভাবছে হয়তো তিনি অমর

কারণ তিনি সকলের প্রিয়

(যেহেতু তাঁরই আদেশে পাঁচজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে

শহীদদের বয়েস ২৭,২১,২৪,৩৩ এবং ২২)

উপরন্তু তিনি দয়ালু

(যেহেতু তিনি ছ-জনের মৃত্যুদণ্ড মকুফ করেন, যার

মধ্যে দু-জন হচ্ছেন নারী)

বুলেটিন বলল—

তাঁর অবস্থা সংকটজনক তবু আগামীকাল তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার করা হবে কারণ এই শল্যচিকিৎসা তাঁকে বাঁচানোর জন্য একান্ত জরুরি

এগারোজন-কে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করে তাঁর তবিয়ত আরও বহাল থাকে, তাঁর চোখে এখন ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ খেলে যায়, যেন চল্লিশ বছর পিছিয়ে যান তিনি

লহমায় যখন তিনি পলক ফেলতে না ফেলতে সই করে যাচ্ছেন একের পর এক মৃত্যু দণ্ডাদেশ যেন এই হচ্ছে স্বাভাবিক কখনো কখনো স্বচক্ষে দেখছেন সেই দণ্ড ঠিকমত কার্যকর হচ্ছে কিনা অর্থাৎ সাঁড়াশি দিয়ে শিরদাঁড়া ভাঙা, বেয়নেট দিয়ে শরীরের যে কোনো জায়গায় খুঁচিয়ে দেওয়া, গলায় রেশমী দড়ির ফাঁস দিয়ে হঠাৎ টেনে নেওয়া, পিন ফুটিয়ে ফুটিয়ে নুন ছিটিয়ে ছিটিয়ে বা সরাসরি গুলি করা ইত্যাদি ইত্যাদি এবং তারা যত ছটফট করতে করতে মৃত্যু বরণ করে ততই তাঁর সারা শরীর কদম ফুলের মতো ফুলে ফুলে ওঠে যেন তাঁর মহিমা এই দণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে, আর কখনো কোনো অলস মুহূর্তে এজন্য তাঁর অনুশোচনা হয় না

তারপর অনেকদিন পর প্রকাশ্যে এগারোজনকে চরম দণ্ড দিতে হয়, অবশ্য প্রকাশ থাকে তিনি গোপনে বহু তাঁর ধারণায় দেশের পক্ষে অ-বাঞ্ছিত ব্যক্তিকে পৃথিবীতে বাঁচার অধিকার থেকে, আদেশ বলে, বঞ্চিত করেছেন, তবে সেগুলি গোপনে হয় এবং তার নিয়মকানুনও আলাদা, সেজন্য তাঁকে খুব বেশি ভাবতেও হয় না, এবং তেমন তেমন নিকেশ তিনি দেখতেও যান না, কেবল যা প্রকাশ্য ভাবেই তিনি মধ্যে মধ্যে অংশগ্রহণ করেন,

এটা তাঁর একটা কৌশলও বটে,

কারণ যখন তিনি নেমে আসেন তখন সকলে বোঝে যে চরম একটা কিছু ঘটছে, তাই তিনি নেমে না এলে যে চরম ব্যাপার ঘটে না এটা অনেকে বিশ্বাসও করেন, অর্থাৎ এই কৌশলের ছলে তিনি গোপন কৃত্যগুলি যেন ঘটেই না অর্থাৎ তিনি গোপনতার পক্ষপাতী নন যা করেন প্রকাশ্যে বলিষ্ঠভাবে করেন এমন একটা পরিমণ্ডল তৈরি করেন

প্রচারের এমনই মাহাত্ম্য যে বার বার এক কথা প্রচার করতে করতে মিথ্যাকে সত্য বলে মনে হয়, আর তাঁর প্রচারে অতিশয় কিছু থাকবে বলে লোকে ধরে নিয়েছে কারণ তা তিনি জনগণের কল্যাণের জন্য করে থাকেন

কারণ তিনি সকলের প্রিয়
(যেহেতু তাঁরই আদেশে পাঁচজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে
শহীদদের বয়েস ২৭,২১,২৪,৩৩ এবং ২২)
উপরন্তু তিনি দয়ালু
(যেহেতু ছ-জনের মৃত্যুদণ্ড মকুফ করেন, যার
মধ্যে দু-জন হচ্ছেন নারী)
বুলেটিন বলল—
তাঁর অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে তিনি নির্বিঘ্নে বিশ্রাম নিচ্ছেন তাঁর শ্বাস-

প্রশ্বাস স্বাভাবিক হৃদ্‌স্পন্দন স্বাভাবিক রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় নি শরীরে উত্তাপ নেই আশা করা যাচ্ছে তিনি সপ্তাহ খানেকের মধ্যে হেঁটে চলে বেড়াতে পারবেন

লোকে তাজ্জব বনে কিছুটা এই ভেবে যে বিরাশী বছরের একজন লোক কি করে এতবার হৃৎশূলে আক্রান্ত হয়ে অন্ত্রপ্রদাহে ভুগে দেহে অস্ত্রোপচারের পর এমন সুস্থ থাকে, তখন সংবাদপত্রে পত্রিকায় এ-বিষয়ে প্রবন্ধ বের হতে শুরু হয় যাদের মূল বক্তব্য প্রায় এক, যাদের নমুনা এরকম কতকটা—

আত্মা ও শরীরের মধ্যে সম্পর্ক কি তা বোধহয় চিরকালই রহস্যাবৃত থাকবে, অথচ মনের প্রভাব শরীরের উপর বিশেষ ক্রিয়াশীল সে-বিষয়ে প্রায় দ্বিমত নেই। একথা সকলের জানা যে অনেকে ইচ্ছা মৃত্যুও বরণ করেছেন, মহাভারতে তার জলজ্যান্ত প্রমাণ ভীষ্ম। এখনও কিছু কিছু ব্যক্তির (যাঁদের মহামানবই বলা যায়) স্নায়ুর শক্তি প্রচণ্ড ও ইচ্ছাশক্তিও প্রবল, ফলে তাঁরা মৃত্যুর সঙ্গে সমানে পাঞ্জা লড়ে যান, মৃত্যু তাঁদের শিয়রে এসেও তাঁদের গ্রাস করতে পারে না, যেমন ঘটছে তাঁর বেলায়। তাঁর ইচ্ছা-শক্তি মনোবল স্নায়ুর জোর যে সাধারণ লোকের চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি তা বোঝা গেল তাঁর অসুস্থ হওয়ার পর ঘটনাবলি বিচার করে, যিনি কাউকে পরোয়া করেন নি কোনও দিন, আজ মৃত্যুকেও পরোয়া করছেন না তিনি একটুও, এখানেই তিনি হয়ে ওঠেন প্রায় ঈশ্বরের সমান ঈশ্বরের মতো ··ইত্যাদি ইত্যাদি

লোকে এ ধরনের লেখা প্রায়ই পড়ে থাকে, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নেই কারণ বেছে নেওয়ার কোনও অধিকারই বা ইচ্ছা কারুর আর নেই এখন, কারণ তিনিই সবার হয়ে ভাবেন আর নিশ্চয় সকলের যাতে মঙ্গল হয় তেমন ব্যবস্থাই করে থাকেন, আর কেউ যদি স্বেচ্ছায় অন্যের চিন্তাভাবনা নিজের করে নেয় তাতে ক্ষতি-ই বা কি, অতএব এসব লেখা পড়ে তাদের মনে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বোধহয় কিছুই হয় না, কারণ তারা চিন্তা করে না

তিনিই চিন্তা করে থাকেন

এগারো জন-কে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করে তিনি বেশ বহাল তবিয়তেই ছিলেন, এবং অনেক দিন পর এমন সাজা দেওয়ার দরকার ছিল তা ভেবে পুলকও বোধ করেন, এ রকম সাজা দেওয়ার সুবিধা এই যে এতে নিজের অপার অসীম ক্ষমতা দেখানো হয় সঙ্গে সঙ্গে প্রজাপুঞ্জ আরও ভীত ও চকিত হয়ে ওঠে এবং এও যেন নিঃশব্দে ঘোষিত হয় যে তাদের মরণবাঁচন তাঁর হাতেই।

তাঁর ক্ষমতা ঐশ্বরিক এ মনোভাবও চারিয়ে দেওয়া হয়েছে অতি কৌশলে এবং মানুষজন তা নির্বিবাদে মেনে নিয়েছে, এহেন তিনি কেন যে ঘোর

অসুস্থ হলেন তা অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে পড়ে তবে নিঃশব্দে বোধহয় নিজেরও অগোচরে, তাতে শ্বাস-প্রশ্বাসও স্বাভাবিক রাখতে হয়, কারণ দীর্ঘশ্বাস বা ভারী নিঃশ্বাসের তাৎপর্য থাকতে পারে এবং তা টের পেলে তাঁর পরিষদবর্গ নিশ্চয়ই চুপ করে থাকবেন না, যেহেতু ঐসব সংবাদ ষড়যন্ত্র ইত্যাদি সরবরাহ দমন ইত্যাদির উপর তাদের সৌভাগ্য নির্ভর করে, তাছাড়া যাঁর নুন খাই তাঁর ভালোমন্দ দেখা উচিত

কারণ তিনি সকলের প্রিয়
(যেহেতু তাঁরই আদেশে পাঁচজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে
শহীদদের বয়েস ২৭,২১,২৪,৩৩ এবং ২২)
উপরন্ত তিনি দয়ালু
(যেহেতু তিনি ছ-জনের মৃত্যুদণ্ড মকুফ করেন, যার
মধ্যে দু-জন হচ্ছেন নারী)
বুলেটিন বলল—

এখনও তাঁর অবস্থা সংকটজনক তবু তিনি সমানে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছেন তাঁর জীবনীশক্তি ঈশ্বরের সমতুল্য না হলে এভাবে লড়াই করা সম্ভব হত না

স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় বুলেটিনের ভাষা এভাবে আধা দর্শন আধা সাহিত্যিক হয়ে উঠলেও লোকে বোঝে যে কয়েকদিন তাঁর সম্বন্ধে যেসব লেখা পত্রপত্রিকায় বের হচ্ছে তার প্রভাব বিশেষজ্ঞদের স্বাক্ষরিত বুলেটিনে পড়েছে, এবং বুলেটিনে শুধু তাঁর স্বাস্থ্যের সংবাদ দিয়েও বাড়তি এমন কিছু দিচ্ছে যার ফলে তাঁর মহিমা আর-একভাবে প্রকাশিত হতে থাকে মানুষের কাছে, তবু এহেন ঐশ্বরিক জীবনীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি হঠাৎ এমন অসুস্থ হলেন কেন তাও ধন্ধ লাগায় সকলকে কারণ

তিনি এগারো জনকে চরমদণ্ড দিয়ে বেশ বহাল তবিয়তে ছিলেন, আর তাঁর চোখে মুখে ঈশ্বরের অজ্ঞান্তেই বোধহয় খুশি খুশি আমেজ কতকটা যৌবনোচিত যা প্রায় চল্লিশ বছর আগে দেখা গিয়েছিল তেমন, নাকি বার্দ্ধক্যে আবার যৌবন ফিরে আসে

কিন্তু তাঁর হৃদ্‌পিণ্ড হঠাৎ লাফিয়ে উঠল কেন—উত্তরদিকের বাতায়ন দিয়ে প্রথম নজরে পড়ে তাঁর, তিনি খুশি হবেন কিনা ভাবছেন কিন্তু তাঁর আগেই বুক দুড়দাড় লাফালাফি শুরু করে দিল, বোধহয় আনন্দ অন্তত প্রথম দেখেই সেই প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক,

কারণ তখনও সবটা স্পষ্ট নয়
তিনি এলেন দক্ষিণের জানলা দিয়ে
তিনি তাকালেন পশ্চিমের জানলা দিয়ে
তারপর তাকালেন নৈঋর্তে
তারপর ঈশান কোণে
তারপর পূবে
তারপর বায়ু……
প্রথমে দেখলেন কয়েকজন তারপর দেখলেন কয়েকজন তারপর কয়েকজন
তারপর কেবল কালো কালো মাথা

কালো কালো মাথা কারণ তিনি জানেন প্রাসাদের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় সকলে নত মস্তক হয়—এই নিয়ম তাই দস্তুর, মুহুর্মুহু তাঁর বুক নেচে নেচে ওঠে যেহেতু তিনি বুঝলেন প্রজাপুঞ্জ এখনও তাঁর বাধ্য আর তারা আজ এসেছে তাদের কৃতজ্ঞতা জানাতে তাঁর হৃদ্‌পিণ্ড তাই লাফিয়ে ওঠে এবং সেই খুশি আরও বাড়াবার জন্য তিনি চাইলেন দক্ষিণ পশ্চিম নৈঋর্ত ঈশানে…

দেখলেন মানুষ কেবল মানুষ
আর তাঁর হৃদ্‌স্পন্দন যেন হঠাৎ থেমে যেতে চায়

কারণ এবার তিনি স্পষ্ট দেখলেন তাদের চোখ জলজ্বলায় এবং তারা নতমস্তক নয়, দৃষ্টি নিবদ্ধ এখন প্রাসাদের দিকে

সেখানে অন্ধকার এখানেও তাই, সেজন্য অন্ধকারে তাদের চোখ জ্বলজ্বলায় যেমন বাঘের চোখ জ্বলে, তিনি দৃষ্টি ফেরাতে চাইলেন. কারণ ঐ সকল দৃষ্টির তীব্রতা সহ্য করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে চকিতে যেন ঐ দৃষ্টি সংহত হয়ে, যেভাবে লেন্সে সূর্যকিরণ ঘন হয়ে দাহ্য পদার্থে আগুন ধরায়, তাঁর সর্বাঙ্গ জর্জরিত করে দেয়

তার বুকের লাফানি এতই দ্রুত ও পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে যে তিনি বুকে হাত দিয়ে সমস্ত বুক সংবাহিত করেও স্থির থাকতে পারেন না আর

কারণ তাঁর চোখের সামনে তখন হাজার হাজার হলুদ বৃত্ত সব ঘোরাফেরা করে আর তিনি কোনো ভূমিকা না করেই পড়ে গেলেন পুরু কার্পেটের উপর তেমন নিঃশব্দে যে নৈঃশব্দ্যে তারা এসেছিল এধার সেধার দশধার থেকে,

সেই প্রথম তিনি হৃৎশূলে আক্রান্ত হলেন দীর্ঘ বিরাশী বছর জীবনে।

দ্বিতীয় দিনে প্রথমবার ও সব মিলিয়ে দ্বিতীয়বার তিনি যে আক্রান্ত হলেন তার কারণও প্রথমবারের প্রায় অনুরূপ ; প্রথম ধাক্কা সামলে নেওয়ার পর

তখনও অবশ্য তা হৃৎশূলরূপে চিহ্নিত হয় নি, তিনি জোর কদমে মনের সামান্যতম দুর্বলতা ঢাকার জন্য আরও কঠোর ঋজু হওয়ার চেষ্টা করলেন· দৈনন্দিন রুটিন আরও কঠোরভাবে মানার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন; পার্ষদ-রা তাঁর এমন সূক্ষ্মভাবে কঠিন ঋজু হওয়ার কাণ্ড ধরতে না পারলেও তিনি যে ঠিক চুল চুল আগের মতো নেই তা টের পায়, ফলে তারা এক অজানা আশঙ্কায় দুলতে থাকে। এই বুঝি কিছু হয় আর তাই তারা পারতপক্ষে তাঁর ত্রিসীমানা মাড়াতে চায় না, পাছে তিনি রুষ্ট হন আর তিনি রুষ্ট হলে সকলের ক্ষতি কারণ তিনি সকলের প্রিয়

(যেহেতু তাঁরই আদেশে পাঁচজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে
শহীদদের বয়েস ২৭, ২১, ২৪, ৩৩ এবং ২২)
উপরন্তু তিনি দয়ালু
(যেহেতু তিনি ছ-জনের মৃত্যুদণ্ড মকুফ করেন, যার
মধ্যে দু-জন হচ্ছেন নারী)

বুলেটিন বলল—তাঁর অবস্থা ততটা সংকটজনক নয় প্রাণের আশঙ্কা নেই তবে যমে মানুষ দারুণ সংগ্রাম চলছে আর এই সংগ্রামে বিরাট মানুষের জয় হচ্ছে তাঁর শরীরে উত্তাপ স্বাভাবিক রক্তচাপ স্বাভাবিক

তাঁর এতদিনের মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামকে কেন্দ্র করে নানাবিধ পত্র-পত্রিকায় দার্শনিক ধার্মিক শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত প্রবন্ধাবলি প্রকাশিত হতে থাকে, কোনও কোনও পত্রিকায় তাঁর জীবনের কোনো ঘটনা যা প্রায় অলৌকিক গল্পের মতো প্রকাশিত হয়; যতই তাঁর লড়াই দীর্ঘায়ত হতে থাকে ততই নানা লেখায় দিব্যমানবতত্ব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, লেখাগুলি পড়লে কিছুটা অবাক-ই মানতে হয় যেহেতু প্রবন্ধগুলির বক্তব্য এক হলেও ভাষা বাক্য ও শব্দ প্রয়োগও প্রায় একই রকম হয় যদিও ভিন্ন ভিন্ন নাম লেখক হিসেবে ছাপা থাকে, এই সব লেখার একটি পড়লে সব লেখা পড়া হয় বলে এমন একটি লেখার কিছু অংশ অর্থাৎ মোদ্দা অংশটি এই রকম-ই হয়—

সকলেই মানুষ কিন্তু কেউ কেউ দিব্যমানব, দিব্যমানব কেননা তাঁরা দিব্য শক্তির অধিকারী, তেমন পুরুষ অবশ্য কালেভদ্রে জন্মান, কারণ তাঁরা মানুষের মধ্যে ব্যতিক্রম বিশেষ। ঈশ্বর কখনো কখনো সাধুদের পরিত্রাণ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য তাঁর ঈপ্সিত পুরুষকে মর্তে প্রেরণ করেন, জন্মমুহূর্তে ঘোষিত হয় যে ইনি মহাপুরুষ কেননা তাঁর জন্মমুহূর্তে দিকে দিকে নানা শুভ চিহ্ন সব প্রকটিত হয়, এই সব চিহ্ন অবশ্য জননীরাই প্রথমে বুঝতে পারেন ও

ঘোষণা করেন, তাই সকল মত পথ বিসর্জন দিয়ে দিব্যমানবকে অনুসরণ করা প্রতিটি মানুষের উচিত কর্তব্য হয়ে ওঠে, যেহেতু তাঁরা সমাজ দেশ ও কালের মঙ্গল বিধানের জন্য জন্মান এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায়ও তাই, এঁরা জন্মের মধ্যে মৃত্যুকে পরাস্ত করেন এবং মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পরোয়া করেন না, এঁদের উপরন্তু ইচ্ছাশক্তি অতি প্রবল, এই ইচ্ছাশক্তির বলে এঁরা হাঁ-কে না এবং না-কে হাঁ করেন, মনের জোর সাঙ্ঘাতিক বলেই মনের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক বল-ও প্রবল হয়ে ওঠে, তাই এঁরা আকারেপ্রকারে বিরাট বিশাল, ক্ষীণতনু শীর্ণ দেহের আকর্ষণশক্তি কম, এজন্য এঁরা বিরাট বিশাল হয়ে জন্মগ্রহণ করেন কারণ শরীরের সঙ্গে মনের সম্পর্ক উভয়ত অর্থাৎ শরীর বিশাল বলেই মন বিশাল মন বিশাল বলেই শরীর বিশাল, ঈশ্বর এঁদের সৃষ্টি করেন তাঁর ঈপ্সিত-কে সফল করার জন্য এবং এরা যুগে যুগে অসংখ্য জন্মান না, কদাচিৎ তেমন একজনই জন্মান যেন তাঁরই মতো, হয়ত এরপর তেমন মানব জন্মাবে কিনা যথেষ্ট সংশয় আছে ইত্যাদি···

দ্বিতীয় দিনে প্রথম হৃৎশূলে আক্রান্ত তার কারণ প্রথম বারের প্রায় অনুরূপ—

প্রথম হৃৎশূলের ধাক্কা সামলে নিয়ে আবার তিনি বহাল তবিয়ত ফিরে পাচ্ছিলেন, আসলে সেটা হৃৎশূল কিনা সে বিষয়ে চিকিৎসকের সন্দেহ থাকাতে হৃৎশূলের পর যে সতর্কতা নেওয়া হয় যেমন পূর্ণ বিশ্রাম অবিচ্ছিন্ন নিদ্রা নিরুদ্বেগ থাকা ইত্যাদি তা এক্ষেত্রে নেওয়া দরকার মনে হয় নি তাই তিনি আগের মতোই চলবেন ফিরবেন তেমনই স্বাভাবিক, অবশ্য তিনি ভেতরে ভেতরে শারীরিক দুর্বলতা টের পেলেও তা ঘুণাক্ষরে জাগানো আত্মমর্যাদাহানিকর ভেবে আগের মতো নিজেকে উৎফুল্ল রাখার চেষ্টা করেন ও সেই সময় কোনও এক দুর্বল মুহূর্তে প্রকৃতির সান্নিধ্য লাভের জন্যই তাঁর চোখ পড়ে দক্ষিণের জানলায় কারণ সেখানে বাতাস ছিল ও সেই বাতাসে দূর সমুদ্র বনজঙ্গলের গন্ধ ভরা ছিল, কিন্তু চোখ পড়েই চোখের পাতা আপসে বন্ধ হয় আবার খোলে, দু-একবার চোখ পিট পিট করে দেখার ভুল কিনা পরখের জন্য

তাকালেন পশ্চিমের জানলা দিয়ে

তারপর নৈঋ‍তের জানলা দিয়ে

তারপর ঈশান কোণের

তারপর পুবের

তারপর বায়ু ··

প্রথমে দেখলেন কয়েকজন তারপর দেখলেন কয়েকজন তারপর কয়েকজন

তারপর কেবল কালো কালো মাথা যেন তা সব নড়ে এখন অথচ শব্দ হয় না তবু সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ওঠে নামে আর যেন তাঁর চোখ ডিঙির মতো একবার তীরস্থ লোকের কাছে দৃশ্য হয় আবার অদৃশ্য

আর ঢেউ সকল তীরে আছাড় খেয়ে ভেঙে পড়ে যদি নিঃশব্দে আবার গুটিয়ে গুটিয়ে চলে যায় সেখানে যেখানে আছে গভীরতা অতলতা প্রভৃতি যেন এই ঢেউগুলি তাঁর কাছে আছড়ে পড়ছে এবং তাঁকে টেনে নিয়ে যেতে ঠিক ঐখানে যেখানে তারা নিঃশব্দ অথচ তাদের চোখ জ্বলজ্বলায় অন্ধকার সমুদ্রে ফসফসরাস দাউ দাউ আর সেই দাউ দাউ ফস্‌ফরাসের আলোকে টের পাওয়া যায় সমুদ্র এখন শান্ত নয় বিচলিত আলোড়িত বিকম্পিত

আর তাদের পকেটে সব তীক্ষ্ণ কালো রঙের বৃত্ত

কালো বৃত্ত তার মানে……তাঁর বাঁ চোখ নিদারুণ নাচতে শুরু করে

তারপর তাঁর বাঁ পায়ের তলা চুলকোয়

তারপর বাঁ হাতের চেটো

তারপর তিনি পুরোহিত বলে চিৎকার করতে যাবার আগেই বুকের লাফানি এমনই দ্রুত ও পীড়াদায়ক হয় যে বাক্যস্ফুট না হতেই পড়ে যান কার্পেটের উপর নিঃশব্দে যে নৈঃশব্দ্যে তারা এসেছিল এধার সেধার দশধার থেকে

তিনি দ্বিতীয়বার হৃৎশূলে আক্রান্ত হলেন

তাঁর একান্ত চিকিৎসক রোগ ঠাহর করতে না পেরে ঘুমের ওষুধ বরাদ্দ করার মুখে একাধিক চিকিৎসক দেখানো সমুচিত হবে মনে হলে সেই রকম ব্যবস্থা হয়

কারণ তিনি সকলের প্রিয়

(যেহেতু তাঁরই আদেশে পাঁচজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে

শহীদদের বয়েস ২৭, ২১, ২৪, ৩৩ এবং ২২)

উপরন্তু তিনি দয়ালু

(যেহেতু তিনি ছ-জনের মৃত্যুদণ্ড মকুফ করেন, যার

মধ্যে দু-জন হচ্ছেন নারী)

বুলেটিন বলল—তাঁর পাকস্থলীর দুই-তৃতীয়াংশ অপসারিত করা হয়েছে তার দক্ষিণ বাহুর ধমনীতে অস্ত্রোপচার চালিয়ে অবশেষে কৃত্রিম বৃক্ক (কিড্‌নি) সংযোজিত হয় এত বড় অস্ত্রোপচার সত্ত্বেও তাঁর অবস্থার কোনও অবনতি ঘটে নি বরং তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের ওঠা নামায় শরীর যেন আরও সজীব হয়ে উঠতে থাকে চোখ খুললে দ্যুতি দেখা দেয় যেমন দিব্যমানবে লক্ষ্যযোগ্য

তৃতীয় চতুর্থবার হৃৎশূল অবশ্য হৃৎশূলের নিয়মেই ঘটে থাকে অর্থাৎ একবার

হৃৎশূল হলে তা একটিমাত্র বার হয়েই থেমে থাকে না, উপরন্তু স্নায়ু টান টান থাকলে তার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা বেশি, তাই তৃতীয় চতুর্থবার যে তিনি আক্রান্ত হন তা নিয়মমাফিক হয় যেমন গরমের বর্ষা বর্ষার শরৎ ইত্যাদি তেমন ভাবে দ্বিতীয়বারের পর তৃতীয়বার তারপর চতুর্থবার

তাঁর বিরাশী বছর জীবনে এ-ধরনের ব্যাপার নিশ্চয়ই নতুন নয়, কিন্তু এতদিন তা টের পান নি, টের পেলেও হয়ত স্বচক্ষে দেখেন নি, অথচ কিছুই নয়

মানুষজন—নীরব, শুধু তাদের চোখ জ্বলজ্বলায় অন্ধকারে

তাদের বুকপকেটের কালো বৃত্ত তীক্ষ্ণ কালো তা যেন বিদ্ধ করে তীরের ফলার মতো, মাত্র এই, তবু নীরবতার কি দারুণ শক্তি, এত অন্তর্নিহিত শক্তি যে তাঁকেও বিচলিত করে শুধু কয়েক মুহূর্ত নয় অনেক অনেক মুহূর্ত, আর তিনি সেই বিলোড়ন সহ্য করতে পারেন না,

তবু এ তথ্য জানাজানি হলে তাঁর সম্মান প্রতিপত্তি খর্ব তো হবেই বটে তদুপরি তাঁর মহিমাও ক্ষুণ্ণ হবে অসীম, এমনকি আসন টল টল করতে পারে

মনের ভিতর যেহেতু অন্য কেউ দেখতে পায় না এই যা ভরসা ; না হলে লোকে এতক্ষণে টের পেত তাঁর অসুস্থ হওয়ার নেপথ্য ঘটনাটি, আর তা জানতে পারে না বলে তাঁর অন্তরঙ্গরা ধারণা করে, যেন যে তাঁর বয়েস হয়েছে অতএব অসুখ হওয়া স্বাভাবিক,

অথচ আশ্চর্য এই যে তিনি অসুস্থ হয়েও চালে এতটুকু ভুল করেন না, যেহেতু এ সময়ে রাগে অন্ধ হলেও তিনি বিশ্বস্ত কর্মচারীদের কাউকে বরখাস্ত করেন না, বা অন্যবিভাগে বদলি, কারণ তা করাই ছিল স্বাভাবিক কারণ তাদের অকর্মন্যতার জন্য এমন কাণ্ড ঘটে নিশ্চিতভাবে

তিনি কিছুই রদবদল করেন না বলেই তিনি যে স্বচক্ষে মানুষজন দেখেন অনেক দেখেন বিরাট নীরবতা এবং চোখে ফসফরাস তা জানতে পারে না অন্যে, কেবল তাঁর একান্ত পরিজনরা আঁচতে পারেন যে তিনি ঠিক ঠিক আগের মতো নেই, যেন কোথাও কিছু ঘটেছে তাই তারা দূরে দূরে বিহার করেন, পাছে তাঁর কোপদৃষ্টি পড়ে এই আশঙ্কায়

যেহেতু তিনি এখন সত্যি অসুস্থ এবং চিকিৎসকদের মতে হৃৎশূলে আক্রান্ত, সেজন্যই বোধহয় কেবলমাত্র বেতারযন্ত্রটি তাঁর শিয়রের কাছে রাখা হয়— এটি তাঁর নীরব নির্দেশ এবং এই সামান্য পরিবর্তন অবশ্য পার্ষদদের মনে নিদারুণ ঝড় তোলে আর সর্বদা শঙ্কিত থাকেন কারণ এবার নিশ্চয়ই কিছু ঘটতে যাচ্ছে

আর তাঁর হৃৎশূল অস্ত্রশূলে পরিণত হবার আগেই তিনি ছ-জনের মৃত্যুদণ্ড মকুফ করেন, অবশ্য তা অনেক আগেই মকুফ করেন

কারণ তিনি সকলের প্রিয়

(যেহেতু তারই আদেশে পাঁচজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে

শহীদের বয়েস ২৭,২১,২৪, ৩১ এবং ২২)

উপরন্তু তিনি দয়ালু

(যেহেতু তিনি ছ-জনের মৃত্যুদণ্ড মকুফ করেন, যার

মধ্যে দু-জন হচ্ছেন নারী)

বুলেটিন বলল—তাঁর অবস্থা উদ্বেগজনক কৃত্রিম বৃক্ক কাজ করে চলেছে রক্ত সঞ্চালনও কৃত্রিম উপায়ে করানো হচ্ছে আরও কিছুদিন তাঁর অবস্থা উদ্বেগজনক থাকবে কিন্তু তাঁর অটুট মনোবল ও ইচ্ছাশক্তি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মৃত্যুকে পরাস্ত করবে বলে মনে হয় তিনি আবার সক্ষম সবল হয়ে ফিরে আসবেন

তাঁর বিরাশী বছর জীবন মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে তিরাশীতে পা দেবে, আর তিনি তিরাশী বছর পূর্তি উপলক্ষে নিজের উদ্যোগেই বিরাট উৎসবের আয়োজন করবেন যেহেতু এবার তিনি মৃত্যুর সঙ্গে কঠোর পাঞ্জা লড়ে মৃত্যুকে পরাস্ত করে বিজয়ী হয়ে ফিরে এসেছেন

বেতারযন্ত্রের চাবি অবশ্য হাত দিয়ে ঘোরাতে হয় না, তাঁরই আদেশ মতো ঠিক করা আছে বিদেশের কয়েকটি বেতারকেন্দ্র, চাবি ঠিক সময় ব্যবধানে নির্দিষ্ট কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে যায় ও সেই কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার করে, প্রায় চল্লিশ বছর তিনি নিজে বেতার শোনেন নি, শোনবার সময় হয় না, এখন অসুস্থ ও রাজকীয় কাজ-কর্মের চাপ কম হওয়ায় সময়ের ভার লঘু করার জন্য এ বন্দোবস্ত স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন, আর এতে সুফলও বর্তায়, নানা দেশের সঙ্গীত তাঁকে উদ্দীপ্ত করে ও মন-মেজাজ খুশি রাখে, ফলে তাঁর ক্ষুধার উদ্রেক হয় ঘুম নিশ্চিত হয় স্নায়ুর টান শিথিল হয়, তিনি শুয়ে শুয়ে সিদ্ধান্ত নেন সুস্থ হয়ে উঠলে সঙ্গীত-প্রচারের মাধ্যমটি আরও জোরালো করবেন যেহেতু সঙ্গীত অসুস্থ লোককে সুস্থ করে তোলে

তাঁর মনের কথা অন্যেরা টের পায় কিভাবে তা বলা মুস্কিল তবে দেখা গেল মানুষের জীবনে সঙ্গীতের উপযোগিতা সম্বন্ধীয় নানা লেখা প্রকাশিত হতে থাকে

অথচ বেতারযন্ত্র কেবল সঙ্গীতই প্রচার করে না, সময় সময় কথিকা সমীক্ষা আলোচনা সংবাদ ইত্যাদিও প্রচার করে থাকে, অবশ্য এযাবৎ তাঁর কানে সংবাদ

প্রবেশ করেনি যেহেতু কেন্দ্রগুলি এমনভাবে নির্দিষ্ট করে রাখেন তাঁর আত্মীয়-পরিজন যে কেবল সঙ্গীত পরিবেশিত হয় অন্য কিছু নয়, অথচ হঠাৎ

সঙ্গীতের বদলে শোনা যায় সংবাদ
তিনি কান পাতলেন
তবে কি কানে খাটো হয়েছেন তিনি, আবার কান পাতলেন
টক্ করে শব্দ হল
অন্য একটি কেন্দ্রে কাঁটা স্থির হয়
সঙ্গীতের বদলে শোনা যায় সংবাদ
কিছুতেই তিনি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না
তিনি কান পাতলেন
টক্ করে শব্দ হয়
সঙ্গীতের বদলে শোনা যায় সংবাদ
আবার কেন্দ্র বদল হয়
সঙ্গীতের বদলে শোনা যায় সংবাদ
আমাদের জনগণ তীব্রভাবে নিন্দা করে এ ধরনের বর্বরোচিত আচরণ
কেন্দ্র বদল হয়
কেবল সংবাদ
বর্বরোচিত আচরণের প্রতিবাদে আমরা সকল সম্পর্ক ছিন্ন করছি
আর এক কেন্দ্র
সংবাদ বলে
তাঁর গর্হিত আদেশ রহিত করার জন্য বিরাট সমাবেশ হয়
আবার আবার শব্দ হয়
আর আর কেন্দ্র
সংবাদ সংবাদ সংবাদ
নিন্দা নিন্দা নিন্দা কেবল নিন্দা

কানে তালা লাগার উপক্রম হলে তিনি কানের ফুটো বন্ধ করার জন্য দু-হাত তুলতে গিয়ে বুঝলেন পেটে তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে, সে যন্ত্রণা কেবলই নীচে নামছে উপরে উঠছে—নামছে উঠছে, যন্ত্রণা এত তীব্র যে কেবলই তাঁর শরীর দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে দরদরিয়ে ঘাম ঝরে আর চোখের উপর ভেসে ওঠে কালো লাল ক্রমে হলুদ বিন্দু, তিনি কান চাপা দেওয়ার বদলে পেট চেপে ধরতে চান, তার আগেই অনর্গল বমি করে সংজ্ঞা হারান সেই প্রথম হৃৎশূল অন্ত্রপ্রদাহে পরিণত হয়।

কিন্তু তাঁকে বাঁচানো একান্ত দরকার
কারণ তিনি সকলের প্রিয়
(যেহেতু তাঁরই আদেশে পাঁচজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে
শহীদদের বয়েস ২৭,২১,২৪,৩৩ এবং ২২)
উপরন্তু তিনি দয়ালু
(যেহেতু তিনি ছ-জনের মৃত্যুদণ্ড মকুফ করেন, যার
মধ্যে দু জন হচ্ছেন নারী)

বুলেটিন বলল—তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক কৃত্রিম বৃক্ক সঠিক কাজ করছে না এমনকি কৃত্রিম রক্ত সঞ্চালনও ঠিক মতো হচ্ছে না মধ্যে মধ্যে তিনি সংজ্ঞা হারান তবু তাঁর শরীরের উত্তাপ ও রক্তচাপ স্বাভাবিক আছে ও থাকছে যমে-মানুষে এমন লড়াই সচরাচর দেখা যায় না তাঁর দীর্ঘ জীবনের প্রায় অর্ধেকটাই কেটেছে রাজ্য ও তৎসংক্রান্ত চিন্তায় এবং আরও কিছু সময় সামরিক কাজকর্মে, প্রথম দিকে কেন প্রায় সব সময়ই তাঁকে বেগ পেতে হয়েছে শাসন চালনায় প্রায় বছর ত্রিশেক আগেই তাঁর ধরনের শাসনব্যবস্থা গত হয় পৃথিবীতে, একমাত্র তিনিই প্রদীপের শেষ সলতের মতো জ্বলজ্বলাচ্ছিলেন এতদিন, তেল ফুরিয়ে এলেও নিভবার আগে প্রচণ্ড জ্বলতে হবে তো বটেই, তিনি আরও দৃঢ় ঋজু হয়ে উঠতে চাইলেন

আর তাই নিজস্ব আদর্শ ও ব্যবস্থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনেকদিন পর চরম দণ্ডাদেশ প্রচার করেন, উদ্দেশ্য থাকে নিজের মহত্ত্ব ও অনিবার্যতা প্রচারের, আর যেটুকু সংশয় দেখা দেবে তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু সন্দেহ যাতে দানা না বাঁধে তার চেষ্টা, কারণ প্রজাপুঞ্জ বুঝবে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা মানেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া—

কিন্তু এমন যে হবে…
সেই নীরব মানুষ কেবল মানুষ
হাত উত্তোলিত নয়
অথচ চোখ ফসফরাস দাউ দাউ
নিশ্চল প্রস্তরীভূত নয় সচল তবু নিঃশব্দ
দিকে দিকে দেশে দেশে
তাঁর হৃদপিণ্ড লাফাতে শুরু করে

তিনি জোর করে সেই লাফানি বন্ধ করতে চান, আবার দৃপ্ত ভঙ্গিতে মরিয়া হয়ে সকলের ইচ্ছা পায়ে দলে দলে সটান দাঁড়াতে চান

কিন্তু কেবলি কেবলি
সেই নীরব মানুষ কেবল মানুষ
হাত উত্তোলিত নয়
অথচ চোখ ফসফরাস দাউ দাউ
নিশ্চল প্রস্তরীভূত নয় সচল তবু নিঃশব্দ
দিকে দিকে দেশে দেশে
তাঁর হৃদপিণ্ড লাফাতে শুরু করে
সমস্ত শরীরের লোমকূপ সব ফুলে ফুলে ওঠে মাথার চুল খাড়া
তিনি মনে মনে দেখেন
এদিক সেদিক যেদিক
কেবল মানুষ আর মানুষ
সেই নীরব মানুষ কেবল মানুষ
হাত উত্তোলিত নয়
অথচ চোখ ফসফরাস দাউ দাউ
আর সেই আগুনের শিখা লেলিহান তাঁকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসে
তিনি চীৎকার করে উঠতে চান
গলা দিয়ে স্বর বের হয় না
কারণ
স্বরভঙ্গ হয়েছে
তিনি উঠে বসতে চান
শরীর ভার বহন করতে পারে না
কারণ
শরীর বহাল নেই—অনড়
চোখ দিয়ে কড়া আদেশ দিতে চান
পার্ষদরা সে ভাষা বোঝে না
কারণ
দৃষ্টি জ্যোতি ম্লান হয়ে গেছে
হাত নড়ে না—পা চলে না—মুখ নড়ে না, শরীর অচল
তিনি অসহায় জড়ের মতো কেবল হয়ে থাকেন
আর মনে মনে দেখেন
এদিক সেদিক যেদিক

সেই নীরব মানুষ কেবল মানুষ
হাত উত্তোলিত নয়
অথচ চোখ ফসফরাস দাউ দাউ
আর আগুনের শিখা লকলকিয়ে এগিয়ে আসে তাঁর দিকে যেন এই মুহূর্তে সেই মুহূর্তে তাঁকে গ্রাস করবে জন্মের মতো
তিনি নিদারুণ ভয় পান, জীবনে এই প্রথম সত্যিকারের ভয়
এবং তখুনি বুঝে ফেলেন
পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে শত ওষুধ সেবা অস্ত্রোপচারে আর উজ্জীবিত করা যাবে না
তিনি অন্তিম সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন নীরবে
আর মনে মনে দেখেন
এদিক সেদিক যেদিক
সেই নীরব মানুষ কেবল মানুষ
হাত উত্তোলিত নয়
অথচ চোখ ফসফরাস দাউ দাউ
আর সেই আগুনের শিখা লকলকিয়ে এগিয়ে আসে
কেবলি এগিয়ে আসে
আরও এগিয়ে আসে, একেবারে তাঁর কাছে
আর তিনি এই প্রথম ভয়ে চোখ বুজে ফেলেন
আর খোলেন না।

দেহসরসী

সত্য ঘোষাল

কোন আদিযুগে মন্দার গিরির অত্যুচ্চ পার্বত্যলোকে ঘটেছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয় তার সঠিক সন তারিখ আজ অনবগত। কিন্তু একথা সর্বজনবিদিত যে, সেই বিপর্যয়ে স্থানচ্যুত পাহাড় আর বিদীর্ণ পার্বত্যপ্রকৃতির বিচিত্র জটাজটিলতা অতিক্রম করে সখী 'কংসাবতী'র সাথে সাথে বন্দিনী 'শীলাবতী' মন্দারশিখর-মালার সমস্ত হাস্যোজ্জ্বলতা সঙ্গে নিয়ে আলুলায়িত ঘন কৃষ্ণ অলকদামে নিজের অপরূপ নগ্নশোভা আবরিত করে নেমে এসেছেন এই অঞ্চলে শত শত বৈদূর্যমণির বিচ্ছুরিত জ্যোতির্ময়তা নিয়ে।

সেই মন্দার গিরি আজও আছে। শুধু আজ আর সেই চন্দ্রহসিত মায়াকাননে অলকাপুরীর অপ্সরীরা নেমে আসে না যৌবন-উৎসবে। অন্ধকার সেই গুহাতলে আজ আর সেকালের সেই বন্যশিকড়বিচ্ছুরিত দ্যুতিশিখা জ্বলে না, তার হিরণ্য-আভায় আজ আর উদ্ভাসিত হয় না সেকালের সেই চীরবাসা অর্দ্ধনগ্না রমনীরা সিংহশিকারী কিরাতের দল যাদের রাখত লুক্কায়িত করে। শুধু সেই প্রাচীন কিরাতের আসবাসক্ত মত্ত হাসি লোলুপ হয়ে বেজে ওঠে কংসাবতী আর শীলাবতীর নুড়ির ঠুন ঠুন করা স্বরে স্বরে।

প্রাচ্যভারতের সেই মন্দারখণ্ড আজ আর কলহাস্যমুখরিতা নিরাবরণা মোহিনীদের কণ্ঠস্বরে উচ্ছ্বসিত হয় না, সর্বনাশিনী উর্বশীরা আজ আর তার আশেপাশে বিশ্বামিত্রদের তপোবন সন্ধান করে ফেরে না। সভ্যতার শ্মশান এই মাঠ আর মাটির গৈরিকে কান পাতলে কিন্তু এখনও শোনা যায় সেদিনের বহু ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস। আলতো হাওয়ায় ভাসে আকন্দ ফুলের গন্ধ, বাঁশঝাড়ের ঘুণে ছিদ্র করা বেণুরন্ধ্র থেকে সেই এলোমেলো হাওয়ায় জাগে বেসুরো বাঁশীর সুর, আর বসন্তের বাতাসে আকুল ভাঁটু ফুলের বনে মরা মাটির স্বপ্নকামনার মতো রঙিন প্রজাপতির ছোপ লাগে। আজ আর কানে বাজে না চাপা হাসির শব্দ, বুনো ঝোপের ফাঁকে ঘোরে নেশাগ্রস্ত গিরগিটি। সেদিনের প্রেমের চাপা ফিসফিসানির মতো তালগাছের তলায় কদাচিৎ জাগে কালনাগের গর্জানি, হালকা মেঘের আবরণে ঢাকা ম্লান নক্ষত্রের মতো চকচক করে তার চোখ। পিঙ্গল কৃষ্ণতায় অভিশাপের ছায়া—জুনোর বক্র নয়নের মতো। বাদশাজাদীর চোখের

কোলে কালো সুর্মার মতো এ সেই চোখ যা এই ইতিহাসবিশ্রুত পথে থেমে-যাওয়া তীর্থযাত্রী রাজপুত সর্দার চন্দ্রকেতুর রক্তে দিয়েছিল নেশাধরা ঘুম আর নীড়ের কামনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল রুক্ষ, উত্তপ্ত, উদগ্র বুকের উদ্দাম যাযাবর হৃদ্‌পিণ্ড।

পাংশু তারারা তখনও আকাশে শাণিত হয়নি, রেড়ির তেলের প্রদীপের তলায় তীর্থযাত্রী সর্দারের ছাউনিতে নেমেছে স্বপ্নহীন ঘুম। ঝম্ ঝম্ করছে রাত। রোদ, বাতাস, আর বৃষ্টিতে সঞ্জীবিত, প্রথম বর্ষায় প্রাণ পেয়ে ওঠা নতুন লতার মতো চেহারা, ছিলে-টেনে-ধরা ধনুকের মতো প্রসারিত ভ্রূরেখা, আর নিস্তরঙ্গ কালোজলে হঠাৎ একটা পাতা উড়ে পড়ার মতো আলো-ভাঙ্গা হালকা ঢেউ খেলে যাওয়া চোখের মায়ায় বাঁধা পড়ল সর্দারের মরুপ্রাণ। সর্দারকে উপলব্ধি করতে হল, নিজের হাতে মানুষ মন্দির বানায়, নিজের হাতে ছেনি দিয়ে কেটে মনের মতো তৈরি করে বিগ্রহ, আর পুণ্য সঞ্চয়ে ও স্বর্গমানসে মাথা কোটে তার পায়ে; কিন্তু আসলে সে স্বর্গ সঞ্চিত হয়ে আছে সেই নীলহরিণী-নয়নার উন্নত দুটি বক্ষের নিটোল ভাস্কর্যে, যে মোক্ষ অর্জিত হয় শ্রোণিভারে অলসগমনা ক্ষীণমধ্যা মোহিনীর নীবিবন্ধমোচনে। যাযাবর সর্দারের মরুপ্রাণে লাগল স্থিতির ছোঁয়াচ। তিন রাত্রির বিশ্রামের স্থলের নতুন নাম হল 'চন্দ্রা'—সর্দারের নামে নাম। চারপাশের মানুষেরা ডাকল 'চাঁদা'। ঢেউ-খেলানো মাটির বুকে সেই চাঁদা আজও দাঁড়িয়ে আছে অবলুপ্তির এক করুণ ইতিকথার মতো। আজ আর স্বর্গ সঞ্চিত নেই বক্ষের যুগলে, আজ স্বর্গ লুটিয়ে আছে লালমাটির খরধারায়, সেখানে নতুন চষা মাটির মিষ্টি গন্ধে স্বপ্নসম্ভবা ধানের শীষ মঞ্জরীর ভারে ভেঙ্গে পড়ে, যেখানে মেঘে-ছাওয়া আকাশের সীমায় সীমায় একাকার হয়ে মেশে মেঘবরণ ধানের ক্ষেত।

কাকে দেখে ভুলেছিলেন চন্দ্রকেতু! কার বুকের কাঁচুলিবিহীন আঁচলে পেয়েছিলেন রাত্রির রহস্যের স্বাদ আর তারই নেশাধরা ঘুম! আজকের নিঃস্ব বিভাবরী সেদিনের সেই উন্মত্ত শর্বরীর সন্ধান রাখে না। নিশীথ রঙ্গমঞ্চের উপরে সেই খেলা দেখার জন্য রাত্রি ভিন্ন কেউ সেদিন জেগে থাকে নি। এলায়িত কেশে তিমির রাত্রি আর আর্দ্র ওষ্ঠে জলন্ত লালসা নিয়ে জেগেছিল সেই বহ্নিকন্যা। সবুজের কাঁকণপরা তার হাতের তালে তালে ফণা দুলিয়ে দুলিয়ে খেলা করে নির্জীব পরাজয়ে আত্মসমর্পণ করেছিলেন সর্দার চন্দ্রকেতু। তীর্থযাত্রা তাঁর সাঙ্গ হয়েছিল রাজ্যজয়ে, সে রাজ্যের রাজধানী আজকের চন্দ্রকোণা। আর সেই মায়াবিনীর অনপচয়িত নয়নাশ্রু আজও থমকে দাঁড়িয়ে আছে চন্দ্রকোণার অতন্দ্র চোখের তারায়—সে এক মজা দীঘি, 'জহরাপুকুর'।

চন্দ্রকেতু রাজার 'বারোতুয়ারী গড়ে'র ভাঙা ইঁটপাথরের টুকরোয় টুকরোয় নিশীথ চাঁদের ম্লান আলোয় দেখা যায় সেদিনের সেই নির্বাপিত দীপস্তম্ভের শিখা, অন্তঃপুরের পথে গোপনচারিণীর নিভৃত পদসঞ্চারে ঘাসে ঘাসে যেখানে জেগে উঠত নবতৃণাঙ্কুর, সূচীভেদ্য অন্ধকারে ক্বচিৎ বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত সর্পিল পথ, নিস্তব্ধ নিষেধসম মুক প্রহরী পালা বদল করত ঝিল্লিমন্দ্রে, মধ্যযামিনীর তোপ ধ্বনিত হত হর্ম্যচূড়ে। চাঁদের সেই অপলক দৃষ্টির তলে, ক্ষমাহীন সূর্যের আলোয় জরাজীর্ণ ভাঙ্গা ইঁট পাথরের জঞ্জাল, ভাঙ্গাচোরা জাঙ্গাল, বিশাল বাঁশ আর কাঁটাবন, স্বর্ণলতায় ছাওয়া লাটাবন, মনসা আর আকন্দের ঝোপের মাঝ দিয়ে ভাঙ্গা মন্দিরগুলি তাকিয়ে থাকে প্রেতপাণ্ডুর দৃষ্টিতে আর আকাশের আলিঙ্গনে বিবশার মতো নিশ্চল হয়ে শায়িতা থাকে জহরাপুকুর—তার রজত আভরণের গাত্রে তারার ঝিকিমিকি, তার উজ্জ্বল দেহের কোমল ভাঁজে ভাঁজে জ্যোৎস্নার চুম্বন, যামিনীর রভসে সে ক্লান্ত।

জহরাপুকুর আজ তার আতঙ্কপাণ্ডুর বিশুষ্ক বুকে গভীর এক হতাশা নিয়ে কালের প্রতীক্ষায় প্রহর গণনায় রত। আজও মধ্যরাত্রে কান পাতলে শোনা যায় কোনো সচকিত-নয়নার সন্তর্পণ গতিছন্দ, অকস্মাৎ শব্দসুরভিত হয়ে ওঠে রাতের অন্ধকার, বারোতুয়ারী গড়ের ভেতর থেকে ভেসে আসে নূপুরের নিক্বণ আর কঙ্কণের ঝংকার, দুরু দুরু করে কেঁপে কেঁপে ওঠে হৃদয়। দেখা যায়, না-বলা কথার আভাসের মতো নীলাম্বরের প্রান্ত আর কাজল চোখের নত পল্লবের বিস্ফারিত লজ্জা আর ভয়। দেখতে দেখতেই মিলিয়ে যায় সেই দ্বিধাভরা চলা। মনে হয়, নেমে যাচ্ছে এক অভিসারিকা গহনতলে—ডুবছে পায়ের পাতা, ডুবছে অলিখিত দুটি কবিতার মতো অলক্তসিক্ত লাজুক দুটি সুছন্দ পা, ডুবছে নিটোল জঙ্ঘা, ডুবছে ক্ষীণকটি, ডুবছে স্তনাগ্রচূড়া, ডুবছে মরাল গ্রীবা, ভাসছে বিস্ফারিত দুটি নলিন নয়নের নিষ্কলঙ্ক দুটি কালো তারা, আর ছড়িয়ে পড়েছে মেঘরঙে বোনা আকুল কেশের রাশি। দেখতে দেখতেই তাও তলিয়ে যায়, শুধু জহরাপুকুরের ক্লিন্ন জলরাশির ওপর সর্বত্রপ্রসারী হয়ে নিশীথিনী নিন্দিত চক্ষু দুটির অতলস্পর্শ চাউনিতে জ্বলতে থাকে দুটি নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখা—প্রত্যাশা আর প্রদাহ।

কিন্তু এতটুকু উষ্ণতা নেই সেই চাওয়ায়। ও দীপ কাছে টানতে জানে না, শুধু দূরে সরিয়ে রাখে। নিশীথ রাত্রে অজানা পথিক চমকে উঠেছে, ভয় পেয়েছে এই চির অভিসারিকাকে দেখে। তারা কেউ বোঝে না ওর কথা। শ্মশানের ধোঁয়াটে আকাশে নিষ্প্রভ নীহারিকাপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে থাকলে সেই

ভাষাতীত ভয় বুকের মাঝে গুমরে ওঠে। সেই ভাষায় কথা বলে 'জহরাপুকুর,' আর তার ঐ অশ্রুমুখী অনুশোচনা।

এ অশ্রু চন্দ্রকোণার। একূল ওকূল দুকূলনাশিনী অশ্রু। তবে উচ্ছ্বসিতা ঊর্মিমালার মতো নয়, এ হল অন্তঃসলিলা অনুরুক্তির অনিরুদ্ধ অন্তর্বেদনা। এ অশ্রুতে ঝরে মাধ্বী মধু। চন্দ্রকোণার মহাশ্মশানের আঁচলে এ অশ্রু মুছে যায় নি। বুঝি অত সহজে কিছুই মুছে যায় না মনের মুকুর থেকে। যে বস্তু নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বাইরের আগুনে, সেই বস্তুই বুকের আগুনে পুড়ে আরও উজ্জ্বল আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে চন্দ্রকোণার অশ্রুভারাক্রান্ত চোখ—জহরাপুকুর। সেই চোখের একটি চাউনিতে বিদ্যুৎ, আর একটি চাউনিতে অশ্রু। কালো সেই পল্লবের নীচে থমকে দাঁড়িয়ে আছে সেই বিয়োগান্ত কাহিনী। সেই কাহিনীর মালা নিয়ে জহরাপুকুর কান্নায় বিবশা।

তিমিরকেশজালে নিরাভরণ নগ্নকায়া আবৃত করে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে নেমেছিল রাত্রি চন্দ্রকোণার মহাশ্মশানে। তার হিমশীতল নগ্নদেহের নিবিড় আলিঙ্গনের মাঝে তলিয়ে গিয়েছিল দিনের চন্দ্রকোণা। আর এক নিবিড় যৌবনবতীর পীনোন্নত বক্ষে যুগযুগান্তরের নির্লজ্জ লালসা আর অনির্বাণ ক্ষুধা মেটাবার উপাদান খুঁজে পেয়ে তাকে আঁকড়ে ধরেছিল এক নির্মম পুরুষ। তলিয়ে গিয়েছিল সেই তিলোত্তমা.—কাঁচা মাংসের সেই অপরূপ ভাস্কর্য, আর কন্দর্প-বাণানলদগ্ধ এক যাযাবর মরুপ্রাণ। যুগল চক্রবাকের মতো ভয়ানক রকম জীবন্ত পাতলা চামড়া ঢাকা দুটি নিটোল মাংসপিণ্ডের মধুর পেষণে ডুবে গিয়েছিল সেই দেহসরোবরে।

চাঁদের আলোয় যখন চকচক করে জহরাপুকুরের জলরাশি, তখনই দেখা যায়, বলির পশুর মতো দৃষ্টি সাকীর মতো অতলস্পর্শ দুটি চোখে—তার উপর ঠিকরে পড়েছে বারোদুয়ারী গড়ের এক পাশব কামনার লাল আভা। দেওয়ালে কাঁপছে একটা ছায়া। ছায়ার চোখে দপ্ দপ্ করে জ্বলছে আগুন। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার লক্‌লকে জিহ্বা। সেই জিহ্বা ঐ সন্ত্রস্তা বলির পশুর সর্বাঙ্গ লেহন করে এগিয়ে আসছে গ্রাস করতে। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে এক অসহায় আকুতি,—"ছাড়ো, ছাড়ো, ছেড়ে দাও আমাকে।" সেই ক্ষীণ আর্তনাদ ছাপিয়ে ভারি থমথমে এক পুরুষ কণ্ঠে বাজছে সর্বনাশের নেশা,—যেন গাল ফুলিয়ে তুবড়ি বাঁশীতে সুর তুলেছে সর্বনিয়ন্তা সাপুড়িয়া। সুরের তালে তালে দুলছে বাসুকীর সহস্রফণা, বইছে বিষাক্ত ঝড়। সেই বিষের বিষক্রিয়ায় বিশ্বম্ভর ঘুমিয়ে আছেন অনন্ত নিদ্রায়—নাগেশের বিষনিঃশ্বাসের প্রমত্ত প্রভাবে সর্বাঙ্গ তাঁর নীল। সে

নীলাভায় মহাব্যোম নীলে নীল, কোটি গ্রহনক্ষত্র সেই হলাহলের নেশায় বাঁধা পড়ে দুর্নিবার প্রমত্ত গতিতে নিরবধি কাল নিজ কক্ষপথে আবর্তিত।

কিন্তু ক্রমাগত উঠছে মর্মন্তুদ আর্তনাদ ধরিত্রীর বুক থেকে, ছিন্নভিন্ন হতে চলেছে মহাব্যোমের নেশার প্রশান্তি। তাই বুকে যত জোর আছে সব উজাড় করে উন্মাদ সাপুড়িয়া ফুঁ দিল বাঁশীতে। কুণ্ঠিতা কান্নাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল মাটিতে। সেই ধাক্কায় জেগে উঠল শেষ প্রলয়ঙ্কর, বিষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। থরথর করে কেঁপে উঠল চন্দ্রকোণার আকাশ, হাহাকার করে কেঁদে উঠল চন্দ্রকোণার মাটি, আর মাথার ওপরে আকাশের বুকের গ্রহনক্ষত্রগুলো সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করল চূর্ণবিচূর্ণ হবার ভয়ে। বিষে বিষে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল বারোদুয়ারী গড় আর তার চারপাশ। নীরন্ধ্র অন্ধকারের বক্ষ ভেদ করে নিস্তব্ধ রজনী জুড়ে জেগে রইল শুধু দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ আর এক ক্ষীণ কণ্ঠ।

বাসনা আর বঞ্চনার রহস্যপূজার সেই নিভৃত আচারের সাক্ষী ঐ জহরাপুকুর —মৃত কালের শবদেহে তার তন্ত্রাসন। সেই আসনে বসেই নিমীলিত নেত্রে সে দেখেছে ঐ যৌবনযন্ত্রণার অবসান আর প্রশ্ন করেছে বলির পশুর মতো সন্ত্রস্ত দুই চোখে সে উদ্ধারের ব্যাকুলতা সে কী সত্য, অথবা মিথ্যা।

উত্তর পায় নি জহরাপুকুর। শুধু চোখ মেলে দেখেছে, বিবশা, বিস্রস্তা, দলিত দ্রাক্ষার মতো বিপর্যস্তা এক ক্ষতবিক্ষত জীবন্ত ভাস্কর্য শিবির থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে তারই শীতল স্পর্শে জুড়িয়েছে সর্ব জ্বালা। ঘননীল তার জলের বুকে আঁকা হয়ে গেছে কাজলাক্ষীর বিস্ফারিত দৃষ্টি, ক্ষীণ বুদবুদ তুলে সে গেছে মিলিয়ে গহনতলে। সেই বিষের জ্বালা নিয়ে সরোবর হয়ে গেছে 'জহরাপুকুর'। স্থানীয় ইতিহাস বলে এতেও শেষ হয়নি কালকূটের উৎক্ষেপ। রাজা চন্দ্রকেতুর ছেলে দ্বিতীয় চন্দ্রকেতু তারও বহু পরে সেই বিষের ঋণ পরিশোধ করেছেন জহরাপুকুরেরই তীরে বারোদুয়ারী গড়ে। আর তাঁর রাণীরা আক্রমণকারী কালাপাহাড়ের হাতে লাঞ্ছিতা হবার ভয়ে জহর পান করে ডুবেছেন জহরাপুকুরেরই গহন গভীরে।

অভিশপ্ত জহরাপুকুর সেই বিষের জ্বালা বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আজও, দেখেছে সেই বারোদুয়ারী গড়কে কেন্দ্র করে ভানবংশীয় রাজাদের রাজপ্রতাপ, দেখেছে তাদের পতন, দেখেছে বড়দার বিদ্রোহী শোভাসিংহের সহযোগী রঘুনাথ সিংহের উত্থান আর পতন। রাশি রাশি হাসিগুলিকে চোখের জলের মতো মেজে আর চোখের জলগুলিকে হাসির মতো মেজে ভাসতে আর ডুবতে দেখেছে জহরাপুকুর, দেখেছে সেই চোখগুলিকে তার শক্তিহীন প্রাণের বেদনাবিমূঢ় দৃষ্টিতে।

আজও শেষ হয় নি সে দেখার। জহরাপুকুরের হৃদয়ের তলদেশ থেকে কয়েক বছর আগে জেলেরা কুড়িয়ে এনেছিল এক মূর্তি—সরোবরের জলে অর্দ্ধনিমজ্জিত দেহ এক স্নানার্থিনী নায়িকার নাগপাশবদ্ধ মূর্তি। তার দুচোখের দৃষ্টিতে উদ্ধারের জন্য সন্ত্রস্ত আকুলতা; ক্ষমা চায়, মিনতি জানায়, সাহায্য খোঁজে—সব অহংকার শেষ করে দিয়ে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করে মুক্তি। দেখে দেখে মনে হয়েছিল এ অসত্যের রূপও কত সুন্দর। জহরাপুকুর সঙ্গে সঙ্গে একথা মনে করিয়ে দিয়েছিল, সুন্দর হতে পারে কিন্তু সত্য নয় এই রূপ। সত্য বলে কিছু নেই এই পৃথিবীর কোন রূপের মধ্যে, শুধু মিথ্যা হয়ে যাওয়াই একমাত্র সত্য। নাগের আলিঙ্গনে আবদ্ধ নায়িকা মূর্তির উদ্ধারের ব্যাকুলতা মিথ্যা, সত্য শুধু আত্মসমর্পণের গোপন ইচ্ছার পুলক।

কারা ?

তুলসী মুখোপাধ্যায়

গর্ভবতী ধরণীকে ছুঁয়ে নিয়ে
রোজ কারা দুর্ভিক্ষের বীজাণু ছড়ায়
শিশুর স্বাস্থ্য ও হাসি গুম খুন ক'রে
শরীর সাজায় কারা বিশিষ্ট আতরে
বন্ধুর চালচিত্র রোজ কারা ফুটো করে
অসম্ভব ধীর স্থির ঠাণ্ডা মাথায়
সিঁদকাঠি দিয়ে কারা চুরি করে
প্রতিবেশী স্বজনের ছায়া
কারা এই অবিরাম ঘাতকবাহিনী—
কারা তার বশংবদ বিশুদ্ধ সেবক ?
বস্তুত এইসব সনাক্তকরণে
সামান্য দর্পণ ভিন্ন অন্য কোনো গোয়েন্দা লাগে না!
অথচ পথে ঘাটে ট্রামে বাসে কাছারি অফিসে
আমরা সবাই এই ঘাতকবাহিনীর বিরুদ্ধে সোচ্চার
সংঘবদ্ধ আস্তিন গোটাই প্রসিদ্ধ ধিক্কারে!

ঘাতকেরা বাড়ি ফেরে আরো মিহি মানুষের ঠাটে।

কয়েক টুকরো

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

১

তোমারও যে দুঃখ আছে, সঙ্গোপনে কাঁদতে ইচ্ছে হয়—
একথা জানে কি কোনো ফুল?
একথা নিশ্চিত জানে, রাতের রজনীগন্ধা,
　　　　　　গোধূলির নিঃসঙ্গ বকুল।

২

ঘর থেকে রোজ বাইরে এলেই যা হোক একটা রাস্তা পেয়ে যাই,
ঝমঝমিয়ে হঠাৎ নামে বৃষ্টি।
ঘরের মধ্যে প্রহর গুনতে সময় চ'লে যায়,
থমকে থাকে দুচোখের এই দৃষ্টি।

৩

যেদিন পুকুরে চাঁদ খানখান ভেঙে গিয়েছিল
সেদিন ভীষণ দুঃখ পেয়েছিলে তুমি,
　　　　　　পুকুর ছিল না স্থির সেইদিন মধ্যরাত্রিবেলা।
আজকেও আশ্চর্য চাঁদ শালের জঙ্গল ঘেঁষে হেঁটে আসছে
　　　　　　শাদা এক ভালুকের মতো,
　　　　　তাকে নিয়ে খেলা যায় 'চাঁদ চাঁদ' খেলা?

প্রজ্ঞাজাতীয় কবিতাকল্প

প্রভাত চৌধুরী

আমি কোন নির্ভরতা শিখে নিতে সূর্যসন্দর্শনে যাব
নাকি সামুদ্রিক শামুকের কাছে শিখে নেব সেই নির্ভরতা
যেমত শিখেছি আগে কলসবৃক্ষের কাছে শিকারপদ্ধতি
পথপরিক্রমা যথা শিখিয়েছে মধ্যরাতে নক্ষত্রের বিপুল সংসার
অথবা কিছুই শিক্ষণীয় নেই জেনে সূর্যসন্দর্শনে যাব
গরুড়পক্ষীর মতো জন্মলগ্নে শুধুমাত্র খাদ্যের সন্ধানে।

অপেক্ষা করে আছি

দীপেন রায়

ডুবো জাহাজের মতো হারিয়ে যাওয়া মাটির
অন্ধকারের ভেতর থেকে
মাথা তুলতে চাইছি তোমার সামনে,
তোমার নির্বাপিত মুখের ওপর আলো ফেলে
দেখতে চাই
আমাদের প্রতিবিম্ব ফোটে কিনা।
গভীর নিচের দিকে একেবারে কাদায়
মাটির শিকড়ের ভেতর যেন লুপ্ত
তবু জাগতে চাইছি চতুর্দিকের চাঙর ভেঙে
একেবারে হৃদয়ের ভেতর—শহর আর
শহরের চারপাশে
আধা শহরের মতো বস্তি নিয়ে যে মাটি
দাঁড়িয়ে আছে
তার ধাতু নির্মিত সবল প্রত্যাঘাতের মুখোমুখি
যে তার শববাহকের জন্য কাজ দেবে আমাদের
আর যা দিয়ে আমাদের চোখের ওপর থেকে আমরা
পর্দার মতো আবরণ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসব
জলজলে উজ্জ্বল পোশাক আঁটা বিয়ের বরের মতন
আর ঢুকব মাথা উঁচু ক'রে যেন কনের বাড়িতে বরযাত্রী
একেবারে সরাসরি মাটি থেকে বিয়ের পিঁড়িতে।

আমাদের লুপ্ত অস্তিত্বের আর প্রাচীন পিতামহদের
মাথার খুলিতে
গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষের যে নকল দাঁত
আর তার সীমানার মধ্যে আমাদের লুপ্ত অস্তিত্বের যে বিষাদ
ঘৃণার মুখে বারুদ বসিয়ে তোমার অবরুদ্ধ ক্রোধে
তাকে গুঁড়োতে চাই।

শুধু তুমি তোমার আবাল্যবাহিত ওই তামার
গঙ্গাজল পাত্র
আর দ্বিধাহীন আত্মসমর্পণের কোষাকুষি থেকে
উঠে এসো
আমরা অপেক্ষা করছি ···

তাকে ছুঁতে

শুভ বসু

বিকেলের হাওয়া খেলা করে তার চুলে।
তার মুখে রক্তগোধুলির ম্লান
সুদূরতা ভীড় ক'রে আছে।
তাকে দেখি—আমার অন্তরে ব্যথা বাজে।
একদিন নির্বিকার জীবনের নিশ্চিত পচন
আমাদের স্বপ্ন আর সংকল্পের সাধ
আমাদের শিল্প আর সৃষ্টির নমুনা
টেনে নেবে অমোঘ নিয়মে, তবু
তার মুখে জ্যোৎস্না আর তমিস্রাবিজয়
খরত্রাণ আর গাঢ় অরূপ লাবণ্য ছবি আঁকে।

আমার বাসনাগুলো
তাকে ছুঁতে ছুটে যায়
সময়ের দাঁতে কাটা সমুৎসুক বাতাসের মতো,
অন্ধকারে এলোমেলো নক্ষত্রের দিকে ছুটে যায়
মাটি মানুষের মুখ মেলা মিছিলের দিকে যায়

পাদপের সুবিশাল ছায়ার আশ্রয়ে
খুঁজে ফেরে গাঢ় তার যথার্থ তৃষ্ণাকে।

ব্রাত্যস্তোম

বীতশোক ভট্টাচার্য

শব স্পর্শ ক'রে ছিলে, মরা ছুঁয়ে আছ ;
সবই অস্তিত্বের থাকা, শূন্যতায়, বাঙলাভাষা সমস্ত বদল
ক'রে দেবে একে একে, তার শুরু এ আদিম বিছানা পাল্টানো :
'আ প্রথম স'রে এসো, ও করুণ, কাছে'—
কিছুতে হয় না কিছু, মনে পড়ে স্বরতোলা আঁৎকানো কীর্তন
প্রসূতিসদন দিয়ে বেঁকে যেতে—অন্ত্রছেঁড়া যন্ত্রণায় বধির ধাত্রীরা
শিশুদের ব্যথা দিত : কাঁদো, কাঁদো, আজীবন কাঁদো ;
তোমার শ্মশানে যেতে দেরি হ'ত, সারারাত থমকে থেমে যেত
গানের বিনুনি খাতা, ভোঁজটিল, পাথরভাঙার
মৃন্ময় মুঠোর শব্দ : এতো বেশি বোবা স্বপ্ন ব'য়ে
ঘুমন্ত দাবির জয়ে সাড়ার কী অর্থ আছে, তার চেয়ে দলবলে নেমে যাওয়া ভালো
মৃত্যুর বিদ্রোহে, বহু বাহুর উত্থান থেকে দূর
উন্মুখ উদ্‌গ্রীবা থেকে······আকণ্ঠ তুলেছে গলা, তবু তত ডুবে গেছে গন্ধক, বুদ্‌বুদ
স্তব্ধতায় অন্ধকারে ফেটে একী বাঙলাভাষা, পিপাসু ঠোঁটের
স্পৃহা টের পেয়ে জল ঘাটে ঘাটে নেমে যায়, শবপোড়া মরাদাহদলে
তরল কলহস্রোতে কথা ভাঙে অর্থহীন, ব্রাহ্মণের ক্রোধ থেকে অধৈর্য চণ্ডাল
জন্ম নিল একদিন, লবণ চপেটাঘাতে কষটে আঁট ফেনাচাটা মাটি
ছুঁড়ে দিয়ে গেল তাকে, সেই থেকে অন্তর্জলি, স্পর্শ ক'রে আছি
নিজেকে বরং······

ভালো এই ঝুলে যাওয়া, যে গহ্বর ভরাট জরায়ু
তারই মধ্যে ঘুম ভ্রূণ, স্মৃতি স্মৃতি গর্ভের স্ফারিত
জড়ানো লতার জাল, ঠেলি হাত, পৌঁছে যাওয়া পাতার বিবরে
একরাত······: একদিন মনে পড়ে এরকমই দুঃস্বপ্ন তাড়ানো
কাঠের দেওয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়েছুঁয়ে স'রে যেতে প্রাচীরের পাশে :
নগরপথের থেকে থেমে গেছে ঘণ্টাস্বর, তবু লগ্ন গলা—
অন্ধকারে কার আঙুল, চাপে ঘাড়, পরিচ্ছন্ন খোঁড়ে
আমানি খাওয়ার গর্ত, ক্ষতে জিভ চলে যায় শর্তের নির্মাণ

আজও সেই শপ্‌শপ্‌—শ্মশানকুকুর ওঠে ছাউনিতে, প্রেমের স্বাক্ষর
জিভে চেটে ছিঁড়ে খায়, নখে ফেঁড়ে চৌকোনো চাদর
শূন্য টেনে আনে গোল, তারপরই ল্যাল্যা জিভ, হাঁকাল দুচোখ,
দশ চান্দ্রমাস জোড়া চিৎকারের থেকে নেমে এসে
সটান দুবুকে থাবা, এ কী ভার, এতো পাপ—চুপ ······
মুখের উপরে জাগি সারামুখে ঝ'রে যায় বৃষ্টির প্রস্রাব ;
যেন ছোঁচ ছাঁড়ির ঢোল, ভিখিরি কুঠের হাতে তীব্র তামা তোলে
পেশাদার মেটে বোল : ভোঁতা প্রেরণায় যত মুছে যাও, ক্ষয়ে
যাও আজ তত ভীতিবিহ্বল সমাজে
দাঁত নড়ে যায় ভুলে, ভ্রান্তিবশে চেপে বসা টাকের শূন্যতা—
টকাটক শব্দ ওঠে ; শিল্পী হও প্রথামতো, ভোলো
মৃত্যুর পাতিলগুলো, চলচ্ছবি টুকরো কুরে তুলে
রহস্য প্রকীর্ণ ক'রে তারপর বিক্ষত পশম
ছেঁড়ো ও শরীর থেকে, দেহ থেকে, গা থেকে—বলো না
সকল সন্দেহ থেকে ··· ··· অসংশ্লিষ্ট বাঙলাভাষা থেকে,
কথায় কথায় যেন ভীতু মাই থেকে নিজে ব্যক্ত স্তনান্তরে
ভিজে যায়, দাঁতে দাঁত, জিভের সন্ধানে।

ফ্রেসকো '৭৫

রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়

১

কাছাকাছি বিষণ্ণ সম্ভোগ এক ধর্মের কল বাতাসেই নড়ে গেল
আমি এখন ঘুম থেকে উঠে তারই ঘণ্টাধ্বনি শুনে চলেছি।

২

অদ্ভুত মানানসই নীলবর্ণ গো-গো পরে হেঁটে যাচ্ছে দিন
সকাল থেকে আমি তার পিছু পিছু পদচিহ্ন চোখে তুলেছি।

৩

আজকের ভাঙারোদে ঝাঁকে ঝাঁকে বালিহাঁস পরিত্রাহি উড়ে গেল
নদীতে বুক ডুবিয়ে আমি টিগারে গুলির ধর্ম জপে চলেছি।

৪

আমার আমাদের পথিকের বুকে বুকে কি নিদারুণ শীত এসে গেল
পাতা ঝরা পাতা নিয়ে কে কাকে ডাকে, ও মিঞা, হিমানী কমাও!

শ্যামকল্যাণ

তপতী রায়

ধানের গমের ক্ষেত পার হ'য়ে পাহাড়ের ঢেউ।
আলের উপর দিয়ে কখনও কি কেউ
পায়ে পায়ে ঐ পথে গিয়েছে উধাও?
বৈকালী কোমল রোদে যদি যেতে চাও—
আমি তবে সঙ্গ দিতে পারি—
ভ'রে নিয়ে মৃদু কথা, অন্যমনা আলাপের ঝারি।

সবুজের কত রঙ! এটা বুঝি কচি কলাপাতা?
ওখানে বোতল ভাঙা ঐ প্রগাঢ়তা,
আরও দূরে চেয়ে দেখো আধো সোনা ধানে
কৌতুক হাসির মতো পান্নার ঝিলিক ঐ হানে।
কিংবা বল শত শত টিয়ে
পথ ভুলে গিয়ে
শান্ত হয়ে যেন বসে আছে—
সুতনুকা পৃথিবীর গৈরিক বুকের কাছে কাছে।
চ'লে যাব একদিন শরৎ যখন অবশেষ
না হ'ল চড়ুইভাতি, এই হবে বেশ
সবুজের ছায়া-পড়া চোখ দিয়ে দেখা—
দিগন্তে আলোর মীড়—মনে তারি স্বরলিপি লেখা।
আমি ঠিক যাব পাশেপাশে
ফসল-সুরভি হাওয়া দুজনেই ভ'রে নেব শ্বাসে।

বর্বরদের জন্য প্রতীক্ষা

সি. পি. কাভাফি

আমরা কেন ভিড়ের মধ্যে প্রতীক্ষা করছি ফোরামে ?
বর্বরদের আজ আসার কথা।
সিনেট-ভবনে কেন কাজ নেই ?
সিনেটার-রা যদি আইনই না বানান তাহলে কেন বসে আছেন ?
কারণ বর্বরদের আজ আসার কথা।
কোন আইন সিনেটার-রা এখন তৈরি করবেন ?
যখন বর্বররা আসবে তারাই তৈরি করবে আইন।

কেন আমাদের সম্রাট সকালবেলা এত তাড়াতাড়ি উঠেছেন ?
কেন শহরের বিশাল তোরণের নীচে তিনি বসে আছেন
সিংহাসনে, কেনই বা তিনি মুকুট পরেছেন ?
কারণ বর্বরদের আজ আসার কথা।

সম্রাট প্রতীক্ষা করছেন তাদের
নেতাকে সম্বর্ধনা দেয়ার জন্য। আসলে তিনি
দেবেন তাকে মানপত্র, যেখানে উল্লেখ করেছেন
নানান নাম আর পদবীর কথা।

কেন আমাদের দুজন কনসাল বাইরে বেরিয়েছেন,
তাঁরা আর প্রেয়েটার-রা কেন
পরেছেন আজ লাল পোষাক, বুটিদার পোষাক ?
কেন তাঁরা পরেছেন ব্রেসলেট, আর দামী দামী পাথর,
আর আঙুলে জমকালো আংটি ?
কেন তাঁরা নিয়ে চলেছেন তাঁদের দামী লাঠি
রূপোর নব আর সোনালি মাথা আশ্চর্যভাবে খোদা ?
কারণ বর্বরদের আজ আসার কথা ;
এমন জিনিষ দেখে তাদের তাক লেগে যাবে।

কেন সুবক্তারা আজ সকল দিনের মতন আসেন নি
তাঁদের সুভাষণ শোনাবার জন্য, যা তাঁরা বলতে
চান শোনাবার জন্য ?
কারণ বর্বরদের আজ আসার কথা ;
আর তাদের ক্লান্ত করে কথা আর কথা, বক্তৃতা।

কেন এই অস্বস্তির হঠাৎ আরম্ভ
আর বিভ্রান্তির। কি ভাবনাজর্জর মানুষের মুখ।
কেন রাস্তা আর পার্ক দ্রুত খালি হয়ে যাচ্ছে,
আর সবাই ভাবনাতাড়িত বাড়ি ফিরে চলেছে ?
কারণ রাত্রি এসেছে, এবং বর্বররা আসেনি।
কতক লোক এসেছে সীমান্ত থেকে ;
তারা বলেছে বর্বররাই আর নেই।

এখন আমাদের কি হবে বর্বরদের ছাড়া ?—
তারা তো ছিল এক ধরনের সমাধান সমস্যার।

অনুবাদ : বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

তরী হতে তীর। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, কলি-১২। কুড়ি টাকা।

আমাদের দেশে যাঁরা প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও মননশীল বিদ্বান ব্যক্তিরূপে পরিচিত, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-পি তাঁদের অন্যতম। বিশেষত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে তিনি সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত। স্বাধীন ভারতে প্রজাতান্ত্রিক গণতন্ত্রী সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকেই তিনি সংসদের একজন নামকরা সদস্য এবং ইংরাজী ভাষার একজন অদ্বিতীয় বক্তা রূপে খ্যাতিমান। সুতরাং এমন একজন মননশীল ব্যক্তির জীবনের অভিজ্ঞতা, পরিবেশ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত যে কোনো চিন্তাশীল পাঠকের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করবে। তাঁর লেখা 'তরী হতে তীর' তাঁর নিজের বক্তব্য অনুসারে "স্মৃতিচারণ" বা আত্মজীবনী না হলেও, তিনি যে "অনেক বিচিত্র মানুষ" ও "বহুবিধ ঘটনার প্রত্যক্ষে" এসেছেন, সেগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি তো নিজেই অধিষ্ঠিত এবং সেদিক থেকেই এই বইয়ের মুল্য বা গুরুত্ব সর্বাধিক। অবশ্য ঢাক পিটিয়ে তিনি নিজেকে প্রচার করেন নি বা কবি নবীন সেনের মতো 'আমার জীবন'ও রচনা করেন নি। কিন্তু অনেক আত্ম-চরিতের চেয়ে তিনি বেশি সাফল্য অর্জন করেছেন অপ্রত্যক্ষ নায়ক রূপে কিংবা 'তরী হতে তীর' অভিমুখে যাত্রার আত্মগোপনকারী মাঝি রূপে।

হীরেন মুখোপাধ্যায় পুরাপুরি এই শতাব্দীর মানুষ এবং পুরাপুরি কলিকাতা শহরের লোক। সুতরাং বিংশ শতকের মানুষ হিসাবে এই শতাব্দীর প্রচণ্ড বৈপ্লবিক আলোড়ন যেমন তাঁর চিন্তা ও মননশীলতাকে অদ্ভুতভাবে নাড়া দিয়েছে, তেমনি জন্মাবধি কলিকাতা মহানগরীর বাসিন্দা হিসাবে তিনি পল্লীপ্রধান জীবনের অবর্ণনীয় দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার থেকে বহু দূরে অবস্থান করে আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোকে নিজেকে উদ্ভাসিত করার সুযোগ পেয়েছেন। অবশ্য এ দিক থেকে তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য তাঁর জীবনকে শতদলের মতো প্রস্ফুটিত করার প্রেরণা জুগিয়েছে। তাঁর পিতা শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং পিতামহ তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় উভয়েই ছিলেন বহু গুণান্বিত কৃতবিদ্য লোক—যে পরিবারে সাংবাদিকতা ও বাগ্মীতা ছিল একটা স্বাভাবিক সম্পদের মতো এবং এই সম্পদের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী

নিঃসন্দেহে 'তরী হতে তীর'-এর তীক্ষ্ণধী লেখক। দুর্ভাগ্যক্রমে যদিও তিনি জন্মাবধি "ক্ষীণ দৃষ্টি"র লোক, তবু সৌভাগ্যক্রমে তাঁর বিদ্যানুশীলন ও বিশ্ববীক্ষণ তাঁকে নতুন দৃষ্টি দান করেছে, যে দৃষ্টি তাঁকে ভারতবর্ষ সহ সারা পৃথিবীর শোষিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত মানুষের মুক্তিযজ্ঞের সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছে। অবশ্য এই 'সংগ্রাম' আজও প্রধানত তাঁর বিশ্বাস ও তত্ত্বমূলক চিন্তার বিতর্কের মধ্যে আবদ্ধ—বিপ্লবের বাস্তব রূপায়ণের কঠিন তীরভূমিতে পৌছুবার সম্ভাবনা এখনও আমাদের দেশের জনগণের দৃষ্টির বাইরে।

হীরেনবাবুর এই পুস্তকের সবচেয়ে বড় বিস্ময় এই যে, একমাত্র নিজের স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে তিনি কার্যত ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত ভারতের মুক্তি আন্দোলনের এবং সেই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত অগণিত মানুষের এক অভিনব রেখাচিত্র তুলে ধরেছেন, আর সমসাময়িক ঘটনাবলির ঘাত-প্রতিঘাতকে চলমান ইতিহাসের কৌতূহলজনক অধ্যায়ে পরিণত করেছেন। সুতরাং একথা সত্য যে, আলোচ্য গ্রন্থ হীরেনবাবুর আত্মজীবনী নয়, বরং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মুক্তি আন্দোলনের মর্মবাণীরূপেই এর আসল বৈশিষ্ট্য জনগণকে চমৎকৃত করবে।

প্রেসিডেন্সী কলেজ তথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত কৃতী ও মেধাবী ছাত্র রূপে তিনি ভবিষ্যতের যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা উদ্রেক করেছিলেন, সেই সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হল বিলাতে প্রবাসকালীন শিক্ষাকালে—যখন পৃথিবী-বিখ্যাত মনীষীদের তিনি সংস্পর্শে এলেন কিংবা তাঁদের চিন্তাধারায় অভিষিক্ত হলেন। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, বার্ণার্ড শ, রাসেল প্রভৃতি দিকপালগণের প্রতি অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধার মধ্যেই তিনি আবদ্ধ রইলেন না। মার্কস, লেনিন, স্ট্যালিনের বৈপ্লবিক মশালের আলোতেও তাঁর হৃদয় ও মস্তিষ্ক উদ্ভাসিত হল। সুতরাং যে হীরেন্দ্রনাথ একদা তরুণ বয়সে মহাত্মা গান্ধীর অবর্ণনীয় সম্মোহনে মুগ্ধ হয়ে ছয় বছর ধরে নিরামিষ খেয়েছিলেন ও খদ্দর পরেছিলেন, তিনিই পরবর্তীকালে একদিন টালিগঞ্জের এক মেটে ঘরে বে-আইনী ঘোষিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নায়ক পি সি যোশীর কাছে কমিউনিজমের দীক্ষা নিলেন এবং তার পর থেকে আজ পর্যন্ত বহু ঘটনা ও বহু স্তর পার হয়ে এসেও কমিউনিজমের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা বিন্দুমাত্র কমেনি। অন্যদিকে তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে গোঁড়ামিও কিছু নেই। তিনি যেমন গান্ধীজী ও নেহরুজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের এবং কংগ্রেসের ত্রুটি ও দুর্বলতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন, তেমনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও জনযুদ্ধের

প্রশ্নে কিংবা আগস্ট বিদ্রোহ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নীতি, পদ্ধতি ও কার্যাবলি বিষয়ে ভুল ও ত্রুটিগুলির প্রতিও স্পষ্ট ইঙ্গিত কিম্বা নিজের সংশয় প্রকাশ করেছেন। একজন স্বাধীনচেতা বুদ্ধিজীবীর পক্ষে এটাই স্বাভাবিক এবং সে জন্যই স্ট্যালিন প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

"বছর পনের আগে, সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেস (১৯৫৬) স্ট্যালিনের একনায়কত্বের যুগে বহু অপকর্ম ও অপরাধ সম্পর্কে যে চাঞ্চল্যকর আত্মসমালোচনা দেখা দিয়েছিল, তখন শুধু যে ইতিহাসে বিপ্লবের ভূমিকা নিয়ে ভাবতে হয়েছে তা নয়। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে স্বদেশবাসীর কাছে আবার একটা দেনা বাড়ল—তাদের জানাতে হবে কেন নিজেদের কমিউনিস্ট বলতে আমাদের লেশমাত্র অনুশোচনা নেই।"

অর্থাৎ এই সমস্ত সত্ত্বেও কমিউনিজমের প্রতি হীরেনবাবুর নিষ্ঠা মরে যায় নি। সুতরাং ফরাসী বিপ্লবের সময় অনুরূপ অনাচার ও অপরাধের কথা স্মরণ করে তিনি লিখেছেন—"আবহমান কাল ধরে ন্যায়, মুক্তি, ধর্ম প্রভৃতির নামে অনাচার কম হয় নি। বিপ্লবী আতিশয্য ও অপকর্মও ঘটে এসেছে প্রায় যেন প্রাকৃতিক বিধানেরই নির্দেশে—কিন্তু তা বলে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ইত্যাদি মন্ত্রের মূলগত মহত্ত্ব ম্লান হয় নি।"

স্বদেশের ও বিদেশের অজস্র বিশিষ্ট ও বিখ্যাত মানুষ এবং সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী ও নেতাগণ এই পুস্তকে ভিড় করেছেন এবং হীরেনবাবু অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে প্রায় প্রত্যেকের গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ করেছেন, তা স্মরণ রাখবার মতো। এমনকি, যাঁরা বর্তমান যুগে প্রায় বিস্মৃত তাঁদেরকেও তিনি নতুন জীবন দান করেছেন। যেমন—সাংবাদিকশ্রেষ্ঠ সত্যেন মজুমদার এবং সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি ও প্রগতি লেখক সংঘের অন্যতম প্রবর্তক সুরেন গোস্বামী প্রভৃতি। এ ছাড়া ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘ, সারা ভারত শান্তি সংসদ ইত্যাদি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যের উল্লেখ আছে। এই পুস্তকের ইনডেক্স বা নির্দেশিকার উপর চোখ বুলালেই যে কোনো পাঠক উপলব্ধি করবেন হীরেনবাবু কত বিচিত্র ও অজস্র মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন এবং তাঁদেরকে কেন্দ্র করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আন্দোলনের একটা সুস্পষ্ট রেখাচিত্র তুলে ধরেছেন। গ্রন্থকার ব্যক্তিগত জীবনে যেমন অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং রুচিবোধ সম্পন্ন, তেমনি তাঁর লেখার স্টাইলও স্বতন্ত্র, তীক্ষ্ণ এবং মননশীলতায় উজ্জ্বল। এই স্টাইলের মধ্যে ভাবাবেগের রোমান্টিকতা নেই, কিন্তু আছে বক্তব্যের স্পষ্টতা ও বুদ্ধির দীপ্তি।

শম্ভু মিত্রের আবৃত্তি

কবিতা বাঙলাদেশের প্রধানতম শিল্পপ্রকরণ হলেও, আবৃত্তি, কেন যেন, তেমন অভ্যস্ত শিল্প মাধ্যম হয়ে ওঠে নি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই প্রকাশ-মাধ্যমটিকে বিস্মৃতি থেকে উদ্ধার করেছেন এবং আবৃত্তির একটি নিরিখও তৈরি হয়ে যায় তাঁর আবৃত্তিচর্চায়, অনিবার্যতই—এ সত্য সত্ত্বেও।

কবিতার অন্তঃস্থিত অর্থময়তার সার্থক প্রতিচিত্র রচনা, দুটি ভিন্ন সত্তার মতো সেইক্ষণে ক্রিয়াশীল শ্রুতি ও মনের অন্বয়েই মাত্র সম্ভব। কবিতার প্রতিটি শব্দই অনিবার্য, মাত্র আভিধানিকতার অতীত। এই অন্তর্নিহিত সত্য আবৃত্তিকারের দায়িত্ব বাড়ায় বহুগুণে। মাত্র ধ্বনির সামান্য বৈচিত্র্যে, অর্থের প্রাত্যহিকতা থেকে শব্দকে কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপনায় শম্ভু মিত্র শ্রুতি ও মনের অন্বয়ের দুরূহ কাজটি করেন, অনায়াসেই। তাঁর আবৃত্তিতে কবিতার সঙ্গে কবিও প্রকাশিত হন সমগ্র জীবনবোধসহ। উচ্চারণ, স্বরক্ষেপ, আয়াসহীন কণ্ঠনিয়ন্ত্রণ, নব নব প্রতিবেশ সৃজন, আবৃত্তিতে এক ধরনের কাব্যিক নাটকীয়তা ও সংগীতময়তা সৃষ্টি তাঁর আবৃত্তির বৈশিষ্ট্য।

শম্ভু মিত্র তাঁর অননুকরণীয় বিশিষ্টতা ও মৌলিকতাসহ, আবৃত্তিতে, একক রবীন্দ্র-অনুসারী। তাঁর সামান্য কটি আবৃত্তি-ই রেকর্ড হয়েছে। তাঁর একক আবৃত্তির রেকর্ডের চারটি কবিতাই রবীন্দ্রনাথের। তিনটি রেকর্ডে ছড়ানো অন্য চারটি আবৃত্তির দুটি জীবনানন্দ দাশের কবিতা—বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটি করে। আবৃত্তিকালে, কবিতার পশ্চাৎভূমি হিসেবে, কবির জীবনবোধকেই শম্ভু মিত্র স্থাপনা করেন। অথবা হয়তো কবিকে উপলব্ধির কারণেই আবৃত্তি তাঁর অপরিহার্য মাধ্যম। এবং তাই, ভিন্ন কবির জন্য তিনি ভিন্ন আবৃত্তি-আঙ্গিক সন্ধানী। জীবনানন্দের দুটি কবিতা, 'আট বছর আগের একদিন', 'কুড়ি বছর পরে', পরপর শুনে স্বতই একথা মনে আসে। দুটি আবৃত্তির মধ্যে সময়ের ব্যবধান দীর্ঘ। 'আট বছর আগের একদিন' আবৃত্তিকালে জীবনানন্দের কবিতার আবৃত্তি-আঙ্গিক বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় নন। তাঁকে যেন নির্ভরশীল মনে হয় প্রচলিত আবৃত্তিকারুতে—তাতেও তিনি অনন্য। "দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরণ / মরণের সাথে লড়িয়াছে" বা "সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের" মতো দুটি একটি ক্ষেত্রে তিনি নিজের

দ্বিধান্বিত বৈশিষ্ট্যেও মৌলিক। "মধু—আর মননের মধু" বা "আমাদের ক্লান্ত করে, ক্লান্ত—ক্লান্ত করে" এ রকম চরণে শম্ভু মিত্র খানিকটা প্রথাগত পদ্ধতিই অনুসরণ করেন। অথচ ধ্বনিমাত্রার সামান্য যোগবিয়োগে 'কুড়ি বছর পরে' হয়ে উঠেছে একেবারেই মৌলিক, বিশিষ্ট ও শিল্পসফল।

'কুড়ি বছর পরে' আবৃত্তিকালে বোধহয় জীবনানন্দের কবিতার আবৃত্তি-আঙ্গিক ও সেই সঙ্গে জীবনানন্দের কাব্যের একটি ভাষ্য পেয়ে যান শম্ভু মিত্র। "অথবা নাইকো ধান ক্ষেতে আর" এই পংক্তির শূন্যতা, শীত আর শিশিরের জলের স্মৃতিময়তা শম্ভু মিত্রের কণ্ঠে নতুন ভাবে উচ্চারিত হয়। প্রায় দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে "জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার/তখন হঠাৎ যদি মেঠো পথে পাই আমি তোমারে আবার" বলতে গিয়ে "তখন"-এর পর মুহূর্তস্থায়ী বিরতি, "হঠাৎ"-এর আ-ধ্বনিতে সংযোজিত হয়ে চকিতে পোষিত সেই আকাঙ্ক্ষাকে মুক্ত করে দেয়—যার পূরণ নেই। পরবর্তী স্তবকে, দুটি শব্দ উচ্চারণের মধ্যবর্তী বিরতিকালের ক্রম-বৃদ্ধি ঘটিয়ে, খাদের গভীরে নেমে যেতে যেতে, তীব্র বিষণ্ণ স্বরক্ষেপে আকাঙ্ক্ষা আর বঞ্চনার তীব্রতা এক নাটকীয় নিম্নস্বরে চলে যায়। পংক্তিগুলোকে ভাঙেন, প্রতিটি পর্বকে, পর্বাংশকে—প্রবহমানতা অব্যাহত রেখেই, কণ্ঠ খাদে নামতে থাকে নির্দিষ্টক্রমে কবিও কবিতার সকল তীব্রতাসহ, সহসা, "কুড়ি বছরের পরে তখন তোমারে নাই মনে"-র ঈষৎ দ্রুত উচ্চারণ কি সেই স্মৃতিময় যন্ত্রণার বৃত্ত থেকে মুক্তি পেতেই? "পরে"-র 'এ'-ধ্বনি দীর্ঘ হয়ে যায় সময়ের সেই দীর্ঘতা বোঝাতেই? আবৃত্তির শেষ দুই পংক্তিতে "সোনালি সোনালি চিল" মাত্র এই তিনটি শব্দের উচ্চারণের শেষে জীবনানন্দের নিত্য অনুষঙ্গী অমোঘ অনিবার্য নিষ্ঠুর প্রকৃতি শম্ভু মিত্রের কণ্ঠে অন্বিষ্ট বাচন খুঁজে পায়।

বিষ্ণু দে-র কবিতার আবৃত্তির দুরূহতার প্রচার 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ'-এ শম্ভু মিত্র নস্যাৎ করেছেন। কবিতার ঋজুতাকে বরাবর কণ্ঠে ধরে রাখেন, স্তোত্রগানের উদাত্ত-অনুদাত্ত উচ্চারণের প্লাবন নামে। কবিতার অন্তর্গত বিস্ময় আত্মজিজ্ঞাসা আত্মআবিষ্কার মুহূর্তে মুহূর্তে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। কবি ও আবৃত্তিকারের জীবনদর্শন, হয়তো সংগ্রামেরও, সম্ভাব্য সামীপ্যের কারণেই কি বিষ্ণু দে-আবৃত্তিতে শম্ভু মিত্র সংশয়শূন্য? আত্মজিজ্ঞাসায় শুরু হয়ে পরক্ষণেই কবিতা উত্তরিত হয় আত্ম-উন্মোচনে, সমকালীন বুদ্ধিচর্চার স্ববিরোধিতা আর পশ্চাদ্‌গামিতা উদ্‌ঘাটনে আর সমাপ্ত হয় জীবনের দর্শনের প্রাণধারণের ইত্যর্থক স্তোত্রপাঠে। "শিহরায় দেওদার বনে"-এর প্রায় অন্তঃস্থলে নেমে যাওয়া

কণ্ঠ, "তোমার আকাশ দাও, কবি, দাও/দীর্ঘ আশি বছরের" দীর্ঘায়িত "দাও" "কবি" ও আরো দীর্ঘায়িত "দাও"-এর প্রার্থনায় সম্বোধনে যে মুক্তি পায়, তাই-ই, ঋজু নেমে যেতে থাকে। সেই ঋজুতা মিশে থাকে "নিভৃতছায়ায় চৈত্রে শালবনে" থেকে উচ্চারিত স্তোত্রে।

আবৃত্তির শেষে শম্ভু মিত্র প্রথম পাঁচ পংক্তির পুনরাবৃত্তি করে একধরনের 'আবৃত্তির নাটকীয়তা' সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। ইতিপূর্বে তৃতীয় স্তবকের শেষ দুটি পংক্তি বাদও দিয়েছেন এবং তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকের পার্থক্য রাখেন নি। (এম. সি. সরকার প্রকাশিত 'একুশ-বাইশ' সংকলনে তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকের পার্থক্য নেই। শম্ভু মিত্র সম্ভবত এই পাঠই অনুসরণ করেছেন, যে কারণে "আনন্দভৈরবী" নয়, "অমরভৈরবী" ও "গড়ে যাই জীবনের···" বদলে "পড়ে যাই" বলেছেন)। কবিতাটির দুটি পংক্তি বাদ দিলেন কেন শম্ভু মিত্র—এর দ্বারা কি আবৃত্তিতে কোনো নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে? এমত সম্পাদন কি অপরিহার্য ছিল? এ ধরনের সম্পাদনা কি সঙ্গত?

শম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাথের 'চিরায়মানা' কবিতাটিরও সম্পাদনা করেছেন। কিন্তু কবিতার গঠন যে তাতে পাল্টে যায়! কবিতাটি পাঁচ পংক্তির পাঁচটি স্তবকে গঠিত। প্রথম তিনটি স্তবকের প্রথম পংক্তিটি পঞ্চম পংক্তি হিসেবে ফিরে এসেছে। প্রথম দুই স্তবকে শম্ভু মিত্র এই পুনরাবৃত্তি করেন নি। কিন্তু তৃতীয় স্তবকে চতুর্থ পংক্তিটি বাদ দিয়ে পঞ্চম পংক্তির পুনরাবৃত্তি বহাল রেখেছেন। কবিতাটির এমত কোনো ভিন্ন পাঠের সন্ধান আমি পাই নি। তিনটি স্তবকেরই পঞ্চম পংক্তিটি বাদ দেবার যুক্তি অগ্রাহ্য হয়—তৃতীয় স্তবকের পুনরাবৃত্তিতে। তৃতীয় স্তবকের প্রথম পংক্তির "হেরো গো"-র এলায়িত সম্বোধনের ধ্বনি মাধুর্য সৃষ্টির কারণেই কি সেখানে এই পুনরাবৃত্তি? এই একই কারণে "বাঁকা" শম্ভু-বাবুর উচ্চারণে হয়েছে, "বাঁকাই"—যদিও কবিতাটি পাঁচ মাত্রার ছন্দে লিখিত?

'চিরায়মানা', 'উদাসীন', 'শেষ বসন্ত' ও 'নিমন্ত্রণ' কবিতা চারটি শম্ভু মিত্র বেছেছেন এক অবিচ্ছিন্ন চিত্ররচনার প্রেরণায়। সহজ আহ্বানে যার শুরু, গোধূলি অন্ধকারে অন্তরিত প্রেমিকার স্মৃতিতে তার সমাপ্তি।

'নিমন্ত্রণ' শম্ভু মিত্রের আবৃত্তিতে এক অনবদ্য সংযোজন। কথোপকথনের আপাতসরল ভঙ্গিমায়, কবিতার প্রথমাংশের সহাস কৌতুকছটা শ্রোতাকে স্পর্শ করে। সামান্য স্বরনিয়ন্ত্রণে "রক্তে জমানো যেন অশ্রুর ফোঁটা" মুহূর্তে ভিন্নতর প্রতিবেশ সৃষ্টি করে। কবিতার ছবি শ্রুতিচিত্রে বিধৃত হতে হতে, সমগ্র আবৃত্তিটির চালচিত্র হয়ে যায়। দ্বিতীয়াংশে, "সেই কথা ভালো, তুমি চলে

এসো একা" থেকে যার শুরু, গোধুলির ক্রমাগত অন্ধকারে, চামেলি ফুলের গন্ধভরা হাওয়ায়, একক সন্ধ্যাতারার সাক্ষ্যে; কোমল গ্রীবায়, রেশম চিকন চুলে, কর্ণমূলের শ্বেতকরবীর গুচ্ছে, কুঙ্কুম ফোঁটায়, স্মৃতি অবয়ব পেতে থাকে। আর স্মৃতিবহনের বেদনা, অণুমাত্র অলংকরণ ব্যতীতই, মাত্র কণ্ঠের কারুকাজে, শুদ্ধ চিত্রে পরিণত হতে থাকে। ধ্বনিবৈচিত্র্যসৃষ্টির প্রতি, অলংকরণের প্রতি, যে অনুরাগ কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর কবিতায় আরোপিত মনে হয়, কিছুটা কৃত্রিমও, তা পরিহার করেও তো তিনি নিয়ত বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারেন। তাঁর কণ্ঠের স্বাভাবিক সংগীতময়তাই তো প্রতি ক্ষণে নব নব বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে ফেলে।

সমরেশ রায়

আমাদের বিজন

'নবান্নে'র স্রষ্টা—গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোহিত বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গীত-নাটক-একাডেমি এওয়ার্ড পাবার সংবাদে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ পুরস্কার অবশ্য অনেক আগেই পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। বিজনকে আমার অন্তরঙ্গতমদের মধ্যে একজন হিসাবে আজ তাকে আমার প্রসঙ্গের মধ্যে আনছি। এবং সে প্রসঙ্গ তার চরিত্র, জীবনদর্শন ও শিল্পীসত্তাকে জড়িয়ে হাজির হচ্ছে আজ আমার সামনে। মনে পড়ছে, আনন্দবাজার পত্রিকার দপ্তর থেকে ফুসলিয়ে যখন আমরা বাইরে নিয়ে আসতাম তাকে, তখন মনে হত জীবনের এক উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গকে নিয়ে চলেছি খুব বড় করে মশাল জ্বালাবার কাজে লাগাবার জন্য। সুন্দর স্বাস্থ্যবান সুশ্রী যৌবনোচ্ছল চেহারা—যা জিম্‌নেশিয়াম বা কুস্তির আখড়ায় ভালোই মানিয়ে যেত—বিজনের ছিল। এবং ছিল জীবনকে আস্ত আকাঁড়া জানবার ও দেখবার উদগ্র আগ্রহ। এই জীবনকে—তার আনন্দ হতাশা দারিদ্র্য সংঘর্ষ এবং কৌতুকপ্রদ দিক নিয়ে সমগ্রভাবে দেখবার ও অনুভব করবার এক অসামান্য শক্তি তার দেখেছি। পথ চলতে, রেস্তোরাঁয়, পার্কে, গণ-মিছিলে, ছেচল্লিশের আড্ডায়—সব সময় তার সজাগ চোখ কান আমাদের সংবাদ পরিবেশন করে চলত। যে সংবাদ সাহিত্য ও নাটকের জনক। 'নবান্নে'রও আগে 'জবানবন্দী'। এবং তারও আগে—১৯৪১-৪২এ তার অভিনয় প্রতিভার অমোঘ পরিচয় পাই। প্লেটোমন্য মাইমশিসের যে গভীর ও মৌল আবেগকেন্দ্র যা বিজনের নাট্যায়নের ভিতর আবিষ্কার করেছিলাম তা তার ব্যবহারে আচরণে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ভিতর থেকেই প্রকাশ পেত। এই উচ্ছল আবেগমথিত জীবনটাই তার নাট্যায়নের বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। সে গ্রন্থগত বিদ্যার খুব ধার ধারত না। সে বলত এই নিয়ত আবর্তিত চলচঞ্চল জীবনই আমার গুরু। এই দৃষ্টিভঙ্গি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির একেবারে মূলে গিয়ে পৌঁছয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—১৩৫০-এর মহামন্বন্তরের দিনগুলিতে পথচারী বিজনের, উৎসুক অথচ উদগ্র মমতায় আবিষ্ট চোখদুটো নির্মম মানুষের হাতে গড়া এই দুর্ভিক্ষের যে মর্মন্তুদ চিত্রটা দেখতে পেয়েছিল, তার নাট্যরূপায়নে—'নবান্নে'—একটা নূতন যুগ, একটা নূতন আন্দোলনের সৃষ্টি করতে পেরেছিল। তার অনুভবের সততা, তার অন্তর্ভেদী দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা

একটা অমোঘ অস্ত্র হয়ে দাঁড়াল—চোরাকারবারী, চালচোর ডালচোরদের, হোর্ডারদের বিরুদ্ধে। পার্টির হাতে এল একটা জোরালো অস্ত্র যা অন্য কোনও উপায়ে আনা শক্ত হত। শুধু শ্লোগান নয়, পার্টির তথাকথিত জ্বালাময়ী ইস্তাহার নয়—বিজন আনল শত্রুঘ্ন শক্তির সংহতি শোষণের বিরুদ্ধে, ধনতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে। বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটল আঙ্গিকের। পশ্চাৎপটে এল হেসিয়ান—সাধারণ চটের পর্দা। উপকরণ-বিরল খাপখোলা তলোয়ারের মতো স্টেজের প্রয়োগ নূতন নাট্যযুগের সৃষ্টি করল। অন্তরঙ্গ সহকর্মীদের ভিতর শত্রু মিত্রের কথাও অনিবার্যভাবে আসে। এবং অন্যান্য অনেকেই বিজনের সহকর্মী হিসাবে এসেছিলেন যাঁদের অনলস সহযোগী কর্মকাণ্ড গণনাট্য আন্দোলনকে প্রবলতর করতে সাহায্য করেছিল। 'জবানবন্দী', 'নবান্ন'-এর পর একে একে আরও অনেক নাট্যসৃষ্টি বিজন করে গেছে। সকলে হয়তো ভুলে গেছে—আমি ভুলি নি তার গীতিনাট্য 'জীয়নকন্যা'র কথা। এই গীতিনাট্যকে এখনকার কালের শ্রোতাকে ভালোভাবে তৈরি করে শোনানো উচিত। আরও অনেক বিজনের নাটক সযত্নে পূর্ণ সহযোগিতায় মঞ্চস্থ হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে আমি মনে করি। 'দেবীগর্জন', 'চলো সাগরে', 'গর্ভবতী জননী' আবার ভালোভাবে মঞ্চস্থ করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। তার কাছ থেকে নবনবতররূপে নাট্যসৃষ্টি পাবার আশা আমাদের এখনও আছে।

যে বৃদ্ধ আধপাগলা গ্রামপ্রধান সর্বস্ব খুইয়ে "আমি ফিরে এসেছি" বলে গ্রামে ফিরে এল নবান্নের উৎসবে যোগ দেবার জন্য, তার অবিস্মরণীয় "ব্যথার কথা ভুলে যাও" বলতে বলতে বেরিয়ে যাওয়া এখনও এ যুগের নাটকীয় স্মৃতির উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে অম্লানভাবে জ্বলজ্বল করছে।

বিজন ভট্টাচার্য সঙ্গীতনাটক একাডেমির দ্বারা পুরস্কৃত হওয়ায় সমস্ত গণনাট্য আন্দোলনই পুরস্কৃত হয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

সম্রাজ্ঞীর ভূমিকায়

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ধরে এগোলে সেই গলিটা। হঠাৎ ঢুকলে চমকে যেতে হয়। রাশিকৃত বেত আর ব্যাকারির মধ্যে ছড়িয়ে বসে আছে কিছু মেয়ে-পুরুষ। তৈরি হচ্ছে বিচিত্র সিং-দরজা, হাওড়ার পুল, পানসি নৌকো, ক্রিকেট খেলোয়াড়—আরো কতো কী! আসলে পুজোমণ্ডপ, বিয়েবাড়ি ইত্যাদি সাজাবার উপকরণ। এটা ডোমপাড়া। এই শিল্পক্ষেত্র ছাড়িয়ে সোজা পশ্চিম মুখে এগিয়ে চলুন, আরো একটা কাদামাখা সরু গলিতে পৌঁছে যাবেন—যেখানে ন্যাংটো শিশু রুগ্ন ভিখারিনী জীর্ণ মুদিখানায় ভিড়, হাড্ডিসার পানওলার রসিকতা ও নিষিদ্ধ পল্লীর অশ্রাব্য খেউড় মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। কোনোক্রমে গলিটা পেরোতে পারলেই ডান হাতে এক প্রশস্ত আঙিনার পারেই স্থির দাঁড়িয়ে আছে সেই বুড়ো নড়বড়ে তিনতলা বাড়িটা। এককালের শৌখিন মেট্রো প্যাটার্নের বাড়ি, বড় বড় হরফে যার গায়ে নাম খোদাই ছিল একদা, এখন অস্পষ্ট হয়ে গেলেও 'ইন্দুভিলা' বুঝতে অসুবিধে হয় না। নিচু ঢোকবার দরজার পাশে পাথরের ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে ফুললতাচিত্রিত কিংবদন্তিশ্বেরা সেই আশ্চর্য নাম—মিস্ ইন্দুবালা। মলিন হলেও সেই রহস্যময়ী নারীর মৃদু হাসির মতোই আকর্ষণীয়। ভিতরে ঢুকতে গেলে দু-মুহূর্ত চোখে অন্ধকার তীব্র হবে। একটু সয়ে গেলে কিন্তু সেই ভাঙা সিঁড়িটা চোখে পড়বে যেটা বেয়ে সাবধানে দোতলায় উঠতে পারলেই সম্রাজ্ঞীর দরবার। বারান্দার এক কোণে একটা বড় খাঁচায় কটা মুনিয়া পাখি দাপাদাপি করছে, তার পাশে দুটো বালতিতে জল তোলা। অন্য পাশে এক সুন্দরী বউ সকালের স্নান সেরে টকটকে লাল সিঁদুরের টিপ পরে রান্নাঘরে কুটনো কুটছে। তার পাশে বসে একটা ছোট ছেলে দুলে দুলে মুখস্থ করছে হামটি ডামটি স্যাট অনে ওয়াল—। আপনাকে দেখতে পেলেই সুন্দরী রমণীটি হাতের কাজ ফেলে নম্র গলায় জিগ্যেস করবে—ওঁর সঙ্গে দেখা করবেন তো? একটু দাঁড়ান।

এবার সঙ্গীত-নাটক অ্যাকাডেমি কর্তৃক পুরস্কৃতা সংগীতসম্রাজ্ঞী ইন্দুবালা, রাজবালা-মতিলাল বসুর একমাত্র কন্যা ইন্দু, জন্মেছিলেন পাঞ্জাবের অমৃতসরে ১৩০৫ সালের ১৯ কার্তিক। এখান থেকেই গল্পের শুরু। সে কালের প্রখ্যাত গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের মালিক মতিলালবাবু ওরফে প্রোফেসর বসুর নাম তখন

ভারতবর্ষের পথেপ্রান্তরে ছড়িয়ে আছে। তাঁরই সুযোগ্যা শিষ্যা ও সহধর্মিনী রাজবালাও স্বামীর দলের সেরা মেয়ে খেলুড়ে। তাঁর 'প্ল্যাষ্টিক গার্ল' খেলা সেকালের অজস্র ক্রীড়ামোদীর অভিনন্দনে ধন্য হয়েছে।

সার্কাসের বিদ্যে ছাড়াও মতিলাল বসুর ধ্রুপদ গানেও দখল ছিল বেশ। অবসর সময়ে রাজবালাকেও তিনি কিছু কিছু সংগীতে তালিম দিতেন। কী একটা তুচ্ছ সাংসারিক কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একদিন মতান্তর হওয়ায় মতিলাল বসু রাজবালাকে ত্যাগ করলেন। এক কথায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া অথবা স্ত্রী বর্তমানে আরো দু-চারটি দারগ্রহ করা যে সে কালে নিন্দনীয় ছিল না, আজ তা সবাই জানেন। তিন বছরের মেয়ে ইন্দুর হাত ধরে তাই সেদিন যখন এই সহায়হীনা যুবতীকে পথে নেমে আসতে হল তখন তার কাছে মমতা, সহানুভূতি ও আশ্রয়ের সমস্ত দরজা বন্ধ। কেননা সার্কাস-করা মেয়ে কি ঘরে তোলা যায়? পরিচিতেরা অচেনা হয়ে গেল হঠাৎ এবং আত্মীয়রা অনাত্মীয়। অনায়াসে যে মেয়ে দড়ির ওপর সাইকেল চালিয়েছে, ট্র্যাপিজের উপরে মরণদোলনার খেলা দেখিয়েছে, বাঘের মুখে হাত ঢুকিয়ে অজস্র দর্শকের করতালি কুড়িয়েছে, সেই মেয়ে আজ তিন বছরের শিশু কন্যার হাত ধরে সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউর পথের পাশে দাঁড়িয়ে সার্কাসের দর্শকের মতো অজানা ভয়ে রুদ্ধশ্বাসে কলকাতা দেখছে। রাতের অন্ধকার নেমে আসতে আর দেরি কত? হঠাৎ অর্ধপরিচিত এক দয়ালু ভদ্রলোক ঠাঁই দিতে নিয়ে এলেন তাঁকে রূপোগাছিতে, যা পরবর্তীকালে রামবাগান নামে কুখ্যাত হয়েছে। উদ্দেশ্য যখন বুঝতে পারলেন রাজবালা তখন আর পালাবার পথ নেই। সার্কাসের কোনো কঠিন খেলাতেই যে হার মানেনি, জীবনের এই খেলা সাময়িক তাকে থমকে দিলেও, অসামান্য জেদী এই রমণীকে হারিয়ে দিতে পারল না শেষ পর্যন্ত। যে শরীর এবং সংগীত জীবনের অঙ্গ হিসেবে একদা বেছে নিয়েছিলেন রাজবালা, ভাগ্যের চতুর খেলায় সেই কণ্ঠের গান আর শরীরের সৌন্দর্য তাঁর জীবিকা হল। নিজের যে পবিত্ররক্তে কন্যার জন্ম দিয়েছেন, জেদ চেপে বসল ফুলের মতো করে তাকে বড় করে তুলতে হবেই। সেই থেকে শুরু হল রাজবালার জননী আর দ্বিচারিণী দুই মনের নিঃশব্দ সহাবস্থান।

এই পর্যন্ত গল্প বলে অতিবৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী থেমে গিয়েছিলেন হঠাৎ। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। জানালার ফাঁক দিয়ে ছিটকে আসা পড়ন্ত বিকেলের ম্লান তির্যক আলোর দিকে চেয়ে কি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস পড়ল? চোখের কোণে যেন দু-ফোঁটা জল জমেছে। বললেন, সে কালের সেই পরিবেশ সমাজব্যবস্থা

আর মানুষের নিষ্ঠুরতার কথা চিন্তা করে সেদিনের সেই অসহায় মহিলা, আমার মা-কে কি আজ ক্ষমা করা যায় না ?

রক্তে ছিল গান। পরিবেশ তাতে উৎসাহ জোগাল আরো। ফলে বালিকা-বয়সেই কণ্ঠে রনরনিয়ে উঠল সুর। সেকালের মস্তবড়ো ওস্তাদ প্রখ্যাত সারেঙ্গি-বাদক গৌরীশঙ্কর মিশিরজীর কাছে নাড়াবাঁধা হল একদিন আনুষ্ঠানিকভাবে। তারপরে গহরজান বাঈ, কালী মিশির, এলাহী বকস্, জমিরুদ্দিন খাঁ ওস্তাদের কাছে তালিম নিয়েছেন। মায়ের কাছে যে বাঙলা গানের প্রেরণা পেয়েছিলেন তা সার্থক রূপ নিল কাজী নজরুল ইসলামের সান্নিধ্যে এসে।

মায়ফিল-মুজরো-বাগানবাড়ির গানে যখন বিপুল নাম ছড়িয়ে পড়েছে ইন্দুবালার, তখন ডাক এল রেকর্ড কোম্পানি থেকে। প্রথম রেকর্ড—"ওরে মাঝি, তরী হেথা বাঁধবো না আর আজকে সাঁঝে" গানেই বাজার মাৎ। সে হল ১৯১৬ সালের কথা। তারপর থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত একটানা রেকর্ড। অতঃপর রয়ালটি সংক্রান্ত মতান্তর এবং রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ। তারই মধ্যে শ-চারেক রেকর্ডের গান লোকের মুখে মুখে ফিরছে।

ওদিকে ততক্ষণে রেডিও কোম্পানি খোলা হয়েছে সম্ভবত ১৯২৬-২৭ সালে। অতএব ইন্দুবালাকে চাই-ই। উদ্বোধনের পরের দিনই হারমোনিয়াম কোলে তুলে মাইকের সামনে গান ধরতে হল। তারপর থেকে বছর চার-পাঁচ আগে চলৎশক্তি নষ্ট হবার পূর্ব পর্যন্ত গাইতে হয়েছে নিয়মিত।

শুধুমাত্র কণ্ঠশিল্পী হিসেবেই থেমে রইলেন না ইন্দুবালা, ততদিনে মঞ্চে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছেন অভিনেত্রী হিসেবে। তখন কতই বা বয়স ? চব্বিশ কি পঁচিশ। পেশাদার অভিনেত্রী হিসেবে স্টার থিয়েটারেই হল হাতেখড়ি। অপরেশ মুখোপাধ্যায় নির্দেশক, প্রধান অভিনেতা দানীবাবু, নায়িকা ইন্দুবালা, নাটকের নাম 'নসীরাম'। তারপর থেকে মনমোহন থিয়েটার, জুপিটার, মিনার্ভা, কালিকা, শ্রীরঙ্গম...কোনো থিয়েটারই প্রায় বাদ পড়েনি। অহীন্দ্র চৌধুরী থেকে নীতীশ মুখার্জি কিংবা শিশিরকুমার থেকে মহেন্দ্র গুপ্ত অথবা নির্মলেন্দু লাহিড়ী থেকে ছবি বিশ্বাস—সকলের সঙ্গেই সম্রাজ্ঞীর মর্যাদা নিয়ে অভিনয় করে গেছেন ইন্দুবালা।

কিন্তু একটানা থিয়েটার করার সময় কোথায় ? ততদিনে যে চলচ্চিত্রের যুগ এসে গেছে রমরমিয়ে। ইন্দুবালাকে চাই! প্রথম ছবি 'যমুনা পুলিনে'। কাহিনী তুলসী লাহিড়ী, সংগীত ধীরেন দাস, নির্দেশক ছিলেন প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী এবং নায়ক ধীরাজ ভট্টাচার্য। তারপর থেকে শুধু বাঙলা নয়, হিন্দী,

মারাঠী, তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া এমনি বিভিন্ন ভাষার প্রায় শ-দেড়েক ছবিতে একটানা অভিনয়ের পর বিরতি।

ইন্দুবালা—আঙুরবালা—কমলা ঝরিয়া—এই তিন প্রবীণা সংগীতশিল্পীকে নিয়ে তিন কন্যা নামে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র নির্মাণ উপলক্ষে প্রায়ই তাঁর কাছে যেতে হত। দেখেছি—এ গল্প ফুরোতে চায় না। এই কান্নাহাসির দোল-দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা হঠাৎ রদ্দুরে নিশির শিশিরবিন্দুর মতো কখনো সখনো ঝিকিয়ে ওঠে। রোগ শয্যায় সাতাত্তর বছরের জীর্ণ শরীর নিয়ে আজ একাকী শুয়ে আছেন যিনি—যৌবনের দিনগুলি নানান রঙের প্রজাপতি হয়ে কি তাঁর চার পাশে উড়ছে না? একদা যৌবন তাঁকে সম্রাজ্ঞীর সিংহাসনে বসিয়েছে, সংগীতের দরবারেও এসেছেন সম্রাজ্ঞীর মুকুট পরে। আজও বসে আছেন স্মৃতির রাজ্যপাট সাজিয়ে সেই সম্রাজ্ঞীর ভূমিকায়। কে তাঁকে হার মানাবে? রাষ্ট্রীয় সম্মাননা তো তারই অভিজ্ঞান।

শ্যামল ঘোষ

আমার চোখে মলিনাদেবী

কম করে হলেও পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। স্টার থিয়েটারের নতুন নাটকে একজন নায়িকার প্রয়োজন হয়েছিল। তখনকার মঞ্চ-মালিক সলিলকুমার মিত্র মহাশয়ের পিতৃদেব ৺উপেন্দ্র কুমার মিত্র মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: নায়িকা খুঁজছেন? মলিনাকে দিয়ে সে কাজ চলে? শুনে বিস্মিত হলাম। বিস্ময়ের কারণ: স্টারে তখন সপ্তাহের প্রতিটি দিন অভিনয় হত। এবং মলিনাদেবী তখন সিনেমার ব্যস্ততম নায়িকা। তাঁর অবকাশ কোথায় থিয়েটারে অভিনয় করবার? উপেন্দ্র মিত্র মহাশয় সিনেমা-টিনেমা দেখতেন না। তাঁর ধারণা, তিনি ডাকলেই মলিনা এসে থিয়েটারে যোগ দেবেন। ডেকে পাঠালেন মলিনাদেবীকে। সেইদিনই সন্ধ্যার পর মলিনা দেবী স্টার থিয়েটারে হাজির। ভূমিষ্ঠ হয়ে মিত্র মহাশয়ের পায়ের ধুলো নিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে যা বললেন, তার সারমর্ম: তাঁর কাছে তিনি ছেলেবেলায় কাজ করেছেন। এতদিনেও তিনি যে মলিনাকে ভোলেন নি, তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন সে জন্য মলিনার জীবন

ধন্য হয়ে গেছে। আপাতত সিনেমার কতগুলি চুক্তিপত্রের শর্ত তাঁকে এমনভাবে বেঁধে রেখেছে যে ষোলআনা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি থিয়েটারে নামতে পারছেন না। এর পর মিত্র মহাশয় তাঁকে যখনই ডাকবেন, তিনি হাজির হবেন। এখন পারছেন না বলে তাঁর পরিতাপের অন্ত নেই। মলিনাদেবী বারবার ক্ষমা চেয়ে এবং উপেনবাবুর আশীর্বাদ নিয়ে বিদায় হলেন। যাবার সময় আমাকে যখন তিনি নমস্কার করলেন, প্রতিনমস্কার করতে ভুলে গেলাম অপরিসীম বিস্ময়ে। লক্ষজনচিত্তজয়ী চিত্রযাদুকরীর এত সৌজন্য! প্রাচীনের প্রতি এত শ্রদ্ধা!

অনেক বছর পরে আর একদিনের কথা মনে পড়ে। মলিনাদেবী তখন মঞ্চে বেশ কয়েকখানি নাটকে অভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেছেন। 'নাট্যাধিরাজ্ঞী' রূপে অভিনন্দিত হয়েছেন। একবার একটি সম্মিলিত অভিনয়ে (ঠিক মনে নেই, হয় 'চরিত্রহীন', না হয় 'চন্দ্রশেখর' নাটকের সম্মিলিত অভিনয়) তাঁকে অংশগ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করতে আমি নিজে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। আমাকে সমাদরে ওপরে নিয়ে গেলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। গিয়ে দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি ছবি ফুল দিয়ে সাজানো, ধূপধুনোর গন্ধে চারদিক ভরে গেছে। সদ্য-স্নাতা মলিনাদেবী একপিঠ খোলাচুল, পরনে গরদের শাড়ি, পূজারিণীর বেশে সহাস্যে সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমার প্রস্তাব শুনে হাত জোড় করে বললেন: এবার আমাকে ক্ষমা করতে হবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী নিয়ে একখানি নাটক অভিনয়ের দুঃসাহস করেছি। দিনরাত্রির ধ্যানধারণা এখন আমার কেবল ঠাকুরের চরণচিন্তা। দুশ্চর তপস্যায় ব্রতী হয়েছি। মনকে এখন আর অন্য কোনো কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারব না। শুনেছি বিনোদিনী শ্রীচৈতন্য অভিনয়ের একমাস আগে থেকে হবিষ্যি করতেন। আমিও এখন প্রতিদিন শুদ্ধাচারে থেকে গঙ্গাস্নান করি, হবিষ্যি করি, ঠাকুরের পূজাভোগ দিয়ে তারপর ঠাকুরের লীলাভিনয়ের মহড়া দিই। আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন, এখন অন্য কিছুতে মনকে বিক্ষিপ্ত না করে যেন সাধনায় উত্তীর্ণ হতে পারি। শ্রদ্ধান্বিত বিস্ময় নিয়ে ফিরে এলাম। পরবর্তীকালে সবাই জানেন মলিনা সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

ঐ নাটক প্রথম মঞ্চস্থ হবার বহু বৎসরের মধ্যে মলিনাদেবী অন্য কোনো নাটকে অংশগ্রহণ করেন নি। ঐ নাটকই ছিল তাঁর ধ্যান, ঐ নাটকের অভিনয়ই ছিল তাঁর পূজা।

সারাটা জীবন তিনি পূজাই করে এসেছেন। পূজা বই কী? অভিনয়ে এত নিষ্ঠা আমি খুব কম শিল্পীরই দেখেছি। মলিনা-গুরুদাস সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমিও বাঙলা ও বাঙলার বাইরে অনেক জায়গায় অভিনয় করতে গেছি।

ব্যবস্থাপনা দেখে অবাক হয়েছি। শিল্পীরা নিজের হাতেই নেপথ্যের সব কাজ করছেন মলিনাদেবীর তত্ত্বাবধানে। মলিনাদেবীকে দেখেছি নিজের হাতে সিন ঠেলতে, পোষাক গোছাতে, তবলাবাঁয়া হারমোনিয়াম নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দিতে। নাট্যসম্প্রদায় নয়, যেন একটি নাট্যাশ্রম। আশ্রমবাসীরা সবাই নিজের হাতে সব কাজ হাসিমুখে সমাধা করছেন। খাওয়াদাওয়ার সময় তো মলিনাদেবী স্নেহময়ী সংঘজননী। সবাইকে নিজের হাতে পরিবেশন করছেন। সে যেন এক আনন্দের হাট।

ইদানীং মলিনাদেবী মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়েন। একেবারে শয্যাশায়ী না হলে ঐ অসুস্থ দেহেও একদিনও অভিনয়ে বিরতি নেই। মলিনাদেবীর ছোট মেয়ে রুনু বড়ালকে সেদিন বলেছিলাম, "আর কেন? এই বার মাকে বিশ্রাম নিতে বল।" রুনু ভুরু কপালে তুলে বলল, "ওরে বাবা, কে বলবে সে কথা! পারেন তো আপনি বলে দেখুন না!" আমরা বললে, ছেলেমানুষের মতো ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেন। বলেন, "যতদিন বাঁচি অভিনয় করব। অভিনয় করতে করতেই যেন মৃত্যু আসে। তার চেয়ে পরম সুখ আর আমার কিছু নেই।"

সংগীত নাটক অকাদমি কর্তৃক এই নাট্য-পূজারিণীর সম্মাননায় আমরা সকলেই সম্মানিত।

মহেন্দ্র গুপ্ত

অ্যাঙ্গোলার বিজয়ে নতুন দিকচিহ্ন

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার সাঙাতদের সমস্ত শক্তি চূর্ণ করে অ্যাঙ্গোলার জাতীয় বিপ্লবী সংস্থা এম পি এল এ-র ঐতিহাসিক বিজয় ভিয়েতনাম-মুক্তির পর বিশ্ব মুক্তিযুদ্ধে এবং শান্তি, স্বাধীনতা ও সংহতির দিকে এক নতুন তাৎপর্য উপস্থিত করেছে। বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রবাহের দিক থেকে বিচার করলে তৃতীয় দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদীরা চিলি ও বাঙলাদেশের প্রগতির পথ সাময়িকভাবে রুদ্ধ করে দিতে পারলেও ভিয়েতনামের পর অ্যাঙ্গোলায় তাদের শোচনীয় পরাজয়ের দ্বারা মুক্তিসংগ্রামের অরোধ্যতাই প্রমাণিত হচ্ছে।

অ্যাঙ্গোলার মুক্তিযুদ্ধে পক্ষে ও বিপক্ষে আন্তর্জাতিক শক্তির সমাবেশ হয়েছিল এইভাবে: মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এম. পি. এল. এ., সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কিউবা

প্রত্যক্ষভাবে আর তার সমর্থনে আফ্রিকার অধিকাংশ সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবিদ্বেষ-বিরোধী স্বাধীন দেশ এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিশ্ব সংহতি ; অন্য দিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, তাঁর আশ্রিত রোবার্টোর এফ এন এল এ ও সাবিম্বির ইউনিটা, ভরস্টারের বর্ণ-বিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার, মাওবাদী চীন আর তলে তলে ইয়োরোপের কোনো কোনো সাম্রাজ্যবাদী দেশ। ব্রিটেন থেকে যে ভাড়াটে সৈন্য এসেছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণই পাওয়া গেছে।

এত শক্তির সমাবেশ করেও সাম্রাজ্যবাদীরা পারেনি অ্যাঙ্গোলার মতো একটি ক্ষুদ্র দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন করতে বা জাতীয় বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখতে। শক্তির অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেছে অ্যাঙ্গোলায়। সাম্রাজ্যবাদ যেমন অ্যাঙ্গোলার জাতীয় মুক্তিকে দাবাবার জন্যে নির্লজ্জের মতো প্রকাশ্যেই তার সাঙাতদের অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছে আর দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী, সি আই এ ও মাওবাদী চীনাদের প্রত্যক্ষভাবে রণক্ষেত্রে এনে হাজির করেছে, তেমনি অন্যদিকে দু-টি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং কিউবা সরাসরি অ্যাঙ্গোলার পূর্ণ মুক্তির জন্যে এম পি এল এ-কে সাহায্য করেছে। সোভিয়েত দেশ থেকে এসেছে অস্ত্র ও সামরিক উপদেষ্টা আর কিউবা থেকে এসেছে দশ হাজার বিপ্লবী সৈন্য। অন্য একটি দেশের স্বাধীনতার জন্যে কিউবার বীরবৃন্দের এই প্রাণপণ সংগ্রাম আন্তর্জাতিকতাবোধের একটি উজ্জ্বলতম নিদর্শন যা স্পেনের প্রজাতন্ত্র রক্ষার জন্যে ফ্যাসিস্ত ফ্রাঙ্কোর জল্লাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রজাতন্ত্রীদের পাশে থেকে আন্তর্জাতিক বিগ্রেডের বীর যোদ্ধাদের অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগ, আন্তর্জাতিকতাবোধ ও শৌর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রায় চার দশকের ব্যবধানে ইতিহাসের গতি আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছে যে, সাম্রাজ্যবাদীদের শক্তি-সংহতির মোকাবিলা করার জন্যে তাদের সমস্ত ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে দু-টি সমাজতান্ত্রিক দেশ তৃতীয় দুনিয়ার একটি দেশের স্বাধীনতা নিষ্কণ্টক করতে অস্ত্র ও সৈন্য নিয়ে একেবারে সরাসরি মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে যা স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় সম্ভব হয় নি। বরং তখন ফ্যাসিস্ত ইতালি ও জার্মানিই অস্ত্র ও জঙ্গী বিমান দিয়ে ফ্রাঙ্কোকে সরাসরি সাহায্য করতে পেরেছিল। ইতিহাসের এই পটপরিবর্তন লক্ষণীয়।

বিশ্ব ঘটনাপ্রবাহের এই পটপরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক শক্তির নববিন্যাসের তাৎপর্য উপলব্ধি না করলে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদবিরোধী বিশ্ব সংহতির যথার্থ মুল্যায়ন করা সম্ভব নয়। বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে অ্যাঙ্গোলার বিজয়কে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক শক্তি ও বিশ্বের অন্যান্য

দেশের সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদবিরোধী শক্তির সংহতির কাছে সাম্রাজ্যবাদ ও তার সাঙাতদের সম্মিলিত শক্তি আর অপরাজেয় নয়। তৃতীয় দুনিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে এবং সি আই এ লাগিয়ে নিরাপত্তার যতই আশ্বাস দিক সাম্রাজ্যবাদীরা তার ওপর ভরসা করে নিশ্চিন্ত থাকার দিন যে ফুরিয়ে আসছে, ভিয়েতনামের পরে অ্যাঙ্গোলার বিজয়ে সেটা এতই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে তা দেখে সাম্রাজ্যবাদীদের সাঙাতরা স্বাভাবিকভাবেই খানিকটা ম্রিয়মান হয়ে পড়বে। অপর দিকে আন্তর্জাতিক সংহতিতে বিশ্বের মুক্তি ও প্রগতির শক্তিগুলির আস্থা ও সক্রিয়তা বাড়বে আর আসবে মুক্তিসংগ্রাম করে ঔপনিবেশিক শৃংখল ভেঙে জাতীয় মুক্তি অর্জনে দুর্জয় সংকল্প ও অটল আস্থা।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চেনামুখে ফেরারি শুদ্ধতার সন্ধানে

ঋত্বিকের বিষয়ে এত তাড়াতাড়ি শান্তভাবে কিছু লেখা দুঃসাধ্য। তার জীবদ্দশার শেষ ৮/১০ বছর সে ছিল যেন স্মৃতির পটে গভীর একটা ক্ষতচিহ্ন। দেখা হলে পাছে আবার সেই ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হয় এই আশঙ্কায় শেষ কটা বছর তাকে এড়িয়ে চলাই শ্রেয় ভেবেছি। তাই বোধহয় সে যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল তখন অনতিদূরে একই হাসপাতালে হৃৎপিণ্ডের উপর ডাক্তারদের খবরদারি মেনে নিয়ে আমিও পড়েছিলাম। দেখা হয় নি। দেখতে চাইও নি। সে চলে গেছে। আমি, আমরা ঘরে ফিরেছি।

অথচ সে কিন্তু আমাদের মতন নিতান্তই প্রাত্যহিক অজ্ঞাতকুলশীল চেনা-মুখের অন্তরালে সেই পরম শুচিশুদ্ধ মানবরূপের সন্ধান করেছিল ক্যামেরার চোখ দিয়ে, শব্দের দ্যোতনায়—চেনামুখের যে শুচিশুদ্ধ রূপ দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগের বাঙলাদেশে ফেরার, অথচ যার মুখ দেখে নাকি যমও নেয় না ঠাকুমাকে। বোধহয় ৬ বছর বয়সেই সে বুঝেছিল যে তার নিকটতম পরম আরাধ্য চেনামুখেও সেই শুচিশুদ্ধ মানবরূপ ফেরার, নিরুদ্দেশ। তাই রবীন্দ্রনাথের গানের ঝড়ো হাওয়ায় রাতের দুয়ারগুলি ভেঙে ভেঙে সেই শুচিশুদ্ধ রূপের অনির্বচনীয় আবির্ভাব ঘটে দুঃস্থ প্রত্যহের ছাইগাদায়, ঠেড়াবেড়ার ঘরে, অলক্ষ্যে।

রবীন্দ্রনাথের মানসী কিন্তু সে নয়, যদিও বিদ্যাগুণে সে সরস্বতী, জগৎ জননী, হংসধ্বনির ছন্দে লাবণ্যময়ী তার আনাগোনা, যদিও কোমলগান্ধারের আদলে ধরা পড়ে তার ঘামতেলমাখা মুখ, বা ঘাটশিলার পাথুরে ভোরের আলোয় তার মুখ দেখে বিশ্বচরাচর গেয়ে ওঠে "আলি দেখো, ভোর হৈ"। কারণ, তাকে দেখা যায় পথে ঘাটে ঘরে; উনুনের ধোঁয়ায় কখনো সে চোখ মোছে, কখনো লালদীঘির আশপাশে দেখা যায় ঘর্মাক্তমুখ—নিতান্তই প্রাত্যহিক, লোকায়ত অথচ সনাতন, অনির্বচনীয়, চেনামুখ অথচ ফেরারি। অনেকটা যেন মেটাফিজিকাল কবিদের মতো, ডানের মতো, ঋত্বিকের এই অন্বিষ্ট। ঋত্বিক একেই বলত মাতৃকারূপী আদিভাবনা—Mother Archetype।

একই কারণে ঋত্বিকের অন্যতম স্থায়ী মুখপাত্র, protagonist, শিশু। কারণ, শিশু অপাপবিদ্ধ, শুচিশুদ্ধ, যদিও তার ভবিষ্যৎ ফেরার, নিরুদ্দেশ; চিরন্তন ও প্রাত্যহিক অবিভাজ্য শিশুর স্বরূপে। অযান্ত্রিকে জগদ্দল বিদেয় হয়ে যাওয়ার

পর দেখা যায় তার ফেলে দেওয়া ভেঁপুটা বাজাচ্ছে একটি শিশু কবরখানার ধারে বসে ; মেঘে ঢাকা তারা-য় হিমালয়ের মহাস্থবির চিরন্তনে নীতা বিলীন হয় আর কলকাতার কলোনিতে তার ছোটবোনের ছেলেটা নতুন কোঠাবাড়ির সিঁড়ি বেয়ে কেবল ওঠে আর নামে ; কোমল গান্ধারে কলকাতার পথে দামাল ভিখারি শিশু মৃগশিশুর মতো সমকালীন শকুন্তলার আঁচল টেনে ধরে ; আর সুবর্ণরেখা তো আগাগোড়াই শিশুতীর্থ। Mother Archetype-এর সঙ্গে Rebirth Archetype একসূত্রে গাঁথা। মাতৃকামূর্তি ও শিশুমূর্তি অবিভাজ্য। কারণ, মানুষের জয় অবশ্যম্ভাবী।

শিশুর অনুষঙ্গে আসে আদিবাসী, হাসে, নাচে, বস্তুতে আরোপ করে প্রাণ অযান্ত্রিকে ; শিশুর অনুষঙ্গেই আসে কলকাতার পথে দামাল জনতার অগ্নিময় উৎসব, কোমল গান্ধারের দামাল ভিখারি শিশু, মৃগশিশু যখন দৌড়ে যায় আর তার হাতে দড়িবাঁধা ভাঙা খেলনা মোটরগাড়িটা পিছু পিছু ওল্টাতে ওল্টাতে যায়—কলকাতার অলিগলিতে তখন অগ্নিময় উৎসব। শিশুর মতোই অবুঝ, দামাল সেই জনতার কাছে "revolution is the festival of the masses" "বিপ্লবই জনতার উৎসব"—মার্কসের উক্তি। শিশু, জনতা ও বিপ্লব, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের এই ত্রিধারা সঙ্গমে Rebirth Archetype তথা পুনর্জন্মের আদিভাবনার মরণজয়ী অভিযান। মাতৃকামূর্তি, শিশুমূর্তি ও জনতার বিপ্লবী উৎসবময় রূপের ত্রিমূর্তির মাধ্যমে ঋত্বিকের অন্বিষ্ট, সমকালীন প্রত্যহের দুঃস্থ চেনামুখে মানবতার মরণজয়ী শুচিশুদ্ধ রূপের অস্থির সন্ধান রূপ পেয়েছে।

সত্যজিৎ রায় ঠিকই বলেছেন—ঋত্বিক আমাদের সবচেয়ে বেশি বাঙালি পরিচালক। কারণ, ঘরের মেয়ের চেনামুখে উমার অস্থির অস্থি বাঙলাদেশ যেমন করে দেখেছে তেমনি করেই ঋত্বিক আমাদের নিজেদের প্রাত্যহিক দুঃস্থ এমনকি কলুষিত সমকালীন চেনা মুখের অন্তরালেও এদেশের শুচিশুদ্ধ মানবতার পৌরাণিক আভাসের সন্ধান করেছে। বাঙলার চলচ্চিত্রের ও শিল্পভাবনার সামনে ঋত্বিকের ছবি ও মন চিরকাল একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবে, সবচেয়ে বেশি বাঙালি পরিচালকের সৃষ্টিকর্মে জাতীয় আত্মশুদ্ধির নীলকণ্ঠ প্রাণান্তকর প্রয়াসের সাক্ষ্য বহন করবে। দৈনন্দিন জীবনে সে যে অতটা নীলকণ্ঠ আত্মস্থতা অর্জন করতে পারে নি, তার জন্য সবটা দায়িত্ব তার ছিল না। আর, তাই নিয়ে আজ যে কলমচিরা সাপ্তাহিকের পাতায় রসালো আলাপ ফেঁদেছে, ঋত্বিকের জীবদ্দশায় তার ধারে কাছে ঘেঁষবার সাহসও তাদের হত না।

বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়

সত্যজিৎ রায়ের 'জন অরণ্য' প্রসঙ্গে কিছু কথা

২৭ ফেব্রুয়ারি 'কালান্তর' দৈনিকের 'চিত্র ও নাট্য জগৎ'-এ 'সত্যজিৎ রায়ের জন অরণ্য' পড়ে বিস্মিত হয়েছিলাম। ৭ মার্চ তারিখে 'জন অরণ্য' দেখে বিস্ময় শেষ পর্যন্ত বেদনা ও ক্ষোভে পরিণত হল।

শিল্প-সাহিত্যের বিচারে মতপার্থক্য হয়, হতেই পারে। প্রাজ্ঞ সমালোচকদেরও কত শত ডাকসাইটে সিদ্ধান্তই না পরবর্তীকালে হঠকারী বা মূঢ়তা বলে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রকৃত সৃজনশীলতা এই সব সমালোচনা ছাপিয়ে সমকালকে অতিক্রম করে যায়। তার আত্মা অক্ষতই থাকে। কিন্তু ক্ষতি হয় সমকালের, সাধারণ রুচির।

আমাদের, শিক্ষাভিমানী বাঙালিদের, এ-ব্যাপারে পরম্পরাগত পারদর্শিতা আছে। বর্তমান প্রজন্মের পিতৃ-পিতামহ অনেকেরই সমালোচক-শিং গজিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ক্রমাগত ঢুঁ মারার সুযোগ সৃষ্টি করে।

পঞ্চাশের দশকে আক্রমণের এক নতুন লক্ষ্য পাওয়া গেল—সত্যজিৎ রায়। ভারতের সংস্কৃতি জগতে এই অসামান্য আবির্ভাবকে চলচ্চিত্র সমালোচক রূপে অনেকেই তৎক্ষণাৎ, এবং ক্রমাগত, ঢুঁ মারতে লাগলেন।

অবশ্য যেমন রবীন্দ্রনাথ তেমনই সত্যজিৎ রায়ও প্রথম থেকেই বাঙালি পাঠক-দর্শকদের অন্য এক অংশের অকৃত্রিম প্রশ্রয় পেয়েছেন। কিন্তু আমাদের জাতিচরিত্রের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যটি তাতে মিথ্যে হয়ে যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায় মহান হিন্দু ধর্মের শুচিতা রক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধে কুৎসার বন্যা বইয়ে কবি গান গাওয়া আর বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াধের্বর কলকাতায় নকশালবাড়ির কৃষিবিপ্লবের স্বার্থে বিদ্যাসাগর-মূর্তির শিরশ্ছেদ হয়তো শেষ বিচারে আমাদের জাতিচরিত্রের ঐ লজিকই প্রমাণ করবে।

সুতরাং, সত্যজিৎ রায়ের ক্ষেত্রেই বা ব্যতিক্রম হবে কেন? আজ আমরা ভুলে গেছি। কিন্তু জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকার ফাইল ঘাঁটলেই 'পথের পাঁচালি', 'অপরাজিত' ও 'দেবী'র তৎকালে প্রকাশিত সেই সব অত্যাশ্চর্য সমালোচনা খুঁজে বের করা যাবে।

সত্যজিতের অতি দ্রুত বিশ্ব-স্বীকৃতি প্রাতিষ্ঠানিক পত্র-পত্রিকাগুলিকে পাঁচন

গিলতে বাধ্য করে। তারপর নিয়ম অনুসারে তারাই হয়ে ওঠে তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও অন্ধ স্তাবক।

কিন্তু, 'জন অরণ্য' আবার তাদের সমস্ত হিসেব বানচাল করে দিল। তাই 'আনন্দবাজার' ছবিটির নিপুণ ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসার শেষে লেখে সত্যজিতের মতো মহৎ প্রতিভা তাজমহল-কোনারক-এর চিরন্তন সৌন্দর্য সৃষ্টির পথ ছেড়ে সমকালীন জীবনের এই পাঁক ঘাঁটতে নামলেন কেন?

নিছক এই মন্তব্য থেকেই আমি অন্তত বুঝতে পারি সত্যজিতের শায়ক আবার পাখির চোখকেই বিদ্ধ করেছে!

দুর্ভাগ্য আমাদের যে 'কালান্তর'-এর অজ্ঞাতনামা সমালোচক মহাশয়ও 'জন অরণ্য'র জন্য সত্যজিৎ রায়কে ভর্ৎসনা করেছেন। অবশ্য, প্রায় বিপরীত কারণে।

অস্বাক্ষরিত রচনার দায় সাধারণভাবে সম্পাদকেরই (যদিও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি প্রায়শই বিভাগীয় রচনা বিভাগীয় সম্পাদক বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরই মনোভঙ্গি প্রতিফলিত করে, অনেক সময় সম্পাদক বা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা সে-লেখা পত্রিকায় ছাপার হরফে প্রথম পাঠ করেন)। 'কালান্তর' আবার কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা। ফলে, প্রকাশিত মতামতের দায়িত্ব একই কারণে পার্টির ওপরও কিছুটা বর্তায়। অথচ, কে না বোঝেন—'জন অরণ্য' সম্পর্কে সে অর্থে কমিউনিস্ট পার্টির কোনো নির্দিষ্ট বক্তব্য এ যাবৎ প্রকাশিত হয় নি।

আবার, শিল্পবিচারে কমিউনিস্টরা কোনো বাঁধাধরা ছকে বিশ্বাসী নয় বলেই কোনো বিশেষ সৃষ্টির মূল্যায়নের প্রশ্নে অনেক সময়ই তাদের মধ্যে মতভেদ হয়। দুনিয়া জুড়েই হয়।

বুর্জোয়া সমালোচকরা কমিউনিস্ট শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের যতই না কেন রোবোট হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা করুন; যতই না কেন তাদের রসাস্বাদন, ভাবনাচিন্তা ও সৃষ্টি করার স্বাধীনতার অভাব সম্পর্কে কাঁদুনি গান—পৃথিবীর সব দেশের কমিউনিস্টদের মধ্যেই সৃজনশীলতার মূল্যবিচারে মতপার্থক্য ছিল, আছে, থাকবেও। ভুল হয়েছে, আবার তা ধরাও পড়েছে। মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের ইতিহাস সত্যের অভিমুখে নিরন্তর অভিযানেরই ইতিহাস।

সুতরাং, এ-কথাটি স্পষ্ট ঘোষণা করা দরকার 'কালান্তর'-এ প্রকাশিত 'জন অরণ্য'র সমালোচনায় যে মনোভঙ্গি ও সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়েছে—তা একান্ত ভাবেই সমালোচক মহাশয়ের নিজস্ব মনোভঙ্গি ও সিদ্ধান্ত। আমি তার সঙ্গে একমত নই।

বিশেষত যে ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে এটি লেখা হয়েছে তাতে আমি লজ্জা ও বেদনা

বোধ না করে পারি না। লেখাটির মধ্যে যে পরস্পরবিরোধিতা আছে—তা আমার লজ্জা আরও বাড়ায়।

সমালোচক মাত্রেরই কিছু পরিমাণ বিনয় থাকা দরকার। তা ছাড়া নিজ সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ধারণার অভাব সমালোচনায় বিভ্রাট ঘটাবেই। সত্যজিৎ রায়ের 'জন অরণ্য'র লিখিত আলোচনা এত ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে কিভাবে করা সম্ভব তা বুঝে ওঠা দায়।

আমি চলচ্চিত্র সমালোচক বা 'ফিল্ম বিশেষজ্ঞ' নই—সাধারণ দর্শক মাত্র। 'জন অরণ্য' সম্পর্কে আমার উপলব্ধিই এ-ব্যাপারে শেষ কথা—এমন নির্বোধ দাবি আমার নেই।

কিন্তু, চলচ্চিত্র সমালোচকদের কাছে যাকে বলে awareness ও দায়িত্ববোধ—সে বস্তুটুকুর দাবি আমি নিশ্চিতই করি।

সম্ভবত ১৯৫৯ সালে 'আনন্দবাজার' অথবা 'দেশ' পত্রিকায় সত্যজিৎ রায় ও তাঁর 'দেবী' চলচ্চিত্র আক্রান্ত হলে আমি 'পরিচয়'-এ একটি নিবন্ধ লিখি। তাতে এ-জাতীয় কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম—চলচ্চিত্র যে একটি স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম তা আমরা সত্যজিতের ছবি দেখেই জেনেছি। বাঙলা চলচ্চিত্রের ভাষা তাঁরই সৃষ্টি। আধুনিক বাঙলা (আজ বলা যায় ভারতীয়) চলচ্চিত্রের তিনিই জনক, তিনিই ধাত্রী। চলচ্চিত্র-শিল্প সম্পর্কিত সবকিছুই তাঁর পরশ-পাথরের ছোঁয়ায় তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এমন কি সিনেমার পোস্টারও যে কতবড় শিল্পকর্ম তা তিনিই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন······ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা।

দুর্ভাগ্য যে পনের-ষোল বছর বাদে আমার 'কালান্তর' পত্রিকার আমার কমরেড সমালোচককে এই কথাগুলিই আবার মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে।

তার অর্থ এই নয় যে সত্যজিৎ সমস্ত সমালোচনার অতীত (স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তো নন)। তার অর্থ এই নয় যে সত্যজিতের সাম্প্রতিক চলচ্চিত্রাবলি সম্পর্কে আমার মনে কিছু অভিযোগ ও প্রভূত অভিমান জমা হয় নি। তার অর্থ এই নয় যে 'অপরাজিত' 'অযান্ত্রিক' ও 'পথের পাঁচালি'র মতো 'জন অরণ্য'ও মহত্ত্বের সেই সীমা স্পর্শ করেছে। তুলনা দিয়ে কথা বললে অনেক সময় ভুল বোঝার অবকাশ থাকে, তবু সেই ঝুঁকি নিয়েই বলছি—তার অর্থ 'গোরা' থেকে 'চতুরঙ্গ'য় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে অভিক্রমা—'পথের পাঁচালি' থেকে 'জন অরণ্য'য় সত্যজিতেরও সেই অমোঘ যাত্রা। 'প্রতিদ্বন্দ্বী' বা 'অশনি সংকেত'-এ নয়, 'জন অরণ্য'য়ই।

এই পদক্ষেপের তাৎপর্য ভুললে সবটাই ভুল হয়ে যাবে।

আমরা, কমিউনিস্টরা, আরও একটি কারণে একথা বিশেষভাবে মনে রাখব।

বাঙলা 'বায়োস্কোপ' জগৎ 'পথের পাঁচালি'কে আঁতুড়েই মারতে চেয়েছিল। তদানীন্তন বাঙলা ও হিন্দি ছবি দেখতে অভ্যস্ত দর্শক সাধারণের কাছে 'পথের পাঁচালি'র বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে পশ্চিম বাঙলার মাস মিডিয়া যথোচিত দায়িত্ব পালন করে নি। কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে সেদিন এ-কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সিনেট হলে এক প্রকাণ্ড সংবর্ধনা সভার আয়োজন হয়। মনে পড়ছে আমি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যানটিন থেকে চেয়ে আনা একটা ছোটো ডেকচি হাতে দাঁড়িয়ে, তাতে সাদা চকের গুঁড়ো পিটুলির মতো গোলা। বেশ কয়েকটা চক চুরি করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। একটুকরো ন্যাতা হাতে পুর্ণেন্দু পত্রী ধনুকের মতো সামনে ঝুঁকে আলপনা আঁকছে। সিনেট হলের সামনের বারান্দা, সিঁড়ি শেষ করে উৎসাহের আধিক্যে সামনের ফুটপাতটুকু চিত্রিত করা হচ্ছে। লোক ভীড় করে দেখছে। তাদের বোঝানো হচ্ছে কে সত্যজিৎ রায়, 'পথের পাঁচালি' ব্যাপারটা কি!

হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টিতে সিঁড়ি আর ফুটপাতের আলপনা ধুয়ে মুছে যায়। কিন্তু সন্ধ্যেবেলা মানুষের ভীড়ে সিনেট হল উপচে পড়ে। সত্যজিৎ রায়ের জীবনে সংগঠিত বৃহৎ জনসংবর্ধনা সেই প্রথম।

তাছাড়া কলেজে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে (তখন হাতের কাছে শুধুই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষক-অধ্যাপকদের মধ্যে মুখে মুখে প্রচার চলে যাতে তাঁরা টিকিট কেটে 'পথের পাঁচালি' দেখেন। 'স্বাধীনতা' 'পরিচয়' ও কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন অন্যান্য পত্র-পত্রিকা 'পথের পাঁচালি'র পক্ষে সৈনিকের মতো কলম ধরে। ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে—তারও মুল সংগঠক ছিলেন সহযাত্রী সহ কমিউনিস্টরা, গণতন্ত্রীরা।

'পথের পাঁচালি'র আবেদন অস্বীকার করা অসম্ভব ছিল। বুর্জোয়া সমালোচকদের অনেকের ভুরু কুঁচকোল 'অপরাজিত' দেখে। এই মহৎ চলচ্চিত্রটি প্রথম প্রদর্শনের সময় তেমন দর্শকই পেল না। তারপর 'দেবী'। সত্যজিৎ তখন অনেকগুলি আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু বাঙলা মনোপলি প্রেস তাঁকে সেদিন একই সঙ্গে ভৎ'সনা করে ও চলচ্চিত্রের ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান দেয়।

সত্যজিৎ রায়ের প্রথম জীবনের এই সংগ্রামকে কমিউনিস্ট ও গণতন্ত্রীরা সেদিন পাশে থেকে খানিকটা সহজ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

আমাদের এই গৌরবকে কি আমরা অর্ধমনস্ক হঠকারী সমালোচনা দ্বারা নিজেরাই নস্যাৎ করব?

সমাজবাস্তবতার প্রতিনির্মাণের জন্য এত বছর বাদে মনোপলি প্রেস যখন সত্যজিতকে আজ প্রকাশ্যেই শাশ্বত শিল্পের লাইন দিচ্ছে, 'অপরাজিত'র স্রষ্টার বিরুদ্ধে যখন জাতির দুঃসময়ে হতাশা প্রচারের গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে —তখন কি আমরা কমিউনিস্টরা 'জন অরণ্য'র অন্বিষ্ট ও অর্জন সম্পর্কে প্রকৃত মূল্যায়নের চেষ্টা করে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি যথোচিত দায়িত্ব পালনে পরাঙ্মুখ হব?

দুই

দীর্ঘ এ ছবির কাহিনী অতি সরল, প্রায় মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী গপ্পোর স্বাদ দেয়—এমন অভিযোগ উঠেছে।

কাহিনীর সরলতা কি কোনো অপরাধ? আমাদের দেশে এক ধরনের চলচ্চিত্র সমালোচকের আবির্ভাব হয়েছে বটে যাঁরা পশ্চিমের কিছু বাছা বাছা চলচ্চিত্রের নামতা আউড়ে এই আপাত-সারল্যের দোষে চ্যাপলিনের 'লাইমলাইট'কেও বাতিল করতে চেয়েছিলেন।

জীবনের সমাজের সময়ের জটিলতা কখনো নিতান্ত সরলভাবে, কখনো বা রীতিমতো জটিল প্রকরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করা যায়। আমার কোনোটাতেই আপত্তি নেই। ফলে চ্যাপলিন এবং বেয়ারিম্যান উভয়েই আমার কাছে উপভোগ্য। রুচির একটা বিশেষ পক্ষপাত অবশ্যই থাকে। কিন্তু তা কখনোই সত্য আর সুন্দরের রসাস্বাদনে বাধা হয় না। যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে সে-রুচির গোড়ায় ঘুন ধরেছে, তাই সংকীর্ণতার ঠেকনো দিয়ে তাকে খাড়া রাখতে হচ্ছে।

আমার তো মনে হয় সোমনাথ যদি যুথিকাকে শেষ পর্যন্ত গোয়েঙ্কার ঘরে না পাঠাত, যুথিকা যদি হঠাৎ গণিকাবৃত্তি ত্যাগ করত—তাহলেই অ্যাভারেজ উপন্যাস-থিয়েটার-সিনেমার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় থাকল দেখে তথাকথিত দর্শক সাধারণ ও সমালোচকরা মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারী গল্পের স্বাদ পেতেন।

মানিকবাবুকে আমরা মাথায় রেখেছি, কিন্তু, বাস্তবকে সর্বদা নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে দেখতে পারার শক্তি আজও অর্জন করি নি। বাস্তবতা আমরা চাই বৈকি—কিন্তু প্রায়শই তা চাই আমার, আমার ভাই-বন্ধুর বৌ-বাচ্চার

মনোরঞ্জনকারী টনিক রূপে। সমাজের নৈতিক ভণ্ডামি উন্মোচনকারী বাস্তবকে সহ্য করার মতো মেরুদণ্ড কোনো সময়েই সুলভে মেলে না। (আবার, এই যুক্তির ছিদ্রপথেই—বাস্তবতারই নামে—অবাধ যৌনতা যে তার ছাড়পত্র চায়, এ-সম্পর্কেও আমি সচেতন। কিন্তু বিপ্লব আর প্রতিবিপ্লবে যতখানি তফাৎ—বাস্তববাদ ও বাস্তবতার ব্যভিচারে তফাৎ ততটাই।)

বলা হয়েছে "মাঝে মধ্যে হঠাং হঠাৎ কিছু সমাজ সমস্যামূলক কথা বলার চেষ্টা থাকলেও মূলতঃ এ ছবিতে সাদামাটা সরল রেখায় বলা একটি তাৎপর্যহীন বক্তব্য উপস্থিত হয়েছে। সমস্যা বলার চেষ্টাটুকু ছবির ভান, মূল প্রতিপাদ্য নয়।"

এ-জাতীয় সমালোচনায় নাক উঁচু আধুনিক মননশীলতার ছড়ি যতই ঘোরানো হোক না কেন - সমালোচকদের অন্তরস্থ নব-বটতলার নবেল পড়ুয়াটি এইভাবেই আর আত্মগোপন করে থাকতে পারে না। স্পষ্ট বোঝা যায় যেখানে যেখানে সোচ্চার সংলাপে সমস্যার কথা বলা হয়েছে– মাত্র সে সব জায়গায়ই এঁরা তার অস্তিত্ব টের পেয়েছেন। 'জন অরণ্য'য় বি. এ. পার্ট টু-র পরীক্ষক মহাশয়ও তো খাতা দেখতে বসে প্রয়োজনে প্রতিবেশীর চশমা ধার করেন। প্রতিবেশী নৈহাটি চলে যান বলেই তো সেদিন সোমনাথের খাতা নম্বর কম পায়। নব-বটতলার নবেল পড়ুয়া রুচি 'নিউ ওয়েভ' আন্দোলনের চশমা ধার করে বেচারা সত্যজিৎ রায়ের প্রতি কতখানি সুবিচার করতে পারে?

অসম বিকাশের এই দেশে গ্রাম্যতা আর আধুনিকতার এহেন অসঙ্গত সহাবস্থান তো নান্দনিক পদ্মবনেই মত্ত হস্তিদের উপদ্রব অনিবার্য করে তোলে।

তাছাড়া গোটা মানসবৃত্তি যখন অসাড় হয়ে যায় তখন সমস্যার পেরেক হাতুড়ি দিয়ে না ঠুকলে অনেকের মাথায় ঢোকে না। যেমন অনেক দুর্ভাগা স্ত্রীকে পাড়ার লোক জানিয়ে চীৎকার করে কেঁদে তাঁর স্বামীকে বোঝাতে হয় যে তিনি কাঁদছেন।

এই মনোবৈকল্য না ঘটলে এঁরা নিজেরাই দেখতে পেতেন 'জন অরণ্য'র প্রথম দৃশ্য থেকে শেষ ফ্রীজ শটটি পর্যন্ত ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-জীবনের বহু স্তরের সমস্যা একটি অমোঘ বক্তব্যে পরিণত হল। তা ভান নয়, এ ছবির আত্মা।

এবং, সে-বক্তব্যও খুব সরলরেখায় উপস্থাপিত হয় নি। সোমনাথের বাড়ি, সুকুমারের বাড়ি, বড়বাজার—প্রধানত এই তিনটি আবর্তের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে কিন্তু অনিবার্যভাবে তা গড়ে উঠেছে।

সত্যজিৎ তাঁর প্রবাদে পরিণত প্রকৃতিপ্রেম ও লিরিকাল মেজাজকে প্রশ্রয়

দেন নি বলে, যত্রতত্র চিত্রকল্প ও প্রতীকের আশ্রয় নেন নি বলে, পিতার প্রতীক্ষার দৃশ্যটুকু ছাড়া আলো ও ছায়াকে প্রায় কোথাও ত্রিকোণমাত্রায় ব্যবহার করেন নি বলে চট করে মনে হতে পারে সব কিছুই বড় সরলভাবে বলা হল।

কিন্তু বোঝা দরকার আঙ্গিকের নানা চমকপ্রদ কৌশল যিনি বাঁ পা দিয়ে করতে পারেন, তিনি, সত্যজিৎ রায়, এই ছবিতে এত ডিরেকট এত নিরাভরণ কেন হলেন। কেন 'জন অরণ্য'র জন্য তাঁকে নতুন ভাষার আশ্রয় নিতে হল ?

ছবিতে সব কিছুই অত্যন্ত ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে ঘটে। ধীরে ধীরে অব্যর্থভাবে কোনো একটি চরম মুহূর্ত গড়ে তোলা—যেমন দুর্গার মৃত্যুর পর হরিহরের নিশ্চিন্দপুরে ফেরা—'জন অরণ্য'য় এমন দৃশ্য একটিও নেই। ছবির এই ক্যাজুয়াল টোন মোটেই আকস্মিক বা "তাৎপর্যহীন" নয়, "সরল" তো নয়ই। সমস্ত জটিলতা ও তীব্রতাকে ধারণ করে আছে সত্যজিতের এই আপাত-ক্যাজুয়াল ভঙ্গি।

শেষ বিকেলে ময়দানে সোমনাথ আর সুকুমার ইংরেজ আমলের ভাস্কর্যের পাদমূলে বসে—সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সত্যজিৎ ক্যামেরার মুখ প্রকৃতি থেকে ঘুরিয়ে নেন, দেখান ফুটবল খেলা প্রত্যাগত ক্ষয়ে-যাওয়া বাঙালি কেরাণীকে, বেকারকে—ইংরেজ শাসনের উত্তরাধিকারকে। দর্শককে হাসান—কিন্তু সে-হাসির স্বাদ তিক্ত, একটু বা লবণাক্ত।

মহিমাময় প্রকৃতি নয়, ক্যামেরার চোখ তুচ্ছ হাস্যকর কেরাণীর ওপর! সত্যজিৎ রায়ের একুশ বছরের চলচ্চিত্র জীবনে এভাবে এমন ঘটনা কোনোদিন ঘটে নি। কারণ, আমরা তো জানিই মূলত রবীন্দ্রনাথের মানস সরোবরে স্নাত স্বভাবসুন্দর মর্জির তাগিদে তিনি কিছুটা অন্যায়ভাবেই দুর্ভিক্ষের মতো কাঁচা দগদগে ব্যাপারকেও 'অশনি সংকেত'-এ স্নিগ্ধ সুষমায় মণ্ডিত করে ফেলেন।

সদাসুন্দরের পূজারী সত্যজিৎ এর আগে আপাত-কুৎসিতের সৌন্দর্য উন্মোচন করেছেন। এবার উদ্ঘাটিত করেন আপাত-সুন্দরের কুৎসিত চেহারাটি ('কাঞ্চনজঙ্ঘা' 'নায়ক' ও 'মহাপুরুষ' মনে রেখেই বলছি)। করেন বেশ নিষ্ঠুরতার সঙ্গে—কোথাও নিরাসক্তভাবে, কোথাও রীতিমতো ক্রুদ্ধ মেজাজে। বহু জায়গায় ঠাট্টার আশ্রয় নেন—কিন্তু তাতে 'পরশ পাথর'-এর প্রসন্ন পরিহাসের ছোঁয়া লাগে না। শ্লেষের এ-জাতীয় কড়া চাবুক জীবনে এই একবারই তিনি হাতে তুলে নেন। ছবির অন্তিম উক্তির মধ্য দিয়ে সে-চাবুক অমোঘ নেমে আসে।

'অপুর সংসার'-এ অপর্ণার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অপু তার শ্যালকের মুখে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ঘুষি মেরেছিল। মোটা দাগের এই ঘটনা বুঝতে

কারোরই কোনো অসুবিধে হয় নি। কিন্তু সোমনাথের নৈতিক মৃত্যুসংবাদ ঘোষণার মধ্য দিয়ে পরিচালকও যে এ ছবির শেষে আমাদের আত্মতৃপ্ত অবসাদগ্রস্ত চৈতন্যের মুখে একটি অব্যর্থ চাবুক মারলেন—কেউ কেউ তা খেয়াল করেন নি। কারণ, চীৎকার করে না কাঁদলে যাঁরা কান্নার অস্তিত্ব টের পান না, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার ভঙ্গিতে আদর্শবাদী পিতার মুখে "যাক বাঁচা গেল" সংলাপ তাঁদের কি কনভে করবে ?

অনুভূতির এই দৈন্য থেকেই তো "সরল" "সাদামাটা" "তাৎপর্যহীন" প্রভৃতি শূন্যগর্ভ অভিযোগের চালিয়াতি জন্ম নেয়।

আমাদের দেশে কিছু ফিল্ম-ইনটেলেকচুয়াল জেনে বসে আছেন চকচক না করলে সোনা হয় না, তাই সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দিতে প্রায়ই তাঁদের বাধে না।

ক্রমে এই পথেই আঙ্গিকসর্বস্বতা প্রবেশ করে।

অভিযোগ উঠেছে এ ছবিটি নেহাতই বিবৃতিধর্মী। 'জন অরণ্য'র আগাগোড়া কোথাও 'সিরিয়াস' কোনো মুহূর্ত বা গভীর কোনো রসাবেদন সৃষ্টির ঝুঁকি সত্যজিৎ নেন নি। এমন কি এ কথাও বলা হয়েছে এ ছবি পরিচালকের "অবকাশকালীন হাল্কা মেজাজের কাজ।"

কাকে বলে বিবৃতিধর্ম ?

তাছাড়া 'জন অরণ্য' যদি বিবৃতিধর্মীই হয়—তাতেই বা কি আসে যায় !

কথাসাহিত্যে চলচ্চিত্রে সচেতনভাবে রিপোর্টাজধর্ম প্রয়োগ করে অনেক কাজকম্ম আগেই হয়ে গেছে। ভারতীয় চলচ্চিত্রেও হয়েছে। বরং মৃণাল সেনের কোনো কোনো সাম্প্রতিক ছবির আলোচনায় ডকুমেণ্টেশন, রিপোর্টাজধর্ম-প্রয়োগ প্রভৃতির সমস্যা প্রাসঙ্গিক। 'জন অরণ্য' নিশ্চিতই সে..কেটিগরিতে পড়ে না। এ ছবিকে কোনোভাবেই বিবৃতিধর্মী বলা যায় না।

'জন অরণ্য'য় আগাগোড়া কোথাও 'সিরিয়াস' কোনো মুহূর্ত নেই ?

কাকে বলে সিরিয়াস মুহূর্ত ?

আগাগোড়া কোথাও গভীর কোনো রসাবেদন সৃষ্টির ঝুঁকি তিনি নেন নি ?

কাকে বলে রসাবেদন সৃষ্টি ? কি ভাবে তা গভীর হয় ?

সোমনাথ ও নটবর মিত্র মেয়ের খোঁজে বেরিয়েছে। করপোরেশনের কেরাণীর বৌ, কলগার্ল, বাড়িতে নতুন টেলিফোন এসেছে। ভদ্রমহিলা পর পর তিনদিন অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছেন, শরীরও ভালো না, আজ বিশ্রাম নিতে চান—সন্ধ্যেটা চান স্বামীর সঙ্গে কাটাতে। কিন্তু অর্ডার সিকিওরের জন্য সোমনাথের আজই মেয়ে ভেট দেওয়া দরকার, এখনই। স্বয়ং নটবর মিত্রের

অনুরোধ, তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার সাহস ভদ্রমহিলা রাখেন না। তাই যেতে রাজি হলেন।

শুধু এই সিকোয়েন্সটিই বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করার জায়গা থাকলে অনেক কিছু স্পষ্ট হত। ঘরটা, পাত্র-পাত্রী, তাদের বসার ভঙ্গি, কথা বলার ধরন, সংলাপ—সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে রেখেছে একটা শ্লথ ক্যাজুয়াল ভঙ্গি। এই ভঙ্গিতেই ভদ্রমহিলা আজকের রাতটা রেহাই চান। এই ভঙ্গিতেই নটবর মিত্র ভদ্রমহিলার রূপের প্রশস্তি গায়, ভদ্রমহিলা তাতে খুশী হন, লজ্জাও পান। এই ভঙ্গিতেই পোশাক বদলাতে তিনি পাশের ঘরে চলে যান, তারপর কিছুক্ষণ বাদে দরজার ফাঁক দিয়ে শুধু রূপসী মুখটুকু বার করে জিজ্ঞেস করেন—সামান্য সাজবেন না রীতিমতো সাজবেন, "পার্টির" পছন্দ কি রকম? এই ক্যাজুয়াল ভঙ্গিটি শুধু দুবার কেটে যায়। প্রথমবার নটবরের সঙ্গে যখন রেট নিয়ে ভদ্রমহিলার তর্কবিতর্ক হয়। দ্বিতীয়বার তাঁর মাতাল স্বামী এসে যখন ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে দেয়, ভদ্রমহিলা যখন হঠাৎ বুঝতে পারেন সোমনাথ এবং নটবরের কাছে তাঁর অর্ধনগ্নতা প্রকাশ্য হয়ে পড়েছে, তখন, অস্ফুট আর্তনাদ করে ব্যাকুলভাবে তিনি নিজেকে ঢাকতে চান।

এই দৃশ্যটি কি বিবৃতিধর্মী? এই দৃশ্যটি কি 'সিরিয়াস' নয়? গভীর কোনো রসাবেদন কি এখানে সৃষ্ট হয় নি?

উপরোক্ত সমালোচক এ ছবিকে চোখের তৃপ্তি, নয়নসুখকর ছবির মেলা বলেছেন। তাঁদের মতে 'জন অরণ্য' নাকি মেধা ও আবেগের রাজ্যে, বোধি ও মননের ক্ষেত্রে শূন্য ছাড়া আর কোনো সংখ্যার যোগান দিতে পারে না। এইসব সমালোচকরা বেশ জোরগলায় বলেন তাঁরা অবশ্য ছবিটিতে তাৎক্ষণিক দৃশ্যসুখ পেয়েছেন।

মানতেই হবে এঁদের চোখ খুব জোরাল, এ-জাতীয় সিকোয়েন্সেও "সুখ" পায়। কিন্তু নিজ মেধা ও আবেগ, বোধি ও মননের সাম্প্রতিক ঠিকানার খোঁজ কি তাঁরা নিজেরাই রাখেন? ছবির চরম নাটকীয় সংস্থানের ব্যাখ্যা করতে গেলে আমরা দেখি, নটবর মিত্রের পরামর্শ মতো সোমনাথ যখন মেয়ে যোগানের লাইন ধরতে যায় তখন 'জন অরণ্য'র নায়ক কিম্বা তার পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যের অস্তিত্বে "ছায়া ঘনাইছে"—সুস্থ চেতনার মহীরুহে শিকড় শুদ্ধ টান পড়েছে।

সোমনাথ অস্থির হয়ে ওঠে। পারতপক্ষে নটবরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে চায়। ইতিপূর্বে নটবর বলেছিল সোমনাথ শিশু, অতএব কনসালট্যান্ট হিসেবে সে তার প্রাপ্য ফী-র আদ্ধেকটা নেবে। এখন বলল তার পুরো ফী

চাই, কারণ শিশুরা কখনো নিজে সিদ্ধান্ত নেয় না। এই ছোট্ট হুমকিটুকুতে কাজ হয়।

সোমনাথ একটি মোটামুটি সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। বাবা আদর্শবাদী রিটায়ার্ড বৃদ্ধ, একদা গান্ধীজীর আহ্বানে স্বদেশী করেছেন। আজও অনেক কিছুই তাঁর আপত্তিকর মনে হয়, তিনি প্রতিবাদ করতে চান। দাদা শিক্ষিত সুদর্শন যুবক—চাকরি আর সংসারে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। সে জানে টেলিফোনে কানেকশন পাওয়া যায় না, লোডশেডিং হয়ই, নকশালরা এমনই করে, ঘুষ ছাড়া কিছুই মেলে না। সে তার নিরাপদ আত্মকেন্দ্রিক জীবনের চমৎকার দর্শন গড়ে নিয়েছে—মহাভারতের যুগে সেক্স ভায়োলেন্স আর উৎকোচ ছিল, আজও আছে। অতএব এইভাবেই বাঁচো এবং বাঁচতে দাও। তার স্ত্রী শিক্ষিতা আধুনিকা অথচ স্নেহময়ী এবং কর্তব্যপরায়ণা। বিয়ের পিঁড়িতে বসে সে তার প্রেমিকের জন্য কেঁদেছিল, সে জানে প্রেম করলেই বিয়ে হয় না আর বিয়ে করলেই প্রেমিককে ভোলা যায় না। কিন্তু স্বামী শ্বশুর আর দেওরকে নিয়ে তার ছিমছাম 'ডিসেন্ট' সংসার। তারপর সোমনাথ। সুদর্শন, রুচিবান তরুণ—ভালোভাবে বাঁচতে চায়। নকশালপন্থীদের খবর সে রাখে, কিন্তু ঊনসত্তর থেকে একাত্তরের প্রচণ্ড দিনগুলিতেও নিজেকে সেই ঝড়ের বাইরে রাখে। সম্ভবত ধনী একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে। ভালো পরীক্ষা দিয়ে, ভালো চাকরি করে সে পেতে চায় নির্ঝঞ্ঝাট জীবন। কিন্তু শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রহসনের দরুন তার ফল খারাপ হয়। মেয়েটিও অপেক্ষা করে না। ভালো চাকুরে পাত্র পেয়ে তাকেই বিয়ে করে, যদিচ বিয়ের পরও সোমনাথকে সে ভুলতে চায় না।

শুরু হয় সোমনাথের নতুন জীবন। সে আর তার নিম্নমধ্যবিত্ত বন্ধু সুকুমার হন্যে হয়ে চাকরি খোঁজে, পায় না। ইতিমধ্যে যুক্তফ্রন্টের আমলে লেখা দেয়াল-লিপিতে আলকাতরার পোঁচ পড়ে, লেখা হয় নতুন স্লোগান। সোমনাথ সুকুমারের সঙ্গে তার তরুণ এম-এল-এদার কাছে যায়। তাঁর মাথার ওপরে নিজের মাল্যভূষিত বাঁধানো আলোকচিত্র। তার ওপরে প্রধানমন্ত্রীর ছবি। এম এল-এদাও আত্মতৃপ্ত ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে জ্ঞান দেন।

সুকুমাররা প্রায় বস্তিবাড়িতে থাকে। দুঃসহ দারিদ্র্য। অক্ষম বৃদ্ধ পিতা বেকার ছেলেকে বিষ জ্ঞান করেন। ভাইরাসের আক্রমণে শুধু সে নয় তার ছোটো ভাইটাও অসুস্থ হয়ে পড়ে। বোন কণা আপিশ-পাড়ায় থিয়েটার করে মাসে সত্তর-আশি টাকা কামায়, সেই টাকার সামান্য অংশ নিজের প্রসাধনে

ব্যয় করে। সুকুমার বোনের পরিণাম ভেবে ছটফটিয়ে মরে, কিন্তু বোঝে কণারও ভবিষ্যৎ আছে—তার নেই। একটা ট্যাক্সি-পারমিটের আশায় অগত্যা এম-এল-এদার খুঁটোয় সে নিজেকে বেঁধে রাখে।

অর্থাৎ, আক্রমণটা ভাইরাসের। এবং তাতে বিপন্ন শুধু পরিবারের বর্তমান নয়, ভবিষ্যতও। কিন্তু বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার কোনোই বন্দোবস্ত নেই। অগত্যা হোমিওপ্যাথিই সম্বল। আর, রুগ্ন শিশুকে সে-ওষুধও দেওয়া হয় অত্যন্ত ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে।

উভয় পরিবারে এইভাবে ভাঙন ধরে। মধ্যবিত্ত সমাজের এক বৃহদংশে ওপর আর নীচতলায় ভাঙন। রবীন্দ্রনাথের গানে সেই ঘনায়মান ছায়ার কথাই বলা হয়েছে। সে ছায়া শুধু সোমনাথের ব্যক্তিজীবনে বা পারিবারিক ঐতিহ্যেই নয়—গোটা দেশেই ঘনিয়েছে, ঘনাচ্ছে।

সোমনাথ অর্ডার-সাপ্লাই-এর ব্যবসা শুরু করে। এই সামাজিক কাঠামোর ভেতরই এ হল আরেক কাঠামো। সুদর্শন রুচিবান মেধাবী অথচ আসলে আত্মসর্বস্ব সুখলোলুপ সোমনাথকে সেই রাক্ষস আস্তে আস্তে গিলে নেয়, তাকে গড়ে পিটে মানুষ করতে থাকে।

সোমনাথ দ্রুত বুঝে ফেলে সাফল্যের চাবিকাঠি হল কঠোর মন্ত্রগুপ্তি ও সর্বজনে অবিশ্বাস। এনভেলাপের অর্ডারটা তো সে স্বাভাবিক ভদ্রতা করার ভুলেই হারাল। বিশুদা, নটবর এবং এই চক্রের ছোটোবড় সকলেই এক-একটি পরম হাঁস। আত্মস্বার্থে যে কোনো জলেই সাঁতরাতে পারে, নীর থেকে ক্ষীরটুকু খুঁটে নেওয়ার ব্যাপারে তাদের অসামান্য দক্ষতা, আবার ডানা থেকে জল ঝেড়ে ফেলতেও কারোর মুহূর্ত লাগে না। বিশুদা, নটবরের যোগাযোগের পরিধিও চমকপ্রদ। আসলে সোমনাথকে যে তারা নির্দ্বিধায় সাহায্য করছে—তা-ও তো তাদের এক ধরনের ইনভেস্টমেন্ট!

অর্থাৎ, আত্মকেন্দ্রিক 'মধ্যবিত্ত জগত' থেকে সোমনাথ এসে পড়ে আত্মকেন্দ্রিক বড়বাজারে—যেখানে "পদে পদে বিস্ময়।"

বিভিন্ন এজেন্সি সোমনাথকে নৈতিক পতনের নরকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলে। আলামোহন দাসদের মতো সোমনাথকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভাঙতে হয় না। এসকেলেটরে প্রথম পা-টি ফেলবার সময় সে একটু টলমল করে বটে, তারপর নিশ্চিত আয়াসে ওপরে উঠতে থাকে। বা, নামতে।

বিরাট আদর্শ, সীমাহীন জেদ, বিপুল ব্যক্তিত্ব, এমনকি তথাকথিত পাগলামো ও সমষ্টির মহিমাময় অহঙ্কার এখানে আত্মরক্ষা করতে পারত।

কিন্তু সোমনাথ তো নিতান্তই একক। পরীক্ষার হলে সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বন্ধুকে নকলে সাহায্য করে। শারীরিক অভিজ্ঞতা অর্জনের পর্ব পেরিয়ে এসে প্রেয়সীকে পরের স্ত্রী হতে দেখে। কোথাও কোনো ঝুঁকি নেয় না। ঝামেলা এড়িয়ে সুখে বাঁচা—এই তার জীবনাদর্শ। আসলে সে তার চৈতন্যের মধ্যেই পতনের বীজ বহন করে!

আর, বড়বাজারের আলোবাতাসে অঙ্কুর ফোটে। সোমনাথের প্রাক্তন প্রেমিকা (সকলকে নানা কথা ভাবার সুযোগ দিয়ে) সোমনাথকে তার প্রথম সন্তানের ছবি পাঠায়। যথোচিত উত্তাপ না দেখিয়েই সোমনাথ সে-ছবি ছিঁড়ে ফেলে এবং নিজের কাজে মন দেয়। বোঝা যায় তার কোনো অতীত নেই, আছে শুধুই বর্তমান, হয়তো ভবিষ্যতও। ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে উত্তেজনাবিহীনভাবে নিজ অতীতের অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে সোমনাথ ক্রমেই তার পরিপার্শ্বের যোগ্য হয়ে ওঠে।

তবু যখন মেয়ে যোগানের প্রশ্ন আসে সোমনাথ ছটফট করে ওঠে। নটবর মিত্র তাকে ভয় দেখায়। তার অর্থ শুধু এই অর্ডারই হাতছাড়া হওয়া নয়—অর্থ, পরিণামে বিশুদারও আশ্রয়চ্যুত হওয়া। কারণ ক্রমেই সে বুঝতে পারছে আপাত-বিচ্ছিন্ন এই বড়বাজারের জগৎ এক অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা। সোমনাথের অফিস-ঘরটা বড়। তাতে অনেকগুলো টেবিল। প্রত্যেক টেবিলে অনেককটা অফিস। ঘরটা অধিকাংশ সময় খাঁ খাঁ করে। অথচ ব্যবসা চলতেই থাকে। এই নবলব্ধ স্বর্গ থেকে সোমনাথ কোন সাহসে নির্বাসিত হতে চাইবে?

তবু তার শেকড়ে টান পড়ে। তাই বিধ্বস্ত সোমনাথ বাড়ি ফিরে আসে।

লোড-শেডিং। অর্ধদগ্ধ মোমবাতি জ্বলছে। বৌদি সোমনাথকে দেখেই বুঝতে পারছেন সে বিধ্বস্ত, কোনো গুরুতর সংকটে পড়েছে। বারবার জিজ্ঞেস করছেন—কি হয়েছে? ঘুষ যে দিতে হয় সে আলোচনা তো আগের দিনই হয়ে গেছে। সোমনাথের দাদা অবশ্য বলেছিল ঘুষে শুরু, কিন্তু শেষ নয়। বুদ্ধিমতী রমণী আঁচ করছেন, জেরা করছেন। সোমনাথ বলতে পারছে না। শুরু করে থেমে যাচ্ছে। একবার বলল, আমাদের কাজটা ভালো নয়। একবার বলল, এ কাজকে কি বলে জানো? দালাল—দালালি। বৌদি চমকে উঠলেন। তারপর বললেন—তা তুমি কি করবে? নামটা তো আর তুমি দাও নি। বরং তোমার দাদাকে জিজ্ঞেস কোরো। তিনি এর সংস্কৃত প্রতিশব্দটি বলে দেবেন।

অর্থাৎ ঘুষের বদলে যেমন উৎকোচ, দালালির বদলে তেমনই কোনো আর্য শব্দ ব্যাপারটাকে মর্যাদা দিয়ে দেবে।

সেই মধ্যবিত্ত জীবন! সংকটটা মূল্যবোধের নয়, ভদ্রতাবোধের। বস্তুর নয় নামের, সেমানটিকসের।

তারপর বৌদি স্পষ্টই বলেন—তুমি যা-ই করো না কেন, আমি জানব তুমি কোনো অন্যায় করো নি। কারণ, তিনি যে জানেন—এমনিই হয়, মেনেও নিতে হয়। নইলে ভবিষ্যৎ নিরাপদ হয় না।

তারপর হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠে।

স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত এই সংলাপাংশে কিছু ভুল থাকতেই পারে। কিন্তু ব্যাপারটা এই রকমই। অভিযোগ উঠেছে মেয়ে যোগানের প্রশ্নে সোমনাথের চৈতন্যে শেকড় শুদ্ধ্ টান পড়ল না কেন! "ছায়া ঘনাইছে" গানটির ব্যবহার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে "ঘটনার এহেন উপস্থাপন 'স্মার্ট' আখ্যা পেতে পারে কিন্তু সুপ্রাচীন সভ্যতার আধারে পালিত জীবনবোধের প্রতিফলন (·তা) নয়।" অভিযোগ-কারীরা যদি শুধুই 'চোখের তৃপ্তি' পেতে ব্যস্ত না থাকতেন তাহলে লক্ষ্য করতেন সত্যজিৎ এই সূত্রেই আরো এক মর্মান্তিক সত্য উদ্‌ঘাটন করছেন। তিনি বলছেন মেয়ে যোগানের প্রশ্নে সোমনাথের চৈতন্যে শেকড় শুদ্ধ্ টান ঠিকই লেগেছিল, কিন্তু সেই সংকট মুহূর্তে তার গোড়ায় মাটি ঢালতে এগিয়ে এলেন সোমনাথেরই মাতৃসমা বৌদি—যিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালোবাসেন, প্রেমে পড়েছিলেন!

মেয়েদের ব্যাপারে বাস্তব জীবনে আজও আমাদের ভাবের ঘরে চুরি যতই থাকুক, বইয়ের পাতায় অথবা সিনেমার পর্দায় এ সবের কি কোনো ক্ষমা আছে? বিশেষত শরৎ জন্মশতবর্ষে?

সত্যজিতের নিরাসক্ত বাস্তব দৃষ্টির জোর এইখানে। তাই তিনি নটবর সহ সোমনাথকে এনে ফেলেন সেই মায়েরও কাছে যাঁর দুই মেয়ে বারবণিতা।

মা অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছেন।

ছোটো মেয়েটি ভেতরে 'ব্যস্ত' আছে। মা বাইরের ঘরে বসে নটবরের সঙ্গে খোশগল্প করেন। আর সোমনাথ দেখে "পদে পদে বিস্ময়।" বড় মেয়েটি একজন 'বাবু'র সঙ্গে বিদেশ গেছে। 'বাবু'টি যেমন-তেমন নয়, সাত দিনের মধ্যে একটি বারাঙ্গনার জন্য পাসপোর্ট ভিসা পি-ফর্ম যোগাড় করার ক্ষমতা রাখে। লক্ষণীয় যে গোটা দৃশ্যে 'বাবু' শব্দটি একবারও উচ্চারিত হয় না। উঁচুতলার আধুনিক বারবণিতা সমাজে 'বাবু' কবে যেন সমস্ত রকম মানবীয় লক্ষণ বিরহিত নিছক ক্লায়েণ্ট তথা বিমূর্ত 'পার্টি'তে পরিণত।

পরনে ধবধবে থান, চোখে রিমলেস চশমা, মাথায় ছোট্ট ঘোমটা, হাল ফ্যাশানের গৃহসজ্জায় গর্বিতা মা তাঁর কথার মধ্যে গ্রাম্য ঢঙে অশুদ্ধ উচ্চারণে

একটি ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করে বসতেই বোঝা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর রামবাগান নিঃশব্দে পার্ক স্ট্রীটে উঠে আসছে। আর, এই মামুলি সংলাপাদির মধ্য দিয়েই অতি পরোক্ষে এই নিষিদ্ধ কক্ষের সঙ্গে আমাদের অভিজাত সমাজ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি সম্পর্ক হঠাতই সত্যজিৎ প্রকাশ্য করে দেন।

প্রৌঢ়া সেই রমণী দুঃখ করে নটবরকে বলেন—ভেবেছিলেন বড় মেয়ে সখ মিটিয়ে বিদেশ গেল, এতদিনে তবু যাহোক ওর একটা ঘর-বরের সুরাহা হল। কিন্তু মেয়ে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে তার 'পার্টি' তাকে ব্যবসার প্রয়োজনে বিভিন্ন 'পার্টি'র মনোরঞ্জনের জন্য ব্যবহার করছে, টাকাও দিচ্ছে না। বড় মেয়ের দুর্দশার কথা বলতে বলতে মা কেঁদে ফেলেছিলেন। "টাকাও দিচ্ছে না" বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখের দৃষ্টি ও গলার স্বর বদলে গেল। মা-কে গিলে নিল আদি ও অকৃত্রিম বাড়িউলি। একটা গোটা চরিত্রকে—তার সৎ-অসৎ shades সহ—মুহূর্তে প্রতিষ্ঠিত করেন সত্যজিৎ, ছোট্ট দৃশ্যটিতে এত কথা বলেন।

এই নিষ্ঠুরতা সত্যজিৎ কণার ক্ষেত্রেও দেখিয়েছেন।

'জন অরণ্য' উপন্যাসে ছিল চাকরির ইন্টারভিউ দিতে দিতে সুকুমার পাগল হয়ে গেল। তারপর একেবারে শেষ মুহূর্তে জানা গেল তার বোন কণা কলগার্ল হয়েছে।

হ্যাঁ, এ-রকম হয় অনেক সময়। আর, শরৎচন্দ্র (অবশ্য খণ্ডিতভাবে) এবং 'কল্লোল' 'কালিকলম' ঐতিহ্যের লেখক শংকরের উপন্যাসে এ-রকম তো হয়ই। বাঙালি পাঠক এতে বেশ অভ্যস্ত।

'জন অরণ্য'য় শেষ পর্যন্ত হতাশার কথা বলা হয়েছে—সত্যজিতের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে 'সপ্তাহ' পত্রিকায় (৫ মার্চ ১৯৭৬) লেখা হয়েছে "সমস্যার বাস্তবিকতাকে ফুটিয়ে তোলার তাগিদ গল্পের সীমাকে অতিক্রম করে গেছে। শুধু তাই কেন নৈরাশ্যের হাত থেকে বাঁচাতে হয়েছে মানুষকে এ ছবিতে সত্যজিৎ রায়কে। যতদূর মনে পড়ে গল্পের সুকুমার পাগল হয়ে গিয়েছিল। ছবির সুকুমার যেমন করেই হোক শেষ পর্যন্ত একটা ট্যাক্সির পারমিট জুটিয়ে নিল। সুতরাং সত্যজিৎ রায় একটা নৈরাশ্য ও হতাশার ছবি তুলেছেন, যতই তার শিল্পকর্ম অসাধারণ হোক—এ অপবাদ ভিত্তিহীন।" 'সপ্তাহ' বামপন্থী ও গণতন্ত্রীদের পত্রিকা। সমালোচিকা নিজেও বামপন্থায় বিশ্বাসী। একপেশে সমালোচনার বিরুদ্ধে সত্যজিৎ রায়ের পক্ষে কলম ধরায় সহযোগী এই পত্রিকা ও সহযাত্রী সমালোচিকাকে সাধারণভাবে আমি অভিনন্দন জানাই।

এই লেখার কোনো কোনো সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু, আমারই দুর্ভাগ্যক্রমে, এই সমালোচনার কিছু অংশের প্রতিবাদও এখানে করতে হচ্ছে।

যেমন আলোচ্য উদ্ধৃতিটি।

সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে কলম ধরতে গিয়ে কি মতান্ধ, প্রায় হাস্যকর, অবস্থানই না এখানে গ্রহণ করা হয়েছে! 'জন অরণ্য'কে কি শেষ পর্যন্ত তথাকথিত অর্থে আশাবাদী হতেই হবে? কেন?

এই প্রসঙ্গে উপন্যাসে অবক্ষয়ের চিত্রায়ণ এবং লেখকের বক্তব্য বিচারের নিরিখ হিসেবে আমরা কি এঙ্গেলসের চিঠি স্মরণ করতে পারি না? 'আশা' 'নৈরাশ্য' ইত্যাকার কথা কবে আমরা এত হাল্কাভাবে বলা বন্ধ করব?

তাছাড়া, হতাশার ছবি আঁকা কি সর্বক্ষেত্রেই অপরাধ? ডস্টয়েভস্কিকে তাহলে আমরা কোথায় রাখব? (সোভিয়েত ইউনিয়নে আজ তিনি অবশ্য মহৎ কথাসাহিত্যিক রূপেই বন্দিত।) এমন কি, ঋষিপ্রতিম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চতুরঙ্গ' কোন জাগতিক আশাবাদে শেষ হয়? 'পুতুলনাচের ইতিকথা'? অতি-উৎসাহী সমর্থকের এই আশাবাদ-ব্যাখ্যা সত্যজিতকে ভিন্ন বিপদে ফেলবে না তো? ভাই পাগল, সংসার চালাবার জন্য বোন কলগার্ল হল—এর মধ্যে এক ধরনের আত্মবিসর্জনের মহিমা আছে। কিন্তু ভাই ট্যাক্সি ড্রাইভার, ফলে সংসারের আর্থিক অবস্থা আগের থেকে অনেক ভালো—এই অবস্থায় বোনকে কলগার্ল করানোয় আমাদের প্রচলিত আশাবাদ কি তৃপ্ত হবে? আমাদের বাস্তবভীত সেন্টিমেন্টালিজম কি আঘাত পাবে না?

শস্তা আশাবাদ প্রচারের জন্য সত্যজিৎ এ-পরিবর্তন করেন নি। সন্দেহ নেই স্ব-শ্রমে জীবিকার্জনের এই পথ সুকুমারকে তার জীবনসংগ্রামের নতুন ভূমি দেয়, প্রধানত 'বুদ্ধিজীবী' এই মধ্যবিত্ত সমাজের এক নতুন লক্ষণ সূচিত করে (যা এতদিনে অবশ্য খুব নতুনও নয়)। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের ঐ সমাজেরই এক বিরাট ও ক্রমবর্ধমান ব্যাধির দিকেও সত্যজিৎ রায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

টেকনোলজির বিস্ময়কর অগ্রগতি আধুনিক জীবনকে কোন সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের সন্ধান দিয়েছে মধ্যবিত্ত তা জানে। নিছক আর্থিক কারণে সে-জীবন তার আয়ত্তের বাইরে।

চাওয়া ও পাওয়ার এই ফারাক থেকে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

তার একটি হল আত্মকেন্দ্রিক মুহূর্তবাদ। ভোগ্যপণ্যসর্বস্ব জীবন। আমাদের যৌবনের এক বড় অংশ তাই আরেকটু ভালো থাকার জন্য খানিকটা উপায়ন্তর-

বিহীন ভাবেই হয় কণা নয় সোমনাথ হয়। একজন দেহ বিক্রি করে টাকা রোজগার করে, আরেকজন দেহ ভেট দিয়ে টাকা রোজগার করে।

এর মধ্যে কোনো শরৎচন্দ্রীয় ভাবাবেগ নেই। কণার মধ্যেও না।

ছবিতে কণাই একমাত্র প্রধান চরিত্র যে একবারও হাসে নি। কথাও বলেছে খুব কম। আগাগোড়াই সে মুখের ওপর একটা ইনডিফারেন্সের মুখোশ এঁটে রেখেছে, কিছু বা অবাধ্যতা ও বিরক্তির।

প্রথম পাওয়া কমিশনের টাকায় সন্দেশ কিনে সোমনাথ সুকুমারের বাড়ি গেল, বাড়ি-বিষয়ে সুকুমারের হীনম্মন্যতার তোয়াক্কা না করেই গেল। সুকুমারের মা বহুকাল বাদে ছেলের বন্ধুকে দেখে আন্তরিক খুশী হলেন, খুশী হল বালিকা ছোটো বোনও। কণা তখন কলঘরে। দাদার সোৎসাহ ডাকাডাকির জবাবে তার ইনডিফারেণ্ট কথা ও স্বর সমস্ত উত্তাপে যেন জল ঢেলে দেয়। সোমনাথ যে-ঘরে বসেছে তার দরজার পাল্লা দুটি ফাঁক করে সদ্যস্নাতা কণা শুধু মুখটুকু ভেতরে ঢোকায়। সোমনাথ বহু দিন পরে তাকে দেখছে।

'জন অরণ্য' ছবিতে কণার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি এইভাবে ঘটল, দরজার আড়ালে গোটা শরীর, শুধু পাল্লার ফাঁকে নির্বিকার মুখটুকু দেখা যাচ্ছে। (আরও পরে কেরাণীর কলগার্ল বৌর বাড়িতে দরজার পাল্লার ফাঁকে একটি রূপসী মুখকে আমরা উঁকি মারতে দেখি। কিন্তু কত পার্থক্য দুটি দৃশ্যে, অভিব্যক্তিতে, ব্যক্তিত্বে।)

তারপর কণাকে দেখা যায় প্রায়ান্ধকার ঘরে পোশাক পালটাচ্ছে। জানলার বাইরে কিছু মাস্তান লোলুপ চোখে সে-দৃশ্য দেখছে। এতকাল বাদে ছেলের বন্ধুকে পেয়ে সুকুমারের বুড়ো বাপ অশ্লীল ভাষায় তার কাছে বেকার সুকুমারের কুৎসা গাইছেন। পারিপার্শ্বের এই শব্দ ও দৃশ্যগত কুশ্রীতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কণা পোশাক পালটায়। সুকুমারের চড়কেও অবাধ্য জেদে কার্যত উপেক্ষাই করে। সে চায় দ্রুত এই মর্যাদাবিরোধী পরিবেশ থেকে বেরিয়ে নিজের কাজে যেতে। সুন্দর সফল সোমনাথ সম্পর্কে তার চোখেমুখে অনুরাগ বা বিরাগ কিছুই প্রকাশ পায় না।

তারপর কণাকে দেখা যায় ছবির একেবারে অন্তিম পর্বে, কমার্শিয়াল স্কুলের দরজায়, কলগার্লদের ওয়েটিংরুমের সামনে। সোমনাথকে দেখে চোখে তার চমক, অস্বস্তি। কিন্তু মুখে সেই জেদী ইনডিফারেণ্ট মুখোশ।

তাই ট্যাক্সিতে সোমনাথের 'কণা' সম্বোধনকে সে কঠোর ভৎ‌র্সনা করে শুধু বলে—"আমি যুথিকা।" বলে—"ওসব কথায় কারোরই কোনো লাভ হবে না।"

কারণ, এই লাভের জন্যই তো কণার মৃত্যু, যুথিকার জন্ম। এই লাভের জন্যই তো সোমনাথ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দুলতে দুলতে সন্ধ্যে থেকে নটবরের সঙ্গে একটি মেয়ে খুঁজছে। এবং এক-একবার ব্যর্থ হয় আর ভাবে—ভালোই হল, দরকার নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বন্ধুর বোনকেই হোটেলে গোয়েঙ্কার ঘরে ঢুকিয়ে দেয়।

যুথিকারও নিজস্ব কোড. অব কণ্ডাক্ট আছে। সোমনাথের আবেগ ও দ্বিধার উত্তরে সেই অবাধ্য অথচ ইণ্ডিফারেণ্ট ভঙ্গিতে স্পষ্টই জানায় হোটেলে যেতে না হলে টাকা সে নেবে না। এমন কি সোমনাথ যে বেশি টাকা দিচ্ছে সে সম্পর্কেও তাকে (সেই চরম মুহূর্তে) নিস্পৃহ ভাবেই সচেতন করে দেয়। আর, সোমনাথ যখন বলে "জেনেই দিচ্ছি," তখন দ্বিরুক্তি না করে টাকাটা ব্যাগে ভরে ঘরে ঢুকে যায়। যার কাছে যাচ্ছে আর যে তাকে পাঠাচ্ছে—দুজনেই তার কাছে সমান অপরিচিত।

কেরাণীর বৌর ভঙ্গিটা ছিল ক্যাজুয়াল। 'জন অরণ্য'র বিস্তৃত অংশ জুড়ে এই ভঙ্গিরই প্রাধান্য। কণা ও যুথিকার অবাধ্য অথচ ইণ্ডিফারেণ্ট ভঙ্গি যে বৈপরীত্য সৃষ্টি করল—তার মধ্য দিয়েই ফেটে বেরুল এই ছবির অন্তর্লীন চাপা গোঙানি, অনুচ্চারিত হাহাকার।

সোমনাথের মুখের ওপর গোয়েঙ্কার ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। লিখিত অর্ডারের জন্য সে নীচে অপেক্ষা করে। তার জীবনে মাসে দু-হাজার টাকা আয়ের দরজা খুলে যায়।

মূল্যবোধের এই সংকট—যুদ্ধ-মন্বন্তর-দাঙ্গা-দেশবিভাগে যার শুরু—পূর্ণতা পায় শেষ দৃশ্যে। টলতে টলতে সোমনাথ বাড়ি ফেরে। জড়ানো স্বরে বলে—অর্ডারটা পাওয়া গেছে। স্থির দৃষ্টিতে বৌদি তার দিকে তাকিয়ে থাকেন। আদর্শবাদী পিতা হাঁফ ছেড়ে বলেন—"যাক। বাঁচা গেল।"

গোটা ছবিতে দুটি ফ্রীজ শটের ব্যবহার হয়েছে। প্রথমটি একেবারে গোড়ায়, অপরটি শেষে।

বি. এ. পার্ট টু-র পরীক্ষা চলছে। ক্লাসরুম। পেছনে দেয়াল। দেয়ালের মাঝখানে ব্ল্যাকবোর্ড। বোর্ডের দুধারে অপটু হস্তাক্ষরে ভুল বানানে কালো অক্ষরের দেয়াললিপি, মাও সে তুংয়ের ছবি। সি. পি. এম. এবং সি. পি. আই. এম. এল. দলের কিছু বাছা বাছা স্লোগান। সামনে প্ল্যাটফর্ম, তার ওপর চেয়ার, চেয়ারে গার্ড মহাশয় টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে বসে। তাঁর চোখের সামনে হল।

হল জুড়ে ছেলেরা নানা কায়দায় কিন্তু অবাধে নকল করছে। আর ইনভিজিলেটর চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর নিয়মমাফিক পদচারণা।

'হ য ব র ল'র বিচারদৃশ্যের কথা মনে পড়ে না ?

সোমনাথ নকল করে না, কিন্তু কিছুটা দ্বিধাগ্রস্তভাবে অথচ হাসিমুখে একটি চারমিনার সিগারেটের প্যাকেট তার বন্ধুর থেকে নিয়ে অপরজনকে দেয়। প্যাকেটে নকল করার কাগজ।

গার্ড মহাশয় একসময় না বলে পারেন না—"কি হচ্ছে কি ?"

একজন পরীক্ষার্থী মুখ ভেঙচে সকৌতুকে উত্তর দেয়—"পরীক্ষা হচ্ছে স্যার।"

গোটা হলটা হাসিতে ফেটে পড়ে।

'হ য ব র ল'তে বিচারদৃশ্যে হিজি বিজ্ বিজ্‌কে প্রশ্ন করা হয়েছিল—" 'তুমি মোকদ্দমার বিষয় কিছু জান ?' " সে উত্তর দেয়—" 'তা আর জানি নে ? একজন নালিশ করে তার একজন উকিল থাকে, আর একজনকে আসাম থেকে নিয়ে আসে, তাকে বলে আসামী, তারও একজন উকিল থাকে। এক-একদিকে দশজন করে সাক্ষী থাকে। আর একজন জজ থাকে, সে বসে-বসে ঘুমোয়।' "

"প্যাঁচা বলল, 'কক্ষনো আমি ঘুমোচ্ছি না, আমার চোখে ব্যারাম আছে তাই চোখ বুজে আছি।' "

"হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, 'আরও অনেক জজ দেখেছি, তাদের সক্কলেরই চোখে ব্যারাম।' বলেই সে ফ্যাক্-ফ্যাক্ করে ভয়ানক হাসতে লাগল।"

পরীক্ষার্থীদের হাসির রেশ মেলাতে না-মেলাতে দরজায় একটি মাস্তানের আবির্ভাব। গার্ডের এক হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে একজন পরীক্ষার্থীকে ডাকল, হাতের বইটা বেশ ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে তাকে দিল, ক্যাজুয়াল স্বরে কিন্তু গার্ডকে জানান দিয়ে নিজের আবির্ভাব জাহির ও তাঁর উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে বলল—উত্তরের জায়গাটায় পেজমার্ক দেওয়া আছে। তারপর চলে গেল।

আর, পরীক্ষা চলতে লাগল। লেখা শেষ করে সোমনাথ যখন টেবিলে খাতা জমা দিতে যায় তখন ওদিক থেকে ইনভিজিলেটর তাঁর নিয়ম মাফিক, প্রায় যান্ত্রিক, পদচারণায় এদিকে আসছিলেন। সোমনাথ আর তিনি যখন পরস্পরবিপরীতমুখী, সমান্তরাল, অথচ ঘনিষ্ঠ—তখনই দৃশ্যটি স্থির হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ফ্রীজটি ঘটে শেষ মুহূর্তে।

আদর্শবাদী পিতা সোমনাথের পরীক্ষার ফল তথা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চান, তারপর বড়ছেলের পরামর্শে নিরস্ত হন। মেনে নেন। সোমনাথ চাকরি পাচ্ছে না, অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা

করতে চায়—তিনি দুঃখিত হন। কারণ তাঁদের পরিবারে অদ্যাবধি কেউ ব্যবসা করে নি, এমন কি তাঁর দু-পুরুষ আগে কেউ চাকরিই করে নি। সোমনাথ ও তার বৌদির ভয় ছিল বুঝি বাবা বেঁকে বসবেন। কিন্তু দুঃখিত চিত্তে অথচ প্রায় "এক কথায়" ছেলেকে বৃদ্ধ অনুমতি দেন। অর্থাৎ, বৃত্তিবদল মেনে নেন। বড়ছেলে ভালো চাকরি করে (সম্ভবত একসিকিউটিভ), জীবনে সে থিতু হয়েছে। তাঁর নিরন্তর ভাবনা ছোটোটির জন্য। অবশেষে খাওয়ার টেবিলে সোমনাথ জানায় কাপড়ের কলের সম্ভাব্য অর্ডারটি পাওয়া গেলে শুধু এই সূত্রেই মাসে দু-হাজার টাকা আয় নিশ্চিত হবে। কথায় কথায় তিনি জানতে পারেন তার জন্য ঘুষ দেওয়ার দরকারও হতে পারে। বৃদ্ধের নীতিবোধে ঘা লাগে। এই প্রসঙ্গে বড়ছেলের নিতান্ত ক্যাজুয়াল ঠাট্টা-তামাশা (সে অবশ্য সাদা মনেই বলেছিল) তাঁকে যারপরনাই আহত করে। তিনি খাওয়া ছেড়ে উঠে যান। ঐ এক টুকরো বাড়িতেই নিজের চারপাশে দেয়াল তুলে নেন। গ্রীল দেওয়া লবিতে নীরবে বসে থাকেন। গোটা ছবিতে মাত্র এই লবির ফ্রেমেই আলোছায়ার জটিলতা সৃষ্টি হয়। তারপর বিধ্বস্ত সোমনাথ আসে। বৌদির চোখে স্থির বিচিত্র দৃষ্টি। তাঁর সমস্ত টেনশ্যন ঐ চাহনিতে ফুটে ওঠে। সোমনাথ জানায় অর্ডারটা পাওয়া গেল। এত বড় খবরেও বৌদির স্থির বিচিত্র দৃষ্টি এতটুকু বদলায় না। কিন্তু বদলায় বাবার অভিব্যক্তি। বৃদ্ধ, দর্শকদের দিকে মুখ, নিশ্চিন্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে পরম আহ্লাদে বলেন—"যাক বাঁচা গেল।" দৃশ্যটি স্থির হয়ে যায়।

সেই সঙ্গে চক্রও সম্পূর্ণ হয়। আদর্শবাদী পিতা ঘুষের বিনিময়ে অর্ডার পাওয়াটা শুধু মেনেই নেন না—তার অংশীদারও হন। মাত্র কিছুদিন আগে যিনি নকশালপন্থীদের বোঝার জন্য তাদের বইপত্র পড়তে চেয়েছিলেন, ভবিষ্যৎ সিকিউরিটির উল্লাসে তিনি আজ তাঁর আত্মজের চোখমুখের প্রকট লিপিটুকু পর্যন্ত পড়ে দেখার আগ্রহ বোধ করেন না।

বি. এ. পার্ট টু পরীক্ষার হলে সোমনাথ নকল করার ব্যাপারে কিছুটা নিষ্ক্রিয় সহযোগী ছিল। সাক্ষী—গার্ড এবং ইনভিজিলেটর। কেউই প্রতিবাদ করে নি।

বড়বাজারের পরীক্ষায় সে হল সক্রিয় সহযোগী। সাক্ষী—বাবা, বৌদি। কেউই প্রতিবাদ করল না।

এই ছবির বিশিষ্টতা এইখানে। পরোক্ষে কিন্তু নিশ্চিতভাবে সত্যজিৎ অক্টোপাস সিস্টেমের চেহারা দেখিয়েছেন। কিন্তু শুধুই সিস্টেমের দোহাই দিয়ে সবাইকে তার শহিদ বানিয়ে শস্তা বিপ্লবীপনা করেন নি।

জঁা পল সার্ত্র একবার বলেছিলেন আমরা সবাই হত্যাকারী। পৃথিবীর প্রতিটি হত্যার নৈতিক দায়িত্ব খানিকটা আমারও।

স্বাধীনতা-উত্তর কালের, বিশেষত গত দশ বৎসরের, ইতিহাস যদি স্মরণ করি তাহলে নিজেদের কোনো না কোনো দায় আমরা কে কিভাবে অস্বীকার করব ?

'কালান্তর'-এর সমালোচক মহাশয় অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন "মুখ্য চরিত্র সোমনাথ প্রথমাবধিই কেমন নিষ্ক্রিয়।" হলে কোনো ক্ষতি ছিল না। আমার পড়া মহত্তম উপন্যাস 'ইডিয়ট'-এর প্রিন্স মিশকিনের চেয়ে বড় নিষ্ক্রিয় চরিত্র কে ? কিন্তু সেই নিষ্ক্রিয় চরিত্রের মধ্য দিয়েই বিপ্লব-পূর্ব রুশ দেশ ও সমাজের এক বৃহৎ অংশের অবক্ষয় কি অসামান্যই না চিত্রিত হয়।

কিন্তু কথা হল—সোমনাথ নিষ্ক্রিয় নয়, বিপ্লবীও নয়। সে অ্যাভারেজ। প্রেমিকা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে জেনে অনায়াসেই মিথ্যে করে বলে মাত্র সাত নম্বরের জন্য অনার্সে ফার্স্টক্লাস হল না। আশা, ভবিষ্যতে অন্তত অধ্যাপক আর ইতিহাসের ডাক্তার হবে এই ভরসায় যদি প্রেয়সী অপেক্ষা করে। মেয়েটির হাত চেপে ধরে সে বলতে পারে না—দুঃখব্রত গ্রহণ করো। কি করে বলবে ? সে নিজেও তো দুঃখের ব্রতে রাজি নয়। ভারবাহী অশ্বেতরর নাকের সামনে ঝোলানো গাজরের মতো তারও তো সামনে ভোগ্যপণ্যসর্বস্ব জীবনের হাতছানি।

তাই যা হবার তাই-ই হয়। আর সেটুকু হওয়াবার জন্য যতখানি সক্রিয়তা দরকার—সোমনাথ ততটাই সক্রিয়। বাদবাকি ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় বৈকি !

বর্তমান মধ্যবিত্ত সমাজের এক অংশের এই আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, বৃহতের আহ্বান বিহীন জীবনের সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তার গৌরনিতাই লীলা কি শরিকি সংঘর্ষের ভয়াবহ দিনগুলিতে যথেষ্ট প্রকট হয় নি ? আজও নিরন্তর হয় না ?

তিন

'স্টেটসম্যান' 'জন অরণ্য'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসার শেষে লিখেছেন "There is no message". মনে হয় এই মন্তব্যটিও প্রশংসার জন্যই করা হয়েছে।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এই রাজ্যের অ-প্রবীণ শিল্পী-সাহিত্যিকদের যে-সভা হয়, 'সানডে' পত্রিকায় তার একটি সচিত্র রিপোর্ট বেরিয়েছে (৭ মার্চ ১৯৭৬)। তাতে এক জায়গায় বলা হয়েছে: "Another bright moment was when the Chief Minister dragged Satyajit Ray's film Jana Aranya into the discussion. He thought it was a great work

of art, likely to earn many a prize the world over, but it might ereate a sense of frustration and despair in the minds of the youth."

প্রশ্নোত্তরের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী জানান :—"We are not going to ban it (একজন 'লেখক' সভায় ঐ দাবি করেছিলেন) and we think as an work of art this is great. But does it fulfil a purpose ?"

'সপ্তাহ'র সমালোচনায় বলা হয়, "কিন্তু আমি নিজে বামপন্থায় বিশ্বাসী হলেও আমার কাছে দুর্বোধ্য সেই দায়িত্বশীল বামপন্থী দৈনিকের সমালোচনা। শ্রমিক হোক, কৃষক হোক, আর মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে সোমনাথ ব্যানার্জিই হোক —এদের চেতনার শিকড় শুদ্ধ টান দেওয়ার দায়িত্ব সুকুমার রায়ের পুত্র সত্যজিৎ রায়ের নয়।" আগেও তিনি বলেছেন 'জন অরণ্য'র পরিচালক "'মেসেজ'-এর নাম করে কোনো কৃত্রিম সমাধানের পথ দেখানোর বুজরুকি করেন নি।"

'স্টেটসম্যান' ও 'সপ্তাহ' নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে 'জন অরণ্য'কে প্রশংসা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন 'জন অরণ্য' মহান শিল্পকর্ম। তথাকথিত মেসেজ-এর প্রশ্নে পত্রিকাদুটি ও মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে অবস্থানের ভিন্নতা সত্ত্বেও এক জাতীয় মিল তবু ঘটল কি করে ? ঘটল সমালোচকদের নিজ নিজ স্ববিরোধিতার জন্য।

মুখ্যমন্ত্রী নিজেই নিজের বক্তব্য খণ্ডন করেছেন। উদ্দেশ্যবিহীন কোনো সৃষ্টি মহৎ শিল্পকর্ম হতে পারে না।

'মেসেজ' শব্দটি 'স্টেটসম্যান' যে অর্থেই ব্যবহার করুন, 'জন অরণ্য'য় মেসেজ নেই একথা তাঁরা প্রশংসা বা নিন্দা যে অর্থেই বলুন—ভিস্যুয়াল আর্ট কিছু বলছে না, এ হতেই পারে না।

'সপ্তাহ'র বক্তব্যেও স্ববিরোধ মারাত্মক। "বামপন্থায় বিশ্বাসী" সমালোচিকা শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের "চেতনার শিকড় শুদ্ধ টান দেওয়ার দায়িত্ব" থেকে সত্যজিৎ রায়কে অব্যাহতি দিয়েছেন। (জানি না সমালোচিকা স্বয়ং উপেন্দ্রকিশোরের বন্ধু স্থানীয়া ছিলেন কি না, তবে) সত্যজিৎ যে সুকুমার রায়ের পুত্র এই তথ্যটুকু অপ্রাসঙ্গিকভাবে জানাতে পারার অশালীন অহঙ্কার থেকেই কি সৃজনধর্মী শিল্পীদের এ-জাতীয় দায়িত্ব দেওয়া না-দেওয়ার অধিকারবোধের মোহ জন্মায় !

তারপরই সেই মিথ্যা অধিকারের সীমা শিল্প থেকে রাজনীতিতে প্রসারিত হয়। শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত চেতনার শেকড় শুদ্ধু টান দেওয়ার দায়িত্ব মজুদ রাখা হয় নানা ছাপের বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য। বোঝা যায় সমালোচিকার অধিকারবোধ একেবারেই মনোপলিস্টসুলভ, তাঁর স্পর্শকাতরতাও অপরিসীম।

মুঠি একটু আলগা করে এমনকি প্রগতিশীল কংগ্রেসী বা গণতন্ত্রীদেরও সে-অধিকার দিতে তিনি রাজি নন।

এই উগ্র বামপন্থী সংকীর্ণতার জন্যই 'জন অরণ্য'র পক্ষে কলম ধরেও কার্যত সুকুমার রায় ও সত্যজিৎ রায়কে তাঁদের জীবনের সব থেকে বড় অসম্মান করা হয়। যে-দায়িত্ব থেকে সত্যজিৎ রায়কে জোর করে অব্যাহতি দিয়ে দেওয়া হল—সত্যজিৎ স্বয়ং কোনোদিন সে-দায় অস্বীকার করেন নি। 'পথের পাঁচালি' থেকে 'জন অরণ্য' পর্যন্ত আপন শিল্পমাধ্যমে নিজের ভাষায় তিনি সাধ্যমতো সে-দায়িত্বই পালন করছেন—যে কোনো সৎ স্রষ্টা যা করতে বাধ্য। (আর 'হ য ব র ল'র মহৎ ও দায়বদ্ধ সুকুমার রায়কেই বা কবে আমরা সাবালক দৃষ্টিতে দেখতে শিখব ?)

তলিয়ে দেখতে পারার অক্ষমতা থেকেই হয়তো 'জন অরণ্য'র আলোচনা প্রসঙ্গে বামপন্থী এই সাপ্তাহিকে বামপন্থী সমালোচিকা শেষ পর্যন্ত বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী মাত্রকেই 'লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক' বলে বসেন।

লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় যদি এই পংক্তিগুলি বেরুত তাহলে কি বলতুম আমরা ? কি বলা উচিত ?

'গোরা' মনে পড়ে। গ্রহণের স্নান উপলক্ষে ত্রিবেণীগামী তীর্থযাত্রীদের স্টীমারে ওঠার সময়কার দুর্দশা দেখে ফার্স্ট ক্লাস ডেকে দাঁড়ানো একজন ইংরেজ ভদ্রলোক ও পানুবাবুর হাস্যপরিহাসে ক্রুদ্ধ গোরার প্রতিক্রিয়া কার না মনে পড়বে—"ধিক তোমাদের ! লজ্জা নাই !" পানুবাবু উত্তর দিলেন—"লজ্জা ! দেশের এই সমস্ত পশুবৎ মূঢ়দের জন্যই লজ্জা।" তারপর পরেশবাবুর বাড়িতে বসে গোরা আর পানুবাবুর তর্ক। …"হারান বাঙালি চরিত্রের নানা দোষ ও দুর্বলতার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।" এবং "দেখিতে দেখিতে গোরার মুখ লাল হইয়া উঠিল ; সে তাহার সিংহনাদকে যথাসাধ্য রুদ্ধ করিয়া কহিল, "এই যদি সত্যিই আপনার মত হয় তবে আপনি আরামে এই টেবিলে বসে বসে পাঁউরুটি চিবোচ্ছেন কোন্ লজ্জায়।" " গোরা বলে—"হারানবাবু, মিথ্যা পাপ, মিথ্যা নিন্দা আরও পাপ, এবং স্বজাতির মিথ্যা নিন্দার মতো পাপ অল্পই আছে।" তারপর গোরা সেই চরম বাক্যটি উচ্চারণ করে—"আপনি একলাই কি আপনার সমস্ত স্বজাতির চেয়ে বড়ো। রাগ আপনি করবেন—আর আমাদের পিতৃপিতামহের হয়ে আমরা সমস্ত সহ্য করব !"

সত্যজিৎ রায় এতবড় মূঢ়তা কোনোদিন করেন নি। তাই তো 'পথের পাঁচালি'তে ইন্দির ঠাকরুণ, 'অপরাজিত'য় সর্বজয়া এবং 'চারুলতা'য় চারু এত সত্য। ভারতের মাটি ও মানুষের সঙ্গে অন্বয়-সাধনই তাঁর নিজস্ব সংগ্রাম।

বলাই বাহুল্য একুশ বছরে তোলা একুশটি ফীচার ফিল্মে সত্যজিতের সাফল্য সমান নয়। কিন্তু তাঁর কোনো কোনো মিত্র যা-ই বলুন—সত্যজিতের ছবিতে কোনো বক্তব্য নেই, কিছুমাত্র কমিটমেণ্ট নেই…এমন অপবাদ তাঁর অতিবড় শত্রুও দিতে পারবে না। 'জন অরণ্য'ও কমিটেড। এই ছবিরও একটি সুস্পষ্ট বক্তব্য আছে।

গোর্কি একদা ভারী সুন্দরভাবে বলেছিলেন চেখভের রচনা আত্মতৃপ্ত রুশী জীবনের অবসাদকে হঠাৎ নাড়া দিয়ে বলে ওঠে: ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা ভালো নেই। 'জন অরণ্য'ও ঠিক তাই বলছে।

এ-ছবিতে কোথাও শ্রমিক নেই, কৃষক নেই। সমগ্র মধ্যশ্রেণীর কাহিনীও এ নয়। কিন্তু নিশ্চিতভাবে আমাদের কলকাতা-কেন্দ্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক-বিরহিত অনিকেত মধ্যবিত্ত সমাজের বৃহদংশের অবক্ষয় ও পতনের মর্মান্তিক মানবিক দলিল হল সত্যজিৎ রায়ের 'জন অরণ্য'।

সামাজিক ব্যাধি সম্পর্কে চোখ বুজে থাকা মূঢ়তা, তাতে ব্যাধির অস্তিত্ব মিথ্যে হয়ে যায় না, প্রতিরোধও অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর, মনে রাখা দরকার হতাশার প্রচারক এভাবে সামাজিক পলায়নপরতার মুলে আঘাত করে না।

'জন অরণ্য' কি বিদেশে ভারতীয় সমাজ জীবনের ইমেজকে কলুষিত করবে? আমি তা মনে করি না। 'লা দোলচে ভিতা' ফেলিনির অক্ষয় সৃষ্টি। সে-ছবিতে আমরা ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার আত্মিক সংকটের অমোঘ পরিচয় পাই। কিন্তু ইতিহাসের ধারা সম্পর্কে আস্থা হারাই না। পর্তুগালের স্পেনের ইতালির ফ্রান্সের দিকে সজাগ আগ্রহে তাকিয়ে থাকি।

আমাদের জীবনে এখনো যে অনেক অপূর্ণতা আছে, এই দেশকে এখনো যে বহু কিছু অর্জন করতে হবে—প্রধানমন্ত্রীর কুড়ি দফা কর্মসূচীই তো সেকথা মনে রাখতে বলছে। কবে শুনব 'টুয়েণ্টি পয়েণ্ট প্রোগ্রাম'ও মহান ভারতভূমির ইমেজ ক্ষুণ্ণ করছে। পূর্ণতা অর্জনের পথ অবক্ষয়কে রঙীন পোশাকে ঢেকে রাখা নয়। কার্যকারণ সম্পর্ক সহ তার স্বরূপ উদঘাটন করা। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো।

সত্যজিৎ 'জন অরণ্য'য় সেই কাজই করেছেন। তাই, আমার মতে, 'জন অরণ্য' হতাশা নয় প্রতিবাদের ছবি।

আমি ধ্রুব জানি যেমন 'পথের পাঁচালি', 'অপরাজিত', 'অপুর সংসার'—তেমনি 'জন অরণ্য'য় আরেক ট্রিলজির সূত্রপাত হল। এই সময়ের সমগ্র বাস্তবতাকে তিনি ধারণ করতে পেরেছেন কি না—একমাত্র পরবর্তী ছবি দুটি দেখার পরই তার বিচার সম্ভব।

সব শেষে 'জন অরণ্য' সম্পর্কে আমার দু-একটি ছোট্ট আপত্তি জানিয়ে রাখি।

১. মূল কাহিনীকে অনুসরণ করার ব্যাপারে পরিচালক আরেকটু কম বিশ্বস্ত হতে পারতেন।

২. সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কিছু পরিমাণে উৎপল দত্তের অভিনয়ে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রের মান রক্ষিত হয় নি।

৩. বড়বাজার পর্বের শুরুটা আকস্মিক, প্রায় যেন দৈব-নির্ভর। বিশুদার ফেলা কলার খোসায় সোমনাথের পদস্খলন ঘটনা হিসেবে কিছুটা বানানোও বটে। আর, বিশুদা যখন অর্ডার-সাপ্লাই বিজনেসটা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে শুরু করেন তখন সত্যজিৎ রায় মান্ধাতার আমলের বাঙলা বায়োস্কোপের ধরনে একগাদা বালতি থেকে একটি আস্ত হাতি পর্যন্ত দেখিয়ে বসেন। এই সিকোয়েন্সগুলির এহেন উপস্থাপনা শুধু অপ্রত্যাশিতই নয়, আমার নিজের কাছেও ব্যাখ্যার অতীত।

এ-ছবির বিষয় বক্তব্য সম্পর্কে কোনো আপত্তি আমার নেই। যেটুকু সংশয় তা 'জন অরণ্য'র কোনো কোনো অংশের শিল্পকর্মগত সাফল্য সম্পর্কে।

কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ, চলচ্চিত্র মাধ্যমের ওপর যাঁর অধিকার প্রশ্নাতীত, পৃথিবীর দেশে দেশে অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র-উৎসবের বিচারক রূপে নিয়মিত যিনি চলচ্চিত্রের আধুনিকতম ভাষার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ পান, তিনি, সত্যজিৎ রায়, কেন বড়বাজারের দৃশ্যপর্যায় এমন সাবেকি ঢঙে তুললেন—এ ব্যাপারটা তো আমাকেও বুঝতে হতেই পারে। আমি তো এ দেশের হাজার লক্ষ সাধারণ দর্শকের একজন বই কিছু নই!

আর, এই আমাদেরি সমালোচনা থেকে সত্যজিৎ রায় যদি কোনো ভাবনার খোরাক পান—আমি নিশ্চিত জানি, তাকে তিনিও উপেক্ষা করবেন না।

'গোরা' থেকে 'চতুরঙ্গ'। তারপর কি 'চার অধ্যায়', না 'শিশুতীর্থ'?

এখনও জানি না। কিন্তু এটুকু বুঝি—বাঙলা চলচ্চিত্রের নতুন ভাষার জন্য এখনও আমাদের তাঁর দিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে। হ্যাঁ, সত্যজিৎ রায়েরই দিকে।

১২ মার্চ ১৯৭৬ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রচনাটি সম্পর্কে পাঠকদের মতামত আহ্বান করা হচ্ছে—সম্পাদক

কলেজ স্কোয়্যার সংলগ্ন স্টুডেন্টস হল-এ ১ ও ২ মে তারিখে পশ্চিমবঙ্গ প্রগতি লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল।

তিনটি কারণে এই সম্মেলন ঐতিহাসিক।

১৯৭৬ সাল নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘর ৪০তম প্রতিষ্ঠা বৎসর।

তেইশ বছর বাদে পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীল লেখকরা একটি রাজ্যসম্মেলনে মিলিত হলেন।

পশ্চিমবঙ্গ প্রগতি লেখক সংঘ পুনর্গঠিত হল।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সময় লেখকদের ভীড়ে স্টুডেন্টস হল আক্ষরিক অর্থেই উপচে পড়েছিল। উপস্থিতির তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ১৯৭৫ সালে গয়া সম্মেলনে গৃহীত ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ প্রগ্রেসিভ রাইটার্স-এর ম্যানিফেস্টোর ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন প্রকৃতই দল-গোষ্ঠী-বয়েস ও প্রতিষ্ঠা নির্বিশেষে বামপন্থী এবং গণতন্ত্রী লেখকদের মহামিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। এই রাজ্যের সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর (হিন্দি, উর্দু, নেপালী) প্রতিনিধিরা এবং গ্রামাঞ্চলের লেখকরা বিপুল সংখ্যায় এসেছিলেন। নিজের হাতে চাষ করেন আর কবিতা লেখেন এমন নবীন কবি এবং বিষ্ণু দে সমান উৎসাহে সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছেন। কৃষক নেতা দেবেন দাশ এবং গোপাল হালদার, হীরেন্দ্রনাথ ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিজ নিজ ভাষায় প্রায় একই আবেগ প্রকাশ করেছেন।

সম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণ পরিচয়-এর পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে প্রগতি লেখক আন্দোলন ও প্রগতি লেখক সংঘর যাকে বলে নাড়ির সম্পর্ক। এই পত্রিকার সম্পাদক ও অন্যতম নিয়মিত লেখক ছিলেন সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক। 'পরিচয়'-এর উপদেশকমণ্ডলীর সদস্যরা প্রায় সকলেই সম্মেলন পরিচালনার জন্য নির্বাচিত সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রগতি লেখক সংঘর নব নির্বাচিত সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে 'পরিচয়'-এর ঘনিষ্ঠতা সুবিদিত। নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক —রাম বসু, দেবেশ রায়, সৌরি ঘটক—'পরিচয়'-এরই নিয়মিত লেখক, কর্মী।

আমরা আশা করি পুনর্গঠিত প্রগতি লেখক সংঘ আমাদের জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে যথাযোগ্য ভুমিকা পালন করবে। কমিটমেণ্ট, সৃজনশীলতা, ব্যাপ্তি —এই হোক ঐতিহ্যমণ্ডিত আমাদের প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের রণধ্বনি।

'পরিচয়' আগের মতোই এই মহান ও সম্ভাবনাময় আন্দোলনে তার স্বেচ্ছা-সৈনিক এবং সহ-শিল্পীর ভূমিকা অক্ষুণ্ণ রাখবে।

চিঠি

১৯৬৮ সালের আগস্ট মাসে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি বিনীতভাবে 'পরিচয়'-এর মতো ঐতিহ্যবান পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করি।

১৯৭২ সালের জুলাই মাসে আমি ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হই। ভেবেছিলাম যে তা সত্ত্বেও 'পরিচয়'-এর দায়িত্ব আগের মতো বহন করতে পারব। কিন্তু ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী আন্দোলনের পরিধি এতই বিস্তারিত হয়ে পড়েছে যে আমার পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া আমার অন্যান্য কাজকর্মও আছে।

১৯৭২ সালের সেই জুলাইয়ের পর থেকে অনিবার্যভাবেই 'পরিচয়'-এর ব্যাপারে আমার দায়িত্ববহন ক্রমশ কমতে থাকে। আর, আমার সহযোগী বন্ধু দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর সেই দায়িত্ব সমান মতোই বেড়ে চলে। 'পরিচয়'-এর আমার অন্যান্য বন্ধুরা দীপেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার বহু দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছিলেন। আমি তাঁদের সকলের প্রতিই কৃতজ্ঞ।

বর্তমানে আমার পক্ষে 'পরিচয়'-এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা একেবারেই সম্ভব নয়—বস্তুত বেশ অনেকদিন ধরেই এ-দায়িত্ব আমার পক্ষে যথোপযুক্তভাবে পালন করা সম্ভবপর হয় নি। 'পরিচয়'-এর প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রীতি বশত 'পরিচয়'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব থেকে আমি ভেবে দেখলুম আমার অব্যাহতি নেওয়াই উচিত। 'পরিচয়'-এর বিপুল শুভার্থী লেখক পাঠক যে আনুকূল্য এবং প্রীতি আমাকে দেখিয়েছেন তার জন্য আমি চিরদিনই ঋণী থাকব।

আমার বন্ধু দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সম্পাদনার ক্ষেত্রে যাঁর যোগ্যতা তুলনারহিত—মাথা পেতে দুজনের দায়িত্ব যে একা বহন করতে রাজী হয়েছেন এজন্যে তাঁকে আমি ধন্যবাদ জানাই। অবশ্য আমরা প্রায় বাল্যবন্ধু এবং জীবনধর্মী একই প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সাথী। তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ জানাবার কোনো মানে হয় না।

একথাও বলা বাহুল্য যে লেখক হিসেবে 'পরিচয়'-এর সঙ্গে ১৯৫০ সাল থেকে গড়ে ওঠা আমার সম্পর্ক কোনোদিনই ম্লান হবার নয়। ভবিষ্যতেও এই পত্রিকার সঙ্গে আমার লেখক-সম্পর্ক অক্ষুণ্ণই থাকবে।

আমি আশা করব দীপেন্দ্রনাথ প্রগতিশীল লেখক আন্দোলনের যথাযোগ্য মুখপত্র হিসেবে 'পরিচয়'-এর গৌরবময় ঐতিহ্যকে অব্যাহত রাখবেন এবং যথাযোগ্য বন্ধুদের কাজে লাগাতে পারবেন।

২৫ বৈশাখ ১৩৮৩

তরুণ সান্যাল

দাম : দেড় টাকা

পরিচয়

বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ৫ অগ্রহায়ণ ১৩৮২ ডিসেম্বর ১৯৭৫

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ ঃ পরিভাষা ও বানান

সম্পাদকীয় টীকা

সুকুমার মিত্র

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

*

প্রচ্ছদপট

বিশ্বরঞ্জন দে

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। হিরণকুমার সান্যাল। সুশোভন সরকার

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র। গোপাল হালদার। বিষ্ণু দে। চিন্মোহন সেহানবীশ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তরুণ সান্যাল

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতা বাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

উপন্যাস পাঠের প্রস্তুতি

গোপাল হালদার

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের শিল্প-তাৎপর্য

প্লট, চরিত্র, প্রকাশের কৌশল, পরিবেশ বর্ণনা, সংলাপ, ভাষার যথাযোগ্যতা—এসব নিশ্চয়ই উপন্যাসের প্রধান অঙ্গ। অন্তত তখন পর্যন্ত উপন্যাসে এসব প্রধান অঙ্গ বলে গণ্য হত, বঙ্কিমও তা মেনেই উপন্যাস রচনা করেছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, সকল অঙ্গের মোটামুটি সামঞ্জস্য না ঘটলে উপন্যাস রূপ গ্রহণ করে না, আর রূপ গ্রহণ না করলে তার রসরূপ বোঝার প্রশ্ন ওঠে না। আসলে, সৃষ্টি একটা অভিনব ও অখণ্ড ক্রিয়া; উপন্যাসে প্লট, চরিত্র, প্রকাশরীতি প্রভৃতির সমন্বয়ে তা সম্পূর্ণ হয়। এই গোড়ার কথা মেনেই স্বীকার করতে হয়, বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে এই সৃষ্টি-সম্পূর্ণতা ঘটেছে, ঘটেছে 'কপালকুণ্ডলা'য়, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে', অনেকাংশে 'বিষবৃক্ষে', 'রাজসিংহে'। বাকি অনেক উপন্যাসেও মোটামুটি সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে। সেই সামঞ্জস্যের অভাব বেশি ঘটেছে সাধারণত প্রচারের উপদ্রবে, ঐতিহ্যগত নৈতিক তত্ত্বের মাত্রাধিক্যে। সকল কালের রসবোধেই যা মানবীয় কাহিনীতে অন্তরায়—সন্ন্যাসী, যোগী, জ্যোতিষ-বচন, স্বপ্ন প্রভৃতি deux ex machina-র উপদ্রব—একালের বিচারে তা অসহ্য অবস্কিউরেন্টিজম। কিন্তু সব সত্ত্বেও মোটামুটি বঙ্কিমের প্রতিটি উপন্যাসই যে সার্থক তা তাঁর যে কোনো উপন্যাস হাতে নিলেই বোঝা যায়। একবার পড়তে আরম্ভ করলে তা ছেড়ে ওঠা যায় না। আমরা বলি—গল্পের আকর্ষণ। এই গল্প কি শুধু প্লট? না, প্লটের সুসংগতি, গ্রন্থ পড়তে পড়তে এগিয়ে গেলে উপলব্ধি করা যায়। হাতে নিতে না-নিতেই যা অনুভব করা যায় সে হচ্ছে বাহ্যত ঘটনার জাদু—ঘটনার অদ্ভুতত্ব, আকস্মিকতা, অভাবনীয়তা প্রভৃতি সার্থক রোমান্টিকতার প্রধান গুণ—তা নিশ্চয়ই আকৃষ্ট করে। কিন্তু সেই সঙ্গেই অনুভব করতে হয় চরিত্র, বর্ণনা, সংলাপ এবং ভাষা,—সকলের মিলিত আকর্ষণ। ঘটনার অজস্র উদ্ভাবন, সুদক্ষ বিন্যাস, প্রায় নাট্যধর্মী প্রয়োগ, প্রত্যক্ষতা, চমৎকারিত্ব—এসব গুণ প্রথম থেকেই বঙ্কিমের আয়ত্ত ছিল। এই কারণেই প্রকাশমাত্রই 'দুর্গেশনন্দিনী' সকলকে মুগ্ধ করেছিল। অথচ 'দুর্গেশনন্দিনী' সকল রকমেই

বঙ্কিমের কাঁচা হাতের রচনা—তার প্রধান পুঁজি রোমান্সের চমক। অন্যদিকে, 'কপালকুণ্ডলা'য় যুদ্ধবিগ্রহের আকর্ষণ নেই। ঘটনার চমৎকৃতি আছে, কিন্তু তার অপেক্ষা অনেক বড় 'কপালকুণ্ডলা'র ভাববস্তু, তার রস-সম্পদ। আসলে অনেক গভীর তার জীবন-জিজ্ঞাসা—সেকথা আমাদের বুঝতে হবে। আপাতত, এই সত্যটা আমাদের স্বীকার্য—বঙ্কিমের উপন্যাস পড়তে আরম্ভ করলে কেউ থামতে পারে না। এ শুধু ঔৎসুক্য-সঞ্চার নয়; তা আছে। কিন্তু পড়ে এগিয়ে চললে —সেই 'বিষবৃক্ষে'র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন—'কি হল', 'কি হল' এই আগ্রহ-উৎকণ্ঠা পাঠককে পেয়ে বসে—সমসাময়িক সামাজিক কাহিনীতেও এই গুণ প্রচুর, আবার বঙ্কিমের শেষ উপন্যাসেও তাঁর এ ক্ষমতা দেখি অব্যাহত। 'রাজসিংহে' তো আখ্যানের গতিময়তা চরমে উঠেছে—ইতিহাসের প্রবাহ তাতে মুর্ত। প্লট, চরিত্র, প্রকাশরীতির একটা মোটামুটি সামঞ্জস্য না ঘটলে এ আগ্রহ জন্মে না, বাঁচে না।

রোমাণ্টিক কল্পনা, ক্লাসিক কলাকৌশল: রোমাণ্টিক চমৎকারিত্ব বঙ্কিমের এই বৈশিষ্ট্যের একটা অবলম্বন, তা আমরা দেখলাম। কিন্তু লক্ষ্য করা উচিত—বঙ্কিমের আখ্যান পরিকল্পনায় ও বিন্যাসে রোমাণ্টিক উদ্দামতা ও মাত্রাহীনতা নেই। তাতে বুদ্ধিমার্জিত সংহতিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সুশৃঙ্খলভাবে ঘটনার উদ্ঘাটন ও চরিত্রের ন্যায়-পরম্পরা সংরক্ষণ, এ শিল্পকৌশল সকল ক্ষেত্রে অটুট। বীজ উপ্ত হওয়া থেকে ফল প্রসব করা পর্যন্ত সমস্ত 'প্রোসেস'টি (বিষয়-বস্তুর প্রাণ-প্রক্রিয়া), প্রথম থেকে বঙ্কিমের পরিকল্পনায় বিধৃত থাকে, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি পদে সৃষ্ট-চরিত্র উদ্ঘাটিত হয়ে চলে। হয়তো চরিত্র রোমাণ্টিক বা অসাধারণ, কিন্তু অস্বাভাবিকতা নেই তাদের অভিব্যক্তিতে, ঘটনার যুক্তি-শৃঙ্খলার মধ্যে (লজিক অব ইভেনটস) চরিত্রের বিকাশ ও যুক্তি-শৃঙ্খলায় (লজিক অব ক্যারেকটারস) নিবদ্ধ—দ্বান্দ্বিক নিয়মে (ডায়েলেকটিক) ঘটনা ও চরিত্র পরস্পরে সংযুক্ত—ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সুবিন্যস্ত। এ 'ন্যায়সিদ্ধি' কি ভাটপাড়াসমাজের নৈয়ায়িক ধারার উত্তরাধিকাররূপে বঙ্কিমের মজ্জাগত হয়েছিল? হতে পারে। কিন্তু বঙ্কিম আপনার নিজস্ব জ্ঞানার্জনে তা আরও সুমার্জিত করেছেন, মিল-কোঁৎ প্রভৃতি মনস্বীদের আধুনিক চিন্তায় তাঁর মনন-শক্তি পরিপুষ্ট। তাঁর সৃজনীশক্তিও তাতে সংহতি আয়ত্ত করেছে। সংযম, সংহতি, শৃঙ্খলা, ন্যায়-পরম্পরা—এসব গুণগুলি শিল্পের ক্লাসিক গুণ। উপন্যাসে রোমাণ্টিক কল্পনা বঙ্কিমের উদ্ভাবনাশক্তির মুল,—সে যেন চঞ্চল সুদূরের পিয়াসী, অসামান্যের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। কিন্তু বঙ্কিমের শিল্পবুদ্ধি ক্লাসিক; গঠনপারম্পর্য,

সু-সমতা, চরিত্রবিকাশে সুসংগতি—এসবের দ্বারা তাঁর রোমান্টিক প্রেরণা পরিচালিত। এই রোমান্টিক ও ক্লাসিক শিল্পভাবনার দ্বান্দ্বিক মিলনে বঙ্কিমের শিল্প সাফল্য অর্জন করেছে। বঙ্কিমের রোমান্টিকতার এই প্রধান তাৎপর্য। এ তাৎপর্য না বুঝলে বঙ্কিম-শিল্পের স্বরূপই বোঝা হয় না। বুঝলে, প্লট-চরিত্র-প্রকাশরীতির বিশ্লেষণ প্রভৃতি অনেকটা গৌণ আলোচনা বলে মনে হয়। রোমান্টিক ও ক্লাসিক গুণের সামঞ্জস্যেই ওসব সামঞ্জস্য-যুক্ত; শিল্পাবলম্বনও একই কালে রোমান্টিক ও ক্লাসিক গুণে সম্মেলিত—সবমুদ্ধ এক সমন্বিত-সৃষ্টি।

বঙ্কিমের শিল্প-আদর্শ (দ্র উত্তরচরিত, বিবিধ প্রবন্ধ ১ম, রস-সংগ্রহ ১।২) "অভিনব, স্বভাবানুকারী ও স্বভাবাতিরিক্ত সৌন্দর্যসৃষ্টি"—'স্বভাবানুকারী' অর্থ ক্লাসিক অবজেকটিভিটি; 'স্বভাবাতিরিক্ত' অর্থ রোমান্টিক—"স্ট্রেঞ্জনেস্ অ্যাডেড টু ওয়াণ্ডার"। এইটি শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক আদর্শ, তাই 'স্বভাবানুকারী'; ঠিক বস্তুবাদী নয়, কিন্তু জীবননিষ্ঠ। বাস্তববাদী শিল্পীও জানে তার স্বভাবানুকারিতা ('ফরমাল রিয়ালিজম') সামান্য জিনিশ। স্বভাবের অন্তঃস্থলে রয়েছে বাস্তবের প্রাণবস্তু (ল্যাইফ অব থিংস), বাস্তববাদী শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি তাকেই উদ্ঘাটন করে। শ্রেষ্ঠ বাস্তববাদী উপন্যাসের এই তাৎপর্যও অস্বীকার করা অসম্ভব। ফরাসী বাস্তববাদীদের অপেক্ষা রুশ ঔপন্যাসিকদের (তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি প্রভৃতির) সঙ্গে পরিচয় ঘটলে বঙ্কিমও বুঝতেন—স্বভাবানুকারিতাতেও স্বভাবাতিরিক্ত অভিনব সৌন্দর্যসৃষ্টি সুসম্ভব। বঙ্কিমের রোমান্টিক ধারার তাৎপর্য আমরা দেখেছি—তা স্বপ্নবিলাস নয়, জীবননিষ্ঠ রোমান্টিক কল্পনা। কিন্তু বঙ্কিম বাস্তববাদের সত্য অনুভব না করায় বাঙলায় বাস্তববাদী সৃষ্টির ধারা দুর্বল থেকে গেল, এই কথা মিথ্যা নয়।

চরিত্র ও শ্রেণী : বঙ্কিমের সম্পর্কে বাস্তববাদের এই অভিযোগ স্বীকার্য, কিন্তু বঙ্কিমের সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ স্থূল (সুপারফিসিয়াল) দৃষ্টির ফল, তাও বোঝা দরকার। বাহ্য সত্য, 'সাধারণ বাঙালীসমাজের কথা' বঙ্কিমের 'সামাজিক' উপন্যাসেও নেই। আসলে তা মুখ্যত 'পারিবারিক' উপন্যাস, 'সামাজিক' উপন্যাস নয়। কয়েকটা সাধারণ কথা ধরা যাক: বঙ্কিমের প্রধান পাত্রপাত্রীদের কারও জীবিকার দায় ছিল না। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের পাত্র-পাত্রীদের সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। বঙ্কিমের আখ্যান প্রধানত জমিদার-শ্রেণীর লোকদের নিয়ে—শ্রেণী হিসাবে যারা অলস ও অনর্জিত-আয়ভোগী ('লেজার ক্লাস', 'আন-আর্নড-ইনকাম'-ভোগী)। উকিল শচীন্দ্র ও কমিসারিয়েটের উ বাবু সেই ভাগ্যবান শ্রেণীর মধ্যেই গণ্য—যেমন বঙ্কিম নিজে। পাত্রপাত্রীরাও

সুসম্পন্ন ভদ্রলোকশ্রেণীর, এমনকি, অধিকাংশ কায়স্থ বা ব্রাহ্মণবংশীয় উচ্চবর্ণের মানুষ—এটা নিতান্ত অবান্তর কথা নয়। শিক্ষাদীক্ষায়ও বঙ্কিমের আত্মীয়তা ঐ বিত্তবান শ্রেণীর সঙ্গে। 'বাঙ্গালার কৃষকে'র সঙ্গে বঙ্কিমের পরিচয় ঘটলেও সে পরিচয় কোনোরূপ আত্মীয়তায় পৌঁছবার কথা নয়—তাঁর অভিন্ন আত্মীয়তা (আইডেনটিফিকেশন) বিত্তবানদের সঙ্গে, আর তাঁর সময়ে জমিদাররাই ছিলেন বাঙালি সমাজের বিত্তবান শ্রেণী। কিন্তু বুঝতে হবে—সেইখানেও তিনি স্বতন্ত্র, একক—বঙ্কিমের 'অ-সামাজিক' নামটার প্রধান কারণ সেই তাঁর প্রতিভার আভিজাত্য, জীবন-জিজ্ঞাসা, আত্মজিজ্ঞাসা। দীনবন্ধু মিত্রের মানুষের সঙ্গে যে 'সহানুভূতি'র কথা বঙ্কিম অত উল্লেখ করেছেন, যাতে দীনবন্ধু তোরাপ-ক্ষেত্রমণিদের অঙ্কিত করতে পেরেছেন, বঙ্কিমের নিম্নশ্রেণীর জন্য সেই আন্তরিক সহানুভূতি ছিল না। নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্যও ছিল কিনা সন্দেহ—ঐ শ্রেণীর মানুষরা তারাচরণের (বিষবৃক্ষ) মতো বঙ্কিমের রঙ্গমিশ্রিত কৃপার পাত্র। এসব কঠিন সত্য। উচ্চবর্গের ডিপুটি বঙ্কিমের আসলে আত্মতৃপ্ত চাকরে ফিলিস্টাইন হবারই কথা,—বৃত্তিগত যথার্থ 'অভিজাত' নয়। কিন্তু সত্য কথা এই যে, বঙ্কিম সে ভাগ্য থেকে অনেকাংশে রক্ষা পেয়েছেন—প্রতিভার আভিজাত্যে সেখানে আত্মতৃপ্তি প্রশ্রয় পায় নি। বরং বিষণ্ণ, একান্ত ভাবুকতা জন্মেছিল। শ্রেণীদৃষ্টির বিচারে, নগেন্দ্রনাথ-গোবিন্দলালের মতো বঙ্কিমের প্রধান নায়কদের ব্যক্তিগত সুখ ছাড়া সামাজিক কোনো দায়িত্বই ছিল না,—রমণীর রূপভোগ ও প্রণয়চর্চা ছাড়া তাদের করবার কী ছিল? বাহ্যত, এ কটাক্ষ সংগত। কিন্তু বঙ্কিম বিত্তবান নায়কদের অবলম্বন করে জীবনের যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, তা শ্রেণীজীবনের প্রশ্ন নয়; তা জীবনের মূল প্রশ্ন,—'এ জীবন লইয়া কি করিব' —সেই প্রশ্নেরই প্রধান এক রূপ। মানুষের জৈববৃত্তি ও মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধি-চৈতন্যের মধ্যেকার সংগ্রাম-সংঘর্ষের কথা, পরাজয়ের, যন্ত্রণার। জয়ের প্রসন্নতা তাতে কতখানি? এ 'বিষবৃক্ষে'র বীজ ঘরে-ঘরেই রয়েছে—এই ভয়াবহবোধই বঙ্কিমের চেতনায় প্রবল। বঙ্কিমের ভাববস্তু বা থিম এই কারণে সর্বমানবীয়। তবে বঙ্কিমের দৃষ্টিতে এ ভাববস্তুকে প্রকটিত করার মতো ক্ষেত্র হল সমৃদ্ধ ভদ্র জীবন, কায়েমি স্বার্থে পরিপুষ্ট জীবন। কারণ যেখানে মানুষের বুদ্ধিতে ও সংবেদনায় সমৃদ্ধ হবার মতো সুস্থির অবকাশ বেশি, সেখানেই বঙ্কিমের বিষয়বস্তুর উপযোগী পাত্র-পাত্রীর প্রকাশ সুসম্ভব। এ ধারণা—তলস্তয়ের উলটো কোটির ভাবনা। কিন্তু এই জীবনদৃষ্টি ঈষৎ বেদনায় জীবনকে গভীরভাবে বুঝতে চায়, মহৎ করে দেখতে চায়। তাঁর প্রশ্ন জীবনজিজ্ঞাসুর প্রশ্ন—সে

জ্ঞান-বুদ্ধিতেও জানে মানব-প্রকৃতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের দাবি আছে; প্রবৃত্তি ছাড়াও আছে সেখানে শুভবুদ্ধি—অনুশীলনতত্ত্বের এই গোড়ার কথা। এই সামঞ্জস্যকে জৈব তাড়নায় ক্ষুণ্ণ করলে মনুষ্যত্বই ক্ষুণ্ণ হয়, বাহ্য ও অধ্যাত্ম নানা যন্ত্রণা তার ফল। এ বক্তব্য বৈষয়িক আভিজাত্যের কথা নয়, শুধু বুদ্ধি-বিবেচনার কথাও নয়, জীবন-বোধের কথা। এই কারণেই বঙ্কিমের নায়করা শেষ অবধিও পাঠকের সমবেদনা লাভ করে—তারা প্রবৃত্তির শিকার, কিন্তু সদ্‌বুদ্ধি-কল্যাণবুদ্ধিবর্জিত নয়। তারা অবসরভোগী, কিন্তু ইতর নয়। তাহলেও জিজ্ঞাসা থেকে যায়—কতটা তাদের মানুষের প্রতিনিধিরূপে শ্রদ্ধা করা যায়? বীরত্বের মহিমা ধরলে প্রতাপ ছাড়া কাকে বলব পুরুষ? অমরনাথকে? সে অবসাদে, আত্মগত ভাবনায় অস্পষ্ট। বরং পুরুষদের তুলনায় স্বীকৃতির সম্মান অধিক লাভ করে বঙ্কিমের নায়িকরা সকলে—সে হীরাই হোক, রোহিণীই হোক, হোক পরপুরুষানুরাগিণী শৈবলিনী, কিংবা 'নিশ্চেষ্ট সরলতার মূর্তি' কুন্দ।

নূতন প্রকাশ : নারীচরিত্র

পুরুষচরিত্র অপেক্ষা নারীচরিত্রের রূপদানে বঙ্কিম অনেক বেশি কৃতকার্য হয়েছেন। বঙ্কিমের সেই সাফল্যের তাৎপর্য আরও একটু বুঝে দেখা প্রয়োজন।

'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে নারী-চরিত্র সম্বন্ধে বঙ্কিমের তীব্র সংবেদনার ও সাগ্রহ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে, তাঁর দৃষ্টিতে তখনো গভীরতা আসে নি। তা বঙ্কিমের রস-চেতনার পর্ব। বিমলার সৃষ্টিতে দেখি প্রথম সেই বাঙালি নারী-চরিত্রের আবির্ভাব; বুদ্ধিতে, চতুরতায়, নির্ভীক আন্তর-ধর্মে যারা পরবর্তী বাঙলা উপন্যাসকে শ্রী ও মর্যাদা দিয়েছে। তথাপি বিমলা শুধু আভাস,—বঙ্কিমের অপরিণত বুদ্ধিরও চিহ্ন। বিমলা অতি-চতুরা, অতি-চপলা, অতি-মোহিনী, অতি-সাহসিকা ইত্যাদি, ইত্যাদি। রোমান্সে অবশ্য 'অতি' চলে, না হলে বিমলা অচল। তার চেয়ে বরং সলজ্জা ভীরু তিলোত্তমাকে বাঙালি মেয়ে বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা হয় না। অথচ, 'দুর্গেশনন্দিনী'তে সে বিমলার ছায়াও নয়। বরং "উদ্যান মধ্যে যেমন ফুল এ আখ্যায়িকার মধ্যে তেমনি আয়েষা।" আয়েষা পাঠানকন্যা, রোমান্সের নায়িকা। একটি কথার মধ্য দিয়ে বঙ্কিম এই মর্যাদাবতী পাঠানকন্যাকে সমস্ত বাঙালি নারী-সত্তার মুখপাত্রী করেছেন—"যদি এ যন্ত্রণা সহিতে না পারিলাম, তবে এ নারীজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম কেন?" জীবনভর শান্তদহন ও আত্মদানই বাঙালি নারীর তখন পর্যন্ত ঐতিহ্য।

প্রতিটি উপন্যাস ধরে এভাবে আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। বঙ্কিম নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে যা বলেছিলেন, তা স্মরণীয়ঃ "এ দেশে স্ত্রীরাই মানুষ।" বঙ্কিমের উপন্যাসেও আমরা সাধারণভাবে তাঁর সেই উপলব্ধির প্রমাণ পাই। কপালকুণ্ডলা-মতিবিবি-মনোরমা —প্রথম যুগের এসব নারীর তুলনায় সার্থক-সৃষ্টি পুরুষ কে? পশুপতিই কিছুটা নিজের অপচেষ্টার শেষে শেষদিকে দাঁড়ায় ও দগ্ধ হয়। জীবনের দাহ নগেন্দ্রনাথের মনুষ্যত্বকে কতটা অগ্নিশুদ্ধ করে রেখে গিয়েছিল উপন্যাসে তা আর জানা যায় না। নগেন্দ্রের সে দাহের যথার্থ উপলব্ধি হয়েছিল কি? গোবিন্দলালের হয়েছিল জানি—তার আত্মসংগ্রাম প্রথম থেকে অনেক বেশি স্পষ্ট। প্রসাদপুরের কুঠিতেই দেখি সে আত্মদহন তখন দুঃসহ দুর্বহ বলেই রোহিণী-হত্যা সম্ভব হতে পারল। শেষ পরিচ্ছেদে ভ্রমর-রোহিণীময় জগতেও সে আত্মদহন থামে নি—'পরিশিষ্টে' এ দাহের শান্তি।

মোট কথা, বঙ্কিমের প্রধান নারীচরিত্রগুলি সর্বত্রই 'রূপবান'। যেমন মতিবিবি, আয়েষা, জেবউন্নিসা, কিংবা সূর্যমুখী, ভ্রমর, শৈবলিনী, ইন্দিরা, লবঙ্গলতিকা ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনকি, যাদের তিনি ধর্মপ্রচারের 'কল' করেছেন, তারাও একেবারে কল হয়ে যায় না, কিছুটা নড়ে-চড়ে। যেমন শ্রী। কপালকুণ্ডলা তার মধ্যে আবার বিশিষ্টা—সে গৃহবাসিনী নারী-প্রকৃতির অধিকারিণী নয়; নিসর্গ-রহস্যের প্রতীক—রোমাণ্টিক কল্পনার অদ্ভুততম দান এক রহস্যমূর্তি। সে তাৎপর্য জীবনবোধের প্রশ্নে আমাদের লক্ষণীয় হবে।

এখন প্রশ্নটা এই—নারীচরিত্রের মতো বঙ্কিমের পুরুষচরিত্র উজ্জ্বল নয় কেন? উত্তর বঙ্কিম দিয়েছেন—'এদেশে স্ত্রীরাই মানুষ'। এ উত্তরটা এখন প্রথম বুঝে দেখতে হয়।

'এ দেশে স্ত্রীরাই মানুষ'ঃ বাঙালি সমাজ পল্লীপ্রধান। এ সমাজের গতানুগতিক জীবনযাত্রায় যুদ্ধবিগ্রহ কখনো বড় ব্যাপার হয় নি—মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে তাই যুদ্ধকবিতা, বীরগাথা প্রায় নেই। পুরুষদেরও সংগ্রাম, উদ্যোগ, পরিশ্রম প্রভৃতি পৌরুষের গুণ প্রয়োজন হত না। নারীরাই এই ফল-জল-শ্যামল অনুগ্র প্রাকৃতিক পরিবেশে 'বারো মাসে তেরো পার্বণে', ব্রত-উপবাসে একইরূপে সূর্য-চন্দ্র-তারার মতো সংসারের দশজনকেও আত্মীয়তাসূত্রে গেঁথে নিয়ে নিতান্ত সরল শান্তগতি সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে-করতে একটা সহজশ্রী-সামঞ্জস্যময় জীবনের অধিকারিণী হত। স্বাতন্ত্র্য-সচেতনতা, অধিকারের দাবি প্রভৃতি অপেক্ষা সংসারের সেবায়, আত্মদানে ছিল বাঙালি নারীসত্তার

আত্ম-সম্পূরণ। নিশ্চয় ফিউডাল ঐতিহ্যেরই তা এক সীমিত কল্যাণের রূপ। উপন্যাসের উপযোগী বুর্জোয়া জীবনচেতনা কিন্তু অনিবার্যভাবেই পুরুষজীবনকে কিছু না কিছু উদ্যোগী করে; নারীজীবনকেও তা একটু সচল চঞ্চল করার কথা,—উভয়েরই আত্মস্বাতন্ত্র্যের বোধও বুর্জোয়া আধুনিকতায় স্বাভাবিক। কিন্তু বাঙলার বিশেষ পল্লী-জীবনযাত্রার আড়ালে বাঙালি সংসারযাত্রা ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহতই ছিল; বাঙালি নারীও তার গতানুগতিক ('ফিউডাল') জীবনকর্মে তেমনি সেবায় আত্মদানে আপনার সার্থকতা লাভ করেছে। ধারাবাহিক সমাজ সংসার ও পরিবেশের সঙ্গে মোটামুটি সুসংগতি (ইনটিগ্রেশন) বাঙালি নারীসত্তা উনিশ শতকেও রক্ষা করেছে। স্বাভাবিকভাবেই তাদের জীবন তখন সংগতিপূর্ণ (ইনটিগ্রেটেড) ছিল। ঝি-পাচিকারা সেদিন কর্তাদের প্রসাদজীবিনী হলেও ছিল পরিবারেরই অঙ্গীভূত। কেবল কখনো কোনো ভাগ্য-বঞ্চিতা রোহিণী বা পুরুষবঞ্চিতা হীরা দেখা দিত এসত্যের ব্যতিক্রম রূপে। ফিউডাল বা সীমাবদ্ধ গতানুগতিকতার মধ্যেও বাঙালি নারী একটা ইনটিগ্রেটেড সত্তার অধিকারিণী ছিলেন, এবং প্রথম ঔপনিবেশিক জীবনেও সে সংহতি অটুট ছিল। কিন্তু বাঙালি পুরুষদের সেরূপ আত্মরক্ষার সুযোগ ছিল না। বহির্বিশ্বের আঘাত তাদের উপর অনিবার্য, সেই আঘাত রোধ করবার মতো তাদের পৌরুষ বিশেষ ছিল না,—আঘাতের সম্মুখে নুয়ে পড়েই তারা নিজেদের বাঁচাতে চেয়েছে। তাই বাঙালি জীবনে বহির্বিশ্বের আঘাতের পরেও নারী-প্রকৃতি যতটা মনুষ্যার্থে অটুট থেকেছে, পুরুষদের পক্ষে ততটাই তার অভাব ঘটেছে। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় ভাঙনটা প্রথমে দেখা দিয়েছে বাঙালি পুরুষের জীবনে—নারীদের জীবনে অনেক পরে, মাত্র বিংশ শতকে।[১] পুরুষদের মধ্যেও; বিশেষ করে সমাজের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর মধ্যেই. সে ভাঙন বেশি স্পষ্ট হয়—এই শ্রেণীই ছিল বঙ্কিমের (এবং বাঙালি লেখকদের) অবলম্বন। তাদের মধ্যে ঔপনিবেশিক আক্রমণের ভাঙন বঙ্কিম প্রতিফলিত করেছেন, চেয়েছেন নবপ্রণীত নীতিধর্মে তার পুনরুদ্ধার। যে

---

১ বিংশ শতকেরও চল্লিশের কোঠায়। এই ক্ষেত্রে একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হলেও স্মরণীয়—বাঙালি পুরুষচরিত্রও কিন্তু বঙ্কিমের কালে ঊনবিংশ শতক থেকেই বেশ কিছুটা পৌরুষ অর্জনে প্রস্তুত হয়—এটি ডায়েলেকটিক সত্য। সে শতাব্দীর পুরুষশ্রেষ্ঠরা সংখ্যায় অল্প হলেও অসামান্য। সংস্কার আন্দোলন, সাহিত্যসৃষ্টি, রাজনৈতিক প্রয়াস, শেষে স্বদেশী যুগ, এসবে বাঙালি 'মনুষ্যার্থ' লাভ করছিল।

শিক্ষিত নিম্নমধ্যবিত্ত গোষ্ঠী এই ভাঙনের মধ্য থেকে বিদ্রোহে মাথা উঁচু করে উঠছিলেন, বঙ্কিম কিন্তু তাঁদের জানতেন না,—যদিও তাঁরা অনেকাংশে 'আনন্দমঠে'র লেখকের মানস-সন্তান ছিলেন। এই সামাজিক পরিস্থিতির আভাসই বঙ্কিমের ওই কথাটায় পাওয়া যায়, 'এদেশে স্ত্রীরাই মানুষ'। আর মুখে তাঁর এই উক্তি না করলেও চলত, কারণ তাঁর উপন্যাসের দর্পণে এই সাক্ষ্যই স্পষ্ট। বঙ্কিমের উপন্যাসে নারীচরিত্রকে তিনি ফিউডাল জড়তা থেকে মুক্ত করে প্রাণবন্ত ও ব্যক্তিত্বময়ী করেছেন, কিন্তু তার ঐতিহ্যগত ইনটিগ্রেটেড সত্তা থেকে বঞ্চিত করেন নি। বুঝবার মতো বঙ্কিমের সৃষ্ট এই নারীচরিত্রের তাৎপর্য—এরূপ নারীচরিত্রের মধ্য দিয়ে বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে বাঙালির ভগ্নোন্মুখ জীবনের মনুষ্যার্থ-ময় দক্ষিণমুখটি বাঙালিকে প্রথম দেখান। সেদিন থেকে এই দক্ষিণমুখই বাঙলা সাহিত্যের বিশেষ সাহিত্য-ট্র্যাডিশন হয়ে ওঠে। আমাদের পরবর্তী উপন্যাসেও দেখি—স্ত্রীরাই আসলে মানুষ। মানুষ—শুধু হৃদয়বত্তায় নয়, বুদ্ধির দীপ্তিতে, প্রাণের স্বচ্ছন্দতায়, আত্মার ঐশ্বর্যে।

কোথা হতে এল বঙ্কিমের নারীচরিত্রে এই দীপ্তি, এই ঐশ্বর্য, এমনকি দেহমনের এই দুর্জয় সাহস? আমাদের মধ্যযুগের জীবন-রীতিতে ফুল্লরা-বেহুলারা সেদিনের মতো করে সেই প্রাণ ও সেই আত্মাকে আপনাদের মধ্যে লালন করে এসেছে। লোকগীতিকায়ও তারা জীবন্ত ছিল। তারা সত্তায় সবল ছিল, কৃত্রিম ও দুর্বল ছিল না। দুর্বল অবশ্য চাঁদ সওদাগর-কালকেতুরাও ছিল না—তবে বুর্জোয়া সভ্যতার আঘাতের সম্মুখে দাঁড়াবার মতো সবলও তারা ছিল না। বঙ্কিমের অন্তর্দৃষ্টি ও রোমাণ্টিক কল্পনার প্রসাদে সেই গৃহ-সর্বস্ব নারীসত্তা সূর্যমুখী, ভ্রমর, শৈবলিনী, ইন্দিরা, লবঙ্গলতিকা হয়ে উঠল, এবং আরও বিচিত্র প্রাণময়ী মানবসত্তার কী না সম্ভাব্যতার ইঙ্গিত বহন করে বাঙলা সাহিত্যে দেখা দিল।

মূল কথাটা এই, বঙ্কিম বাঙলা সাহিত্যে নতুন নারীচরিত্রের ট্র্যাডিশন পত্তন করেছেন—আপনারই অজ্ঞাতে,—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ও মানবাধিকারের; যুগের নির্দেশকে এভাবে তিনি পালন করেছেন। সেই উনিশ শতকের নারীচরিত্র বিংশ শতকের ঘাত-প্রতিঘাতে বাঙালি নারীসত্তার প্রকাশকে সম্ভব করে তুলেছে।

'আনন্দমঠে'র তাৎপর্য : এ প্রসঙ্গে 'আনন্দমঠে'র সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য বোঝা যেতে পারে। 'আনন্দমঠে' প্রথম 'বিজ্ঞাপনে' তিনি জানিয়ে-ছিলেন,—বাঙালি স্ত্রী সংসারে তার প্রধান সহায়। অনেক সময়ে তা নয়,—'আনন্দমঠে'র এ একটি প্রতিপাদ্য। উক্ত 'বিজ্ঞাপনী'র এই প্রতিপাদ্যটির তাহলে

অর্থ কী? 'এ দেশে স্ত্রীরাই কি মানুষ'—একথা কি তবে মিথ্যা? স্বদেশীর পথি হতে নারী-বিবর্জিতা—এই কি? স্বদেশব্রতে স্ত্রী, পরিবার-পরিজন পরিত্যাজ্য, পৃথিবীর অন্য দেশের বিপ্লবী গোষ্ঠীতে বোধহয় এমন কথা হাস্যকর বলেই গণ্য হত। এদেশে তা হয় নি, বঙ্কিমের নিকটও তা অদ্ভূত মনে হয় নি। তবে 'আনন্দমঠে' তিনি তা প্রমাণ করতে পারেন নি। কার্যত স্বদেশোদ্ধার বাধা—চিকিৎসক ও তাঁর জ্ঞানমার্গ।

'বিজ্ঞাপনী'র অন্য প্রতিপাদ্য—"সমাজবিপ্লব অনেক সময়ই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজরা বাঙ্গলাদেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।" অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল থেকে আরম্ভ করে সাধারণ বাঙালিরা, কেউ 'আনন্দমঠে'র এই কথা সত্যই বঙ্কিমের বক্তব্য বলে মনে করেন নি। কিন্তু 'আনন্দমঠে' চিকিৎসক স্বয়ং জানিয়েছেন—"ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে ·······নিষ্কণ্টক ধর্মাচরণ করিবে" ইত্যাদি ইত্যাদি। গ্রন্থ শেষ হতে গেল কর্মযোগের পরিবর্তে হিমালয়ে জ্ঞানযোগের বিধানে,—এই ঘোষণায়—'প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্মক নহে।' অস্বীকার করবার উপায় নেই—বঙ্কিম-মানসের জটিলতা ও বিভ্রান্তিই এইরূপ স্ববিরোধিতার জন্য দায়ী। জীবন-জিজ্ঞাসু শিল্পীকে তা এখানে লক্ষ্যহীন, বিভ্রান্ত, ধর্মজিজ্ঞাসু করে তুলেছে। তিনি নিজেই সঠিক জানতে পারেন নি কেন এরূপ রাজনৈতিক বিদ্রোহের কাহিনীতে তাঁর আগ্রহ। ভারতীয় সভ্যতা ও পরাধীন সমাজের মুল দাবি স্বাধীনতা,—এই প্রগাঢ় সত্যকে অন্তরে-অন্তরে বঙ্কিমও অনুভব করেছেন—তাই আনন্দমঠের বিষয়বস্তু। কিন্তু ফিরে যেতে চেয়েছেন তিনি অন্যদিকে—বিপ্লব আত্মঘাত, ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অন্যায়—এইসব পকবুদ্ধি ঝুনো ফিলিস্টাইনী যুক্তিকে শেষদিকে করতে চেয়েছেন ভাববস্তু। এভাবে লক্ষ্যভ্রষ্টতাই প্রকট হয়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিক হিসাবে বঙ্কিম তাই 'আনন্দমঠে' আত্মভ্রষ্ট। 'আনন্দমঠ' লক্ষ্যহীন—বাঙালি সমাজই ওই উপন্যাসের মধ্যে লক্ষ্য আরোপিত করে 'আনন্দমঠ'কে স্বাধীনতার জীবনবেদ করে তুলতে চেয়েছে—বঙ্কিম তা চান নি—বঙ্কিমের 'বিজ্ঞাপনী' ও 'উপক্রমণিকা' তার প্রমাণ। 'আনন্দমঠে'র এই প্রকৃত তাৎপর্য।

রূপচেতনা-প্রেমসাধনা : ক্ষেত্র ও বীজ

কিন্তু কোথায় পেলেন বঙ্কিম এই অজ্ঞাতপুর্ব অপূর্ব প্রেরণা? তাই এই প্রশ্নের উত্তর—বাঙালির চিরন্তন জীবনের মধ্যেই ছিল তার মুল, ও উনবিংশ শতাব্দীর

বাঙলার জাগরণের মধ্যেও ছিল তার নতুন বিকাশের তাগিদ। শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি অনাগত সত্যকে দেখতে পায়,—আগামীকালের সত্যকে আজকের অতি-প্রত্যক্ষের অন্তরালে—প্রচ্ছন্ন থাকলেও—অনুভব করে—এই হল প্রধান কথা। কিন্তু বঙ্কিম কিসে পেয়েছিলেন তাঁর প্রেরণা? যে ইংরেজি সাহিত্য থেকে বাঙালির নতুন সাহিত্যাদর্শ গৃহীত হয়েছে, উপন্যাসশৈলী গৃহীত হয়েছে, আধুনিক রোমান্সের আদর্শ গৃহীত হয়েছে (এ রোমান্স 'দশকুমারচরিত' নয়, 'আরব্য উপন্যাস' নয়, 'রোমান দি চাসন' বা 'আর্থারীয় রম্যকাহিনী'ও নয়), সেই সাহিত্য থেকে রোমান্টিক কল্পনার প্রধান উপজীব্য নায়িকাদর্শ গৃহীত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। পৃথিবীর অনেক বড় সাহিত্য অন্য বড় সাহিত্যের দ্বারা এভাবে অনুপ্রাণিত হয়, দেখা গিয়েছে। গ্যয়টের 'আলাপনী'তে পড়েছি—(৫ ডিসেম্বর, ১৮২৪):

"আমাদের নিজেদের (জার্মান) সাহিত্য প্রধানত ওদের (ইংরেজি) সাহিত্যের সন্তান। আমাদের নভেল, আমাদের ট্রাজিডি গোলডস্মিথ, ফিলডিং, শেকসপীয়র ছাড়া কোথা থেকে পেলাম? আমাদের এই দিনে জার্মানিতে কি তুমি কোথাও পাবে লর্ড বায়রন, মুর ও ওয়াল্‌টার স্কটের মতো তিনজন মহালেখক।"

স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাস বঙ্কিমের প্রেরণা জুগিয়েছে, এ কথা অকুণ্ঠিত-ভাবেই আমরা স্বীকার করি। কিন্তু যা তার অপেক্ষাও বড় সত্য তা এই—বঙ্কিমের শিল্পপ্রতিভার প্রধান প্রেরণা শেকসপীয়র, তারপর ওয়ার্ডসওয়ার্থ, এবং সম্ভবত অন্যান্য ইংরেজ রোমান্টিক সাহিত্যিকরা।

নতুন চেতনার রূপ: নারী-রূপ সম্বন্ধে নতুন চেতনা ও ভালোবাসা সম্বন্ধে নতুন মানসিকতা বঙ্কিমচেতনায় আমাদের সাহিত্যে ইংরেজি সাহিত্যের স্পর্শে এসে থাকবে। তবে, ইংরেজি সাহিত্যেও এসেছিল আধুনিক যুগ সভ্যতার নিয়মে, তা স্মরণে রাখা উচিত। কথাটা আরও গভীর কথাই। নারীরূপের চেতনা ও নারীপ্রেমের নতুন বিকাশও সেই রিনাসেন্স থেকেই দেখা দেয়। অবশ্য সেই আভাস আগেও পাওয়া যায়—কিন্তু তা আভাসমাত্র। যেমন, যে দান্তে নারী-আশ্রয়ী ভাব-চেতনাকে রিনাসেন্সের চেতনার দিকে এগিয়ে দেন, আধুনিক পাশ্চাত্য গবেষকরা বলেন, তাঁরও প্রেরণা নাকি ভূমধ্যতীরের আরব্য প্রেম-রহস্যকাব্যের মধ্যে নিহিত ছিল। তবে তার একটা গুণগত পরিবর্তন দান্তেতে ঘটে। নারীরূপের সেই আভাস দান্তের পরে ইতালির রিনাসেন্সে আসে; আর ইতালি থেকে রিনাসেন্সের মহিমায় আরও অভিষিক্ত হয়ে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশে,—ইংলণ্ডেও। আধুনিক সভ্যতায় পরিপুষ্ট হয়ে তা

শেকসপীয়র ও তৎপরবর্তী ইংরেজি কাব্যজগতে অপরূপ ঐশ্বর্য লাভ করে—তাতে আরও বড় রকমের একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটে। ইংরেজের দিগ্বিজয়ের, সঙ্গে সেই ইংরেজি সাহিত্য আধুনিক সভ্যতার সমস্ত সম্পদকে পৃথিবীর সম্মুখে তুলে ধরে। ভারতবর্ষে বাঙালি তা প্রথম গ্রহণ করে যথাসাধ্য,—তার ঔপনিবেশিক জীবনের বাস্তব খর্বতা সত্ত্বেও।

অবশ্য একথা বিশদ করে বলা নিষ্প্রয়োজন—আমদানি-করা বীজ ছড়িয়ে দিলেই হয় না। বীজের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকা চাই, আলোজল মানুষের সযত্ন পরিচর্যা লাভ না করলে সেই 'পড়ে-পাওয়া' (কেতাবি) বীজে অঙ্কুর জন্মাত না, পাতা-ফুল-ফলের চিহ্নও দেখা যেত না। শেকসপীয়র প্রভৃতির প্রেরণা বাঙালি শিল্পী যদি বাঙলায় গ্রহণ করে ফুল ফুটিয়ে থাকেন, তাহলে এটাও মানতে হবে এ জমিতে কিছু রস সেই বীজ পেয়েছিল। কেন, নর্দমাও বাঙালি জীবনে ছিল,—এখনো আছে। এখন বরং কলকাতার নর্দমার জঞ্জালের মতো তা পথ ছাড়িয়ে ঘর-দুয়ার পর্যন্ত ডুবিয়ে দিতে বসেছে। তখনো এই নদীমাতৃক·দেবমাতৃক দেশে জলের অভাব হত না,—অর্থাৎ সামান্য হলেও শেকসপীয়র প্রভৃতির সেই দানকে গ্রহণ করার মতো ক্ষেত্র বাঙালি জীবনেও ছিল এবং তা প্রস্তুত করাও সম্ভব হয়েছে। সেই জমি বঙ্কিমও পেয়েছিলেন।

কালিদাস-ভবভূতি, এমনকি, রামায়ণ-মহাভারতও বঙ্কিমের কম প্রেরণা-উৎস ছিল না। বৈষ্ণব পদাবলীও বঙ্কিমের প্রিয় ছিল ; পদাবলীর মধ্যেও এমন অপূর্ব পদ দু·চারটি আছে। সহজিয়া রাগাত্মিকা পদাবলীতেও এমন শ্লোক কিছু মেলে, যা ব্রিটিশ-পূর্ব যুগেও অচল হয় নি, ব্রিটিশ যুগেও না ;—যাতে মনে হয় বাঙালি হৃদয় একেবারে পতিত জমি হয়ে পড়ে থাকতে পায় নি—নানা দুর্যোগের মধ্যে ক্ষীণভাবে হলেও সেই পুরাতন সভ্যতার ধারা পল্লী-প্রান্ত পর্যন্ত বয়ে যেত। ইংরেজি সাহিত্যের প্রেরণাকে সার্থকভাবে গ্রহণ করবার মতো জমি বাঙলায় তাই ব্রিটিশ আগমনের পূর্বক্ষণেও ছিল।

সরল ভাষায়,—জীবনের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা, পুরোনো-নতুন, দেশী-বিদেশী নানা সাহিত্যের প্রেরণা—এরূপ বহু ধারার সম্মেলিত স্রোত থেকে বঙ্কিমই প্রথম আপনার হৃদয় ভরে নিলেন, আর পরবর্তীদের জানালেন—'যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ। এসো এসো এসো গো আমার হৃদয়নীরে।'

ফ্লোবেয়্যারের শেষজীবনের রচনা ঃ বুভার ও পেকুশে

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সমাজ, ঐতিহ্য, কোনও বিশ্বাস-মূল্যবোধের আশ্রয়হীন; ছিন্নমূল জীবন ও শিল্পকর্মের বিড়ম্বনা গুস্তাভ ফ্লোবেয়্যারের জীবন ও রচনায় যে ভাবে প্রত্যক্ষ ও মর্মান্তিক হয়ে উঠেছিল তা বোধহয় উনবিংশ শতাব্দীর আর কোনো ইয়োরোপীয় ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী সমাজ-সভ্যতার অবক্ষয় ফ্লোবেয়্যার ও তাঁর সমকালীন শিল্পীদের মানসকে প্রবল ব্যাধির যন্ত্রণায় প্রায় পঙ্গু করে ফেলেছিল। তাঁরা তাঁদের কালের প্রতিটি বিপ্লবে, সামাজিক-রাষ্ট্রিক পরিবর্তনে শুধু মিথ্যাচার, উচ্চাশা, দুর্নীতি, ভাঙ্গন ও অপচয়ের পুনরাবৃত্তিই দেখেছেন। গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের জর্ণালে নিজেদের কালের দুর্বিষহ অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই সাক্ষ্য দেন : "রাজনৈতিক নীতি বলে কোনো কিছু নেই, ভবিষ্যতে চাকরি পাবার আশায় লোকেরা ঝুঁকি নেয় এবং আপোষ রফা করে, শেষপর্যন্ত তোমাকে মোহভঙ্গে, সমস্ত বিশ্বাসের প্রতি বিতৃষ্ণায় ফুরিয়ে যেতে হয় যা আমি আমার সব সাহিত্যিক বন্ধুদের ভেতর, ফ্লোবেয়্যারের মধ্যে যেমন তেমনি আমার মধ্যেও দেখেছি।……তুমি কোনো কিছুই বিশ্বাস করবেনা শুধু শিল্প ছাড়া, আর সমস্ত কিছুই মিথ্যা।"

ফ্লোবেয়্যারের প্রতিটি চিঠিতেই এই বিচ্ছিন্নতাবোধ পাই যা প্রকাশ পায় কখনও সমাজের বিরুদ্ধে ঘৃণায়, কখনো নিষ্ফলতার তীব্র যন্ত্রণায়, কখনো বা বিষের জ্বালাময় আত্মগ্লানিতে। বুর্জোয়া সমাজের কুৎসিত লোভ, রুচিগত বর্বরতা ও হীন সুবিধাবাদই তাঁর মনকে বিষিয়ে তুলেছিল; তাঁর অনেক চিঠিই এই সমাজের বিরুদ্ধে ঘৃণার হলাহলে পূর্ণ। অন্যদিকে আত্মগ্লানির দহনও তাঁকে কম অস্থির করে তোলেনি, ১৮৫২ সালের সেপ্টেম্বরে লেখা এই চিঠিটিতে তার প্রমাণ মেলে : "আমি পিতা হলে কখনও নিজেকে ক্ষমা করতে পারতুম না। আমার পুত্র! ওহ, না, না, না! আমার বীজ মরে যাক। অস্তিত্বের সমস্ত মূঢ়তা ও কলঙ্ক আমি অন্য কাউকে কিছুতেই দিয়ে যাব না।" নিজের রুদ্ধদ্বার ঘরে, সবরকম প্রতিষ্ঠালাভের তোয়াক্কা না রেখে, ভাস্করের স্বেদাক্ত পরিশ্রমে প্রতিটি অক্ষর

বাক্য খুদে খুদে, ভাষার উজ্জ্বল কারুকার্যে বিষয়বস্তু তথা সমকালীন কুৎসিত, হীন বুর্জোয়া সমাজকে পর্যুদস্ত করে এই ঔপন্যাসিক আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার নেশায় নিজের জীবনের শূন্যতার গ্লানি ভুলতে চেয়েছিলেন। ১৮৫২ সালের আর এক চিঠিতে তিনি নিজের এই আত্মকেন্দ্রিক শিল্পসাধনাকে এক ধরনের ঈসথেটিক মিস্টিসিজ্‌ম্‌ বলেন, বহির্জগতের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন সেই আত্মমগ্নতাতেই তো শিল্পী নিরালম্ব অস্তিত্বের নিদারুণ ক্ষয়কারী যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চান।

কিন্তু জীবন বড় নির্মম, রামের মতোই বৈরী, শিল্পী কিছুতেই তার চাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করে বিশুদ্ধ শিল্পসাধনার চরিতার্থতার স্বর্গে স্থিতি লাভ করতে পারেন না। মাদাম বোভারি শেষ করার পর জানান, "অতি মাত্রায় ইতর এবং অরুচিকর" সমাজচিত্রণ তাঁর কাছে অসহ্য: "এই জগতচিত্রণে আমি এত ক্লান্ত যে এর চেহারাই আমাকে অসুস্থ করে তোলে।" আধুনিক জগত থেকে দূরে সরে যাবার জন্য যীশু খ্রীষ্টের আবির্ভাবের তিনশ বছর আগেকার কার্থেজ নিয়ে 'স্যালাবোঁ' উপন্যাসটি লেখেন, কিন্তু সেই কার্থেজের নৈতিক দুর্গতির চিত্রও তো তাঁর কালের বুর্জোয়া সভ্যতার শোচনীয় অবক্ষয়ের প্রতিফলন হয়ে দাঁড়ায়। অতীত তাঁকে আশ্রয় দিতে পারেনা, যেন নিয়তির নির্দেশেই তাঁকে ফিরতে হয় বর্তমানে, এদুকাঁসিও সঁন্তিমতাঁলের বুর্জোয়া জীবনে, তার ইঙ্গিতও মেলে একটি চিঠিতে: "অতীতে যত গভীরভাবে আমি নিজেকে ডুবিয়ে দেই ততই আধুনিক কিছু লেখার তাগিদ আমাকে পেয়ে বসে।" কিন্তু এই উপন্যাসটি লেখার সময়ও ফ্লোবেয়্যর সেই বিতৃষ্ণা, অপচয়ের গ্লানি অনুভব না করে পারেন না: "এর পর এধরনের কাজ আর আমি হাতে নেব না। বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে এই আত্মিক সহবাস আমাকে ভারাক্রান্ত ও অবসন্ন করে। আমি পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বাস করার প্রয়োজন অনুভব করছি।" জীবন ও শিল্পের এই বিরোধযন্ত্রণায়, শিল্পের রোমান্টিক সাধস্বপ্নের আবেগে, তার কঠিন কসরতের অহংবোধে জীবনের শূন্যতাকে অতিক্রম করার প্রয়াসের ব্যর্থতার গ্লানিতে ফ্লোবেয়্যর দগ্ধ হয়েছেন আজীবন। এই শিল্পীর অধিকাংশ রচনাই তাঁর ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত হৃদয়েরই প্রতিচ্ছবি। মাদাম বোভারির নায়িকা এমা বা এদুকাঁসিও সন্তিমতাঁলের নায়ক ফ্রেদরিক মোরোর আত্মকেন্দ্রিক, নির্বোধ, রোমান্টিক স্বপ্নভাববিলাস এবং বুর্জোয়া পরিবেশে তার অনিবার্য ধ্বংসের যে শূন্যতা চিত্রিত, তা তো তাদের স্রষ্টার অন্তর্জীবনেরই ইতিহাস। মাদাম বোভারি, সে তো আমি, ফ্লোবেয়্যর নিজেই জানান। বৈষয়িক বুদ্ধিবর্জিত, রঙিন স্বপ্ন কল্পনায় মত্ত এমা ও ফ্রেদরিক মোরো এদুকাঁসিও সঁন্তিমতালের নায়ক লেখকের

আত্মগ্লানিরই প্রতিভূ, আয়রনির পরোক্ষ আবরণে তারা উপস্থাপিত; কিন্তু তাদের, বিশেষত এমার ও সমগ্র বোভারি পরিবারের ধ্বংসের পর যে বুর্জোয়া সমাজ ও তার আশ্রিত মধ্যবিত্তদের প্রতিষ্ঠার চিত্র পাই, তাদের হীন বৈষয়িক সুবিধাবাদের প্রতি তো লেখকের স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ ঘৃণার বিদ্রূপই বর্ষিত হয়েছে।

ফ্লোবেয়্যর তাঁর শেষ জীবনের রচনা এবং তাঁর মৃত্যুর পরের বছর ১৮৮১ সালে প্রকাশিত বুভার এ পেকুশেতে (Bouvard et Pe'cuchet) বুর্জোয়া সমাজসংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণা ও আক্রোশকে আয়রনির পরোক্ষতায় নয়, তীক্ষ্ণ, নিষ্ঠুরতম ব্যঙ্গেই পুঞ্জীভূত করতে চেয়েছেন। ১৮৭২ সালের নভেম্বর তুর্গেনিভকে লেখা চিঠিতে এই রচনাটি সম্বন্ধে তিনি লেখেন: "যে বইটি তৈরি করছি তাতে আমি আমার বিতৃষ্ণাকে উজাড় করে ঢেলে দেব।" শিল্পী ১৮৭৩ সালে এই বইটির পরিকল্পনা করেন, কিন্তু তার বীজ দীর্ঘকাল থেকেই তাঁর মনে নানাভাবে অঙ্কুরিত হয়ে আসছিল। ন বছর বয়েসেই তিনি তাঁর এক বন্ধুকে চিঠি লিখে প্রস্তাব করেছিলেন যে তাঁরা দুজনে মিলে লিখবেন, তিনি কমেডি, আর বন্ধুটি তার স্বপ্ন; তাঁর বাবার কাছে এক মহিলা আসেন যিনি তাঁদের অনেক নির্বোধ কথা বলেন, তিনি (ফ্লোবেয়্যর) সেগুলো লিপিবদ্ধ করতে পারেন। বুভার ও পেকুশে তো একদিক থেকে বিভিন্ন ধরনের নির্বুদ্ধিতার সংকলন। ফ্লোবেয়্যর প্রচলিত ধ্যানধারণা, ক্লিশে, মজাদার ভুল, সংস্কার, অর্ধ-সত্য, ভ্রান্ত উক্তি, জনপ্রচলিত হেত্বাভাস (fallacy) ইত্যাদির একটি অভিধানও তৈরি করেন, Dictionaire des ide'es recues। এই সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়েই এই বিচিত্র রচনাটির পটভূমি তৈরি হচ্ছিল। লেখক নিজেও জানিয়েছেন, এই উপন্যাসটি লেখার জন্য তিনি পনেরশ বই ঘেঁটেছেন। ফ্লোবেয়্যরের ভাইঝি কারোলিন কোমাভিও 'গুস্তাভ ফ্লোবেয়্যরের অন্তরঙ্গ স্মৃতি' শীর্ষক রচনায় বলেছেন, ১৮৭৪ সালে ফ্লোবেয়র বুভার ও পেকুশে লিখতে শুরু করলেও ত্রিশ বছর ধরে এর বিষয়বস্তু তাঁকে আগ্রহী করে রেখেছিল। শিল্পীর মনে রচনাটির ভাবকল্পনা প্রথমে যেভাবে আসে কোমাভি তার যে বিবরণ দিয়েছেন তা কৌতূহলোদ্দীপক: একদিন সাহিত্যিক বন্ধু Bouilhet-এর সঙ্গে ফ্লোবেয়্যর রুয়েঁ শহরে বৃদ্ধব্যক্তিদের আতুরাশ্রমের বিপরীত দিকে বুলভার বা উদ্যানপথের একটি বেঞ্চিতে বসে তাঁরা একদিন কি হবেন সেই স্বপ্ন-কল্পনায় মজা উপভোগ করছিলেন, কিন্তু সেই আনন্দপূর্ণ রোমান্সের জাল বুনতে না বুনতেই তাঁরা হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলেন, কে জানে, ঐ আতুরাশ্রমের জরাজীর্ণ বৃদ্ধদের মতোই হয়তো তাঁদের জীবন শেষ হবে। তার পর তাঁরা দুজন কেরাণীর বন্ধুত্ব, তাদের জীবন,

জীবিকা থেকে অবসর নেবার পর দুঃখদৈন্যে তাদের ফুরিয়ে যাওয়া ইত্যাদি তাঁরা কল্পনা করে নিতে লাগলেন।

এই কেরাণীরাই অবশেষে বুভার ও পেকুশের রূপ পেল। এরাই 'বুভার ও পেকুশে'র প্রধান দুজন পাত্র : বুভার দীর্ঘকায়, স্থূল ; পেকুশে খর্ব, শীর্ণ, দুজনেরই বেশভূষা উদ্ভট, বিসদৃশ, হাস্যকর ; দুজনেই কেরাণী, বুভার একটি বাণিজ্যিক সংস্থায়, পেকুশে নৌবিভাগে। প্রথমজন বিপত্নীক, দ্বিতীয় অবিবাহিত। একদিন তারা রাস্তার একই বসবার জায়গায় একই সময়ে বসে পড়ে, কপাল মোছার জন্য টুপি খুলতেই দুজন পরস্পরের টুপিতে নিজেদের নাম দেখতে পায়, টুপি চুরি যাওয়ার ভয়েই এভাবে নাম লেখার একই আইডিয়ায় দুজনে অনুপ্রাণিত হয়েছে জানতে পেরে বুভার ও পেকুশে উৎফুল্ল হয়। আলাপ যতই এগোয় ততই তারা আবিষ্কার করে, তাদের মতামত, ধ্যানধারণা, জীবিকা, বয়েস, রুচি ইত্যাদি সমস্তই হুবহু এক। বিভিন্ন বিষয়ের তালিকার সঙ্গে 'এক' শব্দটির অজস্র পুনরাবৃত্তিতে যেভাবে তাদের এই একত্বকে তুলে ধরা হয়েছে, তাতে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সর্বব্যাপ্ত জড়তা ও স্থূলতাই উপহসিত। দুমির ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছে যেতে স্বভাবতই তাদের বেশি দেরি হয় না। দুটি ব্যক্তিই গবেষণাপ্রবণ, বিশ্বসভ্যতার জ্ঞানের তৃষ্ণায় সদা উত্তপ্ত ও অস্থির। তারা অতীতকালের পুরোনো জিনিশ-পত্রের দোকানে ঘোরে, যে সমস্ত জিনিসের নাম দুর্বোধ্য তাদের মধ্যেই কোনো রহস্য নিহিত আছে বলে ওদের ধারণা হয়, ওরা যাদুঘরের ফসিল দেখে স্বপ্নাবিষ্ট হয়, লাইব্রেরিতে গিয়ে বইয়ের সঠিক সংখ্যা জানতে চায়। একই দোয়াতদান, একই কলম, একই সঙ্গীদল (নির্বোধ ভেবে যাদের সঙ্গে ওরা খুব কম কথা বলে) —নিজেদের জীবিকার পরিবেশে বুভার ও পেকুশে বিতৃষ্ণা বোধ করে, পারস্পরিক গৌরববোধে একের ভাব অন্যের মধ্যে সংক্রামিত হয় : পেকুশে বুভারের জড়বুদ্ধি এবং বুভার পেকুশের বিষাদ পায়। বুভার ছিল জারজপুত্র, একদিন সে জানে, তার বাবা তাকে কিছু সম্পত্তি দান করে গিয়েছেন। নাগরিক জীবনে ক্লান্ত দু বন্ধু গ্রামাঞ্চলে একটা বাড়ি ও জমিজমা কিনে বাস করতে থাকে।

এখানে বুভার ও পেকুশে কৃষি নিয়ে তাদের জ্ঞানের অভিযান শুরু করে। কৃষিসংক্রান্ত বই পত্রপত্রিকা পড়ে নিজেদের জমিতে সেই সমস্ত পুঁথিগত বিদ্যা এলোপাথাড়ি প্রয়োগ করে, কিন্তু একটা বিরাট অখাদ্য বাঁধাকপি ছাড়া ওদের আর কোনো লাভ হয় না। আবহাওয়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হবার জন্য তারা বইয়ে মেঘের শ্রেণীভেদ পড়ে। বিভিন্ন নাম অনুযায়ী মেঘ চিনতে চেষ্টা করে, কিন্তু

চেনার আগেই মেঘের আকৃতি বদলে যাওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়ে। বুভার ও পেকুশে এমন এক ক্রীম তৈরির স্বপ্ন দেখে যা হবে অতুলনীয়, বুভারের নামের ছাপ দিয়ে সেটা বাজারে ছাড়া হবে। অতিথিদের পরিবেশনের আগে চূড়ান্ত প্রস্তুতি হিসেবে তারা নানা বস্তুর একটি বিচিত্র মিশ্রণে অ্যালকহল ঢেলে আগুনে গরম করতে থাকে। হঠাৎ একে বিস্ফোরণে চুল্লিপাত্র সব ফেটে চৌচির হয়ে যায়, দুজনেই আতঙ্কে থর থর করে কাঁপতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে অভিন্ন-হৃদয় দু বন্ধু ভাবতে চেষ্টা করে, কোথায় তাদের ত্রুটি ঘটেছে। ওরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে রসায়নশাস্ত্রে জ্ঞানের অভাবই এই দুর্ঘটনার কারণ। সুতরাং এবার প্রবল উদ্যমে রসায়নচর্চা, সেটাও যথারীতি তাদের জীবনে হাস্যকর নিষ্ফলতা বহন করে আনে। অতঃপর বিভিন্ন পুঁথিপত্রের সাহায্যে শারীর-বিদ্যার নানা গবেষণা এবং তাদের বাস্তবপ্রয়োগে তাদের বিড়ম্বনা। বিভিন্ন পুস্তকের মারফৎ প্রকৃতির সৃষ্টিরহস্যের জ্ঞানে উদ্দীপিত এবং বাস্তব ক্ষেত্রে সেই জ্ঞান যাচাই করে নেবার জন্য ব্যাকুল বুভার ও পেকুশে চাষীদের জিজ্ঞাসা করে, তারা কখনও যণ্ডকে অশ্বীর, শূকরকে গরুর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য উন্মুখ হতে দেখেছে কিনা। দুটি বয়স্ক লোকের এজাতীয় উদ্ভট প্রশ্নে তারা অবাক হয়। তারা নিজেরাই ভিন্নজাতির প্রাণীদের বিসদৃশ মিলন-ঘটিত পরীক্ষার জন্য একটি ছাগল ও স্ত্রী ভেড়াকে মিলিত হতে প্ররোচিত করে এবং যথারীতি বিপত্তি ঘটায়ঃ ছাগলটা পেকুশের ভুঁড়ির নীচে ঢুঁ মারে, আর ভেড়াটা ভয়ে চিৎকার করতে করতে চক্কর দিতে থাকে, বুভার ওটাকে আয়ত্তে আনতে গিয়ে ধপাস করে পড়ে, তার দু হাত লোমে ভরে যায়। পুরাতত্ত্ব, রাজনীতি, ইতিহাসতত্ত্ব ইত্যাদির স্তূপীকৃত, বিশৃঙ্খল, পরস্পরবিরোধী জ্ঞানে তারা দিশেহারা হয়। দুই বন্ধু নাটক কবিতা উপন্যাস প্রভৃতি লেখার পরিকল্পনা করে তাদের সমস্ত নিয়মতত্ত্ব জানার জন্য বিস্তর বই পড়ে, কিন্তু এক্ষেত্রেও নিজেদের জ্ঞানের বোঝায় তাদের উদভ্রান্ত হতে হয়।

পুঁথিপোড়ো, জ্ঞানের স্বপ্নবিলাসী বুভার ও পেকুশের জড়তা ও নির্বুদ্ধিতার পাশাপাশি প্রাক্তন ডেপুটি ও প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক কাউন্ট ফোব্যার্জ, ব্যবসায়ী ও মেয়র ম্যসিয়ে ফুরো, ডেপুটি মার্সো, পাদ্রী জ্যোফ্রয়—এই চরিত্রগুলোর সুবিধাবাদে ও কুটিল স্বার্থপরতায় বুর্জোয়াজীবনের হীনতাই নির্মম কঠিন ভঙ্গিতে চিত্রিত। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে এই সমাজের চেহারা নগ্নভাবে উদ্ঘাটিত হয়। এই বিপ্লবে জনসাধারণের অভ্যুত্থান, রাজতন্ত্রের পতন ও সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বুভার ও পেকুশের মনে দুদিক থেকে উদ্দীপনা আনে, জনসাধারণের বিজয়ে বুভারের

দেশাত্মবোধ এবং রাজতন্ত্রের পতনে যুক্তিবাদী পেকুশের পূর্ব প্রত্যাশা চরিতার্থ হয়। পৌরসভার পক্ষ থেকে বুভারপ্রদত্ত স্বাধীনতার বৃক্ষ রোপণোৎসবে পাদ্রী জ্যোফ্রয় প্রচণ্ড গর্জনে রাজশক্তির মুণ্ডপাত করেন এবং নবপ্রতিষ্ঠিত রিপাবলিকের জয়গানে মুখর হন। বুভার ও পেকুশে মেয়রের বাইরে জনসাধারণের সঙ্গে দহরম-মহরম, ভেতরে রক্ষণশীল মতামত পোষণে এবং হীনস্বার্থপরতায় ক্ষুব্ধ না হয়ে পারে না। সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উৎসবে যোগদান করার পরই ফুরো আশঙ্কা প্রকাশ করেন, জনসাধারণ সব কিছুর বিলোপ সাধনে ইচ্ছুক, প্রজারা এরই মধ্যে তড়পাতে শুরু করেছে। পেকুশে জবাব দেয়, সে তো ভালো, সম্পত্তির মালিকদের প্রতি যথেষ্ট পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয়েছে। ফুরো এবং মার্সো দুজনেই এতে উত্তেজিত হন।

কিছুদিনের মধ্যেই প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটে, মেয়র পাদ্রী সকলেই নিজমূর্তি ধরেন। ইটালিতে সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে পোপকে সাহায্য করার জন্য ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনী প্রেরণ কাউণ্ট ফোব্যার্জ সমর্থন করেন। তাঁর মতে এই হস্তক্ষেপ থেকে ন্যায়সংগত আর কিছুই হতে পারে না। এই ফোব্যার্জই ভিয়েনা কংগ্রেসের ভাগ-বাঁটোয়ারা অনুযায়ী পোলাণ্ডের জারের সাম্রাজ্যভুক্তির সম্বন্ধে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছিলেন। বুভার সেটা মনে করিয়ে দিলে তিনি নির্দ্বিধায় বলেন, দুটো এক ব্যাপার নয়, এটা এখন পোপকে রক্ষা করার প্রশ্ন। বুভারের দেওয়া স্বাধীনতা উৎসবের স্মৃতিচিহ্ন পপলার গাছটি ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হয়, তার কিছু অংশ রক্ষীদল আগুন পোহাবার কাজে লাগায়, গুঁড়িটা পাদ্রীকে দেওয়া হয় যা তিনি কিছুদিন আগেই মন্ত্রপূত করেছিলেন। অতঃপর বুভারেরা এক হিংস্রকুটিল প্রতিশোধ গ্রহণের সাক্ষী হয়ঃ প্রজাতন্ত্রের সমর্থক, স্বাধীনচিন্তাবাদী দরিদ্র স্কুল শিক্ষক পেতিকে দমন করার জন্য পাদ্রী জ্যোফ্রয় তাকে সকলের সঙ্গে গীর্জার প্রার্থনা সভায় যোগ দেবার জন্য বলেন, না দিলে তার চাকরি খতম করে দেওয়া হবে। পেতি ভাবে, রুগ্ন স্ত্রী এবং শিশুসন্তানদের নিয়ে সে কোথায় আশ্রয় পাবে, তাকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য শুধু বিভিন্ন নামে এই একই পাদ্রী, একই রাজ-কর্মচারীরা একটি শৃঙ্খলের এক একটি গ্রন্থির মতো চারদিকেই ছড়িয়ে আছে। এই সময় রান্নাঘরে তার স্ত্রী ভীষণভাবে কাশতে শুরু করে, নবজাত শিশুটি চিৎকার করে ওঠে, ছোট ছেলেটি কাঁদতে থাকে। "হতভাগ্য শিশুরা"—পাদ্রী নরম গলায় বলেন। আর্তকান্নায় ভেঙ্গে পড়ে দরিদ্র স্কুলশিক্ষকটি আত্মসমর্পণ করে, বুভারেরা ধর্মযাজকদের ক্ষমতা দেখে আতঙ্কিত হয়। কাউণ্ট ফোব্যার্জের বাড়িতে এক ভোজসভায় তারা এই অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যযুগীয় মতামত

ব্যক্ত করতে শোনে। ফুরো বলেন, স্বাধীনতার কোনো প্রয়োজন নেই, ফ্রান্সকে এখন কঠিন লৌহদণ্ড দিয়ে শাসন করা দরকার। সকলেই একজন মুক্তিদাতার আবির্ভাবের জন্য প্রার্থনা জানায়। বাইরে বেরিয়ে আসার সময় বুভার ও পেকুশে কাউণ্টকে বলতে শোনে, "রাজাদের ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতার মতো আর কিছুই হতে পারে না।" বনজঙ্গলের পেছনে অক্টোবরের সূর্যের ম্লানরেখাগুলো যখন দীর্ঘতর হচ্ছিল, চারদিকে ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল, তখন ফেরার পথে শুকনো ঝরা পাতার ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সদ্যোমুক্ত বন্দীর মতো বুভার ও তার বন্ধু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। জ্ঞানচর্চার মতো সমাজের সংস্পর্শও তাদের জীবনে শুধু নৈরাশ্যের অন্ধকার বহন করে আনে।

বুভার-পেকুশের অভিজ্ঞতার শুধু একটি অধ্যায়ই অবশিষ্ট থাকে, প্রেম। বুভার ভেবেছিল মাদাম বোর্দ্যা তার অনুরাগিনী। একদিন নির্জনে তাকে পেয়ে সে বিগলিতচিত্তে প্রেম নিবেদন করে, তার পরেই সে তার প্রেমপাত্রীর অভিসন্ধি বোঝে: মাদাম ভালোবাসার বিনিময়ে তার চাষের জমির সব থেকে উর্বর অংশ-টুকু পেতে ইচ্ছুক যা অপরের কাছ থেকে টাকা নিয়েই তাকে দখলে রাখতে হয়েছে। অতএব মাদামকে বিয়ে করে বুভারের সুখী হবার স্বপ্ন চূর্ণ হয়, অন্যদিকে মাদাম তার আকৃতি, ভুঁড়ি সম্বন্ধে নিন্দাবাদ করে তার দুঃখের বোঝা বাড়ায়। পেকুশের অভিজ্ঞতা আরও বেদনাদায়ক। পেকুশে তাদের ঝি মেলির প্রতি আকৃষ্ট হয়। মেলিও তাকে ভালোবাসে শুনে সে আর স্থির থাকতে পারে না, প্রবল আবেগে তাকে জড়িয়ে ধরে। মেলি অস্বস্তি প্রকাশ করে, পেছনে যে কাঠের বোঝা ছিল তার ওপর পড়ে যায়, এক হাত দিয়ে মুখ ঢাকে। অন্য যে কোনো লোক হলেই বুঝতে, পারত, এই সারল্য মেলির ভান মাত্র, সে নিষ্পাপ অনভিজ্ঞ নয়। এই মিলনের ফলে পেকুশে যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। বুভার-পেকুশের প্রেমের স্বপ্নও তাদের জীবনে শুধু নিষ্ফলতার যন্ত্রণাময় অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়।

অপরিসীম তিক্ততায় বুভার ও পেকুশে সর্বজনসমক্ষেই মানুষের সততা, স্ত্রীলোকের সতীত্ব, গভর্ণমেণ্টের বিচক্ষণতা, জনসাধারণের বুদ্ধিবিবেচনা সমস্ত কিছুর যাথার্থ্যকে অস্বীকার করে সন্দেহ জানাতে থাকে। মেয়র তাদের গ্রেপ্তার করার হুমকি দেন। তারা ভাবে, পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তেই তো ফুরো-মার্সোরা ছড়িয়ে আছে, সমগ্র পৃথিবীর বোঝাই যেন ভারি হয়ে তাদের বুকের ওপর নামে। একদিন রাস্তার ধারে একটা কুকুরের গলিত শব দেখে তারা বেদনায় মুহ্যমান হয়: বুভারের ভুরু কুঁচকে যায়, তার দুচোখ জলে ভরে ওঠে, আর পেকুশে কঠিন স্বরে বলে, "একদিন আমাদেরও ঐ রকম হতে হবে!" মৃত্যুর পর তাদের পরিণাম

কি হবে তারা ভাবে। পরিণাম যাই হোক, এই ক্লান্তিকর, অর্থহীন এবং নৈরাশ্যময় অস্তিত্ব থেকে নিশ্চয়ই ভালো। বুভার-পেকুশে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার সংকল্প নেয়। দুজনেই যখন চেয়ারের উপর উঠে দাঁড়িয়েছে তখন বুভার হঠাৎ বলে ওঠে, "একি, আমরা ত উইল করে গেলাম না।" তারা চমকে ওঠে, প্রবল কান্নার আবেগে তাদের বুক ফুলে ওঠে, নিঃশ্বাস নেবার জন্য স্কাইলাইটে হেলান দেয়। সেই মধ্যরাত্রির বাতাস ঠাণ্ডা, অন্ধকার আকাশে অজস্র তারার ঝিকিমিকি, মাটির ওপরে বিস্তৃত তুষারের শুভ্রতা দিগন্তের কুয়াশায় বিলীন। অদূরে মাটির ওপর অনেকগুলো চলমান আলোর বিন্দু, সেগুলো ক্রমশ বড় হয়ে গীর্জার ধারে এসে উপস্থিত হচ্ছে। কৌতূহলী হয়েই বুভার ও পেকুশে সেখানে যায়, মধ্যরাত্রির প্রার্থনাসভার আয়োজন দেখে। গীর্জার প্রার্থনাকক্ষে বৃদ্ধা, তরুণ, ছিন্নবস্ত্রে ভিখারিণী, সন্তানের মাতা—সকলেই প্রার্থনারত, তাদের ধ্যানদৃষ্টিতে খড়ের গাদায় শিশু যীশুখ্রীষ্টের জ্যোতির্ময় আবির্ভাব উদ্ভাসিত। এই বিশ্বাসের আবেগ বুভারের যুক্তিবোধ ও পেকুশের হৃদয়ের কাঠিন্য সত্ত্বেও তাদের স্পর্শ করে।

তারপর পাই তাদের ধর্মতত্ত্ব চর্চা, এক্ষেত্রেও যথারীতি তাদের প্রবঞ্চিত হতে হয়। বুভার খ্রীস্টিয় ধর্মশাস্ত্রের মানুষের আদিম পাপের তত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে: মানুষকে শাস্তি দেওয়া ঈশ্বরের উচিত হয়নি, যেহেতু তিনি তাকে পাপ-প্রবণরূপে সৃষ্টি করেছেন, অশুভ শক্তি তার পতনের পূর্ববর্তী, কারণ আগ্নেয়গিরি বন্য জন্তু ইত্যাদি তো অনেক আগেই ছিল, এই তত্ত্ব তার ন্যায়বিচারের ধারণাকে আঘাত করে। পাদ্রী বলেন, এর সপক্ষে প্রমাণ দিতে সক্ষম না হলেও সকলে প্রমাণ দিতে না পেরেও যে সমস্ত সত্য মেনে নিয়েছে এটা তার অন্যতম, আমরা নিজেরাও তো পিতামাতাদের অপরাধের দায়ভাগ সন্তানদের ওপর চাপিয়ে দিই, নীতি ও আইন এই ঐশ্বরিক বিধানকে সমর্থন করে, কারণ আমরা প্রকৃতির মধ্যেই তো সেটা দেখি। বুভার নিরস্ত না হয়ে নরক সম্বন্ধেও তার সংশয় জানায়: যে শাস্তি অনন্ত তার ক্ষেত্রে তো ক্ষমা নেই, কত লোকই না তা ভোগ করছে! প্রাচীনকালের লোকেরা, ইহুদি, মুসলমান, পৌত্তলিক এবং যে সমস্ত শিশুরা ব্যাপ্‌টিজ্‌মের আগেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হলেও তারা যে পাপ করেনি তার জন্য শাস্তি পাবে! পাদ্রীর ধমক খেয়ে নাস্তিকরূপে পরিচিত হওয়ার ভয়ে বুভার চুপ করে যায়। কাউন্ট তাঁর বাড়ির বৈঠকে বলেন, "ঊননব্বই শতকের (ফরাসী বিপ্লব) মানসপ্রবণতা জঘন্য, তারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিল, সরকার সম্বন্ধে বিচার-বিতর্ক চালিয়েছিল, তারপর এল স্বাধীনতার দাবি—অপমান বিদ্রোহ করার, লুণ্ঠনের স্বাধীনতা! ঈশ্বর ছাড়া

কোনো রাষ্ট্র সম্ভব নয়।" ১৮৪৮-৪৯ সালে নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের সূত্রে ঐক্যবদ্ধ ইটালি গড়ে তোলার প্রয়াসের বিরোধিতা ফ্রান্স করে এসেছে, ফরাসী উচ্চবিত্ত মহলে সেটা সমর্থন পেয়েছে। ভিক্টর ইমানুয়েলের রাজত্বকালে রোমে পোপের কায়েমীস্বত্ব উচ্ছেদ করে তাকে ইটালীর রাজধানী করা হলে সম্ভ্রান্ত ফরাসীরা ভিক্টর ইমানুয়েলের মুণ্ডপাত করছিল, শুধু বুভার ও পেকুশই ক্ষীণ প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কাউন্ট সেই প্রসঙ্গের জের টেনে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন: এটা ইটালীয়ানদের প্রশ্ন নয়। বিপ্লব অথবা পোপ, শয়তান অথবা যীশুখ্রীষ্ট—দাঁড়িপাল্লা কার দিকে ঝুঁকবে সেটা ঠিক করারই ব্যাপার। ধর্মীয় জিজ্ঞাসাও বুভারদের শূন্যতা ছাড়া আর কিছু এনে দেয় না। অতঃপর শিক্ষা-বিষয়ক সমস্ত বইপত্র পড়ে একজন দুর্বৃত্তের একটি ছেলে ও মেয়ের ওপর সেই পুঁথিগত বিদ্যার প্রয়োগেও তাদের অদৃষ্টে কম বিড়ম্বনা জোটে না। 'বুভার ও পেকুশে' এখানেই খণ্ডিত, ফ্লোবেয়্যর রচনাটিকে শেষ করে যেতে পারেন নি। তিনি উপন্যাসটির উপসংহারের যে পরিকল্পনামূলক খসড়া রেখে গেছেন তাতে দেখা যায়, বুভার ও পেকুশে তাদের নাগরিকদের কাছে বক্তৃতা দেবে, বুভারের আশাবাদ আর পেকুশের নৈরাশ্যবাদ—কোনোটাই শ্রোতাদের কাছে সংশয়াতীত বলে মনে হবে না, তারা আরও বৈরীভাবাপন্ন হয়ে উঠবে। গভীর হতাশায় তারা দুজনেই আগেকার মতো কপি করার সিদ্ধান্তে অনুপ্রাণিত হবে। বুভারদের যে মজুরটি স্বাধীনতা-উৎসবের বৃক্ষ তৈরি করেছিল, সে-ই তাদের জন্য একটা ডাব্‌ল ডেস্ক বানিয়ে দেবে, জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ বুভার ও পেকুশে শেষ পর্যন্ত তাদের কেরাণী জীবনের সেই কপি করার কাজেই রত হবে। কেউ কেউ অনুমান করেছেন Dictionnaire des ide'es recues থেকেই বুভার ও পেকুশে কপি করবে, এটি সেই উদ্দেশ্যেই সংকলিত হয়েছিল।

'বুভার ও পেকুশে' সম্বন্ধে ফ্লোবেয়্যর বলেছেন, এটি এক ধরনের এনসাইক্লোপিডিয়া যাকে ফার্সে পরিণত করা হয়েছে। উপন্যাসটি লেখার সময়ও ঔপন্যাসিক জানান, যে বইটি তিনি লিখছেন, তাকে 'মানুষের নির্বুদ্ধিতার এনসাইক্লোপিডিয়া' এই উপ-শিরোনাম দেওয়া যেতে পারে। এই রচনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপের বুর্জোয়া-সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা তার পজিটিভিস্ট জ্ঞানচর্চার গোলকধাঁধাকেই শুধু উপহাস করা হয়নি, সেই সূত্রে সমগ্র মানব-সভ্যতাসংস্কৃতির আড়ম্বরকেই ব্যঙ্গ করা হয়েছে। 'বুভার ও পেকুশে' আমাদের অনিবার্যভাবেই সুইফ্‌ট্‌-এর সভ্যতার ওপর নির্মম ব্যঙ্গের অভিশাপ-বর্ষণ স্মরণ করিয়ে দেয়। দিদেরোর এনসাইক্লোপিডিয়ায় অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী

বুদ্ধিজীবী সমাজের সভ্যতা এবং তার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ সম্বন্ধে যে দৃঢ় প্রত্যয়, তার অগ্রগতিতে যে আস্থা প্রতিফলিত, ফ্লোবেয়্যরদের কাছে তা যে কত মূল্যহীন, নিষ্ফল বলে প্রতিভাত হয়েছিল, 'বুভার ও পেকুশে'তে তার প্রমাণ মেলে। পাঠকসমাজে এই রচনাটি অনাদৃত হলেও আধুনিক যুগের অস্তিত্বের শূন্যতার কোনো কোনো শক্তিশালী শিল্পী তার দ্বারা প্রভাবিত। এজ্‌রা পাউণ্ড যথার্থই বলেছেন, ফ্লোবেয়্যর বুভার ও পেকুশেতে যে প্রক্রিয়ার সূত্রপাত করেন, জয়েস ইউলিসিসে তাকে পূর্ণতা দেন, বুভার-পেকুশের মতো এই উপন্যাসের নায়ক ব্লুমও গণতন্ত্রের ভিত্তি, 'দা ম্যান ইন দা স্ট্রীট, দা পাবলিক'। একালের নৈরাশ্যজীবী নেতিবাদের আর এক শক্তিশালী শিল্পী কাফকার নিজেরই স্বীকৃতি অনুসারে, তাঁর 'একটি কুকুরের অনুসন্ধান' গল্পটি তাঁর 'বুভার ও পেকুশে'। অবশ্যই ফ্লোবেয়্যরের অন্যান্য রচনার মতো এই উপন্যাসটির সীমাবদ্ধতাও আমাদের চোখে পড়ে। যে ইতিহাসবোধে, পরিপ্রেক্ষিতচেতনায় ব্যঙ্গ-তাৎপর্য গভীর হয়ে ওঠে, 'বুভার ও পেকুশে'তে তার একান্ত অভাব। ফ্লোবেয়্যর ব্যাধিগ্রস্তর মতোই তাঁর কালের সমাজ-সভ্যতার অবক্ষয়ের দুর্বিষহ উত্তরাধিকার সীমাহীন শূন্যতা ও লক্ষ্যহীনতায় শুধু পীড়িত, জর্জরিতই হয়েছেন, কিন্তু কোনো জিজ্ঞাসায় বা ব্যাপ্ত বোধে তাকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করেন নি। রূপকের সুস্পষ্ট আবরণ সত্ত্বেও সুইফ্‌ট্-এর গালিভার সজীব, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের রূপ নেয়। কিন্তু ফ্লোবেয়্যরের ব্যঙ্গের নকশার দুজন কুশীলবকে খড়কুটোর মতোই এতো তুচ্ছ, গৌণ মনে হয় (এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, তাদের স্রষ্টা এই রচনাটিকে 'দুটি আরশোলার ইতিহাস' নাম দিতে চেয়েছিলেন) যে লেখকের অসাধারণ উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ রচনাভঙ্গি সত্ত্বেও মাঝে মাঝে উপন্যাসটি বিস্বাদ লাগে।

কিন্তু 'বুভার ও পেকুশে'র সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আধুনিক উপন্যাসপাঠকের কাছে তার একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে। আপাতদৃষ্টিতে এই উপন্যাসের পাত্রদের সঙ্গে ফ্লোবেয়্যরের দূরত্ব চোখে পড়ে, আসলে তারাও শিল্পীর যন্ত্রণা ও আত্মগ্লানির, এমা ও ফ্রেদরিক মোরোর মতো তাঁর আত্মিক সমস্যার প্রতিরূপ। বৈষয়িক স্বার্থসর্বস্ব, হীন সুবিধাবাদ ও নীচতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত সমাজের আঘাতে বৈষয়িক-বুদ্ধিহীন, নির্বোধ স্বপ্নকল্পনাভঙ্গের শূন্যতার থিম এই উপন্যাসটিতেও অন্যভাবে চিত্রিত। বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা অথচ তার গণ্ডি অতিক্রমে অক্ষমতা—পেটিবুর্জোয়াশ্রেণীসুলভ এই স্ববিরোধিতাসঞ্জাত আত্মগ্লানিতে ফ্লোবেয়্যর দগ্ধ হয়েছেন, তাঁর সেই যন্ত্রণাবোধের প্রকৃতি যেমনই হোক, তাতে কোনো মিথ্যাচারের খাদ ছিল না। একালের কোনো কোনো লেখকদের মতো

সামাজিক পটভূমি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন তথাকথিত অস্তিত্ববাদের খেলা, বিচ্ছিন্নতার শৌখিন যন্ত্রণাবিলাস, শাস্ত্রবিরোধী রচনার নানা কলাকৌশলের চমক—প্রভৃতির বেসাতিতে বাণিজ্যিক স্বার্থের সঙ্গে চতুর আপোষরফার সাফল্য ফ্লোবেয়্যর খোঁজেন নি। তাঁর যে এক ধরনের সততা ছিল তার প্রমাণ, নিজের শোচনীয় সীমাবদ্ধতা নিয়ে তিনি কখনো আস্ফালন করেন নি, বা তাই নিয়ে কোনো চমকপ্রদ নাটক জমাবার চেষ্টায় মাতেন নি, টলস্টয়ের মহত্ত্বের পাশে নিজের ক্ষুদ্রতা অকুণ্ঠিতভাবেই উল্লেখ করেছেন। ডকুমেন্টেশন, খুঁটিনাটি তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা ছিল তাঁর প্রযত্ননিষ্ঠ শিল্পকলার অঙ্গ (নিছক টেকনিকের একাগ্র চর্চাও শিল্পীকে কখনো কখনো জীবনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে)। অবশ্য ফ্লোবেয়্যরের এই কঠিন, পরিশ্রমী শিল্পচর্চা ব্যক্তিগত গ্লানিকে দমন করে আত্ম-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উপায় হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে, তবু শিল্পের এই প্রযত্ননিষ্ঠ রূপায়ণের তাগিদ এবং সেই যন্ত্রণাবোধ শিল্পীকে কখনো কখনো বাস্তবজীবনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, তিনি ঐতিহাসিক যাথার্থেই তাঁর কালের ফরাসী সমাজের অবক্ষয়কে আঁকতে পেরেছেন।

সেই কারণেই বুভার ও পেকুশের মধ্যে লেখকের আত্মগ্লানি তথা পেটিবুর্জোয়া-শ্রেণীর দ্বিধাদ্বন্দ্ব অক্ষম-যন্ত্রণা প্রতিফলিত। তারা একদিকে কাউন্ট ফোব্যার্জের প্রাসাদের আসরে নিমন্ত্রিত হবার সৌভাগ্যে গর্বিত, আভিজাত্য ও ঐশ্বর্যের জৌলুসে মুগ্ধ হয়, অন্যদিকে এই উচ্চবিত্ত সমাজের মনুষ্যত্বহীনতা তাদের ক্ষুব্ধ ও পীড়িত করে। বুভার-পেকুশের পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীসুলভ দ্বিধা-দুর্বলতা ১৮৪৮-এর বিপ্লব কালে Gorju-সম্পর্কিত অংশে সব থেকে বেশি প্রকট। Gorju মজুর শ্রেণীর, ষণ্ডাগুণ্ডা গোছের লোক। ১৮৪৮-এর বিপ্লবের সময় সে হিরো হয়ে পড়ে, গ্রামের প্রবেশপথের কাছে স্বাধীনতা-উৎসবের বৃক্ষ বসিয়ে দেয়। তার নেতৃত্বেই বুভারেরা ড্রিল শেখে। চারিদিকের অনিশ্চিত অবস্থায় কারখানা-গুলো বন্ধ হয়ে গেলে বিভিন্ন জায়গার শ্রমিকেরা কাজের দাবিতে মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের মেয়র ও অন্যান্য সদস্যদের সভা চলার সময় কাউন্সিল কক্ষের দরজার সামনে জমায়েত হয়, Gorju এই বিক্ষোভে একটি প্রধান ভূমিকা নেয়। পেকুশে লামার্তিন হবার বাসনায় জনতার সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বিপদে পড়ে, কারখানার একজন মিস্ত্রী তাকে লাঞ্ছিত করতে উদ্যত হলে Gorju-র হস্তক্ষেপের জন্যই সে রক্ষা পায়। বিপ্লব ব্যর্থ হবার বেশ কিছুদিন পর বার্চ গাছগুলোর নীচে Gorju যখন লুকিয়ে ছিল, তখন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়, তার পোষাক জুতো ছিন্নভিন্ন, মুখে আঁচড়ের রক্তাক্ত দাগ, অনাহারে শীর্ণ শরীর। সে এখানে কেন

ফিরে এল এবং গত ছয় সপ্তাহে কোন কাজে নিযুক্ত ছিল—মেয়রের এই প্রশ্নের উত্তরে Gorju বলে, সেটা তার মাথা ঘামাবার বিষয় নয়, তার নিজের স্বাধীনতা আছে। বুভার তার জন্য বলতে গিয়ে মেয়রের ধমক খেয়ে চুপ করে যায়। Gorju তার সপক্ষে কিছু বলার জন্য পেকুশকে অনুরোধ করলে সে মাথা নিচু করে থাকে। দরিদ্র হতভাগ্য ব্যক্তিটি তখন তিক্ত হাসি হেসে বলে, সে কিন্তু তাকে রক্ষা করেছিল! তারাই আবার তাদের অঞ্চলে রক্ষণশীল অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিভূ লুই বোনাপার্ট বিপুলসংখ্যক ভোট পেলে জনসাধারণের প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ করে, তাদের সহজেই প্রতারিত হবার প্রবণতা ও নির্বুদ্ধিতার সমালোচনায় মুখর হয়। অবশ্য বুভার-পেকুশের এই দ্বিধাগ্রস্ততা শুধু চিত্রিতই হয়েছে। তা কখনও তীক্ষ্ণ ও সচেতন সমালোচনার রূপ নেয় নি যা কাউণ্ট ফোব্যার্জ, ম্যসিয়ে ফুরো, মার্সো, জ্যোফ্রয় প্রভৃতি বুর্জোয়া সমাজের প্রতিনিধি চরিত্রগুলোর ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। ফ্লোবেয়্যর তাঁর কালের নৈতিক দুর্গতি ও ভ্রষ্টাচারে প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ ও পীড়িত হয়েও তাদের অনেকটা অনিবার্য নিয়তি বলেই গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর সেই মানসিক পঙ্গুতার জন্যই বুভার ও পেকুশের মধ্যে একবারও নিজেদের সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন বা সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দ্বন্দ্বময় সক্রিয়তা দেখি না। উপন্যাসটির এই মৌল দুর্বলতা সত্ত্বেও আমাদের লক্ষ্য করতে হয়, বুভার-পেকুশে বুর্জোয়া সমাজের প্রতিনিধি চরিত্রগুলোর মতো নীচ প্রকৃতির নয়, একমাত্র তারাই বৈষয়িক স্বার্থসর্বস্ব সমাজের অমানুষিকতা ও নিজেদের অক্ষমতায় পীড়িত হয়েছে। লেখকের সচেতন উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, এই দুটি চরিত্র যদি পুরোপুরিভাবে তাঁর ঘৃণাসঞ্জাত বিদ্রূপের নিছক উপাদান হিসেবেই ব্যবহৃত হত, তবে তাদের আত্মহত্যার চেষ্টার দুঃখের ট্র্যাজিক বিষাদ বোধহয় এত গাঢ় হয়ে উঠত না। 'বুভার ও পেকুশে'-তে ১৮৪৮-এর বিপ্লব ও তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার যে সংক্ষিপ্ত অথচ তীক্ষ্ণ, বস্তুনিষ্ঠ এবং জীবন্ত চিত্র পাই তাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

যতই অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত হোক, 'বুভার ও পেকুশে'-র মধ্যে আমরা বিচার-সমালোচনার একটা দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক পটভূমির বোধ পাই, যা ছাড়া উপন্যাসের কোনো রূপই তার ভিত্তি তথা অর্থময় সংলগ্নতা পায় না। ফ্লোবেয়্যর তাঁর কালের নৈরাজ্যিক মনোভাবের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন নি। শিল্পীর নিজস্ব ব্যক্তিস্বরূপগত স্বাধীনতা বলে যদি কিছু থেকে থাকে তবে সেটা তাঁর ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধের স্বরূপসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই নিহিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই বিভিন্ন লেখকদের মধ্যে বিভিন্ন রকম, কিন্তু স্থানকালের বস্তুনিষ্ঠ

একাঙ্ক নাট্যের রচনা বিভ্রাট

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

একাঙ্ক নাট্য বাঙলা নাটকের ক্ষেত্রে এরই মধ্যে নিজের একটি বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছে। কথাসাহিত্যে উপন্যাস ও ছোটগল্পে যেমন তফাৎ আছে, নাট্যসাহিত্যেও তেমনি পূর্ণাঙ্গ নাটক ও একাঙ্ক নাট্যের স্বাদ আলাদা। অথচ দুটিকে নিয়েই গোটা নাট্য সাহিত্য। একাঙ্ক নাট্যের দ্বারা বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের এই পরিপুষ্টি অভিনন্দনীয়। এর দ্বারা নাটকের প্রসার ঘটেছে। এসেছে বিচিত্র সমস্যা, বিচিত্র জীবন, বহুবিধ চিন্তা ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। একটি আলো ফেলে যা দেখা যায় না, বহু আলোতে তা প্রতিভাত হয়। জীবনে এমন অনেক সমস্যা আসে, এমন দ্বন্দ্ব দেখা দেয় যা একটি বড় নাটক রচনার উপযুক্ত বিষয়বস্তু নয়, অথচ তার যে কোনো একটিকে নিয়ে একটি নিটোল একাঙ্ক নাট্য লেখা যায়। বাঙলা একাঙ্ক নাট্য ইদানীং এ অভাব খানিকটা পুরণ করেছে। এর প্রসার ঘটিয়েছে একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতাগুলি।

কিন্তু এ সম্বন্ধে সাবধান হবারও সময় এসেছে। শিল্পরচনার একটা সাধারণ নিয়ম ও রূপরীতি আছে। প্রত্যেক স্রষ্টাকেই তা মানতে হয়। নতুন কিছু করার নামে সমস্ত নিয়ম ও রীতিকে অগ্রাহ্য করলে anarchy-তে পরিণত হয়। তার পরিণাম chaos, শিল্প সেখানে তার নিজস্ব রূপ হারিয়ে বিকৃত ও বিকলাঙ্গ হয়। উপন্যাস ও ছোটগল্পে যেমন রূপরীতির পার্থক্য আছে, পূর্ণাঙ্গ নাটক এবং একাঙ্ক নাটকও তেমনি রূপকর্মে আলাদা। পূর্ণাঙ্গ নাটকে মূল সমস্যাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য সমস্যাকেও আনা যায় এবং ঘটনার বিস্তারও সেখানে সম্ভব। স্থান এবং কালের ব্যবধানও সেখানে গ্রাহ্য। কিন্তু একাঙ্ক নাট্যে three unities অর্থাৎ স্থান কাল ও ঘটনার ঐক্যের প্রতি বিশেষ নজর রাখা দরকার। তা না থাকলে একাঙ্ক নাট্যে ঘনপিনদ্ধতা আসে না—আর রসহানি ঘটে। বহু ঘটনার অবতারণা এবং স্থান ও কালের ব্যবধান দর্শকদের দৃষ্টি ও কল্পনাকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। একটি সমস্যা বা দ্বন্দ্ব অথবা বিশেষ একটি ঘটনা বা পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে একাঙ্ক নাট্য রচনা করলে নাট্যক্রিয়া ও বক্তব্যের প্রতি দর্শকদের একাগ্রতা আসে। স্বল্পতার মধ্যে পূর্ণতার স্বাদ দেওয়াতেই একাঙ্ক নাট্যের সার্থকতা।

একাঙ্ক নাট্য রচনার ক্ষেত্রে নবাগতদের মধ্যে অনেকেরই এ-বিষয়ে ঔদাসীন্য দেখা যায়। চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিটের একটি নাটকে পুঞ্জীভূত সমস্যার অবতারণা করেন তাঁরা। তার ফলে আসে ঘটনাপ্রবাহ, কোনো একটি ঘটনারই ওপর বিশেষ জোর পড়ে না। দর্শকরা ঘটনাগুলি দেখে যান, কিন্তু কোনো ঘটনাই তাঁদের মনে তেমন ছাপ রাখে না। স্থান এবং কালেরও ঐক্য থাকে না। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ের ঘটনাগুলি একটি একাঙ্ক নাট্যে ঠাসা হয়। কেউ কেউ আবার flash backও ব্যবহার করেন। এক শতাব্দীর কাহিনী বলতে চাওয়া হয় একটি একাঙ্ক নাটকে। ডায়নোসেরাস এর কাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত শোষণের ধারাবাহিকতাও দেখাবার চেষ্টা হয়েছে একটি একাঙ্ক নাট্যে। কেউ কেউ আবার একটি বড় নাটককে সংক্ষিপ্ত করে একাঙ্ক নাট্য বলে চালাতে চান। প্রতিযোগিতায় একঘণ্টার উপযোগী করলেই যে সেটা একাঙ্ক নাট্য হয় না, একথা তাঁদের বোঝাবে কে?

আর একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে সাম্প্রতিক বাঙলা একাঙ্ক নাট্যে যেটাকে mannerism বলা যায়। একজনকে দেখে আরেক জনের অনুকরণ। এই অনুকরণপ্রিয়তা পোশাকের মতোই ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফ্রীজ চাই, কোরাসের মতো একসঙ্গে একই কথা কয়েকজনের বলা চাই। দেহের বিভিন্ন ভঙ্গি করে পেশীসঞ্চালন দেখাতে হবে। প্রেক্ষালয় থেকে চেঁচিয়ে কিছু না বললেই-বা চলে কি করে। একটা যাদুকর আনতে পারলে ভালো হয়। মাইমও দেখানো দরকার। এসব না হলে কি আধুনিক নাটক হয়! তারপর আছে বাণীর পর বাণী উদ্গীরণ। দর্শকদের জ্ঞান দিতে হবে তো। রসের ঘর শূন্য রেখে সবাই জ্ঞান দিতে ব্যস্ত। দেখে মনে হয় চরিত্রগুলি যেন রাজনৈতিক বা সামাজিক নেতা হয়ে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছে। একটি চরিত্র থেকে আরেকটি চরিত্রকে আলাদা করে দেখার বা বুঝবার উপায় নেই। চরিত্রগুলি যেন নাট্যকারের হাতের কলের পুতুল—তাঁর সুতোর টানে সেগুলো নড়াচড়া ও বলাবলি করছে। এক কথায় dehumanised অর্থাৎ মানবীয়গুণরহিত মনুষ্যরূপী যান্ত্রিক পুতুল। কোনো একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় বিশটি নাটক দেখলে অন্তত পনেরোটিতেই এই রকম পুনরাবৃত্তি দেখা যাবে।

নারীচরিত্র বর্জনেও একটা মিল আছে। সমাজের অর্ধেকই নারী। কিন্তু তথাকথিত আধুনিক বাঙলা নাটকের অধিকাংশতেই, বিশেষত একাঙ্ক নাট্যে, নারী জাতি বর্জিত বললেই হয়। পথে নারী বিবর্জিতা বাক্য শিরোধার্য করে নাট্যকাররা নাটকেও নারী সমাজকে বর্জন করেছেন। নরনারীর সম্পর্ক প্রায়

অনুপস্থিত। তাই নেই সামাজিক সমস্যা, নেই পারিবারিক জীবন। মা-বোনের জন্যে কেঁদে আকুল, কিন্তু মা-বোনের ছায়াও মঞ্চে চর্মচক্ষে দেখতে পাওয়া যাবে না। দেখতে হলে দর্শকের দিব্যদৃষ্টি থাকা চাই। যাঁরা বিপ্লবের কথা নাটকে বলেন তাঁরাও মাতৃজাতিকে বর্জন করেই চলেন। বিপ্লব শুধু বাইরের জন্য, ঘরের জন্য নয়। ঘর অন্ধকার থাকলে এসব বিপ্লবীর কিছু এসে যায় না।

এটা প্রচলিত রীতি ভাঙার প্রয়োগ বলে কেউ দাবি করলে বলতে হবে—ভেঙে যা গড়া হচ্ছে তা তো deformed বা বিকলাঙ্গ। অক্ষমতাকেও অনেক সময় অভিনবত্ব বলে চালাবার চেষ্টা হয়। আসলে নাট্যরচনার জন্যে যে অনুশীলনের দরকার তার অভাবেই হয়তো এই বিকৃতি আসছে।

হামেশাই একটা কথা শুনতে পাওয়া যায়—সমাজ-সচেতন নাটক। নাটকে সমাজের যে কোনো একটি চিত্র বা কয়েকটি সামাজিক চরিত্র থাকলেই তা যেন সমাজসচেতন নাটক! ইতিহাসের দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকলেও সমাজসচেতন—আবার ইতিহাসের গতি সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা দেখালে বা ভুল ব্যাখ্যা দিলেও সমাজসচেতন! হট্টগোলের মধ্যে কয়েকটি সামাজিক চরিত্র নিয়ে নাটকের নামে একটা কিছু লিখলেই যেন তা সমাজসচেতন হয়ে যায়।

সব চেয়ে আশ্চর্য লাগে যখন বিজ্ঞ সেজে কিছু অজ্ঞ ব্যক্তি এ ধরনের নাটকগুলির ললাটে সমাজচেতনার তিলক পরিয়ে দেন। এমন অলকাতিলকা-পরা নাটকে আজকাল বাজার ছেয়ে যাচ্ছে। তার ফলে সমাজচেতনার নামে কিছু ভাঁড়ামি, চটুলতা ও পল্লবগ্রাহিতা প্রশ্রয় পাচ্ছে। চোর-লম্পটের মধ্যে মহানুভবতা খোঁজা হচ্ছে—জীবনযন্ত্রণার নামে যৌনবিকার বা যৌনপীড়ন প্রকাশ পাচ্ছে—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে।

সবাই মৌল চিন্তার দাবি করছেন। মুলই নেই তো মৌল হবে কোত্থেকে! আসলে অনেকেরই নেই ইতিহাসবোধ। প্রকৃত ইতিহাসবোধ না থাকলে সমাজ-চেতনা আসে না। ইতিহাসের কোন অধ্যায়ে দাঁড়িয়ে আছি আমরা—তার গতি কোন দিকে, তার প্রতিকূল শক্তি কি আর ভবিষ্যতই বা কোথায়, এসব সম্বন্ধে চেতনা থাকা চাইতো প্রথমে। তার সঙ্গে বিশ্ববোধও থাকা দরকার। আজকের দিনে সেদিকে দৃষ্টি না থাকলে অন্ধকারে থাকারই সামিল। বিশ্ববিচারে আমাদের সমাজ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে—এগিয়ে আছে কি পিছিয়ে আছে—পিছিয়ে থাকলে কতটা এগুতে হবে আমাদের—কোন পথে এগুতে হবে আর কারাই বা সেই এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব পালন করছে—আবার কারাই বা এগোবার পথে প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করছে—এসব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করাই সমাজ-সচেতনতায়

পৌঁছোবার সোপান। অব্যবস্থিতচিত্ত হয়ে বা রাতারাতি খ্যাতিলাভের লালসায় হঠকারিতার পরিচয় দিয়ে সেই সোপানে আরোহণ করা যায় না। তার জন্যে চাই নিয়মিত মনন, অধ্যয়ন ও অনুশীলন। একমাত্র ইতিহাসবোধের দ্বারা চালিত হয়েই সেই অনুশীলন করা সম্ভব।

ঘটনা নিয়তই ভিড় করে আমাদের ঘাড়ে চাপছে। আমরা চাই আর না-ই চাই, ঘটনা কারো জন্যে অপেক্ষা করে না। তা ঘটেই চলেছে। এমন অনেক ঘটনা ঘটছে যা আমরা চাইনা—অথচ ঘটে যাচ্ছে। আমাদের না-চাওয়ার দলের শক্তির চাইতে যারা সেসব অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটাচ্ছে তাদের শক্তি বেশি। তাই তাদের ইচ্ছেয় যখন সেসব ঘটনা ঘটে তখন আমরা খানিকটা অসহায় বোধ করি। আবার আমাদের ইচ্ছের অনুকূল ঘটনাও না ঘটে এমন নয়। সাম্প্রতিককালে আমাদের মনের উপর বড় বড় অনেকগুলি অনভিপ্রেত ঘটনার চাপ পড়েছে—যুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা ইত্যাদি। এর বিপরীতে ধনাত্মক দিকও আছে। আমাদের স্বাধীনতা লাভ। আন্তর্জাতিক ঘটনার প্রভাবও কম নয়। দুনিয়ার এক-তৃতীয়াংশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, প্রবল পরাক্রান্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করে ভিয়েতনামের পূর্ণ মুক্তি, তিনটি মহাদেশে ৭৫ টিরও অধিক দেশের স্বাধীনতা-অর্জন ও বিশ্বশক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তন। স্বাধীন বাঙলা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাও কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়। চিলির বিপর্যয় যেমন মর্মান্তিক, গ্রীসে সামরিক শাসনের অবসান এবং পর্তুগালে ফ্যাসিবিরোধী বিপ্লবের সম্ভাবনা তেমনি আশাব্যঞ্জক। বাঙলাদেশে বঙ্গবন্ধু পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ক্ষমতাদখলও আমাদের চিন্তিত না করে পারে না। এসব ঘটনার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে আমরা কি বিচ্ছিন্নভাবে শুধু নিজেদের কথা চিন্তা করতে পারি? কোনো সচেতন শিল্পী-সাহিত্যিকই তা পারেন না।

কোনো বিপর্যয়ে শিল্পীর চিত্তবিমূঢ়তা বা দৃষ্টিবিভ্রম ঘটলেই বিপদ। শিল্পী-সাহিত্যিকের কাছে বৈষয়িক বিপর্যয়ের চাইতেও মানসিক বিপর্যয়ের গুরুত্ব বেশি। সেটাই তাঁদের অনুভূতি ও চেতনাকে নাড়া দেয়। ঐতিহাসিক চেতনা না থাকলে ঘটনার মুল্যায়নে ভুল হয়। আপাত আঘাতে বিচলিত হয়ে বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা। ঐতিহাসিক চেতনা থাকলে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দ্বারা খাদ ছাড়িয়ে নিয়ে নিখাদ জিনিশ বার করা যায়। মন বিশ্লেষণশীল হলে কার্যকারণ খোঁজে—নিহিত সত্য উদ্‌ঘাটনে ব্যাপৃত হয়। আপাত বস্তু তখন তুচ্ছ হয়ে অন্তর্নিহিত এক মহান সত্যকে প্রকাশ করে। বিপর্যয়ে বিমূঢ় হওয়া নয়, আত্মস্থ হওয়াই শিল্পসাধকের ধর্ম। চিত্তবিক্ষোভকে গভীর সত্যোপলব্ধিতে নিয়ে

যেতে হয়। বাহ্যত নির্বিকার মনে হলেও শিল্পীর মনে চলে তখন অবিরাম সংগ্রাম—সন্তান লাভের জন্যে মাতৃহৃদয়ের দুর্দমনীয় কামনার মতো। তারপর সন্তান যেদিন জঠরে এল—মাতৃহৃদয় ভরে উঠল কানায় কানায়—ধ্যান, জ্ঞান, স্বপ্ন, বাসনা,কামনা ও নিজের রসে পরিপুষ্ট করতে লাগল সেই জঠরস্থ সন্তানকে। তারপর এক শুভ মুহূর্তে ভূমিষ্ঠ হল নবজাতক যার মুখ দেখে কেবল জননীই প্রসন্ন হল না—হল আরো অনেক মানুষই।

শিল্পীকে এইভাবে ঘটনার নির্যাস আত্মস্থ করতে হয়। তারপর তা পরিপুষ্ট হয় তাঁর অন্তরের অনুভূতি ও আবেগের দ্বারা। অতঃপর শিল্পরূপে তা যেদিন জন্মলাভ করে, সেদিন তা আর নির্যাসের রূপে থাকে না, আসে নানাভাবে পরিপুষ্ট হয়ে নানা বৈচিত্র্য নিয়ে, নব কলেবরে। ঘটনা থেকে উদ্ভূত হলেও ঘটনার অবিকল প্রতিরূপ তা নয়—সে এক নব রূপ। কালের গণ্ডিতেও তা আর সীমাবদ্ধ থাকে না। কালকে ছাড়িয়ে ভাবীকালের দিকে বিস্তৃত হয় তার এক নব দিগন্ত। চলমান বাস্তবের সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের এই তফাৎ। বাস্তব থেকে উদ্ভূত বলেই নব কলেবরপ্রাপ্ত শিল্প-বাস্তবকে অর্থাৎ শিল্প-সত্যকে গ্রহণ করতে আমাদের অসুবিধে হয় না। উদ্ভিদ মাত্রেরই মূল আছে আমরা জানি। কিন্তু বৃক্ষের রূপই আমাদের মনে সৌন্দর্যানুভূতি জাগায়। তা বলে, মূলটাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রত্যক্ষ বাস্তবের সঙ্গে শিল্পের হুবহু মিল থাকে না—অথচ তাতে অস্পষ্ট ছায়া যেন প্রত্যক্ষ করা যায় প্রাত্যহিক বাস্তবের। আবার প্রাত্যহিক বাস্তবকে অতিক্রম করে শিল্প-সাহিত্য নিয়ে যায় আমাদের এক স্বপ্ন-জগতে—এক অজানা কল্পলোকে।

মোদ্দা কথা, প্রকৃতির সৃষ্টির রহস্যও সক্রিয় শিল্প-সাহিত্যের জন্মসূত্রে। তবে বস্তুজগতে বস্তুর রূপান্তর ঘটছে বস্তুর সংস্পর্শে—আর শিল্পজগতে বস্তুর রূপান্তর ঘটছে মননের সাহায্যে।

নাটকও শিল্পকর্মেরই অঙ্গ। অতএব প্রাত্যহিক বাস্তবকে হুবহু রূপ দেয়া নাটক নয়। আবার প্রাত্যহিক বাস্তব সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকেও নাটক রচনা করা যায় না– কেননা তা করতে গেলে মানুষের জীবন অনুপস্থিত থেকে যাবে। নাট্যরচনার প্রধান উপাদান মানুষের জীবন। জীবনকে কাব্যময় করে উপস্থিত করতে পারলেই নাটক দৃশ্যকাব্য হয়ে ওঠে। কিন্তু নাটকে কাব্য আশ্রয় করে মুখ্যত জীবনকে। প্রত্যক্ষ জীবন অনুপস্থিত থাকলেই নাটক ব্যর্থ। শুধু আইডিয়ার ওপর নির্ভর করে সার্থক নাটক রচনা করা যায় না। কবি পারেন তাঁর আইডিয়াকে প্রকাশ করার জন্যে শব্দসোপানের সাহায্যে নিজের

ভাবমণ্ডলে আরোহণ করতে। কিন্তু নাট্যকারকে তাঁর ভাবপ্রকাশের জন্যে ডুব দিতে হয় মানুষের জীবনের অতল গর্ভে—জীবনকে দিয়েই তাঁকে নতুন করে জীবন গড়তে হয়। সেই জীবনের মধ্য দিয়ে নাট্যকার তাঁর নিজের কথাও বলেন। এই জীবনের সঙ্গে এভাবে নিজের কথাও মিলিয়ে দিতে যিনি পারেন তিনিই কৃতী নাট্যকার।

কবির প্রধান অবলম্বন ভাব বলেই রূপকর্মে তিনি যতখানি অ্যাবস্ট্রাকশন বা বিমূর্ততা আনবার স্বাধীনতা পান, নাট্যকারের ততখানি স্বাধীনতা নেই। কারণ নাটকে দর্শনেন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করার প্রয়োজন আছে। দর্শকের চক্ষু ও কর্ণ একসঙ্গেই তৃপ্ত হতে চায়। তাই সংলাপে যেমন কাব্যগুণ থাকা চাই, তেমনি চরিত্রাঙ্কণেও বাস্তববোধ থাকা একান্ত আবশ্যক। নাট্যকারকে মানুষের কারুকৃৎ হতেই হয়। অবয়বটা তাঁর কাছে সত্য। অথচ চিন্তার দিক থেকে কবি ও নাট্যকার উভয়কেই অ্যাবস্ট্রাকশন বা সূক্ষ্মতার দিকে যেতেই হয়। তা না হলে ঘটনার জঞ্জাল ঘাড়ে চেপে তাঁকে আপাতমুখীন করে তোলে যার ফলে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি হারিয়ে যায়। ঘটনার বোঝা বয়ে বেড়ানো নাট্যকারের কাজ নয়। তা থেকে নির্যাস গ্রহণ করাই তাঁর লক্ষ্য।

নাট্যকারের শিল্পকর্ম অধিকতর আয়াসসাধ্য বলেই হয়তো নাটককে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলা হয়। সেই কীর্তি অর্জন করতে হলে তার অধিকারী হওয়া চাই। বিনা সাধনায় কোনো অধিকারই আসে না।

বিষ্ণু দে ঃ পটভূমি

অরুণ সেন

পটভূমি ঃ সাহিত্যগত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আধুনিক বাঙলা কবিতার জন্মকালীন ইতিহাসের জমিতে বিষ্ণু দে-র কবিতা রচনার অভিজ্ঞতা এবার অনুসরণ করা যেতে পারে। শৈশবের "ছন্দ-মিলের পালাকীর্তন" শেষ করে, "প্রায় দুশো পৃষ্ঠার কুশলী পদ্যের" খাতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, তিনি প্রথম যখন লেখা ছাপাতে শুরু করলেন তখন তাঁর নিজেরই হিসেব অনুসারে বয়স "তেরো বা চোদ্দ বছর"—অর্থাৎ ধরা যায় ১৯২৩ ২৪ সাল। আমাদের হাতের কাছে অবশ্য সবচেয়ে পুরোনো রচনাকাল যেটা পাওয়া যাচ্ছে, তা ১৯২৫—'চোরবালি' গ্রন্থে প্রকাশিত 'গার্হস্থ্যাশ্রম' কবিতার অন্তত কিছু কিছু অংশ নিশ্চয়ই ১৯২৫ থেকেই রচিত হতে শুরু করে, কেননা ঐ গ্রন্থতেই কবিতাটির রচনাকাল দেওয়া আছে ১৯২৫-৩০। কিংবা পরের যে কবিতাটির তারিখ পাওয়া যায়, সেই ১৯২৬ সালে রচিত সেই 'আধুনিক প্রেম', ছাপা হয় ১৯২৯ সালে 'প্রগতি' পত্রিকায়।

কিন্তু ব্যাপকতরভাবে তাঁর লেখা ছাপা হতে শুরু করে ১৯২৮ সাল থেকে —প্রধানত চারটি পত্রিকায় ঃ 'বিচিত্রা', 'প্রগতি', ধূপছায়া' এবং 'কল্লোল'। এর মধ্যে 'কল্লোল' পুরোনো পত্রিকা, কিন্তু 'বিচিত্রা' বা 'প্রগতি', 'ধূপছায়া' প্রকাশিত হয়েছে মাত্র এক বছর আগে থেকে—অর্থাৎ সব কটিরই প্রথম সংখ্যা বেরোয় ১৯২৭ সালে (বাঙলা ১৩৩৪)। 'প্রগতি' ঢাকার পুরানা পল্টন থেকে বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্তের সম্পাদনায় এবং 'ধূপছায়া' কলকাতা থেকে রেণুভূষণ গাঙ্গুলি ও অরিন্দম বসু-র সম্পাদনায় বেরোতে থাকে। দুটি পত্রিকাই, সর্বতোভাবে, সাহিত্যের যে আধুনিকতার 'আন্দোলন' শুরু হয়েছিল 'কল্লোল'-'কালিকলম' এর নামে, তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল সহযাত্রী হিসেবে। যদিও বিষ্ণু দে খানিকটা নিবিড়ভাবেই যুক্ত ছিলেন পত্রিকা দুটির সঙ্গে—'প্রগতি'র সূত্রেই বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয় এবং সেই বন্ধুত্ব গাঢ় হয় কলকাতায় রিপন কলেজের চাকরির সময় এবং 'ধূপছায়া'

পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবেদনে "সহায়তা" দানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে বিষ্ণু দে-র প্রতি,১—তথাপি সাহিত্যিক রুচি ও মতামতের মৌলিক পার্থক্যের কারণেই পত্রিকা দুটিকে বিষ্ণু দে-র গদ্য (এবং কবিতাও) ছাপানোর সঙ্গে সঙ্গে জানাতে হয়েছে সম্পাদকীয় মতভেদ। বিশেষ করে প্রায় প্রথম পরিচয়ের সময় থেকেই বুদ্ধদেব বসু-র সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গেই যে মতভেদের সূত্রপাত হয়েছিল; তার পিছনে যে মৌলিক নন্দনতত্ত্বের ভেদ দায়ী ছিল, তা আমরা আজ সহজেই বুঝতে পারি।২ 'প্রগতি' ও 'ধূপছায়া' উভয় পত্রিকাতেই উগ্র যদিচ তরল রবীন্দ্রবিরোধিতার প্রতিবাদ যেমন তিনি করেছেন (মূলত লক্ষ্য ছিল বুদ্ধদেব বসুরই রবীন্দ্র-বিরোধিতা), তেমনি ঐসব পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতায় রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে আসার চিহ্ন সবচেয়ে স্পষ্ট ছিল বিষ্ণু দে-রই কাব্যভাষায় (অন্তত বুদ্ধদেব বসু-র তুলনায় তো বটেই)।

১৯২৮ এবং ১৯২৯ এই দুই বছরে পূর্বোক্ত পত্রিকা চারটিতে বিষ্ণু দে-র কয়েকটি প্রবন্ধ, বেশ কয়েকটি গল্প এবং কবিতা বেরোতে থাকে। বিষ্ণু দে-র বিকাশের ইতিহাসে এটাকে প্রথম ধাপ বলা যায়। কবিতাগুলোর ব্যাপারে সবচেয়ে লক্ষণীয় যা তা হল, প্রায় প্রত্যেকটিই বিভিন্ন ফরাসী রীতির বিন্যাসে লেখা—শিরোনামের তলায় বন্ধনীমধ্যে লেখা 'ফরাসী Villanelle ছন্দে রচিত', 'Ballade ছন্দে', সর্বাধিক ক্ষেত্রে 'Triolet' এবং অন্তত একটি ক্ষেত্রে 'Rondelet'। স্বভাবতই সকলের মনে পড়ে যাবে প্রমথ চৌধুরীর কাব্য প্রচেষ্টার কথা। বস্তুত প্রমথ চৌধুরীর প্রেরণা বা আদর্শেই যে এই বিভিন্ন ফরাসী 'ছন্দে' কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন বিষ্ণু দে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শুধু কবিতা নয়, ঠিক এসময়েই রচিত তাঁর গল্পগুলিও প্রমথ চৌধুরীর প্রতি তাঁর সাহিত্যিক অনুরাগেরই ফসল। কিন্তু এ তো স্বেচ্ছাচারী কোনো নির্বাচন নয়—রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসে আধুনিক নন্দনজিজ্ঞাসার অভিমুখে যাত্রার পথে এ এক অনিবার্য অনুশীলন।

কেননা প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাবই ছিল, অন্তত কাব্যরচনার ক্ষেত্রে, সম্পূর্ণ অভিনব। তাঁর কাব্যরচনার পদ্ধতিই ছিল রবীন্দ্রনাথ থেকে একেবারে ভিন্ন। তিনি নিজেই বলেছেন 'সনেট পঞ্চাশৎ'-সম্পর্কে: "আমার সনেট যদি কবিতা হয় তাহলে সে কবিতা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্নধর্মী।"৩ কিংবা অন্যত্র: "রবীন্দ্রনাথের lyric মূলতঃ গীতধর্মী—তার flow অসাধারণ। সনেট আমার

মতে sculpture-ধর্মী—এর ভিতর উদ্দাম flow নেই।” এই “উদ্দাম flow”-এর বিরোধিতাতেই প্রমথ চৌধুরীর কাব্য রচনা। তিনি কোন পরিস্থিতিতে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তা বলতে গিয়ে রবীন্দ্র-অনুকৃতির সেই পরিবেশের কথাই তুলে ধরেছেন—“রবীন্দ্রনাথের কবিতার খেলো নকল পড়ে পড়ে আমি একটু বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলুম।” স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তারিফ করেছিলেন প্রমথ চৌধুরীর “নির্মমভাবে নিখুঁত” কবিতার, যে কবিতা তাঁর মতে “বাঙলার সরস্বতীর বীণায়” “ইস্পাতের তার”। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, “সনেট পঞ্চাশতের কবিতা রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল, হয়তো রবীন্দ্রনাথের অনুকৃতিপ্রাবল্যের ব্যতিক্রম বলেই।”

ঠিক কোথায় প্রমথ চৌধুরী আলাদা হয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ থেকে? প্রমথ চৌধুরীর নিজের কথাতেই শোনা যাক এর ব্যাখ্যা: “রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বড় কবিদের কবিতায় emotion-ই হয়তো আর্টকে সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে আছে। কিন্তু art অনেকটা বন্ধনের সামগ্রী। আমি যে সনেট লিখেছি সে অনেকটা experiment হিসেবে।......আমার সনেটের অন্তরে হয়তো art-এর চাইতে artificiality বেশি।” তাই আবেগের বাধাবন্ধহীন উচ্ছ্বাস তাঁর কবিতার লক্ষ্য নয়, তাঁর কবিতার প্রধান লক্ষ্য অবয়ব গঠন, রূপ বা ফর্মের সাধনা—art নয়, artificiality। তিনি তাই ফরাসী কাব্যের রূপচর্চাকে আনতে চাইলেন বাঙলায়—Triolet, Terza Rima প্রভৃতি রূপাবয়বে। আসলে কৃত্রিম পরিশ্রমী কাব্যরচনার মধ্য দিয়েই ভাঙতে চাইলেন “রবীন্দ্রনাথের কবিতার খেলো নকলে”র আবেশ।৩

প্রমথ চৌধুরীর কবিতার সাফল্যের সীমা শেষপর্যন্ত যতটুকুই হোক, তাঁর এই “সম্পূর্ণ বিভিন্নধর্মী” কাব্যপ্রয়াস বিষ্ণু দে-র মতো পরবর্তী আধুনিক কবিদের শিক্ষাস্থল—তাঁরা রবীন্দ্রনাথ থেকে পৃথক পথপরিক্রমা করতে গিয়ে যে আত্মসচেতনতাকে আশ্রয় করেছিলেন, সেই আত্মসচেতনতারই সূত্রপাত প্রমথ চৌধুরীর কাব্যে। “ভাবালুতার বিস্রস্ত আত্মপ্রকাশের প্রাবল্যের কালে সংযম ও নৈপুণ্যের আশ্চর্য যে-দৃষ্টান্ত একদা তিনি স্থাপন করেছিলেন সেজন্য উত্তর-কালীন কবিরা—যাঁরা স্বভাবকবিত্বে নয়, সচেতন শিল্পকর্মে বিশ্বাসী—এই পূর্বসূরীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন, এই আশা পোষণ করা যেতে পারে।”৪ বস্তুত বিষ্ণু দে-র প্রথম কাব্যরচনা এই কৃতজ্ঞতারই নির্দেশ।

অল্প সময়ের মধ্যে ফরাসী ‘ভিলানেল’, ‘বালাদ’ ও ‘ট্রিওলেট’ ছন্দে পরপর যে কবিতা কয়েকটি তিনি লিখেছিলেন তা আজ পুরোনো সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায়

বিলুপ্ত হওয়ার অপেক্ষাতেই মাত্র রয়েছে। ঐতিহাসিকতার খাতিরে এর মধ্য থেকে তিনটি সম্পূর্ণ কবিতা এবং দুটির অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করলে পাঠকেরা বিষ্ণু দে-র এই অনুশীলন পর্বের যৎকিঞ্চিৎ আস্বাদ পেতে পারেন, যদিও কবি স্বয়ং এই কবিতাগুলির উল্লেখেই লজ্জিত হন।[৫]

স্মৃতি

(ফরাসী Villanelle ছন্দে রচিত)

বিজন ঘরে নিভৃত রাতে তোমারে স্মরি
তিমির কালো ঘোমটা খুলি এসেছ মনে,—
দেখিয়াছিনু তোমারে মোর এ ঘর ভরি।

মনে যে আসো প্রেমের আলো নয়নে ধরি,
আধেকফুট কথা ও লীলা অধর কোণে,—
বিজন ঘরে নিভৃত রাতে তোমারে স্মরি।

কাব্য পড়ি সন্ধ্যা যেত গল্প করি—
মাথাটী বুকে চাহিতে মুখে ক্ষণে ক্ষণে,—
দেখিয়াছিনু তোমারে মোর এ ঘর ভরি।

বরষা রাতে তন্ত্রী পরে টানিতে ছড়ি—
গুমরে সুর বাদলহাওয়া মেঘের স্বনে,
বিজন ঘরে নিভৃত রাতে তোমারে স্মরি।

স্নিগ্ধশ্রী ও তনুটী ঘেরি নীলাম্বরি,
গৃহের কাজে ব্যস্ত—শুন, পড়িছে মনে—
দেখিয়াছিনু তোমারে মোর এ ঘর ভরি।

মুরতি নাই, স্মৃতি যে শুধু রহিল পড়ি
ঘুরিছে কত কথা ও ছবি মনের বনে!
বিজন ঘরে নিভৃত রাতে তোমারে স্মরি—
দেখিয়াছিনু তোমারে মোর এ ঘর ভরি॥

('বিচিত্রা', ফাল্গুন ১৩৩৪, ১৯২৮। পৃ ৪১০)

গাঁয়ের চিঠি

(Ballade ছন্দে)

শরৎ আসে মরত পরে [illegible] দেখি আসে !
শরৎশ্রীতে শ্রী ধরি মাটি, আকাশ মনে টানে !
ভাদ্রপ্রীতি আদর পেয়ে গরবে তটী হাসে
স্বর্ণআভা বিচ্ছুরিছে আধেক সোনা ধানে,
ক্ষেতসুবাস মিঠা কী মেঠো গন্ধ আসে ঘ্রাণে,
আকাশ নীল, শ্যামল মাটি বরষারসে ভরি ;—
পুলকে মোর সর্বমন চাহিছে তোমা পানে—
কোথায় তুমি একেলা সখী সহরে আছ পড়ি !
শরৎশ্রী কী ফুটেছে শ্বেতমেঘে ও শ্বেতকাশে !
মেয়েরা ঐ কলস লয়ে চলেছে সব স্নানে,
রাখাল তার গরুর পাল বিচিত্র কী ভাষে
চালায় একা !—শব্দ তার আসিছে ভাসি কানে .....

[এর পর আরো ষোল লাইন আছে]

('প্রগতি', কার্তিক ১৩৩৫, ১৯২৮। পৃ ২৯৯)

তেপাটী

(Triolet)

সন্ধ্যার শ্যাম অন্ধকারে
বাতায়নে তুমি দাঁড়ায়ে সখী !
ধূসর মলিন আকাশ পারে
সন্ধ্যার শ্যাম অন্ধকারে
যে মায়া হেরিছ, কেমন তারে
ধরিলে বয়ানে ? কও ? ভাবো কি,
সন্ধ্যার শ্যাম অন্ধকারে
বাতায়নে তুমি দাঁড়ায়ে, সখী।

[এরকম ৬টি অংশের একটি]

('কল্লোল', ভাদ্র ১৩৩৬, ১৯২৯। পৃ ২৮১)

বিদুষী

Austin Dobson-এর অনুসরণে

(Triolet)

প্রেমকলার পাঠশালাতে বিদুষী মোর বিনোদিনী,
বারে-বারে ডাক পড়ে মোর যখন-তখন অন্দরেতে !
স্থানের বিচার ত্যাগ করে তাঁর চুড়ির ডাকা রিনিঝিনি—
প্রেমকলার পাঠশালাতে বিদুষী মোর বিনোদিনী !
—পান নেবে না ? চুরুট ? নভেল ? —সকল ছলায় জ্ঞান গৃহিনী !
সেই কারণেই বাপের বাড়ী মাঝে মাঝে চান যে যেতে।
প্রেমকলার পাঠশালাতে বিদুষী মোর বিনোদিনী।
বারে-বারে ডাক পড়ে মোর যখন-তখন অন্দরেতে।

('প্রগতি', ভাদ্র ১৩৩৬, ১৯২৯। পৃ ৫৬)

ভারতচন্দ্র

(Rondelet)

রায় গুণাকর !
ভাষার প্রদীপে রঙীন দীপালি জ্বালো !
রায় গুণাকর !
বিদ্যা ও উমা সুন্দর ও শিব নাগরী নাগর !
তীক্ষ্ণ তোমার বিদ্রূপে করো সবারে কালো !
ব্যঙ্গ কি খাসা ! কি খাসা ভাষায় সবেতে ঢালো ?
রায় গুণাকর !

(ঐ .

এ ছাড়া এসময়ে তিনি আরো অনেক ট্রিওলেট লিখেছেন, নৈপুণ্যের দিক থেকে সেগুলো বোধহয় আরো পরিপক্ক—অধিকাংশই বেরিয়েছে 'প্রগতি' পত্রিকায়। পরে 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থে সেগুলো সাজানো হয়েছে নানা বিন্যাসে—যেমন 'গার্হস্থ্যাশ্রম' বা 'শিখণ্ডীর গান '। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, "ট্রিওলেট ও অন্যান্য ক্ষুদ্র রচনাগুলোকে বিক্ষিপ্ত না রেখে যে-ভাবে পারম্পরিক সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ করেছেন [কবি] তাতে প্রচুর নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে।"[৬]

আসলে ঠিক এই সময়ে তাঁর প্রধান অবলম্বন হয়েছিল 'ট্রিওলেট'—বোধহয় বহিরঙ্গ রূপসাধনা বা টেকনিকের চর্চা যা বিষ্ণু দে করতে চেয়েছিলেন রোমান্টিক-বিরোধী, প্রেরণাবেগ-বিরোধী প্রতিক্রিয়ায়, তার পক্ষে চমৎকার বাহন ছিল এই ট্রিওলেট। প্রমথ চৌধুরীরও প্রিয় ফর্ম ছিল এই ট্রিওলেট। বিষ্ণু দে এর অনুবাদ হিসেবে 'তেপাটী' নামটিও গ্রহণ করেন, প্রমথ চৌধুরীর কাছ থেকে। প্রমথ চৌধুরীর কথায় : "ফরাসী কবিতা Triolet-এর ছাঁচে ঢালাই করে আমি এক সময়ে গুটিছয়েক পদ্য রচনা করি এবং তার নাম দিই তেপাটি। সে-সকল তেপাটিতে Triolet-এর ঠিক গড়নটি বজায় রাখতে পারি নি। হাত-দুই জমির ভিতর কুঁচিমোড়া ভাঙা যে কি কঠিন ব্যাপার, তা যিনি কখনো কসরত করেছেন তিনিই জানেন। তেপাটি লেখাও হচ্ছে লেখনীর একটা কসরত।" বা অন্যত্র বলেছেন : "Triolet লেখাও কঠিন—তার পুনরুক্তির জন্য।" ভাবোচ্ছ্বাসের "কবিআনা ঢঙ" যখন প্রবল হয়েছিল, তখন লেখনীর এই "কসরত"ই ছিল প্রতিবাদের ভাষা—বিষ্ণু দে র কাছেও। পরন্তু 'ভাবঘন' গুরুভার কবিতার পাশে ব্যঙ্গের হালকা ছটা, বুদ্ধির স্বচ্ছ দীপ্তি আনতে হলেও ফরাসী মেজাজের এই সব চাল খুব কাজের হয়—"বলা বাহুল্য এ কবিতার [ট্রিওলেটের] ভাব ভাষা দুইই নেহাত হালকা হওয়া চাই।"[৭] প্রমথ চৌধুরী যাঁর ভক্ত সেই ভারতচন্দ্রও যে ঐ কারণেই বিষ্ণু দে-র মনোযোগ আকর্ষণ করবেন, তা তো খুবই স্বাভাবিক—rondelet-এর কাঠামোয় তিনি একটি কবিতাও রচনা করেছেন ভারতচন্দ্রের প্রশস্তিতে—"ভাষার প্রদীপে রঙীন দীপালি আলো" জেলে যিনি "খাসা" ব্যঙ্গ করেন "খাসা" ভাষায়, সেই ভারতচন্দ্র।

অনেকেরই হয়তো জানা নেই, ঠিক এই সময়েই বিষ্ণু দে বেশ কতকগুলো গল্প লেখেন—প্রমথ চৌধুরীরই আদলে। কবিতার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি গল্পের ক্ষেত্রেও প্রমথ চৌধুরীর মননশীল ব্যঙ্গপ্রধান 'স্টাইল' আধুনিক আত্ম-সচেতন মনের কাছে গ্রহণীয় হয়েছিল। সম্ভবত প্রথম যে গল্পটি লেখেন, তা হচ্ছে ১৯২৮ সালে 'প্রগতি'-তে প্রকাশিত 'পুরাণের পুনর্জন্ম/লক্ষ্মণ'। এ গল্পটি রচনার একটি ইতিহাস আছে। "'প্রগতি'তে তখন 'পুরাণের নবজন্ম' লেখা হচ্ছে—হালের সমাজ ও সভ্যতার পরিবেশে রামায়ণের পুনর্লেখন। প্রভু গুহঠাকুরতাই সে লেখার উদ্বোধন করেছেন। তারই অনুসরণে বিষ্ণু [দে] 'কল্লোলে' 'পৌরাণিক প্রশাখা' লিখলেন - ভরতকে নিয়ে।"[৮] এই তথ্য-পরিবেশনের মধ্যে একটু বিভ্রান্তি আছে। 'কল্লোল'-এ ভরতবিষয়ক রচনাটি বের হয় ১৯২৯ সালে—তার প্রায়

দু-বছর আগে, প্রগতি'-তেই বিষ্ণু দে-র প্রথম গল্পটি বেরোয়। বস্তুত 'প্রগতি-রই' শ্রাবণ সংখ্যায় বেরিয়েছিল বিপ্রদাস মিত্রের (বুদ্ধদেব বসুর ছদ্মনাম) লেখা 'পুরাণের পুনর্জন্ম/উর্মিলা'। ওটাতে মূল বিষয় ছিল উর্মিলার জীবনের ব্যর্থতা—বলা বাহুল্য "হালের সমাজ ও সভ্যতার পরিবেশে"। সেটা পড়ে বিষ্ণু দে খুব "খুসি" হন, বিশেষত এর "লেখার কায়দায়"। এ-বিষয়ে কবিপত্নীর জবানিতে লেখা (বন্ধনীর মধ্যে কবির উদ্ধৃতিসহ) একটি চিঠি থেকে আরো তথ্য উদ্ধার করি: "প্রগতি-তে প্রভু গুহঠাকুরতা 'পুরাণের পুনর্জন্ম' বলে একটা স্মার্ট গল্প লেখেন। বোধহয় John Erkhine এর গল্প অবলম্বনে। প্রাচীন গল্প হেলেন অব ট্রয়ের আধুনিক রূপান্তর। বুদ্ধদেববাবুর উৎসাহে সেই বইখানি Book Co. থেকে কেনেন। তখন [বিষ্ণু দে-র] বয়স খুব অল্প—হয় কলেজে উঠবেন বা উঠেছেন সবে। তাতে ওঁর মজা লাগলো, এবং উনি একটু burlesque style-এ sequel একটা লেখেন। সেটা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বুদ্ধদেববাবুর বাড়িতে, ৪৭নং পুরাণা পল্টনে, প্রগতির আপিস এবং ওঁর বাড়িও। তখন ঢাকায় মোহিতলাল মজুমদারও ছিলেন, বাংলার লেকচারার হয়ে। তিনি নাকি ভেবেছিলেন ("of all men" !) প্রমথ চৌধুরী বেনামে লিখছেন ! ("আমি খুব খুশি হয়েছিলুম, কারণ সবুজপত্রের বিখ্যাত প্রমথ চৌধুরীর smartness আমাদের তখন খুব ভালো লাগত)।"৯

এরকম "কায়দা"-র লেখা থেকে বিষ্ণু দে-র তৎকালীন মানসিকতার কোনো ছাপ আবিষ্কার করা নিশ্চয়ই অবাস্তব হবে, কিন্তু লক্ষণীয় এটুকই যে উর্মিলার প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করতে গিয়ে বিপ্রদাস মিত্রের লেখায় লক্ষ্মণের চরিত্রের যে সরলীকরণ করা হয়েছে, তা থেকে তাঁকে মুক্ত করে তিনি চরিত্রের নিহিত জটিলতা, হয়তো বলা যায় আধুনিক জটিলতা বানিয়ে তুললেন। কিংবা—ধরা যাক গল্পটিতে "লক্ষ্মণের খাতা" অংশে কোনো পাঠক যখন পড়েন, "সীতা ত সে প্যানপেনে আদ্যিকালের সীতা নয়—এমনকি ভীরুকোমল শকুন্তলাও ত নয়—সে হচ্ছে পরিপুর্ণ সুন্দরী, মোহিনী" এবং তার সঙ্গে আরো পড়েন, "সীতার সঙ্গে (লক্ষ্মণের) মতে মিল্‌ল, অর্থাৎ ফরাসী সাহিত্যের তিনি ভক্ত—এবং সরস cynicism ও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ—তা সে ভল্‌তেয়ার, কি সুইফ্‌ট্‌ কি ব্যাবেলে কি ওয়াইল্ড বা শ-রই হোক্ না"১০—তখন সেই পাঠকের মনে হতেও পারে বিষ্ণু দে-র গদ্যে, গল্পের গদ্যে তো বটেই, শুধু ইংরেজি অন্বয়রীতিই নয়, সঙ্গে সঙ্গে আরো গভীরভাবে শিক্ষিত নাগরিক কথা বলার ধরনটাও প্রত্যক্ষগোচর। শেষপর্যন্ত অবশ্য দাঁড়িয়ে যায় এর লেখার "কায়দাটা"-ই, এবং কায়দা-র

স্বকীয়তা, যা শুধুমাত্র প্রমথ চৌধুরীর প্রভাবের নিরিখেই দেখা চলে না। ১৯২৯ সালে 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত "ভরতকে নিয়ে" লেখা 'পৌরাণিক প্রশাখা' গল্পটিতেও যেমন, প্রমথ চৌধুরীর "Smartness" তো আছেই, আরও অতিরিক্ত কিছু আছে।

এছাড়াও আরো কতকগুলি গল্প তিনি লিখেছেন—'প্রগতি'র পাতায় (৪টি) ও 'ধূপছায়া'তে (১টি)। এ-সম্পর্কে তিনি নিজে লেখেন: "গল্পগুলি বাজে। লজ্জাকরভাবে বাজে।"[১১] বিষ্ণু দে-র উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে লেখা এই গল্পগুলির সাহিত্যিক মূল্যায়ন আজ অবান্তর—কিন্তু আমাদের কাছে এগুলোর বেশি গুরুত্ব ঐতিহাসিক কারণে লেখকের মানসিকতার বিচারে। গল্পগুলি প্রত্যেকটিই বিদ্রূপাত্মক ও ব্যঙ্গমূলক। এই বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের লক্ষ্য কখনো শহুরে 'আধুনিক' প্রেমের কৃত্রিম রোমান্টিক ভাবালুতা ('ফিরে-ফিরতি'), বিলাত-প্রত্যাগত স্বামীর ও বিরহিনী স্ত্রীর ঈর্ষা-সন্দেহ-শয্যামিলনের হৃদয়বিলাস ('বাসর-রাত্রি'), কখনো-বা একই সঙ্গে স্থূলরুচি ও সূক্ষ্মরুচি উভয় বন্ধুই ('বন্ধু') কিংবা দুর্নীতিপরায়ণ হিরো ('হিরো')।[১২] অধিকাংশ গল্পই রচনাবিন্যাসে ও ভঙ্গিতে প্রমথ চৌধুরীকে স্মরণ করায়—তাঁর গল্পের মতোই আড্ডার সূত্রে বেশ কয়েকটি কাহিনীকে উন্মোচিত করা হয়েছে।

বিষ্ণু দে-র লেখা এ সময়কার কবিতা বা প্রবন্ধের সঙ্গে এই গল্পগুলির মেজাজ যেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ, তেমনি এগুলোরই আশ্রয়ে তাঁর আত্মসচেতনতার অভিযান এগোল বলা যায়।

১৯২৮ সালে 'ধূপছায়া' পত্রিকায় প্রকাশিত 'শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ'ই বোধহয় বিষ্ণু দে-র প্রথম মুদ্রিত প্রবন্ধ—অন্তত এর পূর্বে ছাপা কোনো প্রবন্ধের সন্ধান আমরা পাই নি। পত্রাকারে লিখিত এই প্রবন্ধটি-সম্পর্কে বিষ্ণু দে বলেছেন, "সে সময়ে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবির বিষয়ে 'শ্যামল রায়' নামে একটা অসাড় প্রবন্ধ লিখি। তার মধ্যে একটা কথা ছিল, আমার মনে আছে যে, ইঁট দিয়ে বাড়ি তৈরি করলে plaster দিলে solid বাড়ি তৈরি হবে, গগনবাবুর cubist ছবি two dimensional, যেন টালি দিয়ে বাড়ির দেয়াল তৈরি করা—তার তো আর plasterএর প্রয়োজন নেই। আলোছায়ার খেলা।—তার আগেই cubist ছবি Europe-এ আরম্ভ হয়ে গেছে। ধূপছায়ার সম্পাদক একদিন জানালেন যে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট তিন copy ঐ পত্রিকার কপি সমবায় ম্যানসনে পাঠিয়ে দিতে লিখেছেন, ওঁরা দাম দিয়ে কিনে নেবেন, সেখানে গগনেন্দ্রনাথের exhibition হবে। ... পর পর বোধহয় তিন

পৃষ্ঠায়- প্রবন্ধটি নাকি খুলে রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু আত্মগ্লানিতে আমার আর exhibition-এ যাওয়া হল না।"১৩

গগনেন্দ্রনাথ-বিষয়ে এই প্রবন্ধটি ছাড়াও এক বছরের মধ্যেই বিষ্ণু দে শিল্প-বিষয়ে আরো দিকনির্দেশক প্রবন্ধ লেখেন—এবার বিদেশী চিত্র ও ভাস্কর্য সম্পর্কে। শিল্পবিষয়ক আলোচনায় বিষ্ণু দে-র যে আগ্রহ ও অধিকার পরবর্তী-কালে আমরা দেখেছি, তার সূত্রপাত তখন থেকেই। শিল্পী-নির্বাচনে এবং শিল্পীর গুণাবলির বর্ণনায় বা মাত্রারোপে বিষ্ণু দে-র অখণ্ড ব্যক্তিত্বের বা ব্যক্তিস্বরূপের প্রকাশ ছিল তখনও। সে দিক থেকেও স্মরণীয় এই অল্পবয়সের প্রবন্ধগুলি। গগনেন্দ্রনাথ-বিষয়ে যে বিষ্ণু দে লেখেন, "গগনবাবুর ছবি পুরো বাংলার ছবি।......য়ুরোপের কিউবিষ্টরা শুধু স্থিতিশীল পদার্থের ছবিই আঁকতে পারতেন। কিন্তু গগনবাবু কিউবিসমে গতি ফোটাতে পারেন। ধরো য়ুরোপীয় কিউবিষ্ট যেন আঁকেন নিশ্চল বাড়ির ছবি—গগনবাবু তার ওপর গতিশীল মেঘও ফোটাতে পারেন।"১৪ —তিনিই 'বিচিত্রা'-র চিত্রসংবলিত সুদৃশ্য প্রবন্ধে ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী 'লরেন্স্ য়্যাটকিন্সন্' সম্পর্কে লেখেন, "প্রশ্নব্যাকুল গভীর-চিত্ত য়্যাটকিন্সন্ সারা য়ুরোপের চিত্রশালাসমূহ ঘুরেছেন, বড়ো বড়ো আর্টিষ্টের সঙ্গে আলাপ করেছেন। জীবনের রহস্যে মুগ্ধ হ'য়ে কত নরনারীর সঙ্গে মিশেছেন। অধ্যাত্মতত্ত্ব, দর্শন, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য তাঁর পাঠ্যবিষয়। নিজে তিনি কবিতাও রচনা করেছেন; আর তাঁর জীবনব্যাপী আর একটা সাধনা আছে, সেটি হচ্ছে সংগীত। য়্যাটকিনসনের শিক্ষা ব্যাপক। তিনি শুধু সাধারণ শিল্পার্থীর মতো ছবি আঁকতে, মূর্তি গড়তেই শেখেন নি। য়্যাট্কিন্সনের শিল্প তাই গভীরতার ভক্ত। তাই তিনি কোনো বিশেষ দলের নন। পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য সব কিছুই তাঁকে আকর্ষণ করে।"১৫ কিংবা একই পত্রিকায় একই বছর ব্রিটিশ চিত্রশিল্পী 'অগষ্টস্ জন্' সম্পর্কে: "অগষ্টস্ জনের স্বভাব এক সুস্থ সবল মানুষের স্বভাব। তিনি ভালোবাস্তে পারেন। এবং যে শিল্পসৃষ্টি তাঁর ভালো লাগে, তার বৈশিষ্ট্য তাঁর মন আপন করে নেয়।··· জীবনে যে কারণে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক, শিল্পেও তাঁর সেই প্রবল প্রাণশক্তি তাঁর শিল্পকে শিল্পের জগতে বিশেষ স্থান দিয়েছে।···এবং অগষ্টস্ জনের প্রাণের উচ্ছলতা তাই সার্জেন্টের মতো সোসাইটিতে তৃপ্তি পায় না। তাই তাঁর চিত্রে জিপ্সির বারংবার আবির্ভাব।"১৬ এই লেখাগুলোর মধ্য দিয়ে চিত্র-ভাস্কর্য-সংগীত ইত্যাদি শিল্পের নানা বিষয়ে চর্চা ও জিজ্ঞাসু আগ্রহই প্রমাণ করে না, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রস্তূয়মান নন্দনতত্ত্বের কাঠামোটির আভাস পাওয়া যায়।

ঠিক তেমনি সমসাময়িক কালে রচিত সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ ও অনুবাদও তাঁর রুচির এই পরিধিকে নির্দেশ করে। কবিতারচনায় রবীন্দ্রবর্জন ঐতিহাসিক বা শিল্পগত কারণে যাঁর কাছে অনিবার্য, তিনিই কিন্তু অবিচল মাত্রাজ্ঞানে স্থূল, রবীন্দ্রবিরোধিতার তীব্র প্রতিবাদী। তাই 'প্রগতি'র নিয়মিত লেখক হয়েও তিনি সাড়া দিতে পারেন না 'প্রগতি'তে প্রকাশিত কোনো কোনো প্রবন্ধের উগ্রতায়—"আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টির সহিত রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যরূপ' রচনা করেন। সাহিত্যের কষ্টিপাথর কি হওয়া উচিত, তাহা এই রচনা পাঠে অতি স্থূলবুদ্ধিও জানিতে পারে। (শ্রাবণের 'প্রগতি'তে) শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এ রচনা পড়িয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অথবা ইচ্ছা করিয়া না বুঝিয়া অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়া স্থানকালপাত্র ভুলিয়া খুব জোরালো ভাষা ব্যবহার করিয়া বসিয়াছেন। ... রবীন্দ্রনাথ যে 'রূপ' বলিতে রচনার সমগ্র বিশেষত্ব formটী বোঝাইতেছেন সেটুকু বুঝিলে মন্মথবাবু একথা বলিতেন না এবং এ বুদ্ধিহীন রসিকতাও করিতেন না।"[১৭] কিংবা যখন বলা হয়, রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' পুনরুক্তিদোষে দুষ্ট, তখন কথাটি শুধু ঐটুকু মাত্র নয়। তার সঙ্গে জড়িত আছে বক্তার বা লেখকের মনস্তত্ত্ব—বলার উদ্দেশ্য বা ব্যক্তির মন বা temperament। যেমন জড়িত থাকে যখন কেউ বলেন, 'যোগাযোগ' আশ্চর্য সংযত রচনা। ...তুলনামূলক সমালোচনা তাই ব্যর্থ। রবীন্দ্রনাথকে বড়ো কি ছোট বা খারাপ কি ভালো, সে কথা অন্যের সম্বন্ধে আলোচনায় তোলা স্থিতধীর পরিচয় নয়।"[১৮] দুটি রচনাই 'প্রগতি'-তে প্রকাশিত কোনো কোনো রচনার প্রতিবাদ—এবং বাদপ্রতিবাদ এই সূত্রে আরো চলেছিল।[১৯]

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, শিল্পসাহিত্যের নানা বিষয়ের আলোচনায় ও বিতর্কে ক্রমশই বিষ্ণু দে নিজের মননকে শানিত করে তুলছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে বৈদগ্ধ্য তাঁর ব্যক্তিত্বের সামগ্রী হয়ে উঠছে।

১৯৩১ সালে বেরোয় 'পরিচয়'—সম্পূর্ণ নতুন ধরনের পত্রিকা—"বাঙলা দেশের ক্রাইটেরিঅন"—বুদ্ধির প্রখর দীপ্তিতে উজ্জ্বল। সম্পাদক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—সঙ্গে ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, হিরণকুমার সান্যাল, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ প্রমুখ এবং বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুও। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে বিষ্ণু দে-র পরিচয় আগেই হয়ে গেছে—পারিবারিক সূত্রে এবং লেখাপড়ার সূত্রেও। নীরেন্দ্রনাথ রায়ও ছিলেন তাঁর কিছুদিনের গৃহশিক্ষক। বাইশ বছরের যুবক বিষ্ণু দে এলেন 'পরিচয়'-এর আড্ডায়—প্রায় প্রথম থেকেই।

ইতিমধ্যেই অবশ্য 'প্রগতি'-তে বেশ কিছু এবং 'কল্লোল'-এ সামান্য কয়েকটি লেখা বেরোবার ফলে তিনি বোধহয় কিছুটা 'কল্লোল'-এর লেখক বলেই চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলেন। অন্তত 'কল্লোল'-এর কয়েকজন খ্যাতনামা লেখকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা 'পরিচয়'-গোষ্ঠী জানতেন। 'পরিচয়'-এর সূচনাকালীন অভিজ্ঞতার কথা লিখতে গিয়ে হিরণকুমার সান্যাল লেখেন, "কল্লোলের পাতায় ও আপাতদৃষ্টিতে কল্লোলী ঢঙে কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন বিষ্ণু দে"—কথাটা অবশ্য ঠিক নয়—কিন্তু বিষ্ণু দে কল্লোল বা কল্লোল-জীবনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ গোপন করেন না 'পরিচয়'-এর নবলব্ধ বন্ধুদের কাছে। যেমন এর সামান্য কিছুকাল পরেই শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ রোজনামচায় লেখেন, "ফেরার পথে ট্রামে বিষ্ণু দে বলছিলেন কল্লোল সঙ্ঘের কথা। 'বেশ মজার দিন ছিল—একেবারে বোহেমীয় জীবন, কোনো কিছুতেই বাদ-বিচার ছিল না।'"[২০]

কিন্তু এক হিসেবে তো 'পরিচয়'-এর জগতই তাঁর আরো কাছের। যে আত্মসচেতনতার সূত্রপাত হয়েছিল তাঁর "ফ্রেঞ্চ ভার্স ফর্ম" নিয়ে, সেই আত্মসচেতন আধুনিকতার সন্ধানই তো 'পরিচয়'-এর লক্ষ্য। কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায়, শিল্পসাহিত্যের নানা জিজ্ঞাসায় বিষ্ণু দে-র যে চর্চা ও অভিযান শুরু হয়েছিল, তার পরিগ্রহণ তো ঘটতে পারে এখানেই। কিন্তু 'পরিচয়'-এর একান্ত একজন হয়েও বোধহয় তফাৎ ছিল অন্যদের সঙ্গে—বুদ্ধি ও মননের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বোধহয় এর সীমিত রূপও দেখতেন—অন্তত মানবজীবনের নগ্ন বাস্তবতাও তাকে টানত।

এই সময়েরই একটি কৌতুককর ঘটনার কথা বিষ্ণু দে তাই অনেককেই জানাতে পারেন—কীভাবে 'কল্লোল'-এর বন্ধুরা তাঁকে মনে করতেন 'পরিচয়' এর লোক এবং খানিকটা বিদ্বিষ্ট ভাবেই জানতে চাইতেন তাঁর "ইনটেলেকচুয়াল বন্ধু"-দের কথা—আর 'পরিচয়'-এ গেলে 'কল্লোল'-এর লোক হিসেবে তার কাছে ঈষৎ অবজ্ঞার স্বরে জানতে চাওয়া হত তাঁর 'কুখ্যাত' কল্লোলের বন্ধুদের কথা।

'পরিচয়'-এর আবহাওয়ায় বিদেশী সাহিত্যের পঠনপাঠনের পরিধি গেল বেড়ে। তাঁর কারণ এই বিদেশী সাহিত্যের চর্চার মধ্যেই বাঙালি লেখকেরা আধুনিকতার ইশারা পেয়েছিলেন—তাঁদের নিজেদের পরিবেশে আত্মস্থ করতে চেয়েছিলেন এর বাস্তবতা। এলিঅট তো সর্বপ্রথম—কারণ তাঁকে আবিষ্কারের সূত্রেই সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা। একে একে এসে গেলেন তাঁর মনোযোগ ও চর্চার সীমানায় মার্সেল প্রুস্ত, ডি. এইচ. লরেন্স, ভার্জিনিয়া উলফ্-

এর গদ্য, আই. এ. রিচার্ডসের সমালোচনা কিংবা পাউণ্ডের কবিতা। বিষ্ণু দে বলেন, "এলিঅট হচ্ছেন আত্মসচেতনতারই মহাকবি। তাঁর কাব্যের মূল বিষয়ই হচ্ছে আত্মসচেতন মানস...। . আত্মসচেতনতার সাহিত্যরূপ অবশ্য গদ্যে দেখা গেছে প্রুস্তে, জয়সে, কাফকায়, পাস্টেরনাকে, খানিকটা ভার্জিনিয়া উল্‌ফে।"[২১]

অতএব 'পরিচয়ে'র ১ম সংখ্যায় (১৯৩১) বেরোল তাঁর কবিতার সঙ্গে সঙ্গে মার্সেল প্রুস্তের অনুবাদ—"প্রুস্তের আটভাগে প্রকাশিত 'অতীতের অন্বেষণে'-নামক উপন্যাসের দ্বিতীয় ভাগের প্রথম খণ্ড থেকে এ কয় পৃষ্ঠা নেওয়া।"[২২] ঐ একই বছরে (এবং দু-বছর পরে আবার) বেরোল ডি. এইচ্. লরেন্স সম্পর্কে তাঁর সানুরাগ শ্রদ্ধা—"তাঁর মধ্যে জলন্ত যে প্রাণ তার আগুন"-এর অনুভব। অলডাস হাক্‌স্‌লি বা রোনাল্ড বট্‌র‍্যাল বা অডেন গ্রেগরি পার্সন্‌স্ এবং বিশেষ-ভাবে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ সম্পর্কে পুস্তকসমালোচনা লেখেন 'পরিচয়'-এর পাতায় পর পর। এলিঅট-সম্পর্কে তাঁর প্রথম আলোচনা বেরোয় বোধহয় ১৯৩২ সালে এবং ১৯৩৫ সালে 'দি রক' ও 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল' এর বিষয়ে আলোচনা। এজ্রা পাউণ্ড এবং আই. এ. রিচার্ডসও সমালোচিত হয়েছেন ১৯৩৪-৩৫ সালে।[২৩]

এই পরিবেশ-বর্ণনা থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়, একদিকে পশ্চিমী নিত্যনতুন তীব্র আঙ্গিকসাধনার মধ্যে যেমন বিষ্ণু দে খুঁজে নিতে চান আত্ম-পরিচয়—বুর্জোয়া আঘাতের উত্তরে ভঙ্গুরতার বা বিচ্ছিন্নতার এ এক আত্মসচেতন প্রত্যাঘাত—তেমনি অন্যদিকে বিষয়নিষ্ঠা বা আবেগনিষ্ঠার মধ্য দিয়েই পেতে চান খণ্ডচৈতন্যের যন্ত্রণাবোধ।

কিন্তু এই আঙ্গিক চেতনা ও যন্ত্রণাবোধ বা বিচ্ছিন্নের বোধ আসল রূপ পায় এ সময়কার কবিতা-রচনায়। ব্যঙ্গে, কখনো আত্মসচেতন আবেগ-অনুভূতির উল্লাসে বা কখনো একাকীত্বের তীব্র বেদনাবোধে কবিতাগুলো পরিকীর্ণ। অভিজ্ঞতার এই দ্বন্দ্ব এনে দেয় নতুন ভাষা, নতুন উচ্চারণ, নতুন বিন্যাস—আধুনিক কাব্যনন্দনের চাপে নতুন ধারণা আঙ্গিকের ও বিষয়ের। ফলে অনভ্যস্ত পাঠককে হোঁচট খেতে হয় বারবার। এমনকি রবীন্দ্রনাথের মতো জঙ্গম পাঠকেরও রসগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়, এমনই মৌলিক এর নবীনত্ব।

১৯২৬ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে রচিত কবিতাগুলোই স্থান পেয়েছে তাঁর প্রথম দুটি কাব্যগ্রন্থে—'উর্বশী ও আর্টেমিস' ও 'চোরাবালি'তে। ১৯৩৩-এ 'উর্বশী ও আর্টেমিস' গ্রন্থটি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ কবিকে পর পর দু দিনে দুটি

স্বীকৃতিমূলক চিঠি পাঠান। কিন্তু ভালো করে নজর করলে বোঝা যায়, ঐ চিঠি দুটিতেও প্রশস্তির আড়ালে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা অস্পষ্ট থাকে নি—তিনি সোজাসুজি স্বীকার করেছেন আধুনিক যুগের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। লিখলেন, "আমাদের বয়সে সাহিত্যে শুধু কেবল জোর নয়, আরামেরও দরকার লাগে"—কিংবা পরের চিঠিতে আরো স্পষ্ট করে বললেন, "নতুন কালের বিদেশী আদর্শ সামনে রেখে সযত্নে ভঙ্গী অভ্যাস করে নিজের রচনাকে নতুন হাটে চালিয়ে দেবার প্রয়াস তোমার নেই এই আশা করি।"[২৪]

১৯৩৭ সালে 'চোরাবালি' হাতে পেয়ে কিংবা তারও আগে 'চোরাবালি'-র কোনো একটি কবিতা 'কবিতা' পত্রিকায় পাঠ করে তিনি আর ঐ ইঙ্গিতের আড়ালটুকুও রাখেন নি—স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন আপত্তি। এতদূর এই আপত্তির গভীরতা যে, বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত পত্রে 'কবিতা' পত্রিকার ১ম সংখ্যার প্রায় সব কজন কবি সম্পর্কেই আশীর্বাদের প্রশ্রয় জানিয়েও সর্বাধিক, প্রায় দীর্ঘ চারটি বাক্য ব্যবহার করেছেন বিষ্ণু দে-র কবিতা বিষয়ে তাঁর আপত্তি জানিয়ে।[২৫] কিংবা অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা পত্রে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বগত'-র কথা বলতে গিয়ে প্রায় উষ্মা প্রকাশ করেছেন গ্রন্থটি সম্পর্কে বা 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটির বিষয়ে।[২৬] স্বয়ং বিষ্ণু দে-কে লেখা পত্রেও নিজের এই প্রতিক্রিয়াকে বস্তুত গোপন রাখেন নি।[২৭] বোঝা যায়, সার্টিফিকেট-দানে অকৃপণ রবীন্দ্রনাথকেও কোথায় ভেতরে ভেতরে গভীরভাবে আঘাত করেছে এই নতুন কবিতা। এটা যেমন রবীন্দ্রনাথের সমগ্রতার অখণ্ডতা প্রমাণ করে, তেমনি প্রমাণ করে, এমনকি রবীন্দ্রনাথও, বিষ্ণু দে-রই ভাষায়, "বিরাট সাহিত্যকীর্তিতেও তাঁর দেশকালে বাধ্যতই নির্দিষ্ট ছিলেন[২৮]—কিংবা একথা পরোক্ষে প্রমাণিত হয়ে যায় যে বিষ্ণু দে-র স্বাতন্ত্র্যই বোধহয় অন্য সকলের চেয়ে ছিল মৌলিক এবং সে কারণেই প্রাক্তন কাব্যতত্ত্বের বিচারে সবচেয়ে অসহনীয়—হয়তো এই একক নেতির দ্বারাই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়া হয়ে গেল বিষ্ণু দে-র।

এ বিষয়ে আজ আর বোধহয় তেমন তর্ক উঠবে না। কারণ রবীন্দ্রনাথের আপত্তির বিষয়গুলি, আজ প্রায় দীর্ঘ চল্লিশ বছর পরে অনেকটাই অবান্তর হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ঘাট বাঁধানো দীঘির পাশাপাশি পাইন বনের ছবি আমাদের চোখে স্পষ্ট হতে পারে না।"[২৯] কিন্তু আজ আমরা যখন পড়ি

"খরযৌবনে হৃদয়বিহীন তোমার হিয়া,
হাসি তো তোমার বৃথাই ছড়াল তুষার, প্রিয়া!

আসবে একদা সাঁঝে বৈরাগী ঘরছাড়া কেউ
—তোমার হৃদয়-পাইনের বনে কী কানাকানি !
ঘাটে বাঁধা ঐ দীঘিতে তুলবে সাগরের ঢেউ
প্রভাতেই হায় ডেকে নেবে তাকে দূরের বাণী ।"

('পঞ্চমুখ', 'চোরাবালি')

তখন "পাইন বন" এবং "ঘাট বাঁধানো দীঘি"-র চিত্রগত "জবরদস্তি" বা অসংগতির প্রশ্নটাই আমাদের কাছে বিস্ময়কর লাগে। 'চোরাবালি' গ্রন্থের 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটি সম্পর্কে (বস্তুত সম্পূর্ণ গ্রন্থটি সম্পর্কেই) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বোঝবার এবং ভালো লাগবার একান্ত ইচ্ছে করেছি। বুঝতে পারিনি।" কিন্তু তিনি যখন বললেন, "কাব্য হিসাবে এর গুণপনা আছে, কিন্তু শ্রাব্য হিসাবে এটা আমার কাছে বহুদূরে বর্জনীয়৩০"- তখন বোঝা যায় কবিতার উচ্চারণে আধুনিক বাঙলা কবিতা কতদূর সরে এসেছে। এর প্রায় এক বছর আগেই বুদ্ধদেব বসুই তো লিখেছেন, 'ঘোড়সওয়ারে' ছন্দের উত্থান-পতন এমন অভ্রান্ত, অনিয়মিত মিলের ও আকস্মিক অনুপ্রাসের বিস্ময় এমন সংগত ও সুন্দর, নাট্য ও গীতির মিশ্রণ এমন নিখুঁত যে সমস্ত কবিতাটি জটিল ও গম্ভীর সংগীতের মতো মনের মধ্যে হানা দিতে থাকে।"৩১ অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বটে, "তাতে প্রমাণ হোতে পারে আমি এখনকার দিনের নই" বা "অভ্যস্ত আদর্শে বিচার করতে পারি নে অন্য আদর্শ আমার জানা নেই। মনে ভাবি যুগের পরিবর্তন হয়েছে, দূরে পড়ে গেছি"—কিন্তু বস্তুত তাঁর আত্মপ্রত্যয়ের কোনো অভাব ঘটে নি। কারণ রবীন্দ্রনাথের অস্বস্তির উৎস তাঁর রোমান্টিক কাব্যধারণাই, যে ধারণায় তাঁর কাছে লজ্জাকর ঠেকে "অত্যন্ত রিরংসার বাস্তব চিত্র" এবং তিনি কিছুতেই মানতে পারেন না বা বুঝতে পারেন না সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ব্যাখ্যা, "এই কবিতাটির অবলম্বন রিরংসা নয়।"৩২

এই মৌলিক বিভেদের জন্যই তিনি পাউণ্ড-এলিঅটের নিন্দা করেও যখন বিষ্ণু দে-র মারফৎ এলিঅটের একটি কবিতার অনুবাদ পাঠ করে এলিঅটের প্রতি ঈষৎ অনুরাগে অনুবাদটির সংশোধন অর্থাৎ পুনর্লিখন করলেন—তখন তাঁর রুচির প্রসারণক্ষমতায় আমরা মুগ্ধ হই বটে, কিন্তু আধুনিক ছন্দ বা কাব্যোচ্চারণের প্রস্থানভূমিতে রবীন্দ্রনাথের অপারগতাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কারণ তিনি, অনুবাদের সংশোধনকালে এলিঅটের কবিতাটিকে, বিষ্ণু দে-র ভাষায় "তাঁর নিজের ছন্দে," "পুরোপুরি গদ্যে রূপান্তরিত করেন"৩৩—ফলে ছন্দ-বিষয়ে তরুণ বিষ্ণু দে-র

মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তা নিবেদন করলে রবীন্দ্রনাথের স্বভাববিরোধী যে অসহিষ্ণুতার কিঞ্চিৎ প্রকাশ ঘটে, তাতে আমরা তত অবাক হই না।৩৪

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যাকে "দুর্ভেদ্য কেল্লা" বলেছেন, কিংবা "বিদেশী পৌরাণিক বা ভৌগোলিক উপমা" কবিতায় "পরিকীর্ণ" হয়ে থাকা বলেছেন, তা সম্পূর্ণ অমান্য করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু "অভ্যস্ত আদর্শে"র বদলে "অন্য আদর্শে"র প্রতি যদি সত্যিই তাঁর সাড়া জাগত, তবে নিশ্চয়ই তিনি এই অতিরেককে উপেক্ষা করতেন। আসলে অসুবিধাটা অন্যত্র এবং আরো মৌলিক।

এই মৌলিক ব্যবধানের জন্যই বিষ্ণু দে যেমন শুরু করতে পারেন রবীন্দ্রনাথের 'অনভ্যস্ত' 'আদর্শ' থেকে, তেমনি এই ব্যবধান অসম্পূর্ণ বা ছদ্মবেশ নয় বলেই সাবালকের মতো গ্রহণ এবং ব্যবহার করতেও পারেন রবীন্দ্রনাথকে ক্রমশ। যিনি কাব্যরচনায় রবীন্দ্রনাথ থেকে সবচেয়ে আলাদা, তিনিই সে-যুগে রবীন্দ্রনাথের প্রবল ভক্ত পাঠক। বোঝা যায়, সম্পূর্ণ ভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ায়, বিদেশী সাহিত্যের অত্যন্ত স্বাভাবিক অন্তরঙ্গতায়, তৎকালীন সাহিত্যিক গয়ংগচ্ছতার বিরুদ্ধে বিষ্ণু দে-র কবিতা যে "অভিনবত্ব" সৃষ্টি করেছিল, তারই সুস্থ বিকাশ পদ্যের "লঘুরস" থেকে ক্রমশ আত্মসংকটের সাক্ষাৎকারে, "অনিদ্রা-তাড়িত স্নায়ুর জ্যাবদ্ধ" উল্লাসে ও বিষাদে। এই বিকাশ আরো পরে কীভাবে সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে এবং "শব্দের ছন্দের দ্বন্দ্বে" এগিয়ে চলল—"অবিচ্ছিন্ন কাব্যে-"র ধারা শুরু হতে পারল এই দ্বিধাহীন স্বাতন্ত্র্য থেকেই, তার ইতিহাস তো অন্য।

সূত্রনির্দেশ এবং টীকা

১ "ধূপছায়ার সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য যাঁরা আমাদের সহায়তা করেছেন", সেই "কৃতজ্ঞ"তার তালিকায় অন্য অনেকের সঙ্গে আছে বিষ্ণু দে-র নাম—'এঁদের সহানুভূতিতেই 'ধূপছায়া' পরিচালনা সম্ভবপর হয়েছে।"

(অ. ব., 'ঘরে-বাইরে'। 'ধূপছায়া,' শ্রাবণ ১৩৩৫)

২ 'প্রগতি'-র ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় (ভাদ্র ১৩৩৬) বিষ্ণু দে-র 'আপন মনে' প্রবন্ধটির সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সংখ্যাতেই বুদ্ধদেব বসু-র দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রতিবাদ ছাপা হয়েছে—এই বাদানুবাদের মধ্যে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য খুব স্পষ্ট।

৩ এই অংশে প্রমথ চৌধুরীর সমস্ত উক্তি বা তাঁর বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তি—এই সব কিছুরই উৎস পুলিনবিহারী সেন-সম্পাদিত 'সনেট-পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা' গ্রন্থটি (বিশ্বভারতী, ১৩৭৮, পৃ ১৪৫-২০৪)।

৪　ঐ, পৃ ১৫১।

৫　বস্তুত triolet দুটিতে প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব খুবই প্রত্যক্ষ। এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য স্বয়ং বিষ্ণু দে-নির্বাচিত প্রমথ চৌধুরীর 'ত্রিওলেত' কবিতাটি—এই কবিতাগুলির ছায়া এ-সময়ে বিষ্ণু দে-র উপর পড়েছে বলে মনে হয়।

(বিষ্ণু দে, 'একালের কবিতা'। পৃ ২৪-৫)

৬　বুদ্ধদেব বসু, "চোরাবালি", 'কালের পুতুল'। কবিতাভবন, ১৯৪৬। পৃ ৮১

৭　আগের তিনটি উদ্ধৃতির-ই উৎস : সূত্র ৩।

৮　অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'কল্লোল যুগ'। ডি. এম্. লাইব্রেরি, ১৩৫৭। পৃ ২৮৫

৯　দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত প্রণতি দেবীর চিঠি। তারিখ ২৫.৩.৭৫।

১০　বিষ্ণু দে, 'পুরাণের পুনর্জ্জন্ম'। 'প্রগতি', ফাল্গুন ১৩৩৪।

১১　সূত্র ৯। ঐ চিঠিতেই বিষ্ণু দে-র সংযোজিত মন্তব্য।

১২　প্রত্যেকটি গল্পই খুব ছোট আকারে—৪/৫ পৃষ্ঠার। 'ফিরে-ফিরতি' ('প্রগতি', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫) গল্পে সৃষ্টীশ ও সুব্রতা এবং সৃষ্টীশ ও অরুণার অসহ্য মন-দেওয়া-নেওয়ার খেলা—নাগরিক কৃত্রিম 'flattery' এবং 'rivalry'—তার বর্ণনায় লেখকের পর্যবেক্ষণশক্তি, যদিচ সিনিসিজমে ভরপুর, দ্রষ্টব্য। 'বাসর-রাত্রি' ('প্রগতি', আষাঢ় ১৩৩৫) গল্পে বিলাত-প্রত্যাগত স্বামী সুরেশের জন্য স্ত্রী সুষমা-র ব্যাকুল প্রতীক্ষা, সুষমাকে দেখে সুরেশের আশাভঙ্গ, সন্দেহ, বিষাদ ইত্যাদি বহুবিধ ভাবালু হৃদয়চর্চার বিবরণ এবং অবশেষে মিলন—সমস্ত বর্ণনাতেই ঠাট্টার সুর তীব্র। 'বন্ধু' ('প্রগতি', অগ্রহায়ণ ১৩৩৫) গল্পে স্কুলের বন্ধু ভজহরির প্রায় আদিম ভালগারিটিকেই শুধু লেখক ঠাট্টা করেন নি—ঠাট্টাটা আর্টিস্ট-বন্ধু বসন্ত এবং নিজেকেও। প্রমথ চৌধুরীর ঢঙে রেস্টুরেণ্টের আড্ডার গল্পে কাহিনী বা চরিত্রগুলো প্রকাশ্য হয়েছিল। 'হিরো' ('প্রগতি,' আষাঢ় ১৩৩৬) গল্পটিতেও—আগের মতোই আড্ডার সূত্রে লেখা—প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব খুব স্পষ্ট। তারুণ্যের স্বপ্নখচিত দিনে লেখকের হিরো সীতেশ কিভাবে নিকৃষ্ট কুৎসিৎ বিবেকহীন চরিত্র রূপে প্রকাশিত হল, তার অনায়াস বিবরণ।

১৩　সূত্র ১১।

১৪　বিষ্ণু দে, 'শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ'। 'ধূপছায়া', আষাঢ় ১৩৩৫। (শ্যামল রায় ছদ্মনামে পত্রাকারে লিখিত প্রবন্ধ)।

১৫　বিষ্ণু দে, 'লরেন্স্ য়্যাট্‌কিন্‌সন্'। 'বিচিত্রা,' বৈশাখ ১৩৩৬।

১৬ বিষ্ণু দে, 'অগস্টস্ জন্'। 'বিচিত্রা', আশ্বিন ১৩৩৬।

১৭ বিষ্ণু দে, 'নব সাহিত্যতত্ত্ব'। 'ধূপছায়া', আশ্বিন ১৩৩৫।

১৮ বিষ্ণু দে, 'আপন মনে'। 'প্রগতি', ভাদ্র ১৩৩৬।

১৯ দ্র সূত্র ১।

২০ হিরণকুমার সান্যাল, 'পরিচয়-এর কুড়ি বছর'। 'পরিচয়', আষাঢ় ১৩৬১।

২১ বিষ্ণু দে, 'এলিঅট', 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ'। সিগনেট, ১৩৫৯, পৃ ১১৬।

২২ বিষ্ণু দে, 'বিচ্ছেদ' (অনুবাদ)। 'পরিচয়', শ্রাবণ ১৩৩৮।

২৩ এই সময়ের বিষ্ণু দে-র গদ্যরচনা :

'ডি. এইচ্. লরেন্স' (পুস্তক-সমালোচনা), 'পরিচয়,' কার্তিক ১৩৩৮ (১৯৩১)।

'অলডাস্ হাক্স্লি (ঐ), ঐ, মাঘ ১৩৩৮ (১৯৩২)।

'রোনাল্ড বট্র্যাল' (ঐ), ঐ, শ্রাবণ ১৩৩৯ (১৯৩২)।

'এলিঅট, অডেন, গ্রেগরি, পার্সন্স্' (ঐ), ঐ, কার্তিক ১৩৩৯ (১৯৩২)।

'আধুনিক স্থাপত্যের অর্থ' (ঐ), ঐ, মাঘ ১৩৩৯ (১৯৩৩)।

'ডি. এইচ্. লরেন্স' (ঐ), ঐ, মাঘ ১৩৩৯ (১৯৩৩)।

'ভার্জিনিয়া উল্ফ্ ও ডেসমণ্ড ম্যাকার্থি' (ঐ), ঐ, বৈশাখ ১৩৪০ (১৯৩৩)।

'এজ্রা পাউণ্ড,' 'সোভিয়েট সাহিত্য' (ঐ), ঐ, কার্তিক ১৩৪১ (১৯৩৪)।

'রিচার্ডসের কল্পনা' (ঐ), ঐ, শ্রাবণ ১৩৪২ (১৯৩৫)।

'টি. এস্. এলিঅট' (ঐ), ঐ, কার্তিক ১৩৪২ (১৯৩৫)।

২৪ 'দেশ', সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮২। পৃ ১৬।

২৫ 'দেশ', সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮১। পৃ ১২।

২৬ রবীন্দ্রনাথ, 'চিঠিপত্র' (১১শ খণ্ড)। বিশ্বভারতী, ১৩৮১। পৃ ২৬৫।

২৭ "কাজের ফাঁকে ফাঁকে তোমার নতুন লেখা বইখানি পড়তে চেষ্টা করি নি, তা ঠিক নয়। কিন্তু তোমার রচনাকে এমন দুর্ভেদ্য কেল্লায় বাসা দিয়েছ যে আমার মন দেয়ালে ঠেকেই ফেরে।" (সূত্র ৬৪, পৃ ১৭).

২৮ সূত্র, পৃ ৫৪।

২৯ সূত্র ২৫।

৩০ সূত্র ২৬।

৩১ সূত্র ৬, পৃ ৮৮।

৩২ সূত্র ২৪ এবং ২৫।

৩৩ Bishnu Dey, 'Homage to T.S. Eliot,' *In the Sun and the Rain*. P. P. H, p. 178.

৩৪ "১৯৩০-৩১ নাগাদ এলিঅট সাহেবের 'এরিয়েল কবিতাবলী'র কটি পুস্তিকা কলকাতায় পাওয়া গিয়েছিল। তার ৮ নম্বর হল 'জার্নি অব্ দি মেজাই', ১৬ নম্বর হল 'সিমেঅনের গান'। তারপর 'পরিচয়'-পত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বেরোল—আধুনিক কাব্য বিষয়ে। সেই বিরোধী প্রবন্ধে তিনি এলিঅটের প্রথম দিককার কাব্য অবজ্ঞায় প্রয়োগ করেন। এই লেখক তখন ক্ষুব্ধ হয়ে ঐ ৮ নম্বর কবিতাটির যে অনুবাদ করেছিল সেটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠায়। ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দ বিষয়ে তার জিজ্ঞাসাও ছিল। তাই অনুরোধ করে ঐ নামহীন কবিতাটি যদি তিনি তাঁর তৎকালীন (অর্থাৎ 'লিপিকা'র নয়) গদ্যকবিতার ছন্দে লিখে দেন তাহলে সে ঐ ছন্দের স্বরূপটা বুঝতে পারবে।"

(বিষ্ণু দে, 'পাদটীকা'। 'দেশ,' সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮২)

"'পুনশ্চ' পড়েই চঞ্চল হয়েছি। তা ছাড়া সাহায্যও পাচ্ছি না আপাতত কারো কাছে। তাই কিছুমাত্র অধিকার না পেয়েও আপনাকে লিখছি। কিছুকাল ধরে আমার অনেক পদ্য মিলহীন হয়ে যায়। সেটা নিয়মছাড়া অমিত্রাক্ষর বা মুক্তছন্দ কি যে তা জানি না—নিশ্চিত হয়ে scan করতে পারি না বলে।... তারপর সমস্যা ছিল ছন্দময় গদ্য—'পুনশ্চ'তে ও 'লিপিকা'তে তার ও মুক্ত ছন্দের সমাধানের আশা পাচ্ছি। কিন্তু কানকে বিশ্বাস করা ছাড়া কি এ বিষয়ে আর কোনো উপায় নেই ? অনেকের কোনো কোনো শব্দ বিষয়ে ভুল ধারণাও থাকে ত ? তা ছাড়া সকলের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও সমান নয়। আমার পক্ষে তাই নিজের লেখা রচনায় আপনার সংশোধন ও যথাস্থানে লাইন স্থাপন দেখলে সুবিধা হয়।/ তাই আপনাকে সাহস করে একটি কবিতার অনুবাদ পাঠাচ্ছি। এর পরে একটি আরো স্পষ্ট ছন্দগন্ধী অনুবাদ করেছিলুম। কিন্তু সেও এর মতো অদ্ভুত ও দুর্বল ছিল ও আপাতত সেটা হারিয়ে গেছে ।"

(রবীন্দ্রনাথকে বিষ্ণু দে-র চিঠি। [১৯৩২ ?]।
দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮২)

"রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছন্দানুসারে লেখাটি পুনর্লিখন করে পাঠান কয়েকদিনের মধ্যে। আমার বন্ধু পরিচয়-সম্পাদক একদিন তাঁকে বলেন, স্যর, আপনাকে এই সুযোগে বিষ্ণু এলিঅটের সাম্প্রতিক কবিতা পড়াল। তিনি বললেন : তাই বুঝি ? এলিঅট তো তবে ভালো লেখে, তার প্রতি আমি তো অন্যায়

করেছি, তুমি ঐ কবিতাটির অনুবাদ ওর কাছ থেকে নিয়ে ছেপো। তারপরে তিনি ইংরেজি কবিতাটি ও তার অনুবাদটি মিলিয়ে দেখেন এবং সংশোধন করেন। এবং সেইটেই হল ১৩৩৯-এর এলিঅট অনুবাদ।"

(বিষ্ণু দে, পাদটীকা')

"ইতিমধ্যে শ্রীবিষ্ণু দে 'পুনশ্চ'-এর নকলে এলিয়টের একটা তর্জমা পাঠিয়েছিল. পড়ে দেখলুম। কম্‌লি ছোড়্‌তি নেই—গদ্যর ঘাড়ে পদ্য কামড়ে ধরেচে।...আমাকে শোধন করতে অনুরোধ করেছিল। সেই প্রক্রিয়ায় তার দেহান্তর ঘটল।"

(ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ। কার্তিক ১৩৩৯। 'দেশ', সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮০)

"যতদূর মনে আছে, তিনি লিখেছিলেন যে অনুবাদে 'তোমার গদ্যছন্দে কিছু কিছু জায়গায় প্রায় পদ্যছন্দের দোলা লেগেছে, সেটাকে সরিয়ে দিয়েছি।'...ঐ প্রসঙ্গে আমি জিজ্ঞাসামূলক অল্পবয়সের স্বাভাবিক ঝোঁকে আবার তাঁকে গদ্যছন্দ নিয়ে তর্কমূলক চিঠি লিখি এবং তার মধ্যে আবার সাম্‌নাসামনি কথা বলতে চান।"

(বিষ্ণু দে, 'পাদটীকা')

"ছন্দ সম্বন্ধে অনেক তর্ক করেচি আর ইচ্ছা নেই। তোমার কী ভালো লাগে বা না লাগে সেটা ভালো লাগবার চরম কথা নয়, আমার কথাও তথৈবচ। তবু নিজের কানে যে লয় আছে, নিজের কাব্য সেই লয়েই পা ফেলে চলে, তোমার পদচারণের সঙ্গে তার মিল না হবারই কথা।...রুচিভেদ সম্বন্ধে কবিমাত্রেরই অবিচলিত সহিষ্ণুতার চর্চা করাই শ্রেয়।"

(বিষ্ণু দে কে রবীন্দ্রনাথ, মার্চ ১৯৩৩, 'দেশ', সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮২)

"তুমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছ তার উত্তর দিতে হলে লম্বা করে লিখতে হয়। সময় থাকলে লিখতুম।...যদি কখনো তোমার সঙ্গে দেখা হয় মোকাবিলায় গদ্য-পদ্যের ছন্দসীমানা নির্ণয়ের বিচার করা যাবে।"

(ঐ, চৈত্র ১৩৩৯)

"In those days Tagore was experimenting with vers libre in Bengali and in that field I sided with Eliot rather than garrulous prose-poems of Whitman or even of Lawrence. So in my youthful impertinence I argued with him, and then sent him a poem with prose rhythms moving towards

verse rhythms as the need arose, and asked him to re-write it according to his canons. He turned it into prose altogether."

(Bishnu Dey, 'Homage to T.S. Eliot',
In the Sun and the Rain. P.P.H. p. 177-8)

"তবে বাঙলা কবিতাতেও গদ্যপদ্যের বিবাদনিরসনে 'তপস্যাকঠিন রবীন্দ্রনাথই মোক্ষ' কিনা, সে আজ বির্তকের বিষয়।...নিরীক্ষার ঐ নূতন পর্বেই ছন্দোনিপুণ রবীন্দ্রনাথ গদ্যছন্দকেই ভেবেছিলেন ভার্স লিবর এর সমান। অমিয় চক্রবর্তীর এই অভিযোগটা পুরোপুরি সত্যি ছিল যে রবীন্দ্রনাথ ভালো করে বিচার করেন নি হুইটম্যানের ছড়িয়ে-পড়া গদ্যছন্দ আর ফরাসি-কবিতা-থেকে-পাওয়া এজরা পাউণ্ডদের মুক্তছন্দে কতোটাই প্রভেদ।...তাই তিনি (পাঠক) ভুলে যান যে গদ্যছন্দই আধুনিক কবিতার প্রাণ নয়, আধুনিক কবিতার পরিচয় বাক্‌ছন্দে।"

(শঙ্খ ঘোষ, 'ছন্দের বারান্দা'। চিত্রক, ১৩৭৮। পৃ ৮-১২)

"তাই গদ্যছন্দকে—তার লালিত্যময় প্রবাহ বা নিতান্ত শুকনো চেহারাকে—বিষ্ণু দে ভাবতে পারেননি নতুন যুগের ছন্দ।...তিনি লক্ষ করেন যে গদ্যছন্দের বাঁধুনিতেই আছে এক অনিশ্চয়তা। এই অনিশ্চয়তা তাঁকে খুশি করতে পারে না।"

(ঐ, পৃ ১১)

আরশী

ধীরেন্দ্র কর

ধুপ করে বুঁচকিটা পিঁড়ায় নামিয়ে রাখল আরশী। শাবন বউ উনুনে ন্যাতা বোলাচ্ছিল। শব্দ পেয়ে চমকে দেখে আরশীকে। বিস্ময়ে শাবনবউ চোখ দুটো বড় বড় করে পরক্ষণে ভুরু কুঁচকে বলে উঠল—এ্যাই সাত সকালে কোত্থেক্যে এ্যালি হতভাগী ?

আরশী চুলের গিঁট খুলতে খুলতে সহজস্বরে বলল—য্যাখানে পাঠাইছিলি স্যাখান থ্যাকে অ্যালাম।

—ওমা আমার কি হবে গো ? হাতের লোয়া আবার ফেল্যে দিয়ে আস্যেছিস্ বুঝি ? শাবন বউ তাকাল আরশীর বাঁ-হাত এর দিকে। আরশী মায়ের কথায় কান না দিয়ে বলে—সকালবেলায় বক্‌বকানি থামা দিকি—ভাল্লাগে না বাপু, দ্যা এট্টু ত্যাল দ্যা, সিনান করে আসি। যা হাঁটুনি, ব্যথা হয়ে গেল পায়ে।

শাবনবউ হাহাকার করে উঠল—চ্যাচাব না ? বলি এ্যাই স্যাদিন ধার দ্যানা করে সাঙা দিলাম, সব্বনাশী ঘর ভ্যাঙ্গে চল্যে এ্যালি। কই হাতের লোয়া কই হতচ্ছাড়ী ?

—যমের ঘরে—জবাব দিয়ে তেল না নিয়েই ডোবাটার দিকে চলে গেল আরশী। শাবনবউ মেয়ের ভাবভঙ্গি দেখে কাঁদো কাঁদো। ন্যাতা ফেলে দিয়ে হাত ধুয়ে বসে পড়ল মেঝেয়। আরশী যখন সাত বছরের মরদ গেল মারা। সে বয়সে আর পাঁচটা মেয়েমানুষ সাঙা করে ; কিন্তু আরশীর কথা ভেবে শাবনবউ রাজি হয় নি। একবার সে ঠকেছে। গায়ে-গতরে খেটে আরশীকে বড় করেছে। জোয়ান পাত্রের সন্ধান করেছে শাবনবউ। মনে তার বড় আশা ভালো স্বভাবের খাটিয়ে পাত্রের হাতে আরশীকে সঁপে দিয়েই সে খালাস। নিজের একটা পেট সে চালিয়ে নিতে পারবে। দেওর রাখু বাড়ুয্যেদের বাড়িতে বারোমেসে মুনিশ, গাড়ি নিয়ে যায় নানা জায়গায়। কুসুমডি থেকে সমন্ধ এনেছিল সে। এসে বলেছিল—দ্যাখ শাবনবউ, ভেবে দ্যাখ, পাত্তর ভালোই। রেল লাইনে জন খাটে—রোজগারটা মন্দ নয়। কুড়ি টাকা পণ আর রূপার আঙটি দিতে হবেক কিন্তুক পাত্তরকে।

শাবনবউ আগ্রহের সঙ্গে বলেছিল—ভালমন্দ তুমি না খ্যাখ্‌লে খ্যাখ্‌ছে কেটা শুনি ? মাথার উপর তো তুমিই রইছ ঠাকুরপো।

পরদিন ভোরে পান্তা খেয়ে পাত্র দেখতে গেছে রাখু। সন্ধ্যেবেলা পাত্র দেখে এল রাখু। পাত্রের খুব সুনাম করল। ওরা চা চিড়া গুড় মিঠাই খাইয়েছে রাখুকে। রাত্রে পাঁঠীর মাংস ভাত। পাত্রের নাম হাসু। বাপ-মা নেই, ছোট ভাই একটা আছে। দশটা কুকড়া-কুক্‌ড়ী দুটো মাদী ছাগল আছে।

শাবনবউ পরদিন থেকে লেগে গেল কুড়িটা টাকা আর রুপোর আঙটির জোগাড়ে। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা হিসেব করে দেখে আর কত বাকি। শেষ-পর্যন্ত কামিনখাটা ধান বেচে, মনিব ঘরের মেজ গিন্নির কাছে টাকায় মাসিক দু-আনা সুদে গোটা তিরিশেক টাকা জোগাড় হয়ে গেল। আরশীর বিয়ে হয়ে গেল। মেয়েটা বিয়ের দিনেও ডুরে শাড়িটা মালকোচা মেরে ছাগল চরিয়েছে। কিন্তু স্বামী চরিয়ে খেতে পারল কই ? বিয়ে হবার ছমাস বাদেই হাতের নোয়া এবারের মতোই ফেলে দিয়ে পালিয়ে এল আরশী। মরদ হাসু সনাতনকে নিয়ে নিতে এল আরশীকে। শাবনবউ বললে—নিয়ে যাও জামাই জোর কর্‍্যে ধর্‍্যে নিয়ে যাও। মাইয়া মানুষের মরদ ছাড়া দিন চলবে কি কর্‍্যে।

হাসুকে দুর থেকেই দেখেই আরশী বেপাত্তা। গ্যাট হয়ে বসে রইল হাঁসু আর সনাতন। হাঁসুকে আর সনাতনকে শাবনবউ খেতে দিল পান্তা, ফুলুরি আর কাঁচালঙ্কা। দুপুর গেল গড়িয়ে। বেড়ার পাশের মাদাল গাছটা থেকে রোদ সরে গেছে। পাশের ডোবাটা আয়নার মতো—রোদ পড়ে জল ঝিকমিক করছে। আরশী ডোবাটার পাড়ের শ্যাওড়া গাছটার উপরে উঠে তক্কে আছে—আঁটকুড়ির ব্যাটারা কখন পালায়। বিকেল হল। না, আরশী ফিরল না। হাঁসু আর সনাতন আবার আসবে বলে বিদায় নিল। শাবনবউ কপাল চাপড়ায় আর বলে—হতচ্ছাড়ী রাক্ষুসী লিজের সব্বনাশ লিজেই কচ্ছে। আমার পোড়া কপাল।

হাঁসু সেই যে গেল আর এল না। শাবনবউ একদিন শুনল হাঁসু সাঙা করেছে পাশের গায়ের অনিন্দ মিস্ত্রির বিটি ময়নাকে।

মায়ের কাছে এসেছে মেয়ে, এতে ভাববার কি আছে ? কিন্তু মন মানে কই ? আরশী নেয়ে এল ডোবাটায়। ভিজে কাপড়টা গোটা গা-টায় লেপ্টে। আখোড়া ফলের মতো গায়ের রঙ কালো। আটসাঁট বাঁধন আরশীর। হাত-পা বেলুনির মতো। দু-হাতে রাধাকৃষ্ণের উল্কি। কাচের চুড়ি-পরা হাতগুলো ভারি খোলতাই। হাসলে মিশি লাগানো দাঁত বেরিয়ে পড়ে। কপালে কাঠপোকার

টিক্‌লি একটা। বর্ষায় ক্ষেতে গাদা কাঠপোকা হয়। কাঠপোকার ডানা ছাড়িয়ে অনেক করে রেখে দেয় আরশী।

মেঝেয় নামানো পুঁটুলিটা খুলে আরশী একটা শাড়ি বের করে। শাড়িটা এই সেদিন কিনে দিয়েছিল হাঁসু কালীহাটির মেলা থেকে। সেটা পরে ভিজে কাপড়টা মেলে দিল আঙিনায় টাঙানো বাঁশটায়। শাবন বউ শুরু করে দিয়েছে বকতে—জুটো মরদ ছাড়্‌লি চোখখাকী। তোর বস্তে সংসার ধম্ম হবেক নাই বল্যে দিলম্‌। আমি কি লুয়ায় গতরটা বাঁধাই আইছি যে চিরকাল বাঁচ্যে থাকব। বুঝবি ত্যামাসাটা পরে। এই আমি বল্যে দিলম্‌।

আরশী সামনের কুলুঙ্গি থেকে চার আনা দামের ভাঙা আয়নাটায় তখন মুখ দেখছে। কপালের সিন্দুর দাগটা ঘসে ঘসে তুলে ফেলছে। কায়দা করে কাঠ-পোকার টিপটা যথাস্থানে লাগাল। মায়ের কথা কানে যায় না।

প্রথম বারের বিয়ে হল আনুষ্ঠানিক বিয়ে। সে বিয়ে ভেঙ্গে গিয়ে যে বিয়ে তার নাম সাঙা। যৌবনের ঢল নিয়ে মেয়েটা বেমক্কা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। শাবন-বউ-এর ইচ্ছা তারও মেয়ে-জামাই থাকে আর পাঁচজনের যেমন রয়েছে। লোকের চোখেও ভালো ঠেকে। তাই রাখুকে বলে কয়ে ধারদেনা করে আরশীর সাঙা দিয়েছে এই মাঘ মাসে আমড়াবনীর শুকুর সাথে। মুনিষ খাটা শরীর শুকুর। রোদে জলে রঙটা তামাটে। বয়স একটু বেশি। চোখমুখ একটু বসা হলেও শাবনবউ এর ততটা অপছন্দ নয়। সাঙাল্যে মরদ ঐরকমই হয়। আরশীর পছন্দ-অপছন্দ কেউ জিজ্ঞেস করে নাই।

আরশী আরশীটা নামিয়ে রাখতেই শাবনবউ মেয়ের সামনে এসে বসল। রাগটা একটু থিতিয়ে এসেছে। তাই একটু নরম স্বরে জিগ্যেস করল—কি হয়্যেছিল যে চল্যে এ্যালি। একটা বছর কাটাতে লারলি ?

আরশী মুখটা ঘসতে ঘসতে উত্তর দিল—তুইতো সাঙাটা দিয়েই খালাস। তাপর কি হল কি হচ্ছ্যে খপর লিয়েছিস ?

শাবনবউ বললে—ক্যান এই স্যাদিন ঠাকুপো বল্লে আরশী ভালো আছে ত্যালি বাড়িতে রোজ খাটছে।

আরশী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—খাটতে গ্যালেই ধর্যো লিলি ভালো আছি ? তোর জামাইটার কিত্তি শুনিস্‌ নাই তো। স্যা ছড়া তো মাইয়া রাখ্যেছে। তাই হাতের লুয়া কুটি কুটি কর্যে চল্যে আল্যাম।

শাবনবউ অবাক হয়ে যায় তবু বলে—তা বল্যে ঘর ভাঙ্গ্যে মরদ ছাড়্যে চল্যে এ্যালি। মরদগুলোর ঐ রকম এক একটা দোষ থাকেই।

আরশী রেগে ওঠে—কি খেয়ে যে কথাগুলন কচ্ছিস্। সে থানটায় আমার দামটা রইছে কই? তুই আর যাই বল আমি আর যাচ্ছি না ও-ধারে। ক্যান ইখানে কি খাট্যে খাত্যে লারব?

আরশীর জন্য কাজের ভাবনা হবে না তা শাবনবউ জানে। গতরের কাজে আরশীর সঙ্গে পাল্লা দেয় পাড়াটায় এমন কেউ নেই। শাবনবউ-এরও একদিন বয়েস ছিল। মাটি ফেলায় ধান রুয়ায় ওর জুড়ি ছিল না। প্রথমবার শাবনবউ-এর বিয়ে হয়েছিল সোনাডাঙায়। ওখানে নাম নিয়েছিল কাজ করে। কাজ করত যখন ওখানে মনিব তারু পাল ওর দিকে ঠায় একপলক তাকিয়ে থাকত। ভারি অস্বস্তিবোধ করত শাবনবউ। প্রথম পক্ষের বেটা পুনুকে ছেড়ে দিয়ে এসেছে শাবনবউ। পুনুকে দেয়নি ওর বাবা। পিতৃত্বের জোরে সে ছেলে কেড়ে নিয়েছিল। পুনু অনেক বড় হয়েছে—শুনেছে শাবনবউ। বিয়ে দিলেই হল; পুনুর বউ হবে সংসার হবে; ভাবতেই বুকটা মোচড় দিয়ে উঠে; মনটা অভিমানে ভরে উঠে তার। ছেলেকে একটিবার দেখবার জন্য মনটা কেমন করে ওঠে।

দ্বিতীয় এবং শেষ স্বামী হল আরশীর বাবা। শ্রাবণে সাঙা হয়েছিল বলে নাম হয়েছে শাবনবউ। শাবনবউকে ভারি ভালোবাসতো আরশীর বাবা। তবে মানুষটার বদগুণ ছিল অনেক। সেবার ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ল। পাক্কা ছটি মাস জেল। ঐ ছমাস কত কষ্টে কেটেছে, আরশী তখন কচি মেয়ে। অমন দশাসই মানুষটা জেলে গেল। ফিরে এল প্যাকাটিটা। গায়ের রঙ কালির ডেলা। শেষপর্যন্ত টিকল না। জেলে নাকি ডাকাতদের ইনজেকসন দিয়ে দুর্বল করে দেয় যাতে সে ফিরে গিয়ে আর ডাকাতি না করতে পারে। এ কথা শাবনবউ শুনেছিল কোথায়।

আরশীকে বড় করে তুলতে কত ভাবনা ভাবতে হয়েছে শাবনবউকে। ভাতের ভাবনা বড় ভাবনা। পশ্চিম পাড়ার খাঁদু মোড়ল এসেছিল একদিন সন্ধ্যেবেলায়, বলেছিল—শাবন বউ, তুই আমার হয়েই থাক। তোর যা খরচ-পত্তর আমার কাছ থেকে চেয়ে নিবি। ফিরিয়ে দিয়েছিল মোড়লকে। মাঝে মাঝে কাজ না জুটলে উপোস করতে হয়েছে তাকে। খালধার থেকে কচু, কাঞ্চিরা ও পুন্যা শাক তুলে এনে সিদ্ধ করে খেয়েছে। আরশীও মাঝে মাঝে খাল-ডোবায় জলঝিটে পুটী, চিংড়ী, কাঁকড়া ও ব্যাঙ ধরে খেয়েছে। এখনো খায়। দুঃখ কষ্ট বারোমাসের সঙ্গী। তবু শাবনবউ কারু ডাকে সাড়া দেয় নি। ছোট দেওর রাখুর ছেলেপুলে ছটা। স্বামী-স্ত্রীতে মুনিশ কামিন খাটে।

ছোট বউ পাতুরী মনিবঘরে বারোমাস গোহাল নিকোয়। ছেলেগুলো রাখালি করে। টানাটানি করে চলে যায় ওদের।

উল্টোরথের পর থেকে ধুরুপ বর্ষা নেমে গেল। ক্ষেত ভর্তি জল। কোথায় আল ভেঙ্গে জল ছুটছে। জোড়-নদী একাকার। শোল ক্ষেতে উগাল-পাখ্‌না চলছে। কাদা করা মাঠে ধান চারা পুত্‌ছে কামিনরা কোমরে কাপড় জড়িয়ে। গোছালো হাতে পনপন বীজ পুতে চলেছে ওরা। মুনিষেরা কোদাল পাড়ছে আর হাঁক পেড়ে গান জুড়েছে। আরশী আর শাবনবউ বাদ-হিড় সব জায়গায় কাজ করছে। জলেকাদায় খেটে এ সময় যা চাট্টি রোজগায় হয়। অসময়ে ধান ধার করেছে শাবনবউ। এক শলিতে দেড় শলি বাড়। তার কিছু শোধ হচ্ছে এখন। আরশীর ধান পুরো জমেছে। শ্রাবণ মাসে মা মনসার ব্রত আছে, আছে অরান্নার পরব, সন্যাসীর পরব, শেয়াল শকুনির ভাসান, জন্মাষ্টমী—তারপর দুগ্‌গোপুজা। মনসাভাসানের পর চার পাঁচদিন কাজ হবে না। চাষ তখন শেষ হবে। হাতে পায়ের হাজা শুকোবে সবাই।

আরশী ধাড়ী ছাগল দুটোর ক্ষেতের আইড়ে বেঁধে দেয় খুঁটি পুতে আর নিড়োন দেয় ধানগাছের, অটাই বেঁধে। একটা ধাড়ী বিয়োবে আশ্বিন মাসে। হেসো দিয়ে জোড়-পাতা খাইয়ে ছাগল দুটোর চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছে আরশী। আরশী আসায় শাবনবউ-এর অনেক খাটুনি কমেছে। কিন্তু ওর মরদ পানা ভঙ্গিটা দেখলে পিত্তি জ্বলে যায়। শাবন বউ আর ক-দিন এমনভাবে রাখবে আরশীকে? সুদন বুড়োর বিটি কুচি রাইমোশায়ের রাখ্‌নি হয়ে আছে। সে থাকুকগে কিন্তু যৌবন গেলে দেখবে কে তখন? সেদিন এক কেলেঙ্কারী, কুচি ছ মাসের পেট খসাল। জানাজানি হতে বাকি রইল কই? অমন আকছার কত হচ্ছে। আরশীর বাবা মারা যাবার পর কতবার তার দুয়ারে টোকা পড়েছে। মাঝে মাঝে মনটা অবুঝ হয়েছে বৈকি, কিন্তু পরক্ষণেই মনটাকে শক্ত করেছে শাবনবউ। ঘুমন্ত আরশীর গায়ে হাত বুলিয়ে বেসরমী কামনাকে হটিয়েছে। আরশীর কি হবে? আর কত সাঙা দেবে ধার দেনা করে। মরদের ঘর যদি না করতে পারে আরশী তবে ওর কপাল। না হয় খাটিয়ে মেয়ে। কত মরদ রয়েছে। খবর পেলে চিলের মতো উড়ে আসবে। শাবনবউ আশা করেছিল হয়তো শুকু লোকজন নিয়ে চাষের আগেই আরশীকে নিতে আসবে। ষোল আনার (গ্রাম্য গণসালিশী সমিতি) কাছে বোল কবুল করাবে। কিন্তু শুকু আর এল কই? হয়ত ঘরে বউ এনেছে এ্যাদ্দিন।

শ্রাবণসংক্রান্তিতে মা মনসার পুজো। সে সময় ধানে সবুজ রঙ ধরে। গাছ

গাছালি ঘন হয়। ডহরের জলে ঘুনি পেতে মাছ ধরে ন্যাংটো ছেলেরা। বিকাল নেমে আসে আঙিনায় ছায়া ছায়া হয়ে। ঢলে পড়া সূর্যের আলোর ছটায় মাঠের গাঢ় সবুজ মনোহারী হয়ে ওঠে। সন্ধ্যের পরই পাড়ার মনসা মেলায় শুরু হয়ে যায় মনসামঙ্গল। মানুষগুলো সারাদিন খেটে এসে ভরপেট করে এই সময়টা গান গায় আয়েস করে। সতী বেহুলা সর্পদষ্ট স্বামীকে কলার ভেলায় চাপিয়ে নিয়ে চলেছে বাঁচাবার আশায়। আবার স্বামীকে নিয়ে ঘর বাঁধবে সে। বেহুলার ধৈর্য আর আত্মবিশ্বাসের কাহিনী শোনে পাড়ার মেয়েরা। আরশী ভাবে বেহুলার কথা আর তার নিজের কথা—সোয়ামী নাই পুত্র নাই কাকে নিয়ে তার ঘর। চোখে ঘুম নেমে আসছে আরশীর। পালা শুনে আরশী উঠল।

কল্‌কে গাছের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার আলো ফুল ফুটিয়েছে। অঢেল ফুলের গন্ধে সাঁঝের বাতাসটুক ভারি হয়ে উঠেছে। চাটুয্যেদের বেড়ার পাশ দিয়ে পথটা গেছে বেঁকে। এখান থেকে তাদের উঠোনটা দেখাচ্ছে। আরশী হঠাৎ থম্‌কে গেল—বিতিকিচ্ছি ঢঙ্‌ করে মনু চাটুয্যের হাবা ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে। পেটটা বড়, হাত পা সরু কাঠি। ন্যাঙটা। আরশী অবাক মুখে জিজ্ঞেস করল—তুই ইখানে কি কচ্ছিস্‌ লেলো। লেলোর মুখে অনবরত লাল পড়ে বলে সকলে ওকে লেলো বলে ডাকে।

লেলো কান্না জড়ানো স্বরে বলল—নতুন মা মেরেছে। ঘর যাবনি আবার মারবে। আরশী তাকে কোলে তুলে নিল—চল আমার ঘরে চল, মুড়ি দুব। ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে আরশী চলল।

মনু চাটুয্যের দুবার বিয়ে। প্রথম বারের স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। এই হাবা ছেলেটা রেখে গেছে। চাটুয্যের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছেলেটাকে মোটেই দেখতে পারে না। খুব মারধোর করে। ছেলেটাও তেমনি। অত মারলেও কাঁদাকাটা করে না। শুধু বিষণ্ণ মুখে করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে। চাটুয্যে মাসের পনের দিন বাড়িতে থাকে না। জুয়ো খেলে, মদ খায়। বেড়ার পাশ দিয়ে আরশীর দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে থাকে। চাটুয্যের রঙভরা চোখের অর্থ আরশী বোঝে। বুঝেও চাটুয্যেকে কিছু বুঝতে দেয় না। আরশী দাওয়ায় তুলল ছেলেটাকে। শাবনবউ দাওয়ায় বসেছিল। উঠে দেখে লেলোকে। বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে—ওমা, এ্যা যে চাটুয্যের ব্যাটা, কুথায় প্যালি ?

আরশী বলে—আর বলিস্‌ ক্যান। হই র্ঁদের ধারে দাড়াইছিল ভূতটা মতন। য্যামনি কপাল ঃ মা গ্যালোত বাপটা ঐ রঙের। ব্যাতে পোকা পড়ুক অমন বাপের। সতীনের মুয়ে ঝাঁটা।

শাবনবউ আঁতকে ওঠে—ই, হি-ই-ই, বামুনকে গাল দিলি হতচ্ছাড়ী ?

আরশী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—অমন বাম্‌নাই ঢ্যার দ্যাখেছি। ল্যা, দুটি মুড়ি দ্যা, ছেলেটা খাক্ এখন। খুঁজতে তো আসবে না কেউ।

শাবনবউ মুড়ি দেয়। ছেলেটাকে শাবনবউও ভালোবাসে। মন্নু চাটুয্যের ঘরে কামিন খেটেছে সে। এখনও গোহাল নিকিয়ে বেরুন পায়। ওর সঙ্গে মাগী ছেলেটাকে কত মারে। কতবার পায়খানা পরিষ্কার করেছে ছেলেটার, স্নান করিয়ে দিয়েছে ডোবায়।

মুড়ি খাইয়ে দাওয়ায় চট বিছাল আরশী। ছেলেটাকে কাছে নিয়ে শুল। খানিকক্ষণ ছেলেটার সাথে গল্প করল সে। নতুন মা কখন কেমনভাবে কি কারণে মেরেছে সবই বলল লেলো। সকালবেলায় মন্নু চাটুয্যের স্ত্রী এদিক দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিল পুকুরের দিকে। শাবন বউ-এর দাওয়ায় দু-চোখের বিষটাকে দেখে এগিয়ে এল।

—বলি, হ্যাগা, আরশী, তোদের আক্কেল তো বড়। তোরা একবার খবর দিলিনা যে ছেলেটা আমাদের কাছে রয়েছে ?

আরশী ডান হাতটা ঘুরিয়ে বলে—খপর কার কাছে দুব ? ওটার রইছেই বা কে ? বলি, তুমরা একবারও তলাশ করেছ ?

বামুনবউ একটু নরম স্বরে বলে—খোঁজ করেছি বৈকি লা। নিজের ছেলের মতো দেখি। যত যতন করতে চাই ছেলেটা বিষ বাসছে আমায়। তা বলে আমার নাড়ু আর লেলো কি আলাদা আলাদা ? তোরাই বল ?

শাবনবউ বলে—ঠাকুরুন আমি এখুনি যাত্যাম তুমার কাছে। তা তুমি আস্থে পড়্যেছ। ভ্যালাই হল। রাতে অবশ্য চাট্টি মুড়ি লঙ্কা খায়্যেছে।

বামুনবউ দপ্ করে জ্বলে ওঠে—বলি তোদের আস্পদ্দা তো কম নয় ? ছোট জাত হয়ে মুড়ি খাওয়ালি কি বলে বাম্ভনের সন্তানকে ?

আরশী দাওয়া থেকে নেমে আসে—রাখ্যে দাও তুমার বাম্ভনগিরি। সোতিনের ছানার উপর ভারি দরদ। দু-প্যাট খ্যাতে দ্যায় না তার আবার ঢ্যাম্‌নাই হচ্ছে।

শাবনবউ আহা করে ওঠে—অ আরশী, বলি মনিবানির সাথে ভালো কথা কইতে পারিস্ না ?

বামুনবউ বলে—দ্যাখ, তোর বিটির কাণ্ড দ্যাখ্, আমার অত অবস্‌র নাই তোদের মতো ছোট লোকের সঙ্গে তক্ক করবার। কর্তা আসুক সব বলছি।

আরশী ঝেঁঝে ওঠে—ডাক্‌গ্যা যা তুর কত্তাকে। লেলোকে ছোট থ্যাকে

হ্যাখেছে কেটা শুনি ? মা তো তুমার ঘরে কামিন খাটত্, হ্যাপাজতটা কে করেছে ? লেলো ইখানেই থাকবেক বল্যে দিচ্ছি।

বামুনবউ চলে গেল গজগজ করতে করতে। শাবনবউ আরশীকে বকে ওঠে,—মিছিমিছি ভদ্দর লোকের মাইয়ার সঙ্গে ঝগড়া কত্তে গ্যালি ক্যান্? ভদ্দরলোকের ব্যাটা আমাদের কাছে থাকবেক ক্যান বল ?

আরশী কোনো কথা না বলে আঁচলে মুড়ি বাঁধে, শিশিতে তেল নেয়, তারপর লেলোর হাত ধরে বেরিয়ে যায়। নিড়ানির কাজ দিনকতকের ভেতরই আরম্ভ হবে, চারদিকে ধানক্ষেত, তার ভেতর দিয়ে দিয়ে ভিন্‌গাঁয়ে চলে গেলে একটা না একটা কাজ কি আর জুটবে না আরশীর ? মনু চাটুয্যে এমনি হয়তো লেলোকে খুঁজবে না, এক আরশীকে জব্দ করার জন্য খুঁজতে পারে। অবশ্য হাতের কাছে পেলে জব্দ করার জন্য যতটা লাগত, এখন খুঁজে পেতে জব্দ করার অত ঝামেলা নাও করতে পারে—লেলোর হাত থেকে রেহাই তো পেয়েছে।

এখন নিড়ানি, তারপর ধানকাটা। এদিকে ক্রমেই তো ধানকাটার দলের ভিড় বাড়বে। অত ভিড়ের ভেতর, অত ঝুবড়ির ভেতর লেলোকে নিয়ে কি আর আরশী লুকিয়ে থাকতে পারবে না ?

তবু যদি মনু চাটুয্যে তাকে খুঁজে পেতে বের করে তাহলে আরশী চিল্লাচিল্লি বাধিয়ে দেবে যে লেলো আসলে আরশীরই ছেলে। তাতে আরশীর চরিত্রে সবাই কলঙ্ক দেবে—তাতে আরশীর বয়েই যাবে।

মাঠের ভেতর এক জলামতো জায়গায় কাঁকড়া ঘুরছিল। দুটো ধরে আরশী লেলোকে দিল। লেলো এমন হেসে হাততালি দিয়ে ওঠে যে আরশীর আর মনে থাকে না যে লেলো হাসতে পারত না।

তারপর, আর এক জলা থেকে শালুক ফুল তুলে আরশী লেলোর গলায় মালা করে দেয়। তারপর, আর এক জলা থেকে মোটা পাতার ঘাস তুলে আরশী টুপি মতো বানিয়ে লেলোকে পরিয়ে দেয়। লেলো যখন নুলো পায়ে রাখালরাজার মতো নেচে ওঠে; তখন আরশী নিশ্চিত হয়ে যায় লেলোকে আর মনু চাটুয্যের ছেলে বলে মনেই হচ্ছে না।

তখন সে নিজেও একটা শালুক ফুলের মালা পরে নেয়।

একটি জরুরী কবিতা

অমিতাভ দাশগুপ্ত

ইকড়িমিকড়িচামেকাটাচামচিকি,
সোজাসুজি মানা—সান্ধ্যভাষায় লিখি।

তেমনকি হাবা একলব্যটি আছি
চাইলে আঙুল কেটে দেব দক্ষিণা,
কবির চেয়ে কে ভালো খেলে কানামাছি—
তোমার কাছে তো এক কড়াও ধারি না।

গগনে গগনে মেঘের ঘন দ্রিমিকি
তোমাকে মজায় স্বপ্নের ছৌ-নাচে,
অনুগত জন ছোঁড়ে আধুলি ও সিকি—
খিদে জমে জমে রাক্ষস হয়ে আছে।

আর কতকাল দড়ির ওপরে মেয়ে
নাচবে এবং দেখবে অলপ্পেয়ে,
বাঁয়ে না ঝুঁকেই ডান কত সামলাবে—
খিদে জমে জমে শেষে কি তোমাকে খাবে?

অনতিক্রম্য

অনন্ত দাশ

এখন দুর্গম বলে কিছু নেই
সুউচ্চ পর্বত কিংবা নিতল সমুদ্র
দূর নভস্তল আজ ছুঁয়ে আছে মানুষের হাত
অতি অনায়াসে আমি
ডিসেকশন টেবিলে হৃদপিণ্ড খুলে রেখে বাড়ি ফিরতে পারি।

প্রার্থিত অনেক কিছু পেয়েছে মানুষ
অনালব্ধ আরো কিছু আছে—
নিরত সন্ধানে তাই বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে
স্থপতি বানায় সৌধ,
　　　　কারিগর ব্যস্ত আজ গ্রামে ও নগরে
তবুও আমরা যেন প্রাবাসিক রয়ে গেছি আপন হৃদয়ে
আজন্ম বিষাদ
　　　　চতুর্দিকে আগ্নেয় বলয়ে ঘিরে আছে
শুধু পঞ্চপাণ্ডবেরা নয়, সমস্ত মানুষ আজ জতুগৃহবাসী।

বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে বিচ্ছিন্নতা
　　　　ফাটলে ফাটলে গুল্ম, বিভেদের দীর্ঘশ্বাস
বৃক্ষরোপণের নামে চতুর্দিকে চলে যেন সবুজ সংহার।
এখন অনেক কিছু অধিগম্য
　　　　তবু ক্ষুৎকামনায় ভোগে অজস্র মানুষ—

অনার্জিত শৈশবের দুঃখপুঞ্জ নিয়ে
　　　　আমরা চলেছি যেন দিকচিহ্নহীন
এক ইতিহাস ভেঙে ছায়াপথে অন্য ইতিহাসে
　　　　গ্রহান্তরে, সেতু পারাপারে—
এখন দুর্গম বলে কিছু নেই
　　　　তবুও অনতিক্রম্য যেন মানুষে মানুষে ব্যবধান।

জীবন যেখানে

শিবেন চট্টোপাধ্যায়

পরাভব ছিল যেন বুকের ভিতরে—কোন নষ্টচাঁদ রাতের বেলায়
সোঁদাল বনের মধ্যে তাই পড়ে থাকে
মৃত বাঘ,
জ্যোৎস্না কি আজো আছে ?
হিরণ জ্যোৎস্নার শত মন্দাকিনী
যুবকের রক্তে ডুবে যায়।

গাঙুড়ের জলে দেখি ভেসে যায় বেহুলার ভেলা।

জীবন কোথায় আছে—রাজপথে—হিমমাঘ কুয়াশার
গভীর শরীরে
হেমন্তের শূন্য মাঠ
অথবা সে কোন নিষ্ঠীবনে
স্বপ্নছেঁড়া অন্তিম শয়নে।

শ্মশানচাঁপার দেহ জেগে থাকে কাপালিক চোখের ভিতর।

দুটি কবিতা

অমিয় ধর

ফোটানো গেলনা

ঘাসের উপর রোদে পাখিদের ওড়াবসা,
মেঘেদের ছবি,
গাছের মাথায় বিলি কাটছে হাওয়া,
বাগানের পথে রোদেটানা মাকড়শার ঝালর ;—
দেখে যাই উপর উপর।

এসব ছাড়িয়ে চোখ নেমে আসে
যেখানে নাড়ীর টান,
শ্রমের নির্মাণ শেষে, ক্লান্তি ধোয়া অবসর,
যাওয়া আসা মানুষজনের,
শেকড় ওপড়ানো যন্ত্রণা,
হাওয়ায় বাজে হাহাকার।

সুরের ভেতরে সুর
চোখ ডুবিয়ে আর একটা ছবি
কিছুতেই ফোটানো গেলনা!

যাওয়া আসা ভিতরে বাহিরে

তোমার দুয়ারে এলে
রৌদ্রফুলে আলোময় ভিতর বাহির
ভিতর বাহিরে এ কী আকুলতা
সুখ-দুঃখ জটিল নির্মাণে
দশটি আঙুল জুড়ে মমতায় তুলে আনি
পরাই তোমায় মালা
অগ্নিবাক্ ফুলের ভাষায়
তবুও হয় না বলা
বিঁধে রয় স্মৃতির গভীরে!

সুখ-দুঃখ দুই স্মৃতি
বেদনায় স্ফূর্তি তার
যাওয়া আসা ভিতরে বাহিরে!

এরকমই কথা ছিলো

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

একটি নিটোল মুখ দেখাবে
কথা ছিল।
এই সহরের
এফোঁড় ওফোঁড় রাস্তাঘাটের
ভালোবাসার অনাহারের চলচ্ছবি
কথা ছিল
একটি মুখের রেখার মধ্যে
চারিয়ে দেবে।
তিস্তা আবার ফুঁসে উঠলে
হৃদয় খুলে
উড়িয়ে দিলে শিমুল তুলো
কুজ্‌ঝটিকা
মিলিয়ে যাচ্ছে নিটোল মুখ
মুখের রেখা।
অন্ধকার ডানা মেললে
বাঙলাদেশে পর্তুগালে
পাহাড়ী ঢল মুহুর্মুহু মুখ ঘুরিয়ে
ভয়ঙ্করী
ভালোবাসা দুমড়ে এখন
বারবনিতার নাকের নোলক
মেটে সিঁদুর
ঘণ্টা কয়েক গৃহস্থালী।
নিপুণ নরুন
বাড়তি মাটি ছেঁটে ফেললে
একটি নিটোল মুখ বেরোবে
এরকমই কথা ছিল।

দুটি কবিতা

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

সীমাবদ্ধ নদীটির ঢেউ

সময় কি স্থির থাকে? নাকি স্থির থাকতে পারে?
পৃথিবী ঘুরলে আবর্তনে দিন রাত্রি একই বৃত্তে অস্থির হয়ে পড়ে।
নিজস্ব জন্মবৃত্তে মানুষ-মানুষীরা স্বরচিত অন্ধকারে এরকম
চঞ্চল হতে হতে জ্যোৎস্নার নিষিদ্ধ রসদ খুঁজে বেড়ায়।
রাত্রির শরীরে, আতপ্ত মধ্যাহ্ন দুপুরে সময়ের বুকে আছাড় খেয়ে
রক্তাক্ত হয়ে পড়ে।

প্রিয় শো কেসে সযত্নে লুকিয়ে রাখা কাঞ্চন স্মৃতি,
স্বপ্নের জীবাশ্ম কিংবা আরও কিছু সৌখিন জিনিসপত্তর
চারদিকে ছিট্‌কে পড়ে—আর তুলে রাখতে কিংবা শো-কেস
সাজাতে পারে না।

সীমাবদ্ধ নদীটির ঢেউ কখন কাকে যে বুকে টানে কেউ বলতে
পারে না। কখন কে যে নৌকো ভাসিয়ে নিরুদ্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে
যায় কেউ তার খোঁজখবর রাখে না
অথচ সখের সাম্পানে চড়ে নতুন দিন নতুন মুখ জানালার
পাশে এসে যায়……

এমনি উজ্জ্বল মুহূর্তে ভ্রূণ বীজনের দিনে পৌরুষ সেও
চৈতন্যের গভীরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মৌলিক অধিকার দাবি করে।

বৃষ্টিকে বৃষ্টির মতো ভাবতে দাও

বৃষ্টিকে বৃষ্টির মতো ভাবতে দাও

বন্দী ঘরে দারুণ স্তব্ধতায়
নির্বিকার নিশ্চল ময়ূর
পেখম জুড়ে দারুণ জড়তা
কদম ফোটার গান জেনেও জানে না!

বৃষ্টিকে বৃষ্টির মতো ভাবতে পারলে
দুঃখ বা বিষাদ বলে কিছুই থাকে না
গায়ের শোভন পোষাকেও কোনো রঙ লাগে না
সমস্ত অসুখ সুখ হয়ে
সুখের ইস্কাবন খেলে যায়।
আয়নায় নিজের মুখ দ্রুত পাল্টে যায়
প্রতিবিম্বে গোপন প্রেমের স্বরলিপি
বাজতে বাজতে বাজতে বাজতে
পুরাতন রুমালের পরিচিত গন্ধে
দুনিয়া মশগুল করে।

বৃষ্টিহীন কঠিন আষাঢ়ে নিজস্ব বিষাদ নিয়ে
খরতাপে প্রতিশ্রুতি পোড়াতে পোড়াতে
চিরহরিৎ বৃক্ষের বল্কলে যারা লুকোতে চায়
কিংবা যারা সহজিয়া সুর তুলে
যক্ষের বিরহ মেঘে নির্বাসিত হতে চায়
তারা ভালোবাসার অসংলগ্ন 'এরেনা'র মাঝখানে
ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে একদিন
সত্যি সত্যিই পৃথিবী থেকে সাড়ে সাত লক্ষ মাইল
দূরে সরে যায়।

আমি এসবের মধ্যে নেই
সব দুঃখের কালি শক্ত 'ইরেজার' দিয়ে মুছে ফেলি
বৃষ্টিকে বৃষ্টির মতো ভাবতে ভাবতে
ঘরের ভিতরে বন্দী আমি
টইটম্বুর নদীর শরীর এবং কোমলগান্ধার মন ছুঁয়ে
ছুটে যাই মুক্ত দরোজায়।

সহজ জীবন

শিবরাম পণ্ডা

অগ্রহায়ণী ধানের ক্ষেত
কালো মেয়ের মাথায় ফুল
পাকা ধানের সোনালী রং
দুপুর রোদে চোখ ধাঁধানো
গরুর গাড়ি বোঝাই ধান
তাড়ির গন্ধ নিমের তেল বাজনা বাজে
ইতিউতি হিজু গোপাল
কান জুড়ানো বাঁশের বাঁশী
হিজুলেন অকাল বাকাল
দুম্ দুমা দুম্ কাড়ানাকাড়
কংস রাজা মেনায় মুখ জেরা রে
ঘুঙুর শব্দে নাচের তাল
আয় বাব্উ বসুন হেথা
মধুর হাসি সহজ জীবন
গোখরা সাপ কাঁদে
বিষদাঁত নাচের তালে ভাঙ্গে
নিত্য জীবন কাগজ নৌকা
ভ্রমণকাহিনী দামোদরের তীরে
কোরাসে গান চলে
কংস রাজা মেনায় মুখ জেরা রে।

[শব্দার্থ ঃ—ইতিউতি হিজু গোপাল—
গোপাল আসছে ;
হিজুলেন অকাল বাকাল—
চলার সময় অঙ্গ দুলছে ;
কংসরাজা মেনায় মুখ জেরা রে—
কংসরাজার মুখে ক্রোধের প্রকাশ]

ক্ষীরোদ নট্ট

শুকনো কঙ্কালেও শিল্পীসত্তার প্রকাশ যে কী যৌবনচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে, তা প্রত্যক্ষ করেছিলাম বছর দুয়েক আগে। চক্ষু কোটরে সন্ধ্যার আলো—অন্ধকারের মাত্রাই তাতে বেশি। স্মৃতিও পাথর হয়ে যাওয়া মস্তিষ্ক—পুত্রশোকের অন্ধকার সেখানেও মুখ্য। কানে এই পৃথিবীর ধ্বনি আর বুঝি পৌঁছোয় না। কারুকাজ-করা ঢাকনাওয়ালা একটা ঢোলের ওপর শতাধিক বছরের আনন্দ-বেদনা-দুঃখ-শোকের নিবাস একটা মাথা, যেন ঢোলটারই মাথাটা। আর ঢোলের ওপরে ভাঁজ করা দুখানা হাত। সেদিন তাঁর সম্বর্ধনা, ঐ ঢোলটাকে যিনি জীবন্ত প্রমাণ করতে জীবন দিয়েছেন একশ পাঁচ বছর ধরে। এই প্রমাণ উপস্থিত করবার জন্যে নিজেকে তাঁর কোনো দিন কথা ব্যয় করতে হয় নি। সেদিনও না। ভাগনে মঞ্চে উঠে কানে কানে কী বলল, কৌতূহলী শিশুর মতো সমগ্র ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলেন শিল্পী। তারপর বুঝলেন, কঠিন কাঠ আর শুকনো চামড়ার ভেতরকার জব্দ হৃৎপিণ্ডের শব্দ পৌঁছে দিতে হবে উপস্থিত জনতার কানে। অতি ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, যা মাইকেও ক্ষীণ স্বর হয়ে শ্রোতাদের কানে পৌঁছল, 'আমি বইস্যাই বাজাই'। ব্যাস, বসেই তিনি আত্মপরিচিতি উপস্থিত করলেন, তাঁর হাত কথা কওয়াল ঢোলটাকে দিয়ে: "ক্ষীরোদ নট্ট মাছরঙ্, ক্ষীরোদ নট্ট মাছরঙ্।" তারপর কত বোল, কত কথা। সে ভাষা সমগ্র বুঝবার সামর্থ্য আমার ছিল না—বুঝিনি 'দেশী' উচ্চাঙ্গ ধ্রুবপদের বিস্তার বিলয়। কিন্তু দেখেছিলাম নির্জীব বয়োভারক্লান্ত কঙ্কালসর্বস্ব ক্ষুৎকাতর একটা শরীর, বসে বসে বাজাতেই যাঁর অক্ষমতা, এক সময় বিরাট ঢোলটা কাঁধে করে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। হাঁটু ভেঙে, সামনে ঝুঁকে, পেছনে হেলে, হাতের যাদুই কাঠিতে ঢোলের চামড়ায় আঘাত হেনে একটা সামুদ্রিক ছন্দতরঙ্গ তুলে দিয়েছেন সমগ্র পরিবেশে। এক জনতার অন্তর্গত রক্তে, আর যদি কিছু কাজ না-ও করে থাকে, ধ্বনি সোচ্চার হয়েছিল: "ক্ষীরোদ নট্ট মাছরঙ্, ক্ষীরোদ নট্ট মাছরঙ্।"

তারপর সমস্ত তরঙ্গ-কল্লোলকে ধীরে ধীরে সম্-এ এনে কাঠি শুদ্ধু হাত দুটো এক সময় জোড় হয়ে যায়। শৃঙ্খলিত করজোড়ের ভাষাহীন কথা ভাষাহারা করে দেয় আবহাওয়াকে।

আজ সেই ঢোলটিই ভাষাহারা। গত তেরই মার্চ রাত্রে একশো সাত বছর বয়সে ক্ষীরোদ নট্টের সেই 'কথা কওয়া' দুটি হাত বুঝি সেই সম্বর্ধনা সভারই মতো যুক্ত করে মৃত্যুকে আবাহন করেছিল। সম্পূর্ণ সজ্ঞান বৃদ্ধের ক্ষীণ কণ্ঠে বুঝি-বা বেজেছিল কীর্তনের পদ, ঢোলের বোল। মৃত্যুকালে তাঁর পাশে ছিল আজীবনের সুখদুঃখের সঙ্গী সাত পুরুষের ঢোলটি, স্ত্রী, বিধবা পুত্রবধু, দুটি নাতি আর এক নাতনী। এই নিয়েই তো সংসার ছিল ক্ষীরোদ নট্টর। এরাই ছিল তাঁর শেষ জীবনের নিত্য সঙ্গী—জীবন্ত দুঃখ। কিন্তু সমস্ত দুঃখকেই জয় করে শিল্পীসত্তা। শিল্পীর কোনো জাত নেই ধর্ম নেই দেশ নেই—নেই দুঃখও যে, ক্ষীরোদ নট্ট মৃত্যুকালেও তার প্রমাণ দিয়েছেন প্রকাশের আনন্দের মধ্যে থেকে।

একশত সাত বছরের জীবন। কত না কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে তাঁকে নিয়েই। একটা বিরাট ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করে নিয়ে এসে আজ তাকে মহতী মৌনে চিরদিনের মতো বিলীন করে দিয়ে গেছেন তিনি। কেউ শিষ্য হয় নি, তাঁর দুঃখব্রত দেখে বহন করতে এগিয়ে যায় নি মাছরঙ ঘরানার ঐতিহ্য। বৈকুণ্ঠ নট্ট, যজ্ঞেশ্বর নট্ট, ক্ষীরোদ নট্ট। শিশুবেলা থেকে এঁদের সম্পর্কে নানা কিংবদন্তি শুনেছি মায়ের মুখে। আমাদের পারিবারিক স্মৃতিতে এঁদের ঢোলের আওয়াজ বা 'মাছরঙ্ ঘরানা'র বোল বিশেষভাবেই জড়িত। ঐ সূত্রে বৈকুণ্ঠ-যজ্ঞেশ্বরের কথাই শুনেছিলাম—ক্ষীরোদ নট্টকে প্রথম দেখলাম বিশ বছর আগে দেশ-বিভাগের সূত্রে যখন আমার ও তাঁর একই অভিধা 'রিফিউজি'। তিনি কয়াডাঙার কলোনির বাসিন্দা, আমি বালক অশোকনগর কলোনির। তবু উৎসাহিত লোক-সাহিত্য-সংগীত ও গণশিল্পে। আমাদের সংগঠনের এক 'পূর্ণিমা সম্মেলন'-এর আসরে সেদিন ক্ষীরোদ নট্ট, শম্ভু ভট্টাচার্য ও ক্ষিতীশ বসু উপস্থিত। শম্ভু ভট্টাচার্যের 'রানার' নাচ দেখে আমাদের মতো তিনিও মুগ্ধ হয়েছিলেন। "মুরগী ক্যার-ক্যারায় ক্যারক্যারায় আণ্ডা পারে না" প্রভৃতি গানে ক্ষিতীশ বসু আসর মাতিয়ে তুলেছিলেন। কিন্তু তখনও বুঝতে পারি নি কী বিস্ময় শ্রোতাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। ক্ষীরোদ নট্ট তখনও তেজী আর উদ্দাম। শ্রোতাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর দুটি হাতের নির্দেশ মেনেই শ্রোতাদের মনোভুবনে রামধনুর এক একটি রঙ ফুটে উঠবে, মিলিয়ে যাবে। এবং হয়েও ছিল তাই। সমস্ত পূর্ণিমা সম্মেলন সুরেবোলে গতিতে জীবন্ত আনন্দের দ্যোতনা নিয়ে এসেছিল। ক্ষীরোদ

নট্ট আমাদের সদিচ্ছা দেখে 'আজীবনের সদস্য' হয়েছিলেন সংগঠনটির। কিন্তু আমাদের অক্ষমতাই বোঝা। অঙ্কুর বৃক্ষ হয় না এখন আর।

একটা সময় এল, সবাই ভুলেই গিয়েছিলাম নট্ট মশাইকে। শুধু নট্ট মশাইকে কেন বাঙলার লোকশিল্প লোকসাহিত্য লোকসঙ্গীতকেই বা কে কতটুকু মনে রেখেছি! মাঝে মধ্যে বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন হয়। সেখানে কলকাত্তাই বিলাসটা যতখানি, গোটা বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি আদর তার তুলনায় কতটা! কলকাতায় শুধু সভ্য-ভঙ্গি বজায় রাখার জন্যেই বুঝি ড্রইংরুমে শোভাসজ্জা হয় একখানা কালীঘাটের পট, বাঁকুড়ার ঘোড়া আর পুরুলিয়ার মুখোশ। রেডিওতে নানা ধরনের ব্যঞ্জনের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ 'হ' 'হা' যুক্ত পল্লীসংগীত লোক-সংগীত চাটনির মতো ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সঙ্গীতাসরে 'একতারা যাহাদের' তারা আজও যে কোনো প্রকৃত সম্মান পাচ্ছে না কেন তা বুঝতে পারা যায় না। যদি পেত, রেডিও নামক যন্ত্রে কি কোনোদিন ক্ষীরোদ নট্টর ঢোল বাদন শুনতে পেত না এ দেশ? কোথাও তা টেপ রেকর্ডারে তোলা থাকলেও থাকতে পারে (আছে হয়তো সত্যজিৎ রায়ের কাছে)। কিন্তু সে তো ব্যক্তিগত সম্পত্তি। যেমন রবি ঘোষ নাকি মাত্র দেড়শ টাকায় ক্ষীরোদ নট্টর একটা ঢোল কিনে নিয়ে গিয়ে নিজের ড্রইংরুমের কিউরিও করে রেখেছেন। এমনি সব কাজের মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই লোক-ঐতিহ্য প্রীতির পরিচয় সুস্পষ্ট হয় না। বাহ্যবস্তুর নিদর্শন ছিটেফোঁটা রক্ষা করা হয়তো যায়, কিন্তু সংগীত যন্ত্রসংগীতকে রক্ষা করা এবং নতুন যুগকে তার প্রতি উৎসাহিত করে ঐতিহ্যকে ধরে রাখা ও এগিয়ে নিয়ে চলার জন্যে যে সক্রিয় সাংগঠনিক কার্যক্রম, তা এদেশে নেই বললেই চলে। এ ব্যাপারে যদি সত্যিকারের কোনো উৎসাহ থাকত, তবে কি 'সাহিত্য পরিষদ'-এর মতো সংগঠনকে অমন দীনদশাগ্রস্ত হয়ে কেবল অস্তিত্ব বজায় রেখে যেতে হয়?

সে যাই হোক, এ দেশ ক্ষীরোদ নট্টর মতো শিল্পীর জন্যে যা করা উচিত ছিল তা করেনি। কেউ জানতে চায়নি তিনি কিরকমভাবে বেঁচে ছিলেন। তাঁর স্মৃতি বলে, তিনি অনেক পেয়েছেন: বাজনা শুনে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন, গান্ধিজী তাঁর গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিলেন খদ্দরের চাদর, নেতাজী দিয়েছিলেন খদ্দরের রুমাল, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ পিঠে চাপড় দিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন "সাবাস", প্রশংসা-বাক্য শুনিয়েছিলেন ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সঙ্গীতজ্ঞরা। অনেক পাননি কি? একজন শিল্পীর শিল্পস্বীকৃতিই তো সবচেয়ে বড় পাওয়া? কিন্তু হায়, শিল্পীরও

একটা পেট আছে একটা মাথা আছে। খাদ্য আর মাথা গুঁজবার মতো একটা ঠাঁই তারও চাই। চাই, কিন্তু এদেশে তা পরাধীন সময়েও পাওয়া যায় নি, স্বাধীন সময়েও এদেশ তা দিতে কৃপণ। ক্ষীরোদ নট্টকে মরতে হয়েছে অসীম দারিদ্র্যের মধ্যে ভাঙা ঘরে—তাঁর স্ত্রীর ক্যানসার এবং চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা নেই। শেষজীবনে নট্টমশাই দু বেলা দু মুঠো খেতে পান নি। বহু মানপত্র তিনি পেয়েছিলেন। সোনা রুপার মেডেলগুলো কিছু তবু উপকার করেছে। প্রাণে ধরে দিতে ইচ্ছে না করলেও তাঁকে তার কিছু কিছু বেচে দিতে হয়েছে শুধু কয়েকটা 'পেট'-এ শাক-ভাত নুন-ভাত জুগিয়ে যাবার জন্যে।

দারিদ্র্যকে নট্ট মশাই অস্বীকার করেন নি, বরং সহজভাবে স্বীকারই করে নিয়েছিলেন। একমাত্র পুত্র নারায়ণ নট্ট—নট্ট কোম্পানির যাত্রাদলে সাড়ে তিনশো টাকা বেতনে ক্লারিওনেট বাজাত। তার মৃত্যুর পর থেকে দারিদ্র্যই হয়েছিল গোটা পরিবারের নিত্যসঙ্গী। ছেলের মৃত্যুর আগে তিনিও নবদ্বীপের এক সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ করতেন—বাড়ি পাঠাতে পারতেন একশ টাকা করে। কিন্তু সেও যায় বন্ধ হয়ে। ফলে অসীম দারিদ্র্য। খাইয়ে তবু পাঁচ-ছ জন। সংগীত-নাটক একাডেমি মানপত্রের সঙ্গে দু-হাজার টাকার একটা চেক যেমন দিয়েছে, তেমনি হয়তো কোনো কোনো সময় তিনি দু-তিনশো টাকা সম্মানীও পেয়েছেন, তবে তা হয়েছে তপ্ত বালুকায় বারি বিন্দুরই সমান। ক্ষুধাকে শান্ত করতে তিনি পারেন নি একদিনও। যখন খেতে পেতেন না, ভালোমন্দ খাবার সাধ যখন জাগত, নট্ট মশাই নাতি-নাতনীর কাছে গল্প বলতেন —ত্রিপুরার রাজবাড়িতে, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর বিয়েতে এবং অন্যান্য বড়লোক জমিদার ও রাজারাজড়ার বাড়িতে ঢোল বাজাতে গিয়ে কবে কী খেয়েছেন। বলেছেন, "তোরা হেয়া চউখ্যেও দেখবি না কোনোকালে।" চোখে ওরা দেখবে কি করে, একটা গরুর দুধ বেচে, সাধারণ বিয়ের মিছিলে ঢোল বাজিয়ে এবং পঞ্চাশ টাকা মাসিক সরকারী সাহায্য নিয়ে সর্বসাকুল্যে যা হয় তাতে স্বপ্নেও নুনের ওপর শাকচচ্চড়ির বেশি দেখা যায় না। লোকশিল্পীর শেষ জীবন তবু স্মৃতি-রোমন্থনে পেতে চেয়েছে পরিতৃপ্তি।

আসল কথা, 'ঢুলি' এবং 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন'-এর নেপথ্য ঢোল বাদক ক্ষীরোদ নট্ট জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের ঢোলবাদক ক্ষীরোদ নট্টর চেয়ে বেশি পরিচিত হলেও, অর্থকষ্ট তাঁর ঘোচে নি, জাতীয় সরকারও দেয় নি মাসিক পঞ্চাশ টাকার অতিরিক্ত সম্মান-ভাতা।

'মাছরঙ' ঘরানার শ্রেষ্ঠ ঢোলবাদক যজ্ঞেশ্বর নট্টর সুযোগ্য শিষ্য ক্ষীরোদ

নট্ট আজ আর নেই। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে 'মাছরঙ' ঘরানাও অবলুপ্ত। কিন্তু এ ঘরানাকে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব ছিল না। 'রবীন্দ্র ভারতী' তো তৈরি হয়েছিল সংগীত-নাটক শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবেই। সেখানে যদি ক্ষীরোদ নট্টকে সামান্য একটু ভূমি-কোণ দেয়া যেত, অথবা বেঙ্গল মিউজিক কলেজের মতো প্রতিষ্ঠান যদি লোকশিল্পীকে একটু গুরুত্ব দিত, হয়তো তবে এই বিশিষ্ট ঘরানা-টিকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা যেত। তাঁর সাত পুরুষের ঢোলটি এখন হয়তো কোনো বিলাসীর ড্রইং রুমে শোভা হতে যাবে—দারিদ্র্যের জ্বালায় সেটিকে হয়তো দু-একশ টাকায় বিক্রি করে দিতে বাধ্য হবে তাঁর ক্ষুৎকাতর পরিবার। কিন্তু তারপর কিভাবে বাঁচবে মৃত শিল্পীর পরিবারটি! শিল্পীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সরকার, নিয়ম রাখতে গিয়ে, হয়তো শিল্পীকে যে আর্থিক সাহায্যটুকু দিতেন, তা বন্ধ করে দেবেন। এর পর উপার্জনের উপায়হারা পরিবারটিকে বানের জলে ভেসে যেতে হবে। অতিবৃদ্ধা ক্ষীরোদামণি অসুস্থা, বিধবা পুত্রবধূ গীতা নট্ট স্থানীয় স্পিনিং মিলে একটা চাকরির আবেদন-নিবেদন করে হতাশ, নাতি দুটি ছোট—নাতনীও তাই। লক্ষ লক্ষ টাকা যে দেশ সেমিনার-প্রদর্শনীর জন্যে ব্যয় করে সে দেশ কি শিল্পীর এই পরিবারটিকে রক্ষা করার জন্যে একটু সক্রিয় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে না? পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে পারে না শিল্পীর ভাঙা-কাঁচা ঘরটিকে পাকা করে দিতে? শিল্পীর স্মৃতিকে রক্ষা করার জন্য তাঁর বাসস্থানটি সংরক্ষণের দায়িত্ব কি সরকার নেবেন না? ক্ষীরোদ নট্টর নামে সরকার তো এটিকে একটি বাদ্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও পরিণত করতে পারেন। মনে রাখতে হবে, কয়াভাঙার এই বাড়িটি নট্ট কলোনিতেই। চারপাশে বরিশালের নট্টরা। এখানে একটি 'স্কুল' তৈরি হলে এবং ক্ষীরোদ নট্টর সম্পর্কে ভাগনে শরৎ নট্টকে বা অন্য যোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়ে সরকার যদি প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন এবং শিল্পীর স্মৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন তবে 'মাছরঙ' ঘরানার লোকশিল্পটি আমূল বিনষ্টির হাত থেকে হয়তো কিছুটা রক্ষা পেতে পারে।

কিন্তু হায় আমাদের দেশ, "একটা মনোমত স্টেজের অভাবে এই বয়সেও শম্ভু মিত্রকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয়", এই কলকাতায় এক চিলতি জমি পাওয়া যায় না নবনাট্য আন্দোলনের নাট্যাচার্য শম্ভু মিত্রের আকৈশোর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে। প্রাণ খুলে তো দুরস্থান, সৃষ্টিমূলক কাজ করার সামান্য সুযোগ পান না নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য। শুধু তাঁরা কেন, কত প্রবীণ নবীন শিল্পীই তো এই সুযোগের অভাবে সৃজনশীলতার যথার্থ পরিচয় দিতে পারছেন

না। একদিকে মনোপলি কারবারির চূড়ান্ত মুনাফাসংগ্রহের ষড়যন্ত্র—যতটুকু তার মুনাফা লুণ্ঠনের সহায়ক ঠিক ততটুকুকেই ঐতিহ্য ও সুস্থ জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে সে তার কারবারে ব্যবহার করে, অন্য দিকে সরকারী ঔদাসীন্য। যার ফলে, লোকসংগীত শিল্পসংস্কৃতি—গণশিল্প বিকাশের এবং প্রকাশের যোগ্য সুযোগ পায় না। সদিচ্ছা যাদের আছে, তাদের ক্ষমতা নেই, অর্থাৎ "যার হাত আছে তার ভাত নেই, যার ভাত আছে তার হাত নেই।" কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেই যাদের সদিচ্ছা আছে তাদের সংগঠিত হতে হবে জাতীয় শিল্পসাহিত্যসংস্কৃতিকে সার্থকতার চূড়ায় পৌঁছে দেবার জন্যে। একত্রিত হতে হবে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের নায়কদের। আমাদের অঙ্গীকার, আমরা তাদের সঙ্গে আছি এবং থাকব।

ক্ষীরোদ নট্ট আজ আর নেই। দেশজোড়া এখন শোক। কিন্তু মৃত্যুর পরে চোখের জল ফেলে শোকপ্রকাশ করার চেয়ে শিল্পীকে শারীরিক ও মানসিক ভাবে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নেওয়াটা অনেক বেশি জরুরী। বাস্তব দুঃখকে শিল্পী হয়তো বহন করতে পারেন, কিন্তু শিল্প নিয়ে তাঁর যে আভ্যন্তরিক দুঃখ, তা দুঃসহ। তাই মৃত্যুর আগে ক্ষীরোদ নট্টকে উত্তরাধিকারীর হাতে বেঁচে বত্তে থাকার সম্পদ গুরু যজ্ঞেশ্বরের দেওয়া সাধের ঢোলটি তুলে দিয়ে যেতে না পেরে আক্ষেপ করে বলতে হয়েছে, "গরমেণ্টও বাজনাডা শেখানের কিছু করল না, নাতিডারেও মানুষ কইর‍্যা যাইতে পারুম না।"

এই করুণ কথার পুনরাবৃত্তি যাতে আর কারোর মুখ থেকে শুনতে না হয়, তা দেখা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব।

সত্য গুহ

শচীন কর্তা

বম্বের থেকে ফিরছিলাম ট্রেনে ৩০শে অক্টোবর। এলাহাবাদ হয়ে ফিরব। ৩১শে-র রেডিওর ঘোষণা এক সহযাত্রীর ট্রানসিসটর মারফৎ শুনলাম, হঠাৎই কানে গেল, আমাদের গুরুস্থানীয় পরম শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু শচীন কর্তা আর আমাদের মধ্যে নেই। আকস্মিক বজ্রপাতের মতোই এই নিষ্ঠুর ঘোষণা। অবশ্য ইদানীং তাঁর শরীর, কয়েক বছর থেকেই, রোগাক্রান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আততায়ী,

দুরারোগ্য ডায়েবেটিস। ট্রেনে যেতে যেতে, বহির্নিসর্গের সমস্ত আলো যেন হঠাৎ নিভে গেল। অন্যমনস্কভাবে ট্রেনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে স্মৃতির অতল থেকে প্রায় চল্লিশ বৎসর আগেকার শচীনদার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ-কারের দিনগুলি একে একে উদ্‌ঘাটিত হতে লাগল।

আমি তাঁকে উনিশ'শ পঁয়ত্রিশ সালে প্রথম দেখি আমার সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজের বন্ধু কমল চৌধুরীদের এক সঙ্গীতের আসরে। যতদূর মনে পড়ে, কবি অজয় ভট্টাচার্যও ছিলেন সেই আসরে। ছিপছিপে গৌরবর্ণ অভিজাত ত্রিপুরার রাজপুরুষদের ছাপ চোখে মুখে। অত্যন্ত অমায়িক এক ব্যক্তিত্ব। উচ্চারণে গায়ন ভঙ্গিতে এক অভিনব নান্দনিক অনুভূতির দ্যোতনা। এরকম পূর্বে আর শুনি নি। এক অনন্যসাধারণ সাঙ্গীতিক প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত হলাম সেদিন। এ যেন এক অভিজাত পূর্ব বাঙলার বাউল শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে পরিশীলিত পরিমার্জিত হয়ে এক অভাবনীয় ঔজ্জ্বল্যে প্রকাশিত হলেন। কিছু পরে নানাভাবে, নানা অনুষঙ্গে তাঁর কাছে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল। কোনো এক সময় আমাদেরই পাড়ায় রাজা বসন্ত রায় রোডের এক বাড়িতে থাকতেন। একটা সঙ্গীতের পরিবেশে বাড়িটা মুখরিত হত। দরজার ওপরে লেখা ছিল 'সুর-তীর্থ'। রাস্তার থেকে সেটা দেখা যেত। সার্থক নাম। সকাল সন্ধ্যায় তানপুরার আওয়াজ ও কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে মাঝে মাঝে গিয়ে বসতাম তাঁর সঙ্গীতসাধনার আসরে। আবহাওয়ায় থাকত এক রোমান্টিক সঙ্গীত-জগতের সৌরভ, এক অপূর্ব শিল্পসমাহিতি। সে আসর ছেড়ে আসার পরও, একটা নেশার মতো লেগে থাকত সুরের আমেজ। আরও অন্তরঙ্গ হলাম কিছু পরে, আমার সঙ্গীতগুরু শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। সপ্তাহে অন্তত দু-দিন সন্ধ্যায় তালিমের আসর বসত। একদিন দেখি শচীন কর্তা আগেভাগেই তানপুরা নিয়ে বসে গেছেন। তিনি ভীষ্মদেবের কাছে বাঙলায় রাগসঙ্গীতের বিশেষভাবে তালিম নিতেন। সঙ্গে সঙ্গে চলত পুরো শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিক্ষা ও কণ্ঠসাধনা। সেদিন, মনে পড়ে, পুরিয়া রাগের বিখ্যাত গান "সপুনেমে আয়েরি" তালিম চলছিল। সঙ্গে আমার এক সতীর্থ কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন। এবং মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃদেব শৈলেন দা-ও তানপুরা ছাড়ছিলেন। আমরা সকলে একে একে গানের অস্থায়ী আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছিলাম। ক্রমে পুরিয়া রাগের ভাবমূর্তি আলাপে বিস্তারে তানে ফুটে উঠতে লাগল। ভীষ্মদেব স্বয়ং গান ধরলেন এবং পুরিয়ার কোমল ঋষভের বিশিষ্ট স্বরপ্রয়োগটি দেখাতে লাগলেন। কত রাত অবধি এই সঙ্গীতসাধনা চলেছিল ঠিক মনে নেই।

মনে হয় শেষরাত্রে শেয়ারে ট্যাক্সি করে বাড়ি ফিরেছিলাম। শচীন কর্তাও সঙ্গে ছিলেন। এরকম গানের তালিমের আসর সপ্তাহে দু-তিন বসত। এই সব আসরে শচীন কর্তাকে এক তন্ময় সঙ্গীতসাধক রূপে দেখেছি। রাগপ্রধান গানের তালিম তিনি বিখ্যাত অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-র কাছেও নেন। খলিফা বাদল খাঁর ঘরানার তালিমও তাঁর ছিল।

এর কিছু পরে 'ওদেয়ন ক্লাব' নাম দিয়ে এক সঙ্গীতসংস্থার সৃষ্টি হয়, যার মুখ্য উদ্দেশ্য শাস্ত্রীয় সঙ্গীত প্রচার। এবং ঘুরে ঘুরে পালা করে এক একজনের বাড়িতে গানের আসর বসত। শচীনদাও এই ক্লাবের সভ্য ছিলেন। ওদেয়ন্ ক্লাবের গানের আসর বেশ কিছুদিন ধরে চলে। তদানীন্তন কালের অনেক বিখ্যাত শিল্পীরা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিখ্যাত সরোদবাদক রাধিকামোহন মৈত্র, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, কেরামৎ উল্লা খাঁ, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, মণ্টু ব্যানার্জী, ধীরেন্দ্র মিত্র প্রমুখ অনেকেই এর সভ্য ছিলেন। এই সব আসরে শচীনদা রাগাশ্রিত গান অনেকবার গেয়েছেন। সুরসাগর হিমাংশু দত্ত, নজরুল ও অজয় ভট্টাচার্যের গানই তিনি গাইতেন। এবং যখনই গাইতেন, তখনই ঐ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসরেও এক অভূতপুর্ব সঙ্গীত-পরিবেশের সৃষ্টি হত, যা তাঁর গায়ন ভঙ্গি ও অনবদ্য কণ্ঠস্বরের স্বকীয়তায় উজ্জ্বল ও বিশিষ্ট হয়ে উঠত। বাঙলায় রাগাশ্রিত গানে কৃষ্ণচন্দ্র দে, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী ও ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে শচীন কর্তারও একটি বিশিষ্ট ও অভিজাত স্থান গড়ে উঠেছিল। এ স্থান পূরণ করবার মতো শিল্পী আর তো কাউকে দেখি না। আমি ইচ্ছা করেই বম্বের ফিল্মী জগতের এস. ডি. বর্মণের কথা উল্লেখ করলাম না। কারণ সে এস. ডি. বর্মণের সঙ্গে পরিচয় ছিল খুবই, তবে হৃদ্যতা ছিল না। অবশ্য ফিল্মী জগতে শচীন কর্তার সাঙ্গীতিক অবদান অগ্রাহ্য করবার মতো নয়। ফিল্ম-সঙ্গীতের জগতেও সুরস্রষ্টা হিসাবে তিনি এনেছিলেন এক স্বকীয় নূতন ভঙ্গি, নূতন ছন্দ, নূতন সুর। সেখানে তিনি অদ্বিতীয় ও অনবদ্য।

রাতের ট্রেন। উদ্দাম গতিতে একের পর এক ষ্টেশন পেরিয়ে চলেছে। সহযাত্রীরা নিদ্রামগ্ন। আমার বিভাবরী জানলার দিকে তাকিয়ে জাগরণেই যাচ্ছে। বিদিশা ষ্টেশন পেরিয়ে গেল। এবার গতি জব্বলপুরের দিকে। আমার স্মরণের বিদিশা কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশকে ছুঁয়ে আবার শচীন কর্তাকে নিয়ে মগ্ন হয়ে পড়ল। একদিন হঠাৎ মোহন বাগান-ইষ্টবেঙ্গলের খেলার মাঠে দেখা। খুব হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে ইষ্টবেঙ্গলের দলকে উৎসাহ

দিচ্ছেন। দেখলাম খেলার সম্বন্ধে প্রচণ্ড উৎসাহ। বললেন, স্কুল-কলেজে ছাত্রাবস্থায় ফুটবল খেলেছেন। খেলার মাঠের ভিড় এড়িয়ে একটু ঘুরে রেড রোড ধরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পর্যন্ত হাঁটলাম। তাঁর শৈশব বাল্যজীবন সম্বন্ধে, আমার প্রশ্নের উত্তরে, গল্প করতে করতে চললেন। প্রাসাঙ্গিকভাবে ত্রিপুরার মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের কথা এল। এল শ্রীহট্টের হরি আচার্যের প্রসঙ্গে—পূর্ব বাঙলার ভাটিয়ালী, বাউল, ঢপ্ কীর্তনের কথা। আগরতলার সাহেবালী ফকিরের কথা। তাঁর ওপর লোকসঙ্গীতের প্রভাবের মূল সূত্র খুঁজে পাওয়া গেল এই সব গল্পের মাধ্যমে। ত্রিপুরা ও লোকসঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর মার্মিক যোগ থাকা সত্ত্বেও, তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতচর্চার মূল্য উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর সঙ্গীতমানসের ধারা দুই খাতে প্রবাহিত হয়েছিল—লোক সঙ্গীতের ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের। এর ভিতর কোনো অন্তর্বিরোধ তিনি উপলব্ধি করেন নি। আজকাল লোকসঙ্গীতের আসরে "ঘরানা" আর "বাহিরানা" কথার উল্লেখ হয় বিতর্কমূলকভাবে। আসল কথা, এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে "ঘরানা"ই "বাহিরানা" হয় এবং "বাহিরানা" হয় "ঘরানা"। কারণ সঙ্গীতসত্তার মৌল গভীরে ঘর বাহির একই হয়ে যায়। তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পশ্চিম ভারতের লোকসঙ্গীতের ভিতর পাওয়া যায়। তা ছাড়া, এটা তো সুপ্রতিষ্ঠিত যে, বহু বিখ্যাত বিখ্যাত শাস্ত্রীয় রাগ রাগিনীর মূল সূত্র লোকসঙ্গীত থেকেই এসেছে। সঙ্গীতের সার্বভৌমসত্তার অন্তঃপুরে—ethnic groupings, ecology ও শ্রেণীবিন্যাসটাই শেষ কথা নয়। গানের ভিতর, বিশেষ করে লোকসঙ্গীতের ভিতর, কেবল মাত্র প্রতিবাদ, সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্ব থাকবেই এমন কোনো কথা নয়। নিশ্চয়ই কিছু কিছু গানে শোষণ, সামাজিক বৈষম্য, সংঘর্ষ, জীবনযন্ত্রণার কথা থাকে এবং থাকবেই এবং সেটাও সবসময় যে পূর্ণ বোধের ভিতর থেকে আসে তা নয়। কিন্তু সেটাই সব কথা নয়, সব গানও নয়। গানে নান্দনিক অনুভূতির মুখ্য ও মৌল স্থান আছেই। আমি তখন Marxism-এর গোঁড়া ছাত্র! শচীন কর্তার সঙ্গে সঙ্গীত প্রসঙ্গে তখন মাঝে মাঝে তর্কবিতর্ক চলত। তাঁর সঙ্গে অনেক বিষয়েই মতান্তর হত। তখন পারি নি, কিন্তু এখন উপলব্ধি করতে পারি, শচীন কর্তার অনেক বিচার ও সিদ্ধান্ত ঠিকই ছিল। কারণ এর ঠিক পরের যুগেই, যখন আমরা গণনাট্য আন্দোলনের নেতৃত্ব করছি, গান লিখছি, শচীন কর্তা আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং প্রত্যক্ষভাবে না হোক, পরোক্ষভাবে নানাভাবে আমাদের উৎসাহিত করেছেন, আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন। এবং শেষে নিজেও এই গণনাট্য

আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এই আন্দোলনের পিছনে যে ভাবমূর্তি, ideology ছিল, তাকেও সমর্থন করতেন।

এই সময় একদিন, ১৯৪৪-এ, শচীনদাকে সশরীরে নিয়ে আসা গেল ৪৬ ধর্মতলার আড্ডায়। তখন আমাদের গণনাট্যের মহড়া, প্রস্তুতি ইত্যাদি পুরোদমে চলছে। আমাদের এই গণনাট্য আন্দোলনের এইরকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও উজ্জ্বল কর্মকাণ্ড দেখে শচীন কর্তা খুব খুশি। তাঁর গানের আসর বসল। প্রকাণ্ড হলঘর ভরে উৎসুক উদ্‌গ্রীব শ্রোতার দল। মনে আছে, প্রায় দুঘণ্টা ধরে অনেক গানই গাইলেন, সবই লোকসঙ্গীতের আঙ্গিকে। তার মধ্যে দুটি গানের স্মৃতি এখনও অম্লান ভাস্বরতায় স্মরণের নক্ষত্র হয়ে জ্বল জ্বল করছে। একটি—"আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে, ছাইয়া দে রে টুই, আল্লা ম্যাঘ দে"—। মনে আছে এ গানটি শুনে আমরা অনেকেই খুব অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। পরে বিজন গণনাট্যের এক Conference-এ, "আল্লা ম্যাঘ দে" গেয়েছিল এক বৃদ্ধ মুসলমান চাষী সেজে। হাতে বাঁকা লাঠি। আর এক হাত ধরে রয়েছে ছোট্ট নাতি (বিজনেরই ছোট বোন, নাতি সেজেছিল)। সমস্ত Conference-এ এই গানটি চমক লাগিয়ে দিয়েছিল।

শচীনদার আর একটি গান, যা মনের মধ্যে অবিস্মরণীয়ভাবে গেঁথে রয়েছে, সেটা হচ্ছে—"রঙ্গিলা রঙ্গিলা রঙ্গিলা রে, আমারে ছাড়িয়া বন্ধু কোই গেলা রে—"। অত দরদভরা গান, লোকসঙ্গীতের শৈলীতে, আমি আর শুনি নি। রঙ্গিলা বন্ধুর বিরহে তার সঙ্গিনীর আকুতি যেন অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ঝরে পড়ছে। সেদিন অনেক শ্রোতাদের চক্ষুই অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। আজ শচীন কর্তা আর নেই। চলন্ত ট্রেনের কামরায় জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখছি শেষ রাতের ম্লান চাঁদের আলোয় ব্যথাতুর প্রান্তর ট্রেনের গতিবেগে দ্রুত অপস্রিয়মান। নিদ্রাচ্ছন্ন গ্রাম। ছোট ছোট পাহাড়ের সারি। আর মনের মধ্যে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে ডানা ভাঙ্গা পাখির মতো—"রঙ্গিলা রে! আমারে ছাড়িয়া বন্ধু কোই গেলা রে—"।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

তারাপদ চক্রবর্তী

বিংশ শতকের সত্তরের দশকে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত জগতে আবার ইন্দ্রপাত ঘটল সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর মৃত্যুতে। আমাদের বিশেষত বাঙালি জাতির পক্ষে এই ক্ষতি অপূরণীয়।

সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর জন্ম এই শতকের গোড়ার দিকে। ১৯০৯ সালের ১লা এপ্রিল পূর্ব বাঙলার (বর্তমান বাঙলাদেশে) ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া পরগণার পশ্চিমপাড় গ্রামে এক বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারে এঁর জন্ম। বাবা কুলচন্দ্র চক্রবর্তী এবং জ্যেষ্ঠতাত পণ্ডিত রামচন্দ্র চক্রবর্তী উভয়েই ছিলেন স্বনামখ্যাত পুরুষ। সংস্কৃত বিদ্যায় ও পাণ্ডিত্যে এঁদের প্রচণ্ড খ্যাতি ছিল। সঙ্গে সঙ্গে কলাবিদ্যায়ও সুনাম অর্জন করেছিলেন। এঁরা দুজনেই ছিলেন সুগায়ক। দিল্লী ঘরানার বিখ্যাত ওস্তাদ জহুর খানের কাছে এঁরা গান শিখেছিলেন। ফলে দিল্লী ঘরানার প্রকৃত গায়কী ও বৈশিষ্ট্যকে এঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে আয়ত্ত করেছিলেন। তারাপদ চক্রবর্তী জন্ম থেকেই কাব্য-সাহিত্য আর সুর এই তিন পরিমণ্ডলে মানুষ হতে থাকেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের প্রতি অদম্য ঝোঁক দেখা যায়। যেখানেই গানের সভা বালক তারাপদ সেখানেই হাজির। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্থির অবিচলভাবে গান শুনে চলেছে। অনেকেই অবাক হতেন এই বালকের এমন স্থৈর্য দেখে। বাবা, কাকা বিস্মিত হলেন বালকের কণ্ঠে গান শুনে, সুমধুর কণ্ঠস্বরে হলেন মুগ্ধ। স্থির করলেন বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতশিক্ষাও দেবেন।

এভাবেই প্রথম জীবনে তারাপদ চক্রবর্তীর সঙ্গীতশিক্ষা শুরু হয় বাবা ও জ্যেষ্ঠতাতের কাছে। এর কয়েক বছর বাদে যখন কৈশোরে পা দিয়েছেন, তারাপদবাবু চলে আসেন কলকাতায়। ঘরবাড়ি, আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে নিঃস্ব সহায়সম্বলহীন অবস্থায় এই শহরের বুকে ঘুরে তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে বেড়াতে থাকেন গান শেখার জন্যে। পরিচিত দু-একজন আত্মীয়স্বজনের কাছে গেছেন কিন্তু কোথাও ঠাঁই মেলেনি। যখনই তাঁরা শুনেছেন নেহাতই গান শেখার জন্যে ছেলেটি এসেছে, তখনই তাঁরা হয়েছেন বিরূপ। অগত্যা রাস্তার ফুটপাতে আশ্রয় নিতে হয়েছে। বেশির ভাগ দিন খিদের জ্বালা মেটাতে হয়েছে কলের জলে। এইভাবে যখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখন কোনোরকমে ঠাঁই পেলেন মামার বাড়িতে। এই মামার সঙ্গে অন্ধগায়ক সাতকড়ি মালাকারের বন্ধুত্ব ছিল। সেই সুবাদে মামার চেষ্টায় তারাপদবাবুর সঙ্গে সাতকড়ি মালাকারের যোগাযোগ ঘটে এবং তিনি ওঁর কাছে তালিম নিতে থাকেন। এইভাবে আবার নতুন করে গানের তালিম শুরু হল। সাতকড়িবাবু ছিলেন গোয়ালিয়র ঘরানার ধারক। এই ঘরানার তালিম পেলেন এঁর কাছ থেকেই। পরবর্তীকালে তারাপদবাবুর সঙ্গীতশিক্ষা গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর কাছে। গিরিজাবাবুর গায়নভঙ্গি ছিল রামপুর ঘরানার। যদিও তিনি (গিরিজাবাবু) ধ্রুপদ শেখেন রাধিকা গোস্বামীর

কাছে এবং ঠুংরির তালিম নেন মৈজুদ্দিন খাঁ-এর কাছে কিন্তু মূল তালিম নিয়ে ছিলেন ভাইয়া গণপৎ রাও আর ইনায়েৎ হোসেন খাঁ (রামপুর)-র কাছে। উনবিংশ শতাব্দীর এক অনন্য সাধারণ কণ্ঠশিল্পী ছিলেন এই গিরিজাবাবু। যেমন সুরেলা আওয়াজ তেমনি গায়নশৈলী। সব মিলিয়ে তাঁর মতো গাইয়ে সে যুগে আর কেউ ছিল না। সেই গিরিজাবাবুর কাছে তারাপদবাবুর শেষ শিক্ষা। গিরিজাবাবু যেমন তাঁকে স্নেহ করতেন তেমনি অকৃপণ হৃদয়ে সবকিছু উজার করে শিখিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে গিরিজাবাবুর সঙ্গে তারাপদবাবুর যোগাযোগের ঘটনাটা বলি। সেটা যেমন চমকপ্রদ তেমনি মজার। ঘটনাটা হচ্ছে এইরকম :

তারাপদবাবু তখন তবলচির চাকরি করেন রেডিওতে। সেদিন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর গান ব্রডকাস্ট করা হবে। কিন্তু সময় পেরিয়ে যায় জ্ঞানবাবুর খোঁজ নেই (তখন রেকর্ডিং-এর ব্যবস্থা ছিল না। সরাসরি ব্রডকাস্ট হত)। সকলেই উদগ্রীব। কি করা যায়? কোনো শিল্পী নেই যাকে গাইতে বসানো যেতে পারে? এমন সময় একজন রাইবাবুকে (রাইচাঁদ বড়াল) এসে খবর দিলেন যে যদি তিনি অনুমতি করেন তো তারাপদ চক্রবর্তীকে দিয়ে আপাতত গাইয়ে দেওয়া যায়—সে নাকি ভালোই গাইতে পারে। প্রথমে অবিশ্বাস্য হলেও গান শুনে আর আপত্তি করলেন না। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর পরিবর্তে গান গাইতে বসলেন তারাপদ চক্রবর্তী। ব্রডকাস্ট হবার পর অনেকেই খোঁজ করতে থাকেন কে এই শিল্পী। আবার কয়েকজন রাইবাবুর কাছে প্রতিবাদ করেন যে নির্দিষ্ট শিল্পীর গান হওয়া সত্ত্বেও অন্য শিল্পীর নাম ঘোষিত হল কেন?—আসলে নির্দিষ্ট শিল্পীর মতো হুবহু আগাগোড়া গেয়ে গেলেন তারাপদবাবু। ফলে অনেকেরই বিভ্রান্তি জেগেছিল। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল রেডিও-প্রচারিত এই গান শুনে গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী এই তরুণশিল্পীকে ডেকে পাঠান এবং সেদিন থেকেই তাঁকে ওঁর শিষ্যরূপে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। গিরিজাবাবুর সঙ্গে যোগাযোগের এই হল মুখবন্ধ।

এরপর অনেক খাড়াই উৎরাই পেরিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে যখন পৌঁছলেন, তখন তারাপদ চক্রবর্তী—এই নাম সর্বজনবিদিত, সর্বজনপ্রিয়। আর এই জনপ্রিয়তার অন্যতম মূল কারণ ছিল ওঁর গায়নভঙ্গি। যে গায়নভঙ্গির সঙ্গে বিশেষ কোনো ঘরানার মিল নেই অথচ সব মিলিয়ে একটা নতুন আবেদন, নতুন পথ, নতুন রং, নতুন ঢং, তার চমক আর তার জৌলুস শ্রোতাদের কম বিস্মিত করল না। এর কারণ দিল্লী, গোয়ালিয়র, রামপুর প্রভৃতি ঘরানায় একনিষ্ঠভাবে তালিম নেওয়ার পর নিজের ভাবকল্পনায় আলাদা একটি গায়নভঙ্গি একটি রূপকল্প গড়ে

তুলেছিলেন, যা পরবর্তীকালে জননন্দিতই নয়, তারাপদবাবুর স্টাইল বা তারাপদবাবুর ঘরানা বলে চিহ্নিত হয়ে গেল। কি অসামান্য প্রতিভা থাকলে তবে এমনটা সম্ভব! ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতে একটি নতুন ঘরানার জন্ম হল 'তারাপদ ঘরানা'। স্বরশিল্পী তারাপদ চক্রবর্তীর এটাই সবচেয়ে বড় অবদান ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে, একথা বললে অত্যুক্তি করা হবেনা। দ্বিতীয়ত বাঙলা ভাষায় বিলম্বিত এবং দ্রুত খেয়ালের প্রচলন সর্বপ্রথম তিনিই করেন। রেডিওতে বাঙলা খেয়াল উনিই প্রথম চালু করেন। তৃতীয়ত বাঙলা রাগপ্রধান গানের আজকের এই জনপ্রিয়তার মুল কারণ তারাপদ চক্রবর্তী। বলা চলে বাঙলা রাগপ্রধান গানের প্রকৃত জনক তিনিই। হাজার খানেক গান তিনি রচনা করেছেন। বিভিন্ন রাগরাগিনীতে সেগুলির স্বর সংযোজন করেছেন— আসরে আসরে গেয়ে শ্রোতাদের মাৎ করেছেন। দু-একটি রেকর্ড আজও তার সাক্ষী। চতুর্থত ওঁর সৃষ্ট রাগগুলি প্রথম প্রকাশকালেই সর্বভারতীয় গুণী সমাজে যে স্বীকৃতি ও সমাদর পেয়েছে একমাত্র আলাউদ্দীন খাঁ, রবিশঙ্কর ও আলী আকবর খাঁ ছাড়া আর কোনো শিল্পীর এই সৃজনক্ষমতা দেখা যায় নি। ওঁর সৃষ্ট রাগগুলি হচ্ছে: ছায়াহিন্দোল, নবমালিকা, নবশ্রী ও অহল্যা।

আর একটি ব্যাপারেও তাঁর প্রায় তুলনা নেই। তা হচ্ছে দেশময় ছড়ানো তাঁর অগণিত ছাত্রছাত্রীর সাফল্য ও খ্যাতি। এটাই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা।

গত ১লা সেপ্টেম্বরের পর থেকে প্রিন্স আনোয়ার শা রোডের 'ছায়াহিন্দোল' নামের সেই বাড়িতে স্বরসম্রাট তারাপদ চক্রবর্তীর কণ্ঠস্বর আর শোনা যাবে না—এর চেয়ে শোকাবহ ঘটনা আর কী আছে!

উত্তম ভরদ্বাজ

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

দীর্ঘ অসুস্থতার শেষে গত ২রা জানুয়ারি দুপুরে তাঁর টালার বাড়িতে বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম প্রবীণ কথাশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু ঘটেছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। শেষের দিকে শরীরে জরা ও ব্যাধি এসে আশ্রয় নিচ্ছিল, ফলে আর লিখতে পারতেন না তিনি।

'কয়লাকুঠি' নামে একটি বিখ্যাত গল্প নিয়েই তৎকালীন 'প্রবাসী'-তে প্রথম

তাঁর আত্মপ্রকাশ। পরে এই নামে তাঁর একটি গল্পগ্রন্থও বেরোয়। পৃথিবীর রোদ-জল-আবহাওয়া থেকে দূরে অনেকটা নীচে প্রকৃতির ভয়ঙ্কর মৃত্যুফাঁদে বসে যে মানুষ কালিমাখা ঘর্মাক্ত দেহে গাঁইতি চালিয়ে এক অন্ধকার জগত থেকে তুলে আনছে সভ্যতার ইন্ধন, সেই অশিক্ষিত সরল লাঞ্ছিত মানুষগুলোর বেঁচে থাকার সংগ্রামকেই বাঙলা সাহিত্যে প্রথম নিয়ে এলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। শুধুমাত্র নিম্নস্তরের মানুষজনই নয়, তাদের অশিক্ষিত আঞ্চলিক ভাষাকে কি করে কথাসাহিত্যে নিয়ে এসে চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলা যায় সে ব্যাপারেও শৈলজানন্দের দান অনস্বীকার্য। তাঁর 'কয়লাকুঠি'-র অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলোতে ধাওড়ার সাঁওতাল কুলিকামিনদের বঞ্চিত অত্যাচারিত জীবনের অসহনীয় দারিদ্র্য, দারিদ্র্যের সঙ্গে বেঁচে থাকার সংগ্রামকে তিনি বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই তুলে ধরেছেন। ফলে বাঙলা উপন্যাসকে বাস্তবতা-অন্বেষার নতুন মাত্রা যুক্ত হল। বাঙলা গল্প-উপন্যাসে শৈলজানন্দের অবদান ঐতিহাসিক। তিনি তাঁর কালে যুদ্ধপূর্ব দেশকালের পরিধিতে সামাজিক জীবনযাত্রার মধ্যে অসম্ভব দারিদ্র্য, হতাশা ও অজ্ঞতার মাঝখানে আশার আলো খুঁজতে গিয়ে খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন; তাই তাঁর রচনায় এসে পড়ে অতিরিক্ত দুঃখবাদ। এসে পড়েছে কখনো নেতিবাদের সুর। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে তাঁর—'ভঙ্গুর', 'গরীব' 'নারীমেধ' 'ধ্বংসপথের যাত্রী ওরা', 'বদলি-মজুর' ইত্যাদি বিখ্যাত গল্পগুলো। সেখানেও তাঁর এই চিন্তাধারার পরিচয় স্পষ্ট। তবে অতিরিক্ত দুঃখবাদ বা নেতিবাদ থাকলেও শেষপর্যন্ত কিন্তু শৈলজানন্দের চরিত্ররা দুঃখের ভেতরেই শেষ হয়ে যেতে চায় না। এইখানেই শৈলজানন্দের সার্থকতা।

কাজী নজরুল ইসলামের বাল্য সুহৃৎ, 'কল্লোল' ও 'কালিকলম'-এর জনপ্রিয় স্রষ্টা শৈলজানন্দ সাহিত্যজীবনে অসংখ্য গল্প এবং প্রায় দুইশতাধিক উপন্যাস লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। 'খরস্রোতা', 'সারারাত', 'ছায়াছবি', 'পূর্ণচ্ছেদ', 'মাটির ঘর', ইত্যাদি উপন্যাসগুলোতেই শৈলজানন্দের বলিষ্ঠ লেখনী-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

শৈলজানন্দ প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৫ সালে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসান কালে, মহম্মদ আলি পার্কের যে-সম্মেলনে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ আবার প্রগতি লেখক সংঘে পরিণত হয়—সেই সম্মেলনে সংঘের সভাপতি নির্ধারিত হন শৈলজানন্দ, যুগ্ম-সম্পাদক মানিক বন্দোপাধ্যায় ও স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য।

শেষ জীবনে, বাজারী সাহিত্যের হট্টগোলে পাঠকের কাছে তাঁর অস্তিত্ব তেমন অনুভূত না হলেও বাঙলা সাহিত্য তাঁর কাছে অবশ্যই চিরঋণী।

শচীন দাশ

চণ্ডীচরণ সাহা

হিন্দুস্থান মিউজিক্যালস-এর প্রতিষ্ঠাতা ও ডিরেক্টার চণ্ডীচরণ সাহা গত ২৮ আগস্ট ইহলোক ত্যাগ করেছেন, পরিচয়-পাঠকদের কাছে সম্ভবত এ খবর অবিদিত নেই। অসামান্য কর্মকুশলতা, স্থির লক্ষ্য, দুর্দমনীয় সংকল্প, অকুণ্ঠ নিষ্ঠা ও ও সম্পাদন-যোগ্যতা এই সব গুণে ভূষিত ছিলেন চণ্ডীচরণ। তিনি ছিলেন অজাতশত্রু ও বান্ধবাসক্ত। হিন্দুস্থান মিউজিক্যালস ছাড়া তাঁর পরিচালিত আর দুটি প্রতিষ্ঠান—সি. সি. সাহা ও এম. এল সাহাতে চাকরিতে নিযুক্ত হয়ে বা গান রেকর্ডিং করে অথবা উপকরণাদি সরবরাহ করে, বাদ্যযন্ত্র তৈরি করে দিয়ে বহু সহস্র ব্যক্তিজীবনের পাথেয় সংগ্রহ করেছেন।

তাঁর জীবনী-সংকলন আমার উদ্দেশ্য নয়। আমাদের জন্য তিনি কী রেখে গেছেন, নিয়তি তাঁর দ্বারা কী কাজ সমাধা করলেন আমি সে বিষয়ে কিছু বিচার ও আলোচনা করব। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবার আগেই, ধর্মতলা স্ট্রিটের বিখ্যাত বাদ্য যন্ত্র-ব্যবসায়ী তাঁর পিতা এম. এল. সাহার অকালমৃত্যু হওয়ায় ওই ব্যবসা চালাবার ভার নিতে হয় চণ্ডীচরণকে। এই ব্যবসা চালাবার স্বল্প অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর উপলব্ধি হয় সঙ্গীতবিদ্যা সকল বিদ্যার সারাৎসার। চণ্ডীচরণ একদিন আমায় কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন তিনি ভাবতেন বেদ, উপনিষদ, গীতা, দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত তো ছাপা হয়েছে এবং জগতের অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়ে সুরক্ষিত হতে চলেছে, কিন্তু আমাদের রাগ-রাগিনী যা বেদ বেদান্তর চেয়ে কোনো অংশে নিম্নশ্রেণীর বা তুলনায় দীন হেয় নয়,—তাদের সংরক্ষণের প্রকৃষ্ট উপায় কি? কালের গ্রাস থেকে এতকাল তারা রক্ষা পেয়েছিল গুরু ও শিষ্য পরম্পরায়। রাগ-রাগিনীর বিশুদ্ধতা রক্ষা পেয়েছিল তাদের কণ্ঠস্থ করে। বেদবেদান্তও রক্ষা পেয়েছে কণ্ঠের মাধ্যমে। এখন আর তা সম্ভব নয়। এখন রক্ষা করতে হবে রেকর্ডিং করে ও চাকতি রেকর্ডে ছেপে, এইচ্. এম্. ভি. যা করেছেন; আমাদের দেশের বিখ্যাত ওস্তাদ ও গাইয়ে, কীর্তনীয়া ও বাজিয়েদের সাহায্য নিয়ে। কিন্তু একা সেই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সে-কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব ছিল না। সে সম্পূর্ণতা আনার জন্য প্রয়োজন ছিল

চণ্ডীচরণের। তিনি সংকল্প করলেন তিনিও রাগাশ্রয়ী কণ্ঠসঙ্গীত—বিশেষত বাঙলা গান ও বাদ্য বাদন রেকর্ডিং করে সে অভাব পুরণ করবেন।

চণ্ডীচরণ সংকল্প করলেন যে তিনি বাঙলা গান প্রচুর রেকর্ডিং করে ও ছাপিয়ে বাঙলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ার পথ উন্মুক্ত করে দেবেন। আদিতেই রেকর্ডিং করবেন কবিকণ্ঠ। রবীন্দ্র-কণ্ঠের রেকর্ডিং এইচ. এম. ভি. আগেই করেছেন, মাত্র সাতটি রেকর্ডে। তারপর অনেক কাল ওঁরা এ বিষয়ে আর সচেষ্ট হন নি। নতুন করে কবি-কণ্ঠের রেকর্ডিং করে এক নব জাগরণ আনবেন। চণ্ডীচরণের এক জার্মান বন্ধু ছিলেন, ডীনসবাক। তিনি ছিলেন বিখ্যাত জাইস-ইকন ক্যামেরার ভারতীয় এজেন্ট অ্যাডেয়ার, ওট্ অ্যাণ্ড কোং-র ক্যামেরা বিভাগের অধিকর্তা। তাঁর সাহায্যে খবরাখবর করে জানলেন জার্মানীর জর্জ নয়ম্যান কোং এক শ্রেষ্ঠ রেকর্ডিং মেসিন প্রস্তুতকারক। ১৯৩০ অব্দে ডীনসবাকের পঞ্চ-বার্ষিক ছুটি পাওনা হলে দুই বন্ধু রওনা হলেন জার্মানীতে ও সেখানে বৎসরাধিক থেকে চণ্ডীচরণ রেকর্ডিং করা শিখে এক সেট মেসিন নিয়ে দেশে ফিরলেন। ফিরে ৬ অক্রুর দত্ত লেনে রেকর্ডিং-এর জন্য স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করলেন। কলকাতার বাদ্যযন্ত্র ও রেকর্ড-ব্যবসায়ীদের এক সভায় একত্রিত করে তিনি এক রেকর্ডিং কোং প্রতিষ্ঠিত করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ও তাঁদের সমর্থন পেয়ে, হিন্দুস্থান মিউজিক্যালস ভ্যারাইটিজ অ্যাণ্ড প্রোডাক্টস লিঃ নামে কোম্পানি রেজেস্ট্রি করেন। পরে আবার নাম পরিবর্তন করে ভ্যারাইটিজ শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস এই নাম অবলম্বন করেন। এবার রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে তাঁকে দিয়ে গান ও আবৃত্তি রেকর্ডিং করার প্রস্তাব উত্থাপন করার পালা। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহালনবিশ ও তাঁর স্ত্রী চণ্ডীচরণকে জানতেন ও স্নেহ করতেন। তাঁদের সঙ্গে চণ্ডীচরণ চলে গেলেন কবির কাছে, শান্তিনিকেতনে। চণ্ডীচরণের তাঁর বাঙলা গানে নতুন করে জোয়ার বহানোর সংকল্পের কথা শুনলেন। রেকর্ডিং-এ এইচ. এম. ভি.-র একাধিপত্য থাকবে না, তবু জানলেন এইচ. এম. ভি-র লণ্ডনস্থ কর্তৃপক্ষ হিন্দুস্থানের রেকর্ডিং ছেপে দিতে রাজি হয়েছেন। ফেরবার পথে লণ্ডনে গিয়ে চণ্ডীচরণ মোকাবিলা করে এসেছেন। সব শুনে হিন্দুস্থানে রেকর্ডিং করাতে কবি রাজি হন ও চণ্ডীচরণকে আশীর্বাদ করেন এই বলে যে তিনি দেশের এক মহৎ কর্ম করার ভার নিয়েছেন, যেন তাতে সফল হন। নির্দিষ্ট দিনে কবি অক্রুর দত্ত লেনে এসে স্টুডিওতে হিন্দুস্থানের প্রথম রেকর্ডিং সম্পন্ন করেন। হিন্দুস্থানের দ্বিতীয় রেকর্ড অতুলপ্রসাদের স্বীয় কণ্ঠে গাওয়া "জানি,

জানি গো নন্দরানী।" এই সময়ে তিনি উপস্থিত থেকে শিল্পীদের ট্রেনিং দিয়ে কয়েকটি গান রেকর্ডিং করান—"উঠগো ভারত লক্ষ্মী"—"হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর"—ইত্যাদি। প্রথম রেকর্ডিং-এর পরে কবিকণ্ঠের আরও ১৪টি গান ও আবৃত্তি হিন্দুস্থানে গৃহীত হয়। বাঙলা গানে নতুন করে জোয়ার আনার প্রয়াসে চণ্ডীচরণ নব নব শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর গায়ককে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠিত করেন—কুন্দলাল সাইগল, কুমার শচীন্দ্রদেব বর্মণ, রাণু সেনগুপ্ত, রাজেশ্বরী দত্ত, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, সুপ্রভা সরকার ইত্যাদি। এছাড়া প্রতিষ্ঠিত গাইয়ে-বাজিয়েদেরও রেকর্ডিং করেন, যেমন ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, গোপেশ্বর ও রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী, বড়ে গোলাম আলি খাঁ, তিমিরবরণ, রাইচাঁদ বড়াল ইত্যাদি।

চণ্ডীচরণ যে সুধাকলস আমাদের জন্য রেখে গেছেন তা যেমন আমাদের গত ৩২-৩৩ বছর ঘরে ঘরে সঙ্গীতপিপাসুদের তৃপ্ত করেছে, তেমনি তা ভবিষ্যতবংশীয় সঙ্গীত-পিপাসুদের বহু যুগ ধরে তৃপ্ত করবে রেকর্ড-মাধ্যমে। জয় হোক তাঁর।

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ৭৫ নরেন্দ্রনাথ মিত্র মারা গেছেন। একালের লেখকদের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল প্রথম সারিতে। শুধুমাত্র ছোটগল্পের জন্যই কয়েকজন লেখক আমাদের স্মৃতিতে থেকে যান, নরেন্দ্রনাথও।

তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অসমতল' প্রকাশিত হয় ১৯৪৬-এ, যদিও বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে লিখতে আরম্ভ করেছিলেন এর দশ বছর আগে থেকেই। তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের সংখ্যা চল্লিশের কাছাকাছি। 'অসমতল'-এর পর ক্রমান্বয়ে 'হলদে বাড়ি,' 'উল্টোরথ' 'পতাকা,' 'চড়াই উৎরাই,' 'শ্রেষ্ঠ গল্প,' 'কাঠগোলাপ' এই সমস্ত গল্পগ্রন্থ বেরিয়েছে; নরেন্দ্রনাথ অসংখ্য ভালো গল্প লিখেছেন। 'অসমতল'-এর গল্পগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালীন বাঙলা দেশের ছবি।

নরেন্দ্রনাথের গল্প অতিসন্তর্পণে বুকের ভিতরে জট পাকায়, গল্পশেষে বিষয়ের গভীরে ডুবে থাকতে হয় বহুক্ষণ। এই মুহূর্তে 'চোর', 'একপো দুধ,' 'রস,' 'আবরণ,' 'শ্বেত-ময়ুর,' 'সোহাগিনী' এই সমস্ত গল্পের কথা মনে পড়ছে। গল্প বলার ভঙ্গি বা গল্পের বহিরঙ্গ সম্বন্ধে তিনি অচেতন ছিলেন না, যদিও বৈচিত্র্যময়

ভঙ্গিতে কখনো গল্প বলেননি। এ বিষয়ে হয়তো বা একটু রক্ষণশীলই ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। অথচ শব্দচয়ন করেছেন নিখুঁত, শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে আশ্চর্য সব বাক্য গঠন করেছেন আর সেই বাক্য নিয়ে মানুষের মনের গহনে প্রবেশ করেছেন অনায়াসে, চারপাশের মানুষের কথা উচ্চারণ করেছেন নিজস্ব ভঙ্গিতে। তাঁর সব লেখাই অনুচ্চভাষী, বিষয়ের বৈচিত্র্য খুব বেশি ছিল না। যারা কাছাকাছি আছে, চারপাশে ভিড় করে আছে যে মানুষেরা, নরেন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গে ক্রমে নিবিড়তর হয়েছেন। 'চেনামহলে'র লোক চেনামানুষের আনাগোনা তাঁর লেখায়। প্রতিটি বাক্যই মানুষের মনের অবয়ব। বৈচিত্র্যময় বিষয় না থাকলেও আমরা বিচিত্র মানুষ দেখেছি তাঁর লেখায়; মোতালেফ, ফুলবানু, জার্মান সাহেব ম্যাকস, মতি মিঞা; এইসব চরিত্র নরেন্দ্রনাথকে কখনো ভুলতে দেয় না আমাদের।

নরেন্দ্রনাথ উপন্যাস লিখেছেন তিরিশের ঊর্ধ্বে। প্রথম উপন্যাস 'দ্বীপপুঞ্জ' অবশ্যই উল্লেখযোগ্য লেখা। এরপর লিখেছেন 'চেনামহল', 'সূর্যসাক্ষী' এই সমস্ত অবশ্যপাঠ্য উপন্যাস। অনেকে বলেন 'চেনা মহল' তাঁর সবচেয়ে ভালো লেখা, আমরা বলি 'দ্বীপপুঞ্জ' বা 'সূর্য সাক্ষী'-ই বা নয় কেন?

চোখেমুখে সারাক্ষণ অন্যমনস্কতা, এক আশ্চর্য প্রশান্তিময় জীবনের মানুষ ছিলেন নরেন্দ্রনাথ যাঁর জীবনযাপনে কোনো রকম আকস্মিকতা কখনো দেখি নি, ঊনষাট বছর বয়সে মৃত্যুই হল ব্যতিক্রম।

প্রগতি সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলন ও 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ৪৬ ধর্মতলার আসরে যেমন, সাম্প্রতিক ফ্যাসিবিরোধী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সম্মেলনেও তেমনিই অনিবার্য ছিল তাঁর অংশগ্রহণ। জীবিকার বন্ধন বা জনপ্রিয়তার মোহ এই আপাত নম্র মানুষটিকে কখনোই স্বধর্মচ্যুত করতে পারে নি।

অমর মিত্র

অধ্যাপক শ্যামল চক্রবর্তী

২৭শে জুন ১৯৭৫-এ সমাজতান্ত্রিক জার্মানির রাজধানী বার্লিন শহরে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ভারত-সমাজতান্ত্রিক জার্মানি মৈত্রী সমিতির পক্ষ থেকে শিক্ষাবিদ্দের প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে তিনি ঐ দেশ সফরে গিয়েছিলেন। অধ্যাপক শ্যামল চক্রবর্তী বিদ্যাসাগর মহিলা কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের

প্রধান ছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যা সিনেট সদস্য ছিলেন এবং শিক্ষক আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা ছিলেন।

অধ্যাপক শ্যামল চক্রবর্তী আমাদের কাছে শ্যামলদা বলেই পরিচিত। আমার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় প্রায় এক দশক ধরে। শ্যামলদার কথা মনে হলেই মনে পড়ে ৪ নম্বর প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের দোতলায় ওঁর ঘরখানি যার চারদিকটাই বইভর্তি আলমারি আর র‍্যাকে সাজানো। ওঘরে আমরা বহু সভা করেছি, প্রধানত পার্টির অধ্যাপক-শাখার। মৃত্যু পর্যন্ত শ্যামলদা অধ্যাপক শাখার সদস্য ছিলেন এবং তার আগে দীর্ঘ দিন ছিলেন সম্পাদক। তাছাড়াও বহু সকালসন্ধ্যারাত্রি ঐ ঘরে শ্যামলদা-র সান্নিধ্যে কাটিয়েছি। শিক্ষা-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে শ্যামলদা ছিলেন বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের লোক। তাই বিভিন্ন বিষয়ে ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে ওঁর বাড়িতে যেতাম সব কাজ সেরে রাত্রিবেলায়; তারপর মধ্যরাত্রি বা তারও পর আলোচনা করে ঐ ঘরেই খেয়েদেয়ে ঘুমোতাম। আমার জন্য আর একটা খাট আনা হত শ্যামলদারই ঘরে। শ্যামলদার সকালে কলেজ, আমি ঘুম থেকে ওঠবার আগেই উনি বেরিয়ে যেতেন।

শ্যামলদার সঙ্গে আমার বয়সের পার্থক্য ছিল প্রায় একটা যুগের কিন্তু উৎসাহে-আলোচনায় তর্কে-বির্তকে উনি শুধু আমার নয়, আমার চাইতে বয়সে কনীয়ান সকলেরই সমপর্যায়ের হয়ে যেতেন। বয়োজ্যেষ্ঠ জ্ঞানী অনেকেই থাকেন যাদের আমরা সমীহ করে দূরে রাখি, হঠাৎ প্রশ্ন করতে ভরসা পাই না, বক্তব্যের সঙ্গে একমত না হলেও প্রতিবাদ করি না পাছে ক্ষুণ্ণ হন। শ্যামলদা ছিলেন এ চরিত্রের ঠিক বিপরীত; সদাহাস্যময় খোলামনের মানুষ। ওঁর উপস্থিতিতে সকলেই সহজ হতে পারতেন। অল্পখ্যাত বিখ্যাত বহুলোককেই শ্যামলদা সাহায্য করেছেন কখনও পরামর্শ দিয়ে, কখনও লিখে, কখনও সমালোচনা করে। তার কোনোটার স্বীকৃতি আছে, কিছুর বা নেই। কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত শিক্ষানীতির প্রথম খসড়া শ্যামলদারই লেখা, ভারতীয় শিক্ষার ২৫ বৎসর (People's Publishing House কর্তৃক প্রকাশিত) ওঁর লেখা সাম্প্রতিক গ্রন্থ।

শ্যামলদার প্রথম জীবন সম্পর্কে গল্প শুনেছি শ্যামলদার মুখে এবং সে সময়কার ওঁর বন্ধুদের কাছে। ছাত্র হিসেবে মেধাবীকৃতী ছাত্র ছিলেন বরাবর এবং ছাত্র বয়সেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদে আকৃষ্ট হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেন। শুনেছি অল্প দিনের সরকারী চাকরী যা তাকে অবিভক্ত বাঙলাদেশের

পূর্বপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল কিংবা কুষ্টিয়ার বেসরকারী কলেজের অধ্যাপনায় এইসব বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকলেও শ্যামলদা ছিলেন মনেপ্রাণে কমিউনিস্ট। সবরকম জনহিতকর কাজেই ওঁর ছিল অদম্য উৎসাহ। ব্যক্তিজীবনের দৈন্যক্লেশ কিছুই তাঁকে এই সাধনলক্ষ্য থেকে সরাতে পারে নি। তাই এই সব ছেড়ে আবার তিনি হয়েছিলেন পার্টির সারাক্ষণের কর্মী। এই সময়ে পার্টির কলকাতা জেলার অন্যতম প্রধান নেতা হিসেবেও তিনি কিছুদিন কাজ করেন, তাঁর সর্বশেষ বৃত্তি ছিল বিদ্যাসাগর কলেজের এই অধ্যাপনা।

শ্যামলদা নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির অন্যতম নেতা ছিলেন, কিছুদিন কোষাধ্যক্ষও ছিলেন। সমিতির ছোট বড় সব কর্মকাণ্ডে তিনি লিপ্ত থেকেছেন। একদল অল্পবয়স্ক তরুণদের সঙ্গে অনায়াসে তিনি নিজেকে মিলিয়ে নিতে পেরেছেন। ওখানকার তরুণ কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, শ্যামলদার প্রতি তাদের কী গভীর শ্রদ্ধামেশানো ভালোবাসা। শ্যামলদার কলেজের সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। কলেজের গভর্নিং বডিতে উনি ছিলেন শিক্ষক প্রতিনিধি। কলেজের সব সমস্যায় সংকটে উনি ছিলেন প্রধান আশ্রয়। শ্যামলদা পশ্চিমবঙ্গ অধ্যাপক সমিতির নেতা ছিলেন, কিছুদিন যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন, বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন, কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিলেন, সর্বোপরি শিক্ষাতত্ত্ব-সম্পর্কিত সব বিষয়ে সমিতির অন্যতম নীতিনিরূপক ছিলেন।

বেশ কিছুদিন ধরে শ্যামলদা শারীরিক সুস্থ ছিলেন না। চলাফেরা করতে অসুবিধা হত, সিঁড়ি দিয়ে বেশি ওঠানামা করতে ডাক্তারের বারণ ছিল। কিন্তু এইসব সত্ত্বেও পার্টির সমস্ত কার্যক্রমে ওঁর উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ ছিল অনিবার্য। মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরে ওঁর মেয়ে লিপির মুখে একটি ঘটনা শুনেছিলাম। মে মাসে কলকাতায় জয়প্রকাশের আন্দোলনের বিরুদ্ধে পার্টির ডাকে শহীদমিনার ময়দানে মিছিল ও জমায়েত হয়। শ্যামলদা তাতে যোগ দিতে যাবেন, মেয়ে বারণ করল স্বাস্থ্যের কথা বলে, শ্যামলদা হঠাৎ রেগে গিয়ে ওকে ধমক দিয়ে উঠলেন। লিপি শ্যামলদার একমাত্র সন্তান, পিতামাতা উভয়ের স্নেহ দিয়ে ওকে মানুষ করেছেন তিনি। জমায়েত থেকে বাড়ি ফিরে তিনি মেয়েকে কাছে ডেকে বললেন, "সারাটি জীবনই তো এই পার্টির সঙ্গেই রইলাম। এখনও আমাদের ডাকে এত লোক জমায়েত হয়, দেখলে বুকটা ভরে যায়, এতে কি না গিয়ে থাকতে পারা যায় রে!"

মৃন্ময় ভট্টাচার্য

বিশ্বরঞ্জন দে

অশোকনগরের ইস্কুল থেকে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় যখন কাজ নিয়ে চলে যান তরুণ চিত্রী বিশ্বরঞ্জন দে, তখন নবীন কবি ও গল্পকারেরা বিমর্ষ হয়েছিলেন। রাত জেগে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে সবটুকু ভালোবাসা ঢেলে তাঁদের নতুন গ্রন্থের প্রচ্ছদ আর তাঁর মতো কে-ই আঁকবেন বা!

হঠাৎ হঠাৎ এসে হাজির হতেন কলকাতায়, এবং এলে বলা বাহুল্য পরিচয়-এর দপ্তরে। অটুট স্বাস্থ্য, প্রিয়দর্শী, ভব্য পোশাকে নিখুঁত ও প্রকৃত বিনয়ী বিশ্বরঞ্জন বারবার এঁকে দিয়েছেন পরিচয়-এর প্রচ্ছদ, ছাত্রের মতো অপেক্ষা করেছেন ছাপার পর তাঁর অঙ্কনের ফল দেখার জন্য।

পূর্ণতরু জীবনের দিকে প্রকৃত শিল্পীর মতোই বড় বড় পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎ এক মর্মন্তুদ দুর্ঘটনা রাস্তার মাঝখানে এসে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তৃষ্ণার তমসা। স্নেহাকর ভট্টাচার্য। কৃত্তিবাস প্রকাশনী, ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলকাতা ১৭। দাম তিন টাকা।

স্নেহাকর ভট্টাচার্য একালের পঞ্চাশ দশকের তরুণ কবিদের অন্যতম এবং সম্ভবত 'তৃষ্ণার তমসা' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু তাঁর প্রস্তুতি সম্পর্কে সংশয় নেই ; সন্দেহ নেই তিনি দীর্ঘকাল ধরে আস্তে আস্তে কবিতার জগতে নিজের অভিজ্ঞতাকেই শুধু লালন করেন নি, কবিতাকেও অভিজ্ঞতার উপযুক্ত মাধ্যম রূপে গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাটি পড়লেই বোঝা যায় তিনি একজন পুরোপুরি আধুনিক কবি এবং তিনিও "উক্তি ও উপলব্ধির মধ্যে সাযুজ্যসন্ধানী।" একালের বিষাদ এবং অবসাদ, উদ্যোগ এবং পতন, তিক্ততা ও গ্লানি—এই সব কিছুই এসে গেছে তাঁর কবিতায়, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে কবির সতকর্তা, কবিতার কলাকৌশল সম্পর্কে সচেতনতা। ফলে তাঁর কবিতা পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে, মনকে নাড়া দেয়।

স্নেহাকর মূলত নাগরিক জীবনের কবি এবং এই দিক থেকে একালের অধিকাংশ আধুনিক কবিদেরই অন্যতম। কলকাতা শহরকে বিষয় করে তাঁর একাধিক কবিতা এই বইয়ের যথার্থ ভালো বেশ কিছু কবিতার অন্যতম। তাঁর অন্যান্য কয়েকটি কবিতায় যেমন, তেমনি এই কবিতাগুলিতেও শব্দাবলির ব্যবহার এবং শব্দচিত্রের সমাবেশ যে-কোনো সচেতন পাঠকের নজরে পড়ে। "সত্তার ভিতর দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সৃষ্টি খোলে পরতে পরতে" এই উপলব্ধি স্নেহাকরের কবিতাকে অনেক ক্ষেত্রেই আশ্চর্য সংহতি দান করেছে এবং অন্যত্র নানা পংক্তি-বিন্যাসের মধ্যে শব্দের তীক্ষ্ণতা। "দিনের পাঁজরে থাবা রেখে / ঈশ্বর জ্বলন্ত বাঘ স্থির দীপ্ত নিমগ্ন আপন মহিমায়!" ('মাথার উপরে চাঁদ') এবং পাশাপাশি "সতর্ক পা ফেলে ছায়ার মানুষগুলি বেরোবার পথ খোঁজে। তারা / দৌড়য় হাঁপায় অন্ধকারে পড়ে যায়। রক্ত ও বিষ্ঠায় ঘামে / মাখামাখি হয়ে, থেমে, ফের ছুটে গিয়ে / চক্রাকারে ঘুরে আসে কোথায় জানেনা।" ('স্বপ্ন কি আগের জন্ম')।

'তৃষ্ণার তমসা'-র কবিতাগুলো পড়লে পাঠক বুঝতে পারেন একটা ভয়ঙ্কর দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে কবি ভীষণভাবে আলোড়িত হলেও শুভবুদ্ধি তাঁকে কখনো পরিত্যাগ করেনি এবং ভঙ্গিসর্বস্ব বাকচাতুর্যকে এই কবি

সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। থেকে থেকেই স্নেহাকরের কবিতায় ফিরে ফিরে এসেছে এক ধরনের প্রসন্ন কোমলতা যা কাব্যপাঠককে আশ্বস্ত করে। "আচ্ছন্ন মলিন চেতনায় / রক্তের ছিটের মত নষ্ট প্রেম গ্লানি পাপ লেগে থাকে।" ('বৃথা আমি চেষ্টা করি') কিংবা "নীল কুয়াশায় লীন মৌনের ভেতর থেকে পদধ্বনি আসে!" ('পাতালজলের ঝাঁপি') অথবা "বিষণ্ণ স্মৃতির বেলা নিয়ে আসে আসন্ন গোধুলি' ('বিষণ্ণ স্মৃতির বেলা') .এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। 'যুগযন্ত্রণা' শব্দটি একালের অনেক কবির ক্ষেত্রে বারবার ব্যবহৃত হবার ফলে সম্প্রতি প্রায় তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছে, কিন্তু স্নেহাকরের অনেক কবিতায় শব্দটি তার স্বতন্ত্র সারবত্তা ফিরে পেয়েছে। নীচের কয়েকটি ছোট উদ্ধৃতি আশা করি আমার এরকম মন্তব্যের তর্কাতীত সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণীয়।

১. কতকাল পরে আমি তোমাদের সবার কুশল নিতে এসে
সকালে আপাত রৌদ্রে হাত মেলে ধরতে গিয়ে দেখেছি রোদ্দুর
মুঠো থেকে গলে যায়, বৃক্ষ ছুঁতে গেলে বৃক্ষ
মায়াবী মিলিয়ে যায় দূরে,
আতঙ্কিত আলিঙ্গনে ঘনিষ্ঠ সবল প্রিয়জন
বালির মতন ঝরে... ..
('প্রথমে ভিতরে কিছু ছিঁড়ে যায়')

২. বুকের যেখানে তুমি অস্থিরতা রক্তচন্দনের মত স্মৃতি ও সৌরভ
পৃথিবীতে তাই শুধু এখনো নীরোগ। বাকি সকল কিছুতে
ক্ষয় বড় দ্রুত কাজ করে। .....
('আসলে তোমাকে আমি')

৩. কাদের কলকাতা ওই ভোরবেলা সোনার মন্দির হয়ে আছে
স্তোত্রের মতন বহে নদী
সকল তিক্ততা থেকে জয়ধ্বনি নিয়ে
পাখি যায় ঈশ্বরের পদতলে নীলিমা অবধি।
('মাথার উপরে চাঁদ')

অল্প কয়েকটি শব্দের প্রয়োগে স্নেহাকর যে কবিতাকে গভীর ও অর্থবহ করে তুলতে পারেন, 'তৃষ্ণার তমসা'র অনেক কবিতার অনেক পংক্তিই তার সাক্ষ্য। "স্তোত্রের মতন বহে নদী", "সময় থপথপ ঘোরে সার্কাসের ভল্লুকের

মত” কিংবা “গোধূলি সতীর মত শুয়ে আছে গঙ্গার চিতায়” অথবা “পচা কমলালেবুর মত কলকাতা ভিতর থেকে খসে যাচ্ছে” এবং অন্যত্র “হিংস্রক সূর্যের খুলি ফেটে যায় ঘিলু-রোদ ফুটপাতে ছড়ায়” দ্রষ্টব্য। কাব্যরচনার ক্ষেত্রে স্নেহাকর ঋণী—সমসাময়িক কবিদের কারোর কাছে নয়, চল্লিশ দশকের কবির কাছেও নয়, বরং তারও আগের তিরিশের দিকপাল কোনো-কোনো কবির কাছে, জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ যাঁদের অন্যতম। তাঁর কোনো কোনো পংক্তি জীবনানন্দের কোনো কোনো বিখ্যাত কবিতার কোনো কোনো পংক্তিকে মনে করিয়ে দেয় অনেক সময়, যদিও তাতে স্নেহাকরের কবিতার উপযুক্ততা বা প্রসাদগুণ হ্রাস পায় না। বরং বলা যায় তাঁর সমসাময়িক একদল যোনিসচেতন কবির মতো হল্লাগোল্লার পেছনে না ছুটে তিনি সঙ্গত কারণেই সুস্থ কবিতা রচনার প্রয়োজনে একটি সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয়েছেন।

ছন্দের দিক থেকে ‘তৃষ্ণার তমসা’র প্রধান অবলম্বন পয়ার এবং এই পয়ার স্নেহাকরের হাতে যথার্থ কৃতিত্বের সঙ্গে ব্যবহৃত হওয়ায় পাঠককে আকর্ষণ করে। বড় বড় পংক্তির দীর্ঘ স্তবকগুলো পড়তে গিয়ে পাঠক শেষ পর্যন্ত আশ্বস্ত হন। আর কোনো ছন্দ নিয়ে কবি কেন পরীক্ষা করেন নি সে-প্রশ্ন অবান্তর কিংবা হয়তো পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে তার সদুত্তর পাওয়া যেতে পারে। তবে এই কাব্যগ্রন্থে একটিও সনেট নেই কেন এই প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে, কেননা আমার ধারণা সনেটের প্রয়োজনীয়তা একালেও একেবারেই ফুরিয়ে যায় নি এবং সনেটচর্চা যে কোনো নবীন কবির শক্তিকে শিক্ষিত করে তুলতে পারে। এই বইয়ের দুটি কবিতায়—‘সীতার জন্যে’ এবং ‘বন্দিনী রঙ্গিণী’—স্নেহাকর অবশ্য একটু ভিন্ন ধরনের আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা করেছেন, কিন্তু তেমন সফল হয়েছেন বলে আমার মনে হল না। বরং পয়ারে চিহ্নিত বড় বড় পংক্তি ও স্তবক সজ্জায় তিনি বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের ঢেউ জাগিয়ে তুলতে পেরেছেন এবং সেক্ষেত্রে তাঁর পৌরুষ উচ্চারণ এক অভিনিবেশের গভীরতায় পাঠককে টেনে নিতে থাকে।

বইয়ের প্রচ্ছদটি সুন্দর, এঁকেছেন পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। মুদ্রণও মোটামুটি নির্ভুল।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

বিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন। পবিত্র মুখোপাধ্যায়। ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা ১২। পাঁচ টাকা।

মোট বারোটি প্রবন্ধ আছে 'বিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন'-তে, এবং প্রায় কোথাও আপ্তবাক্য, কিংবদন্তি ও প্রতিষ্ঠিত সত্যে তিনি নিজেকে ন্যস্ত করেন নি। কিন্তু একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, পবিত্র কেবল নিষ্ঠুর কথা বলা এবং অস্বীকৃতির সরল গোঁয়ার্তুমির পথে বল্গাহীন গাড়ি চালিয়ে অহং-কে তৃপ্ত করার প্রলুব্ধকর প্রয়াসে স্থিত হন নি। উভয়ের মাঝখানে, এই ক্ষুরধার ও সংকীর্ণ পথে বিচরণেচ্ছু, তাঁর তাই প্রাবন্ধিক হিসেবে দায়িত্ব বেড়ে গেছে। তিনি কবিতার মূল প্রশ্নগুলির তটরেখায় বিচরণ করেন নি, সেগুলির মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করেছেন।

'জীবনানন্দ : আমাদের অভিজ্ঞতায়'; 'সুকান্তকে এরকম ভাবে দেখি'; 'চিত্রকল্প সংক্রান্ত দু'চার কথা'; 'মহাকবিতার সময়'; 'কবিতার ভাষা'; 'গদ্যপদ্যের সীমান্তে'; 'কবিতা ভাবনা'; 'দীর্ঘ কবিতায় আমি'; 'প্রগতি সাহিত্যের সংকট'; 'বাংলা সাহিত্যে আন্দোলন'; 'বিষ্ণু দে', এবং 'বিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন'—এই বিষয়গুলির ওপর বারোটি প্রবন্ধ গ্রন্থটিতে সংকলিত হয়েছে।

একজন সামান্য পাঠক হিসেবে গ্রন্থটির গৌরচন্দ্রিকায় যখন পড়ি, "শব্দের যাদু নয়, অর্থের দ্বৈত তাৎপর্য নয়, জ্ঞানমন্থর ভাষণকলা নয়; যা একান্তভাবে আমার অন্তর্গত বোধের জগতে নতুন বোধের সংযোজন ঘটাতে পারে"—পবিত্র-র এই সন্ধানী সংকল্প, সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্যে সেই 'নতুন বোধের সংযোজন' খুঁজতে বেরিয়ে পড়ি। দেখতে চাই, আমাদের অনুভবে জীবনানন্দ যেখানে স্থিত হয়ে গেছেন, সেখানে কতখানি আলোড়ন বহে আনতে পারেন তিনি। আমাদের দেখা-সুকান্তকে, তাঁর দেখার যদি সত্যিই কিছু নতুনত্ব থাকে, তার সঙ্গে মিলিয়ে পড়ি ও বিচার করি। জানতে চাই, চিত্রকল্প নিয়ে এ যাবত যা কিছু কথাবার্তা, লেখালিখি হয়েছে, সেখানে বস্তুত কিছু অভিনব সংযোজন পবিত্র করতে পারলেন কিনা। এভাবেই—কবিতার ভাষা, দীর্ঘ কবিতা, প্রগতি সাহিত্য, যূথবদ্ধতায় কবিতা হয় কিনা বা বিষ্ণু দে—নিয়ে ..।

আমার মনে হয়, পবিত্র আসলে সেই স্থির সত্যেরই পুনর্মোচন করতে চেয়েছেন, যা দেখতে চায়, কবিতা কবিকে কতখানি খেয়েছে। কবিতার কাছে জীবনানন্দের পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ব্যাপারটাকে এই ভাবেই দেখতে

চেয়েছেন তিনি। তবে, শেষপর্যন্ত জীবনানন্দ ন্যস্ত হয়েছিলেন "আত্মার রহস্য উন্মোচনেই" কেবল, এবং এই কথা প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি তুলে ধরলেন তাঁর 'বেলা অবেলা কালবেলা' গ্রন্থটিকে—এই সিদ্ধান্তের ভেতরে রয়ে গেছে অনৌচিত্য। কারণ, পবিত্র নিশ্চয় জানেন, মহা-ইতিহাস চেতনার উদ্বোধন নিছক আত্মার রহস্য উন্মোচন-ই নয়—তার চেয়ে অনেক দায়িত্ববান, বড় ও বেশি। নিজের প্রাক্তন কাব্যচর্চার প্রবাহের বিরুদ্ধে গতিবিরোধীর মতো দাঁড়িয়ে 'বেলা অবেলা কালবেলা'-য় এক পরম ঝুঁকি নিয়েছিলেন জীবনানন্দ, খুঁজেছিলেন অনায়ত্ত এক টোট্যালিটিকে, এখানেই তাঁর আত্ম-বিস্ফার, মোটা কথায়—সততা। পবিত্র একটি সঠিক কথা বলেছেন, যার মানে দাঁড়ায়, জীবনানন্দ অনর্জিত দর্শনে আস্থাশীল ছিলেন না। অর্থাৎ সেই, অভিজ্ঞতা ছেঁকে সম্পূর্ণতার দিকে যাওয়ার প্রশ্ন। কিন্তু বহুমানুষের সামাজিক উত্তরণ ব্যক্তিমানুষের নিভৃত সাধনার মাধ্যমে ঘটা সম্ভব—জীবনানন্দের অন্তিম পর্বের রচনার বোধ সম্পর্কে পবিত্রের এই তত্ত্ব আমার আরোপিত বলে মনে হয়—অ-দ্বান্দ্বিক তো বটেই। বরং 'সমবেত মানুষের সাধনার সারাৎসার'—এহেন বাক্য ব্যবহার করে প্রকৃতভাবেই নিজেরা পূর্বেকার কথাকে উচিতভাবে ডিঙিয়ে গেছেন প্রাবন্ধিক, এবং সেই সারাৎসারকে নিজের মতো করে প্রকাশের মধ্যে কবির যে নিশ্চিত জয় রয়ে গেছে, জীবনানন্দ সেই বিজয়ের অধিকারী, এই সংজ্ঞায় তাঁকে চিহ্নিত করেই বস্তুত পবিত্র নিজের মনীষাকে সম্মানিত করেছেন। তিনি ঠিকই বলেছেন, জীবনানন্দের কবিতায় দাঁড়িয়ে আছে "ঐতিহ্য বা ইতিহাসে দেশকালগত চৌহদ্দি ভেঙে" "ক্রমপ্রসারিত বিশ্বের সমস্যাজর্জর মানুষের পৃথিবী।"

সুকান্ত ভট্টাচার্যকে নিয়ে যে প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে, তাতে সুকান্ত কেন র‍্যাঁবো বা কীট্‌স্‌-এর পরিণত শিল্পবোধ অর্জন করতে পারেন নি, তা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। এ দুঃখ, আমার মনে হয়, অমূলক। তিনজনের কাব্যের জগত, সময়, পরিবেশ ও লক্ষ্য একেবারে আলাদা।

যখন মহাকবিতা রচনায় বা রচনার সম্ভাবনায় পারিপার্শ্ব বিমুখ, তখন মহাকবিতা-র (দীর্ঘ কবিতা ?) পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন পবিত্র জীবনানন্দের ভাষ্যকে শিরোধার্য করে। এক্ষেত্রে হয়তো অনিবার্য ওঠে ব্যক্তিগত পক্ষপাতের প্রশ্ন।

এই সংকটকে যে সর্বাংশে এ-প্রবন্ধে অতিক্রম করতে পেরেছেন পবিত্র—এমন কথা বলি না। 'মহাকবিতা' শব্দটি আমি ঠিক বুঝি না। তবে দীর্ঘ

কবিতা রচনার ক্ষেত্রে যে সামগ্রিকতাবোধ, অস্তিত্ব-চেতনা, প্রবাহিত কাব্য-ময়তা ও সংহতির প্রয়োজন, স্বয়ং পবিত্র অত্যন্ত সাহসী ভাবে সেই প্রয়োজনীয় তাকে রূপদান করতে বারবার প্রয়াসী হয়েছেন। এবং সেই প্রয়াস ও নির্মিতির চিহ্ন অন্তত তাঁর দুটি প্রবন্ধে—'মহাকবিতার সময়' এবং 'দীর্ঘ কবিতায় আমি'-তে অনেকখানি পেয়ে যাই বলে আমি কৃতজ্ঞ। প্রবন্ধদুটিতে লেখক নিছক আত্মসমর্থনের মধ্যে বক্তব্যকে আটক না রেখে তার অনেকখানি নির্বিশেষ চেহারা দিতে পেরেছেন—এ খুব কম কথা নয়।

জনরঞ্জনকারী কবিতার জন্মশত্রু হিসেবে পবিত্র তাঁর কবি ও পাঠক-স্বভাবকে যুগপৎ চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তাঁর এই ভাবনাকে সক্ষমভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি, "অভিজ্ঞ মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপ ধ্যানগম্ভীর, চোখের মণিতে স্বপ্নহর দুঃস্বপ্ন-প্রোথিত জাগরণ, সন্ধানী চোখের তারায় বিশ্ব ফেলেছে ছায়া, তাবৎ অভিজ্ঞতাকে ধারণ করে নীলকণ্ঠ। তাই জনমনোরঞ্জনের ভূমিকায় এ কালের কবিকে মানায় না আর।" জনমনোরঞ্জনকারী কবিতা বলতে নিশ্চয়ই তিনি কবিতার অতি-সরলীকরণ ও অতি-তরলীকরণের কথা বলেছেন।

গ্রন্থটির ভাষা-ব্যবহার অত্যন্ত সাবলীল। এ জাতীয় ভাষা সৃষ্টি করতে পারার জন্য পবিত্রকে আমি সাধুবাদ জানাই। পবিত্র-র বহু কথা, বহু বক্তব্যকে আমি মানি না। তাতে কি এসে যায়? তবু পরের কাঁধে বন্দুক না রেখে তিনি নিজের গলায় নিজের কথা বুক খুলে বলতে পেরেছেন—এই কি যথেষ্ট নয়?

অমিতাভ দাশগুপ্ত

জীবনযাপন। শচীন বিশ্বাস। বাক-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড,
কলকাতা। চার টাকা।

রক্তমাংস সমাচার। জগত বন্দ্যোপাধ্যায়। দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ,
কলকাতা। দু-টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

কাছিম। জীবন সরকার। অন্যদিন, কলকাতা। চার টাকা।

'জীবন-যাপন' গল্পগ্রন্থের প্রথম তিনটি গল্প 'গ্রহ-সম্মেলন,' 'অচিন্ত্য অনসূয়া এবং অনেকে' ও 'আজ কাল পরশু'। এই তিনটি গল্পের মূলে রয়েছে সেই চেতনা যা বেঁচে থাকার সংগ্রামে মধ্যবিত্ত জীবনের একমাত্র হাতিয়ার। এ গল্পের নায়ক আর পাঁচজন যুবকের মতো বিচ্ছিন্নতাবোধের শিকার। কখনও সে বাঁচার

সংগ্রামে প্রতিশ্রুত কখনও সে পরাজিত। কখনও সে সংগ্রামের জন্য মানসিক প্রস্তুতি করে কখনও আবার সামাজিক বৈষম্যের প্রতিবাদে নিজের বিরুদ্ধেই 'রিবেল' হয়ে ওঠে। সম্ভবত এই প্রতিক্রিয়াগুলোর জন্ম তার বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে। তাই এর সবটাই প্রায় পারম্পর্যহীন। আবার একই প্রতিক্রিয়া বাস্তব-সংগ্রামমুখী হয়ে ওঠে যখন সে বুঝতে পারে "জনতার মিছিলে যোগ দেওয়াই হল বাঁচার একমাত্র পথ।" দ্বিতীয় গল্পের নায়ক অচিন্ত্য-ও একইভাবে তার পরিচিত বিচ্ছিন্ন মানুষগুলোর মধ্যে আবিষ্কার করে এক নিরবচ্ছিন্ন জীবনের ঐকতান। বুঝতে পারে এই খণ্ড-খণ্ড জীবনপ্রবাহের মধ্যে রয়েছে বেঁচে থাকার এক নিরন্তর সংগ্রাম যা জীবনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে ক্রমাগত এক পূর্ণতার দিকে। সে বলে, "সবুজের মধ্যে লাল রঙ দেখলে আমি কেমন হয়ে যাই। মনে হয়, ওটা আমার আর এক জীবন।" সকাল-সন্ধ্যে যে সব মানুষের সঙ্গে কাজ করতে হয় তারা কেউই সময়ের স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন বা বিপরীত নয়। তাই দিনের শেষে যখন অঙ্কের হিসেব মিলে যায় তখন অচিন্ত্য দেখে, এক এক করে সব বিবর্ণ ম্লান ছবিগুলো তার সামনে থেকে সরে গেছে—"রেখে গেছে এক বিচিত্র সুরের ঐকতান যা আগামী দিনেও বাজবে।" তৃতীয় গল্পে রয়েছে বেকারিত্বের চিরন্তন নিষ্ঠুর যন্ত্রণা, হতাশা আর নৈরাশ্যবোধ। কিন্তু এটাই যে শেষ কথা নয় তা দৃঢ়ভাবেই ঘোষিত হয় জয়ন্তর কণ্ঠে। কেতকীর স্বপ্ন, জয়ন্তর ভালোবাসা নিছক রোমান্টিক বা বাস্তববোধহীন 'মূর্খের স্বর্গ' রচনা নয়। জয়ন্ত যখন বলে, আমাদের একটি ছেলেও যদি থাকতো, কুড়িবছর পরে সে স্পেস ইঞ্জিনিয়ার হতে পারত—এটা নিছক স্বপ্ন বলে মনে হলেও মধ্যবিত্ত জীবনসংগ্রামে এটাই একমাত্র সুখ, একমাত্র নির্ভর। এমনি করেই মধ্যবিত্ত জীবনসংগ্রামে পরাজিত হয়ে বোধহয় একটু নিরাপত্তা খোঁজে। সংগ্রামবিমুখ মধ্যবিত্ত জীবনের এ ট্রাজিক পরিণামটাই এ গল্পে চমৎকারভাবে বিবৃত।

আরও কয়েকটি ভিন্নস্বাদের গল্প রয়েছে এখানে—'জীবজন্তুর সঙ্গে যুদ্ধ,' 'ফসল ওঠার আগে', 'দ্বিতীয় জীবন', 'ভানুমতী', 'সমুদ্র আনন্দ এবং নুলিয়ারা', সীমানা নেই', 'শিশুমেধ' ও 'জীবন যাপন'। 'জীবজন্তুর সঙ্গে যুদ্ধ' গল্পটিতে শিবুর বাবা এবং শিবুকে দুটো প্রজন্মের প্রতীক বলে ধরা যায়। 'শিশুমেধ' ও 'জীবনযাপন' গল্পদুটিতেও রয়েছে সেই একই প্রশ্ন। যে রাজনীতির আদর্শ মানুষের কল্যাণ নয়, তারই ক্রীড়নক একদল মানুষ নিরাপত্তার সন্ধানে কেবল এপার থেকে ওপারে ছুটে বেড়ায়। ক্রমশ তারা বুঝতে পারে যে সর্বগ্রাসী ধনতন্ত্রের হিংস্র ক্ষুধা দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষকে এক শোষণের যন্ত্রে ক্রমাগত নিষ্পেষিত করে

চলেছে। সেই শোষণ থেকে মুক্ত না হলে মানুষের স্থায়ী কল্যাণ হতে পারে না। আবার ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে এই শোষিত সর্বহারা মানুষই কিন্তু অপরাজেয়।

জগত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রক্তমাংস সমাচার' রীতির দিক থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। জগতবাবু সচেতনভাবেই গল্পের কোনো ঐতিহ্যকে মানতে চান নি। বরং গল্প এবং কবিতার মধ্যে যে কোনো পার্থক্য নেই এমনি এক বোধ নিয়ে কবিতার মুহূর্তগুলোকে গল্পের ফ্রেমে ধরতে চেয়েছেন। কবিতার অনুভব গল্পের রস এবং ছবির রং সবগুলো একসঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে কতখানি সফল হয়েছেন তা অবশ্যই গল্পের নিরিখে বিচার্য, কারণ এই বইটিকে তিনি গল্পগ্রন্থ বলেই চিহ্নিত করেছেন। 'রক্তমাংস সমাচার' নামকরণটির মধ্যেও জগতবাবু সম্ভবত এরকম একটা তত্ত্বকে হাজির করতে চেয়েছেন। প্রথম গল্প 'রক্ত মাংস সমাচার'-এ তিনটি মাত্র চরিত্র—অতীন, চুয়া এবং অতীনের মা। তিনজনকেই প্রথম থেকে কেমন অশরীরী বলে মনে হয়। গল্পের মূলে রয়েছে চুয়ার শূন্যতাবোধ। অতীনের নির্লিপ্ততা এবং তার মায়ের হতাশ্বাসে। চুয়ার একদিন মনে হয় সেও যেন ক্রমশ এক অনাবিল অন্ধকারে হারিয়ে যেতে যেতে অশরীরী আত্মায় পরিণত হয়ে আসছে। শেষপর্যন্ত চুয়ার আত্মহত্যা অন্ধকারের রহস্যকে আরও কঠিন অস্পষ্ট করে তোলে। অন্ধকারে অতীনের মুখোমুখি হওয়ার অনুভবের মুহূর্তে রক্তমাংসের চুয়া মুহূর্তে সজীব হয়ে আবার অতীন্দ্রিয় অনুভবে বিলীন হয়ে যায়। এমন সুন্দর একটি মুহূর্তে গল্পের যে স্বাদটুকু পাই তাকে অস্বীকার করতে পারি না। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথা মনে হয় এমন রক্তমাংসের মানুষকে এত অন্ধকারে না দেখলে বোধহয় সহজেই চিনে নিতে পারতাম।

'কায়ানগরের গল্প'-র রুগ্ন হাড্ডিসার "কাঠির মতো দেড়হাতি" মেয়েটি অনেক বেশি সজীব বলেই সহজে স্পর্শ করে। সেই একরত্তি নির্বোধ মেয়েটিকে গ্রাস করবার জন্যে যে বিরাট যন্ত্রদানবটি এগিয়ে আসে তা থেকে ধনতন্ত্রের সর্বগ্রাসী ভয়ঙ্কর চেহারাটি চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। বিশেষ করে লেখক যখন বলেন, "হাতে ভাঙ্গা কৌটোয় মালা জপতে জপতে তার এই প্রকাশ্য অধিবেশন কতিপয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাস্তব প্রদর্শনী···।" এ গল্পের শেষ মুহূর্তটি জগতবাবু তাঁর ক্যানভাসে বেশ উঁচু দরের শিল্পীর মতো ধরে রেখেছেন। এখানে অতৃপ্তির অবকাশ আপেক্ষিকভাবেই কম। 'চড়ুই' গল্পের সদানন্দর পঙ্গু স্থবির জীবনে একরত্তি চড়ুই পাখিটির মতো অমলার উপস্থিতি অনেক অনুভবের মুহূর্ত রচনা করেছে। তবে এখানেও সেদিন সদানন্দর শূন্য জীবনে অমলা মরীচিকার মতো নিছক অস্তিত্বের হাহাকারমাত্র। বিমূর্ত ছবির মতো জগতবাবুর

এই তিনটি গল্পই সহজবোধ্য নয়। তবে কবিতার মতো তাঁর গল্পের ব্যঞ্জনা বেশ কিছুক্ষণ চেতনাকে আপ্লুত করে রাখে। সম্ভবত এটাই তাঁর রচনাশৈলীর কুশলতা। রঙের বদলে শব্দ এবং তুলির বদলে লেখনীর এমন সযত্ন ব্যবহার অবশ্যই নিপুণ শিল্পকর্ম। তবু একথা অস্বীকার করতে পারি না যে তাঁর গল্পের মানুষ কেউই রক্তমাংসের হয়ে উঠতে পারে নি। লেখকের নিজের কথাতেই রয়েছে তার স্বীকৃতি—"ছায়া ছায়া অন্ধকারে মানুষগুলি চলাফেরা করেছে, একে অন্যের গা বাঁচিয়ে।"

'কাছিম' তরুণ গল্পকার জীবন সরকারের প্রথম গল্পসংকলন। এর অধিকাংশ গল্পই গতানুগতিক গ্রাম-জীবনের পটভূমিতে লেখা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বহু ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত কেবল যে নগর-জীবনকে ওলটপালট করেছে তাই নয়, গ্রামজীবনকেও প্রতিমুহূর্তে ভেঙেচুরে নতুন করে গড়ছে, এটা সম্ভবত লেখকের অজানা নয়। নদ-নদী, খাল-বিল, গাছ-গাছালিই বাঙলাদেশের সব কিছু নয়। তার মাঝখানে যে মানুষগুলো বিগত কয়েক দশকের যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত তাদের চেহারা বাদ দিয়ে লেখক কেবল তাঁর কৈশোর-স্বপ্নের রোমন্থন করেছেন মাত্র। অধিকাংশ গল্পের উপজীব্য প্রেম এবং প্রাসঙ্গিকভাবে এসে-পড়া কিছু রোমান্স যার পরিণতিও লেখকের মনগড়া। 'কালো হাঁস' গল্পে মঙলি নামক মেয়েটির আত্মহত্যা বা 'স্বয়ম্বরা' গল্পে টগরি নামে একটি মেয়েকে বাজি রেখে বাইক প্রতিযোগিতা পাঠককে সহজেই রূপকথার জগতে টেনে নিয়ে যায়। অবশ্য বিষয়বস্তুকে বাদ দিলে, বাইক প্রতিযোগিতার বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক নিঃসন্দেহে তার অভিজ্ঞতার ছাপ রাখতে পেরেছেন। তবে জীবনের অভিজ্ঞতা লেখককে যেমনভাবেই উদ্বুদ্ধ করুক না কেন সময়ের দাবিতে আর একটু সচেতনতা বাঞ্ছনীয় ছিল। বরং শ্রমিক-জীবনের সমস্যাকেন্দ্রিক যে গল্পটি এখানে সংকলিত হয়েছে তা অপেক্ষাকৃত বাস্তব। 'দর্পণে সংগ্রামের মুখ' গল্পটিতে লেখকের যে সংগ্রামী মানসিকতাটুকুর স্পর্শ পাওয়া যায় আগামী দিনে হয়তো তা তাঁর সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হবে। 'কাছিম' গল্পে কাছিম শিকারের বর্ণনায় কিছু অভিনবত্ব রয়েছে। জীবনবাবুর লেখনশৈলী আর একটু বলিষ্ঠ হতে পারলে হয়তো তাঁর রচনা আমাদের শিল্পচেতনাকে নাড়া দিতে পারত। তবু তরুণ গল্পকারের কিছু প্রতিশ্রুতি একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

মুকুল রায়

মার্কস এঙ্গেলস লেনিন স্তালিন হো-চি-মিন ও মাও-সে-তুঙের কবিতা। সম্পাদনা ও ভূমিকা: সন্দীপ সেনগুপ্ত। পরিবেশক: স্ট্যাণ্ডার্ড পাব্লিশার্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২। দাম চার টাকা।

সকলেই কবি নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় যেন আন্তর্জাতিক সব কমিউনিস্ট শিক্ষক ও নেতাই কবি - যদিও এই নামের তালিকাটি বিভ্রান্তিকর। চীন-বিপ্লবের নেতৃত্বকালে মাও-ৎসে-তুঙ কিছু স্মরণীয় কবিতা লিখেছিলেন কিন্তু চীনের রাজনীতির সামগ্রিক অধঃপতন মাও-ৎসে-তুঙ-কে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকেই সরিয়ে দিয়েছে। তাই একত্রে এই কয়েকজন নেতার নাম আপত্তিজনক। হো-চি-মিন বা মাও-ৎসে-তুঙের কবিতার অনুবাদ অবশ্য অনেকেই করেছেন এবং দীর্ঘকাল ধরে। সন্দীপবাবুও মূলত পূর্বের অনুবাদই সংগ্রহ করেছেন—যদিও শেষ পৃষ্ঠায় নমো নমো করে টানা গদ্যে অনুবাদকদের নাম একবার মাত্র উল্লেখ করায় পাঠকরা প্রতারিত হতে পারেন। ফলে উদ্‌ভ্রান্ত পাঠককে খুঁজে নিয়ে জানতে হয়। মার্কসের কবিতা সমর সেন ও সুখময় দাশগুপ্ত-র এবং লেনিনের কবিতা অরুণ মিত্রের অনুবাদ। উদ্‌ভ্রান্ত, কারণ এর ফলে পাঠক ভাবতে প্ররোচিত হন কেন তিনি হো-চি-মিন বা মাও-ৎসে-তুঙের ক্ষেত্রেও জ্যেষ্ঠ বাঙালি কবিদের শরণাপন্ন হলেন না? তাঁর অন্যান্য অনুবাদকর্ম ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে একটু ব্যস্ততা চোখে পড়ে। আমরা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করছি সন্দীপবাবুর কর্মোদ্যোগ ও উৎসাহপ্রেরণার। আর আশা করছি আরো একটু সচেতনতা ও যত্ন।

সুতরাং ভাল আছি। সুনীল হাজরা। আত্মপ্রকাশ প্রকাশনী, ৭১/৪/১ তাঁতিপাড়া লেন, হাওড়া ৪। দাম দুই টাকা।

বেশ কিছুকাল যাবৎ কবিতা লিখছেন সুনীলবাবু। নানা ছন্দে কবিতা লিখতে পারেন তিনি। সপ্রতিভভাবে এবং চড়া গলায়। বামপন্থী সাংবাদিকতার মেজাজও আছে। পরিণত পাঠকের শুধু একটু আফশোষ থেকে যায়, অন্তরঙ্গতা কি লেখাগুলিতে খানিকটা বেশি জড়িয়ে থাকতে পারত না!

যন্ত্রণার জন্য জন্মের যন্ত্রণা। করুণাপ্রসাদ দে। অধুনা সাহিত্য, হালিসহর, চব্বিশ পরগণা। দাম তিন টাকা।

এই তরুণ কবি চেষ্টা করছেন নিষ্ঠার সঙ্গে লেখার, প্রকৃত অর্থে কবিতা রচনার যোগ্য হয়ে ওঠার। বিষ্ণু দে-র অনুরাগী পাঠক করুণাপ্রসাদ এবং তাঁর

ইতিবাচক প্রভাব আছে অনুজের কবিতায়। দেশকাল সম্পর্কে মোটামুটি স্বচ্ছ ও সুস্থ বোধ এবং প্রাকরণিক দক্ষতা কবিতাগুলিকে যথেষ্ট পাঠযোগ্য করে তুলেছে।

কিছু কবিকণ্ঠ। সুনীল দাশ এবং সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য-প্রয়াসী, হাওড়া ২। দাম তিন টাকা।

এটি নানা কবির কবিতার একটি সংকলন। গ্রন্থভুক্ত কবিদের নাম গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ দাশগুপ্ত, নির্মল ধর, পরমেশ মজুমদার, বরুণ ঘোষ, শৈলেন শেঠ, সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও সুনীল দাশ।

সুকান্তের সমাজচেতনা। নিখিল পাল। মৌসুমী প্রকাশন, কলকাতা ৬০। দাম ন টাকা।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বিষয়ে এত বড় একটি বই লেখা হয়েছে, এটা প্রথমেই যেমন খুব উৎসাহের ব্যাপার, পরে বইটি পড়তে গিয়ে সেই উৎসাহ কিছুটা নিভে যায়, যখন পাঠক দেখেন, বইটিতে পাতার পর পাতা জুড়ে রাজনৈতিক পটভূমির মামুলি ও প্রায় অপ্রাসঙ্গিক তথ্য সমাবেশ করা হয়েছে শুকনো রাজনৈতিক সাংবাদিকতার ভাষায় কিংবা শেষ প্রবন্ধে তাকে সরল সমীকরণে মেলানোর চেষ্টা হয়েছে সুকান্ত-র কবিতার সঙ্গে। তবু সুকান্ত সম্পর্কে নানা তথ্য জানাবার যে চেষ্টা করেছেন লেখক তা কিছুটা অভিনন্দনযোগ্য তো বটেই। মুদ্রণপ্রমাদ বড় বেশি নয় কি? সবটাই কি মুদ্রণপ্রমাদ?

বিশপ হেবারের চোখে বাংলাদেশ। মুনতাসীর মামুন। সুবর্ণ প্রকাশন, ঢাকা　দাম চার টাকা।

১৮১৪ সালে কলকাতায় যে লর্ড বিশপের পদ সৃষ্টি হয়, রেজিনাল্ড হেবার ছিলেন তার দ্বিতীয় বিশপ। তিনি শুধু ধর্মকর্ম নিয়েই মেতে থাকেন নি বা কলকাতাতেই আটকে পড়েন নি—সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়েছেন, খোলা চোখে দেখেছেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল। তাঁর সেই অভিজ্ঞতা লিখেও গেছেন অক্লান্তভাবে। তা থেকে সে-যুগের ভারতবর্ষের চমৎকার ছবি পাওয়া যায়। হেবারেরই এরকম একটি ডায়েরিতে পাওয়া যায় ১৮২৪-২৬ সালের কলকাতা থেকে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের বিবরণ। পথে পড়ে ঢাকা—আজকের বাঙলাদেশের রাজধানী ঢাকা।

হেবারের চোখে দেখা সেই ঢাকার বর্ণনাই মুনতাসীর মামুন তাঁর অনবদ্য সরল সহজ ভাষায়, মনে হয় সাধারণ পাঠক ও কিশোরদের জন্য সংক্ষেপে, খুবই সংক্ষেপে (মাত্র ৩০ পৃষ্ঠায়), লিখেছেন এই বইটিতে। অসামান্য ছাপা, ভালো কাগজ, পাতায় পাতায় ছবি (হেবারের-ই আঁকা স্কেচের প্রতিলিপি)—যেমনটি হয়ে থাকে বাঙলাদেশের প্রায় প্রতিটি গ্রন্থে।

কবিতা, নিঃসঙ্গপ্রবাস ও মনোমোহন ঘোষ। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় গবেষণা পরিষৎ, কলকাতা ৩। দাম আট টাকা।

সুনীলবাবু অল্প বয়সেই গবেষক হিসেবে নিজের যোগ্যতা ও কৃতিত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। 'গবেষক' বলতে যে-সব ভালো গুণের কথা মনে আসে, সবই তাঁর লেখায় আছে—অর্থাৎ তথ্যনিষ্ঠা অথচ রসবোধ। এই গ্রন্থটিও তাঁর ক্ষমতা ও রসজ্ঞতার আরেক দৃষ্টান্ত। কি বিপুল পরিশ্রম করে "শ্রীঅরবিন্দের মধ্যমাগ্রজ" মনোমোহন ঘোষ, যিনি "আমরণ জ্ঞানার্জনের প্রতীক", আবার "কবিতার জগতের এক নির্জনতম অধিবাসী"—এই পণ্ডিত এবং ইঙ্গভারতীয় কবি-র সমগ্র পরিচয়কে তিনি আবিষ্কার করেছেন, তা দেখলে শ্রদ্ধাবনত হতে হয়।

কমিউনিস্ট পার্টির অর্ধশতক

একটি দেশে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার অর্থ—সেই দেশের ইতিহাসে মার্কসবাদের তত্ত্বের ফলিত প্রয়োগ শুরু হল।

মার্কসবাদের তত্ত্ব প্রযুক্ত হওয়ার ফলে সেই দেশের ইতিহাসচেতনায় বিপ্লব ঘটে যায়—ইতিহাস মানে তখন আর শুধু অতীত নয়, ইতিহাস মানে তখন ভবিষ্যৎ।

মার্কসবাদ মানুষকে প্রথম জানিয়েছে—সমাজবিজ্ঞানের অনিবার্য নিয়মেই সমাজপরিবর্তন ঘটে আর সেই নিয়মগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই মানুষ তার ঈপ্সিত ভবিষ্যত গড়তে পারে।

কমিউনিস্ট পার্টি সেই প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ নির্মাণের সংগঠন।

কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা তাই একটি জাতির জীবনে সোনার কাঠির ছোঁয়া—তার চৈতন্য থেকে কর্ম সব কিছুই বদলে যায়, নতুন হয়ে ওঠে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার অর্ধশতাব্দী পূর্ণ হল ১৯৭৫-এর ২৬ ডিসেম্বর।

এ-দেশে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক অর্থ: এ-দেশের জাতীয় রাজনীতিতে শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। আর আমাদের জাতীয় রাজনীতিতে শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ঐতিহাসিক অর্থ: জাতীয় রাজনীতিতে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার অপরিবর্তনীয় ভূমিকা। আমাদের দেশে, কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী তার ঐতিহাসিক ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছিল, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের এক বিশেষ স্তরে। তখন কমিউনিস্ট পার্টি নিশ্চয়ই ছিল নিতান্তই ছোট, তখন শ্রমিক আন্দোলনও নিশ্চয়ই ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ। কিন্তু সেই ছোট পার্টির সীমাবদ্ধ আন্দোলনের প্রধান প্রেরণা ছিল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভেতর দিয়ে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ও রক্ষার শক্তি আর শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবোধ। তাই শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির প্রতিষ্ঠার অনিবার্য অভিঘাত পড়েছিল জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি, স্বাধীনতাসংগ্রামের অপরিহার্য অংশ হিসেবে শ্রমিককৃষকের শ্রেণীগত আন্দোলনের স্বীকৃতি, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলন ও ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের অবিভাজ্যতা, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ভেতরের শ্রেণীসংগ্রাম ও উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঐক্য—সম্পূর্ণ নতুন এই

উপাদানগুলি আমাদের জাতীয় আন্দোলনে সংযোজিত হয়েছিল মার্কসবাদের বিজ্ঞানে শিক্ষিত শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন, কমিউনিস্ট পার্টি, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। ফলে, স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের বিশ্বঅভিযানের সশস্ত্র আশঙ্কা সত্য প্রমাণ হলে আর তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে পরিণত হলে ভারতের জাতীয় সংগ্রাম ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক সংগ্রামেরই অংশ হয়ে যেতে পেরেছিল। তাই, আমাদের দেশের বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থায় ও নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কারণে, প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রাম আমাদের জাতীয় সংগ্রামেরই একটি অনিবার্য পরিণতি আর কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি আমাদের দেশের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অর্থে অসমাপ্ত জাতীয় সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি পালনের ইতিবাচক উদ্যোগ।

কমিউনিস্ট কর্মসূচির চরিত্র অনুযায়ী এই উদ্যোগও সামগ্রিকতারই অন্বেষী। মানুষের পারিবারিক জীবনকে তার সামাজিক জীবন থেকে, ব্যক্তিজীবনকে পারিবারিক জীবন থেকে, মনোজীবনকে ব্যক্তিজীবন থেকে, কর্মজীবনকে মনোজীবন থেকে খণ্ড বিচ্ছিন্ন করে ফেলা ও করে রাখাই হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পক্ষে অনিবার্য। কমিউনিস্ট কর্মসূচির রূপকার শ্রমিকশ্রেণী সেই বিচ্ছিন্নতা দূর করতে চায়। তাই কলে কারখানায় অফিসে কাছারিতে শ্রমিক-কর্মচারীদের নেহাতই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন আর গ্রাম-গ্রামান্তরে কৃষকের ফসল-ফলানোর নিয়ত প্রয়াস আর সুরকারের নতুন সুর খোঁজা, কবির নতুন ছন্দসন্ধান—সবই সেই এক মহৎ উদ্যোগের অংশ। জীবিকার লড়াই এতো বেশি অব্যবহিত যে অনেক সময়ই হয়তো জীবনের লড়াই কম গুরুত্ব পায়। আবার কখনো হয়তো হাতে-কলমে মাথায় ঘামে ইতিহাস নির্মাণের উজ্জীবনী দায়িত্ব থেকে ছুটি নিয়ে ইতিহাস কথা রচনার রোম্যান্স পেয়ে বসে। সে-সবই স্খলন, সে-সবই চ্যুতি। আর নিশ্চয়ই সাময়িক। সে-সব স্খলন-পতনের পরও মানব-সমগ্রের অখণ্ডতার কমিউনিস্ট অন্বেষাই সবচেয়ে বড় সত্য।

শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ, মার্কসবাদের বিজ্ঞানে শিক্ষিত, ভারতের মেহনতি মানুষের অর্ধশতকের সহযাত্রী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি রূপায়ণের ভেতর দিয়ে এই আমাদের ভারতবর্ষের, এই আমাদের ভারতীয় জাতির রুদ্ধ সৃষ্টিশীলতার মুক্তির পথ তৈরি করতে চায়—সেই সৃষ্টিশীলতার দুই পা হাজার হাজার বৎসর ধরে বয়ে আসা লৌকিক ঐতিহ্যের গভীরে প্রোথিত থাকবে, তার মাথা ব্যক্তিগত শিল্পকর্ম আর মননের কৈলাসশিখরে।

কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচি এর কম কিছুই নয়—অর্ধশতক পূর্তির এই সন্ধিকালেও এটাই কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিশ্রুতি।

টাকায় কেনা নাম ঃ বিড়লা মিউজিয়াম

আমীর আলি এভেন্যু থেকে গুরুসদয় রোডে ঢুকতেই ডান দিকে খোলা সবুজ চত্বরের গায়ে ১৯/এ, নম্বর বাড়িটির মধ্যে ঢুকলেই সামনের দেয়ালে একটি বিরাট তৈলচিত্র। বাড়িটি কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা বিভাগ পরিচালিত শিল্প ও কারিগরি মিউজিয়ামের প্রদর্শনীগৃহ। আর এই মিউজিয়ামের সঙ্গে নিতান্তই বে-মানান এবং বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কহীন রাজা ঘনশ্যাম দাস বিড়লার ঐ তৈলচিত্রটি সবার আগে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। পাশের দেয়ালে রয়েছে দেশবিদেশের বিজ্ঞানীদের অপেক্ষাকৃত ছোট চিত্র।

কি করে ঐ বিরাট তৈলচিত্রটি এই বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর দেয়াল জুড়ে রয়েছে? আর কেনই বা সরকারী অর্থে, সরকারী সংস্থা এই মিউজিয়ামের নামের আগে বিড়লার নাম যুক্ত হয়ে এর নাম হয়েছে "বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাণ্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম।"

এই নামটির পেছনে এক ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে।

বিশের দশকের বাঙলা। স্বাদেশিকতা ও স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে কলকাতা প্লাবিত। স্বাদেশিকতার পীঠস্থান ঠাকুর পরিবারের সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি ছিল এখানে। আজ তারই নতুন ঠিকানা ১৯/এ, গুরুসদয় রোড। এই বাড়ির কাছেই ছিলেন প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। এমনি-ভাবে ঐ অঞ্চল তখনকার একটি সাংস্কৃতিক ও স্বাদেশিকতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

১৯২০ সালে নিদারুণ অর্থসঙ্কটে পড়েন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিছু টাকা তাঁর চাই-ই। তখন নিজ বসতবাড়িটি বিক্রি অপরিহার্য হয়ে ওঠে। বিড়লাদের কাছে বাড়িটি বিক্রির কথা হয় এবং সহকর্মী নলিনীরঞ্জন সরকার বাড়িটি নাম-মাত্র দামে বিড়লাদের পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন।

শোনা যায়, বিড়লাগোষ্ঠীর অন্যান্য অনেক বেনামা সম্পত্তির মতো এই বাড়িটিও বাড়ির তিনজন চতুর্থশ্রেণীর কর্মীর নামে কেনা হয়েছিল।

১৯৫৯ সালে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কলকাতায় একটি বিজ্ঞান মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেন। তখন বিড়লাগোষ্ঠী এই বাড়িটি ২০

লক্ষ টাকা দাম ধরে "দান" করে। যদিও দলিলপত্রে নাকি স্বাক্ষরদাতা সেই তিনজন চতুর্থশ্রেণীর কর্মী। ১৯২০ সালে, বাড়ি কেনার সুদীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর পরে দান করার সময় আগেকার কর্মীরা, যাদের নামে কেনা হয়েছিল, বেঁচে ছিলেন কিনা বা তাঁদের উত্তরাধিকারীদের বদলে অন্য কাউকে "দাঁড় করিয়ে" দলিলপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল কিনা তা কেউ জানে না। তবে এটা ঠিক যে, বিড়লা পরিবারের পক্ষে সবই সম্ভব। যারা বিষ্ণু মন্দিরের নাম দিতে পারেন "বিড়লা মন্দির" তাঁরা কি না পারেন ?

ডাঃ রায় তাঁর শেষজীবনের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও এই মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠাকে অবশ্যকর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে গড়ে তোলেন মিউজিয়ামটি। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনিই ছিলেন এর পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান।

জীর্ণ বাড়িটি নেবার পরেই ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এর সংস্কার করতে হয় এবং প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের প্রথম বিজ্ঞান মিউজিয়াম।

গত ১৭ বছর ধরে এখানে তিলে তিলে গড়ে উঠছে একটি জাতীয় সম্পদ। যার অর্থ যোগাচ্ছে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা বিভাগ এবং জনসাধারণ। প্রতিদিন শত শত ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষ প্রদর্শনী দেখতে আসেন। একে কেন্দ্র করেই পূর্বভারতে ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর আঞ্চলিক বিজ্ঞান মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—পুরুলিয়া, কাঁথি ও মালদহে।

এখানে রয়েছে টেকনিক্যাল বই-এর বিরাট রেফারেন্স লাইব্রেরি। এখানে রয়েছে সংস্থার বিশেষজ্ঞদের পরিচালনায় 'ক্রিয়েটিভ এবিলিটি সেণ্টার'। স্কুলে স্কুলে গিয়ে এবং মিউজিয়ামে ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞানবিষয়ে সৃজনশীল কাজে সহযোগিতা করাই এই সেণ্টারের লক্ষ্য। আর রয়েছে টেলিভিশন, টেলিস্কোপ দেখাবার ব্যবস্থা এবং বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞান ভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী।

সর্বোপরি রয়েছে এর এগারোটি প্রদর্শনী কক্ষ। বিভাগগুলি হল—নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, মোটিভ পাওয়ার, পরিবহন, জনপ্রিয় বিজ্ঞান, খনি, তামা, লোহা ও ইস্পাত, পেট্রোলিয়াম, ইলেক্‌ট্রিসিটি, ইলেক্‌ট্রনিক্‌স ও টেলিভিশন এবং কম্যুনি-কেশন (যোগাযোগ) প্রভৃতি। কয়েকটি বিভাগ সম্পর্কে উল্লেখ করা অবশ্যই দরকার। যেমন, পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা (নিউক্লিয়ার ফিজিক্স)। বিভিন্ন মডেলের মাধ্যমে এখানে দেখানো হয়েছে কিভাবে পরমাণুর মধ্যে লুকিয়ে-থাকা শক্তিকে মানুষের কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। এর সহজবোধ্য একটি দিক হিসেবে রয়েছে "প্রশ্ন-উত্তর বোর্ড"।

মেটিভ পাওয়ার (চালিকাশক্তি) কক্ষে দেখানো হয়েছে—সেই আদি কালে মানুষ কিভাবে কায়িকশ্রমে গড়ে তুলছে বিশাল পিরামিড। সেই থেকে শুরু করে পরমাণু শক্তি প্রকল্প পর্যন্ত চালিকাশক্তির ক্রমবিকাশ।

পরিবহন প্রদর্শনী কক্ষে দেখানো হয়েছে মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত গরুর গাড়ির নিদর্শন থেকে শুরু করে আজকের রকেট পর্যন্ত পরিবহনের ক্রমবিকাশ।

যোগাযোগ অংশে সেই প্রাচীন কালের পায়রার ডাক থেকে শুরু করে আজকের উপগ্রহ-যোগাযোগ পর্যন্ত দেখানো হয়েছে।

জনপ্রিয় বিজ্ঞান প্রদর্শনী কক্ষে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে মজার মজার মডেলের মাধ্যমে সাধারণের উপভোগ্য করে তোলা হয়েছে।

এই সব সচল প্রদর্শিত বিষয়ের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। কাজেই বর্ণনা সংক্ষিপ্ত রইল। লেখার উদ্দেশ্য হল মিউজিয়ামের বিরাটত্ব, গুরুত্ব এবং তার জন্য সরকারী অর্থ ও কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টার একটি আভাস দেওয়া।

মিউজিয়ামটির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও খুব উৎসাহজনক। এখন যে পথ দিয়ে মিউজিয়ামের ঘরে যেতে হয় সেখানে শীঘ্রই গড়ে উঠবে সুউচ্চ বহুতলবিশিষ্ট প্রদর্শনীগৃহ। কেন্দ্রীয় সরকার এর জন্য ৩৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুরও করেছে। এ ছাড়া প্রদর্শনী সাজাতেও খরচ হবে আরও ৩০/৩২ লক্ষ টাকা।

এখানে থাকবে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগে শক্তি (এনার্জি), কয়লা ও কয়লাখনি সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক ও কয়লা-ভিত্তিক অন্যান্য বিষয়। আর থাকবে জ্যোতির্বিদ্যা ও মহাকাশ গবেষণায় অগ্রগতি।

এই বিশাল কর্মযজ্ঞে বিড়লাগোষ্ঠীর কোনো দানই নেই। আর অন্য শিল্প-পতিরাও এখানে অর্থ দিয়ে বিড়লার গৌরব বাড়াবে কেন? এখানে ব্যয়িত সমগ্র অর্থই জনসাধারণের। অথচ প্রতিষ্ঠানটির নাম থাকছে বিড়লা মিউজিয়াম।

আমাদের দেশে একজন শিল্পপতির কাছে "নাম বিক্রি" হলেও সারা পৃথিবীতে এমন নজির আর নেই। বরং এর বিপরীত চিত্র অর্থাৎ একজন শিল্পপতি রোজেনওয়াল্ড নিজের অর্থ দিয়ে নিজের নামে একটি বিজ্ঞান ও শিল্প প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি নিজেই তার নাম পরিবর্তন করে "শিকাগো মিউজিয়াম অব সায়েন্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি" করেন। তিনি এটা করেন মিউজিয়ামকে নিজের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে অন্য সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য।

ব্রিটিশবিজ্ঞানী জন স্মিথসন তাঁর সারা জীবনের সমগ্র সঞ্চয় মানুষের মধ্যে জ্ঞানবিতরণের জন্য দান করেন। সেই অর্থে তৈরি হয় ওয়াশিংটনের বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞান মিউজিয়াম। এঁর নামেই ঐ মিউজিয়ামের নামকরণ করা হয়েছে "স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিট্যুট"।

ফিলাডেলফিয়ার বিখ্যাত বিজ্ঞান মিউজিয়ামের নামকরণও হয়েছে বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন-এর নামে—ফ্রাঙ্কলিন ইনস্টিট্যুট (সায়েন্স মিউজিয়াম)।

ইতালির বিজ্ঞান মিউজিয়ামের নামও রাখা হয়েছে মনীষী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি-এর নামে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মহাকাশ সংক্রান্ত মিউজিয়ামের নাম রাখা হয়েছে মহাকাশ-বিজ্ঞানের জনক জিয়লকোভাস্কির নামে। প্রতিষ্ঠাও করা হয়েছে তাঁরই জন্মস্থানে। এ ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত বড় বড় বিজ্ঞান মিউজিয়ামের নাম সেই সেই শহরের নামের সঙ্গে যুক্ত।

সারা বিশ্বেই আর সব বিজ্ঞান মিউজিয়ামগুলির নাম শহর, জাতি বা দেশের নামের সঙ্গে যুক্ত।

আমাদের দেশেও কেন্দ্রীয় সরকারের অপর বিজ্ঞান মিউজিয়ামটির নাম বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বেসরাইয়ার নামের সঙ্গে যুক্ত রাখা হয়েছে। আর "কাল্‌টিভেশন অব সায়েন্স", "এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন", "এ্যাটমিক রিসার্চ স্টেশন" প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির নামও কোনো ব্যবসায়ীর নামের সঙ্গে যুক্ত নয়।

তবে দেশে বিদেশে দাতাদের দানসম্বলিত নামের ফলক প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়। অবশ্য রুচিশীল দাতারা এভাবে নাম জাহির করা নীচতা বলে মনে করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে "ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাণ্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামে"র নামের সঙ্গে বিড়লা নামটি নিতান্তই বে-মানান তো বটেই কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা, দেশের ও জাতির পক্ষে সম্মানহানিকর।

অতীন সরকার

সাহিত্য প্রসঙ্গে মিখাইল শলোকভ

শলোকভের সাহিত্য হল মহাকাব্যিক। এই তো সেদিন তাঁর সত্তর বছর পূর্তিতে এযুগের এই শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্য-স্রষ্টা সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সম্মান 'অর্ডার অব লেনিন'-এ ভূষিত হলেন।

'অ্যাণ্ড কোয়াইট ফ্লোজ দি ডন' ও 'ভার্জিন সয়েল আপটার্নড'-এর বিশ্বখ্যাত লেখক এখন ব্যাপৃত রয়েছেন তাঁর 'দে ফট ফর দেয়ার মাদারল্যাণ্ড' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটি রচনায়। এ বইটি হল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানবতার বিজয়ের সংগ্রামে সোভিয়েত জনগণের অসীম বীরত্ব ও আত্মত্যাগের অবিস্মরণীয় কাহিনী।

সাহিত্য সৃষ্টি, সাহিত্যিকের কাজ ও সমাজে লেখকের ভূমিকা সম্পর্কে শলোকভ নানা সময়ে লেখায় ও ভাষণে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা হল একটি পদ্ধতি যা সোভিয়েত শিল্পসাহিত্যের মূলে রয়েছে। শলোকভ বলেন, "সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা হল সেই শিল্পপদ্ধতি যা মানুষকে এক নতুন জীবন গড়ায় সক্রিয় সহায়তা দিতে পারে।" অর্থাৎ এই সক্রিয়তা হল মানসিকতার, দৃষ্টিভঙ্গির। শলোকভের মতে এই শিল্পপদ্ধতি "এমন একটি বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশক যা বাস্তবতা থেকে পশ্চাদপসরণকে প্রত্যাখ্যান করে। মানবসমাজের প্রগতির স্বার্থে যা সংগ্রামের আহ্বান জানায়, কোটি কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য অর্জনে যা সহায়তা করে এবং এই লক্ষ্যাভিমুখী পথকে যা আলোকিত করে।"

সাহিত্য ও শিল্পের শ্রেণী-চরিত্রকে শলোকভ তুলে ধরেন আবেগের সঙ্গে। তিনি বলেন, উপন্যাসের কোনো চরিত্র-চিত্রণের সময় লেখক তাঁর সহানুভূতি বা বিরূপতা লুকিয়ে রাখতে পারেন না, পাঠকের কাছ থেকে তিনি তাঁর ভাবাদর্শগত মতামতকে লুকিয়ে রাখতে পারেন না।"

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সৃষ্টিশীল সাফল্যের উৎস ও প্রেরণা হিসেবে শলোকভ পার্টি-চেতনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। এপ্রসঙ্গে তিনি লেখেন, "বিদেশে আমাদের কুৎসাকারী শত্রুরা রটায় যে আমরা, সোভিয়েত লেখকরা, নাকি পার্টির নির্দেশে লিখি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা কি? আমরা আমাদের হৃদয়ের নির্দেশে লিখি, আর আমাদের হৃদয় আমাদের পার্টি ও জনগণের প্রতি নিষ্ঠাবান।"

একজন প্রথম সারির লেখকের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে 'অ্যাণ্ড কোয়াইট ফ্লোজ দি ডন'-এর স্রষ্টার অভিমত হল এই যে, "পাঠকের সঙ্গে স্পষ্ট সংলাপ কর, মানুষকে যা সত্য তাই বল, এমনকি তা কঠিন সত্য হলেও, কিন্তু সব সময়েই সাহসিক সত্য। মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করে দাও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা, আর সেই ভবিষ্যৎ যে তারা গড়তে পারে সে সম্পর্কে তাদের আত্মশক্তিতে আস্থা; তোমার লেখা যেই পড়ুক প্রগতি ও অগ্রগতির স্বাভাবিক ও মহান

আদর্শে জনগণকে তা একত্রিত করে তুলুক।" নিজের সম্পর্কেও শলোকভ বলেন যে, তিনি নিজে সেই জাতের লেখক যারা তাদের "লেখনীকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করতে পারাকেই শ্রেষ্ঠ সম্মান ও শ্রেষ্ঠতম স্বাধীনতা বলে গণ্য করে।"

শলোকভের সমগ্র সৃজনশীল প্রতিভা ও তাঁর সমস্ত জনসেবামূলক কাজকর্মের মূলে রয়েছে সোভিয়েত সমাজব্যবস্থার অগ্রগতিকে জোরদার করে তোলা। তিনি লিখেছেন, "সোভিয়েত বাস্তবতা থেকে বিচ্যুত কোনো সোভিয়েত লেখক হতে পারেন তা কল্পনা করা যায় না। সোভিয়েত জনসমাজের সঙ্গে একজন সোভিয়েত লেখকের কি সম্পর্ক হওয়া উচিত তা আমার ব্যক্তিগত জীবনের কাজকর্ম থেকেই প্রকাশিত। আপার ডন এলাকার ভেশেনকাইয়া গ্রামের আমি একজন অধিবাসী। গৃহযুদ্ধকালে আমি সোভিয়েত ক্ষমতার বিজয়ের জন্য লড়াই করেছি। সোভিয়েত আমল ও বলশেভিক পার্টির দ্বারাই আমি লালিত। আমি মেহনতী জনগণের সন্তান··· ।"

জনগণের প্রতি আনুগত্য ও তার সেবার মধ্যেই শলোকভ লেখক হিসেবে একজন লেখকের ও তার সামাজিক সত্তার কর্তব্য দেখতে পান। শলোকভ লেখেন, "আমাদের যুগে জীবন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় যে, একমাত্র জনগণের স্বার্থে যে শিল্প রচিত তাই মানুষের মধ্যে স্থায়ীভাবে বাঁচে।"

শলোকভ বার বার বলেছেন যে, একজন লেখককে জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকতে হবে, যে বই তিনি লিখবেন তার চরিত্রগুলির মধ্যে তাঁকে থাকতে হবে, জানতে হবে তাদের প্রকৃতি, তাদের অন্তর্গত জীবন, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা। তবেই সেই লেখকের শিল্পসৃষ্টি জনগণের হৃদয়ে আলোড়ন তুলতে পারবে।

শলোকভ লিখেছেন, "যে মানুষের কথা আমরা লিখি, সেই মানুষ, আমাদের সেই সব পাঠক, সর্বদাই আমাদের সঙ্গে আছেন। যখনই প্রয়োজন হয় তখনই তাঁরা আমাদের সমালোচনা করেন, আমাদের সমর্থন জানান, মনের মতো লেখা হলে আমাদের প্রশংসা করেন।"

তিনি আরও বলেছেন, "জনগণের অভিমত লেখকদের কাছে খুবই মূল্যবান। জনগণের আস্থা অর্জন এবং আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি ও দক্ষতা জনগণের স্বার্থে, পার্টি ও মাতৃভূমির স্বার্থে নিয়োজিত করতে পারছি এই সচেতনতা ছাড়া একজন লেখকের জীবন ও কাজের কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে।"

বিরাট প্রতিভাধর শলোকভ তাঁর নিজের লেখার ব্যাপারে অত্যন্ত দীর্ঘসূত্রী

ও খুঁতখুঁতে। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী লেখক। এ-প্রসঙ্গে শলোকভ একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, সোভিয়েত সাহিত্যে দুধরনের লেখার ধারা রয়েছে। "কতক লেখক আছেন যাঁরা খুব তাড়াতাড়ি সমসাময়িক ঘটনায় সাড়া দিতে পারেন। আবার কেউ কেউ আছেন যাঁরা লেখেন ধীরেসুস্থে, কিন্তু চেষ্টা করেন যাতে তাঁদের লেখা লোকে মনে রাখে।"

তিনি লিখেছেন, "মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সময় ঘটনা ঘটত খুব তাড়াতাড়ি এবং লেখকদেরও তাড়াতাড়ি সাড়া দিতে হত। এই ছিল তখনকার দিনে জীবনের দাবি। সে সময় আমিও অনেক লেখা তাড়াতাড়ি লিখেছি। তবু আমার পাঠকরা অধৈর্য হয়ে পড়লেও, আমি নিজে ধীরেসুস্থে কাজ করার পক্ষপাতী, তবে আমি এইটে দেখি যে এই ধীরগতি কাজ যেন শেষপর্যন্ত গুণগত উৎকর্ষের একটা সমুহ মানে উন্নীত হয়।"

শলোকভের নিজের রচনাবলী তাঁর এই কথা সমর্থন করে। শলোকভ যাই সৃষ্টি করেছেন, তা তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষ্য নিয়ে হাজির হয়েছে এবং একটা কালজয়ী গুণে গুণান্বিত হতে পেরেছে। যা পাঠকের মনঃসংযোগ দাবি করে, তাকে নাড়া দেয়, তার মন ভরে তোলে আনন্দে।

নির্মলাশিস সেন

"চারিদিকে নবীন যদুর বংশ"

সম্পাদক, পরিচয়, সমীপেষু

মাননীয় মহাশয়,

শারদীয় ১৩৮২-র 'পরিচয়' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অশ্রুকুমার সিকদারের 'চারিদিকে নবীন যদুর বংশ' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে ভালো লাগল। শ্রীযুক্ত সিকদার একটি তাৎপর্যপুর্ণ বিষয় নিয়ে গুরুত্বপুর্ণ আলোচনার চেষ্টা করেছেন। তবে প্রবন্ধটি পাঠ করে দু-একটি প্রশ্ন মনে জাগল—বিনীতভাবে নিবেদন করছি।

অশ্রুকুমার চমৎকার বলেছেন, "পুরাণের প্রাচীন অনুষঙ্গের মধ্যে লুকিয়ে থাকে গভীর কোনো পুনরাবৃত্ত প্রাসঙ্গিকতা—সেই গূঢ় সারাংশকে নিষ্কাশিত করে নেন আধুনিক কবি এবং ব্যবহার করেন নিজের সময়ের দর্পণ রচনার কাজে। সেই রচনায় প্রাচীন নবীন-বিষয়ে মন্তব্য করে, নবীন প্রাচীনের করে নবতর ব্যাখ্যা।" এই চিন্তায় স্থিত থেকেও অশ্রুকুমার কি করে অসতর্ক উক্তি করেন: "বিষ্ণু দে থেকে আরম্ভ **পক্ষপাতী** রূপায়ণ—কখনো অকপটভাবে, কখনো ছদ্মবেশে। বিষ্ণু দে-র 'পদধ্বনি'তে আমরা পেলাম **শ্রেণীসংঘাত-মুখর ইতিহাসতত্ত্বের** রূপায়ণ।" কবি যখন পুরাণকে নিজ সময়ের দর্পণ রচনায় ব্যবহার করেন, তখন তাঁর বিশ্ববীক্ষা, বা সমাজ-ইতিহাসের বোধের আলোকেই তা করেন—এখানে নিরপেক্ষ, পক্ষপাতী এসব শব্দ কি প্রাসঙ্গিক? আর "পক্ষপাতী" অর্থে শ্রেণীসংঘাতমুখর ইতিহাসতত্ত্বই কি? বিষ্ণু দে-র পদধ্বনির মহত্ত্বই তো এখানে, তিনি তাঁর বিশ্ববীক্ষায় মধ্যবিত্ত-র ইতিহাসের পটে মৌষল পর্বকে নিজ কবিতার কনটেণ্টে এনেছেন। আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইতিহাস অনুধাবন না করলে 'পদধ্বনি' বোঝা মুশকিল: এখানে বিশ শতকের ইউরোপসেবিকার কবিদের পুরাণ ব্যবহারের ঐতিহ্য যেমন তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল, তেমনি মেঘনাদবধের মাইকেল বা কচ-ও-দেবযানী বা কর্ন-কুন্তী সংবাদের রবীন্দ্রনাথের দেশীয় পরিপ্রেক্ষিত সমান কার্যকর। দেশকালচেতনা ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর ইতিহাসগত দৃঢ়ভূমি থাকে বলেই বিষ্ণু দে-র মিথ ব্যবহার ঐতিহাসিক পরিবর্তন ও বিকাশ থেকে পালিয়ে যাওয়া নয়: ফিলিপ রাইভ এরকম একটা আপত্তিই সাম্প্রতিক বিশ শতকের কবিদের মিথপুজা সম্পর্কে

করেছেন যে এটা আসলে ইতিহাস থেকে পালিয়ে যাওয়া। "পদধ্বনিও ফিনল্যাণ্ডে সোভিয়েত প্রবেশ মানেরহাইম দুর্গপ্রাচীর তৈরির সময়ে একটানাই লেখা। অর্জুনকে উল্টিয়ে..... বাঙ্গালি মধ্যবিত্তের সেই ১৯১২-১৮-র সুসময়ের স্মৃতি বারবার অর্জুনের নাট্যোক্তিতে ছায়া ফেলে। মহাশ্বেতার বিস্মরণ বা ক্রেসিডার স্মরণ তোমার হানে আজো তরবারির ব্যক্তিকেন্দ্রিক পটভূমি পদধ্বনিতে স্মৃতির দেশকালনির্ভর শ্রেণীগত পটভূমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের প্রাক্কালে বাঙ্গালি মধ্যবিত্তের শ্রেণী হিসাবে হতাশাবিধুর পরিবেশে মধ্যবিত্তের অতীতের স্মৃতিই একমাত্র মূলধন: মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কীর্তিজয়ের ঔপনিবেশিক সাফল্যকেই শ্রেণীগতভাবে জীবনের আদিগন্ত মুক্ত মোহানা মনে হয়েছিল: কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সমর্থনে অর্জুনের সুভদ্রাহরণের মধ্যেই, সুভদ্রাহরণ কবিতাটিতে প্রতীকী তাৎপর্যে এসেছে। আমাদের পলায়ন প্রেমের বিহ্বল বেগে—অতীতের বন্ধন ছিন্ন করে, দেশজ শিকড় থেকে প্রায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে নিজ শ্রেণীর স্বার্থে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্নতি করবার ইতিহাসটি 'পলায়ন' শব্দে চমৎকার আভাষিত হয়েছে। আর ভূমিকর্ষণের পৌরাণিক চিত্রকল্প বলরাম বা হলধরের প্রতি স্ফীতোদর শব্দটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। (মনে পড়ে প্রগতিশীল সোমপ্রকাশের উক্তি, চাষীরা পশুর পাল)। দেশজমৃত্তিকা থেকে, এই যে পলায়ন এতে নিশ্চয়ই সাময়িক লাভ ছিল: প্রাণৈশ্বর্যে ধনী সুভদ্রাকেই মনে হয় বীর জননী, এখানেও পৃথিবী মাতা ও কুমারীর আর্কেটাইপটির একত্র অবস্থিতি। কিন্তু ১৯৩৮-এ এই সাফল্য শুধু স্মৃতি: ধনঞ্জয়ের বার্ধক্যে অর্থাৎ বাঙ্গালি মধ্যবিত্তর পতন প্রক্রিয়ায় আবার নতুন পদধ্বনি শোনা যায় আরেক যুগান্তরের।" (কোমলে গান্ধারে বিষ্ণু দে: সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃ ৩০—৪৭, পৃ ৭২—৭৭)। এ জাগরণে মধ্যবিত্ত নায়ক সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে: পৌরাণিক চিত্রকল্প 'প্রচণ্ড কিরাত' আসে: কিরাতের ছদ্মবেশে মহাদেবের (যাঁর মধ্যে আর্য-অনার্য দুই উপদলই মেলে) অর্জুনকে পরাজিত করার কাহিনীটির উল্লেখে নতুন জনগণতান্ত্রিক জাগরণের আভাস দেন কবি, এখানে বিশ্বব্যাপী নতুন যুগান্তরের কথাই স্মরণে থাকে তাঁর। মধ্যবিত্ত বিকাশের দ্বন্দ্বে একে উদার প্রসাদ মনে হলেও আজ প্রশ্ন জাগছে, "দুরন্ত মিছিল", "কার পদধ্বনি আসে?" "এ যে দস্যুদল।" পদধ্বনির ব্যাখ্যায় এই ইতিহাস-প্রেক্ষিতটির বিবেচনা বড়ই প্রয়োজন। আর ভারতবর্ষে কেন, ১৯৩৮-এ কোথায়ই শ্রমজীবীর অভ্যুত্থান আসন্ন ছিল না: রাশিয়াই তখন মূলাধার। কিন্তু ১৯৩০-এর দশকে ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে

ক্রমাগত বৃহৎ ভূমিকা পালনে অগ্রসর হচ্ছিল তা যে কোনো প্রামান্য গ্রন্থ পাঠ করলেই জানা যাবে। মধ্যবিত্তর বাঁচবার একমাত্র উপায় শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে ঐক্যের সূত্রে হিগেমনি রচনায়ঃ মহাদেবের চিত্রকল্পে তার আভাস আছে—কিন্তু ট্র্যাজেডি এই, তা এখানে ঘটে নি, এই ট্র্যাজিক বিশ্ববীক্ষাই পদধ্বনিকে আরও তাৎপর্যময় করে তুলেছে। ব্যর্থ ধনঞ্জয় আজ, ব্যর্থ গাণ্ডীব অক্ষয়ের হাহাকারে বিষাদে মধ্যবিত্তকে অন্তত এই ব্যর্থতার চেতনাটুকু দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মৌষল পর্বের কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাটকের একটি পরিকল্পনার কথা স্মরণ করিঃ Krishna the five Pandava brothers and the heroes of the clan of Yadu were engrossed in big wars, big talk, big ideals and had no time to devote to their women. Women were their only for their household work. But they were not satisfied with that. In the meantime, the non-Aryan dasyus who were men of the earth used to come and talk to the women, sing to them and women were drawn to them. It was the women who destroyed the weapons of the Pandavas so that the robbers could easily abduct them. Arjuna went out to resist and found that his great Gandiva's string was cut. This play somehow was never written. But he used to talk of it now and then and used to laugh, "My readers will be furious if I write the play." (*Rabindranath Tagore*, Prasanta Chandra Mahalanobis. *Samvadadhyvam*, Vol. 10, Nos. 1—4).

আমার দ্বিতীয় আপত্তি শ্রীযুক্ত সিকদারের কালসন্ধ্যার ব্যাখ্যায়। ঠিক আপত্তি বলব না, অশ্রুকুমার বুদ্ধদেব বসুর শক্তি বলেছেন, সেটাই আমার মতে কবিতা পত্রিকার কীর্তিমান সম্পাদকের দুর্বলতা। মহাভারতের ঔচিত্যবোধ বুদ্ধদেব বিশশতকের দ্বিতীয় পর্বে বজায় রাখতে চান। নতুন ব্যাখ্যা, অর্থ নিষ্কাশন নয়। সবই তাঁর কাছে "কালপ্রেরিত।" কালের নিয়মে সব ঘটছেঃ মানুষের ভূমিকা কিছু নেই। ইতিহাসের এই শিক্ষাকে মেনে নেওয়াই নাকি প্রজ্ঞা। ভিয়েতনামে ফরাসীরা অত্যাচার করেছে, আমেরিকা নারকীয় পাশবিকতা দেখিয়েছে। সবই কালের নিয়মে। আবার ভিয়েতনামীরা যে জয়ী হল, তাও কালের নিয়মেই। হো-চি-মিনদের সংগ্রাম না করলেও চলত,

কালের নিয়মেই আমেরিকান-ফরাসীরা চলে যেত। এ সেই হেগেলীয় ধারণার সেই দিকটি যার বারবার মানববিরোধিতায় কাজে লেগেছে, কার্ল পপারের মতো কমিউনিস্ট-বিরোধীও যার প্রতিবাদ করেছেন। আর এ হচ্ছে বুদ্ধদেবেরও মার্কিনী-প্রজ্ঞা: সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় যে একে "শ্মশানবৈরাগ্য" ও "পরাভূত ভূমিকাহারার আত্মসান্ত্বনা" বলেছেন, তা বুদ্ধদেবের এই "কালের নিয়মের", মানুষের-ব্যক্তির ভূমিকাহীনতার কথা ভেবেই। কিন্তু ব্যাপার আরও গভীর: সমাজ-দেশ-পরিবর্তনের যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম দিকে দিকে, বুদ্ধদেব বসুদের ইতিহাসবীক্ষা তারই বিপক্ষে। আর কালসন্ধ্যায় শ্রমজীবীর জাগরণের জয়নাদ কোথায়? শ্রমজীবী—একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক-মানবিক পদ। কালসন্ধ্যায় তো কতগুলি লোভী দস্যুদল আছে—পদধ্বনি অর্জুনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা, ফলে তারই ব্যর্থতা, দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা, দ্বন্দ্ব সেখানে রূপায়িত। এখানে তো তা নয়। বুদ্ধদেবের মহান ঔচিত্যবোধে, অন্তত অশ্রুকুমারের ব্যাখ্যায়, বোধহয় তাই হয়। অথচ পৌরানিক প্রসঙ্গের ব্যবহার দেশকাল চেতনায় গভীর হয়েই চলেছে—এমন কি ফিল্মেও! সেদিনই তার পরিচয় পেলাম প্যাসোলিনির রাজা ইডিপাসের মহৎ চলচ্চিত্র রূপে।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

পল রোবসন

জন্ম—১৮৯৮ মৃত্যু—১৯৭৬

বিশ শতকের প্রথম পর্বে আমেরিকার নিগ্রোদের দুঃখ, যন্ত্রনা আর বিদ্রোহের গান রোবসনের দৈব কণ্ঠের গভীর খাত থেকে উঠে এসেছিল। বিশ শতকের এই শেষ পর্বে আমেরিকার নিগ্রোদের সেই বেদনা—বিশ্বের শ্রমজীবী শোষিত মানুষের বিদ্রোহ আর ব্যথার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে। প্রায় শতাব্দবিস্তারী এই গানে গানে রোবসনের কণ্ঠে কণ্ঠে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, বর্ণভেদের বিরুদ্ধে মানুষের জয়যাত্রার সুরবিস্তার। এই স্বর আর সুরের পরিপ্রেক্ষিত রচিত করে রেখেছে সোভিয়েতের দুনিয়াজোড়া মহাবিজয়। রোবসন এই শতাব্দীর সংগীত! সে কণ্ঠ আজ স্তব্ধ হলো। কিন্তু সেই কণ্ঠস্বর আজ থেকে আগামী চিরন্তনতার দিকে চলে যায়—দুনিয়ার স্বাধীনতার মুক্তির আনন্দের অবকাশের স্ফূর্তির মানবমুক্তির অবধারিত সেই চিরন্তনতা।

প্রসঙ্গ ঃ পরিভাষা ও বানান

বাঙলা পরিভাষা ও বানান নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে আমাদের উনিশ শতকী আধুনিকতার দিনগুলি থেকেই। বিদেশী সভ্যতার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্কের ফলে নতুন নতুন শব্দ এসেছে আমাদের কথায় বার্তায়, ব্যবহারিক এবং মননের জগতে—সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষায় তা চর্চা করার বা প্রয়োগ করার আকুতি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যুগ থেকেই বা তার আগে থেকেই এই সচেতনতার ইতিহাস, ক্ষীণভাবে হলেও, শুরু হয়েছে বলা চলে। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র বা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পর্যন্ত পর পর আমাদের অনেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মীই এ ব্যাপারে সক্রিয়তা দেখিয়েছেন। সর্ব ব্যাপারে যেমন তেমনি এ ব্যাপারেও, অর্থাৎ বিদেশী শব্দের আত্মীকরণে বা পরিভাষার নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা আশ্চর্য দ্যুতিময়, ক্ষিপ্র-তৎপর—তিনি যে কটি অনুবাদ নিজে করে গেছেন তা এ বিষয়ে প্রায় আদর্শ বলে আজও গণ্য হতে পারে। বিশেষ করে বিদ্যাসাগর রামেন্দ্রসুন্দর ও রবীন্দ্রনাথের সক্রিয়তার পাশে আমাদের আজকের উদ্যমহীনতা বা উদ্যমের ক্ষীণতা ও মামুলিত্ব আমাদের ঐতিহ্যচ্যুতিরই দৃষ্টান্ত। পরবর্তীকালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবকতায় পরিভাষা নির্মাণের যে চেষ্টা হয়েছে সেটাই বোধহয় যৌথ উদ্যোগের প্রাথমিক প্রয়াস এবং সকলেই জানেন, এ ধরনের উদ্যোগ

ছাড়া শেষপর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ পরিভাষা রচনার মতো বড় কাজ হতেই পারে না। আজকে তো তারও পরে, জ্ঞানবিজ্ঞানের নতুন নতুন বিস্তার, সারা জগতের সঙ্গে ত্বরিত যোগাযোগ এই উদ্যোগের প্রয়োজনকে আরো অনিবার্য যদিচ দুঃসাধ্য করে তুলেছে। ইংরেজ ঔপনিবেশিকতার জের এখনও আমাদের মনোভাবকে দাসানুদাস করে রেখেছে, আমাদের কথায় লেখায় সরকারী-বেসরকারী সংগঠনে; মাতৃভাষায় বুদ্ধি ও আবেগের চর্চাকে এখনও তর্ক করেই বোঝাতে হয়; তবু বরফ তো গলছেই।

বানানের যাথার্থ্য বা সঙ্গতি রক্ষার প্রশ্নও ভাষাসচেতনতা অর্থাৎ আত্মসচেতনতারই আরেকটি দিক। এ বিষয়ে যথার্থ মনোযোগ আসতে হয়তো একটু দেরিই হয়েছে এবং বাঙলা ভাষার শব্দভাণ্ডারের প্রকৃতিগত কারণে বানান-সচেতনতার চেষ্টাটাও একটু বিতর্কমূলক ও বিশৃঙ্খল হতেও বাধ্য। এবং সে কারণেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান কমিটির সিদ্ধান্ত এক যুগ আগে নেওয়া হলেও এবং সে-সম্পর্কে সে-যুগের তাবৎ মহারথীরা সম্মতি জানালেও আজও আমরা এ ব্যাপারে নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক চেতনার বদলে নিজেদের অভ্যাস বা বাতিককেই প্রশ্রয় দিই।

পরিভাষা ও বানানসঙ্গতির এই সমস্যার বিস্তার ঘটল, আরো যত বেশি আমরা রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক কাজকর্মে গোষ্ঠীবদ্ধতা থেকে ছড়িয়ে পড়লাম। বিশেষ করে আমাদের দেশে মার্কসবাদের আবির্ভাব এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠায় অবস্থার গুণগত পরিবর্তন ঘটল। অনেক বেশি লেখার দরকার হল, দরকার হল অনেক বেশি অনুবাদ করার, শিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত নানা ধরনের নানা জীবিকার নানা ভাবনার জনতার সঙ্গে মতবিনিময় বা মতপ্রচারের আশু তাগিদ এসে গেল। মার্কসবাদের প্রচার এদেশে, শুধু বিদেশী ভাষায় নয়, এদেশের ভাষায়, শুধু অনুবাদে নয়, তার মৌলিক প্রয়োগে—শিল্পসাহিত্যের নানা সমস্যাকে উন্মোচিত করায়—আমাদের চিন্তা ও ভাবনার জগতে এমন এক বিস্তার ঘটল, আমাদের বিশ্ব গেল বেড়ে, মাতৃভাষার নিজস্ব শব্দ ও বিদেশী ভাষা থেকে পাওয়া বা অনুবাদ-করা শব্দের এমন এক অনায়াস সহাবস্থান ঘটতে থাকল আমাদের মননে ও লেখায় যে অনুবাদের সমস্যা, পরিভাষার সমস্যা এক নতুন পর্যায়ে পৌঁছে গেল। আমাদের রাজনীতির নতুন এই চেতনার স্তরে পরিভাষার ও বানানের সমস্যা তাই এত জরুরি।

কমিউনিস্ট পার্টি যখন তার ৫০ বছর বয়সে এ-সম্পর্কিত বিক্ষিপ্ত চিন্তা-ভাবনাকে নিজেরই প্রয়োজনে একত্রিত করে একটি ধারাবাহিক ও স্থায়ী চেহারা

দেবার জন্য সরাসরি উদ্যোগ নেন ['পরিভাষা' ও কয়েকটি আধুনিক বাঙলা বানান'। প্রকাশক : কালান্তর প্রেস। ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭। প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ১৯৭৫], সূত্রপাত করেন দীর্ঘ আলোচনা ও বিচারের প্রথম পর্যায়ের [ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পরিভাষা ও বানান বিষয়ে সেমিনার। স্থান : লেনিন স্কুল ফর মার্কসিস্ট স্টাডিজ], তখন সেটা খুবই স্বাভাবিক ও সংগত লাগে —কারণ সাংস্কৃতিক সবরকমের কাজেকর্মেই তো সচেতনতার বা আত্মসচেতনতার ইতিহাসের সঙ্গে নিজেকে সংলগ্ন করে দেওয়াই তার একটা বড় কর্তব্য এবং বলা বাহুল্য সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য তাকে আরো অর্থবহ করে তোলা বৈপ্লবিক প্রেরণায়। কমিউনিস্ট পার্টির এই উদ্যোগ আরো মূল্যবান এই কারণে যে পরিভাষা রচনার কাজকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য প্রয়োজনীয় যৌথ উদ্যোগ, অনুপ্রাণিত উদ্যোগ, এর চেয়ে বেশি কার কাছ থেকে আসতে পারে? এই কাজ যেমন পারস্পরিক সহযোগিতায় একটি বিরাট দলই মাত্র করতে পারে, তেমনি এর গ্রহণ ও প্রচারও কেন্দ্রীয় আনুগত্য নির্ভর। রবীন্দ্রনাথ-স্বীকৃত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচেষ্টার যুগ শেষ হয়ে গেছে, সরকারী উদ্যোগও বড় শ্লথ। এই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টিই তো পারে সব শর্ত পূরণ করতে। তবে এ সবই সূত্রপাত মাত্র। আসল কাজ দিনের পর দিন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ইঁট গেঁথে যাওয়া, তর্কবিতর্কের মধ্যে মতৈক্যে পৌঁছনো।

আমরা এই সূত্রে পাওয়া দুটি সংক্ষিপ্ত টীকা ছাপছি এ-সংখ্যায় এবং আশা করছি এ-বিষয়ে তত্ত্বগত এবং তথ্যগত উভয় প্রকার আলোচনাই কিছু কিছু ছাপিয়ে যেতে পারব ভবিষ্যতে, এবং মার্কসবাদী মহলের প্রয়োজনে যে পরিভাষা-কোষ পরবর্তীকালে গড়ে উঠবে 'পরিচয়'-এর এই আলোচনা তাতে সাধ্যমতো সাহায্য করবে।—সম্পাদক।

পরিভাষা ও কয়েকটি আধুনিক বাঙালা বানান

(নির্বাচিত অংশ)

['কালান্তর প্রেস' প্রকাশিত একটি পুস্তিকা আলোচনার জন্য প্রকাশিত হয়। ডিসেম্বর ১৯৭৬-এ একটি সেমিনারও অনুষ্ঠিত হয় এ-ব্যাপারে। সেই পুস্তিকায় পরিভাষা ও বানান-এর যে প্রস্তাব করা হয়েছে, তা থেকে কয়েকটি এখানে তুলে দেওয়া হল—পরবর্তী টীকাগুলিতে যে শব্দগুলির উল্লেখ করা হয়েছে প্রধানত সেগুলিই।—সম্পাদক।]

পরিভাষা

Absolute—পরম, অনাপেক্ষিক, অনপেক্ষ
Accident—আপতন, আকস্মিকতা
Barter—দ্রব্য-বিনিময়
Bourgeoisie—বুর্জোয়া, মধ্যশ্রেণী
Basis and Superstructure—ভিত্তি ও সৌধ
Accumulation of Capital—মূলধনের আদি বা মূল সঞ্চয়
Capitalism—ধনতন্ত্র, ধনবাদ
Capitalist—ধনিক, ধনতন্ত্রী, ধনবাদী
Chance—আকস্মিকতা, সুযোগ, দৈব ঘটনা
Credit—ক্রেডিট
Chauvinism—জাতিদম্ভ
Clan—গোষ্ঠী, ক্ল্যান
Dialectical—দ্বন্দ্বমূলক
Dialectics—ডায়েলেকটিক্‌স্‌, দ্বন্দ্ব
Economics—অর্থতত্ত্ব
Expropriator—উচ্ছেদকারীর উচ্ছেদসাধন
Fallacy—যুক্তিপতন
Finance Capital—ফিনান্স ক্যাপিটাল, ফিনান্স মূলধন
Generalization—সাধারণীকরণ
Hegemony—অধিনায়কত্ব
Investment—বিনিয়োগ
Jingoism—যুদ্ধমত্ততা
Laissez-fair—অবাধনীতি, হস্তক্ষেপ বর্জননীতি
Manufacture—উৎপাদন
Nominalism—নমিনালিজ্‌ম্‌
Organic Composition (of Capital)—অঙ্গ সংস্থান
Petty-bourgeoisie- পেটি-বুর্জোয়া, নিম্ন-মধ্যশ্রেণী
Product—উৎপন্ন
Pragmatism—প্রয়োগসর্বস্ববাদ
Saturation point—পরিপূক্তিবিন্দু
Social chauvinism—জাতিদাম্ভিক সমাজবাদ
Technology—কৃৎবিদ্যা, প্রয়োগবিদ্যা, কারিগরি বিদ্যা
Toll—উপশুল্ক
Thesis—থিসিস, বিধান

☞ বানান

বর্জিত	গৃহীত
অর্চ্চনা, মূর্চ্ছনা	অর্চনা, মূর্ছনা
ঊনিশ, চুণ	উনিশ, চূন, পুব, ভূঁয়ে
ভেঙ্গে, রঙ্গীণ	ভেঙে, রঙীন
সংগে, গংগা	সঙ্গে, গঙ্গা
মত, ভাল	মতো, ভালো
ধরণ, দরুণ	ধরন, দরুন
তফাৎ, নেহাৎ	তফাত, নেহাত
খৃষ্ট, বৃটিশ	খ্রীষ্ট, ব্রিটিশ
জিনিষ, আপোষ	জিনিস, আপোস, পোষাক
খুসি, সহর, সুরু	খুশি, শহর; শুরু
কম্যিউনিষ্ট, মার্ক্স	কম্যিউনিস্ট, মার্কস
হোলো, হলো, হোল	হ'ল
যাবো, শুনবো	যাব, শুনব

আলোচনা

এক

পরিভাষা বিষয়ের উপর নির্ভর করে। একই শব্দের পরিভাষা বিষয় অনুযায়ী ভিন্ন রকমের হতে পারে। এ ছাড়া অর্থনীতি অথবা রাজনীতির পরিভাষা ইতিহাসের উপরেও অনেকখানি নির্ভরশীল। যেমন ধনিকশ্রেণীর অভ্যুদয়কালে তৎকালীন সমাজবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে ধনিকশ্রেণীকে 'বুরজোয়া' বা মধ্যশ্রেণী বলে অভিহিত করা হয়েছিল। কিন্তু এখন এই শ্রেণীকে আর মধ্যশ্রেণী বলে অভিহিত করা যায় না। এই কারণে 'বুরজোয়া' শব্দের বাংলা পরিভাষা হওয়া উচিত 'ধনিক শ্রেণী'। 'বুরজোয়া' কথাটিও বাংলায় চলে গেছে। তবে ধনিক শ্রেণীর অভ্যুদয়ের যুগের ইতিহাস অথবা ঐ যুগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো প্রবন্ধের অনুবাদকালে 'মধ্যশ্রেণী' পরিভাষা রূপে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। 'বুরজোয়া' কথাটিও ব্যবহার করা যায়। একই যুক্তি অনুসারে ঐ সময়কার ইতিহাস বা অর্থনীতি বা রাজনীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধ অনুবাদকালে 'পেতি বুরজোয়া' কথাটির পরিভাষা রূপে 'নিম্ন মধ্যশ্রেণী' ব্যবহার করা উচিত। 'পেতি বুরজোয়া' কথাটিও রাখা যায়। কিন্তু আজকের দিনে 'পেতি বুরজোয়া'-র পরিভাষা রূপে 'মধ্যবিত্ত' কথাটি চালু করা উচিত। অবশ্য এ বিষয়ে কিছুটা অসুবিধা আছে বলে আমার মনে হয়। তা হলেও 'মধ্যবিত্ত' গ্রহণযোগ্য।

'ফিনান্স ক্যাপিটাল'-এর পরিভাষা রূপে আমি 'লগ্নী-পুঁজি' কথাটি ব্যবহার করে থাকি। খুঁটিয়ে দেখলে এতে অসুবিধা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু পরিভাষা সৃষ্টিকালে একটু স্বাধীনতা নিতে দোষ নেই।

'ইনভেস্টমেন্ট'-এর বাংলা পরিভাষা 'লগ্নী'। 'বিনিয়োগ'ও চলে।

'ডায়ালেকটিক্‌স'-এর পরিভাষা 'দ্বন্দ্বতত্ত্ব' বা 'দ্বন্দ্ববিদ্যা' হওয়া উচিত বলে মনে হয়। 'ডায়ালেকটিক্যাল'-এর পরিভাষা রূপে 'দ্বান্দ্বিক'ও চলতে পারে।

'ইকনমিকস'—'অর্থনীতি' চলে গেছে, 'অর্থশাস্ত্র' বা 'ধনবিজ্ঞান'ও চলে। 'অর্থতত্ত্ব'-এর কোনো প্রয়োজন নেই।

'ক্যাপিটালিজম'—পুঁজিবাদ, ধনতন্ত্র

'ক্যাপিটালিস্ট'—পুঁজিপতি, ধনিক

'ক্রেডিট'—ধারে জিনিস দেওয়ার ব্যবস্থা। এক কথায় অনেকে 'পসার' কথাটা ব্যবহার করেন।

'জেনারালিজেশন'—সামান্যীকরণ। এটা চালু আছে, কাজেই, 'সাধারণী-করণ' রাখবার প্রয়োজন নেই।

'নমিনালিজম'—সংজ্ঞাবাদ

'প্র্যাগমাটিজম'—প্রয়োগবাদ। 'সর্বস্ব' কথাটির কোনো দরকার নেই।

'টেকনোলজি'—'প্রযুক্তিবিদ্যা' চালু হয়ে গেছে।

'টোল'—তোলা। 'তোলা' কথাটি চাষীদের কাছে সুপরিচিত। কাজেই নতুন পরিভাষার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

'থিসিস'—তত্ত্ব, গবেষণানিবন্ধ। 'বিধান' কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়।

'সভিনিজম'—'জাত্যভিমান' চালু হয়ে গেছে, কাজেই 'সোস্যাল সভিনিজম' হতে পারে, 'জাত্যভিমানী সমাজবাদ' হতে পারে।

'প্রোডাক্ট'—শুধু 'উৎপন্ন' কথাটি বললে হবে কি? 'দ্রব্য' যোগ করা বিধেয়।

'Organic composition'—জীবতত্ত্বের পরিভাষা রূপে 'অঙ্গ-সংস্থান' চলতে পারে, কিন্তু পুঁজির বেলায় চলবে কি? 'Organic composition of Capital'—'পুঁজির আঙ্গিক গঠন'।

মোটামুটি কিছু বলার চেষ্টা করলাম। স্বভাবতই এরকম বিষয়ে আরও ভেবেচিন্তে কাজ করা দরকার।

সুকুমার মিত্র

দুই

আলোচনা সভায় থাকতে পারছি না। অথচ এবিষয়ে অনেক কথা বলার ছিল। সংক্ষেপে দু-একটি কথা লিখে জানাচ্ছি।

বানান

যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তার পেছনে কী যুক্তি বা নীতি আছে, তা খুলে বলা হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে নতুন বানানরীতি, তার কতকাংশ মেনে কতকাংশ অগ্রাহ্য করা হয়েছে। অগ্রাহ্য করার কোনো কারণ দর্শানো হয়নি।

রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না—এটা এখন সর্বস্বীকৃত। সুতরাং এর উল্লেখ এখন বাহুল্যমাত্র।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বানানের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল বিকল্পের ব্যবস্থা। কালান্তর প্রেসের তালিকায় বানানের একটিমাত্র রূপ বেছে নেওয়া উচিত কাজ হয়েছে।

কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে নতুন বানানরীতিকে কেন লঙ্ঘন করা হয়েছে, তার কোনো যুক্তি দেওয়া হয়নি। যেমন, 'চূন', 'ভূঁয়ে'। উ-কার স্বচ্ছন্দে বাদ দেওয়া যেত। 'রঙিন'-এর বদলে কেন 'রঙীন' হবে? 'পোশাক'-এর বদলে 'পোষাক'? 'বাংলা'র বদলে কেন 'বাঙলা'?

বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের ছিল দুটি উদ্দেশ্য: বানানের নিয়ন্ত্রণ আর সরলতা। কিন্তু যে কারণেই হোক তাঁরা পুরোপুরি সফল হন নি। রক্ষণশীলদের চাপের কাছে অনেক জায়গায় তাঁরা নতি স্বীকার করেছেন।

বানান জিনিসটা আদতে হলো বানানো। বর্ণগুলো এমনভাবে যোগ করা যাতে উচ্চারণ ঠিক থাকে। উচ্চারণ বদলে গেলে সাধারণত বানানও বদলায়।

অবশ্য সব শব্দেরই বানান হুবহু উচ্চারণ-অনুযায়ী হয় না। সঠিক উচ্চারণ দর্শানোর যে আন্তর্জাতিক বর্ণমালা আছে, তাতে কোনো ভাষাই লেখা হয় না।

শুধু অক্ষর চিনলেই কোনো ভাষা নির্ভুলভাবে পড়া যায় না। প্রত্যেক ভাষারই উচ্চারণবিধি শিখে নিতে হয়। তাছাড়া প্রসঙ্গ থেকেও একটি শব্দের উচ্চারণ বা অর্থ আঁচ করে নিতে হয়।

'হ'ল'—এই বানান আমি সমর্থন করি না। ইলেক দেওয়া অনর্থক এবং বাহুল্য। 'হল' লিখলে অর্থবিভ্রাট ঘটতে পারে? 'হয়েছিল', 'বিষ', 'লাঙল', না 'সভাকক্ষ'—কোন্‌টা, তা কি বাক্য বা প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যাবে না?

বানান সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বানানবিধি সম্পর্কে মন স্থির ক'রে নেওয়া দরকার।

বিদেশী শব্দের বাংলা বানান নির্ণয় করার সময় দেখতে হবে তার প্রচলিত রূপটি বজায় রাখা যায় কিনা।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ল: অপ্রচলিত নতুন বিদেশী শব্দের বেলায় আমরা কি চোখকান বন্ধ ক'রে শুধু ইংরিজিরই অনুসরণ করব?

যেমন: ব্যক্তিক বা ভৌগোলিক নামের ক্ষেত্রে। ভারত এখন স্বাধীন। ইংরিজি ছাড়াও সমস্ত বিদেশী ভাষার সঙ্গেই এখন আমাদের সাক্ষাৎযোগ ঘটছে। সব দেশেরই দূতাবাস আছে দিল্লীতে। যে কোনো নামেরই সে-দেশী

উচ্চারণ জেনে নেওয়া দুঃসাধ্য নয়। একাজ সর্বভারতীয় নিউজ এজেন্সীগুলোও করতে পারে। যেমন 'টাইম উইক্‌লি' থেকে আমরা জেনেছিলাম হাঙ্গেরির 'নাগি'র উচ্চারণ আসলে 'নজ'।

এদেশী কাগজগুলোতে ইংরেজির নকলে এখনও লেখা হয় 'কাম্বোডিয়া'। অথচ ভারতীয়রা বরাবরই তাকে বলে এসেছে 'কাম্বোজ' এবং সেদেশের নিজস্ব নামও হল 'কাম্বোজ'। 'ঈজিপ্ট'কে কেন আমরা 'মিশর' বলি না?

সবক্ষেত্রে বিদেশী শব্দের মুল উচ্চারণ অবিকল বজায় রাখার আমি পক্ষপাতী নই। নিজেদের উচ্চারণের প্রকৃতি অনুযায়ী শব্দটিকে আমরা স্বচ্ছন্দে খাপ খাইয়ে নিতে পারি। পাঞ্জাবীরা 'সটেশন', 'সকুল' বললে আমরা হাসি, অথচ আমরা অম্লানবদনে এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই বলি 'ইস্টিশান', 'ইস্কুল'।

ইংরিজি, ফরাসী ইত্যাদি শব্দের মূলানুগ উচ্চারণ আর বানানের ব্যাপারে আমাদের অনেকের মধ্যেই বেশ খানিকটা নাকউঁচু চালিয়াতির ভাব আছে।

আসলে যেটা দরকার; সেটা হল এই সমস্ত বিষয়েই একটা সর্বজনগ্রাহ্যতা। বানানের অভিন্নতা।

ভিয়েতনামীরা 'মার্ক্স' না ব'লে বলেন 'মাক্‌'। এসত্ত্বেও মার্ক্সবাদ তাঁরা আয়ত্তে এনেছেন।

বানানের প্রসঙ্গে আরেকটি দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি দিতে বলব। তা হল বাংলা হরফ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বানানরীতি চালু হবার পর ছাপাখানায় যুক্তাক্ষরের ছাঁচ কিছুটা বদলেছে। আরও বেশি বদল হয়েছে লাইনোটাইপ আর মনোটাইপের ক্ষেত্রে। কিন্তু আজও টাইপরাইটারের হরফের সঙ্গে ছাপার অক্ষরের সঙ্গতি নেই। ফলে, বাংলায় টাইপ-করা পাণ্ডুলিপি ছাপাখানায় অচল। তাছাড়া, অক্ষরের এই ত্রিমূর্তি আজ বানানের ক্ষেত্রে নৈরাজ্য ঘটাচ্ছে। এখনকার ছেলেদের বানানবিভ্রাটের একটা বড় কারণ এই অক্ষরবিভ্রাট।

পরিভাষা

বিশেষভাবে কয়েকটি ছাড়া এই তালিকার প্রায় সব পরিভাষাই সাধারণভাবে দর্শনে, অর্থনীতিতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়। এমনকি মার্ক্সবাদও এখন অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং পরিভাষা যদি স্থির করতেই হয়, তাহলে তা করতে হবে গোটা বাংলাভাষারই স্বার্থে। একাজে

সংশ্লিষ্ট সবাইকে টেনে আনার জন্যে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগ দরকার। দুঃখের বিষয়, ভাষা, শিক্ষা, আর জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বামপন্থীরা এযাবৎ বিশেষ উদ্যোগ বা নিষ্ঠার পরিচয় দেখান নি। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা প্রবর্তনের ব্যাপারে এবং সর্বভারতীয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে হিন্দীর স্বপক্ষে পার্টিগতভাবে বামপন্থীরা বলতে গেলে কিছুই করে নি। ইংরিজিকে শিক্ষার বাহন করার ব্যাপারে প্রগতিশীল অভিভাবকদের দুর্বলতা আর শিক্ষা-কর্মীদের সুবিধাবাদ আমাদের অগৌরবের কারণ হয়েছে।

পরিভাষা ঠিক করতে গেলে, তা বাংলাভাষাভাষী সকলের জন্যেই হওয়া উচিত। তার জন্যে সরকার আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে খোঁচানো দরকার। সেই সঙ্গে জানা দরকার, অতীতে ও সম্প্রতি এরাজ্যে ও বাংলাদেশে কতটা কী কাজ হয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বিনয় সরকার, সুরেন ঠাকুর, ভূপেন দত্ত—এঁদের লেখা থেকে অর্থনীতি আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নানা পরিভাষা পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া নেওয়া যেতে পারে হাটবাজারের চলতি শব্দ। একদিকে গবেষণা আর লৌকিক শব্দসংগ্রহ। অন্যদিকে নতুন শব্দ তৈরি—এইভাবে পরিভাষার ভাণ্ডার গড়ে উঠতে পারে। বিদেশী শব্দ সব সময় অবিকলভাবে আমরা নেব এমন কোনো কথা নেই—বিদেশী শব্দ আমাদের ভাষার স্বভাবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে আত্মসাৎ করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে পরিভাষাকারদের আরেকটি কথা আমি মনে করিয়ে দিতে চাই। পরিভাষাগুলো যেন কিম্ভূতকিমাকার না হয় এবং কিছুটা সহজবাক্য ও শ্রুতিসুখকর হয়। বাংলাভাষায় জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোই পরিভাষার প্রধান কাজ। কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানের জিনিস ক্রমে বেড়া ভেঙে আবেগের স্তরেও চলে যায়। পরিভাষা খটোমটো হলে এই প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হবে।

পরিভাষা প্রসঙ্গে আমার আরও অনেক কথা বলার আছে। পরে সুযোগমত বলব।

আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাষা আজও একান্তভাবে ইংরিজি-নির্ভর। পরিভাষা বলতেই আমরা বুঝি ইংরিজির অনুবাদ। অথচ একটু খুঁজে দেখলে সংস্কৃত বইপুঁথি থেকে অজস্র পরিভাষা পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে হিন্দীতে অনেক কাজ হয়েছে। তা থেকে আমরা সাহায্য পেতে পারি। বাংলাভাষা যদি আজকের বাকি ভারত থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে শুধু ইংরিজির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাহলে সেটা মারাত্মক ভুল হবে। সেই সঙ্গে উদারভাবে লোকমুখের চলিত শব্দগুলোকে পরিভাষার কাজে লাগাতে হবে।

আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে। শুধু ফতোয়া দিয়ে কোনো পরিভাষা চালু রাখা যায় না। পরিভাষার সুষ্ঠু ব্যবহার এবং লোকগ্রাহ্যতার ওপর পরিভাষার বাঁচা-মরা নির্ভর করবে। যে সব পরিভাষা এখনও ঠিক স্থায়ী হয় নি, হয় তার পাশে আপাতত বন্ধনীতে কিংবা লেখার শেষে তালিকা আকারে ইংরিজিগুলো নির্দেশ করলে ভাল হয়।

একই শব্দ যখন দর্শন, অর্থনীতি ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে ব্যবহার হচ্ছে, তখন আলাদাভাবে নির্দেশ করা দরকার কোন্ পরিভাষাটি দর্শনের, কোনটি অর্থনীতির উপযোগী। যেমন: Absolute: পরম (দ), অনাপেক্ষিক (অ)—এইভাবে।

Barter: হিতোপদেশে 'দ্রব্যপরিবর্ত' পাওয়া যায়। তাছাড়া একটু খুঁজলেই বোধ হয় যুৎসই লৌকিক শব্দ পাওয়া যেতে পারে। শুধু 'পরিবর্ত' বা তার সঙ্গে 'প্রথা' যোগ করলেও তো চলে।

Bourgeoisie: 'বুর্জোয়া' কথাটা রেখে দরকার মতো 'শ্রেণী' বা 'গোষ্ঠী' যোগ করা যেতে পারে। 'মধ্যশ্রেণী' না রাখাই উচিত।

Superstructure-এর প্রতিশব্দ এক সময়ে করা হত 'উপরিকাঠামো' বা 'উপরিতল'। রূপক হিসেবে দুটোর একটিও স্পষ্ট নয়। ভিত্তির ওপর স্থাপিত অর্থে 'সৌধ' বরং সমর্থনযোগ্য।

Accident আর Chance দুয়েরই মূলের অর্থ 'পতন' (পড়া)। 'আপতন' আর 'দৈব' শব্দদুটি ('দৈব'-এর পেছনে রয়েছে 'যেখান থেকে আলো আসে' অর্থাৎ 'আকাশ'। 'দৈবাৎ'=আকাশ থেকে পড়া।) ব্যবহার করা যায়।

Clan=গোত্র বা কুল?

Expropriator='উচ্ছেদকারী' নয়; 'বেদখলকারী'।

Fallacy=হেত্বাভাস।

Manufacture='কায়িক শিল্প' বা 'শ্রমশিল্প' উপযুক্ত নয়।

Hegemony=এক রাষ্ট্রের বা এক জাতির ওপর অন্য রাষ্ট্রের বা জাতির কর্তৃত্ব। 'মোড়লি' কথাটা কি খাটে?

Jingoism=মারমুখো দেশাভিমান?

Laissezfair=ছাড়া-গরু নীতি?

অনুবাদ

মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স ও লেনিনের বইগুলির বাংলা অনুবাদে সম্ভবত অনেক ভুল আছে। এখনই এ বিষয়টির তদন্তের ব্যবস্থা হোক। ভুল হয়ে থাকলে ভুলগুলো কী ধরণের তা খুঁটিয়ে দেখা হোক। যেখানে অনুবাদকের সততা বা নিষ্ঠার অভাব দেখা যাবে, সেখানে অনুবাদককে ব্ল্যাকলিস্ট করা হোক (নাম বা পার্টিতে পদমর্যাদার কেয়ার না ক'রে)। প্রত্যেক অনুবাদকর্মের সঙ্গে অনুবাদকের নাম থাকলে দায়িত্বজ্ঞান বাড়বার সম্ভাবনা থাকবে।

অনুবাদ যাতে বোধগম্য হয় সেদিকে অনুবাদককে দৃষ্টি দিতে হবে। তা না হলে অনুবাদের উদ্দেশ্যই পণ্ড হবে।

সেই সঙ্গে অনুবাদকদের বিশেষভাবে শেখানোর ব্যবস্থা করতে পারলে খুব ভাল হয়।
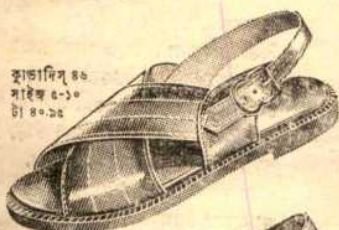
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
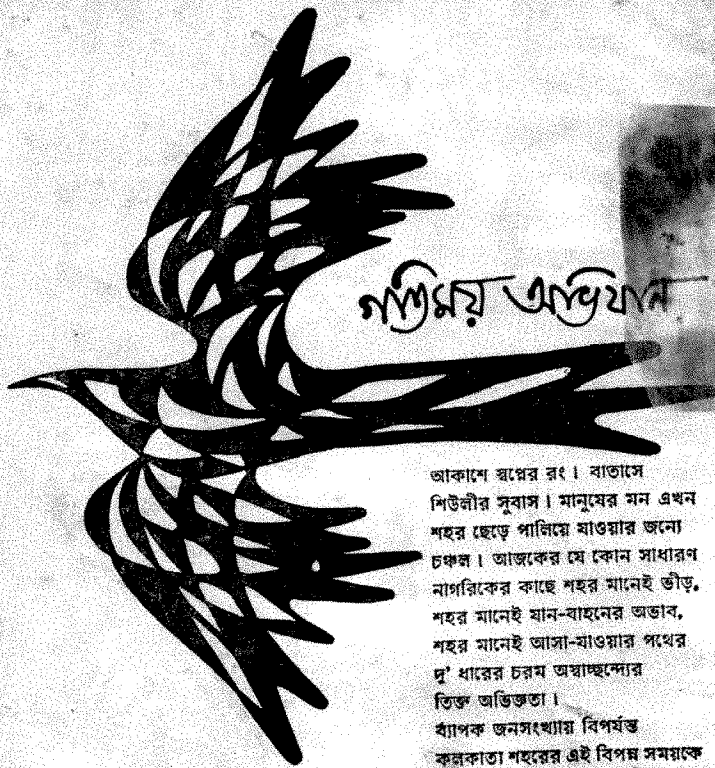
গতিময় অভিযান
আকাশে স্বপ্নের রং। বাতাসে
শিউলীর সুবাস। মানুষের মন এখন
শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে
চঞ্চল। আজকের যে কোন সাধারণ
নাগরিকের কাছে শহর মানেই ভীড়,
শহর মানেই যান-বাহনের অভাব,
শহর মানেই আসা-যাওয়ার পথের
দু' ধারের চরম অস্বাচ্ছন্দ্যের
তিক্ত অভিজ্ঞতা।
ব্যাপক জনসংখ্যায় বিপর্যস্ত
কলকাতা শহরের এই বিপন্ন সময়কে
পটভূমিকায় রেখেই ভূগর্ভ-রেলের
ব্যাপক ও বিপুল পরিকল্পনা। ভূগর্ভ
রেল মানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ
যাত্রীর দ্রুত এবং নিরাপদ ভ্রমণের
প্রতিশ্রুতি। ভূগর্ভ রেল মানেই
জাতীয় শান্তি সমৃদ্ধির পথে এক
গতিময় অভিযান।
MTP
কলকাতার মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল
মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট
প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)